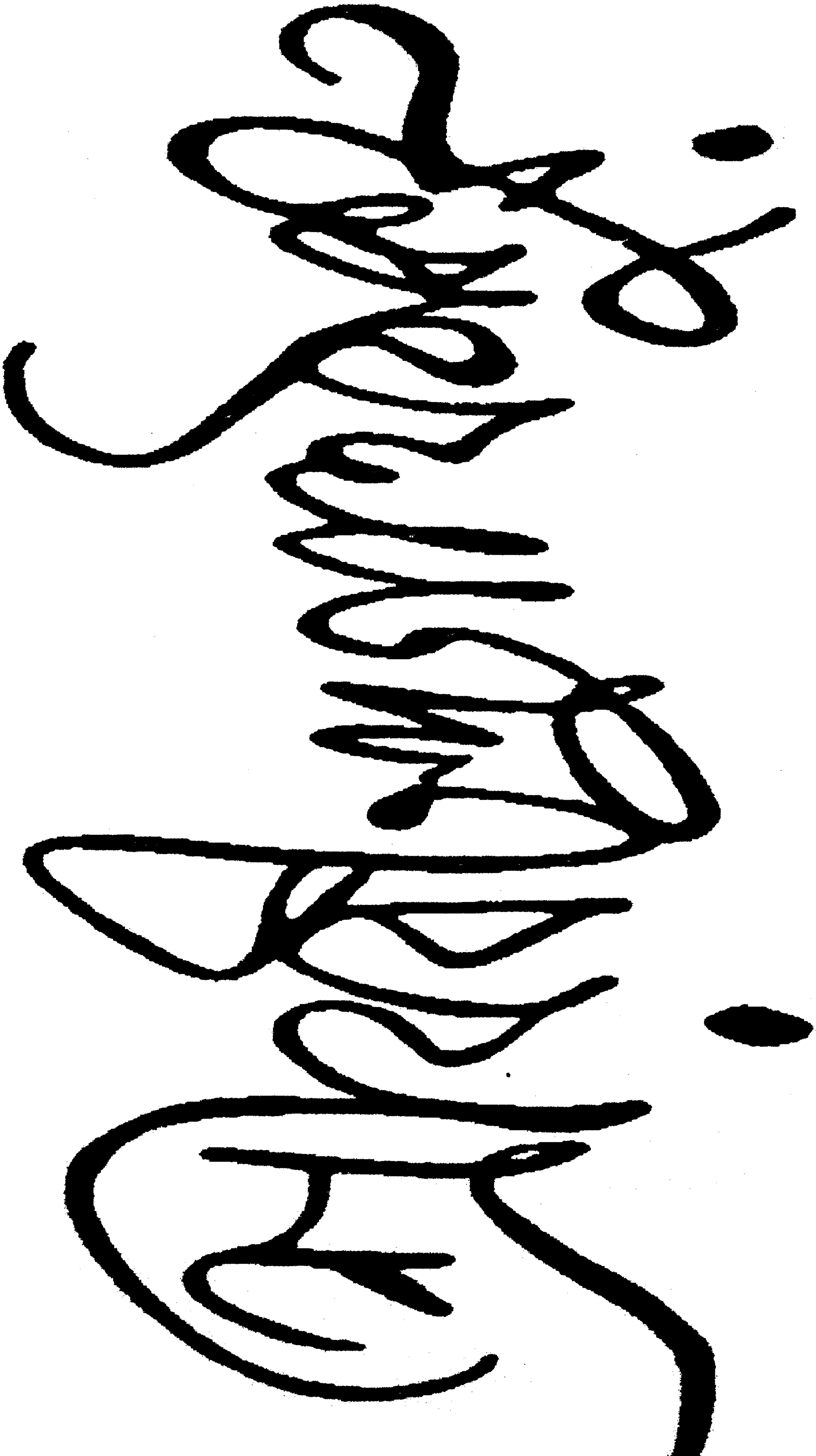

রবীন্দ্র-রচনাবলী

রবীন্দ্র-রচনাবলী

ষোড়শ খণ্ড

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বিশ্বভারতী
৬ আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড। কলকাতা ১৭

প্রকাশ মাঘ ১৪০৭

© বিশ্বভারতী

ISBN-81-7522-291-3 (V.16)
ISBN-81-7522-289-1 (Set)

প্রকাশক কল্যাণ মৈত্র
বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ। ৬ আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড। কলকাতা ১৭

ফোটোটাইপ সেটিং : ক্যালকাটা রিপ্রোগ্রাফিক্স
৩৬/৮বি সাহিত্য পরিষদ স্ট্রীট। কলকাতা ৬

মুদ্রক স্বপ্না প্রিন্টিং ওয়ার্কস প্রাইভেট লিমিটেড
৫২ রাজা রামমোহন রায় সরণী। কলকাতা ৯

প্রকাশকের নিবেদন

রবীন্দ্র-রচনাবলীর সপ্তবিংশ খণ্ডের (সুলভ সংস্করণ চতুর্দশ খণ্ডের) 'নিবেদন'-এ বলা হইয়াছিল: 'এ-যাবৎ রবীন্দ্র-রচনাবলীর অন্তর্ভুক্ত হয় নাই অথচ গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইয়াছে এরূপ রচনা এই খণ্ডে সংগৃহীত হইল।

যে-সব রচনা এ পর্যন্ত রবীন্দ্র-রচনাবলীর অন্তর্ভুক্ত হইল না পরবর্তী এক বা ততোধিক খণ্ডে সেগুলি সংগৃহীত হইবে।'

সেই অনুযায়ী পূর্ব-প্রকাশিত রচনাবলীর অন্তর্ভুক্ত কোনো কোনো গ্রন্থের উদ্‌বৃত্ত রচনা এবং কিছু অগ্রন্থিত রচনা রচনাবলীর বর্তমান অষ্টাবিংশ খণ্ডে (সুলভ সংস্করণ ষোড়শ খণ্ডে) যথাস্থানে সন্নিবিষ্ট করা হইল। পরবর্তী উনত্রিংশ, ত্রিংশ এবং একত্রিংশ খণ্ডে (সুলভ সংস্করণ সপ্তদশ ও অষ্টাদশ খণ্ডে) আরো কিছু অগ্রন্থিত রচনা সংকলিত হইল। বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় মুদ্রিত বিবিধ রচনা সংগ্রহের কাজ চলিতেছে এবং তাহা খণ্ডশ প্রকাশের আয়োজনও করা হইতেছে।

বিষয়সূচী

কবিতা ও গান

সংযোজন

পূরবী ৫
বীথিকা ১৩
প্রহাসিনী ২৫
রোগশয্যায় ৩১
জন্মদিনে ৩৩
গল্পসল্প ৩৫
স্ফুলিঙ্গ ৩৬

নূতন সংকলন

চিত্রবিচিত্র ৭১
রূপান্তর ৮৭
অনূদিত কবিতা ১৯৭

নাটক ও প্রহসন

মালঞ্চ ২১৯
হাস্যকৌতুক : হেঁয়ালি নাট্য ২৫৩
বিসর্জন : নারীচরিত্রবর্জিত সংক্ষিপ্ত ২৫৯

উপন্যাস ও গল্প

ইঁদুরের ভোজ ২৭৯

প্রবন্ধ

শিক্ষা : সংযোজন ২৮৩
বাংলা শব্দতত্ত্ব ৩৫৯
সংগীতচিন্তা ৫২৫
  সংযোজন ৬১৫

গ্রন্থপরিচয় ৬৪৫

বর্ণানুক্রমিক সূচী ৭২৩

চিত্রসূচী

রবীন্দ্রনাথ প্রবেশক

পাণ্ডুলিপিচিত্র

পাঙ্চুয়াল ৮৬
মালঞ্চ উপন্যাস: ৪৫এ: পৃ.২৫ ২২০
"শব্দচয়ন" প্রবন্ধের পাণ্ডুলিপি ৪৯১

কবিতা ও গান

সংযোজন

পূরবী
বীথিকা
প্রহাসিনী
রোগশয্যায়
জন্মদিনে
গল্পসল্প
স্ফুলিঙ্গ

পূরবী

শিবাজি-উৎসব

কোন্ দূর শতাব্দের কোন্-এক অখ্যাত দিবসে
নাহি জানি আজি
মারাঠার কোন্ শৈলে অরণ্যের অন্ধকারে ব'সে,
হে রাজা শিবাজি,
তব ভাল উদ্ভাসিয়া এ ভাবনা তড়িৎপ্রভাবৎ
এসেছিল নামি—
'একধর্মরাজ্যপাশে খণ্ড ছিন্ন বিক্ষিপ্ত ভারত
বেঁধে দিব আমি।'

সেদিন এ বঙ্গদেশ উচ্চকিত জাগে নি স্বপনে,
পায় নি সংবাদ—
বাহিরে আসে নি ছুটে, উঠে নাই তাহার প্রাঙ্গণে
শুভ শঙ্খনাদ—
শান্তমুখে বিছাইয়া আপনার কোমলনির্মল
শ্যামল উত্তরী
তন্দ্রাতুর সন্ধ্যাকালে শত পল্লিসন্তানের দল
ছিল বক্ষে করি।

তার পরে একদিন মারাঠার প্রান্তর হইতে
তব বজ্রশিখা
আঁকি দিল দিগ্‌দিগন্তে যুগান্তের বিদ্যুদ্‌বহ্নিতে
মহামন্ত্রলিখা।
মোগল-উষ্ণীষশীর্ষ প্রস্ফুরিল প্রলয়প্রদোষে
পক্বপত্র যথা—
সেদিনও শোনে নি বঙ্গ মারাঠার সে বজ্রনির্ঘোষে
কী ছিল বারতা।

তার পরে শূন্য হল ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ নিবিড় নিশীথে
দিল্লিরাজশালা—

একে একে কক্ষে কক্ষে অন্ধকারে লাগিল মিশাতে
দীপালোকমালা।
শবলুব্ধ গৃধ্রদের ঊর্ধ্বস্বর বীভৎস চীৎকারে
মোগলমহিমা
রচিল শ্মশানশয্যা— মুষ্টিমেয় ভস্মরেখাকারে
হল তার সীমা।

সেদিন এ বঙ্গপ্রান্তে পণ্যবিপণীর এক ধারে
নিঃশব্দচরণ
আনিল বণিকলক্ষ্মী সুরঙ্গপথের অন্ধকারে
রাজসিংহাসন।
বঙ্গ তারে আপনার গঙ্গোদকে অভিষিক্ত করি
নিল চুপে চুপে—
বণিকের মানদণ্ড দেখা দিল পোহালে শর্বরী
রাজদণ্ডরূপে।

সেদিন কোথায় তুমি হে ভাবুক, হে বীর মারাঠি,
কোথা তব নাম!
গৈরিক পতাকা তব কোথায় ধুলায় হল মাটি—
তুচ্ছ পরিণাম!
বিদেশীর ইতিবৃত্ত দস্যু বলি করে পরিহাস
অট্টহাস্যরবে—
তব পুণ্য চেষ্টা যত তস্করের নিষ্ফল প্রয়াস,
এই জানে সবে।

অয়ি ইতিবৃত্তকথা, ক্ষান্ত করো মুখর ভাষণ।
ওগো মিথ্যাময়ী,
তোমার লিখন-'পরে বিধাতার অব্যর্থ লিখন
হবে আজি জয়ী।
যারা মরিবার নহে তাহারে কেমনে চাপা দিবে
তব ব্যঙ্গবাণী?
যে তপস্যা সত্য তারে কেহ বাধা দিবে না ত্রিদিবে
নিশ্চয় সে জানি।

হে রাজতপস্বী বীর, তোমার সে উদার ভাবনা
বিধির ভাণ্ডারে
সঞ্চিত হইয়া গেছে, কাল কভু তার এক কণা
পারে হরিবারে?

তোমার সে প্রাণোৎসর্গ, স্বদেশলক্ষ্মীর পূজাঘরে
সে সত্যসাধন,
কে জানিত, হয়ে গেছে চিরযুগযুগান্তর-তরে
ভারতের ধন।

অখ্যাত অজ্ঞাত রহি দীর্ঘকাল, হে রাজবৈরাগী,
গিরিদরীতলে
বর্ষার নির্ঝর যথা শৈল বিদারিয়া উঠে জাগি
পরিপূর্ণ বলে,
সেইমতো বাহিরিলে— বিশ্বলোক ভাবিল বিস্ময়ে,
যাহার পতাকা
অম্বর আচ্ছন্ন করে, এতকাল এত ক্ষুদ্র হয়ে
কোথা ছিল ঢাকা।

সেইমতো ভাবিতেছি আমি কবি এ পূর্ব-ভারতে,
কী অপূর্ব হেরি,
বঙ্গের অঙ্গনদ্বারে কেমনে ধ্বনিল কোথা হতে
তব জয়ভেরী।
তিন শত বৎসরের গাঢ়তম তমিস্র বিদারি
প্রতাপ তোমার
এ প্রাচীদিগন্তে আজি নবতর কী রশ্মি প্রসারি
উদিল আবার।

মরে না, মরে না কভু সত্য যাহা শত শতাব্দীর
বিস্মৃতির তলে—
নাহি মরে উপেক্ষায়, অপমানে না হয় অস্থির,
আঘাতে না টলে।
যারে ভেবেছিল সবে কোন্‌কালে হয়েছে নিঃশেষ
কর্মপরপারে,
এল সেই সত্য তব পূজ্য অতিথির ধরি বেশ
ভারতের দ্বারে।

আজও তার সেই মন্ত্র— সেই তার উদার নয়ান
ভবিষ্যের পানে
একদৃষ্টে চেয়ে আছে, সেথায় সে কী দৃশ্য মহান্‌
হেরিছে কে জানে।
অশরীর হে তাপস, শুধু তব তপোমূর্তি লয়ে
আসিয়াছ আজ—

তবু তব পুরাতন সেই শক্তি আনিয়াছ বয়ে,
সেই তব কাজ।

আজি তব নাহি ধ্বজা, নাই সৈন্য রণ-অশ্বদল
অস্ত্র খরতর—
আজি আর নাহি বাজে আকাশেরে করিয়া পাগল
'হর হর হর'।
শুধু তব নাম আজি পিতৃলোক হতে এল নামি,
করিল আহ্বান—
মুহূর্তে হৃদয়াসনে তোমারেই বরিল, হে স্বামী,
বাঙালির প্রাণ।

এ কথা ভাবে নি কেহ এ তিন-শতাব্দ-কাল ধরি—
জানে নি স্বপনে—
তোমার মহৎ নাম বঙ্গ-মারাঠারে এক করি
দিবে বিনা রণে।
তোমার তপস্যাতেজ দীর্ঘকাল করি অন্তর্ধান
আজি অকস্মাৎ
মৃত্যুহীন বাণী-রূপে আনি দিবে নূতন পরান
নূতন প্রভাত।

মারাঠার প্রান্ত হতে একদিন তুমি ধর্মরাজ,
ডেকেছিলে যবে
রাজা ব'লে জানি নাই, মানি নাই, পাই নাই লাজ
সে ভৈরব রবে।
তোমার কৃপাণদীপ্তি একদিন যবে চমকিলা
বঙ্গের আকাশে
সে ঘোর দুর্যোগদিনে না বুঝিনু রুদ্র সেই লীলা,
লুকানু তরাসে।

মৃত্যুসিংহাসনে আজি বসিয়াছ অমরমুরতি—
সমুন্নত ভালে
যে রাজকিরীট শোভে লুকাবে না তার দিব্যজ্যোতি
কভু কোনোকালে।
তোমারে চিনেছি আজি, চিনেছি চিনেছি হে রাজন্,
তুমি মহারাজ।
তব রাজকর লয়ে আট কোটি বঙ্গের নন্দন
দাঁড়াইবে আজ।

সেদিন শুনি নি কথা— আজ মোরা তোমার আদেশ
শির পাতি লব।
কণ্ঠে কণ্ঠে বক্ষে বক্ষে ভারতে মিলিবে সর্বদেশ
ধ্যানমন্ত্রে তব।
ধ্বজা করি উড়াইব বৈরাগীর উত্তরী বসন—
দরিদ্রের বল।
'একধর্মরাজ্য হবে এ ভারতে' এ মহাবচন
করিব সম্বল।

মারাঠির সাথে আজি, হে বাঙালি, এক কণ্ঠে বলো
'জয়তু শিবাজি'।
মারাঠির সাথে আজি, হে বাঙালি, এক সঙ্গে চলো
মহোৎসবে সাজি।
আজি এক সভাতলে ভারতের পশ্চিম-পূরব
দক্ষিণে ও বামে
একত্রে করুক ভোগ একসাথে একটি গৌরব
এক পুণ্য নামে।

[গিরিদি
১১ ভাদ্র ১৩১১]

দুর্দিন

ওই আকাশ-'পরে আঁধার মেলে কী খেলা আজ খেলতে এলে
তোমার মনে কী আছে তা জানব না।
আমি তবুও হার মানব না, হার মানব না।
তোমার সিংহ-ভীষণ রবে,
তোমার সংহার-উৎসবে,
তোমার দুর্যোগ-দুর্দিনে—
তোমার তড়িৎশিখায় বজ্রলিখায় তোমায় লব চিনে—
কোনো শঙ্কা মনে আনব না গো আনব না।
যদি সঙ্গে চলি রঙ্গভরে কিংবা পড়ি মাটির 'পরে
তবুও হার মানব না হার মানব না।

কভু যদি আমার চিত্তমাঝে ছিন্ন-তারে বেসুর বাজে
জাগে যদি জাগুক প্রাণে যন্ত্রণা—
ওগো না পাই যদি নাইবা পেলেম সান্ত্বনা।
যদি তোমার তরে আজি

ফুলে সাজিয়ে থাকি সাজি,
প্রদীপ জ্বালিয়ে থাকি ঘরে,
তবে ছিঁড়ে গেলে পুষ্প, প্রদীপ নিবে গেলে ঝড়ে
তবু ছিন্ন ফুলে করব তোমার বন্দনা।
তবু নেবা-দীপের অন্ধকারে করব আঘাত তোমার দ্বারে,
জাগে যদি জাগুক প্রাণে যন্ত্রণা।

আমি ভেবেছিলেম তোমায় লয়ে যাবে আমার জীবন ব'য়ে
দুঃখ তাপের পরশটুকু জানব না—
তাই সুখের কোণে ছিলেম পড়ে আনমনা।
আজ হঠাৎ ভীষণ বেশে
তুমি দাঁড়াও যদি এসে,
তোমার মত্ত চরণ ভরে
আমার যত্নে-গড়া শয়নখানি ধুলায় ভেঙে পড়ে
আমি তাই ব'লে তো কপালে কর হানব না।
তুমি যেমন করে চেনাতে চাও তেমনি করে চিনিয়ে যাও
যে-দুঃখ দাও দুঃখ তারে জানব না।

তবে এসো হে মোর সুদুঃসহ ছিন্ন করে জীবন লহো
বাজিয়ে তোলো ঝঞ্ঝা-ঝড়ের ঝঞ্ঝনা,
আমায় দুঃখ হতে কোরো না আর বঞ্চনা।
আমার বুকের পাঁজর টুটে
উঠুক পূজার পদ্ম ফুটে ;
যেন প্রলয়-বায়ু-বেগে
আমার মর্ম্মকোষের গন্ধ ছুটে বিশ্ব উঠে জেগে।
ওরে আয় রে ব্যথা সকল-বাধা-ভঞ্জনা।
আজ আঁধারে ওই শূন্য ব্যেপে কণ্ঠ আমার ফিরুক কেঁপে,
জাগিয়ে তোলো ঝঞ্ঝা-ঝড়ের ঝঞ্ঝনা।

[শ্রাবণ ১৩১৪]

সুপ্রভাত

রুদ্র, তোমার দারুণ দীপ্তি
এসেছে দুয়ার ভেদিয়া ;
বক্ষে বেজেছে বিদ্যুৎবাণ
স্বপ্নের জাল ছেদিয়া।
ভাবিতেছিলাম উঠি কি না উঠি,
অন্ধ তামস গেছে কি না ছুটি,

রুদ্ধ নয়ন মেলি কি না মেলি
তন্দ্রা-জড়িমা মাজিয়া।
এমন সময়ে, ঈশান, তোমার
বিষাণ উঠেছে বাজিয়া।
বাজে রে গরজি বাজে রে
দগ্ধ মেঘের রন্ধ্রে-রন্ধ্রে
দীপ্ত গগন-মাঝে রে।
চমকি জাগিয়া পূর্বভুবন
রক্তবদন লাজে রে।

ভৈরব, তুমি কী বেশে এসেছ,
ললাটে ফুঁসিছে নাগিনী,
রুদ্র-বীণায় এই কি বাজিল
সুপ্রভাতের রাগিণী?
মুগ্ধ কোকিল কই ডাকে ডালে,
কই ফোটে ফুল বনের আড়ালে?
বহুকাল পরে হঠাৎ যেন রে
অমানিশা গেল ফাটিয়া;
তোমার খড়্গ আঁধার-মহিষে
দুখানা করিল কাটিয়া।
ব্যথায় ভুবন ভরিছে,
ঝর ঝর করি রক্ত-আলোক
গগনে-গগনে ঝরিছে,
কেহ-বা জাগিয়া উঠিছে কাঁপিয়া
কেহ-বা স্বপনে ডরিছে।

তোমার শ্মশানকিঙ্করদল,
দীর্ঘ নিশায় ভুখারি।
শুষ্ক অধর লেহিয়া লেহিয়া
উঠিছে ফুকারি ফুকারি।
অতিথি তারা যে আমাদের ঘরে
করিছে নৃত্য প্রাঙ্গণ-'পরে,
খোলো খোলো দ্বার ওগো গৃহস্থ,
থেকো না থেকো না লুকায়ে—
যার যাহা আছে আনো বহি আনো,
সব দিতে হবে চুকায়ে।
ঘুমায়ো না আর কেহ রে।

হৃদয়পিণ্ড ছিন্ন করিয়া
ভাণ্ড ভরিয়া দেহো রে।
ওরে দীণপ্রাণ, কী মোহের লাগি
রেখেছিস মিছে স্নেহ রে।

উদয়ের পথে শুনি কার বাণী,
'ভয় নাই, ওরে ভয় নাই—
নিঃশেষে প্রাণ যে করিবে দান
ক্ষয় নাই তার ক্ষয় নাই।'
হে রুদ্র, তব সংগীত আমি
কেমনে গাহিব কহি দাও স্বামী—
মরণনৃত্যে ছন্দ মিলায়ে
হৃদয়ডমরু বাজাব,
ভীষণ দুঃখে ডালি ভরে লয়ে
তোমার অর্ঘ্য সাজাব।
এসেছে প্রভাত এসেছে।
তিমিরান্তক শিবশঙ্কর
কী অট্টহাস হেসেছে!
যে জাগিল তার চিত্ত আজিকে
ভীম আনন্দে ভেসেছে।

জীবন সঁপিয়া, জীবনেশ্বর,
পেতে হবে তব পরিচয়;
তোমার ডঙ্কা হবে যে বাজাতে
সকল শঙ্কা করি জয়।
ভালোই হয়েছে ঝঞ্ঝার বায়ে
প্রলয়ের জটা পড়েছে ছড়ায়ে,
ভালোই হয়েছে প্রভাত এসেছে
মেঘের সিংহবাহনে—
মিলনযজ্ঞে অগ্নি জ্বালাবে
বজ্রশিখার দাহনে।
তিমির রাত্রি পোহায়ে
মহাসম্পদ তোমারে লভিব
সব সম্পদ খোয়ায়ে—
মৃত্যুরে লব অমৃত করিয়া
তোমার চরণে ছোঁয়ায়ে।

[শান্তিনিকেতন
৮ বৈশাখ ১৩১৪]

বীথিকা

বাণী

পক্ষে বহিয়া অসীম কালের বার্তা
যুগে যুগে চলে অনাদি জ্যোতির যাত্রা
কালের রাত্রি ভেদি
অব্যক্তের কুজ্ঝটিজাল ছেদি
পথে পথে রচি আলিম্পনের লেখা।
পাখার কাঁপনে গগনে গগনে
উজ্জ্বলি উঠে দিক্‌প্রাঙ্গণে
অগ্নিচক্ররেখা।
অস্তিত্বের গহনতত্ত্ব ছিল মূক বাণীহীন—
অবশেষে একদিন
যুগান্তরের প্রদোষ-আঁধারে
শূন্যপাথারে
মানবাত্মার প্রকাশ উঠিল ফুটি।
মহাদুঃখের মহানন্দের
সংঘাত লাগি চিরদ্বন্দ্বের
চিৎপদ্মের আবরণ গেল টুটি।
শতদলে দিল দেখা
অসীমের পানে মেলিয়া নয়ন
দাঁড়ায়ে রয়েছে একা
প্রথম পরম বাণী
বীণা হাতে বীণাপাণি।

১১ নভেম্বর ১৯৩০
[২৫ কার্তিক '৩৭]

প্রত্যুত্তর

বেলকুঁড়ি-গাঁথা মালা
দিয়েছিনু হাতে,
সে মালা কি ফুটেছিল রাতে?

দিনান্তের ম্লান মৌনখানি
নির্জন আঁধারে সে কি ভরেছিল বাণী?

অবসন্ন গোধূলির পাণ্ডু নীলিমায়
লিখে গেল দিগন্তসীমায়
অস্তসূর্য— স্বর্ণাক্ষরধারা।
রাত্রি কি উত্তরে তারি রচেছিল তারা?

পথিক বাজায়ে গেল পথে-চলা বাঁশি,
ঘরে সে কি উঠেছে উচ্ছ্বাসি?
কোণে কোণে ফিরিছে কোথায়
দূরের বেদনখানি ঘরের ব্যথায়!

২৬ চৈত্র ১৩৩৯

দিনান্ত

একাত্তরটি প্রদীপ-শিখা
নিবল আয়ুর দেয়ালিতে,
শমের সময় হল কবি
এবার পালা-শেষের গীতে।
গুণ টেনে তোর বয়েস চলে,
পায়ে পায়ে এগিয়ে আনে
তরঙ্গহীন কূল-হারানো
মানস-সরোবরের পানে।
অরূপ-কমল-বনে সেথায়
স্তব্ধবাণীর বীণাপাণি—
এত দিনের প্রাণের বাঁশি
চরণে তাঁর দাও রে আনি।
ছন্দে কভু পতন ছিল,
সুরে স্খলন ক্ষণে ক্ষণে,
সেই অপরাধ করুণ হাতে
ধৌত হবে বিস্মরণে।
দেবে যে গান গ্লানিবিহীন
ফুলের মতো উঠল ফুটে

আপন ব'লে নেবেন তাহাই
প্রসন্ন তাঁর স্মৃতিপুটে।
অসীম নীরবতার মাঝে
সার্থক তোর বাণী যত
অন্ধকারের বেদীর তলায়
রইল সন্ধ্যাতারার মতো।
যৌবন তোর হয় নি ক্লান্ত
এই জীবনের কুঞ্জবনে—
আজ যদি তার পাপড়িগুলি
খসে শীতের সমীরণে।
দিনান্তে সে শান্তিভরা
ফলের মতো উঠুক ফলি,
অতন্দ্রিত নিশীথিনীর
হবে চরম পূজাঞ্জলি।

১৫ জ্যৈষ্ঠ ১৩৪০

যুগল পাখি

স্বপ্নগগন পথের-চিহ্ন-হীন
সেথা ছিলে একদিন,
বিরহাবেগের উধাও মেঘের
সজল বাষ্পে লীন।
বহিল সহসা নববসন্ত-বায়,
এক দিগন্তে আনিল দোঁহারে
এক নব বেদনায়।

সেদিন ফাগুন আম্রমুকুলে ভরি
উড়ায়েছে উত্তরী,
গন্ধে-রসানো ঘোমটা-খসানো
পূর্ণিমাবিভাবরী।
সেদিন গগন মুখর বাঁশির গানে,
ধরণীর হিয়া ধায় উদাসিয়া
অভিসার-পথ-পানে।
অসীম শূন্যে সন্ধান গেল থেমে,
এলে বনতলে নেমে।

চঞ্চল পাখা মানিল বিরাম
সীমার মোহন প্রেমে।
লভিল শান্তি তৃপ্তিবিহীন আশা,
শ্যামল ধরার বক্ষের কাছে
রচিলে নিভৃত বাসা।

বাণীর ব্যথায় উচ্ছ্বাসি এক পাখি
গেয়ে ওঠো থাকি থাকি।
আর পাখি শোনো আপনার মনে
ডানা-'পরে মুখ রাখি।
ভাষার প্রবাহ মেলে ভাষাহারা গানে,
অধীরের সুর লভিল আকাশ
ধীর নীরবের প্রাণে।

১৫ ফাল্গুন ১৩৪০

একাকী

এল সন্ধ্যা তিমির বিস্তারি ;
দেবদারু সারি সারি
দোলে ক্ষণে ক্ষণে
ফাল্গুনের ক্ষুব্ধ সমীরণে।
স্তব্ধতার বক্ষোমাঝে পল্লবমর্মর
জাগায় অস্ফুট মন্ত্রস্বর।
মনে হয় অনাদি সৃষ্টির পরপারে
আপনি কে আপনারে
শুধাইছে ভাষাহীন প্রশ্ন নিরন্তর ;
অসংখ্য নক্ষত্র নিরুত্তর।
অসীমের অদৃশ্য গুহায় কোন্‌খানে
নিরুদ্দেশ-পানে
লক্ষ্যহীন কালস্রোত চলে।
আমি মগ্ন হয়ে আছি সুগভীর নৈঃশব্দ্যের তলে।

ভাবি মনে মনে,
এতদিন সঙ্গ যারা দিয়েছিল আমার জীবনে
নিল তারা কতটুকু স্থান?
আমার গভীরতম প্রাণ,

আমার সুদূরতম আশা-আকাঙ্ক্ষার
গোপন ধ্যানের অধিকার,
ব্যর্থ ও সার্থক কামনায়
আলোয় ছায়ায়
রচিলাম যে স্বপ্নভুবন,
যে আমার লীলানিকেতন
এক প্রান্ত ব্যাপ্ত যার অসমাপ্ত অরূপসাধনে
অন্য প্রান্ত কর্মের বাঁধনে,
যে অভাবনীয়,
অলক্ষিত উৎস হতে যে অমিয়
জীবনের ভোজে
চেতনারে ভরেছে সহজে,
যে ভালোবাসার ব্যথা রহি রহি
আনিয়া দিয়েছে বহি
শ্রুত বা অশ্রুত সুর উৎকণ্ঠিত চিতে
গীতে বা অগীতে—
কতটুকু তাহাদের জানা আছে
এল যারা কাছে!
ব্যক্ত অব্যক্তের সৃষ্টি এ মোর সংসারে
আসে যায় এক ধারে,
বিরহদিগন্তে পায় লয়—
নিয়ে যায় লেশমাত্র পরিচয়।
আপনার মাঝে এই বহুব্যাপী অজানারে ঢাকি
স্তব্ধ আমি রয়েছি একাকী।
যেন ছায়াঘন বট
জুড়ে আছে জনশূন্য নদীতট—
কোণে কোণে প্রশাখার কোলে কোলে
পাখি কভু বাসা বাঁধে, বাসা ফেলে কভু যায় চলে।
সম্মুখে স্রোতের ধারা আসে আর যায়
জোয়ার-ভাঁটায় ;
অসংখ্য শাখার জালে নিবিড় পল্লবপুঞ্জ-মাঝে
রাত্রিদিন অকারণে অন্তহীন প্রতীক্ষা বিরাজে।

২ এপ্রিল ১৯৩৪
[১৯ চৈত্র '৪০]

জীবনবাণী

কোন্ বাণী মোর জাগল, যাহা
রাখবে স্মরণে—
পলে-পলে দলিত সে
কালের চরণে।
যায় সে কেবল ভেঙে চুরে,
ছড়িয়ে পড়ে কাছে দূরে—
জীবনবাণীর অখণ্ড রূপ
মিলবে মরণে।

ক্ষণে ক্ষণে পাগল হাওয়ায়
ঘূর্ণিধূলিতে
প্রাণের দোলে এলোমেলো
রয় সে দুলিতে।
বৈতরণীর অগাধ নদী
পেরিয়ে আবার ফেরে যদি
উল্টো স্রোতের সে দান, ডালায়
পারবে তুলিতে।

কোন্ বাণী মোর জাগল, যাহা
রাখবে স্মরণে,
টিকবে যাহা নিমেষগুলির
পূরণ-হরণে।
তারে নিয়ে সারা বেলা
চলেছে হার-জিতের খেলা,
খেলার শেষে বাঁচল যা তাই
বাঁচবে মরণে।

৭ শ্রাবণ ১৩৪১

যাত্রাশেষে

বিজন রাতে যদি রে তোর
সাহস থাকে
দিনশেষের দোসর যে জন
মিলবে তাকে।

ঘনায় যবে আঁধার ছেয়ে
অভয় মনে থাকিস চেয়ে—
আসবে দ্বারে আলোর দূতী
নীরব ডাকে।

যখন ঘরে আসনখানি
শূন্য হবে
দূরের পথে পায়ের ধ্বনি
শুনবি তবে।
কাটল প্রহর যাদের আশায়
তারা যখন ফিরবে বাসায়,
সাহানাগান বাজবে তখন
ভিড়ের ফাঁকে।

অনেক চাওয়া ফিরলি চেয়ে
আশায় ভুলি,
আজ যদি তোর শূন্য হল
ভিক্ষা-ঝুলি
চমক তবে লাগুক তোরে,
অধরা ধন দিক সে ভরে
গোপন বঁধু, দেখতে কভু
পাস নি যাকে।

অভিসারের পথ বেড়ে যায়
চলিস যত—
পথের মাঝে মায়ার ছায়া
অনেক-মতো।
বসবি যবে ক্লান্তিভরে
আঁচল পেতে ধুলার 'পরে,
হঠাৎ পাশে আসবে সে যে
পথের বাঁকে।

এবার তবে করিস সারা
কাঙাল-পনা—
সমস্তদিন কাণাকড়ির
হিসাব-গণা।
শান্ত হলে মিলবে চাবি,
অন্তরেতে দেখতে পাবি

সবার শেষে তার পরে যে
অশেষ থাকে।

দূর বাঁশিতে যে সুর বাজে
তাহার সাথে
মিলিয়ে নিয়ে বাজাস বাঁশি
বিদায়-রাতে।
সহজ মনে যাত্রাশেষে
যাস রে চলে সহজ হেসে,
দিস নে ধরা অবসাদের
জটিল পাকে।

শান্তিনিকেতন
২৪ শ্রাবণ ১৩৪১

আবেদন

পশ্চিমের দিক্‌সীমায় দিনশেষের আলো
পাঠালো বাণী সোনার রঙে লিখা—
'রাতের পথে পথিক তুমি, প্রদীপ তব জ্বালো
প্রাণের শেষ শিখা।'
কাহার মুখে তাকাব আমি, আলোক কার ঘরে
রয়েছে মোর তরে—
সঙ্গে যাবে যে আলোখানি পারের ঘাট-পানে,
এ ধরণীর বিদায়-বাণী কহিবে কানে কানে,
মম ছায়ার সাথে
আলাপ যার হবে নিভৃত রাতে।
ভাসিবে যবে খেয়ার তরী কেহ কি উপকূলে
রচিবে ডালি নাগকেশর ফুলে,
তুলিয়া আনি চৈত্রশেষে কুঞ্জবন হতে
ভাসায়ে দিবে স্রোতে?

আমার বাঁশি করিবে সারা যা ছিল গান তার,
সে নীরবতা পূর্ণ হবে কিসে?
তারার মতো সুদূরে-যাওয়া দৃষ্টিখানি কার
মিলিবে মোর নয়ন-অনিমিষে?
অনেক-কিছু হয়েছে জমা, অনেক হল খোঁজা,
আশাতৃষার বোঝা
ধুলায় যাব ফেলে।

ধুলার দাবি নাইকো যাহে সে ধন যদি মেলে,
সুখদুখের সব-শেষের কথা,
প্রাণের মণিখনির যেথা গোপন গভীরতা
সেথায় যদি চরম দান থাকে,
কে এনে দেবে তাকে?
যা পেয়েছিনু অসীম এই ভবে
ফেলিয়া যেতে হবে—
আকাশ-ভরা রঙের লীলাখেলা,
বাতাস-ভরা সুর,
পৃথিবী-ভরা কত-না রূপ, কত রসের মেলা,
হৃদয়-ভরা স্বপন-মায়াপুর,
মূল্য শোধ করিতে পারে তার
এমন উপহার
যাবার বেলা দিতে পারো তো দিয়ো
যে আছ মোর প্রিয়।

শান্তিনিকেতন
৫ সেপ্টেম্বর ১৯৩৪
[১৯ ভাদ্র '৪১]

অচিন মানুষ

তুমি অচিন মানুষ ছিলে গোপন আপন গহন-তলে,
কেন এলে চেনার সাজে ?
তোমায় সাঁজ-সকালে পথে ঘাটে দেখি কতই ছলে
আমার প্রতিদিনের মাঝে।
তোমায় মিলিয়ে কবে নিলেম আপন আনাগোনার হাটে
নানান পান্থদলের সাথে,
তোমায় কখনো বা দেখি আমার তপ্ত ধুলার বাটে
কভু বাদল-ঝরা রাতে।
তোমার ছবি আঁকা পড়ল আমার মনের সীমানাতে
আমার আপন ছন্দে ছাঁদা,
আমার সরু মোটা নানা তুলির নানান রেখাপাতে
তোমার স্বরূপ পড়ল বাঁধা।
তাই আজি আমার ক্লান্ত নয়ন, মনের-চোখে-দেখা
হল চোখের-দেখায় হারা।
দোঁহার পরিচয়ের তরীখানা বালুর চরে ঠেকা,
সে আর পায় না স্রোতের ধারা।

ও যে অচিন মানুষ— মন উহারে জানতে যদি চাহ
জেনো মায়ার রঙমহলে,
প্রাণে জাগুক্ তবে সেই মিলনের উৎসব-উৎসাহ
যাহে বিরহদীপ জ্বলে।
যখন চোখের সামনে বসতে দেবে তখন সে আসনে
রেখো ধ্যানের আসন পেতে,
যখন কইবে কথা সেই ভাষাতে তখন মনে মনে
দিয়ো অশ্রুত সুর গেঁথে।
তোমার জানা ভুবনখানা হতে সুদূরে তার বাসা,
তোমার দিগন্তে তার খেলা।
সেথায় ধরা-ছোঁওয়ার-অতীত মেঘে নানা রঙের ভাষা,
সেথায় আলো-ছায়ার মেলা।
তোমার প্রথম জাগরণের চোখে উষার শুকতারা
যদি তাহার স্মৃতি আনে
তবে যেন সে পায় ভাবের মূর্তি রূপের-বাঁধন-হারা
তোমার সুর-বাহারের গানে।

শান্তিনিকেতন
৩০ কার্তিক ১৩৪১

জন্মদিনে

তোমার জন্মদিনে আমার
কাছের দিনের নেই তো সাঁকো।
দূরের থেকে রাতের তীরে
বলি তোমায় পিছন ফিরে
'খুশি থাকো'।

দিনশেষের সূর্য যেমন
ধরার ভালে বুলায় আলো,
ক্ষণেক দাঁড়ায় অস্তকোলে,
যাবার আগে যায় সে ব'লে
'থেকো ভালো'।

জীবনদিনের প্রহর আমার
সাঁঝের ধেনু— প্রদোষ-ছায়ায়
চারণ-শ্রান্ত ভ্রমণ-সারা
সন্ধ্যাতারার সঙ্গে তারা
মিলিতে যায়।

মুখ ফিরিয়ে পশ্চিমেতে
বারেক যদি দাঁড়াও আসি
আঁধার গোষ্ঠে এই রাখালের
শুনতে পাবে সন্ধ্যাকালের
চরম বাঁশি।

সেই বাঁশিতে উঠবে বেজে
দূর সাগরের হাওয়ার ভাষা,
সেই বাঁশিতে দেবে আনি
বৃন্তমোচন ফলের বাণী
বাঁধন-নাশা।

সেই বাঁশিতে শুনতে পাবে
জীবন-পথের জয়ধ্বনি—
শুনতে পাবে পথিক রাতের
যাত্রামুখে নূতন প্রাতের
আগমনী।

শান্তিনিকেতন
২৪ অক্টোবর ১৯৩৫
[৭ কার্তিক '৪২]

পুপুদিদির জন্মদিনে

যে ছিল মোর ছেলেমানুষ
হারিয়ে গেল কোথা—
পথ ভুলে সে পেরিয়েছিল
মরা নদীর সোঁতা।
হায়, বুড়োমির পাঁচিল তারে
আড়াল করল আজ—
জানি নে কোন্ লুকিয়ে-ফেরা
বয়স-চোরার কাজ।
হঠাৎ তোমার জন্মদিনের
আঘাত লাগল দ্বারে,
ডাক দিল সে দূর সেকালের
খ্যাপা বালকটারে।
ছেলেমানুষ আমি
ডাক শুনে সে এগিয়ে এসে
হঠাৎ গেল থামি।

বললে, শোনো ওগো কিশোরিকা,
'রবীন্দ্র' নাম কুষ্ঠিতে যার লিখা,
নামটা সত্য— সত্য শুধু
তারিখটা মাত্তর—
তাই বলে তো বয়সখানা
নয়কো ছিয়াত্তর।
কাঁচা প্রাণের দৃষ্টি যে তার,
জগৎটা তার কাঁচা।
বাঁধে নি তায় খেতাব-লাভের
বিষয়-লোভের খাঁচা।

মনটাতে তার সবুজ রঙে
সোনার বরন মেশা।
বক্ষে রসের তরঙ্গ তার,
চক্ষে রূপের নেশা।
ফাগুন-দিনের হাওয়ার খ্যাপামি যে
পরানে তার স্বপন বোনে
রঙিন মায়ার বীজে।
ভরসা যদি মেলে
তোমার লীলার আঙিনাতে
ফিরবে হেসে খেলে।
এই ভুবনের ভোর-বেলাকার গান
পূর্ণ করে রেখেছে তার প্রাণ।
সেই গানেরই সুর
তোমার নবীন জীবনখানি
করবে সুমধুর।

শান্তিনিকেতন
১৩ অগ্রহায়ণ ১৩৪৩

রেশ

বাঁশরি আনে আকাশ-বাণী—
ধরণী আনমনে
কিছু বা ভোলে কিছু বা আধো
শোনে।
নামিবে রবি অস্তপথে,
গানের হবে শেষ—
তখন ফিরে ঘিরিবে তারে
সুরের কিছু রেশ।

অলস খনে কাঁপায় হাওয়া
আধেকখানি-হারিয়ে-যাওয়া
গুঞ্জরিত কথা,
মিলিয়া প্রজাপতির সাথে
রাঙিয়ে তোলে আলোছায়াতে
দুইপহরে-রোদ-পোহানো
গভীর নীরবতা।
হল্‌দেরঙা-পাতায়-দোলা
নাম-ভোলা ও বেদনা-ভোলা
বিষাদ ছায়ারূপী
ঘোমটা-পরা স্বপনময়
দূরদিনের কী ভাষা কয়
জানি না চুপিচুপি।
জীবনে যারা স্মরণ-হারা
তবু মরণ জানে না তারা,
উদাসী তারা মর্মবাসী
পড়ে না কভু চোখে—
প্রতিদিনের সুখ-দুখেরে
অজানা হয়ে তারাই ঘেরে,
বাষ্পছবি আঁকিয়া ফেরে
প্রাণের মেঘলোকে।

শান্তিনিকেতন
১৪ অগাস্ট ১৯৪০
[২৯ শ্রাবণ '৪৭]

প্রহাসিনী

সালগম-সংবাদ

[১]নাতিনীর পত্র

শ্রীচরণেষু
দাদামহাশয়

খেয়েছ যে সাল্‌গম   না করিয়া কাল-গম
এই আমি বহুভাগ্য মানি।
তার পরে মিঠি মিঠি   লিখেছ স্নেহের চিঠি,
তার মূল্য কী আছে কী জানি।
তুচ্ছ এই উপহার   কে জানিত কমলার
পদ্মসরোবর দিবে নাড়া—
সালগম মটন রোস্টে   কবির অধর-ওষ্ঠে
খুলি দিবে কাব্যের ফোয়ারা।
কিন্তু বড়দাদা-ভাই   বড়ো মনে দুঃখ পাই
এ খেদ যাবে না প্রাণ গেলে—
শুনিতে হইল এও   ভাগ্যবান তোমারেও
নাচের দোসর নাহি মেলে!
নাহয় না হল বুড়ি   তবুও তো ঝুড়ি ঝুড়ি
নাতিনীতে ঘরটি বোঝাই—
যারেই লইবে বাছি   সেই তো উঠিবে নাচি,
নাচিবার ভাবনা তো নাই।
এ কথা ভুলিলে যবে   বুঝায়ে কী আর হবে—
ধিক্‌ তবে মোর সালগমে।
বুঝিলাম তরকারি   যত হোক দরকারী,
তাহাতে কবিত্ব নাহি জমে।

---

[১] কবির ভাগিনেয় সত্যপ্রসাদের কন্যা শান্তা। গ্রন্থপরিচয় দ্রষ্টব্য।
প্র. অর্থাৎ সাময়িক পত্রে প্রচার।

আর না করিব ভুল—   এবারে বসন্তে ফুল
তুলিয়া আনিব ভরি ডালা।
সালগম পেঁয়াজকলি   জলে দিয়া জলাঞ্জলি
পাঠাইব বকুলের মালা।

প্র ভাদ্র ১৩০৯

এপ্রিলের ফুল

বসন্তের ফুল তোরই
সুধাস্পর্শে লেপা
আমারে করিল আজি
এপ্রিলের ক্ষেপা।
পাকা চুল কেঁচে গেল,
বুদ্ধি গেল ফেঁসে—
যে দেখে আমার দশা
সেই যায় হেসে।
বিনা বাক্যে ঘটাইলি
এমন প্রমাদ,
তারি সঙ্গে আছে আরো
বচনের ফাঁদ।
আমি যে মেনেছি হার
নিজেরেই ছলি,
অবোধ সেজেছি কেন
কারণটা বলি।
বিপাকের সেতু একা
নহে তরিবার—
পাশে এসে ধরো হাত,
জোড়ে হব পার।[১]

[১৩২০? চৈত্র]

---

[১] নলিনী দেবীর প্রেরিত স-পুষ্প কৌতুককবিতার উত্তরে।

তোমার বাড়ি

ওই দেখা যায় তোমার বাড়ি
চৌদিকে-মালঞ্চ-ঘেরা,
অনেক ফুল তো ফোটে সেথায়,
একটি ফুল সে সবার সেরা।
নানা দেশের নানা পাখি
করে হেথায় ডাকাডাকি,
একটি সুর যে মর্মে বাজে
যতই গাহুক বিহঙ্গেরা।
যাতায়াতের পথের পাশে
কেহ বা যায় কেহ আসে,
বারেক যেজন বসে সেথায়
তার কভু আর হয় না ফেরা!
কেউ বা এসে চা করে পান,
গ্রামোফোনে কেউ শোনে গান,
অকারণে যারা আসে
ধন্য যে সেই রসিকেরা॥

উদয়ন
১৩।১২।৪০
[২৭ অগ্রহায়ণ ১৩৪৭]

হ্যারাম

কখনো সাজায় ধূপ
কখনো বা মাল্য,
ধ্যাক্সোধারায় মনে
এনে দেয় বাল্য।
সরিষার তেলে দেহ
দেয় ক'ষে মাজিয়া।
নিয়মের ত্রুটি হলে
করে ঘোর কাজিয়া—
কোথা হতে নেমে আসে
বকুনির ঝাঁক তার,
তর্জনী তুলে বলে
'ডেকে দেব ডাক্তার'।

এইমতো বসে আছি
আরামে ও ব্যারামে
যেন বোগ্‌দাদে কোন্‌
নবাবের হ্যারামে ॥

১৫।১২।৪০
[২৯ অগ্রহায়ণ ১৩৪৭]

বেঁটেছাতাওয়ালি

ও আমার বেঁটেছাতাওয়ালি,
বৃথাই সময় তুই খোয়ালি।
বাদল থামিল যবে
ভাবিনু সুযোগ হবে,
তখন কেন গো বেলা পোয়ালি।
মেঘ করে গুরুগুরু,
প্রলয় হইবে শুরু—
আকাশ হয়েছে ঘোর ধোঁয়ালি।

ও আমার বেঁটেছাতাওয়ালি,
তুই আসিলি না ব'লে
দিন বৃথা গেল চলে—
ধরণী চোখের জলে ধোয়ালি।
ও আমার বেঁটেছাতাওয়ালি,
ঝড়ের গাছের প্রায়
দুঃখের ঝাপটায়
মনটা মাটির পানে নোয়ালি।

ও আমার বেঁটেছাতাওয়ালি,
এত ক্ষণে এল রোদ,
আরাম হতেছে বোধ—
আকাশে সোনার কাঠি ছোঁয়ালি।

২১ এপ্রিল ১৯৪১
[৮ বৈশাখ ১৩৪৮]
'কালবৈশাখী ঝড়ের পর বেলা ৪।২০ মিনিটে
বুড়ির উদ্দেশে'

দিদিমণি

দিদিমণি আঁট করে দিলে মোর দিন,
এক করে দিলে যেন ছিল যেটা তিন।
প্রহরে প্রহরে সব নিয়মেতে বাঁধা,
ডাক্তারি ফাঁদে এই জীবনটা আগাগোড়া ফাঁদা।
সারি সারি ওষুধের শিশি
খাড়া আছে তর্জনী তুলে দিবানিশি।
যদি তারি কোনো ফাঁকে তবু
সুস্থ লোকের চালে চলিতে সাহস করি কভু
চোখে তবে পড়ে সেটা তোমার তখুনি,
স্পর্ধা মানিয়া লয়ে চুপ করে শুনি যে বকুনি।
গ্ল্যাক্সো খাওয়াও তুমি গুনে গুনে চামচেতে মেপে,
বই খুলে বসি যদি দাও সেটা চেপে।
বলো, 'পড়া থাক্-না!'
দিনটাকে ঢেকে রাখে সেবা-গাঁথা ঢাক্না॥

স্নানে গেছ, সেই ফাঁকে খাতা
টেনে নিয়ে লিখি এই যা'-তা'।
মিথ্যার রসে মিশে সত্যটা হলে উপাদেয়,
সাহিত্যে সেটা নয় হেয়।
গদ্যে যাহারে বলে মিথ্যে
সেটাই যে ছন্দের নৃত্যে
সত্যেরও বেশি পায় দাম—
এ কথাটা লিখে রাখিলাম॥

[১৯৪০-৪১]

রোগশয্যায়

[১]

যারা বিহান-বেলায় গান এনেছিল
আমার মনে
সাঁঝের বেলায় ছায়ায় তারা
মিলায় ধীরে।
একা বসে আছি হেথায়
যাতায়াতের পথের তীরে,
আজকে তারা এল আমার
স্বপ্নলোকের দুয়ার ঘিরে।
সুরহারা সব ব্যথা যত
একতারা তার খুঁজে ফিরে।
প্রহর-পরে প্রহর যে যায়,
বসে বসে কেবল গণি
নীরব জপের মালার ধ্বনি
অন্ধকারের শিরে শিরে।।

জোড়াসাঁকো
৩ নভেম্বর ১৯৪০

[২]

পাখি, তোর সুর ভুলিস নে—
আমার প্রভাত হবে বৃথা
জানিস কি তা।
অরুণ-আলোর করুণ পরশ
গাছে গাছে লাগে,
কাঁপনে তার তোরই যে সুর
জাগে—
তুই ভোরের আলোর মিতা
জানিস কি তা।

আমার জাগরণের মাঝে
রাগিণী তোর মধুর বাজে
জানিস কি তা।
আমার রাতের স্বপন-তলে
প্রভাতী তোর কী যে বলে
নবীন প্রাণের গীতা
জানিস কি তা॥

শান্তিনিকেতন
১২ ডিসেম্বর ১৯৪০

জন্মদিনে

অবিচার

নারীর দুখের দশা অপমানে জড়ানো
এই দেখি দিকে দিকে ঘরে ঘরে ছড়ানো।
জানো কি এ অন্যায় সমাজের হিসাবে
নিমেষে নিমেষে কত হলাহল মিশাবে?
পুরুষ জেনেছে এটা বিধিনির্দিষ্ট
তাদের জীবন-ভোজে নারী উচ্ছিষ্ট।
রোগ-তাপে সেবা পায়, লয় তাহা অলসে—
সুধা কেন ঢালে বিধি ছিদ্র এ কলসে!
সমসম্মান হেথা নাহি মানে পুরুষে,
নিজ প্রভুপদমদে তুলে রয় ভুরু সে।
অর্ধেক কাপুরুষ অর্ধেক রমণী
তাতেই তো নাড়ীছাড়া এ দেশের ধমনী।
বুঝিতে পারে না ওরা— এ বিধানে ক্ষতি কার।
জানি না কী বিপ্লবে হবে এর প্রতিকার।
একদা পুরুষ যদি পাপের বিরুদ্ধে
দাঁড়ায়ে নারীর পাশে নাহি নামে যুদ্ধে
অর্ধেক-কালি-মাখা সমাজের বুকটা
খাবে তবে বারে বারে শনির চাবুকটা।
এত কথা বৃথা বলা— যে পেয়েছে ক্ষমতা
নিঃসহায়ের প্রতি নাই তার মমতা,
আপনার পৌরুষ করি দিয়া লাঞ্ছিত
অবিচার করাটাই হয় তার বাঞ্ছিত।

শান্তিনিকেতন
পৌষ ১৩৪৭ [১৯ ডিসেম্বর ১৯৪০]

প্রচ্ছন্ন পশু

সংগ্রামমদিরাপানে আপনা-বিস্মৃত
দিকে দিকে হত্যা যারা প্রসারিত করে
মরণলোকের তারা যন্ত্রমাত্র শুধু,
তারা তো দয়ার পাত্র মনুষ্যত্বহারা!
সজ্ঞানে নিষ্ঠুর যারা উন্মত্ত হিংসায়
মানবের মর্মতন্তু ছিন্ন ছিন্ন করে
তারাও মানুষ বলে গণ্য হয়ে আছে!
কোনো নাম নাহি জানি বহন যা করে
ঘৃণা ও আতঙ্কে মেশা প্রবল ধিক্কার—
হায় রে নির্লজ্জ ভাষা! হায় রে মানুষ!
ইতিহাসবিধাতারে ডেকে ডেকে বলি—
প্রচ্ছন্ন পশুর শান্তি আর কত দূরে
নির্বাপিত চিতাগ্নিতে স্তব্ধ ভগ্নস্তূপে!

উদয়ন শান্তিনিকেতন
২৪ ডিসেম্বর ১৯৪০ [৯ পৌষ ১৩৪৭]

ফসল গিয়েছে পেকে

ফসল গিয়েছে পেকে,
দিনান্ত আপন চিহ্ন দিল তারে পাণ্ডুর আভায়।
আলোকের ঊর্ধ্বসভা হতে
আসন পড়িছে নুয়ে ভূতলের পানে।
যে মাটির উদ্‌বোধন বাণী
জাগায়েছে তারে একদিন,
শোনে আজি তাহারই আহ্বান
আসন্ন রাত্রির অন্ধকারে।
সে মাটির কোল হতে যে দান নিয়েছে এতকাল
তার চেয়ে বেশি প্রাণ কোথাও কি হবে ফিরে দেওয়া
কোনো নব জন্মদিনে নব সূর্যোদয়ে!

[শান্তিনিকেতন
২৩/২৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৪১ ॥ ১১/১৩ ফাল্গুন ১৩৪৭]

গল্পসল্প

ওকালতি ব্যবসায়ে ক্রমশই তার

ওকালতি ব্যবসায়ে ক্রমশই তার
জমেছিল একদিন মস্ত পসার।
ভাগ্যটা ঘাটে ঘাটে কী করিয়া শেষে
একদা জজের পদে ঠেকেছিল এসে।
সদাই বাড়িতে তার মহা ধুমধাম,
মুখে মুখে চারি দিকে রটে গেছে নাম।
আজ সে তো কালীনাথ, আগে ছিল কেলে—
কাউকে ফাঁসিতে দেয় কাউকে বা জেলে।
ক্লাসে ছিল একদিন একেবারে নিচু,
মাস্টার বলতেন হবে নাকো কিছু।
সব চেয়ে বোকারাম, সব চেয়ে হাঁদা—
দুষ্টুমি বুদ্ধিটা ছিল তার সাধা!
ক্লাসে ছিল বিখ্যাত তারি দৃষ্টান্ত,
সেই ইতিহাস তার সকলেই জানত।
একদিন দেখা গেল ছুটির বিকালে
ফলে ভরা আম গাছে একা বসি ডালে
কামড় লাগাতেছিল পাকা পাকা আমে—
ডাক পাড়ে মাস্টার, কিছুতে না নামে।
আম পেড়ে খেতে তোরে করেছি বারণ,
সে কথা শুনিস নে যে বল্ কী কারণ।
কালু বলে, পেড়ে আমি খাই নে তো তাই,
ডালে ব'সে ব'সে ফল ক'ষে কামড়াই।
মাস্টার বলে তারে, আয় তুই নাবি—
যত ফল খেয়েছিস তত চড় খাবি!
কালু বলে, পালিয়াছি গুরুর আদেশ
এই শাস্তিই যদি হয় তার শেষ,
তা হলে তো ভালো নয় পড়াশুনা করা—
গুরুর বচন শুনে চড় খেয়ে মরা।

স্ফুলিঙ্গ

১

অবকাশপদ্মে বাণী
রচে পাদপীঠ।
সেই পদ্মে ছিদ্র রচে
তুচ্ছ বাক্যকীট।

৭. ৯. ৩৯

২

অবসন্ন দিন তার
সোনার মুকুট ফেলে খুলে,
মাথা নত করে আসি
নীরবের মহাবেদীমূলে।

৩

অবুঝ, বুঝি মরিস খুঁজি
কোথায় দূর-পানে,
বাহিরে আঁখি বাঁধা—
বুকের মাঝে চাহিস না যে,
ঘুরিস কোন্‌খানে,
তাই তো লাগে ধাঁধা।

৪

অযতনে তব নিমেষকালের দান
পরশ করে যে গভীর আমার প্রাণ,
শরৎরাতের উল্কা যেন সে টুটে
রজনীর বুকে আগুন হইয়া উঠে।

৫

অলকায় অন্ত নাই
মানিক-মোতির,

অরুচি হয়েছে তাই
অলকাপতির,
গলায় মালার তরে
মাগিয়াছে ফুল—
কাননের আদরিণী
এসো গো পারুল।

*২২ মাঘ ১৩২১

৬

অসীম শূন্যে একা
অবাক্ চক্ষু
দূর-রহস্য-দেখা।

আষাঢ়। শ্রাবণ ১৩৪৩

৭

অস্তাচলের প্রান্ত থেকে
তরুণ দল'কে গেলেম ডেকে
উদয়পথের পানে—
ক্লান্ত প্রাণের প্রদীপশিখা
পরিয়ে দিবে আলোর টিকা
নূতন-জাগা প্রাণে।

১. ১. ৪৬

৮

আকাশ নিঠুর, বাতাস নীরস,
কৃপণ মাটির 'পরে
শিকড় হা হা করে—
চারি দিকে ফেটে চৌচির মাঠটা।
ফুলের খবর নিতে এলে
শোনায় নেহাত ঠাট্টা।
দখিন হাওয়া শুধায় যদি
'কেমন আছ' ব'লে,
শুকনো পাতায় খস্‌খসানি
কেবল জাগিয়ে তোলে।

২২. ২. ৪৮]

৯

আকাশে বাতাসে ভাসে,
অতলের নির্জনে নির্বাকে
গুপ্ত রহে, পাই নাকো ছুঁতে।
ছন্দের সংগীতে তারে
ধরিবারে কবি বসে থাকে—
ধরা যাহা দেয় না কিছুতে।

২৭. ৭. ৩৮]

১০

আকাশের বাণী বাজে
বাতাসের বীণাতে—
মাধবীরে ডাক দিল
রবি-মুখ চিনাতে।
টুনটুনি নেচে নেচে
দুলাইল লতাটি,
রবিরে শুনায়ে দিল
ধরণীর কথাটি।

২২. ৩. ৩৮

১১

আগে যেথায় ভিড় জমত
মেলা ;
নানারকম চলত হাসি
খেলা,
বিদায় নেবার সময় হলে
লাগত মনে ব্যথা,
‘এখন তবে যাই’ বলতে
বাধত মুখে কথা,
চোখের কোণে দেখেছিলেম
অশ্রুজলের ধারা—
করুণ রসের সেই পালাটা
আজকে হল সারা।
আজ বুঝেছি সেটা কালের
ভ্রান্তি,
এখন যেটা প্রকাশ পেল
সেটাই শান্তি শান্তি!

[২৫. ১২. ৪৭]

১২

আজি তোমাদের শুভপরিণয়-রাতে
সপ্তঋষির স্বর্গের আঙিনাতে
চিরমিলনের উজ্জ্বল শিখা
আশীর্বাদের মঙ্গল লিখা
তারায় তারায় লিখিল দোঁহার তরে।
অরুন্ধতীর স্নিগ্ধ দৃষ্টি
করি দিল আজ পুণ্যবৃষ্টি
প্রণতিমন্ত্র যুগল ললাট-'পরে।
আজি নন্দন-মন্দারবনে
রজনীগন্ধা-গন্ধের সনে
পৌঁছিল বুঝি মর্ত্যের হাসিখানি।
শচীর প্রেমের মধুরাগিণীতে
ধরার প্রেমের সাহানার গীতে
মিলিয়া বাজিল আলোকবীণার বাণী।

২৮. ১. ৪৫

১৩

আজি মানুষের সব সাধনার
কুৎসিত বিদ্রূপ
দিকে দিগন্তে করিছে প্রচার
দানবিকতার রূপ।
আমার আয়ুর প্রদোষ গগনে
এ কুশ্রী বিভীষিকা
দেখিতে হবে কি দারুণ লগনে
জ্বালায় প্রলয়শিখা!

শান্তিনিকেতন
১. ১. ৪৫

১৪

আঁধার রাতি জ্বেলেছে বাতি
অযুত কোটি তারা
আপন কারাভবনে পাছে
আপনি হয় হারা।

১৫

আঁধারে ডুবিয়া ছিল যে জগৎ
আলোতে উঠিল ভেসে
অনাদিকালের তীর্থসলিলে
প্রাতঃস্নানের বেশে।

শান্তিনিকেতন
৩০. ১১. ৪৪]

১৬

আঁধারের লীলা আকাশে আলোক-লেখায়,
ছন্দের লীলা অচল মৃদঙ্গে।
অরূপের লীলা রূপের রেখায় রেখায়,
অতলের লীলা চপল তরঙ্গে।

৫ চৈত্র ১৩৩২

১৭

আয় চলে আয়, রে ধূমকেতু,
আঁধারে বাঁধ্ অগ্নিসেতু,
দুর্দিনের এই দুর্গশিরে
উড়িয়ে দে তোর বিজয়-কেতন।
অলক্ষণের তিলক-রেখা
রাতের ভালে হোক-না লেখা—
জাগিয়ে দে রে চমক মেরে
আছে যারা অর্ধচেতন।

২৪ শ্রাবণ ১৩২৯

১৮

আলো এল-যে দ্বারে তব
ওগো মাধবীবনছায়া—
দোঁহে মিলিয়া নব নব
তৃণে বিছায়ে গাঁথো মায়া।
চাঁপা, তোমার আঙিনাতে
ফেরে বাতাস কাছে কাছে—
আজি ফাগুনে এক-সাথে
দোলা লাগিয়ো নাচে নাচে।
বধূ, তোমার দেহলীতে

বর আসিছে দেখিছ কি?
আজি তাহার বাঁশরিতে
হিয়া মিলায়ে দিয়ো সখী।

১৯

আলোর আশীর্বাদ জাগিল
তোমার সকাল বেলায়,
ধরার আশীর্বাদ লাগিল
তোমার সকল খেলায়,
বায়ুর আশীর্বাদ বহিল
তোমার আয়ুর সনে—
কবির আশীর্বাদ রহিল
তোমার বাক্যে মনে।

দার্জিলিং
২৭. ২. ৪০]

২০

আসন দিলে অনাহূতে,
ভাষণ দিলে বীণাতানে—
বুঝি গো তুমি মেঘদূতে
পাঠায়েছিলে মোর পানে।
বাদল-রাতি এল যবে
বসিয়াছিনু একা-একা—
গভীর গুরু-গুরু রবে
কী ছবি মনে দিল দেখা।
পথের কথা পুবে হাওয়া
কহিল মোরে থেকে থেকে—
উদাস হয়ে চলে যাওয়া
খ্যাপামি সেই রোধিবে কে!
আমার তুমি অচেনা যে
সে কথা নাহি মানে হিয়া,
তোমারে কবে মনোমাঝে
জেনেছি আমি না জানিয়া।
ফুলের ডালি কোলে দিনু—
বসিয়াছিলে একাকিনী।
তখনি ডেকে বলেছিনু:
তোমারে চিনি, ওগো, চিনি।

২১

উৎসবের রাত্রিশেষে
মৃৎপ্রদীপ হায়
তারকার মৈত্রী ছেড়ে
মৃত্তিকারে চায়।

২২

এ অসীম গগনের তীরে
মৃৎকণা জানি ধরণীরে।

২৩

এসেছে প্রথম যুগে
প্রকাণ্ড প্রচণ্ড মাংসস্তূপ
পঙ্কিল ধরণীপৃষ্ঠে।
প্রাণের সে সন্দিগ্ধ স্বরূপ
সৃষ্টির তিমির রাত্রে।
ক্ষুদ্রতনু মানুষ তাহার
মনের আনিল দীপ্তি।
সংশয় ঘুচিল বিধাতার!

[আষাঢ়। শ্রাবণ ১৩৪৩]

২৪

ওগো স্মৃতি কাপালিকা,
বর্তমানের বলির রক্তে
অতীতেরে দাও টিকা।

২৫

কঠিন শিলা প্রতাপ তাঁর বহে,
তাহার কাছে পথিক সাবধান।
প্রীতি তাঁহার কুসুমে ফুটে রহে,
অনাদরেও করে সে হাসি দান।

২৬

কণ্ঠে ভরি নাম নিল,
গান নিল মীরা—
কণ্ঠ হতে ফেলে দিল
মোতিমালা হীরা।

মুখে বাণী শুনি না যে,
মনে মনে সুর বাজে,
বাজে তার শিরা উপশিরা।
শান্তি তার দেহেমনে,
শান্তি তার দু নয়নে—
একতারা সংগীতে অধীরা।

১৭. ৩. ৩৮

২৭

কী সুর তুমি জাগালে উষা
কনকবীণা-তারে—
নবজীবনলহরী উঠে
সুপ্তিপারাবারে।

২৮

কে জানে কার মুখের ছবি
কোথার থেকে ভেসে
ঠেকল অনাহূত আমার
তুলির ডগায় এসে।
সাইকো-এনালিসিস-যোগে
ইহার পরিচয়
পণ্ডিতেরা জানেন স্পষ্ট—
আমার জানা নয়।

[আষাঢ়। শ্রাবণ ১৩৪৩]

২৯

কোথা আছ অন্যমনা ছেলে—
দুই চক্ষু পাখি-সম
দূর শূন্যে ওড়ে পাখা মেলে।
অদৃশ্য দেশের হাওয়া
কেন জানি তোমারে ভুলায়,
অকূল সমুদ্রপারে
স্বপ্ন দিয়ে বাঁধিছ কুলায়।

শান্তিনিকেতন
৩০. ১১. ৪৪]

৩০

গোড়াতেই ঢাক-
বাজনা—
কাজ করা তার
কাজ না।

৩১

গোঁড়ামি যখন সত্যেরে চাহে
যত্নে রাখিতে ধরি
মুঠির চাপনে ভীম উৎসাহে
সত্য সে যায় মরি।

৩২

ঘরের মায়া ঘরের বাইরে করুক রূপরচনা,
বাইরের রসিক আনুক তার ফুলের মালা।
ঘরের বাণী ঘরের বাইরে বাজাক বাঁশি,
বাইরের উদাসী এসে দাঁড়াক তোমার আঙিনায়।
ঘরের হৃদয় ঘরের বাইরে পাতুক আসন,
সেই আসনে বাইরের পথিক এসে বসুক
ক্ষণকালের তরে।

শান্তিনিকেতন
২৮. ৯. ৩৯]

৩৩

চরণে আপনারে
বরণ করি যবে
পাখিরা গেয়ে ওঠে
মধুরতম রবে।
মাটির তলে তলে
পুলকধারা চলে,
নবীন আলো ঝলে
প্রভাত-উৎসবে।

২০. ৮. ১৯২৯

৩৪

চলার গতি শেষের প্রতি
হোক-না অনুকূল।

পথের বোঁটা কঠিন অতি,
গৃহটি তার ফুল।
শমেতে এসে মিটুক মম
গানের যত ক্ষুধা।
কর্ম হোক পাত্র মম
ধর্ম হোক সুধা।

৩৫

চারি দিকে বিবাদ বিদ্বেষ,
মনে হয় নাই তার শেষ।
ক্ষমা যদি চিত্তে রাখি, তবে
শান্তিলাভ হবে।

১৩৪৬

৩৬

চিত্ত মম বেদনা-দোলে
আন্দোলিত।
অঙ্গনের
সমুখ-পথে পান্থ সবা
গিয়েছে বুঝি ক্লান্তপায়ে
দিগন্তরে।
বিরহবেণু
ধ্বনিছে তাই মন্দ বায়ে,
ছন্দে তারি কুন্দফুল
কাঁদিয়া ঝরে—
নবীন তৃণ
শিহরি উঠে ক্ষণে ক্ষণে।

৩৭

ছবির জগতে যেথা কোনো ভাষা নেই
সেথায় তোমার স্থির দৃষ্টি
যে কাহিনী করিতেছে সৃষ্টি,
ঘটনাবিহীন তার বোবা ইতিহাস
কালো মেঘে ছেয়ে ফেলে চিত্ত-আকাশ
বিষাদ-বাদল করে বৃষ্টি।

শান্তিনিকেতন
৩০. ১১. ৪৪]

৩৮

ছবির আসরে এল
কত রাজা কত মহারাজা
নানা অলংকারে সাজা।
অকুণ্ঠিত এলে দ্বারীসাজে
সে সবার মাঝে
তুমি প্রাণবান্—
তাদের সবার চেয়ে তোমার সম্মান।

শান্তিনিকেতন
৩০. ১১. ৪৪]

৩৯

জন্মের দিনে দিয়েছিল আজি
তোমারে পরম মূল্য
রূপসত্তায় এলে যবে সাজি
সূর্যতারার তুল্য।
দূর আকাশের পথে যে আলোক
এসেছে ধরার বক্ষে
নিমেষে নিমেষে চুমি তব চোখ
তোমারে বেঁধেছে সখ্যে।
দূর যুগ হতে আসে কত বাণী
কালের পথের যাত্রী—
সে মহাবাণীরে লয় সম্মানি
তোমার দিবসরাত্রি।
সম্মুখে গেছে অসীমের পানে
জীবযাত্রার পন্থ—
সেথা চল তুমি, বলো কেবা জানে
এ রহস্যের অন্ত।

৮. ১২. ৪০

৪০

জীবনযাত্রা আগে চলে যায় ছুটে—
কালে কালে তার খেলার পুতুল
পিছনে ধুলায় লুটে।

১. ১. ৩৯

৪১

জীবন সঞ্চয় করে
যা তাহার শ্রেয়—
মরণেরে পার হবে,
এই সে পাথেয়।

১২. ৮. ৩৯

৪২

জ্বেলেছে পথের আলোক
সূর্যরথের চালক,
অরুণরক্ত গগন।

বক্ষে নাচিছে রুধির—
কে রবে শান্ত সুধীর?
কে রবে তন্দ্রামগন?
বাতাসে উঠিছে হিলোল,
সাগর ঊর্মি-বিলোল,
এল মহেন্দ্রলগন—
কে রবে তন্দ্রামগন?

৪৩

তরণী বেয়ে শেষে
এসেছি ভাঙা ঘাটে—
স্থলে না মেলে ঠাঁই,
জলে না দিন কাটে।

৪৪

তরুণ প্রাণের যুগল মিলনে
পুণ্য-অমৃত-বৃষ্টি
মঙ্গলদানে করুক মধুর
নবজীবনের সৃষ্টি।
প্রেমরহস্যসন্ধানপথে যাত্রী—
মধুময় হোক তোমাদের দিনরাত্রি—
নামুক দোঁহার শুভদৃষ্টিতে
বিধাতার শুভদৃষ্টি।

কালিম্পং
জ্যৈষ্ঠ '৪৫]

৪৫

তলোয়ার থাকে
সংক্ষেপে তার খাপে।
গদার গুরুতা
শুধু তার মোটা মাপে।

কালিম্পং
৬. ৩. ৪৫

৪৬

তোমাদের যে মিলন হবে
বিশ্বে হল জানাজানি—
তারাগুলি করছে কেবল
হাসাহাসি কানাকানি।
রাত্রি যখন গভীর হবে
বাসর-ঘরের বাতায়নে
মারবে ওরা উঁকিঝুঁকি
—এইটে ওদের আছে মনে।

তোমরা যদি শোধ দিতে চাও,
এনেছি এই যন্ত্রখানি[১]
ওরা কেন লুকিয়ে রবে
অন্ধকারের পর্দা টানি।
তোমরা কোণে দাঁড়িয়ে দেখো
আলোক-সভার মিলন-রাতি—
দ্যুলোকেতে ভূলোকেতে
হোক-না আড়ি-পাতাপাতি।

২৩. ১. ২১

৪৭

তোমার আমার মাঝে ঘন হল কাঁটার বেড়া এ
কখন সহসা রাতারাতি—
স্বদেশের অশ্রুজলে তারেই কি তুলিবে বাড়ায়ে
ওরে মূঢ়, ওরে আত্মঘাতী?
ওই সর্বনাশটাকে ধর্মের দামেতে কর দামী,
ঈশ্বরের কর অপমান—

---

[১] দূরবীক্ষণ

আঙিনা করিয়া ভাগ দুই পাশে তুমি আর আমি
পূজা করি কোন্ শয়তান!
ও কাঁটা দলিতে গেলে দুই দিকে ধর্মধ্বজী দলে
ধিক্কারিবে তাহে ভয় নাই—
এ পাপ আড়ালখানা উপাড়ি ফেলিব ধূলিতলে,
জানিব আমরা দোঁহে ভাই।

দুই হাত মেলে নাই এত কাল ধরে তাই
বার বার বিধাতার দান
ব্যর্থ হল— অবশেষে আশীর্বাদ কাছে এসে
অভিশাপে হল অবসান।
তবুও মানবদ্রোহে স্পর্ধাভরে সমারোহে
চল যদি অন্ধতার পথে,
এই কথা জেনে যেয়ো বাঁচাবে যে মূঢ়কেও
হেন শক্তি নাই এ জগতে।

শান্তিনিকেতন
১৩ ফাল্গুন ১৩৪৩]

৪৮

দাদুরে যে মনে করে লিখেছ এ চিঠি
তাই ভাবি দাদুতেও আছে কিছু মিঠি।
সেটা কি অহৈতুকী প্রীতি
অথবা চকোলেটের স্মৃতি—
এ কথাটা নয় খুব সোজা,
হয়তো বছর-কয় যাবে নাকো বোঝা।
তবু যদি লিখে রাখি তাহে ক্ষতি নেই
সংক্ষেপে এই—
ভিতরে এনেছ তুমি বিধাতার চিনি,
আমি সে বাহির হতে বাজারেতে কিনি।

৪ ১২ ৪৬]

৪৯

দিনান্তে ধরণী যথা
চেয়ে থাকে স্তব্ধ নির্নিমিখে
নিশীথের সপ্তর্ষির দিকে,

জীবনের প্রান্ত হতে
তেমনি কি শান্ত তব চোখ
দেখিতেছে সুদূর আলোক?

শান্তিনিকেতন
৩০. ১১. ৪৪]

৫০

দুই প্রাণ মিলাইয়া
যে সংসার করিছ রচন
তাহাতে সঞ্চিত হোক
নিখিলের আশীর্বচন।
ধ্রুবতারকার মতো
তোমাদের প্রেমের মহিমা
বিশ্বের সম্পদ হোক
ছাড়ায়ে গৃহের ক্ষুদ্র সীমা।

শান্তিনিকেতন
৪. ৩. ৩২]

৫১

দূরের মানুষ কাছের হলেই
নতুন প্রাণের খেলা—
নতুন হাওয়ায় নতুন ঋতুর
ফুলের বসায় মেলা।

৫২

ধরণীর আঁখিনীর
মোচনের ছলে
দেবতার অবতার
বসুধার তলে।

৫৩

ধরার আঙিনা হতে ওই শোনো
উঠিল আকাশবাণী।
অমরলোকের মহিমা দিল যে
মর্ত্যলোকেরে আনি।
সরস্বতীর আসন পাতিল
নীল গগনের মাঝে,
আলোকবীণার সভামণ্ডলে
মানুষের বীণা বাজে।

সুরের প্রবাহ ধায় সুরলোকে,
দূরকে সে নেয় জিনি।
কবিকল্পনা বহিয়া চলিল
অলখ সৌদামিনী।
ভাষারথ ধায় পুবে পশ্চিমে
সূর্যরথের সাথে—
উধাও হইল মানবচিত্ত
স্বর্গের সীমানাতে।

শান্তিনিকেতন
২০. ৪. ৪৫]

৫৪

নদী বহে যায় নূতন নূতন বাঁকে,
সাগর সমান থাকে।

[১৩৩৩]

৫৫

নয়ন-অতিথিরে
শিমুল দিল ডালি—
নাসিকা প্রতিবেশী
তা নিয়ে দেয় গালি।
সে জানে গুণ শুধু
প্রমাণ হয় ঘ্রাণে—
রঙ যে লাগে রূপে
সে কথা নাহি জানে।

৫৬

নয়নে নিঠুর চাহনি,
হৃদয়ে করুণা ঢাকা—
গভীর প্রেমের কাহিনী
গোপন করিয়া রাখা।

৫৭

নিঃস্বতাসংকোচে দিন
অবসন্ন হলে
নিভৃতে নিঃশব্দ সন্ধ্যা
নেয় তারে কোলে।

৫৮

নূতন সংসারখানি সৃষ্টি করো আপন শক্তিতে
হৃদয়সম্পদ দিয়ে, হে শোভনা, স্নেহে ও ভক্তিতে
পুণ্যে ও সেবায়— থাকো লক্ষ্মীর আসনে শুভব্রতা।
তোমাদের সম্মিলিত প্রাণের যুগল তরুলতা।
সুলগ্নে রোপিত হল— দেবতার প্রসাদ বর্ষণ
নববর্ষাধারা-সাথে আজি তারা করুক গ্রহণ,
পূর্ণ হোক প্রেমরসে, মাধুর্যের ধরুক মঞ্জরী
চির সুন্দরের দান, উঠুক সকল শাখা ভরি
বিশ্বের সেবার তরে সরস কল্যাণময় ফল,
বিস্তার করুক শান্তি স্নিগ্ধ তার শ্যামচ্ছায়াতল!

১৩. ৩. ৪২

৫৯

পতিত ক্ষেতের ধূসরিত ভূমে
আগামী ফসল নিমগন ঘুমে,
আলোর আড়ালে ভূতলের নীচে
সোনার স্বপন অঙ্কুরিছে
মাটির মন্ত্রবলে।
সে মহামন্ত্র আশীর্বাদের
গোপনে লভিছে মন তোমাদের,
ভবিষ্যতের উদার আশার
সেই তো বাহন— পুণ্যভাষার
ধীরে ধীরে ফল ফলে।
মিলাইয়া হাত দেবে ও মানবে
একত্র হয়ে কাজ করি যবে
পৌরুষ তবে সার্থক হয়,
দেবতাপ্রসাদ নিজগুণে লয়—
জিৎ হয় মানবেরই।
আকাশের আলো বৃষ্টির জল
যত কেন নামে সবই নিষ্ফল—
নিজের শক্তি না যদি জাগাই
তবে কাঁটাগাছ আর আগাছাই
মাঠ বাট ফেলে ঘেরি।

কালিম্পং
১১. ২. ৪৭

৬০

পথে পথে অরণ্যে পর্বতে
চলিতে চলিতে হয় দেখা,
বিস্মৃতির পটভূমিকায়
স্মৃতি কিছু রেখে যায় রেখা।

[আষাঢ়-শ্রাবণ ১৩৪৩]

৬১

পথে যেতে যেতে হল
পথিকের মেলা—
কিছু হল কথা, আর
কিছু হল খেলা।
তার পরে মিলে গেল
দিগন্তের পারে
ছায়ার মতন একেবারে।

৬২

পুণ্যধারার অভিষেক বারি
শুভপরিণয় পরে
স্বর্গলোকের প্রসাদ আনুক
মর্ত্যলোকের ঘরে।

[২৭ শ্রাবণ ১৩৪৩]

৬৩

প্রদীপ থাকে সারাটা দিন
ঘরের এক কোণে—
সন্ধ্যাবেলা উঠিবে জাগি
শিখার চুম্বনে।

৬৪

প্রদোষের দেশে
আর ভালো লাগে না গো—
নবীন আলোকে
জাগো, মন, জাগো জাগো।

হারায়ো না মন
চিরস্বপনের লোকে
ছায়া-উপছায়া-
জড়িত মুগ্ধ চোখে—
নবপ্রভাতের পুণ্যপ্রসাদ মাগো।

১৯. ৪. ৪২

৬৫

প্রভাতের 'পরে দক্ষিণ করে
রবির আশীর্বাদ—
নূতন জনমে নব নব দিন
তোমার জীবন করুক নবীন
অমল আলোকে দূরে হোক লীন
রজনীর অবসাদ।

১১. ৪. ২১

৬৬

প্রয়াগে যেখানে গঙ্গা যমুনা
মিলায়েছে দুই ধারা,
সেখানে তোমার দেখেছিনু কী চেহারা।
দ্বিবেণী তোমারে নাম দিয়েছিনু,
দুই-বেণী সোজাসুজি—
পিঠে নেমেছিল অচল ঝরনা বুঝি।
আজি এ কী দেখি! খোঁপায় তোমার
বাঁধিয়া তুলেছ বেণী—
চাঁদেরে মাগিয়া জমেছে মেঘের শ্রেণী।
এবার তোমার নামের বদল
না ক'রে উপায় নাই—
খোঁপা-গরবিণী, খোবানি ডাকিব তাই।

২. ১২. ৪৭

৬৭

প্রিয়ার দৌত্যের পথে
ছন্দে এঁকে চলেছিল কবি
নদী গিরি কাননের ছবি।
জীবনের মর্মে আছে
কোন্ চিরবিচ্ছেদবেদনা—

সুন্দরের দৌত্যে তাই
কত ছবি আঁকে অন্যমনা।

শান্তিনিকেতন
৩০. ১১. ৪৪]

৬৮

প্রেয়সী মোর পুপে,
তোমায় চুপে চুপে
ভালোবাসা দিয়ে গেলুম
গলার ভূষণ-রূপে।
কোনোদিন কী জানি
খুলবে হৃদয়খানি
সোনার স্মরণ দিয়ে গড়া
এই মায়া-কুলুপে।

[ফাল্গুন ১৩৩২]

৬৯

ফিরে ফিরে আঁখিনীরে
পিছু-পানে চায়—
পায়ে পায়ে বাধা প'ড়ে
চলা হল দায়।

৭০

বচন নাহি তো মুখে,
তবু মুখখানি
হৃদয়ের কানে বলে
নয়নের বাণী।

৭১

বড়োই সহজ
রবিরে ব্যঙ্গ করা
আপন আলোতে
আপনি দিয়েছে ধরা।

[১৩৩৩]

৭২

বড়োর দলে নাইবা হলে গণ্য—
লোভ কোরো না লোকখ্যাতির জন্য।

ভালোবাসো, ভালো করো, প্রাণ মনে হও ভালো—
তবেই তুমি আলো পাবে, তবেই দেবে আলো—
আপন-মাঝে আপনি হবে ধন্য।
স্বার্থমাঝে থেকো না অবরুদ্ধ—
লোভের সাথে নিয়ত করো যুদ্ধ।
নিজেরে যদি বিশ্বমাঝে করিতে পারো দান
নিজেরে তবে করিবে লাভ— তখনি পাবে ত্রাণ,
হৃদয়ে মনে তখনি হবে শুদ্ধ।
নদীর জলে প্রবাহ হলে বন্ধ
তাহার দশা তখনি জেনো মন্দ।
দানের স্রোতে ছিল যে তার নিয়ত ত্রাণধারা—
হারায়ে ফেলি আপনা দিয়ে রচে আপন কারা,
অশুচি হয়ে রহে সে নিরানন্দ।

চৈত্র ১৩২৯?

৭৩

বনের পথে পথে বাজিছে বায়ে
নূপুর-রুনুরুনু কাহার পায়ে।
কাটিয়া যায় বেলা মনের ভুলে,
বাতাস উদাসিছে আকুল চুলে—
ভ্রমর মুখরিত বকুলছায়ে
নূপুর-রুনুরুনু কাহার পায়ে।

৭৪

বর্ষণশান্ত
পাণ্ডুর মেঘ যবে ক্লান্ত
বন ছাড়ি মনে এল নীপরেণু গন্ধ,
ভরি দিল কবিতার ছন্দ।

[১৩৩৯

৭৫

বহিয়া হালকা বোঝা চলে যায় দিন তার
অবকাশ দেয় না সে কোনো দুশ্চিন্তার!

সম্বল কম বটে,   আছে বটে ঋণ দায়—
অনুরাগ নেই তবু   ভাগ্যের নিন্দায়।
পাড়া-প্রতিবেশীদের   কটুতম ভাষ্যে
নীরব জবাব তার   স্মিত ঔদাস্যে
জন্ম নেবার কালে   পেয়েছিল যৌতুক
ভাঙাচোরা জীবনের
বিদ্রূপে— কৌতুক।

শান্তিনিকেতন
৩০. ১১. ৪৪]

৭৬

বাউল বলে খাঁচার মধ্যে
আসে অচিন পাখি।
তেমনি, মনের পোড়ো বাসা
সেথায় করে যাওয়া-আসা
অচিন রূপের কোন্ রহস্য
ডাকি নাইবা ডাকি।

[আষাঢ়/শ্রাবণ ১৩৪৩]

৭৭

বাক্য তোমার সব লোকে বলে
গজদন্তের তুল্য—
বের হয়ে যদি ফিরিত কবলে
হারাত সত্য মূল্য।
আঁখি-পানে তব তাকিয়েই
বিশ্বাস মনে রাখি এই
কথা দিলে তুমি ভোল না কখনো—
কত লোকে কত ভুলল।

শান্তিনিকেতন
৩ চৈত্র ১৩৩৯

৭৮

বাজে নিশীথের নীরব ছন্দে
বিশ্বকবির দান
আঁধার-বাঁশির রন্ধ্রে রন্ধ্রে
তারার বহ্নিগান!

৭৯

বাণী আমার পাগল হাওয়ার
ঘূর্ণি ধূলিতে
প্রাণের দোলে এলোমেলো
রয় গো দুলিতে।
মৃত্যুলোকের অগাধ নদী
পার হয়ে সে ফেরে যদি
উল্টো স্রোতের সে দান ডালায়
পারবে তুলিতে।

৮০

বাহিরের আশীর্বাদ
কী আনিব আমি—
অন্তরের আশীর্বাদ
দিন অন্তর্যামী।
পথিকের কথাগুলি
লভিবে পথের ধূলি—
জীবন করিবে পূর্ণ
জীবনের স্বামী।

১১. ৩৮]

৮১

বিদায়-বেলার রবির পানে
বনশ্রী তার অর্ঘ্য আনে
অশোক ফুলের করুণ অঞ্জলি
আভাস তারই রঙিন মেঘে
শেষ নিমেষে রইবে লেগে
রবি যখন অস্তে যাবে চলি।

আলমোড়া
বৈশাখ ১৩৪৪

৮২

বিপুল প্রস্তরপিণ্ড ভূস্তরের কণ্ঠ রুদ্ধ করি
ছিল যুগে যুগান্তরে অর্থহীন দিবা বিভাবরী।
দীর্ঘ তপস্যার পরে ভাঙাইল প্রথম কুসুম
ধরণীর বাণীহারা ঘুম।

[আষাঢ়/শ্রাবণ ১৩৪৩]

৮৩

বিরহী গগন ধরণীর কাছে
পাঠালো লিপিকা। দিকের প্রান্তে
নামে তাই মেঘ বহিয়া সজল
বেদনা, বহিয়া তড়িৎচকিত
ব্যাকুল আকৃতি। উৎসুক ধরা
ধৈর্য হারায়, পারে না লুকাতে
বুকের কাঁপন পল্লবদলে।
বকুলকুঞ্জে রচে সে প্রাণের
মুগ্ধ প্রলাপ— উল্লাস ভাসে
চামেলিগন্ধে পূর্বগগনে।

৮৪

বিস্মৃত যুগে গুহাবাসীদের মন
  যে ছবি লিখিত ভিত্তির কোণে
    অবসরকালে বিনা প্রয়োজনে
      সেই ছবি আমি আপনার মনে
        করেছি অন্বেষণ।

[৩. ৪. ৪৩]

৮৫

ভয়ে ভয়ে এসেছিল,
    চেয়েছিল নাম।
মনে মনে হাসি আমি—
    কী বা তার দাম।

১০ শ্রাবণ ১৩৩৯

৮৬

ভুবন হবে নিত্য মধুর
    জীবন হবে ভালো,
মনের মধ্যে জ্বালাই যদি
    ভালোবাসার আলো।

১৬.৬.২৮

৮৭

ভোরের কলকাকলিতে
মুখর তব প্রাণ
জাগাবে দিনসভাতলে
আলোর জয়গান।

১২. ৪৫

৮৮

ভ্রমণকারী মন,
ভ্রমণ করার তীর্থ তাহার
আপন ঘরে কোণ!

[আষাঢ়/শ্রাবণ ১৩৪৩]

৮৯

মনে রেখো দৈনিক
চা খাইবে চৈনিক,
গায় যদি জোর পাও
হবে তবে সৈনিক।

জাপানিরা যদি আসে
চিঁড়ে নিক, দই নিক—
আধুনিক কবিদের
যত পারে বই নিক।

৯০

মরুতল কারে বলে? সত্য যেথা
কুশ্রী বিভীষিকা,
সুন্দর সে মিথ্যা মরীচিকা।

৯১

মাটি আঁকড়িয়া থাকিবারে চাই
তাই হয়ে যাই মাটি।
'রবো' বলে যার লোভ কিছু নাই
সেই রয়ে যায় খাঁটি।

পাহাড় যে সেও ক্ষ'য়ে ক্ষ'য়ে মরে
কালের দীর্ঘশ্বাসে
মুকুল কেবল যতবার ঝরে
ততবার ফিরে আসে।

১৯. ৮. ৩২

৯২

মাঠে আছে কাঁচা ধান,
কাঁচা হাঁড়ি কুমোর-বাড়ি,
কাঁচা চুলো, ভিজে কাঠ—
পাত পাড়িয়ো না তাড়াতাড়ি।

৯৩

মাধবী যায় যবে চলিয়া
বাতাসে শেষ কথা বলিয়া,
কেহ না পারে তারে ধরিতে।
দাহন দানবের আকারে
যখন হানে বনশাখারে
দাগিয়া পীতরেখা হরিতে,
নিঠুর তপনের তাপনে
যখন পবনের কাঁপনে
বকুল ঝরি পড়ে ত্বরিতে,
তখন বলো কোন্ সাহসে
কে ভোলে আকাশের দাহ সে,
কে ছোটে বাঁচিতে কি মরিতে?
কে চলে বাধাহীন চরণে
নবীন রসে রূপে বরনে
তাপিত ভুবনেরে বরিতে?
মুকুল সুকুমার সে যে গো,
মাধুরীরসে দেহ মেজে গো
বনের কোল আসে ভরিতে।

১১. ১২. ৩৩

৯৪

মালতী সারাবেলা ঝরিছে রহি রহি
কেন যে বুঝি না তো। হায় রে উদাসিনী,

১০১

যতক্ষণ থাকে মেঘ
শূন্যপটে নাম রহে লেখা।
যখন সে চলে যায়
মুছে দিয়ে যায় সব রেখা।

১০২

যদিও ক্লান্ত মোর দিনান্ত
রিক্ত আমার বল্লী,
তবুও পেয়েছি বনের প্রান্তে
একটি শীর্ণ মল্লি।
মোর দ্বারে যবে আনিয়াছ সাজি
স্নেহের আশিস্ এই লহো আজি—
যাবার ঘণ্টা ওই উঠে বাজি,
বিদায় হে গুরুপল্লী!

[বৈশাখ ১৩৩৩]

১০৩

যশের বোঝা তুলিয়া লয়ে কাঁধে
নামটা মোর মরে মরুক ঘুরে,
মনটা আমার যেন অপ্রমাদে
শান্ত হয়ে রহে অনেক দূরে।

১০৪

যাহা খুশি তাই করে
বিশ্বশিল্পী সকালে বিকালে
রঙের খেয়ালে।
সেই নেশা লেখনীতে এসে
মনেরে উদাসী করে
রঙিনের দেশে।

শান্তিনিকেতন
৩০. ১১. ৪৪]

১০৫

যুগল যাত্রী করিছ যাত্রা,
নূতন তরণীখানি—
নবজীবনের অভয়বার্তা
বাতাস দিতেছে আনি।
দোঁহার পাথেয় দোঁহার সঙ্গ
অফুরান হয়ে রবে—
সুখের দুখের যত তরঙ্গ
খেলার মতন হবে।

২২. ২. ৪৩]

১০৬

রুদ্র সমুদ্রের বক্ষ,
ক্ষুদ্র এ তরণীর কক্ষ—
স্থল হতে জলে জলে
বহন করিয়া চলে
সিন্ধু ও ধরণীর সখ্য।

১০৭

রেণু কোথায় লুকিয়ে থাকে
ফুলের মধ্যখানে,
বাতাসেতে গন্ধ তাহার
ছড়ায় সুদূর-পানে।

১৫ ফাল্গুন ১৩৪২]

১০৮

রৌদ্রী তপস্যার তাপে জ্বলন্ত বৈশাখে
মোর জন্ম রবিদৌত্যে যদি এনে থাকে
নব আলোকের লিপিখানি
সে মোর সৌভাগ্য বলে জানি।

২৭ বৈশাখ ১৩৪৭

১০৯

লিখন দিয়ে স্মৃতিরে কি
রাখবে চিরদিন?
লিখন রবে, স্মৃতি হবে
কোন্ আঁধারে লীন।

পাখির সময় হলে সে কি
মান্‌বে খাঁচার মানা—
রইবে না সে, রবে কেবল
লোহার খাঁচাখানা।

১১০

লেখা আসে ভিড় ক'রে,
বসে তার মেলা—
কেহ আসে কেহ যায়
কেহ করে খেলা।

আখরেতে বাসা বাঁধে
ভাষা দিয়ে গাঁথা—
যে লেখে সে কোথা থাকে
প'ড়ে থাকে খাতা।

৪. ১১. ৩৮

১১১

শকতিহীনের দাপনি
আপনারে মারে আপনি।

১১২

শক্তির সংঘাত-মাঝে বিশ্বে যিনি শান্ত যিনি স্থির,
কর্মতাপে মর্মদাহে তিনি দিন শান্তিসুধানীর।
সংসারের আবর্তনে নির্বিচল যে মঙ্গলময়,
দুঃখে সুখে ক্ষতি-লাভে তিনি দিন ভয়হীন জয়।
বিশ্বের বৈচিত্র্য-মাঝে যিনি এক যিনি অদ্বিতীয়,
নিখিলেরে নিশিদিন করে দিন আমাদের প্রিয়।
যে মহা-একের পানে বিশ্বপদ্ম উঠিছে বিকশি
তিনিই আমার পিতা—
বলো, মন, বলো 'পিতা নোঽসি'।

[১৩১৬]

১১৩

শান্তি নিজ-আবর্জনা দূর করিবারে
ঝাঁট দিতে থাকে বেগে—
ঝড় কহে তারে।

১১৪

শিশির আপন বিন্দুর মাঝখানে
রবির জ্যোতিরে বিন্দু ব'লেই জানে।

[১৩৩৪]

১১৫

শিশির সে চিরন্তন
যদিও মিলায় মুহূর্তেই।
রাজকণ্ঠে মণিহার
আছে তবু নিত্যই সে নেই।

[১৩৩৩]

১১৬

শীতের দুয়ারে বসন্ত যবে
আসে যায় দ্বিধাভরে
আমের মুকুল ছুটে চলে আসে—
ঝরে তার পথ-'পরে।

১১৭

শৈশবে ছাদের কোণে গোপনে ছুটিত মায়ারথ—
যেথা মরীচিকাপুরী যেথা ছিল অদেখা পর্বত।
হারায়েছি সহজ সে পথ।
আজিকে তুলির মুখে আনি
ছুটি-লোকে অভিনব ভূগোল-সৃষ্টির মন্ত্রখানি।

শান্তিনিকেতন
৩০। ১১। ৪৪

১১৮

সকল পক্ষী মৎস্যভক্ষী
মাছ রাঙাটাই কলঙ্কিনী।
সবাই কলম ধার করে নেন,
আমিই কেবল কলম কিনি।

[১৩৪৬]

১১৯

সবিতার জ্যোতির্মন্ত্র
সাবিত্রী তাহারই নাম জানি।
সর্বলোকে আপনারে মুক্তি দাও
—এই তার বাণী।

১২০

সাত বর্ণ মিলে যথা
দেখা দেয় এক শুভ্র জ্যোতি
সব বর্ণ মিলে হোক
ভারতের শক্তির সংহতি।

১২১

সীমাশূন্য মহাকাশে
দৃপ্তবেগে চন্দ্র সূর্য তারা
যে প্রদীপ্ত শক্তি নিয়ে
যুগে যুগে চলে তন্দ্রাহারা,
মানবের ইতিবৃত্তে
সেই দীপ্তি লয়ে, নরোত্তম,
তোমরা চলেছ নিত্য
মৃত্যুরে করিয়া অতিক্রম।

১২২

সুনিবিড় শ্যামলতা
উঠিয়াছে জেগে
ধরণীর বনতলে
গগনের মেঘে।

১২৩

সুন্দরের অশ্রুজল দেখা দেয় যেই
করুণা জাগায় সহজেই।
উপেক্ষিত অসুন্দর যে বেদনা বহে
কোনো ব্যথা তার তুল্য নহে।

শান্তিনিকেতন
৩০. ১১. ৪৪]

১২৪

সূর্য কখন আলোর তিলক
দিলেন তোমার ভালে
অজানা উষার কালে।
কিন্তু তোমারে ভিক্ষার মতো
দেন নাই তিনি ফুল ;
তোমার আপন হৃদয়েতে ছিল
মাধুরীলতার মূল।
অরুণকিরণে ঝরিল করুণা,
বিকশিল মঞ্জরী—
দেবতা আপনি বিস্মিত হল
আপন মন্ত্র স্মরি।

১২৫

সেকালের জয়গৌরব খসি
ধুলায় হতেছে ধূলি।
একাল তা নিয়ে গড়িতেছে বসি
আপন খেলেনাগুলি।

১২৬

স্বর্গের চোখের জলে
ঝরে পড়ে বৃষ্টি—
হাজার হাজার হাসি
মর্ত্যে করে সৃষ্টি।

[১৩২৩]

১২৭

স্মৃতি সে যে নিশিদিন
বর্তমানেরে নিঃশেষ করি
অতীতের শোধে ঋণ।

[পৌষ ১৩৩৬]

১২৮

হিতৈষীদের স্বার্থবিহীন অত্যাচারে
পীড়িত ধরণী বেদনাভারে।

১২৯

হেথায় আকাশ সাগর ধরণী
কহিছে প্রাণের ভাষা,
এইখানে এসে হৃদয় আমার
পেয়েছে আপন বাসা।
লভেছি গভীর শান্তি,
দেখেছি অমৃতকান্তি,
দুদিনে পেয়েছি চিরদিবসের
বন্ধুর ভালোবাসা।

[১৩২৩]

নূতন সংকলন

চিত্রবিচিত্র

শীত

অঘ্রান হ'ল সারা,
স্বচ্ছ নদীর ধারা
বহি চলে কলসংগীতে।
কম্পিত ডালে ডালে
মর্মর-তালে-তালে
শিরীষের পাতা ঝরে শীতে।

ও পারে চরের মাঠে
কৃষাণেরা ধান কাটে,
কাস্তে চালায় নতশিরে।
নদীতে উজান-মুখে
মাস্তুল পড়ে ঝুঁকে,
গুণ-টানা তরী চলে ধীরে।

পল্লীর পথে মেয়ে
ঘাট থেকে আসে নেয়ে,
ভিজে চুল লুণ্ঠিত পিঠে।
উত্তর-বায়ু-ভরে
বক্ষে কাঁপন ধরে,
রোদ্দুর লাগে তাই মিঠে।

শুক্‌নো খালের তলে
এক-হাঁটু ডোবা-জলে
বাগ্‌দিনি শেওলায় পাঁকে
করে জল ঘাঁটাঘাঁটি
কক্ষে আঁচল আঁটি—
মাছ ধ'রে চুবড়িতে রাখে।

ডাঙায় ঘাটের কাছে
ভাঙা নৌকোটা আছে—
তারি 'পরে মোক্ষদা বুড়ি
মাথা ঢুলে পড়ে বুকে
রৌদ্র পোহায় সুখে
জীর্ণ কাঁথাটা দিয়ে মুড়ি।

আজি বাবুদের বাড়ি
শ্রাদ্ধের ঘটা ভারি,
ডেকেছেন আশু জন্দার।
হাতে কঞ্চির ছড়ি
টাট্টু ঘোড়ায় চড়ি
চলে তাই কালু সর্দার।

বউ যায় চৌগাঁয়ে,
ঝি-বুড়ি চলেছে বাঁয়ে,
পাল্‌কি কাপড়ে আছে ঘেরা।
বেলা ওই যায় বেড়ে
হাঁই-হুঁই ডাক ছেড়ে,
হন্‌-হন্‌ ছোটে বাহকেরা।

শ্রান্ত হয়েছে দিন,
আলো হয়ে এল ক্ষীণ,
কালো ছায়া পড়ে দিঘি-জলে।
শীত-হাওয়া জেগে ওঠে,
ধেনু ফিরে যায় গোঠে,
বকগুলো কোথা উড়ে চলে।

আখের খেতের আড়ে
পদ্মপুকুর-পাড়ে
সূর্য নামিয়া গেল ক্রমে।
হিমে-ঘোলা বাতাসেতে
কালো আবরণ পেতে
খড়-জ্বালা ধোঁওয়া ওঠে জ'মে।

ঝোড়ো রাত

ঢেউ উঠেছে জলে,
হাওয়ায় বাড়ে বেগ।
ওই-যে ছুটে চলে
গগন-তলে মেঘ।

মাঠের গোরুগুলো
উড়িয়ে চলে ধুলো,
আকাশে চায় মাঝি
মনেতে উদ্‌বেগ।

নামল ঝোড়ো রাতি,
দৌড়ে চলে ভুতো।
মাথায় ভাঙা ছাতি,
বগলে তার জুতো।
ঘাটের গলি-'পরে
শুক্‌নো পাতা ঝরে,
কল্‌সি কাঁখে নিয়ে
মেয়েরা যায় দ্রুত।

ঘণ্টা গোরুর গলে
বাজিছে ঠন্ ঠন্।
নীচে গাড়ির তলে
ঝুলিছে লণ্ঠন।
যাবে অনেক দূরে
বেণীমাধব-পুরে—
ডাইনে চাষের মাঠ,
বাঁয়ে বাঁশের বন।

পশ্চিমে মেঘ ডাকে,
ঝাউয়ের মাথা দোলে।
কোথায় ঝাঁকে ঝাঁকে
বক উড়ে যায় চ'লে।
বিদ্যুৎকম্পনে
দেখছি ক্ষণে ক্ষণে
মন্দিরের ওই চূড়া
অন্ধকারের কোলে।

গৃহস্থ কে ঘরে,
খোলো দুয়ারখানা।
পান্থ পথের 'পরে,
পথ নাহি তার জানা।
নামে বাদল-ধারা,
লুপ্ত চন্দ্র তারা,
বাতাস থেকে থেকে
আকাশকে দেয় হানা।

পৌষ-মেলা

শীতের দিনে নামল বাদল,
বসল তবু মেলা।
বিকেল বেলায় ভিড় জমেছে,
ভাঙল সকাল বেলা।

পথে দেখি দু-তিন-টুক্‌রো
কাঁচের চুড়ি রাঙা,
তারি সঙ্গে চিত্র-করা
মাটির পাত্র ভাঙা।

সন্ধ্যা বেলার খুশিটুকু
সকাল বেলার কাঁদা
রইল হোথায় নীরব হয়ে,
কাদায় হল কাদা।

পয়সা দিয়ে কিনেছিল
মাটির যে ধনগুলা
সেইটুকু সুখ বিনি পয়সায়
ফিরিয়ে নিল ধুলা।

উৎসব

দুন্দুভি বেজে ওঠে
ডিম্‌-ডিম্‌ রবে,
সাঁওতাল-পল্লীতে
উৎসব হবে।
পূর্ণিমাচন্দ্রের
জ্যোৎস্নাধারায়
সান্ধ্য বসুন্ধরা
তন্দ্রা হারায়।

তাল-গাছে তাল-গাছে
পল্লবচয়
চঞ্চল হিল্লোলে
কল্লোলময়।

আম্রের মঞ্জরী
গন্ধ বিলায়,
চম্পার সৌরভ
শূন্যে মিলায়।

দান করে কুসুমিত
কিংশুকবন
সাঁওতাল-কন্যার
কর্ণভূষণ।
অতিদূর প্রান্তরে
শৈলচূড়ায়
মেঘেরা চীনাংশুক-
পতাকা উড়ায়।

ওই শুনি পথে পথে
হৈ হৈ ডাক,
বংশীর সুরে তালে
বাজে ঢোল ঢাক।
নন্দিত কণ্ঠের
হাস্যের রোল
অম্বরতলে দিল
উল্লাসদোল।

ধীরে ধীরে শর্বরী
হয় অবসান,
উঠিল বিহঙ্গের
প্রত্যূষগান।
বনচূড়া রঞ্জিল
স্বর্ণলেখায়
পূর্বদিগন্তের
প্রান্তরেখায়।

ফাল্গুন

ফাল্গুনে বিকশিত
কাঞ্চন ফুল,
ডালে ডালে পুঞ্জিত
আম্রমুকুল।

চঞ্চল মৌমাছি
গুঞ্জরি গায়,
বেণুবনে মর্মরে
দক্ষিণবায়।

স্পন্দিত নদীজল
ঝিলিমিলি করে,
জ্যোৎস্নার ঝিকিমিকি
বালুকার চরে।
নৌকা ডাঙায় বাঁধা,
কাণ্ডারী জাগে,
পূর্ণিমারাত্রির
মত্ততা লাগে।

খেয়াঘাটে ওঠে গান
অশ্বত্থতলে,
পান্থ বাজায়ে বাঁশি
আন্‌মনে চলে।
ধায় সে বংশীরব
বহুদূর গাঁয়,
জনহীন প্রান্তর
পার হয়ে যায়।

দূরে কোন্ শয্যায়
একা কোন্ ছেলে
বংশীর ধ্বনি শুনে
ভাবে চোখ মেলে—
যেন কোন্ যাত্রী সে,
রাত্রি অগাধ,
জ্যোৎস্নাসমুদ্রের
তরী যেন চাঁদ।

চলে যায় চাঁদে চ'ড়ে
সারা রাত ধরি,
মেঘেদের ঘাটে ঘাটে
ছুঁয়ে যায় তরী।
রাত কাটে, ভোর হয়,
পাখি জাগে বনে—
চাঁদের তরণী ঠেকে
ধরণীর কোণে।

তপস্যা

সূর্য চলেন ধীরে
সন্ন্যাসীবেশে
পশ্চিম নদীতীরে
সন্ধ্যার দেশে
বনপথে প্রান্তরে
লুণ্ঠিত করি
গৈরিক গোধূলির
ম্লান উত্তরী।
পিঠে লুটে পিঙ্গল
মেঘ জটাজুট,
শূন্যে চূর্ণ হ'ল
স্বর্ণমুকুট।

অন্তিম আলো তাঁর
ওই তো হারায়
রক্তিম গগনের
শেষ কিনারায়—
সুদূর বনান্তের
অঞ্জলি-'পরে
দক্ষিণা দিয়ে যান
দক্ষিণ করে।
ক্লান্ত পক্ষীদল
গান নাহি গায়,
নীড়ে-ফেরা কাক শুধু
ডাক দিয়ে যায়।
রজনীগন্ধা শুধু
রচে উপহার
যাত্রার পথে আনি
অর্ঘ্য তাহার।

অন্ধকারের গুহা
সংগীতহীন,
হে তাপস, লীলা তব
সেথা হ'ল লীন।
নিঃস্ব তিমিরঘন
এই সন্ধ্যায়
জানি না বসিবে তুমি
কী তপস্যায়।

রাত্রি হইবে শেষ,
উষা আসি ধীরে
দ্বার খুলি দিবে তব
ধ্যানমন্দিরে।
জাগিবে শক্তি তব
নব উৎসবে,
রিক্ত করিল যাহা
পূর্ণ তা হবে।
ডুবায়ে তিমিরতলে
পুরাতন দিন
হে রবি, করিবে তারে
নিত্য নবীন।

উড়ো জাহাজ

ওরে যন্ত্রের পাখি,
ওরে রে আগুন-খাকী,
একি ডানা মেলি আকাশেতে এলি,
কোন্ নামে তোরে ডাকি?

কোন্ রাক্ষসে চিলে
কী বিকট হাড়গিলে
পেড়েছিল ডিম প্রকাণ্ড ভীম,
তোরে সে জন্ম দিলে।

কোন্ বটে, কোন্ শালে,
কোন্ সে লোহার ডালে,
কিরকম গাছে তোর বাসা আছে
দেখি নি তো কোনো কালে।

যখন ভ্রমণ করো
গান কেন নাহি ধরো—
কোন্ ভূতে হায় চাবুক কষায়,
গোঁ গোঁ ক'রে ক'রে মরো।

তোমার ও দুটো ডানা
মানুষের পোষ-মানা—
কলের খাঁচায় তোমারে নাচায়,
তুমি বোবা, তুমি কানা।

হায় রে এ কি অদৃষ্ট,
কিছুই তো নহে মিষ্ট—
মানুষের সাথ থাকো দিন রাত,
নাহি বল রাধাকৃষ্ট।

যত হও নাকো বড়ো,
দাঁত করো কড়োমড়ো—
তবু ভয়ে তোর লাগিবে না ঘোর,
হব নাকো জড়োসড়ো।

মানুষেরে পিঠে ধরি
ঘোরো দিবা-বিভাবরী—
আমরা দোয়েল পাপিয়া কোয়েল
দূর হতে গড় করি।

ছবি-আঁকিয়ে

ছেঁড়াখোঁড়া মোর পুরোনো খাতায়
ছবি আঁকি আমি যা আসে মাথায়
যক্ষনি ছুটি পাই।
বঙ্কিম মামা বুঝিতে পারে না—
বলে যে, কিছুই যায় না তো চেনা;
বলে, কী হয়েছে, ছাই!

আমি বলি তারে, এই তো ভালুক,
এই দেখো কালো বাঁদরের মুখ,
এই দেখো লাল ঘোড়া—
রাজপুত্তুর কাল ভোর হলে
দণ্ডক বনে যাবেন যে চ'লে—
রথে হবে ওরে জোড়া।
উঁচু হয়ে আছে এই-যে পাহাড়,
খোঁচা খোঁচা গায়ে ওঠে বাঁশ-ঝাড়,
হেথা সিংহের বাসা।
এঁকে বেঁকে দেখো এই নদী চলে,
নৌকো এঁকেছি ভেসে যায় জলে,
ডাঙা দিয়ে যায় চাষা।

ঘাট থেকে জল এনেছে ঘড়ায়—
শিবুঠাকুরের রান্না চড়ায়
তিন কন্যা যে এই।
সাদা কাগজের চর করে ধু ধু,
সাদা হাঁস দুটো ব'সে আছে শুধু,
কেউ কোথাও নেই।
গোল ক'রে আঁকা এই দেখো দিখি,
সূর্যের ছবি ঠিক হয় নি কি,
মেঘ এই দাগ যত।
শুধু কালি লেপা দেখিছ এ পাতে—
আঁধার হয়েছে এইখানটাতে,
ঠিক সন্ধ্যার মতো।
আমি তো পষ্ট দেখি সব-কিছু—
শালবন দেখো এই উঁচুনিচু,
মাছগুলো দেখো জলে।

'ছবি দেখিতে কি পায় সব লোকে—
দোষ আছে তোর মামারই দু চোখে'
বাবা এই কথা বলে।

চিত্রকূট

একটুখানি জায়গা ছিল
রান্নাঘরের পাশে,
সেইখানে মোর খেলা হ'ত
শুকনো-পারা ঘাসে।
একটা ছিল ছাইয়ের গাদা
মস্ত ঢিবির মতো,
পোড়া কয়লা দিয়ে দিয়ে
সাজিয়েছিলেম কত।
কেউ জানে না সেইটে আমার
পাহাড় মিছিমিছি,
তারই তলায় পুঁতেছিলেম
একটি তেঁতুল-বিচি।
জন্মদিনের ঘটা ছিল,
ছয় বছরের ছেলে—
সেদিন দিল আমার গাছে
প্রথম পাতা মেলে।

চার দিকে তার পাঁচিল দিলেম
কেরোসিনের টিনে,
সকাল বিকাল জল দিয়েছি
দিনের পরে দিনে।
জল-খাবারের অংশ আমার
এনে দিতেম তাকে,
কিন্তু তাহার অনেকখানিই
লুকিয়ে খেত কাকে।
দুধ যা বাকি থাকত দিতেম
জানত না কেউ সে তো—
পিঁপড়ে খেত কিছুটা তার,
গাছ কিছু বা খেত।

চিকন পাতায় ছেয়ে গেল,
ডাল দিল সে পেতে—
মাথায় আমার সমান হল
দুই বছর না যেতে।
একটি মাত্র গাছ সে আমার
একটুকু সেই কোণ,
চিত্রকূটের পাহাড়-তলায়
সেই হল মোর বন।
কেউ জানে না সেথায় থাকেন
অষ্টাবক্র মুনি—
মাটির 'পরে দাড়ি গড়ায়,
কথা কন না উনি।
রাত্রে শুয়ে বিছানাতে
শুনতে পেতেম কানে
রাক্ষসেরা পেঁচার মতো
চেঁচাত সেইখানে।

নয় বছরের জন্মদিনে
তার তলে শেষ খেলা,
ডালে দিলুম ফুলের মালা
সেদিন সকাল-বেলা।
বাবা গেলেন মুন্‌শিগঞ্জে
রানাঘাটের থেকে,
কোল্‌কাতাতে আমায় দিলেন
পিসির কাছে রেখে।

রাত্রে যখন শুই বিছানায়
পড়ে আমার মনে
সেই তেঁতুলের গাছটি আমার
আঁস্তাকুড়ের কোণে।
আর সেখানে নেই তপোবন,
বয় না সুরধুনী—
অনেক দূরে চ'লে গেছেন
অষ্টাবক্র মুনি।

চলন্ত কলিকাতা

ইঁটের টোপর মাথায় পরা
শহর কলিকাতা
অটল হয়ে ব'সে আছে,
ইঁটের আসন পাতা।
ফাল্গুনে বয় বসন্তবায়,
না দেয় তারে নাড়া।
বৈশাখেতে ঝড়ের দিনে
ভিত রহে তার খাড়া।
শীতের হাওয়ায় থামগুলোতে
একটু না দেয় কাঁপন।
শীত বসন্তে সমান ভাবে
করে ঋতুযাপন।

অনেক দিনের কথা হ'ল
স্বপ্নে দেখেছিনু
হঠাৎ যেন চেঁচিয়ে উঠে
বললে আমায় বিনু
'চেয়ে দেখো', ছুটে দেখি
চৌকিখানা ছেড়ে—
কোল্‌কাতাটা চ'লে বেড়ায়
ইঁটের শরীর নেড়ে।
উঁচু ছাদে নিচু ছাদে
পাঁচিল-দেওয়া ছাদে
আকাশ যেন সওয়ার হ'য়ে
চড়েছে তার কাঁধে।
রাস্তা গলি যাচ্ছে চলি
অজগরের দল,

ট্র্যাম-গাড়ি তার পিঠে চেপে
করছে টলোমল।
দোকান বাজার ওঠে নামে
যেন ঝড়ের তরী,
চউরঙ্গীর মাঠখানা ওই
যাচ্ছে সরি সরি।
মনুমেন্টে লেগেছে দোল,
উল্‌টিয়ে বা ফেলে—
খ্যাপা হাতির শুঁড়ের মতো
ডাইনে বাঁয়ে হেলে।

ইস্কুলেতে ছেলেরা সব
করতেছে হৈ হৈ,
অঙ্কের বই নৃত্য করে
ব্যাকরণের বই।
মেঝের 'পরে গড়িয়ে বেড়ায়
ইংরেজি বইখানা,
ম্যাপগুলো সব পাখির মতো
ঝাপটি মারে ডানা।
ঘণ্টাখানা দুলে দুলে
ঢঙ্ ঢঙা ঢঙ্ বাজে—
দিন চ'লে যায়, কিছুতে সে
থামতে পারে না যে।
রান্নাঘরে কেঁদে বলে
রান্নাঘরের ঝি,
'লাউ কুম্‌ড়ো দৌড়ে বেড়ায়,
আমি করব কী!'

হাজার হাজার মানুষ চেঁচায়
'আরে, থামো থামো—
কোথা যেতে কোথায় যাবে,
কেমন এ পাগ্‌লামো!'
'আরে আরে, চলল কোথায়'
হাব্‌ড়ার ব্রিজ বলে,
'একটুকু আর নড়লে আমি
পড়ব খ'সে জলে।'
বড়োবাজার মেছোবাজার
চিনেবাজার থেকে—

'স্থির হয়ে রও' 'স্থির হয়ে রও'
বলে সবাই হেঁকে।
আমি ভাবছি যাক-না কেন,
ভাব্‌না কিছুই নাই—
কোল্‌কাতা নয় দিল্লি যাবে
কিম্বা সে বোম্বাই।

হঠাৎ কিসের আওয়াজ হ'ল,
তন্দ্রা ভেঙে যায়—
তাকিয়ে দেখি কোল্‌কাতা সেই
আছে কোল্‌কাতায়।

হনুচরিত

হনু বলে, তুলব আমি গন্ধমাদন,
অসাধ্য যা তাই জগতে করব সাধন।
এই ব'লে তার প্রকাণ্ড কায় উঠল ফুলে।

মাথাটা তার কোথায় গিয়ে ঠেকল মেঘে,
শালের গুঁড়ি ভাঙল পায়ের ধাক্কা লেগে,
দশটা পাহাড় ঢাকল তাহার দশ আঙুলে।
পড়ল বিপুল দেহের ছায়া যে দিক বাগে
দুপুর-বেলায় সেথায় যেন সন্ধ্যা লাগে,
গোরু যত মাঠ ছেড়ে সব গোষ্ঠে ছোটে।
সেই দিকেতে সূর্যহারা আকাশ-তলে
দিন না যেতেই অন্ধকারের তারা জ্বলে,
শেয়ালগুলো হুক্কাহুয়া চেঁচিয়ে ওঠে।
লেজ বেড়ে যায় হু হু ক'রে এঁকে বেঁকে,
লেজের মধ্যে বন্যা নামল কোথা থেকে,
নগর পল্লী তলায় তাহার চাপা পড়ে।
হঠাৎ কখন্‌ মস্ত মোটা লেজের বাধায়
নদীর স্রোতের মধ্যখানে বাঁধ বেঁধে যায়,
উপড়ে পড়ে দেবদারুবন লেজের ঝড়ে।
লেজের পাকে পাহাড়টাকে দিল মোড়া,
ঝেঁকে ঝেঁকে উঠল কেঁপে আগাগোড়া,
দুড়্‌দাড়িয়ে পাথর পড়ে খ'সে খ'সে।

গিরির চূড়া এক পাশেতে পড়ল ঝুঁকি,
অরণ্যে হয় গাছে গাছে ঠোকাঠুকি,
আগুন লাগে শাখায় শাখায় ঘ'ষে ঘ'ষে।
পক্ষী সবে আর্তরবে বেড়ায় উড়ে,
বাঘ-ভালুকের ছুটোছুটি পাহাড় জুড়ে,
ঝর্নাধারা ছড়িয়ে গেল ঝর্‌ঝরিয়ে।
উপুড় হয়ে গন্ধমাদন পড়ল লুটে,
বসুন্ধরার পাষাণ-বাঁধন যায় রে টুটে।
ভীষণ শব্দে দিগ্‌দিগন্ত থর্‌থরিয়ে
ঘূর্ণিধুলা নৃত্য করে অম্বরেতে,
ঝঞ্ঝাহাওয়া হুংকারিয়া বেড়ায় মেতে,
ধূসর রাত্রি লাগল যেন দিগ্‌বিদিকে।

গন্ধমাদন উড়ল হনুর পৃষ্ঠে চেপে,
লাগল হনুর লেজের ঝাপট আকাশ ব্যেপে—
অন্ধকারে দন্ত তাহার ঝিকিমিকে।

পাঙ্‌চুয়াল

গতকাল পাঁচটায়
তেলে ভেজে মাছটায়
বাবু রেখেছিল পাতে,
ছিল সাথে ছেঁচ্‌কি।
নেয়ে এসে দেখে চেয়ে
বিড়ালে গিয়েছে খেয়ে—
চোঁ চোঁ করে ওঠে পেট
আর ওঠে হেঁচ্‌কি।
মহা রোষে তিনুরায়
যেতে চায় আগ্‌রায়,
পাঁজিতে রয়েছে লেখা
দিন আছে কল্য।
রান্না চড়াতে গেলে
পাছে ট্রেন নাই মেলে
ভোরে উঠে তাই আজ
হাওড়ায় চলল।

পাড়ুচুয়াল্

গত কাল সাঁঝটায়
তেল ভেজে মাছটায়
বাবু রেখেছিল পাতে
ছিল সাথে ছেঁচকি।
নেয়ে এসে দেখে হায়
বিড়ালে গিয়েছে খেয়ে
চোঁ চোঁ করে ওঠে পেট
ভাত ওরে ছেঁচকি।
মহা রাগে তিনু ভায়
যেতে চায় ভাটিয়ায়,
পাঁজিতে রয়েছে লেখা
দিন আছে কল্য।
রান্না চড়াতে গেলে
পাছে ট্রেন নাহি মেলে
ভোরে উঠে তাই আজ
হাওড়ায় চলল॥

৬।১।৩৮

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

রূপান্তর

বেদ : সংহিতা ও উপনিষৎ

১

পিতা নোঽসি
পিতা নো বোধি
নমস্তেঽস্তু
মা মা হিংসীঃ।
—শুক্লযজুর্বেদ, ৩৭ . ২০

বিশ্বানি দেব সবিতর্দুরিতানি পরাসুব
যদ্ভদ্রং তন্ন আসুব॥
—শুক্লযজুর্বেদ, ৩০. ৩

নমঃ শম্ভবায় চ ময়োভবায় চ
নমঃ শংকরায় চ ময়স্করায় চ
নমঃ শিবায় চ শিবতরায় চ॥
—শুক্লযজুর্বেদ, ১৬ . ৪১

তুমি আমাদের পিতা,
তোমায় পিতা বলে যেন জানি,
তোমায় নত হয়ে যেন মানি,
তুমি কোরো না কোরো না রোষ।
হে পিতা, হে দেব, দূর করে দাও
যত পাপ যত দোষ—
যাহা ভালো তাই দাও আমাদের
যাহাতে তোমার তোষ।
তোমা হতে সব সুখ হে পিতা,
তোমা হতে সব ভালো—
তোমাতেই সব সুখ হে পিতা,
তোমাতেই সব ভালো।
তুমিই ভালো হে, তুমিই ভালো,
সকল ভালোর সার—
তোমারে নমস্কার হে পিতা,
তোমারে নমস্কার!

২

যো দেবোঽগ্নৌ যোঽপ্সু
যো বিশ্বং ভুবনমাবিবেশ।
য ওষধীষু যো বনস্পতিষু
তস্মৈ দেবায় নমো নমঃ॥

—শ্বেতাশ্বতর উপনিষৎ, ২. ১৭

যিনি অগ্নিতে যিনি জলে,
যিনি সকল ভুবনতলে,
যিনি বৃক্ষে যিনি শস্যে,
তাঁহারে নমস্কার—
তাঁরে নমি নমি বার বার।

৩

ভূর্ভুবঃ স্বঃ তৎ সবিতুর্বরেণ্যং
ভর্গো দেবস্য ধীমহি
ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ॥

—শুক্লযজুর্বেদ, ৩৬. ৩

যাঁ হতে বাহিরে ছড়ায়ে পড়িছে
পৃথিবী আকাশ তারা,
যাঁ হতে আমার অন্তরে আসে
বুদ্ধি চেতনা ধারা—
তাঁরি পূজনীয় অসীম শক্তি
ধ্যান করি আমি লইয়া ভক্তি।

৪

সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম।

—তৈত্তিরীয় উপনিষৎ, ২. ১. ১

আনন্দরূপমমৃতং যদ্‌বিভাতি।

—মুণ্ডক, ২. ২. ৭

শান্তং শিবমদ্বৈতম্।

—মাণ্ডুক্য, ৭

সত্য রূপেতে আছেন সকল ঠাঁই,
জ্ঞান রূপে তাঁর কিছু অগোচর নাই,
দেশে কালে তিনি অন্তহীন অগম্য—
  তিনিই ব্রহ্ম, তিনিই পরম ব্রহ্ম।

তাঁরই আনন্দ দিকে দিকে দেশে দেশে
প্রকাশ পেতেছে কত রূপে কত বেশে—
  তিনি প্রশান্ত, তিনি কল্যাণহেতু,
তিনি এক, তিনি সবার মিলনসেতু।

৫

য আত্মদা বলদা যস্য বিশ্ব উপাসতে প্রশিষং যস্য দেবাঃ।
যস্য ছায়ামৃতং যস্য মৃত্যুঃ কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম॥

যঃ প্রাণতো নিমিষতো মহিত্বৈক ইদ্রাজা জগতো বভূব।
য ঈশে অস্য দ্বিপদশ্চতুষ্পদঃ কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম॥

যস্যেমে হিমবন্তো মহিত্বা যস্য সমুদ্রং রসয়া সহাহুঃ।
যস্যেমাঃ প্রদিশো যস্য বাহূ কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম॥

যেন দ্যৌরুগ্রা পৃথিবী চ দৃল্‌হা যেন স্বঃ স্তভিতং যেন নাকঃ।
যো অন্তরিক্ষে রজসো বিমানঃ কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম॥

যং ক্রন্দসী অবসা তস্তভানে অভ্যৈক্ষেতাং মনসা রেজমানে।
যত্রাধি সূর উদিতো বিভাতি কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম॥

মা নো হিংসীজ্জনিতা যঃ পৃথিব্যা যো বা দিবং সত্যধর্মা জজান।
যশ্চাপশ্চন্দ্রা বৃহতীর্জজান কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম॥

—ঋগ্‌বেদ, ১০. ১২১. ২-৬. ৯

আপনারে দেন যিনি,
  সদা যিনি দিতেছেন বল,
বিশ্ব যাঁর পূজা করে,
  পূজে যাঁরে দেবতা সকল,

অমৃত যাঁহার ছায়া,
যাঁর ছায়া মহান্ মরণ,
সেই কোন্ দেবতারে
হবি মোরা করি সমর্পণ!

যিনি মহামহিমায়
জগতের একমাত্র পতি,
দেহবান্ প্রাণবান্
সকলের একমাত্র গতি,
যেথা যত জীব আছে
বহিতেছে যাঁহার শাসন,
সেই কোন্ দেবতারে
হবি মোরা করি সমর্পণ!

এই-সব হিমবান্
শৈলমালা মহিমা যাঁহার,
মহিমা যাঁহার এই
নদী-সাথে মহাপারাবার,
দশ দিক যাঁর বাহু
নিখিলেরে করিছে ধারণ,
সেই কোন্ দেবতারে
হবি মোরা করি সমর্পণ!

দ্যুলোক যাঁহাতে দীপ্ত,
যাঁর বলে দৃঢ় ধরাতল,
স্বর্গলোক সুরলোক
যাঁর মাঝে রয়েছে অটল,
শূন্য অন্তরীক্ষে যিনি
মেঘরাশি করেন সৃজন,
সেই কোন্ দেবতারে
হবি মোরা করি সমর্পণ!

দ্যুলোক ভূলোক এই
যাঁর তেজে স্তব্ধ জ্যোতির্ময়
নিরন্তর যাঁর পানে
একমনে তাকাইয়া রয়,
যাঁর মাঝে সূর্য উঠি
কিরণ করিছে বিকিরণ,

সেই কোন্ দেবতারে
হবি মোরা করি সমর্পণ!

সত্যধর্মা দ্যুলোকের
পৃথিবীর যিনি জনয়িতা,
মোদের বিনাশ তিনি
না করুন, না করুন পিতা!
যাঁর জলধারা সদা
আনন্দ করিছে বরিষন,
সেই কোন্ দেবতারে
হবি মোরা করি সমর্পণ!

পাঠান্তর

আত্মদা বলদা যিনি ; সর্ব বিশ্ব সকল দেবতা
বহিছে শাসন যাঁর ; মৃত্যু ও অমৃত যাঁর ছায়া ;
আর কোন্ দেবতারে দিব মোরা হবি?

যিনি স্বীয় মহিমায় বিরাজেন একমাত্র রাজা
প্রাণবান্ জগতের, চতুষ্পদ দ্বিপদ প্রাণীর ;
আর কোন্ দেবতারে দিব মোরা হবি?

এই হিমবন্ত গিরি, নদীসহ এই অম্বুনিধি
বিশাল মহিমা যাঁর ; এই সর্ব দিক্ যাঁর বাহু ;
আর কোন্ দেবতারে দিব মোরা হবি?

যাঁর দ্বারা দীপ্ত এই দ্যুলোক, পৃথিবী দৃঢ়তর ;
যিনি স্থাপিলেন স্বর্গ, অন্তরীক্ষে রচিলেন মেঘ ;
আর কোন্ দেবতারে দিব মোরা হবি?

মহাশক্তি-প্রতিষ্ঠিত দীপ্যমান দ্যুলোক ভূলোক
যাঁরে করে নিরীক্ষণ ; সূর্য যাঁহে লভিছে প্রকাশ ;
আর কোন্ দেবতারে দিব মোরা হবি?

যিনি সত্যধর্মা, যিনি স্বর্গ পৃথিবীর জনয়িতা,
আমাদের না করুন নাশ! স্রষ্টা যিনি মহাসমুদ্রের ;
আর কোন্ দেবতারে দিব মোরা হবি?

৬

যদেমি প্রস্ফুরন্নিব দৃতি র্ন ধ্মাতো অদ্রিবঃ।
মৃড়া সুক্ষত্র মৃড়য়।।
ক্রত্বঃ সমহ্ দীনতা প্রতীপং জগমা শুচে।
মৃড়া সুক্ষত্র মৃড়য়।।
অপাং মধ্যে তস্থিবাংসং তৃষ্ণাবিদজ্জরিতারম্।
মৃড়া সুক্ষত্র মৃড়য়।।

—ঋগ্‌বেদ, ৭. ৮৯. ২-৪

যদি ঝড়ের মেঘের মতো আমি ধাই
চঞ্চল-অন্তর
তবে দয়া কোরো হে, দয়া কোরো হে,
দয়া কোরো ঈশ্বর।
ওহে অপাপপুরুষ, দীনহীন আমি
এসেছি পাপের কূলে—
প্রভু দয়া কোরো হে, দয়া কোরো হে,
দয়া করে লও তুলে।
আমি জলের মাঝারে বাস করি তবু
তৃষায় শুকায়ে মরি—
প্রভু দয়া কোরো হে, দয়া করে দাও
হৃদয় সুধায় ভরি।।

৭

যৎ কিং চেদং বরুণ দৈব্যে
জনেহভিদ্রোহং মনুষ্যাশ্চরামসি।
অচিত্তী যত্তব ধর্মা যুযোপিম
মা নস্তস্মাদেনসো দেব রীরিষঃ।।

—ঋগ্‌বেদ, ৭. ৮৯. ৫

হে বরুণদেব,
মানুষ আমরা দেবতার কাছে
যদি থাকি পাপ ক'রে,
লঙ্ঘন করি তোমার ধর্ম
যদি অজ্ঞানঘোরে—
ক্ষমা কোরো তবে, ক্ষমা কোরো হে,
বিনাশ কোরো না মোরে।

৮

অপো সু ম্যক্ষ বরুণ ভিয়সং
মৎসম্রাড়ৃতা বোহনু মা গৃভায়।
দামেব বৎসাদ্বি মুমুগ্‌ধ্যংহো
নহি ত্বদারে নিমিশশ্চনেশে ॥

মা নো বধৈর্বরুণ যে ত ইষ্টা-
বেনঃ কৃণ্বন্তমসুর ভ্রীণন্তি।
মা জ্যোতিষঃ প্রবসথানি গন্ম
বি ষূ মৃধঃ শিশ্রথো জীবসে নঃ ॥

নমঃ পুরা তে বরুণোত নূনম্‌
উতাপরং তু বিজাত ব্রবাম।
ত্বে হি কং পর্বতে শ্রিতান্য-
প্রচ্যুতানি দূলভ ব্রতানি ॥

পর ঋণা সাবীরধ মৎকৃতানি
মাহং রাজন্নন্যকৃতেন ভোজম্‌।
অব্যুষ্টা ইন্নু ভূয়সীরুষাস
আ নো জীবান্‌ বরুণ তাসু শাধি ॥

—ঋগ্বেদ. ২. ২৮. ৬-৯

হে বরুণ, তুমি দূর করো হে, দূর করো মোর ভয়—
ওহে ঋতবান্‌, ওহে সম্রাট্‌, মোরে যেন দয়া হয়।
বাঁধন-ঘুচানো বৎসের মতো ঘুচাও পাপের দায়—
তুমি না রহিলে একটি নিমেষও কেহ কি রক্ষা পায়!

বিদ্রোহী যারা তাদের, হে দেব, যে দণ্ড কর দান—
আমার উপরে, হে বরুণ, তুমি হানিয়ো না সেই বাণ।
জ্যোতি হতে মোরে দূরে পাঠায়ো না, রাখো রাখো মোর প্রাণ।

তব গুণ আমি গেয়েছি নিয়ত, আজও করি তব গান—
আগামী কালেও, সর্বপ্রকাশ, গাব আমি তব গান।
হে অপরাজিত, যত সনাতন বিধান তোমার কৃত
স্খলনবিহীন রয়েছে অটল পর্বতে-আশ্রিত।

ওহে মহারাজ, দূর করে দাও নিজে করেছি যে পাপ!
অন্যের কৃত পাপফল যেন আমারে না দেয় তাপ!
বহু উষা আজও হয় নি উদিত, সে-সব উষার মাঝে
আমার জীবন করিয়া পালন লাগাও তোমার কাজে ॥

৯

তমীশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরং
তং দেবতানাং পরমং চ দৈবতম্।
পতিং পতীনাং পরমং পরস্তাদ্
বিদাম দেবং ভুবনেশমীড্যম্ ॥

ন তস্য কার্যং করণং চ বিদ্যতে
ন তৎসমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে।
পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে
স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ ॥

ন তস্য কশ্চিৎ পতিরস্তি লোকে
ন চেশিতা নৈব চ তস্য লিঙ্গম্।
স কারণং করণাধিপাধিপো
ন চাস্য কশ্চিজ্জনিতা ন চাধিপঃ ॥
—শ্বেতাশ্বতর উপনিষৎ ৬. ৭-৯

এষ দেবো বিশ্বকর্মা মহাত্মা
সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ।
হৃদা মনীষা মনসাভিকৢপ্তো
য এতদ্‌বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি ॥
—শ্বেতাশ্বতর উপনিষৎ ৪. ১৭

সকল ঈশ্বরের পরমেশ্বর,
সব দেবতার পরমদেব,
সকল পতির পরমপতি,
সব পরমের পরাৎপর।
তাঁরে জানি তিনি নিখিলপূজ্য
তিনি ভুবনেশ্বর।

কর্ম-বাঁধনে নহেন বাঁধা,
বাঁধে না তাঁহারে দেহ—
সমান তাঁহার কেহ না, তাঁ হতে
বড়ো নাই নাই কেহ।
তাঁর বিচিত্র পরমাশক্তি
প্রকাশে জলে স্থলে—
তাঁহার জ্ঞানের বলের ক্রিয়া
আপনা-আপনি চলে।

জগতে তাঁহার পতি নাই কেহ,
কলেবর নাই কভু—
তিনিই কারণ, মনের চালন—
নাই পিতা, নাই প্রভু।

ইনি দেব ইনি মহান্ আত্মা
আছেন বিশ্বকাজে,
সকল জনের হৃদয়ে হৃদয়ে
ইঁহারই আসন রাজে।
সংশয়হীন বোধের বিকাশে
ইঁহাকে জানেন যাঁরা
জগতে অমর তাঁরা।

১০

স পর্যগাচ্ছুক্রমকায়মব্রণমস্নাবিরং শুদ্ধমপাপবিদ্ধম্।
কবির্মনীষী পরিভূঃ স্বয়ম্ভূর্যাথাতথ্যাতোহর্থান্
ব্যদধাৎ শাশ্বতীভ্যঃ সমাভ্যঃ ॥

—ঈশোপনিষৎ, ৮

শুভ্র কায়াহীন নির্বিকার
নাহি তাঁর আশ্রয় আধার—
তিনি শুদ্ধ, পাপ তাঁহে নাই।
তিনি বিরাজেন সর্ব ঠাঁই।
তিনি কবি বিশ্বরচনের,
তিনি পতি মানবমনের,
তিনি প্রভু নিখিল জনার—
আপনিই প্রভু আপনার।

বাধাহীন বিধান তাঁহার
চলিছে অনন্তকাল ধরি,
প্রয়োজন যতটুকু যার
সকলই উঠিছে ভরি ভরি।

১১

অভয়ং নঃ করত্যন্তরিক্ষ-
মভয়ং দ্যাবাপৃথিবী উভে ইমে।
অভয়ং পশ্চাদভয়ং পুরস্তা-
দুত্তরাদধরাদভয়ং নো অস্তু ॥

অভয়ং মিত্রাদভয়মমিত্রা-
দভয়ং জ্ঞাতাদভয়ং পরোক্ষাৎ।
অভয়ং নক্তমভয়ং দিবা নঃ
সর্বা আশা মম মিত্রং ভবন্তু ॥

—অথর্ববেদ, ১৯. ১৫. ৫-৬

অন্তরীক্ষ আমাদের হউক অভয়,
দ্যুলোক ভূলোক উভে হউক অভয়।
পশ্চাৎ অভয় হোক সম্মুখ অভয়,
উর্ধ্ব নিম্ন আমাদের হউক অভয়।
বান্ধব অভয় হোক শত্রুও অভয়,
জ্ঞাত যা অভয় হোক অজ্ঞাত অভয়।
রজনী অভয় হোক দিবস অভয়,
সর্বদিক আমাদের মিত্র যেন হয়।

১২

শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রা
আ যে ধামানি দিব্যানি তস্থূ ॥

—শ্বেতাশ্বতর উপনিষৎ, ২. ৫

বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তম্
আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।
তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি
নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায় ॥

—শ্বেতাশ্বতর উপনিষৎ, ৩. ৮

শোনো বিশ্বজন,
শোনো অমৃতের পুত্র যত দেবগণ
দিব্যধামবাসী, আমি জেনেছি তাঁহারে
মহান্ত পুরুষ যিনি আঁধারের পারে
জ্যোতির্ময়। তাঁরে জেনে তাঁর পানে চাহি
মৃত্যুরে লঙ্ঘিতে পারো; অন্য পথ নাহি।

১৩

সত্যকামোঽজাবালো জবালাং মাতরমামন্ত্রয়াঞ্চক্রে
ব্রহ্মচর্যং ভবতি বিবৎস্যামি কিংগোত্রোঽন্বহমস্মীতি।
সা হৈনমুবাচ নাহমেতদ্ বেদ তাত যদ্‌গোত্রস্ত্বমসি
বহ্বহং চরন্তী পরিচারিণী যৌবনে ত্বামলভে
সাহমেতন্ন বেদ যদ্‌গোত্রস্ত্বমসি
জবালা তু নামাহমস্মি সত্যকামো নাম ত্বমসি
স সত্যকাম এব জাবালো ব্রুবীথা ইতি।

স হ হারিদ্রুমতং গৌতমমেত্যোবাচ
ব্রহ্মচর্যং ভগবতি বৎস্যাম্যুপেয়াং ভগবন্তমিতি।
তং হোবাচ কিং গোত্রো নু সোম্যাসীতি।
স হোবাচ নাহমেতদ্ বেদ ভো যদ্‌গোত্রোঽহমস্মি
অপৃচ্ছং মাতরং
সা মা প্রত্যব্রবীদ্ বহ্বহং চরন্তী পরিচারিণী যৌবনে ত্বামলভে
সাহমেতন্ন বেদ যদ্‌গোত্রস্ত্বমসি
জবালা তু নামাহমস্মি সত্যকামো নাম ত্বমসীতি সোঽহং
সত্যকামো জাবালোঽস্মি ভো ইতি।
তং হোবাচ নৈতদব্রাহ্মণো বিবক্তুমর্হতি
সমিধং সোম্যাহরোপ ত্বা নেষ্যে
ন সত্যাদগা ইতি।

—ছান্দোগ্যোপনিষৎ, ৪. ৪

সত্যকাম জাবাল মাতা জবালাকে বললেন,
  'ব্রহ্মচর্য গ্রহণ করব, কী গোত্র আমার?'
তিনি বললেন, 'জানি নে, তাত, কী গোত্র তুমি।

যৌবনে বহুপরিচর্যাকালে তোমাকে পেয়েছি;
তাই জানি নে তোমার গোত্র।
জবালা আমার নাম, তোমার নাম সত্যকাম,
তাই বোলো তুমি সত্যকাম জাবাল।'

সত্যকাম বললে হারিদ্রুমত গৌতমকে,
'ভগবন্, আমাকে ব্রহ্মচর্যে উপনীত করুন।'
তিনি বললেন, 'সৌম্য, কী গোত্র তুমি?'
সে বললে, 'আমি তা জানি নে।
মাকে জিজ্ঞাসা করেছি আমার গোত্র কী।
তিনি বলেছেন— যৌবনে যখন বহুপরিচারিণী ছিলেম
তোমাকে পেয়েছি।
আমার নাম জবালা, তোমার নাম সত্যকাম,
বোলো আমি সত্যকাম জাবাল।'

তিনি তখন বললেন, 'এমন কথা অব্রাহ্মণ বলতে পারে না।
সত্য থেকে নেমে যাও নি তুমি।
সমিধ আহরণ করো সৌম্য, তোমাকে উপনীত করি।'

১৪

মা মিৎ কিল ত্বং বনাঃ শাখাং মধুমতীমিব।

—অথর্ববেদ, ১. ৩৪. ৪

যথা সুপর্ণঃ প্রপতন্ পক্ষৌ নিহন্তি ভূম্যাম্
এবা নি হন্মি তে মনঃ।

—অথর্ববেদ, ৬. ৮. ২

ফুল্ল শাখা যেমন মধুমতী
মধুরা হও তেমনি মোর প্রতি।
বিহঙ্গ যথা উড়িবার মুখে
পাখায় ভূমিরে হানে,
তেমনি আমার অন্তরবেগ
লাগুক তোমার প্রাণে।

১৫

যথেমে দ্যাবাপৃথিবী সদ্যঃ পর্যেতি সূর্যঃ
এবা পর্যেমি তে মনঃ।

—অথর্ববেদ. ৬, ৮, ৩

আকাশ-ধরা রবিরে ঘেরি
যেমন করি ফেরে,
আমার মন ঘিরিবে ফিরি
তোমার হৃদয়েরে।

১৬

অক্ষ্যৌ নৌ মধুসংকাশে অনীকং নৌ সমঞ্জনম্।
অন্তঃ কৃণুষ্ব মাং হৃদি মন ইন্নৌ সহাসতি।

—অথর্ববেদ, ৭. ৩৬. ১

আমাদের আঁখি হোক মধুসিক্ত,
অপাঙ্গ হয় যেন প্রেমে লিপ্ত।
হৃদয়ের ব্যবধান হোক মুক্ত,
আমাদের মন হোক যোগযুক্ত।

১৭

অহমস্মি সহমানাথো ত্বমসি সাসহিঃ।...
মামনু প্র তে মনঃ...
পথা বারিব ধাবতু ॥

—অথর্ববেদ, ৩. ১৮. ৫-৬

যেমন আমি
সর্বসহা শক্তিমতী,
তেমনি হও
সর্বসহ আমার প্রতি।
আপন পথে
যেমন হয় জলের গতি,
তোমার মন
আসুক ধেয়ে আমার প্রতি।

ধম্মপদ

যমকবগ্‌গো

মনোপুব্বঙ্গমা ধম্মা মনোসেট্‌ঠা মনোময়া।
মনসা চে পদুট্‌ঠেন ভাসতি বা করোতি বা।
ততো নং দুক্‌খমন্বেতি চক্কং ব বহতো পদং॥ ১

মনোপুব্বঙ্গমা ধম্মা মনোসেট্‌ঠা মনোময়া।
মনসা চে পসন্নেন ভাসতি বা করোতি বা।
ততো নং সুখমন্বেতি ছায়া ব অনপায়িনী॥ ২

অক্কোচ্ছি মং অবধি মং অজিনি মং অহাসি মে।
যে চ তং উপনয্‌হন্তি বেরং তেসং ন সম্মতি॥ ৩

অক্কোচ্ছি মং অবধি মং অজিনি মং অহাসি মে।
যে চ তং নূপনয্‌হন্তি বেরং তেসূপসম্মতি॥ ৪

নহি বেরেন বেরানি সম্মন্তীধ কুদাচনং।
অবেরেন চ সম্মন্তি এস ধম্মো সনন্তনো॥ ৫

পরে চ ন বিজানন্তি ময়মেত্থ যমামসে।
যে চ তত্থ বিজানন্তি ততো সম্মন্তি মেধগা॥ ৬

সুভানুপস্‌সিং বিহরন্তং ইন্দ্রিয়েসু অসংবুতং।
ভোজনম্‌হি অমত্তঞ্‌ঞুং কুসীতং হীনবীরিয়ং।
তং বে পসহতি মারো বাতো রুক্‌খং ব দুব্বলং॥ ৭

অসুভানুপস্‌সিং বিহরন্তং ইন্দ্রিয়েসু সুসংবুতং।
ভোজনম্‌হি চ মত্তঞ্‌ঞুং সদ্ধং আরদ্ধবীরিয়ং।
তং বে নপ্পসহতি মারো বাতো সেলং ব পব্বতং॥ ৮

অনিক্কসাবো কাসাবং যো বত্থং পরিদহেস্‌সতি।
অপেতো দমসচ্চেন ন সো কাসাবমরহতি॥ ৯

যো চ বন্তকসাবস্‌স সীলেসু সুসমাহিতো।
উপেতো দমসচ্চেন স বে কাসাবমরহতি॥ ১০

অসারে সারমতিনো সারে চাসারদস্সিনো।
তে সারং নাধিগচ্ছন্তি মিচ্ছাসঙ্কপ্পগোচরা ॥ ১১

সারঞ্চ সারতো ঞত্বা অসারঞ্চ অসারতো।
তে সারং অধিগচ্ছন্তি সম্মাসঙ্কপ্পগোচরা ॥ ১২

যথাগারং দুচ্ছন্নং বুট্ঠি সমতিবিজ্ঝতি।
এবং অভাবিতং চিত্তং রাগো সমতিবিজ্ঝতি ॥ ১৩

যথাগারং সুচ্ছন্নং বুট্ঠি ন সমতিবিজ্ঝতি।
এবং সুভাবিতং চিত্তং রাগো ন সমতিবিজ্ঝতি ॥ ১৪

ইধ সোচতি পেচ্চ সোচতি পাপকারী উভয়ত্থ সোচতি।
সো সোচতি সো বিহঞ্ঞতি দিস্বা কম্মকিলিট্ঠমত্তনো ॥ ১৫

ইধ মোদতি পেচ্চ মোদতি কতপুঞ্ঞো উভয়ত্থ মোদতি।
সো মোদতি সো পমোদতি দিস্বা কম্মবিসুদ্ধিমত্তনো ॥ ১৬

ইধ তপ্পতি পেচ্চ তপ্পতি পাপকারী উভয়ত্থ তপ্পতি।
পাপং মে কতংতি তপ্পতি ভীয্যো তপ্পতি দুগ্গতিং গতো ॥ ১৭

ইধ নন্দতি পেচ্চ নন্দতি কতপুঞ্ঞো উভয়ত্থ নন্দতি।
পুঞ্ঞং মে কতংতি নন্দতি ভীয্যো নন্দতি সুগ্গতিং গতো ॥ ১৮

বহুম্পি চে সহিতং ভাসমানো ন তক্করো হোতি নরো পমত্তো।
গোপো ব গাবো গণয়ং পরেসং ন ভাগবা সামঞ্ঞস্স হোতি ॥ ১৯

অপ্পম্পি চে সহিতং ভাসমানো ধম্মস্স হোতি অনুধম্মচারী।
রাগঞ্চ দোসঞ্চ পহায় মোহং সম্মপ্পজানো সুবিমুত্তচিত্তো।
অনুপাদিযানো ইধ বা হুরং বা স ভাগবা সামঞ্ঞস্স হোতি ॥ ২০

যুগ্মগাথা

মন আগে ধর্ম পিছে, ধর্মের জনম হল মনে[১]—
দুষ্ট মনে যে মানুষ কাজ করে কিম্বা কথা ভণে[২]
দুঃখ তার পিছে ফিরে চক্র যথা গোরুর পিছনে ॥ ১

মন আগে ধর্ম পিছে, ধর্মের জনম হল মনে—
যে জন প্রসন্ন মনে কাজ করে কিম্বা কথা ভণে
সুখ তার পাছে ফিরে ছায়া যথা কায়ার পিছনে ॥ ২

আমারে রুষিল, আমারে মারিল,
আমারে জিনিল, আমার কাড়িল—
এ কথা যে জনে বেঁধে রাখে মনে
বৈর তাহার কেবলই বাড়িল ॥ ৩

আমারে রুষিল, আমারে মারিল,
আমারে জিনিল, আমার কাড়িল—
এ কথা যে জনে নাহি বাঁধে মনে
বৈর তাহারে ছাড়িল ছাড়িল ॥ ৪

বৈর দিয়ে বৈর কভু শান্ত নাহি হয়,
অবৈরে সে শান্তি লভে এই ধর্মে কয় ॥ ৫

হেথা হতে যেতে হবে আছে কার মনে,
বিবাদ মিটিল তার বুঝিল যে জনে ॥ ৬

শরীরের শোভা খোঁজে ইন্দ্রিয় যাহার অসংযত,
ভোজনে রাখে না মাত্রা বীর্যহীন অলস সতত,
ঝড়ে যথা বৃক্ষ হানে 'মার' তারে মারে সেইমত ॥ ৭

অঙ্গশোভা নাহি খোঁজে ইন্দ্রিয় যাহার সুসংযত,
ভোজনের মাত্রা বোঝে শ্রদ্ধাবান্ কর্মঠ নিয়ত,
মার তারে নাহি মারে ঝড়ে যেন পর্বতের মতো ॥ ৮

দমহীন, সত্যহীন, অন্তরে কামনা,
গেরুয়া কাপড় তার শুধু বিড়ম্বনা ॥ ৯

নিষ্কাম, সুশীল, দম সত্য যার মাঝে
গেরুয়া কাপড় পরা তাহারেই সাজে ॥ ১০

অসারে যে সার মানে সারে যে অসার
মিথ্যা কল্পনায় সার নাহি জোটে তার ॥ ১১

সারকে যে সার বোঝে অসারে অসার
সত্য সংকল্পের কাছে সার মিলে তার ॥ ১২

ভালো ছাওয়া না হইলে বৃষ্টি পড়ে ঘরে,
সতর্ক না হলে মন বাসনায় ধরে ॥ ১৩

ভালো ছাওয়া ঘরে নাহি পড়ে বৃষ্টিকণা,
সতর্ক যে মন তারে কী করে বাসনা ॥ ১৪

হেথা মরে শোকে, সেথা মরে শোকে,
পাপকারী দুখ পায় দুই লোকে—
ব্যথা বাজে তার হেরি আপনার
মলিন কর্ম আপনার চোখে ॥ ১৫

হেথা সুখ তার, সেথা সুখ তার,
দুই লোকে সুখ পুণ্যকর্তার—
সে যে সুখ পায় বহু সুখ পায়
শুদ্ধকর্ম হেরি আপনার ॥ ১৬

হেথা পায় তাপ, সেথা পায় তাপ,
দুই লোকে দহে যে করেছে পাপ।
‘এই মোর পাপ’ এই ব’লে তাপ,
দুর্গতি পেয়ে সেও পরিতাপ ॥ ১৭

হেথা আনন্দ, সেথা আনন্দ,
দুই লোকে সুখী পুণ্যবন্ত।
‘পুণ্য করেছি’ ব’লে আনন্দ,
সুগতি লভিয়া পরমানন্দ ॥ ১৮

যে কহে অনেক শাস্ত্রবচন
কাজে নাহি করে প্রমাদ লাগি—
অপরের গোরু গণিয়া গোয়াল
হয় কি সেজন শ্রেয়ের ভাগী ॥ ১৯

অল্পই কহে শাস্ত্রবাক্য,
ধর্মের পথে করে বিচরণ

রাগ দোষ মোহ করি পরিহার
জ্ঞানসমাপ্ত বিমুক্তমন—
বিষয়বিহীন ইহপরলোকে
কল্যাণভাগী হয় সেইজন ॥ ২০

অপ্পমাদবগ্‌গো

অপ্পমাদো অমতপদং পমাদো মচ্চুনো পদং।
অপ্পমত্তা ন মীয়ন্তি যে পমত্তা যথা মতা ॥ ১

এতং বিসেসতো ঞত্বা অপ্পমাদম্‌হি পণ্ডিতা।
অপ্পমাদে পমোদন্তি অরিয়ানাং গোচরে রতা ॥ ২

তে ঝায়িনো সাততিকা নিচ্চং দল্‌হপরক্কমা।
ফুসন্তি ধীরা নিব্বানং যোগক্‌খেমং অনুত্তরং ॥ ৩

উট্‌ঠানবতো সতিমতো সুচিকম্মস্‌স নিসম্মকারিনো।
সঞ্‌ঞতস্‌স চ ধম্মজীবিনো অপ্পমত্তস্‌স যসোঽভিবড়্‌ঢতি ॥ ৪

উট্‌ঠানেনঽপ্পমাদেন সঞ্‌ঞমেন দমেন চ।
দীপং[৪] কয়িরাথ মেধাবী যং ওঘো নাভিকীরতি ॥ ৫

পমাদমনুযুঞ্জন্তি বালা দুম্মেধিনো জনা।
অপ্পমাদঞ্চ মেধাবী ধনং সেট্‌ঠং ব রক্‌খতি ॥ ৬

মা পমাদমনুযুঞ্জেথ মা কামরতি সন্থবং।
অপ্পমত্তো হি ঝায়ন্তো পপ্পোতি বিপুলং সুখং ॥ ৭

পমাদং অপ্পমাদেন যদা নুদতি পণ্ডিতো।
পঞ্‌ঞা পাসাদমারুয্‌হ অসোকো সোকিনিং পজং।
পব্বতট্‌ঠো ব ভুম্মট্‌ঠে ধীরো বালে অবেক্‌খতি ॥ ৮

অপ্পমত্তো পমত্তেসু সুত্তেসু বহুজাগরো।
অবলস্‌সং ব সীঘস্‌সো হিত্বা যাতি সুমেধসো ॥ ৯

অপ্পমাদেন মঘবা দেবানং সেট্‌ঠতং গতো।
অপ্পমাদং পসংসন্তি পমাদো গরহিতো সদা ॥ ১০

অপ্পমাদরতো ভিক্‌খু   পমাদে ভয়দস্‌সি বা।
সঞ্ঞোজনং অণুং থূলং   ডহং অগ্‌গীব গচ্ছতি ॥ ১১

অপ্পমাদরতো ভিক্‌খু   পমাদে ভয়দস্‌সি বা।
অভব্বো পরিহানায়   নিব্বানস্‌সেব সন্তিকে ॥ ১২

অপ্রমাদবর্গ

অপ্রমাদ অমৃতের,   প্রমাদ মৃত্যুর পথ—
অপ্রমত্ত নাহি মরে,   প্রমত্ত সে মৃতবৎ ॥ ১

অপ্রমাদ কারে বলে   পণ্ডিত তা মনে রাখি
অপ্রমাদে সুখে রন   জ্ঞানীর গোচরে থাকি ॥ ২

ধ্যাননিষ্ঠ ধীরগণ   নিত্য দৃঢ়পরাক্রম
নির্বাণ করেন লাভ   যোগক্ষেম মহোত্তম ॥ ৩

স্মৃতিমান, শুচিকর্ম,   সাবধান, জাগ্রত, সংযত,
ধর্মজীবী, অপ্রমত্ত—   যশ তাঁর বেড়ে যায় কত ॥ ৪

জাগরণে অপ্রমাদে   সংযমনিয়ম দিয়ে ঘিরে
মেধাবী রচেন দ্বীপ,   বন্যা ঠেকে যায় তার তীরে ॥ ৫

মূঢ় সে জড়ায় পায়ে প্রমাদের ফাঁদ,
জ্ঞানী শ্রেষ্ঠধন বলি রাখে অপ্রমাদ ॥ ৬

মেতো না প্রমাদে পড়ি,   ভজনা কোরো না কামরতি—
বহুসুখ পান তিনি   অপ্রমত্ত, ধ্যানে যাঁর মতি ॥ ৭

জ্ঞানী অপ্রমাদবলে   প্রমাদেরে ফেলি দিয়া দূরে
প্রজ্ঞার প্রাসাদ হতে   অশোক হেরেন শোকাতুরে,
গিরি হতে ধীর যথা   দেখেন ভূতলে যারা ঘুরে ॥ ৮

অমত্ত জাগ্রত ধায়, সুপ্ত মত্তজনে
পড়ে থাকে নীচে—
দ্রুত অশ্ব যেইমতো দুর্বল অশ্বেরে
ফেলে যায় পিছে ॥ ৯

অপ্রমাদে ইন্দ্রদেব   হয়েছেন দেবতার সেরা—
অপ্রমাদে তুষে সবে,   প্রমাদে দূষেন পণ্ডিতেরা ॥ ১০

প্রমাদে যে ভয় পায় ভিক্ষু অপ্রমাদে রত
পুড়িয়ে সে চলে যায় স্থূল সূক্ষ্ম বন্ধ যত ॥ ১১

অপ্রমাদে রত ভিক্ষু প্রমাদে যে ভয় পায়
ভ্রষ্ট নাহি হয় কভু— নির্বাণের কাছে যায় ॥[১] ১২

চিত্তবগ্‌গো

ফন্দনং চপলং চিত্তং দূরক্‌খং দুন্নিবারয়ং।
উজুং করোতি মেধাবী উসুকারো ব তেজনং ॥ ১

বারিজো ব থলে খিত্তো ওকমোকত উব্‌ভতো।
পরিফন্দতিদং চিত্তং মারধেয্যং পহাতবে ॥ ২

দুন্নিগ্‌গহস্‌স লহুনো যত্থ কামনিপাতিনো।
চিত্তস্‌স দমথো সাধু চিত্তং দন্তং সুখাবহং ॥ ৩

সুদুদ্দসং সুনিপুণং যত্থ কামনিপাতিনং।
চিত্তং রক্‌খেয্য মেধাবী চিত্তং গুত্তং সুখাবহং ॥ ৪

দূরঙ্গমং একচরং অসরীরং গুহাসয়ং।
যে চিত্তং সঞ্‌ঞমেস্‌সন্তি মোক্‌খন্তি মারবন্ধনা ॥ ৫

অনবট্‌ঠিতচিত্তস্‌স সদ্ধম্মং অবিজানতো।
পরিপ্লবপসাদস্‌স পঞ্‌ঞা ন পরিপূরতি ॥ ৬

অনবস্‌সুতচিত্তস্‌স অনন্বাহতচেতসো।
পুঞ্‌ঞপাপপহীনস্‌স নত্থি জাগরতো ভয়ং ॥ ৭

কুম্ভূপমং কায়মিমং বিদিত্বা নগরূপমং চিত্তমিদং ঠপেত্বা।
যোজেথ মারং পঞ্‌ঞাযুধেন জিতঞ্চ রক্‌খে অনিবেসনো সিয়া ॥ ৮

অচিরং বত যং কায়ো পঠবিং অধিসেস্‌সতি।
ছুদ্ধো অপেতবিঞ্‌ঞাণো নিরত্থং ব কলিঙ্গরং ॥ ৯

দিসোদিসং যন্তং কয়িরা বেরী বা পন বেরিনং।
মিচ্ছাপণিহিতং চিত্তং পাপিয়ো নং ততো করে ॥ ১০

ন তং মাতাপিতা কয়িরা অঞ্‌ঞে বাপি চ ঞাতকা।
সম্মাপণিহিতং চিত্তং সেয্যসো নং ততো করে ॥ ১১

চিত্তবর্গ

যে মন টলে, যে মন চলে, যাহারে ধরে রাখা দায়,
মেধাবী তারে করেন সিধা ইষুকারের তীরের প্রায় ॥ ১

এই-যে চিত্ত আকুল নিত্য মারের বাঁধন কাটিতে—
জলের পদ্ম কে যেন সদ্য উপাড়ি তুলেছে মাটিতে ॥ ২

চপল লঘু অবশ চিত যেখানে খুশি পড়ে—
সুখে সে রহে, এমন মন দমন যেবা করে ॥ ৩

নহে সে সোজা, যায় না বোঝা, যেখানে খুশি ধায়,
মেধাবী তারে রক্ষা করে তবেই সুখ পায় ॥ ৪

দূরে যায়, একা চরে, অশরীর থাকে সে গুহায়—
হেন মন বশে রাখে মৃত্যু হতে তবে রক্ষা পায় ॥ ৫

অস্থির যাহার চিত্ত সত্যধর্ম হতে আছে দূরে,
হৃদয় প্রসাদহীন— প্রজ্ঞা তার কভু নাহি পুরে ॥ ৬

বাসনাবিমুক্ত চিত্ত অচঞ্চল পুণ্যপাপহীন—
কোনো ভয় নাহি তার জাগিয়া সে রহে যত দিন ॥ ৭

কুম্ভের মতো জানিয়া শরীর নগরের মতো বাঁধিয়া চিত্ত
প্রজ্ঞা-অস্ত্রে মারিবে মরণে,' নিজেরে যতনে বাঁচাবে নিত্য ॥ ৮

অচিরে এ দেহখানা তুচ্ছ জড় কাঠি
মাটিতে পড়িয়া হায় হয়ে যায় মাটি ॥ ৯

শত্রু সে শত্রুতা করে যত, যত দ্বেষ করে তারে দ্বেষী—
মিথ্যা লয়ে আছে যেই মন আপনার ক্ষতি করে বেশি ॥ ১০

মাতাপিতা জ্ঞাতিবন্ধুজন যত তার করে উপকার—
সত্যে যার বাঁধা আছে মন বেশি শ্রেয় করে আপনার ॥ ১১

পুপ্‌ফবগ্‌গো

কো ইমং পঠবিং বিজেস্‌সতি যমলোকঞ্চ ইমং সদেবকং।
কো ধম্মপদং সুদেসিতং কুসলো পুপ্‌ফমিব পচেস্‌সতি ॥ ১

সেখো পঠবিং বিজেস্‌সতি যমলোকঞ্চ ইমং সদেবকং।
সেখো ধম্মপদং সুদেসিতং কুসলো পুপ্‌ফমিব পচেস্‌সতি ॥ ২

ফেণূপমং কায়মিমং বিদিত্বা মরীচিধম্মং অভিসম্বুধানো।
ছেত্বান মারস্স পপুপ্ফকানি অদস্সনং মচ্চুরাজস্স গচ্ছে ॥ ৩

পুপ্ফানি হেব পচিণন্তং ব্যাসত্তমনসং নরং।
সুত্তং গামং মহোঘো ব মচ্চু আদায় গচ্ছতি ॥ ৪

পুপ্ফানি হেব পচিণন্তং ব্যাসত্তমনসং নরং।
অতিত্তং যেব কামেসু অন্তকো কুরুতে বসং ॥ ৫

যথাপি ভমরো পুপ্ফং বণ্ণবন্ধং অহেঠয়ং।
পলেতি রসমাদায় এবং গামে মুনী চরে ॥ ৬

ন পরেসং বিলোমানি ন পরেসং কতাকতং।
অত্তনো ব অবেক্খেয্য কতানি অকতানি চ ॥ ৭

যথাপি রুচিরং পুপ্ফং বণ্ণবন্তং অগন্ধকং।
এবং সুভাসিতা বাচা অফলা হোতি অকুব্বতো ॥ ৮

যথাপি রুচিরং পুপ্ফং বণ্ণবন্তং সগন্ধকং।
এবং সুভাসিতা বাচা সফলা হোতি সকুব্বতো ॥ ৯

যথাপি পুপ্ফরাসিম্হা কয়িরা মালাগুণে বহু।
এবং জাতেন মচ্চেন কত্তব্বং কুসলং বহুং ॥ ১০

পুষ্পবর্গ

কে এই পৃথিবী করি লবে জয় যমলোক আর দেবনিকেতন—
ধর্মের পদ নিপুণ হস্তে কে লবে চুনিয়া[১] ফুলের মতন ॥ ১

শিষ্য জিনিয়া লইবে পৃথিবী যমলোক আর দেব নিকেতন,
নিপুণ শিষ্য ধর্মের পদ চুনিয়া লইবে ফুলের মতন ॥ ২

ফেনের মতন জানিয়া শরীর, মরীচিকাসম বুঝিয়া তারে,
ছিঁড়ি মদনের পুষ্পশায়ক মৃত্যুর চোখ এড়ায়ে যা রে ॥ ৩

সুখের কুঞ্জে তুলিছে পুষ্প চিত্ত যাহার বাসনাময়
বন্যায় যেন সুপ্তপল্লী মৃত্যু তাহারে ভাসায়ে লয় ॥ ৪

সুখের কুঞ্জে তুলিছে পুষ্প চিত্ত যাহার বাসনাময়
না পূরিতে তার তৃষা বাসনার মরণ তাহারে ছিনিয়া লয় ॥ ৫

বরন-সুবাস[11] না করিয়া হানি
ভ্রমর যেমন ফুলরস টানি
যায় সে উড়ে,
সেইমতো যত জ্ঞানীমুনিজন
সংসারমাঝে করি বিচরণ
পালান দূরে ॥৬

পর কী বলেছে কঠিন বচন   পর কী করে বা না করে—
তাহে কাজ নাই, তুমি আপনার   কৃত বা অকৃত দেখো রে ॥৭

যেমন রঙিন সুন্দর ফুলে   গন্ধ না যদি জাগে
তেমনি বিফল উত্তম বাণী   কাজে যদি নাহি লাগে ॥৮

যেমন রঙিন সুন্দর ফুলে   গন্ধও যদি থাকে
তেমনি সফল উত্তম[12] বাণী   কাজে খাটাইলে তাকে ॥৯

ফুলরাশি লয়ে যথা নানামত মালা গাঁথে মালাকর
তেমনি বিবিধ কুশলকর্ম রচনা করিবে নর ॥১০

টীকা

১ প্রথম পাঠ : ধর্ম মনঃশ্রেষ্ঠ, মনোময় ২. প্রথম পাঠ : কয়
৩ প্রথম পাঠ : নিষ্কাম যে, দম সত্য আছে যার মাঝে
৪ পালিতে দ্বীপ শব্দেরও বানান 'দীপ'
৫ প্রথম পাঠ : গিরি হতে ধীর যথা চপলেরে হেরে ভূমিতলে
তেমতি পণ্ডিত নাশি প্রমাদেরে অপ্রমাদবলে
প্রজ্ঞার শিখর হতে অশোক হেরেন শোকী- দলে।
৬ প্রথম পাঠ : প্রমাদে যে ভয় পায় ভিক্ষু অপ্রমাদে রত
ভ্রষ্ট সে তো নাহি হয়, নির্বাণের কাছে গত।
৭ প্রথম পাঠ : সে মন যে বশে রাখে মৃত্যু হতে সেই রক্ষা পায়
৮ প্রথম পাঠ : মৃত্যু ৯ প্রথম পাঠ : কে গাঁথিয়া লবে
১০ প্রথম পাঠ : ধর্মের পদ নিপুণ হস্তে গাঁথিয়া লইবে ফুলের মতন
১১ প্রথম পাঠ : বর্ণগন্ধ ১২ প্রথম পাঠ : সুন্দর

মহাভারত। মনুসংহিতা

১

প্রহরিষ্যন্ প্রিয়ং ব্রূয়াৎ
প্রহৃত্যাপি প্রিয়োত্তরম্।
অপি চাস্য শিরশ্ছিত্ত্বা
রুদ্যাৎ শোচেৎ তথাপি চ॥[১]

—মহাভারত, আদিপর্ব ১৪০.৫৬

মারিতে মারিতে কহিবে মিষ্ট,
মারিয়া কহিবে আরো।
মাথাটা কাটিয়া কাঁদিয়া উঠিবে
যতটা উচ্চে পারো॥

২

সুখং বা যদি বা দুঃখং
প্রিয়ং বা যদি বাপ্রিয়ম্।
প্রাপ্তং প্রাপ্তমুপাসীত
হৃদয়েনাপরাজিতঃ॥

—মহাভারত, শান্তিপর্ব ১৭৪.৩৯

সুখ বা হোক দুখ বা হোক,
প্রিয় বা অপ্রিয়,
অপরাজিত হৃদয়ে সব
বরণ করিয়া নিয়ো॥

পাঠান্তর

সুখ হোক দুঃখ হোক,
প্রিয় হোক অথবা অপ্রিয়,
যা পাও অপরাজিত
হৃদয়ে বহন করি নিয়ো॥

পাঠান্তর

আসুক সুখ বা দুঃখ,
প্রিয় বা অপ্রিয়,
বিনা পরাজয়ে তারে
বরণ করিয়ো ॥

৩

নাধর্মশ্চরিতো লোকে সদ্যঃ ফলতি গৌরিব।
শনৈরাবর্তমানস্তু কর্তুর্মূলানি কৃন্ততি ॥
যদি নাত্মনি পুত্রেষু ন চেৎ পুত্রেষু নপ্তৃষু।
ন ত্বেব তু কৃতোহধর্মঃ কর্তুর্ভবতি নিষ্ফলঃ
অধর্মেণৈধতে তাবৎ ততো ভদ্রাণি পশ্যতি।
ততঃ সপত্নাঞ্জয়তি সমূলস্তু বিনশ্যতি ॥

—মনুসংহিতা, ৪, ১৭২-৭৪

গাভী দুহিলেই দুগ্ধ পাই তো সদ্যই,
কিন্তু অধর্মের ফল মেলে না অদ্যই।
জানি তার আবর্তন অতি ধীরে ধীরে
সমূলে ছেদন করে অধর্মকারীরে ॥

আপনিও ফল তার নাহি পায় যদি,
পুত্র বা পৌত্রেও তাহা ফলে নিরবধি।
এ কথা নিশ্চিত জেনো অধর্ম যে করে
নিষ্ফল হয় না কভু কালে কালান্তরে ॥

আপাতত বাড়ে লোক অধর্মের দ্বারা,
অধর্মেই আপনার ভালো দেখে তারা।
এ পথেই শত্রুদের পরাজয়[2] করে,
শেষে কিন্তু একদিন সমূলেই মরে ॥৩

টীকা :

১ সুভাষিতরত্নভাণ্ডাগার-ধৃত পাঠ। মহাভারতের প্রচলিত পাঠ—
প্রহরিষ্যন্ প্রিয়ং ব্রূয়াৎ প্রহরন্নপি ভারত।
প্রহৃত্য চ কৃপায়ীত শোচেত চ রুদেত চ ॥

২ পাঠান্তর : পরাস্ত

৩ শেষ ছত্র-দুটির পাঠান্তর—
অধর্মেই শত্রুদের করে পরাজয়
শেষে কিন্তু সমূলে বিনাশপ্রাপ্ত হয়।

কালিদাস-ভবভূতি

কুমারসম্ভব ॥ তৃতীয় সর্গ

কুবেরগুপ্তাং দিশমুষ্ণরশ্মৌ গন্তুং প্রবৃত্তে সময়ং বিলঙ্ঘ্য।
দিগ্‌দক্ষিণা গন্ধবহং মুখেন ব্যলীকনিশ্বাসমিবোৎসসর্জ ॥ ২৫

অসূত সদ্যঃ কুসুমান্যশোকঃ স্কন্ধাৎ প্রভৃত্যেব সপল্লবানি।
পাদেন নাপৈক্ষত সুন্দরীণাং সম্পর্কমাশিঞ্জিতনূপুরেণ ॥ ২৬

সদ্যঃ প্রবালোদ্গমচারুপত্রে নীতে সমাপ্তিং নবচূতবাণে।
নিবেশয়ামাস মধুর্দ্বিরেফান্ নামাক্ষরাণীব মনোভবস্য ॥ ২৭

বর্ণপ্রকর্ষে সতি কর্ণিকারং দুনোতি নির্গন্ধতয়া স্ম চেতঃ।
প্রায়েণ সামগ্র্যবিধৌ গুণানাং পরাঙ্মুখা বিশ্বসৃজঃ প্রবৃত্তিঃ ॥ ২৮

মৃগাঃ পিয়ালদ্রুমমঞ্জরীণাং রজঃকণৈর্বিঘ্নিতদৃষ্টিপাতাঃ।
মদোদ্ধতাঃ প্রত্যনিলং বিচেরুর্বনস্থলীর্মর্মরপত্রমোক্ষাঃ ॥ ৩১

তং দেশমারোপিতপুষ্পচাপে রতিদ্বিতীয়ে মদনে প্রপন্নে।
কাষ্ঠাগতস্নেহরসানুবিদ্ধং দ্বন্দ্বানি ভাবং ক্রিয়য়া বিবব্রুঃ ॥ ৩৫

মধু দ্বিরেফঃ কুসুমৈকপাত্রে পপৌ প্রিয়াং স্বামনুবর্তমানঃ।
শৃঙ্গেণ চ স্পর্শনিমীলিতাক্ষীং মৃগীমকণ্ডূয়ত কৃষ্ণসারঃ ॥ ৩৬

… … … …

অর্ধোপভুক্তেন বিসেন জায়াং সম্ভাবয়ামাস রথাঙ্গনামা ॥ ৩৭

গীতান্তরেষু শ্রমবারিলেশৈঃ কিঞ্চিৎ সমুচ্ছ্বাসিতপত্রলেখম্।
পুষ্পাসবাঘূর্ণিতনেত্রশোভি প্রিয়ামুখং কিম্পুরুষশ্চুচুম্বে ॥ ৩৮

পর্যাপ্তপুষ্পস্তবকস্তনাভ্যঃ স্ফুরৎপ্রবালোষ্ঠমনোহরাভ্যঃ।
লতাবধূভ্যস্তরবোহপ্যবাপুর্বিনম্রশাখাভুজবন্ধনানি ॥ ৩৯

লতাগৃহদ্বারগতোহথ নন্দী বামপ্রকোষ্ঠার্পিতহেমবেত্রঃ।
মুখার্পিতৈকাঙ্গুলিসংজ্ঞয়ৈব মা চাপলায়েতি গণান্ ব্যনৈষীৎ ॥ ৪১

নিষ্কম্পবৃক্ষং নিভৃতদ্বিরেফং মূকাণ্ডজং শান্তমৃগপ্রচারম্।
তচ্ছাসনাৎ কাননমেব সর্বং চিত্রার্পিতারম্ভ ইবাবতস্থে ॥ ৪২

দৃষ্টিপ্রপাতং প্রতিহৃত্য তস্য কামঃ পুরঃশুক্রমিব প্রয়াণে।
প্রান্তেষু সংসক্তনমেরুশাখং ধ্যানাস্পদং ভূতপতের্বিবেশ ॥ ৪৩

স দেবদারুদ্রুমবেদিকায়াং শার্দূলচর্মব্যবধানবত্যাম্।
আসীনমাসন্নশরীরপাতস্ত্রিয়ম্বকং সংযমিনং দদর্শ ॥ ৪৪

পর্যঙ্কবন্ধস্থিরপূর্বকায়মৃজ্বায়তং সন্নমিতোভয়াংসম্।
উত্তানপাণিদ্বয়সন্নিবেশাৎ প্রফুল্লরাজীবমিবাঙ্কমধ্যে ॥ ৪৫

ভুজঙ্গমোন্নদ্ধজটাকলাপং কর্ণাবসক্তদ্বিগুণাক্ষসূত্রম্।
কণ্ঠপ্রভাসঙ্গবিশেষনীলাং কৃষ্ণত্বচং গ্রন্থিমতীং দধানম্ ॥ ৪৬

কিঞ্চিৎপ্রকাশস্তিমিতোগ্রতারৈর্ভ্রূবিক্রিয়ায়াং বিরতপ্রসঙ্গৈঃ।
নেত্রৈরবিস্পন্দিতপক্ষ্মমালৈর্লক্ষ্যীকৃতঘ্রাণমধোময়ূখৈঃ ॥ ৪৭

অবৃষ্টিসংরম্ভমিবাম্বুবাহমপামিবাধারমনুত্তরঙ্গম্।
অন্তশ্চরাণাং মরুতাং নিরোধান্নিবাতনিষ্কম্পমিব প্রদীপম্ ॥ ৪৮

কপালনেত্রান্তরলব্ধমার্গৈর্জ্যোতিঃপ্ররোহৈরুদিতৈঃ শিরস্তঃ।
মৃণালসূত্রাধিকসৌকুমার্যাং বালস্য লক্ষ্মীং গ্লপয়ন্তমিন্দোঃ ॥ ৪৯

স্মরস্তথাভূতমযুগ্মনেত্রং পশ্যন্নদূরান্মনসাপ্যধৃষ্যম্।
নালক্ষয়ৎ সাধ্বসসন্নহস্তঃ স্রস্তং শরং চাপমপি স্বহস্তাৎ ॥ ৫১

নির্বাণভূয়িষ্ঠমথাস্য বীর্যং সন্ধুক্ষয়ন্তীব বপুর্গুণেন।
অনুপ্রয়াতা বনদেবতাভ্যামদৃশ্যত স্থাবররাজকন্যা ॥ ৫২

অশোকনির্ভর্ৎসিতপদ্মরাগমাকৃষ্টহেমদ্যুতিকর্ণিকারম্।
মুক্তাকলাপীকৃতসিন্ধুবারং বসন্তপুষ্পাভরণং বহন্তী ॥ ৫৩

আবর্জিতা কিঞ্চিদিব স্তনাভ্যাং বাসো বসানা তরুণার্করাগম্।
পর্যাপ্তপুষ্পস্তবকাবনম্রা সঞ্চারিণী পল্লবিনী লতেব ॥ ৫৪

স্রস্তাং নিতম্বাদবলম্বমানা পুনঃ পুনঃ কেশরদামকাঞ্চীম্।
ন্যাসীকৃতাং স্থানবিদা স্মরেণ মৌর্বীং দ্বিতীয়ামিব কার্মুকস্য ॥ ৫৫

সুগন্ধিনিশ্বাসবিবৃদ্ধতৃষ্ণং বিম্বাধরাসন্নচরং দ্বিরেফম্।
প্রতিক্ষণং সম্ভ্রমলোলদৃষ্টির্লীলারবিন্দেন নিবারয়ন্তী ॥ ৫৬

তাং বীক্ষ্য সর্বাবয়বানবদ্যাং রতেরপি হ্রীপদমাদধানাম্।
জিতেন্দ্রিয়ে শূলিনি পুষ্পচাপঃ স্বকার্যসিদ্ধিং পুনরাশশংস ॥ ৫৭

ভবিষ্যতঃ পত্যুরুমা চ শম্ভোঃ সমাসসাদ প্রতিহারভূমিম্।
যোগাৎ স চান্তঃ পরমাত্মসংজ্ঞং দৃষ্ট্বা পরং জ্যোতিরুপাররাম ॥ ৫৮

তস্মৈ শশংস প্রণিপত্য নন্দী শুশ্রূষয়া শৈলসুতামুপেতাম্।
প্রবেশয়ামাস চ ভর্তুরেনাং ভ্রূক্ষেপমাত্রানুমতপ্রবেশাম্ ॥ ৬০

তস্যাঃ সখীভ্যাং প্রণিপাতপূর্বং স্বহস্তলূনঃ শিশিরাত্যয়স্য।
ব্যকীর্যত ত্র্যম্বকপাদমূলে পুষ্পোচ্চয়ঃ পল্লবভঙ্গভিন্নঃ ॥ ৬১

উমাপি নীলালকমধ্যশোভি বিস্রংসয়ন্তী নবকর্ণিকারম্।
চকার কর্ণচ্যুতপল্লবেন মূর্ধ্না প্রণামং বৃষভধ্বজায় ॥ ৬২

অনন্যভাজং পতিমাপ্নুহীতি সা তথ্যমেবাভিহিতা ভবেন।
ন হীশ্বরব্যাহৃতয়ঃ কদাচিৎ পুষ্ণন্তি লোকে বিপরীতমর্থম্ ॥ ৬৩

কামস্তু বাণাবসরং প্রতীক্ষ্য পতঙ্গবদ্‌বহ্নিমুখং বিবিক্ষুঃ।
উমাসমক্ষং হরবদ্ধলক্ষ্যঃ শরাসনজ্যাং মুহুরামমর্শ ॥ ৬৪

অথোপনিন্যে গিরিশায় গৌরী তপস্বিনে তাম্ররুচা করেণ।
বিশোষিতাং ভানুমতো ময়ূখৈর্মন্দাকিনীপুষ্করবীজমালাম্ ॥ ৬৫

প্রতিগ্রহীতুং প্রণয়িপ্রিয়ত্বাৎ ত্রিলোচনস্তামুপচক্রমে চ।
সম্মোহনং নাম চ পুষ্পধন্বা ধনুষ্যমোঘং সমধত্ত বাণম্ ॥ ৬৬

হরস্তু কিঞ্চিৎ পরিলুপ্তধৈর্যশ্চন্দ্রোদয়ারম্ভ ইবাম্বুরাশিঃ।
উমামুখে বিম্বফলাধরোষ্ঠে ব্যাপারয়ামাস বিলোচনানি ॥ ৬৭

বিবৃণ্বতী শৈলসুতাপি ভাবমঙ্গৈঃ স্ফুরদ্‌বালকদম্বকল্পৈঃ।
সাচীকৃতা চারুতরেণ তস্থৌ মুখেন পর্যস্তবিলোচনেন ॥ ৬৮

অথেন্দ্রিয়ক্ষোভমযুগ্মনেত্রঃ পুনর্বশিত্বাদ্ বলবন্নিগৃহ্য।
হেতুং স্বচেতোবিকৃতোর্দিদৃক্ষুর্দিশামুপান্তেষু সসর্জ দৃষ্টিম্ ॥ ৬৯

স দক্ষিণাপাঙ্গনিবিষ্টমুষ্টিং নতাংসমাকুঞ্চিতসব্যপাদম্।
দদর্শ চক্রীকৃতচারুচাপং প্রহর্তমভ্যুদ্যতমাত্মযোনিম্ ॥ ৭০

তপঃপরামর্শবিবৃদ্ধমন্যোর্ভ্রূভঙ্গদুষ্প্রেক্ষ্যমুখস্য তস্য।
স্ফুরন্নুদর্চিঃ সহসা তৃতীয়াদক্ষ্ণঃ কৃশানুঃ কিল নিষ্পপাত ॥ ৭১

ক্রোধং প্রভো সংহর সংহরেতি যাবদ্‌গিরঃ খে মরুতাং চরন্তি।
তাবৎ স বহ্নির্ভবনেত্রজন্মা ভস্মাবশেষং মদনং চকার ॥ ৭২

মদনদহন

সময় লঙ্ঘন করি নায়ক তপন
উত্তর অয়ন যবে করিল আশ্রয়
দক্ষিণের দিকবালা হেরিয়া তাহাই
ধীরে ধীরে ফেলিলেন বিষণ্ণ নিশ্বাস ॥ ২৫
অমনি উঠিল ফুটি অশোকের ফুল,
অমনি পল্লবজালে ছাইল পাদপ ॥ ২৬
নবীন পল্লব দিয়া রচি পক্ষগুলি
ভ্রমর-অক্ষরে লিখি মদনের নাম
নবচূতবাণচয় নির্মিল বসন্ত ॥ ২৭

মনোহরবর্ণময় কর্ণিকার ফুল
ফুটিল, নাইক তাহে সুবাসের লেশ।
বিধাতা সকল গুণ দেন কি সবারে ॥ ২৮

মর্মর শবদ করি জীর্ণ পত্রগুলি
ফেলে ধীরে বনস্থলী বায়ুর পরশে,
মদোদ্ধত হরিণেরা করে বিচরণ
পিয়ালমঞ্জরী হতে রেণু ঝরি ঝরি
যাদের বিশাল আঁখি হয়েছে আকুল ॥ ৩১

যখন মদন বসি বনশ্রীর কোলে
পুষ্পশরে গুণ তার করিল বন্ধন
স্নেহরসে মগ্ন হল যত ছিল প্রাণী ॥ ৩৫

একই কুসুমপাত্রে ভ্রমর প্রিয়ার
পীত-অবশেষ মধু করিল গো পান।
স্পর্শনিমীলিতচক্ষু মৃগীর শরীরে
কৃষ্ণসার শৃঙ্গ দিয়া করিল আদর ॥ ৩৬

আধেক মৃণাল খেয়ে সুখে চক্রবাক
আধেক তুলিয়া দিল প্রিয়ার মুখেতে ॥ ৩৭

পুষ্পমদ পান করি ঢলঢল আঁখি
কিম্পুরুষললনারা গাইতেছে গান,
প্রিয়তম তাহাদের হইয়া বিহ্বল
থেকে থেকে প্রিয়ামুখ করিছে চুম্বন ॥ ৩৮

কুসুমস্তবকগুলি স্তন যাহাদের
নবকিশলয়গুলি ওষ্ঠ মনোহর
বাঁধিল সে লতিকারা বাহুপাশ দিয়া
নম্রশাখা তরুদের গাঢ় আলিঙ্গনে ॥ ৩৯

লতাগৃহদ্বারে নন্দী করি আগমন
বাম করতলে এক হেমবেত্র ধরি
অধরে অঙ্গুলি দিয়া করিল সংকেতে ॥ ৪১

[অমনি] নিষ্কম্প বৃক্ষ, নিভৃত ভ্রমর,
... হইল মূক, শান্ত হল মৃগ
... ... কাঁপিল সংকেতে ॥ ৪২

নন্দীর সতর্ক আঁখি এড়ায়ে মদন
নমেরু গাছের তলে লুকায়ে লুকায়ে
শিবের সমাধিস্থান করিল দর্শন ॥ ৪৩

দেখিল সে— মহাদেব শার্দূল-আসনে
দেবদারুবেদী-'পরে আছেন বসিয়া ॥ ৪৪

উন্নত প্রশস্ত অতি স্থির বক্ষ তাঁর,
শোভিতেছে সন্নমিত দৃঢ় স্কন্ধদেশ,
কোলে তাঁর হাত দুটি রয়েছে অর্পিত
প্রফুল্ল পদ্মের মতো শোভিছে কেমন ॥ ৪৫

বদ্ধ তাঁর জটাজাল ভুজঙ্গবন্ধনে।
কর্ণে তাঁর অক্ষসূত্র রয়েছে জড়িত—
গ্রন্থিবদ্ধ কৃষ্ণসারহরিণ-অজিন
ধরিয়াছে নীলবর্ণ কণ্ঠের প্রভায় ॥ ৪৬

ঈষৎ প্রকাশে যার স্তিমিত তারকা,
শান্ত যার ভ্রূযুগল অচল নিষ্পন্দ,
অকম্পিত পক্ষ্মমালা ভেদ করি যার
বিকীরিত হইতেছে শান্ত জ্যোতিরাশি
সে নেত্র নাসাগ্রভাগ করিছে বীক্ষণ ॥ ৪৭

অবৃষ্টিসংরম্ভস্তব্ধ মেঘের মতন
তরঙ্গবিহীন শান্ত সমুদ্রের মতো
নির্বাতনিষ্কম্প অগ্নি-শিখার সমান
মহাদেব শান্তভাবে ধেয়ানে নিমগ্ন ॥ ৪৮
মস্তক করিয়া ভেদ উঠিয়াছে জ্যোতি
কপালের শশধরে করিয়া মলিন ॥ ৪৯

মনের অগম্য সেই মহাদেবে হেরি
মদনের সকম্পিত হস্তদ্বয় হতে
থর থর কাঁপি খসি পড়িল ধনুক ॥ ৫১

হেনকালে বনদেবীদের সাথে সাথে
উমা পশিলেন সেই বনস্থলীমাঝে—
হেরি সে অতুলরূপ পাইয়া আশ্বাস
মদন তুলিয়া নিল ধনুর্বাণ তার ॥ ৫২

পদ্মরাগ মণি জিনি অশোককুসুম
কনকবরন জিনি কর্ণিকার ফুল
মুকুতাকলাপসম সিন্ধুবারমালা
আরণ্য বসন্তফুলে... ... ...
... ... ॥ ৫৩

স্তনভারে নতকায়া ঈষৎ অমনি
অবনত কুসুমের মঞ্জরীর ভারে
সঞ্চারিণী পল্লবিনী লতাটির মতো ॥ ৫৪

থেকে থেকে খুলে পড়ে বকুলমেখলা,
বার বার হাতে করে রাখেন আটকি ॥ ৫৫

ভ্রমর তৃষিত হয়ে নিঃশ্বাসসৌরভে
বিম্ব-অধরের কাছে করে বিচরণ,
সম্ভ্রমে বিলোলদৃষ্টি উমা প্রতিক্ষণ
লীলাশতদল নাড়ি দিতেছেন বাধা ॥ ৫৬

যাঁর রূপরাশি হেরি রতি লজ্জা পায়
অকলঙ্ক সে উমারে করি নিরীক্ষণ
জিতেন্দ্রিয় শূলীরেও বাণ সন্ধানিতে
মদন হৃদয়ে নিজে বাঁধিল সাহস ॥ ৫৭

শৈলসুতা ভবিষ্যৎপতি শংকরের
লতাগৃহদ্বার-মাঝে করিলা প্রবেশ।
পরমাত্মাসন্দর্শনে পরিতৃপ্ত হয়ে
যোগ ভাঙি উঠিলেন মহেশ তখন ॥ ৫৮

নন্দী তাঁর পদতলে প্রণিপাত করি
উমা-আগমনবার্তা করিল জ্ঞাপন।
ঈষৎ ভ্রূক্ষেপমাত্রে মহেশ অমনি
পার্বতীরে প্রবেশিতে দিলা অনুমতি ॥ ৬০

উমার স্বহস্তে তুলা পল্লবে-জড়িত
হিমসিক্ত ফুলগুলি অর্পি পদতলে
সখীগণ মহাদেবে করিল প্রণাম ॥ ৬১

উমাও সে পদতলে হইলেন নত—
চঞ্চল অলক হতে পড়িল খসিয়া
নবকর্ণিকার ফুল মহেশচরণে ॥ ৬২

[অন্য] নারী-অনুরক্ত নহে যেই জন
[হেন] পতি লাভ করো আশীষিলা দেব
... [ক] থার কভু হয় না অন্যথা ॥ ৬৩

... [অ] বসর প্রতীক্ষা করিয়া
... ... পতঙ্গের মতো
... ... কবি ॥ ৬৪

পদ্মবীজমালা লয়ে আরক্তিম করে
মহেশের হস্তে উমা করিলা অর্পণ ॥ ৬৫
সম্মোহন পুষ্পধনু করিয়া যোজনা
অমনি শিবের প্রতি হানিলা মদন ॥ ৬৬
অমনি হইলা হর ঈষৎ অধীর
সবেমাত্র চন্দ্রোদয়ে অম্বুরাশি-সম,
উমার মুখের 'পরে মহেশ তখন
একেবারে ত্রিনয়ন করিলা নিবেশ ॥ ৬৭
অমনি উমার দেহ উঠিল শিহরি,
সরমবিভ্রান্ত নেত্রে লাজনম্র মুখে
পার্বতী মাটির পানে রহিলা চাহিয়া ॥ ৬৮
মুহূর্তে ইন্দ্রিয়ক্ষোভ করিয়া দমন
বিকৃতির হেতু কোথা দেখিবার তরে
দিশে দিশে করিলেন ত্রিনয়নপাত ॥ ৬৯
দেখিলা জ্যাবদ্ধমুষ্টি সশর মদন
তাঁর [প্রতি] লক্ষ নিজ করেছে নিবেশ ॥ ৭০
তপস্যার বিঘ্ন হেরি ক্রুদ্ধ অতিশয়
ভ্রূভঙ্গদুষ্প্রেক্ষ্যমুখ মহাতপস্বীর
তৃতীয় নয়ন হতে ছুটিল অনল ॥ ৭১
ক্রোধ সম্বরহ প্রভু ক্রোধ সম্বরহ
স্বর্গ হতে দেবতারা কহিতে কহিতে
হইল মদনতনু ভস্ম-অবশেষ ॥ ৭২

কুমারসম্ভব

সূচনা

অস্ত্যুত্তরস্যাং দিশি দেবতাত্মা
হিমালয়ো নাম নগাধিরাজঃ।
পূর্বাপরৌ তোয়নিধী বগাহ্য
স্থিতঃ পৃথিব্যা ইব মানদণ্ডঃ ॥

—কুমারসম্ভব, ১. ১

কুমারসম্ভব

সূচনা

উত্তর দিগন্ত ব্যাপি
দেবতাত্মা হিমাদ্রি বিরাজে—
দুই প্রান্তে দুই সিন্ধু,
মানদণ্ড যেন তারি মাঝে ॥

রঘুবংশ ॥ সূচনা

বাগর্থাবিব সম্পৃক্তৌ বাগর্থপ্রতিপত্তয়ে।
জগতঃ পিতরৌ বন্দে পার্বতীপরমেশ্বরৌ ॥ ১

ক্ব সূর্যপ্রভবো বংশঃ ক্ব চাল্পবিষয়া মতিঃ।
তিতীর্ষুর্দুস্তরং মোহাদুড়ুপেনাস্মি সাগরম্ ॥ ২

মন্দঃ কবিযশঃপ্রার্থী গবিষ্যাম্যুপহাস্যতাম্।
প্রাংশুলভ্যে ফলে লোভাদুদ্‌বাহুরিব বামনঃ ॥ ৩

অথবা কৃতবাগ্‌দ্বারে বংশেঽস্মিন্ পূর্বসূরিভিঃ।
মণৌ বজ্রসমুৎকীর্ণে সূত্রস্যেবাস্তি মে গতিঃ ॥ ৪

সোঽহমাজন্মশুদ্ধানাম্ আফলোদয়কর্মণাম্।
আসমুদ্রক্ষিতীশানাম্ আনাকরথবর্ত্মনাম ॥ ৫

যথাবিধিহুতাগ্নীনাং যথাকামার্চিতার্থিনাম্।
যথাপরাধদণ্ডানাং যথাকালপ্রবোধিনাম্ ॥ ৬

ত্যাগায় সম্ভৃতার্থানাং সত্যায় মিতভাষিণাম্।
যশসে বিজিগীষূণাং প্রজায়ৈ গৃহমেধিনাম্ ॥ ৭

শৈশবেঽভ্যস্তবিদ্যানাং যৌবনে বিষয়ৈষিণাম্।
বার্ধক্যে মুনিবৃত্তীনাং যোগেনান্তে তনুত্যজাম্ ॥ ৮

রঘূণামন্বয়ং বক্ষ্যে তনুবাগ্‌বিভবোঽপি সন্।
তদ্‌গুণৈঃ কর্ণমাগত্য চাপলায় প্রণোদিতঃ ॥ ৯

তং সন্তঃ শ্রোতুমর্হন্তি সদসদ্‌ব্যক্তিহেতবঃ।
হেম্নঃ সংলক্ষ্যতে হ্যগ্নৌ বিশুদ্ধিঃ শ্যামিকাপি বা ॥ ১০

—রঘুবংশ, ১. ১-১০

রঘুবংশ ॥ সূচনা

বাক্য আর অর্থ-সম সম্মিলিত শিবপার্বতীরে
বাগর্থসিদ্ধির তরে বন্দনা করিনু নতশিরে ॥ ১

কোথা সূর্যবংশ, কোথা অল্পমতি আমার মতন—
ভেলায় দুস্তর সিন্ধু তরিবারে বৃথা আকিঞ্চন ॥ ২

বামন হাসায় লোক হাত বাড়াইয়া উচ্চ ডালে,
মন্দ কবিযশ চায়— সেই দশা তাহারো কপালে ॥ ৩

কিংবা পূর্ব পূর্ব কবি রচি গেলা যেথা বাক্যদ্বার,
বজ্রবিদ্ধ মণি -মধ্যে সূত্রসম প্রবেশ আমার ॥ ৪

আজন্ম যাঁহারা শুদ্ধ, কর্ম যাঁরা নিয়ে যান ফলে,
সসাগররাজ্যেশ্বর, ধরা হতে স্বর্গে রথ চলে—

যথাবিধি হোম যাগ, যথাকাম অতিথি অর্চিত,
যথাকালে জাগরণ, অপরাধে দণ্ড যথোচিত—

দানহেতু ধনার্জন, মিতভাষা সত্যের কারণ,
যশ-আশে দিগ্বিজয়, পুত্র লাগি কলত্রবরণ—

শৈশবে বিদ্যার চর্চা, যৌবনে বিষয়-অভিলাষ,
বার্ধক্যে মুনির ব্রত, যোগবলে অন্তে দেহ-নাশ ॥ ৫-৮

এ হেন বংশের কীর্তি বর্ণিবারে নাহি বাক্যবল,
অতুল সে গুণরাশি কর্ণে আসি করিল চঞ্চল ॥ ৯

পণ্ডিতে শুনিবে কথা ভালোমন্দ-বিচারে-নিপুণ—
সোনা খাঁটি কিংবা ঝুঁটা সে পরীক্ষা করিবে আগুন ॥ ১০

রঘুবংশ ॥ অষ্টম সর্গ

কৃতবত্যসি নাবধীরণা-
মপরাদ্ধেঽপি যদা চিরং ময়ি।
কথমেকপদে নিরাগসং
জনমাভাষ্যমিমং ন মন্যসে ॥ ৪৮

মনসাপি ন বিপ্রিয়ং ময়া
কৃতপূর্বং তব কিং জহাসি মাম্।
ননু শব্দপতিঃ ক্ষিতেরহং
ত্বয়ি মে ভাবনিবন্ধনা রতিঃ ॥ ৫২

কুসুমোৎখচিতান্ বলীভৃতশ্-
চলয়ন্ ভৃঙ্গরুচস্তবালকান্।
করভোরু করোতি মারুতস্-
ত্বদুপাবর্তনশঙ্কি মে মনঃ ॥ ৫৩

তদপোহিতুমর্হসি প্রিয়ে
প্রতিবোধেন বিষাদমাশু মে।

জ্বলিতেন গুহাগতং তমস্-
তুহিনাদ্রেরিব নক্তমোষধিঃ ॥ ৫৪

ইদমুচ্ছ্বসিতালকং মুখং
তব বিশ্রান্তকথং দুনোতি মাম্।
নিশি সুপ্তমিবৈকপঙ্কজং
বিরতাভ্যন্তরষট্‌পদস্বনম্ ॥ ৫৫

শশিনং পুনরেতি শর্বরী
দয়িতা দ্বন্দ্বচরং পতত্রিণম্।
ইতি তৌ বিরহান্তরক্ষমৌ
কথমত্যন্তগতা ন মাং দহেঃ ॥ ৫৬

নবপল্লবসংস্তরেঽপি তে
মৃদু দুয়েত যদঙ্গমর্পিতম্।
তদিদং বিষহিষ্যতে কথং
বদ বামোরু চিতাধিরোহণম্ ॥ ৫৭

ইয়মপ্রতিবোধশায়িনীং
রশনা ত্বাং প্রথমা রহঃসখী।
গতিবিভ্রমসাদনীরবা
ন শুচা নানুমৃতেব লক্ষ্যতে ॥ ৫৮

সমদুঃখসুখঃ সখীজনঃ
প্রতিপচ্চন্দ্রনিভোঽয়মাত্মজঃ।
অহমেকরসস্তথাপি তে
ব্যবসায়ঃ প্রতিপত্তিনিষ্ঠুরঃ ॥ ৬৫

ধৃতিরস্তমিতা রতিশ্চ্যুতা
বিরতং গেয়মৃতুর্নিরুৎসবঃ।
গতমাভরণপ্রয়োজনং
পরিশূন্যং শয়নীয়মদ্য মে ॥ ৬৬

গৃহিণী সচিবঃ সখী মিথঃ
প্রিয়শিষ্যা ললিতে কলাবিধৌ।
করুণাবিমুখেন মৃত্যুনা
হরতা ত্বাং বদ কিং ন মে হৃতম্ ॥ ৬৭

বিভবেঽপি সতি ত্বয়া বিনা
সুখমেতাবদজস্য গণ্যতাম্।

অহৃতস্য বিলোভনান্তরৈর্-
মম সর্বে বিষয়াস্ত্বদাশ্রয়াঃ ॥ ৬৯

অজবিলাপ

বহু অপরাধে তবুও আমার 'পর
ভুলেও কখনো কর নাই অনাদর,
তবু কেন আজ কোনো অপরাধ বিনা
মোর প্রতি তুমি রয়েছ বাক্যহীনা ॥ ৪৮

মনেও আনি নি তব অপ্রিয় কভু
মোরে ফেলে কেন চলে গেলে তুমি তবু!
পৃথিবীর আমি নামেই মাত্র পতি,
তোমাতেই মোর ভাবে নিবদ্ধ রতি ॥ ৫২

কুসুমে খচিত কুঞ্চিত কালো কেশে
মন্দপবন কাঁপায় যখন এসে,
হে সুতনু, তব প্রাণ ফিরে এল ব'লে
থেকে থেকে মোর দুরাশায় হিয়া দোলে ॥ ৫৩

হে প্রেয়সী, তবে উচিত তোমার ত্বরা
জাগিয়া আমার বিষাদ বিনাশ করা—
রজনী আসিলে হিমাচলগুহাতলে
আঁধার নাশিয়া ওষধি যেমন জ্বলে ॥ ৫৪

ও মুখে অলক দোলে যে' মারুতভরে,
তবু কথা নাই বুক ফাটে তারি তরে—
যেমন নিশায় কমল ঘুমায়ে রহে,
অন্তরে তার ভ্রমর কথা না কহে ॥ ৫৫

[অলক তোমার কভু মৃদু বায়ুভরে
বিচলিয়া উঠে মৌন মুখের 'পরে—
শতদল যেন অবসান হলে দিন
নিশানিমীলিত অলিগুঞ্জনহীন ॥ ৫৫][১]

শর্বরী পুন ফিরে পায় শশধরে,
চকাচকি পুন মিলে বিচ্ছেদ-পরে,
বিরহ তাহারা মিলনের আশে সহে—
চিরবিচ্ছেদ আমারে যে আজ দহে ॥ ৫৬

শয়ন রচিত হত পল্লবে নব,
তবু দুখ পেত কোমল অঙ্গ তব।
আজ সেই তনু চিতা-আরোহণ' আহা
কেমনে সহিবে, কেমনে সহিব তাহা ॥ ৫৭

এ মেখলা' তব প্রথমা রহঃসখী
গতিহারা দেহে নিক্বণ হারালো কি?
মনে হয় যেন সেও বুঝি তব শোকে
তোমারি সঙ্গে গিয়েছে মৃত্যুলোকে ॥ ৫৮

সমসুখদুখ তব সঙ্গিনীজন,
প্রতিপদচাঁদ তব আত্মজধন,
তব রস মোর জীবনে করেছি সার—
নিঠুর, তবুও একি তব ব্যবহার ॥ ৬৫

ধৃতি হল দূর, রতি শুধু স্মৃতিলীন,
গান হল শেষ, ঋতু উৎসবহীন,
আভরণে মোর প্রয়োজন হল গত—
শয়ন শূন্য চিরদিবসের মতো ॥ ৬৬

গৃহিণী, সচিব, রহস্যসখী মম,
ললিতকলায় ছিলে যে শিষ্যাসম—
করুণাবিমুখ মৃত্যু তোমারে নিয়ে
বলো গো আমার কি না সে হরিল প্রিয়ে ॥ ৬৭

তোমা বিনা আজ রাজসম্পদ ধনে
সুখ বলি' অজ গণ্য না করে মনে।
কোনো প্রলোভন রোচে না আমার কাছে,
আমার যা-কিছু তোমারে জড়ায়ে আছে ॥ ৬৯

মেঘদূত সূচনা

পূর্বমেঘ

কশ্চিৎ কান্তাবিরহগুরুণা স্বাধিকারপ্রমত্তঃ
শাপেনাস্তংগমিতমহিমা বর্ষভোগ্যেন ভর্তুঃ।
যক্ষশ্চক্রে জনকতনয়াস্নানপুণ্যোদকেষু
স্নিগ্ধচ্ছায়াতরুষু বসতিং রামগির্যাশ্রমেষু ॥ ১

তস্মিন্নদ্রৌ কতিচিদবলাবিপ্রযুক্তঃ স কামী
নীত্বা মাসান্ কনকবলয়ভ্রংশরিক্তপ্রকোষ্ঠঃ।
আষাঢ়স্য প্রথমদিবসে মেঘমাশ্লিষ্টসানুং
বপ্রক্রীড়াপরিণতগজপ্রেক্ষণীয়ং দদর্শ ॥ ২

মেঘদূত ॥ সূচনা

যক্ষ সে কোনোজনা আছিল আনমনা,
সেবার অপরাধে প্রভুশাপে
হয়েছে বিলয়গত মহিমা ছিল যত—
বরষকাল যাপে দুখতাপে।
নির্জন রামগিরি- শিখরে মরে ফিরি
একাকী দূরবাসী প্রিয়াহারা,
যেথায় শীতল ছায় ঝরনা বহি যায়
সীতার স্নানপূত জলধারা ॥ ১

মাস পরে কাটে মাস, প্রবাসে করে বাস
প্রেয়সীবিচ্ছেদে বিমলিন।
কনকবলয়-খসা বাহুর ক্ষীণ দশা,
বিরহদুখে হল বলহীন।
একদা আষাঢ় মাসে প্রথম দিন আসে,
যক্ষ নিরখিল গিরি-'পর
ঘনঘোর মেঘ এসে লেগেছে সানুদেশে,
দন্ত হানে যেন করিবর ॥ ২

পাঠান্তর

মেঘদূত ॥ সূচনা

অভাগা যক্ষ যবে
করিল কাজে হেলা
কুবের তাই তারে দিলেন শাপ—
নির্বাসনে সে রহি
প্রেয়সী-বিচ্ছেদে
বর্ষ ভরি সবে দারুণ জ্বালা।
গেল চলি রামগিরি-
শিখর-আশ্রমে
হারায়ে সহজাত মহিমা তার,

সেখানে পাদপরাজি
স্নিগ্ধ ছায়াবৃত
সীতার স্নানে পূত সলিলধার ॥ ১

পাঠান্তর

মেঘদূত ॥ সূচনা

কোনো-এক যক্ষ সে
প্রভুর সেবাকাজে
প্রমাদ ঘটাইল
উন্মনা.

তাই দেবতার শাপে
অস্তগত হল
মহিমা-সম্পদ্
যত-কিছু ॥ ১

কান্তাবিরহগুরু
দুঃখদিনগুলি
বর্ষকাল-তরে
যাপে একা.

স্নিগ্ধপাদপছায়া
সীতার-স্নানজলে-
পুণ্য রামগিরি-
আশ্রমে ॥ ২

১

ন খলু ন খলু বাণঃ সন্নিপাত্যোহয়মস্মিন্
মৃদুনি মৃগশরীরে পুষ্পরাশাবিবাগ্নিঃ।
ক্ব বত হরিণকাণাং জীবিতঞ্চাতিলোলং
ক্ব চ নিশিতনিপাতা বজ্রসারাঃ শরাস্তে।

—অভিজ্ঞানশকুন্তল. ১. ১০

মৃদু এ মৃগদেহে
মেরো না শর।

আগুন দেবে কে হে
ফুলের 'পর!
কোথা হে মহারাজ
মৃগের প্রাণ—
কোথায় যেন বাজ
তোমার বাণ!

২

সরসিজমনুবিদ্ধং শৈবলেনাপি রম্যং
মলিনমপি হিমাংশোর্লক্ষ্ম লক্ষ্মীং তনোতি।
ইয়মধিকমনোজ্ঞা বল্কলেনাপি তন্বী
কিমিব হি মধুরাণাং মণ্ডনং নাকৃতীনাম্ ॥

—অভিজ্ঞানশকুন্তল. ১. ১৮

কমল শৈবালে ঢাকা তবু রমণীয়,
শশাঙ্ক কলঙ্কী তবু লক্ষ্মীর সে প্রিয়।
এ নারী বল্কল পরি আরো মনোহর—
কী নহে ভূষণ তার যে জন সুন্দর!

[কমল শেয়ালা-মাখা তবু মনোহর,
চাঁদেতে কলঙ্করেখা তথাপি সুন্দর,
বল্কলও মনোজ্ঞ অতি রূপসীর গায়,
মধুর মুরতি যেই কী না সাজে তায়?][১]

৩

অধরঃ কিসলয়রাগঃ কোমলবিটপানুকারিণৌ বাহূ।
কুসুমমিব লোভনীয়ং যৌবনমঙ্গেষু সন্নদ্ধম্ ॥

—অভিজ্ঞানশকুন্তল, ১. ১৯

অধর কিসলয়-রাঙিমা-আঁকা,
যুগল বাহু যেন কোমল শাখা,
হৃদয়-লোভনীয় কুসুম-হেন
তনুতে যৌবন ফুটেছে যেন।

৪

গচ্ছতি পূরঃ শরীরং ধাবতি পশ্চাদসংস্থিতং চেতঃ।
চীনাংশুকমিব কেতোঃ পতিবাতং নীয়মানস্য ॥

—অভিজ্ঞানশকুন্তল, ১. ৩১

শরীর সে ধীরে ধীরে যাইতেছে আগে,
অধীর হৃদয় কিন্তু যায় পিছু-বাগে—
ধ্বজা লয়ে গেলে যথা প্রতিকূল বাতে
পতাকা' তাহার মুখ ফিরায় পশ্চাতে ॥

৫

পাতুং ন প্রথমং ব্যবস্যতি জলং যুষ্মাস্বপীতেষু যা
নাদত্তে প্রিয়মণ্ডনাপি ভবতাং স্নেহেন যা পল্লবম্।
আদ্যে বঃ কুসুমপ্রসূতিসময়ে যস্যা ভবত্যুৎসবং
সেয়ং যাতি শকুন্তলা পতিগৃহং সর্বৈরনুজ্ঞায়তাম্ ॥

—অভিজ্ঞানশকুন্তল, ৪. ৯

তোমাদের জল না করি দান
যে আগে জল না করিত পান ;
সাধ ছিল যার সাজিতে, তবু
স্নেহে পাতাটি না ছিঁড়িত কভু ;
তোমাদের ফুল ফুটিত যবে
যে জন মাতিত মহোৎসবে ;
পতিগৃহে সেই বালিকা যায়,
তোমরা সকলে দেহো বিদায় !

৬

রম্যান্তরঃ কমলিনীহরিতৈঃ সরোভিশ্-
ছায়াদ্রুমৈর্নিয়মিতার্কমরীচিতাপঃ।
ভূয়াৎ কুশেশয়রজোমৃদুরেণুরস্যাঃ
শান্তানুকূলপবনশ্চ শিবশ্চ পন্থাঃ ॥

—অভিজ্ঞানশকুন্তল, ৪, ১১

মাঝে মাঝে পদ্মবনে
পথ তব হোক মনোহর।
ছায়াস্নিগ্ধ তরুরাজি
ঢেকে দিক তীব্র রবিকর।
হোক তব পথধূলি
অতিমৃদু পুষ্পধূলিনিভ।
হোক বায়ু অনুকূল
শান্তিময়, পন্থা হোক শিব।

৭

উগ্‌গলিঅদব্‌ভকঅলা মঈ পরিচ্চত্তণচ্চণা মোরী।
ওসরিঅপণ্ডুপত্তা মুঅন্তি অস্‌সূ বিঅ লদাও॥

—অভিজ্ঞানশকুন্তল, ৪. ১২

মৃগের গলি পড়ে মুখের তৃণ,
ময়ূর নাচে না যে আর,
খসিয়া পড়ে পাতা লতিকা হতে
যেন সে আঁখিজলধার।

৮

যস্য ত্বয়া ব্রণবিরোপণমিঙ্গুদীনাং
তৈলং ন্যষিচ্যত মুখে কুশসূচিবিদ্ধে।
শ্যামাকমুষ্টিপরিবর্ধিতকো জহাতি
সোহয়ং ন পুত্রকৃতকঃ পদবীং মৃগস্তে॥

—অভিজ্ঞানশকুন্তল, ৪. ১৪

ইঙ্গুদীর তৈল দিতে স্নেহসহকারে
কুশক্ষত হলে মুখ যার,
শ্যামাধান্যমুষ্টি দিয়ে পালিয়াছ যারে,
এই মৃগ পুত্র সে তোমার।

৯

শুশ্রূয়স্ব গুরূন্ কুরু প্রিয়সখীবৃত্তিং সপত্নীজনে
ভর্তুর্বিপ্রকৃতাপি রোষণতয়া মাস্ম প্রতীপং গমঃ।

ভূয়িষ্ঠং ভব দক্ষিণা পরিজনে ভাগ্যেষ্বনুৎসেকিনী
যান্ত্যেবং গৃহিণীপদং যুবতয়ো বামাঃ কুলস্যাধয়ঃ ॥
—অভিজ্ঞানশকুন্তল, ৪. ১৮

সেবা কোরো গুরুজনে, সপত্নীরে জেনো সখীসম,
অপরাধী পতি-'পরে রোষভরে হোয়ো না নির্মম।
পরিজনে দয়া রেখো, সৌভাগ্যে হোয়ো না আত্মহারা—
গৃহিণীর এই ধর্ম ; কুলনাশী অন্যরূপ যারা।

১০

অহিণঅমহুলোলুবো তুমং তহ পরিচুম্বিঅ চূঅমঞ্জরিং।
কমলবসইমেত্তণিব্বুদো মহুঅর বিসুমরিঅো সি ণং কহং ॥
—অভিজ্ঞানশকুন্তল, ৫. ১০

নবমধুলোভী ওগো মধুকর,
চূতমঞ্জরী চুমি
কমলনিবাসে যে প্রীতি পেয়েছ
কেমনে ভুলিলে তুমি।

১১

নেপথ্যপরিগতায়াশ্চক্ষুর্দর্শনসমুৎসুকং তস্যাঃ।
সংহর্তুমধীরতয়া ব্যবসিতমিব মে তিরস্করণীম্ ॥
—মালবিকাগ্নিমিত্র, ২. ১

নেপথ্যপরিগত প্রিয়া সে,
রূপখানি দর্শন তিয়াসে
আঁখি মোর উৎসুক দশাতে
তিরস্করণী চাহে খসাতে ॥

১২

উৎপৎস্যতেঽস্তি মম কোঽপি সমানধর্মা।
কালোহ্যয়ং নিরবধির্বিপুলা চ পৃথ্বী ॥
—মালতীমাধব-প্রস্তাবনা

কী জানি মিলিতে পারে মম সমতুল—
সময় অসীম আর পৃথিবী বিপুল।

১৩

লৌকিকানাং হি সাধূনামর্থং বাগনুবর্ততে।
ঋষীণাং পুনরাদ্যানাং বাচমর্থোঽনুধাবতি ॥

—উত্তররামচরিত, ১. ১০

অর্থ পরে বাক্য সরে
লৌকিক যে সাধুগণ তাঁদের কথায়।
আদ্য ঋষিদের বাক্যে
বাক্যগুলি আগে যায়, অর্থ পিছে ধায় ॥

১৪

অকিঞ্চিদপি কুর্বাণঃ সৌখ্যৈর্দুঃখান্যপোহতি।
তত্তস্য কিমপি দ্রব্যং যো হি যস্য প্রিয়ো জনঃ ॥

—উত্তররামচরিত, ৬. ৫

কিছুই করে না, শুধু
সখ্য দিয়ে হরে দুঃখগ্লানি—
যে যাহার প্রিয়জন
সে তাহার কেমন কী জানি।

টীকা :

১ বৈজয়ন্তী পত্রিকা-অনুযায়ী পাঠ
২ পূর্ববর্তী শ্লোকানুবাদেরই রূপান্তর
৩ পাণ্ডুলিপি : চিতাশয্যায়
৪ পাঠান্তর : রশনা
৫ পাঠান্তর : অংশুক
৬ পাঠান্তর : অভিনবধুমলোভী মধুকর

ভট্টনারায়ণ-বররুচি-প্রমুখ কবিগণ

১

সূতো বা সূতপুত্রো বা
যো বা কো বা ভবাম্যহম্।
দৈবায়ত্তং কুলে জন্ম
মদায়ত্তং হি পৌরুষম্॥
—বেণীসংহার, ৩. ৩৭

যেমন তেমন হোক মোর জাত,
হই ডোম হই চামার,
জন্মের কুল সেটা দৈবাৎ—
পৌরুষ সেটা আমার।

২

ইতরপাপফলানি যথেচ্ছয়া
বিতর তানি সহে চতুরানন।
অরসিকেষু রসস্য নিবেদনম্
শিরসি মা লিখ মা লিখ মা লিখ॥
—নীতিরত্ন, ২

চতুরানন, পাপের ফল
যেমন খুশি তব
বিতর মোরে, সকলই আমি
যে ক'রে হোক সব।
মিনতি শুধু— অরসিকেরে
রসের নিবেদন
লিখো না, ওগো, লিখো না ভালে,
লিখো না সে বেদন।

পাঠান্তর

বিধি হে, যত তাপ মোর দিকে
হানিবে, অবিচল রব তাহে।
রসের নিবেদন অরসিকে
ললাটে লিখো না হে, লিখো না হে।

৩

ভদ্রং কৃতং কৃতং মৌনং
কোকিলৈর্জলদাগমে।
দর্দুরা যত্র বক্তারস্-
তত্র মৌনং হি শোভনম্।

—নীতিরত্ন, ১১

ভালোই করেছ, পিক,
চুপ করে রয়েছ আষাঢ়ে।
মৌনই সেথায় শোভে
ভেকেরা যেথায় ডাক ছাড়ে।

৪

কাকঃ কৃষ্ণঃ পিকঃ কৃষ্ণস-
ত্বভেদঃ পিককাকয়োঃ।
বসন্তে সমুপায়াতে
কাকঃ কাকঃ পিকঃ পিকঃ॥

—বররুচি : নীতিরত্ন, ১৩

কাক কালো, পিক কালো,
বর্ষায় সমান তারা ঠিক—
বসন্ত যেমনি আসে
কাক কাক, পিক হয় পিক।

পাঠান্তর

কাক কালো, পিক কালো,
মিথ্যা ভেদ খোঁজা—
বসন্ত যেমনি আসে
ভেদ যায় বোঝা।

৫

কাকস্য পক্ষৌ যদি স্বর্ণযুক্তৌ'
মাণিক্যযুক্তৌ চরণৌ চ তস্য
একৈকপক্ষে গজরাজমুক্তা
তথাপি কাকো ন চ রাজহংসঃ॥

—বররুচি : নীতিরত্ন, ৮

সোনা দিয়ে বাঁধা হোক কাকটার ডানা,
মানিকে জড়ানো হোক তার পা দুখানা,
এক এক পক্ষে তার গজমুক্তা থাক্—
রাজহংস নয় কভু, তবুও সে কাক।

৬

উদ্যোগিনং পুরুষসিংহমুপৈতি লক্ষ্মীর্-
দৈবেন দেয়মিতি কাপুরুষা বদন্তি।
দৈবং নিহত্য কুরু পৌরুষমাত্মশক্ত্যা
যত্নে কৃতে যদি ন সিধ্যতি কোহত্র দোষঃ॥

—ঘটকর্পর : নীতিসার, ১৩

উদ্যোগী পুরুষসিংহ, তারি' 'পরে জানি
কমলা সদয়।
দৈবে করিবেন' দান এ অলসবাণী
কাপুরুষে কয়।
দৈবেরে হানিয়া' করো পৌরুষ আশ্রয়
আপন শক্তিতে।

যত্ন করি সিদ্ধি যদি তবু নাহি হয়
দোষ নাহি ইথে।

পাঠান্তর

সেই তো পুরুষসিংহ উদ্যোগী যে জন,
তারি লক্ষ্মীলাভ।
দৈবপানে চেয়ে থাকে কাপুরুষগণ
দুর্বলস্বভাব।
দৈবেরে পরাস্ত করো আত্মশক্তিবলে,
পৌরুষ তাহাই।
যত্ন করি সিদ্ধি যদি তবুও না ফলে
তাহে দোষ নাই।

পাঠান্তর

লক্ষ্মী সে পুরুষসিংহে করেন ভজন
উদ্যোগী যে জন।
দৈবে করে ফল দান হেন কথা বলে
কাপুরুষ-দলে।
পৌরুষ সাধন করো দৈবেরে বধিয়া
আত্মশক্তি দিয়া।
বহুযত্নে ফল যদি নাহি মিলে হাতে
দোষ কী তাহাতে!

পাঠান্তর

উদ্যোগী পুরুষ বলবান্
লক্ষ্মী করে জয়,
দৈবে আসি করে বরদান
কাপুরুষে কয়।
দৈব ছাড়ি আত্মশক্তিবলে
পৌরুষ লভিবা—
যত্নে যদি সিদ্ধি নাহি ফলে
দোষ তাহে কিবা!

৭

গর্জসি মেঘ ন যচ্ছসি তোয়ং
চাতকপক্ষী ব্যাকুলিতোহহম্।
দৈবাদিহ যদি দক্ষিণবাতঃ
ক্ব ত্বং ক্বাহং ক্ব চ জলপাতঃ ॥

—পূর্বচাতকাষ্টক, ৪

গর্জিছ মেঘ, নাহি বর্ষিছ জল—
আমি যে চাতক পাখি, চিত্ত বিকল—
দৈবাৎ আসে যদি দক্ষিণবাত
কোথা তুমি, কোথা আমি, কোথা জলপাত!

৮

উপকর্তুং যথা স্বল্পঃ
সমর্থো ন তথা মহান্।
প্রায়ঃ কূপস্তৃষাং হন্তি
সততং ন তু বারিধিঃ ॥

—কুসুমদেব : দৃষ্টান্তশতক, ১৩

প্রায় কাজে নাহি লাগে মস্ত ডাগর—
কূপ তৃষা দূর করে, করে না সাগর।

৯

উদয়তি যদি ভানুঃ পশ্চিমে দিগ্‌বিভাগে
বিকসতি যদি পদ্মঃ পর্বতানাং শিখাগ্রে।
প্রচলতি যদি মেরুঃ শীততাং যাতি বহ্নির্-
ন চলতি খলু বাক্যং সজ্জনানাং কদাচিৎ ॥

—কবিভট্ট : পদ্যসংগ্রহ, ৭

উঠে যদি ভানু পশ্চিম দিকে,
পদ্ম বিকাশে গিরিশিরে,

মেরু যদি নড়ে, জুড়ায় বহ্নি—
সাধুর বচন নাহি ফিরে।

১০

সদ্ভিস্তু লীলয়া প্রোক্তং
শিলালিখিতমক্ষরম্।
অসদ্ভিঃ শপথেনাপি
জলে লিখিতমক্ষরম্॥

—সুভাষিতরত্নভাণ্ডাগার

সতের বচন লীলায় কথিত
শিলায়-খোদিত যেন সে।
অসতের কথা শপথজড়িত
জলের লিখন জেনো সে।

১১

নিন্দন্তু নীতিনিপুণা যদি বা স্তুবন্তু
লক্ষ্মীঃ সমাবিশতু গচ্ছতু বা যথেষ্টম্।
অদ্যৈব বা মরণমস্তু যুগান্তরে বা
ন্যায্যাৎ পথঃ প্রবিচলন্তি পদং ন ধীরাঃ॥

—ভর্তৃহরি : নীতিশতক, ১০

নীতিবিশারদ যদি করে নিন্দা অথবা স্তবন,
লক্ষ্মী যদি আসেন বা যথা-ইচ্ছা ছাড়েন ভবন,
অদ্য মৃত্যু হয় যদি কিংবা যদি হয় যুগান্তরে—
ন্যায্য পথ হতে তবু ধীর কভু এক পা না সরে॥

পাঠান্তর

নীতিজ্ঞ করুক নিন্দা অথবা স্তবন,
লক্ষ্মী গৃহে আসুন বা ছাড়ুন ভবন,
অদ্য মৃত্যু হোক কিংবা হোক যুগান্তরে—
ন্যায়পথ হতে ধীর এক-পা[৬] না সরে।

পাঠান্তর

নীতিজ্ঞ বলুন ভালো, গালি বা পাড়ুন,
লক্ষ্মী ঘরে আসুন বা যথেচ্ছা ছাড়ুন,
মৃত্যু চেপে ধরে যদি অথবা পাসরে—
ন্যায্য পথ হতে ধীর এক-পা না সরে।

১২

আরম্ভগুর্বী ক্ষয়িণী ক্রমেণ
লঘ্বী পুরা বৃদ্ধিমতী চ পশ্চাৎ
দিনস্য পূর্বার্ধপরার্ধভিন্না
ছায়েব মৈত্রী খলসজ্জনানাম্।

—ভর্তৃহরি : নীতিশতক, ৭৮

আরম্ভে দেখায় গুরু, ক্রমে হয় ক্ষীণকায়া,
দুর্জনের মৈত্রী যেন পূর্বার্ধদিবসছায়া।
সজ্জনের মৈত্রী ভায় অপরাহ্ণছায়াপ্রায়—
প্রথমে দেখিতে লঘু, কালবশে বৃদ্ধি পায়।

১৩

শম্ভুস্বয়ম্ভুহরয়ো হরিণেক্ষণানাং
যেনাক্রিয়ন্ত সততং গৃহকর্মদাসাঃ।
বাচামগোচরচরিত্রবিচিত্রিতায়
তস্মৈ নমো ভগবতে কুসুমায়ুধায় ॥

—ভর্তৃহরি : শৃঙ্গারশতক, ১

যাঁর তাপে বিধি বিষ্ণু শম্ভু বারো মাস
হরিণেক্ষণার দ্বারে গৃহকর্মদাস,
বাক্য-অগোচর চিত্র চরিত্র যাঁহার,
ভগবান্ পঞ্চবাণ, তাঁরে নমস্কার।

১৪

মধু তিষ্ঠতি বাচি যোষিতাং হৃদি হালাহলমেব কেবলম্।
অতএব নিপীয়তেঽধরো হৃদয়ং মুষ্টিভিরেব তাড্যতে ॥

—ভর্তৃহরি : শৃঙ্গারশতক, ৮৫

নারীর বচনে মধু, হৃদয়েতে হলাহল।
অধরে পিয়ায় সুধা, চিত্তে জ্বালে দাবানল।

১৫

শাস্ত্রং সুচিন্তিতমপি প্রতিচিন্তনীয়ং
স্বারাধিতোঽপি নৃপতিঃ পরিশঙ্কনীয়ঃ।
অঙ্কে স্থিতাপি যুবতিঃ পরিরক্ষণীয়া
শাস্ত্রে নৃপে চ যুবতৌ চ কুতো বশিত্বম্॥

—বানরষ্টক, ২

যত চিন্তা কর শাস্ত্র, চিন্তা আরো বাড়ে।
যত পূজা কর ভূপে, ভয় নাহি ছাড়ে।
কোলে থাকিলেও নারী, রেখো সাবধানে।—
শাস্ত্র নৃপ নারী কভু বশ নাহি মানে।

১৬

যা স্বসদ্মনি পদ্মেঽপি সন্ধ্যাবধি বিজৃম্ভতে
ইন্দিরা মন্দিরেঽন্যেষাং কথং তিষ্ঠতি সা চিরম্॥

—শার্ঙ্গধরপদ্ধতি, ৪৭১

যে পদ্মে লক্ষ্মীর বাস, দিন-অবসানে
সেই পদ্ম মুদে দল সকলেই জানে।
গৃহ যার ফুটে আর মুদে পুনঃপুনঃ
সে লক্ষ্মীরে ত্যাগ করো, শুন, মূঢ়, শুন।

১৭

আশা নাম মনুষ্যাণাং কাচিদাশ্চর্যশৃঙ্খলা।
যয়া বদ্ধাঃ প্রধাবন্তি মুক্তাস্তিষ্ঠন্তি পঙ্গুবৎ॥

—ভর্তৃহরি সুভাষিতসংগ্রহ, ৪০৫

শৃঙ্খল বাঁধিয়া রাখে এই জানি সবে,
আশার শৃঙ্খল কিন্তু অদ্ভুত এ ভবে।
সে যাহারে বাঁধে সেই ঘুরে মরে পাকে,
সে বন্ধন ছাড়ে যবে স্থির হয়ে থাকে।

১৮

মেঘৈর্মেদুরমম্বরং বনভুবঃ শ্যামাস্তমালদ্রুমৈর্-
নক্তং ভীরুরয়ং ত্বমেব তদিমং রাধে গৃহং প্রাপয়।
—জয়দেব : গীতগোবিন্দ, ১. ১

অম্বর অম্বুদে স্নিগ্ধ,
তমালে তমিস্র বনভূমি,
তিমিরশর্বরী, এ যে
শঙ্কাকুল— সঙ্গে লহো তুমি।

পাঠান্তর

মেঘলা গগন, তমাল-কানন
সবুজ ছায়া মেলে—
আঁধার রাতে লও গো সাথে
তরাস-পাওয়া ছেলে।

১৯

পততি পতত্রে বিচলতি পত্রে
শঙ্কিতভবদুপযানম্।
রচয়তি শয়নং সচকিতনয়নং
পশ্যতি তব পন্থানম্॥
—জয়দেব : গীতগোবিন্দ, ৫. ১০

কাঁপিলে পাতা নড়িলে পাখি,
চমকি উঠে চকিত আঁখি।

২০

বদসি যদি কিঞ্চিদপি দন্তরুচিকৌমুদী
হরতি দরতিমিরমতিঘোরম্।

—জয়দেব : গীতগোবিন্দ, ১০. ২

বচন যদি কহ গো দুটি
দশনরুচি উঠিবে ফুটি,
ঘুচাবে মোর মনের ঘোর তামসী।

২১

অলিন্দে কালিন্দীকমলসুরভৌ কুঞ্জবসতের্
বসন্তীং বাসন্তীনবপরিমলোদ্‌গারচিকুরাম্।
ত্বদুৎসঙ্গে লীনাং মদমুকুলিতাক্ষীং পুনরিমাং
কদাহং সেবিষ্যে কিসলয়কলাপব্যজনিনী ॥

—রূপগোস্বামী : হংসদূত, ১১৫

কুঞ্জকুটিরের স্নিগ্ধ অলিন্দের 'পর
কালিন্দীকমলগন্ধ ছুটিবে সুন্দর,
লীনা রবে মদিরাক্ষী তব অঙ্কতলে—
বহিবে বাসন্তীবাস ব্যাকুল কুন্তলে।
তাঁহারে করিব সেবা, কবে হবে হায়—
কিসলয়পাখাখানি দোলাইব গায়?

পাঠান্তর

কুঞ্জকুটিরের স্নিগ্ধ অলিন্দের 'পর
কালিন্দীকমলগন্ধ বহিবে সুন্দর,
মুদিতনয়না লীনা তব অঙ্কতলে,
বাসন্তী সুবাস উঠে এলানো কুন্তলে—
তাঁহার করিব সেবা সেদিন কি হবে
কিসলয়-পাখাখানি দোলাইব যবে?

২২

বীথীষু বীথীষু বিলাসিনীনাং
মুখানি সংবীক্ষ্য শুচিস্মিতানি।
জালেষু জালেষু করং প্রসার্য
লাবণ্যভিক্ষামটতীব চন্দ্রঃ ॥

—সুভাষিতরত্নভাণ্ডাগার

কুঞ্জ-পথে পথে চাঁদ উঁকি দেয় আসি,
দেখে বিলাসিনীদের মুখভরা হাসি।
কর প্রসারণ করি ফিরে সে জাগিয়া
বাতায়নে বাতায়নে লাবণ্য মাগিয়া।

২৩

বরমসৌ দিবসো ন পুনর্নিশা
ননু নিশৈব বরং ন পুনর্দিনম্[১]।
উভয়মেতদুপৈত্বথবা ক্ষয়ং
প্রিয়জনেন ন যত্র সমাগমঃ ॥

—অমরুক : অমরুশতক, ৮০

আসে তো আসুক রাতি, আসুক বা দিবা,
যায় যদি যাক্ নিরবধি।
তাহাদের যাতায়াতে আসে যায় কিবা
প্রিয় মোর নাহি আসে যদি।

২৪

মন্দং নিধেহি চরণৌ পরিধেহি নীলং
বাসঃ পিধেহি বলয়াবলিমঞ্চলেন।
মা জল্প সাহসিনি শারদচন্দ্রকান্ত-
দন্তাংশবস্তব তমাংসি সমাপয়ন্তি ॥

—সুভাষিতরত্নভাণ্ডাগার

ধীরে ধীরে চলো তন্বী, পরো নীলাম্বর,
অঞ্চলে বাঁধিয়া রাখো কঙ্কণ মুখর,
কথাটি কোয়ো না— তব দন্ত-অংশু-রুচি
পথের তিমিররাশি পাছে ফেলে মুছি।

২৫

অপসরতি ন চক্ষুষো মৃগাক্ষী
রজনিরিয়ং চ ন যাতি নৈতি নিদ্রা।

—ত্রিবিক্রমভট্ট : নলচম্পূ, ৭. ৪৯

চক্ষু'পরে মৃগাক্ষীর চিত্রখানি ভাসে—
রজনীও নাহি যায়, নিদ্রাও না আসে!

২৬

নিঃসীমশোভাসৌভাগ্যং নতাঙ্গ্যা নয়নদ্বয়ম্
অন্যোঽন্যালোকনানন্দবিরহাদিব চঞ্চলম্ ॥

—জগন্নাথপণ্ডিত : ভামিনীবিলাস, শৃ. ৪৬

আনতাঙ্গী বালিকার
শোভাসৌভাগ্যের সার
নয়নযুগল,
'না দেখিয়া পরস্পরে
তাই কি বিরহভরে
হয়েছে চঞ্চল?

২৭

হত্বা লোচনবিশিখৈর্গত্বা কতিচিৎ পদানি পদ্মাক্ষী
জীবতি যুবা ন বা কিং ভূয়ো ভূয়ো বিলোকয়তি ॥

—সুভাষিতরত্নভাণ্ডাগার

বিঁধিয়া দিয়া আঁখিবাণে
যায় সে চলি গৃহপানে,
জনমে অনুশোচনা—
বাঁচিল কিনা দেখিবারে
চায় সে ফিরে বারে বারে
কমলবরলোচনা ॥

২৮

লোচনে হরিণগর্বমোচনে
মা বিদূষয় নতাঙ্গি কজ্জলৈঃ।
সায়কঃ সপদি জীবহারকঃ
কিং পুনর্হি গরলেন লেপিতঃ ॥

—সুভাষিতরত্নভাণ্ডাগার

হরিণগর্বমোচন লোচনে
কাজল দিয়ো না সরলে!
এমনি তো বাণ নাশ করে প্রাণ,
কী কাজ লেপিয়া গরলে!

২৯

গতং তদ্‌গাম্ভীর্যং
তটমপি চিতং জালিকশতৈঃ।
সখে হংসোত্তিষ্ঠ
ত্বরিতমমুতো গচ্ছ সরসঃ।

—বল্লভদেব : সুভাষিতাবলি, ৭০৭

সে গাম্ভীর্য গেল কোথা!
নদীতট হেরো হোথা
জালিকেরা জালে ফেলে ঘিরে—
সখে হংস, ওঠো, ওঠো,
সময় থাকিতে ছোটো
হেথা হতে মানসের তীরে।

৩০

অলিরসৌ নলিনীবনবল্লভঃ
কুমুদিনীকুলকেলিকলারসঃ
বিধিবশেন বিদেশমুপাগতঃ
কুটজপুষ্পরসং বহু মন্যতে ॥

—ভ্রমরাষ্টক, ৯

ভ্রমর একদা ছিল পদ্মবনপ্রিয়,
ছিল প্রীতি কুমুদিনী-পানে।
সহসা বিদেশে আসি, হায়, আজ কি ও
কুটজেও বহু বলি মানে!

৩১

অসম্ভাব্যং ন বক্তব্যং
প্রত্যক্ষমপি দৃশ্যতে
শিলা তরতি পানীয়ং
গীতং গায়তি বানরঃ ॥

—চাণক্য : চাণক্যশতক, ৮৯

অসম্ভাব্য না কহিবে, মনে মনে রাখি দিবে
প্রত্যক্ষ যদিও তাহা হয়।
'শিলা জলে ভেসে যায় বানরে সংগীত গায়
দেখিলেও না হয় প্রত্যয়।'[১০]

৩২

দানং প্রিয়বাক্‌সহিতং জ্ঞানমগর্বং ক্ষমান্বিতং শৌর্যম্।
বিত্তং ত্যাগনিযুক্তং দুর্লভমেতচ্চতুর্ভদ্রম্ ॥[১১]

—নারায়ণ পণ্ডিত : হিতোপদেশ

প্রিয়বাক্য-সহ দান, জ্ঞান গর্বহীন,
দান-সহ ধন,
শৌর্য-সহ ক্ষমাগুণ— জগতে এ চারি
দুর্লভ মিলন।

৩৩

পয়সা কমলং কমলেন পয়ঃ
পয়সা কমলেন বিভাতি সরঃ।
মণিনা বলয়ং বলয়েন মণির্-
মণিনা বলয়েন বিভাতি করঃ।
শশিনা চ নিশা নিশয়া চ শশী
শশিনা নিশয়া চ বিভাতি নভঃ।
কবিনা চ বিভুর্বিভুনা চ কবিঃ
কবিনা বিভুনা চ বিভাতি সভা॥
—নবরত্নমালা

জলেতে কমল, জল কমলে,
শোভয়ে সরসী কমলে জলে।
মণিতে বলয়, বলয়ে মণি,
মণি বলয়েতে শোভয়ে পাণি।
নিশিতে শশী, শশীতে নিশি,
আকাশের শোভা উভয়ে মিশি।
কবিতে নৃপতি, নৃপেতে কবি,
নৃপ-কবি-যোগে সভার ছবি।

৩৪

যথৈকেন ন হস্তেন তালিকা সংপ্রপদ্যতে
তথোদ্যমপরিত্যক্তং কর্ম নোৎপাদয়েৎ ফলম্।
—নবরত্নমালা

এক হাতে তালি নাহি বাজে,
যে কাজ উদ্যমহীন
ফলোদয় না হয় সে কাজে।

টীকা :

পাঠান্তর :

১ 'ইতরতাপশতানি', 'ইতরকর্মফলানি' নানা পাঠান্তর আছে। অন্যত্র 'যদৃচ্ছায়', 'বিতর' স্থলে 'বিলিখ', 'অরসিকেষু' স্থলে 'অরসিকে তু', 'রসস্য' স্থলে 'রহস্য' বা 'কবিত্ব'।

২ কাব্যসংগ্রহে প্রথম চরণ : কাকস্য চঞ্চুর্যদি স্বর্ণযুক্তা

৩ তাঁরি

৪ পরে করিবেক

৫ পরকে বিস্মরি

৬ কিছুতে

৭ কাব্যসংগ্রহ-ধৃত পাঠান্তর দ্রষ্টব্য : ষড়্‌রত্ন, ১

৮ কাব্যসংগ্রহ-ধৃত পাঠ : পুনর্দিবা

৯ গ্রন্থপরিচয় দ্রষ্টব্য।

১০ উদ্‌ধৃতি-চিহ্নিত অংশ ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর হইতে গৃহীত। পাঠান্তর 'ভেসে' স্থলে 'ভাসি'।

১১ নবরত্নমালা গ্রন্থে সামান্য পাঠভেদ আছে।

মন্তব্য : সংকলিত সংস্কৃত শ্লোকাবলির পাঠ নানা আধারগ্রন্থে নানারূপ, কদাচিৎ রচয়িতা সম্পর্কেও মতভেদ আছে। রবীন্দ্রনাথ-ধৃত পাঠ অথবা যে পাঠ তিনি ব্যবহার করিয়াছেন জানা যায়, তাহাই এ স্থলে সংকলিত।

২-৯, ১১-১৫, ১৮-২১, ২৩, ৩০ ও ৩১ -সংখ্যক শ্লোক 'শ্রীডাক্তরযোহন-হেবর্লিন'-কর্তৃক সমাহৃত ও মুদ্রাঙ্কিত কাব্যসংগ্রহ (১৮৪৭, পরবর্তী পরিবর্ধিত সংস্করণ : ১৮৬১-৬২ খৃস্টাব্দ) গ্রন্থে দেখা যায়। উপরে পাঠভেদগুলি নির্দেশ করা হইয়াছে ; তাহা ছাড়া ইহাও উল্লেখযোগ্য যে, দ্বাদশ শ্লোকের পাঠ প্রমাদপূর্ণ মনে হওয়াতেই নবরত্নমালা বা সুভাষিতরত্নভাণ্ডাগার-ধৃত পাঠ গৃহীত।

১০, ১২, ১৬, ১৭, ২২-২৯ ও ৩২-সংখ্যক শ্লোক সুভাষিতরত্নভাণ্ডাগার গ্রন্থে যথাযথ পাওয়া যায়, কেবল চতুর্বিংশ শ্লোকের একাংশে 'নীলং / বাসঃ' পাঠ শারঙ্গধরপদ্ধতি (১৮৮০) গ্রন্থের প্রামাণ্যে প্রচলিত সংস্করণে 'বাসো / নীলং' করা হইয়াছে।

বহু স্থলে রবীন্দ্রনাথ মর্মানুবাদ মাত্র করিয়াছেন। চতুর্দশ শ্লোকের শেষাংশ নাটকের প্রয়োজনেই পরিবর্তিত হইয়া থাকিতে পারে ; কিন্তু ইহা উল্লেখযোগ্য যে, ভর্তৃহরি-রচিত মূল কাব্যে পরবর্তী শ্লোকের সূচনাতেই আছে অপসর সখে দূরমস্মাৎ কটাক্ষবিশিখানলাৎ। সপ্তদশ, বিশেষতঃ ষোড়শ শ্লোকের রূপান্তরে অংশতঃ পরিবর্তনও ফাল্গুনী নাট্যকারেরই প্রয়োজনোপযোগী।

সর্বশেষ শ্লোকের অনুরূপ একটি শ্লোক পাওয়া যায় যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতিতে ; সুভাষিতরত্নভাণ্ডাগার-ধৃত পাঠ—

যথা হ্যেকেন চক্রেণ ন রথস্য গতির্ভবেৎ
এবং পুরুষকারেণ বিনা দৈবং ন সিদ্ধ্যতি ॥

পালি-প্রাকৃত কবিতা

১

পালি

বণ্ণগন্ধগুণোপেতং এতং কুসুমসন্ততিং
পূজয়ামি মুনিন্দস্‌স সিরিপাদসরোরুহে।
গন্ধসম্ভারযুত্তেন ধূপেনাহং সুগন্ধিনা
পূজয়ে পূজনেয্যন্তং পূজাভাজনমুত্তমং।

—বৌদ্ধ এদাহিমা

স্বর্ণবর্ণে-সমুজ্জ্বল নবচম্পাদলে
বন্দিব শ্রীমুনীন্দ্রের পাদপদ্মতলে।
পুণ্যগন্ধে পূর্ণ বায়ু হল সুগন্ধিত—
পুষ্পমাল্যে করি তাঁর চরণ বন্দিত ॥

প্রাকৃত

২

বরিস জল ভমই ঘণ গঅণ
সিঅল পবণ মনহরণ
কণঅ পিঅরি ণচই
বিজুরি ফুল্লিআ ণীবা।
পথর বিথর হিঅলা
পিঅলা নিঅলং ণ আবেই ॥

—প্রাকৃতপৈঙ্গল

বৃষ্টিধারা শ্রাবণে ঝরে গগনে,
শীতল পবন বহে সঘনে,
কনকবিজুরি নাচে রে,
অশনি গর্জন করে—
নিষ্ঠুর-অন্তর মম প্রিয়তম নাই ঘরে।

পাঠান্তর

অবিরল ঝরছে শ্রাবণের ধারা,
বনে বনে সজল হাওয়া বয়ে চলেছে,
সোনার বরন ঝলক দিয়ে নেচে উঠছে বিদ্যুৎ,
বজ্র উঠছে গর্জন ক'রে—
নিষ্ঠুর আমার প্রিয়তম ঘরে এল না।

মরাঠী : তুকারাম

১

মাঝিয়ে মঁনীচা জাণা হা নির্ধার।
জিবাসি উদার জালোঁ আতাঁ॥
তুজবিণ দুজেঁ ন ধরীঁ আণিকা।
ভয় লজ্জা শংকা টাকিয়েলী॥
ঠাযীঁচা সংবন্ধ তুজ মজ হোতা।
বিশেষ অনন্ত কেলা সন্তীঁ॥
জীবভাব তুঝ্যা ঠেবিয়েলা পায়ীঁ।
হেঁ চি আতাঁ নাহীঁ লাজ তুম্‌হাঁ॥
তুকা হ্মণে সন্তীঁ ঘাতলা হাবালা।
ন সোডীঁ বিঠ্‌ঠলা পায আতাঁ॥

শুন, দেব এ মনের বাসনানিচয়—
জীবনও সঁপিতে আমি নাহি করি ভয়।[১]
সকলই করেছি ত্যাগ, তোমারেই চাই—
সংশয় আশঙ্কা ভয় আর কিছু নাই।
হে অনন্তদেব, মোর আছিল সম্বন্ধডোর
তব সাথে বহু পূর্বে যাহা,
মিলি যত সাধুগণ আমাদের সে বাঁধন
দৃঢ়তর করিলেন আহা!
আর কিছু নাই, শুধু ভক্তি ও জীবন
যা আছে তোমারই পদে করেছি অর্পণ।
সাধুগণ সঁপিয়াছে আমারে তোমারই কাছে,

আমি কভু ছাড়িব না ও তব চরণ।
তুমিই করো গো মোর লজ্জানিবারণ।

২

নামদেবেঁ কেলেঁ স্বপ্নামাজী জাগেঁ।
সবেঁ পাণ্ডুরংগে যেঊনিয়াঁ ॥
সাংগিতলেঁ কাম করাবেঁ কবিত্ব।
বাউগেঁ নিমিত্য বোলোঁ নকো ॥
মাপ টাকী সল ধরিলী বিঠ্ঠলেঁ।
থাপটোনি কেলেঁ সাবধান ॥
প্রমাণাচী সংখ্যা সাংগে শত কোটী।
উরলে শেবটীঁ লাবী তুকা ॥

নামদেব পাণ্ডুরঙ্গে লয়ে সঙ্গে ক'রে
একদা দিলেন দেখা স্বপ্নে তিনি মোরে।
আদেশ করিলা মোরে কবিতারচনে
মিছা দিন না যাপিয়া প্রলাপবচনে।
ছন্দ কহি দিলা মোরে, ' আদেশিলা পিছু—
বিঠলেরে লক্ষ্য কোরো লিখিবে যা-কিছু।'
কহিলেন পিঠ মোর চাপড়িয়া হাতে
এক শত কোটি শ্লোক হইবে পূরাতে।

৩

দ্যাল ঠাব তরি রাহেন সংগতী।
সন্তাচে পংগতী পায়াঁপাশীঁ ॥
আবডীচা ঠাব আলোঁসেঁ টাকুন।
আতাঁ উদাসীন ন ধরাবেঁ ॥
সেবটলি স্ছল নীচ মাঝী বৃত্তি।
আধারেঁ বিশ্রান্তী পাবঈন ॥
নামদেবা পায়ীঁ তুক্যা স্বপ্নীঁ ভেটী।
প্রসাদ হা পোঁটী রাহিলাসে ॥

যদি মোরে স্থান দাও তব পদছায়
দিবানিশি সাধুসঙ্গে রহিব সেথায়।

যাহা ভালোবাসিতাম ছেড়েছি সকল,
তুমি মোরে ছাড়িয়ো না শুন গো বিঠ্‌ঠল!
চরণের এক পাশে দেহ যদি স্থান
শান্তিসুখে কাটাইব এ মম পরান।
নামদেবে মোর ' কাছে পাঠালে স্বপনে,
'এই অনুগ্রহ তব' গাঁথা র'ল মনে।

৪

মজচি ভোঁবতা কেলা যেণেঁ ভোগ।
কায় যাচা ভোগ অন্তরলা॥
চালোনিয়াঁ ঘরা সর্ব সুখেঁ য়েতী।
মাঝী তোঁ ফজীতী চুকেচি না॥
কোণাচী বাঈল হোউনিয়াঁ বোটূ।
সংবসারী কাটূ আপদা কিতী॥
কায় তরী দেউঁ তোড়তীল পোরেঁ।
মরতী তরী বরেঁ হোতেঁ আতা॥
কাহীঁ নেদী বাঁচোঁ ধোবিয়েলেঁ ঘর।
সারবাবয়া ঢোরশেণ নাহীঁ॥
তুকা ম্হণে রাণ্ড ন করিতাঁ বিচার।
বাহুনিয়াঁ ভার কুঞ্ছে মাথাঁ॥

'আমারই বেলায় উনি যোগী! নিজের তো বাকি নাই সুখ—
সব সুখ ঘরে আসে, শুধু আমারই তো ঘুচিল না দুখ।
ঘরে মোর অন্ন নেই ব'লে বলো দেখি যাই কার দ্বার?
এই পোড়া সংসারের তরে আপদ সহিব কত আর?
অন্ন অন্ন ক'রে রাত দিন ছেলেগুলো খেলে যে আমায়!
মরণ তাদের হয় যদি সকল বালাই ঘুচে যায়।
সকলই ঝেঁটিয়ে নিয়ে যান, তিলমাত্র ঘরে থাকা ভার।'
তুকা বলে, 'দূর, পোড়ামুখী, আপনি মাথায় নিলি ভার।
এখন তাহার তরে মিছে কাঁদিলে কী হবে বল্ আর!'

৫

কায় নেণোঁ হোতা দাবেদার মেলা।
বৈর তো সাধিলা হোউনি গোহো॥

কিতী সর্বকাল সোসাবেঁ হেঁ দুঃখ।
কিতী লোকাঁ মুখ বাঁসূ তরী॥
ঝবে আপুলী আঈ কায় মাঝেঁ কেলেঁ।
ধড় যা বিট্টলে সংসারা চেঁ॥
তুকা ম্হণে যেতী বাঈলে আসড়ে।
ফুন্দোনিয়াঁ রড়ে হাঁসে কাঁহীঁ॥

'বোধ হয় এ পাষণ্ড পূর্বজন্মে ছিল মোর অরি,
এ জনমে স্বামী হয়ে বৈর সাধিতেছে এত করি।
কত 'জ্বালা সবো বলো' আর! কত ভিক্ষা মাগি পরদ্বারে!
বিঠোবার মুখে ছাই! কী ভালো করেন এ সংসারে!'
তুকা বলে, 'স্ত্রী আমার রাগিয়া কতই কটু ভাষে—
কভুবা কাঁদিয়া মরে, কভুবা আপনমনে হাসে।'

৬

গোণী আলী ঘরা।
দাণে খাউঁ নেদী পোরা॥
ভরী লোকাঞ্চী পাটোরী।
মেলা চোরটা খাণোরী॥
খবসলী পিসী।
হাতা ঝোম্বে জৈসী লাসী॥
তুকা ম্হণে খোটা।
রাণ্ডে সঞ্চিতাচা সাঁটা॥

'ঘরে দুটো অন্ন এলে ছেলেদের দেবো কোথা খেতে,
হতভাগা তা দেবে না— সকলই পরেরে যান দিতে।'
তুকা বলে, 'অতিথিরে যখনি গো দিতে যাই ভাত,
রাক্ষসীর মতো এসে হতভাগী ধরে মোর হাত।'
'না জানি যে পূর্বজন্মে কতই করিয়াছিলি পাপ'
তুকা বলে, 'এ জনমে তাই এত পেতেছিস তাপ।'

৭

আতাঁ পোরা কায় খাসী।
গোহো ঝালা দেবলসী॥

ডোচকেঁ তিম্বী ঘাতল্যা মালা।
উদমাচা সাঙী চালা ॥
আপল্যা পোটা কেলী থোর।
আমচা নাহীঁ যেসপার ॥
হাতী টাল তোণ্ড বাসী।
গায় দে উলী দেবাপাশী ॥
আতাঁ আম্হী করূঁ কায়।
ন বসে ঘরীঁ রানা জায় ॥
তুকা হ্মণে আতাঁ ধীরী।
আজুনী নাহীঁ জালে তরী ॥

'খাবার কোথায় পাবি বাছা,
বাপ তোর থাকেন মন্দিরে—
মাথায় জড়ান তিনি মালা,
ঘরে আর আসেন না ফিরে।
নিজের হলেই হল খাওয়া,
আমাদের দেখেন না চেয়ে।
খর্তাল বাজিয়ে তিনি শুধু
মন্দিরে বেড়ান গেয়ে গেয়ে।
কী করিব বল্ দেখি বাছা,
কিছুই তো ভেবে নাহি পাই।
ঘরে না বসেন এক রতি,
চলে যান অরণ্যে সদাই।'
তুকা বলে, 'ধৈর্য ধরো মনে,
এখনো সকল ফুরায় নাই।'

৮

বরেঁ ঝালেঁ গেলেঁ।
আজী অবঘেঁ মিলালেঁ ॥
আতাঁ খাঈন পোটভরী।
ওল্যা কোরড্যা ভাকরি ॥
কিতী তরী তোণ্ড।
বাঁশী বাজবুঁ মী রাণ্ড ॥
তুকা বাইলে মানবলা।
ছিথু করূনিয়াঁ বোলা ॥

'গেছে সে আপদ গেছে, ঘরেতে থাকিবে তবু রুটি।
যা হোক তা হোক ক'রে পেট ভ'রে খেতে পাব দুটি।
বোকে বোকে দিনু এলে, জ্বালাতন হনু হাড়ে মাসে।'
তুকা বলে, 'যদিও সে দিবানিশি কত কটু ভাষে,
তুকারে তুকার স্ত্রী মনে মনে তবু ভালোবাসে।'

৯

ন করবে ধন্দা।
আইতা তোণ্ডী পড়ে লোন্দা ॥
উঠি তেঁ তেঁ কুটিতেঁ টাল।
অবঘা মাণ্ডিলা কোলাহল ॥
জিবস্তচি মেলে।
লাজা বাটুনিয়াঁ প্যালে ॥
সঁবসারাকড়ে।
ন পাহাতী ওস পড়ে ॥
তলমলতী যাঞ্চ্যা রাণ্ডা।
ঘালিতী জীবা নাঁবেঁ ধোণ্ডা ॥
তুকা ক্ষ্মণে বরেঁ ঝালেঁ।
ঘে গে বাইলে লিহিলেঁ ॥

'ঘরে আর আসে না সে— কোনো পরিশ্রম নাহি ক'রে
নিজে নাকি খেতে পায় রোজ রোজ সুখে পেট ভরে!
না উঠিতে শয্যা হতে মিলি দলবলগুলা-সাথে
করতাল বাজাইতে আরম্ভ করেন অতি প্রাতে।
খেয়েছে লজ্জার মাথা, জ্যান্তে তারা মড়ার মতন—
ঘরে আছে ছেলেপিলে, তাদের তো না করে যতন।
স্ত্রী তাদের পড়ে আছে— হতভাগী লজ্জা-দুঃখ-ভরে
অভিশাপ দিতে দিতে মাথায় পাথর ভেঙে মরে।'
'ভাগ্যে যাহা আছে তাহা'— তুকা বলে, 'থাক সহ্য ক'রে।'

১০

কোণ ঘরা যেতেঁ আমুচ্যা কাশালা।
কায় জ্যাচা ত্যালা নাহীঁ ধন্দা ॥

দেবাসাঠী ঝালেঁ ব্রহ্মাণ্ড সোইরেঁ।
কোঁবল্যা উত্তরেঁ কায় বেঁচে ॥
মানেঁ পাচারিতাঁ নব্হে আরাণুক।
ঐসেঁ যেতী লোক প্রীতীসাঠীঁ ॥
তুকা ম্হাণে রাণ্ডে নাবড়ে ভূষণ।
কঁতেলোঁসেঁ শ্বান লাগে পাঠীঁ ॥

'হেথা কেন আসে লোকগুলা,
তাদের কি কাজ নাই হাতে?'
তুকা কহে, 'ঈশ্বরের বরে
ব্রহ্মাণ্ড মিলেছে মোর সাথে।
"ভালোমুখে দু-চারিটা কথা
না জানি তাহে কী ক্ষতি আছে!"
কোথাও যায় না যারা কভু
ভালোবেসে আসে মোর কাছে।
এও সে বাসে না ভালো— হায়,
ভাগ্য কিবা আছে এর বাড়া!
সকল লোকের পাছে পাছে
কুকুরের মতো করে তাড়া।'

১১

আম্হী জাতোঁ আপুল্যা গাঁবা।
আম্‌চা রামরাম ঘ্যাবা ॥
তুমচী আমচী হে চি ভেটী।
যেথুনিয়াঁ জন্মতুটী ॥
আতাঁ অসোঁ দ্যাবী দয়া।
তুমচ্যা লাগতসেঁ পায়াঁ ॥
যে তাঁ নিজধামী কোণী।
বিঠ্ঠল বিঠ্ঠল বোলা বাণী ॥
রামকৃষ্ণ মুখী বোলা।
তুকা জাতো বৈকুণ্ঠালা ॥

দেও গো বিদায় এবে যাই নিজধামে—
এতকাল আছিলাম তোমাদের গ্রামে।

আর কী কহিব বলো, মনে রেখো মোরে—
আর না ভ্রমিতে হবে সংসারের ঘোরে।
বলো সবে রাম কৃষ্ণ বিঠ্‌ঠলের নাম
বৈকুণ্ঠে পৃথিবী ছাড়ি যায় তুকারাম।

১২

ঘরিঞ্চি দারিঞ্চি সুখী তুহ্মি নান্দা।
বডিলাঁসি সাঙ্গা দণ্ডবত॥
মধাচিয়ে গোড়ী মাশী ঘালি উড়ি।
গেলি প্রাপ্তঘড়ী পুন্‌হা নয়ে॥
গঙ্গেচা তো ওঘ সাগরাসী গেলা।
নাহিঁ মাগেঁ আলা পরতোনী॥
ঐসিয়া শব্দাচা বরা হেত ধরা।
উপকার করা তুকয়াবরী॥

বাহিরে ও ঘরে মোর আছ যারা যারা
এই আশীর্বাদ— সুখে থাকো গো তোমরা।
গুরু পূজ্যলোক মোর রয়েছেন যত
প্রণতি তাঁদের মোর জানাইবে শত।
মধু-অন্বেষণ-তরে অলি যায় উড়ে—
বস্ত্র ছিন্ন হলে পরে আর কি সে জুড়ে?
নদী যবে একবার সাগরেতে মিশে
তার সেই স্রোত আর ফিরাইবে কিসে?
এই-সব কথাগুলি মনে জেনো সার—
এই-যে চলিল তুকা ফিরিবে না আর।

১৩

পতাকাঞ্চা ভার মৃদঙ্গাচা ঘোষ।
জাতী হরিদাস পংঢরীসী॥
লোকাঞ্চী পংঢরী আহে ভূমীবরী।
আহ্মা জাণে দূরী বৈকুণ্ঠাসী॥
কাহীঁ কেল্যা তুহ্মা উমজেনা বাট।
হ্মনুনি বোভাট করূনি জাতোঁ॥
মাগেঁ পুটে রডাল করাল আরোলী।
মগ কদাকালী তুকা ন য়ে॥

ধরায় পাণ্ডরী আছে লোকেদের তরে,
আমি চলিলাম কিন্তু বৈকুণ্ঠের 'পরে।
যাহা-কিছু কর সবে ইহা জেনো সার—
বৈকুণ্ঠের সেই পথ খুঁজে পাওয়া ভার।
আমি গেলে কাঁদিবে সকলে উচ্চরবে,
কিন্তু আর ফিরিব না মনে জেনো সবে।
আমার যে পথ, বড়ো সহজ সে নয়—
দুর্গম সে পথ অতি জানিয়ো নিশ্চয়।

১৪

সখে সজ্জনহো ঘ্যারে রামনাম।
সঙ্গে এতো কোণ নিশ্চয়েসী॥
আমুচে গাবীঞ্চে জরী রত্ন গেলেঁ।
নাহিঁ সাংগীতলে ম্হণাল কোণী॥
ম্হণোনীয়া জরী তুম্হাঁ করিতোঁ ঠাওয়েঁ।
ন কলে তরী জাওয়ে পুঢে বাটে॥
ইতক্যাবরী রহাল জরী তুম্হি মাগে।
তুকা নিরোপ সাঙ্গে বিঠোবাশিঁ॥

বন্ধুগণ, শুন, রামনাম করো সবে—
তিনি ছাড়া সত্য বলো কী আছে এ ভবে।
'গ্রামের রত্ন যে ছিল সে ছাড়িল দেহ
মোদের সে বার্তা তবু জানালে না কেহ'
পাছে এই কথা বলো ভয় করি, তাই
পৃথ্বী ছাড়িবার আগে জানাইনু ভাই!
লইয়া ধ্বজার বোঝা, করি ভেরীরব
পাণ্ডরীপুরেতে যায় হরিভক্ত সব।

১৫

তুকা উতরলা তুকীঁ।
নবল জালেঁ তিহীঁ লোকীঁ॥
নিত্য করিতোঁ কীর্তন।
হেঁ চি মাঝেঁ অনুষ্ঠান॥

তুকা বৈসলা বিমানী।
সন্ত পাহাতী লোচনী॥
দেব ভাবাচা ভুকেলা।
তুকা বৈকুণ্ঠাসী নেলা॥

তুকার পরীক্ষা শেষ হয়,
তিন লোকে লাগিল বিস্ময়।
প্রত্যহ দেবতাগুণগান
ইথে তার কেটে গেছে প্রাণ

তুকা বসি আছে স্বর্গরথে,
দেবগণ দেখে স্বর্গ হতে।
বিধি তিনি ভক্তি শুধু চান,
তুকারে বৈকুণ্ঠে লয়ে যান।

টীকা

১ নবরত্নমালা-ধৃত প্রথম-দ্বিতীয় ছত্র—

শুন, দেব, মনে যাহা করেছি নিশ্চয়,
জীবন সঁপিনু পদে হইয়ে নির্ভয়।

২ নবরত্নমালায় পাঠান্তর—

গম্ভীর সে বাণী,
বিঠ্ঠলজী নিজহস্তে ধরেন লেখনী।

৩ নবরত্নমালা : দেও
৪ নবরত্নমালা : তুকা-
৫ নবরত্নমালা : তোমার প্রসাদ এই
৬ নবরত্নমালা : দুঃখ সব
৭ শব্দটি পাণ্ডুলিপিতে নাই।
৮ পাণ্ডুলিপিতে : এখনি
৯ নবরত্নমালা : স্ত্রী যে
১০ নবরত্নমালা : লাজ
১১ পাণ্ডুলিপি : নেই
১২ পাণ্ডুলিপি : পৃথিবী
১৩ ছত্রদ্বয়ের পাণ্ডুলিপি-ধৃত পাঠ—

দুচারিটা ভালো বাকো
তাতে কিবা ক্ষতি বৃদ্ধি আ[ছে]

মন্তব্য : ১, ২, ৩, ৫, ৮, ৯, ১৩, ১৪ ও ১৫ -সংখ্যক তুকারাম-ভজনের ভাষান্তর পাণ্ডুলিপি হইতে সংকলিত। ৪, ৭, ১০ ও ১১ -সংখ্যক রূপান্তর নবরত্নমালা হইতে গৃহীত। ৬ ও ১২ -সংখ্যক বাংলা কবিতার পাঠ নবরত্নমালায় ও মালতীপুঁথিতে অভিন্ন। মালতীপুঁথির জীর্ণতা-বশতঃ ৪, ৭, ১০ ও ১১ -সংখ্যক রূপান্তর পাণ্ডুলিপিতে কোনো কোনো স্থলে পড়া যায় না।

হিন্দী : মধ্যযুগ

১

গুরুচরণনকী আশা।
গুরুকৃপা ভব নিশা সিরাণী
দীপত জ্ঞান উজ্বালা।
কারী কমরিয়া গুরু মোহি দীনী,
নাম জপনকো মালা।
জল পীবন কো তুম্বী দীনী
আসন্ চরণন পাসা।
গুরুচরণনকী আশা॥

—গোরখনাথের অন্যতম শিষ্য

গুরু, আমার মুক্তিধনের
দেখাও দিশা।
কম্বল মোর সম্বল হোক
দিবানিশা।
সম্পদ হোক জপের মালা
নামমণির দীপ্তি -জ্বালা
তুম্বীতে পান করব যে জল
মিটবে তাহে বিষয়-তৃষা।

২

করবোঁ মৈঁ কবন বহানা
গবন হমরো নিয়রানা।
সব সখিয়নমেঁ চুনরী মোরী মৈলী—
দুজে পিয়া ঘর জানা।
এক লাজ মোহী শাস ননদকী—
দুজে পিয়া মারে তানা।
পিয়াকে পগিয়া রঙ্গী জোনা রঙ্গমে
হমরো চুনরিয়া রঙ্গানা॥

—কবীর

চূড়াটি তোমার
যে রঙে রাঙালে, প্রিয়,
সে রঙে আমার
চুনরি রাঙিয়ে দিয়ো।

পাঠান্তর

তোমার ঐ মাথার চূড়ায়
যে রঙ আছে উজ্জ্বলি
সে রঙ দিয়ে রাঙাও আমার
বুকের কাঁচলি।

শিখ ভজন

১

এ হরি সুন্দর এ হরি সুন্দর
তেরো চরণপর সির নাবেঁ।
সেবক জনকে সেব সেব পর
প্রেমী জনাঁকে প্রেম প্রেম পর
দুঃখী জনাঁকে বেদন বেদন
সুখী জনাঁকে আনন্দ এ।
বনা-বনামেঁ সাঁবল সাঁবল
গিরি-গিরিমেঁ উন্নিত উন্নিত
সলিতা-সলিতা চঞ্চল চঞ্চল
সাগর-সাগর গম্ভীর এ।
চন্দ্র সূরজ বঁরে নিরমল দীপা
তেরো জগমন্দির উজার এ।

এ হরি সুন্দর, এ হরি সুন্দর,
মস্তক নমি তব চরণ-'পরে।

সেবক জনের সেবায় সেবায়,
প্রেমিক জনের প্রেমমহিমায়,
দুঃখী জনের বেদনে বেদনে,
সুখীর আনন্দে সুন্দর হে,
মস্তক নমি তব চরণ-'পরে।
কাননে কাননে শ্যামল শ্যামল,
পর্বতে পর্বতে উন্নত উন্নত,
নদীতে নদীতে চঞ্চল চঞ্চল,
সাগরে সাগরে গম্ভীর হে,
মস্তক নমি তব চরণ-'পরে।
চন্দ্র সূর্য জ্বালে নির্মল দীপ—
তব জগমন্দির উজল করে,
মস্তক নমি তব চরণ-'পরে।

২

বাদে বাদে রম্যবীণা বাদে—
    অমল কমল বিচ
উজল রজনী বিচ
    কাজর ঘন বিচ
নিশ আধিয়ারা বিচ
    বীণ রণন সুনায়ে।
বাদে বাদে রম্যবীণা বাদে॥

বাজে বাজে রম্যবীণা বাজে—
অমলকমল-মাঝে, জ্যোৎস্নারজনী-মাঝে,
কাজলঘন-মাঝে, নিশি-আঁধার-মাঝে,
কুসুমসুরভি-মাঝে বীণরণন শুনি যে
প্রেমে প্রেমে বাজে॥

পরিশিষ্ট ১

মৈথিলী : বিদ্যাপতি

১

নায়িকা সঁ দূতি উক্তি

কণ্টক মাঁহ কুসুম পরগাসে।
বিকল ভমর নহিঁ পাবথি বাসে॥
ভমরা ভরমে রমে সভ ঠামেঁ।
তুঅ বিনু মালতি নহিঁ বিসরামেঁ॥
৫ মধুজীব তোঁহেঁ মধু রাসে।
সঞ্চি ধরিএ মধু মনহিঁ লজা সে॥
অপনহুঁ মন দয় বুঝু অবগাহে।
ভমর মরত বধ লাগত কাহে॥
ভনহিঁ বিদ্যাপতি তৌ পয় জীরে।
অধর সুধা রস জৌঁ পয় পীরে॥ ২

[ক]ণ্টকমাঝারে কুসুমপরকাশ,
[বি]কল ভ্রমর সেথা নাহি পায় বাস।
[ভ্র]মভরে ভ্রমর রমিছে নানা ঠাই—
[তু]হু বিনা, হে মালতী, বিশ্রাম নাই।
[৫]যে মধুজীবী তোমারি মধু চায়—
[স]ঞ্চি রেখেছ মধু মনের লজ্জায়।
[আ]পনার মন দিয়া বুঝ সুবিচারে
[ভ্রম]রবধের দায় লাগিবে কাহারে।
[বি]দ্যাপতি ভনয়ে তখনি পাবে প্রাণ
[অ]ধরপীযূষরস যদি করে পান॥ ২

২

নায়ক সঁ দূতি বচন

মাধব করিঅ সুমুখি সমধানে।
তুঅ অভিসার কয়লি জত সুন্দরি
কামিনি করু কে আনে॥

…

[১] দেখি ভবন ভিতি লিখল ভুজঙ্গ পতি
জসু মন পরম তরাসে।
সে সুবদনি কর ঝপইতি ফণি মণি
বিহসি আইলি তুঅ পাসে॥

…

কাম প্রেম দুহু এক মত ভয় রহু
কখনে কী ন করাবে॥ ৭

সুন্দরী রমণী তোমার অভিসার যত করিয়াছে,
এত আর কে করিয়াছে?
[ভ]বনভিত্তিতে লিখিত [ভু]জঙ্গপতি দেখিয়া
যার মন [প]রম ত্রাসিত হয়,
সেই সুবদনী [ফ]ণিমণি করে ঢাকিয়া
হাসিয়া [তে]ামার কাছে আসিল।*

…

কাম প্রেম উভয়ে যদি একমত হইয়া থাকে,
তবে কখন্ কী না করায়! ৭

৩

নায়ক সঁ নায়িকা বচন

রাহু মেঘ ভয় গরসল সূর।
পথ পরিচয় দিবসহিঁ ভেল দূর
নহিঁ বরিসয় অবসর নহিঁ হোএ।
পুর পরিজন সঞ্চর নহিঁ কোএ॥

…

এহি সংসার সারবস্তু এহ।
তিলা এক সঙ্গম ভাব ভিব নেহ॥ ১৯

---

* করে [ফ]ণিমণি ঢাকিবার তাৎপর্য [বো]ধ করি এইরূপ হইবে যে, [পা]ছে ফণিমণির আলোকে [তা]হাকে দেখা যায়, গোপন অভিসারের ব্যাঘাত করে।

[র]াহু মেঘ হইয়া/আকার ধারণ করিয়া, সূর্য গ্রাস করিল।

…

এখন বর্ষণ হইতেছে না,
এবং দিনের বেলায় অবসর নাই,
সেই-হেতু পুরপরিজন কেহ সঞ্চরণ করিতে[ছে] না।

…

যাবজ্জীবন প্রেমের পর এক তিল সঙ্গম। ১৯

৪

রাধা কৃষ্ণ বিলাস বর্ণন

বদন মিলায় ধয়ল মুখ মণ্ডল
কমল বিমল জনি চন্দা।
ভমর চকোর দুঅও অলসাএল
পীবি অমিঅ মকরন্দা ॥৩৭

মুখমণ্ডলে বদন মিলাইয়া ধরিল,
পদ্মের উপরে চাঁদ।
অমিয়-মকরন্দ পান করিয়া
পবন ও চকোর দুজনেই অলসিত হইল।—
কামিনী চকোর, পুরুষ ভ্রমর। ৩৭

৫

সখী সঁ নায়িকা বচন

সমুদ্র ঐসনি নিসি ন পারিঅ ওরে।
কখন উগত মোর হিত ভয় সূরে॥ ৩৮

[স]মুদ্রের মতো নিশির [পার] পাই না।
[আ]মার হিতকর হইয়া [সূ]র্য কখন্ উদিত হয়! ৩৮

৬

নায়ক ও মুগ্ধা নায়িকা মিলন

মাধব সিরিস কুসুম সম রাহী।
লোভিত মধুকর কৌসল অনুসর
নব রস পিবু অবগাহী ॥

...

আরতি পতি পরতীতি ন মানথি
কি করথি কেলিক নামেঁ ॥

...

চাঁপল রোস জলজ ভনি কামিনি
মেদনি দেল উপেখে।

...

এক অধর কৈ নীবি নিরোপলি
দৃ পুনি তীনি ন হোঈ।
কুচ জুগ পাঁচ পাঁচ শশি উগল
কি লয় ধরথি ধনি গোঈ ॥
আকুল অলপ বেয়াকুল লোচন
আঁতর পূরল নীরে।
মনমথি মীন বনসি লয় বেধল
দেহ দসো দিশি ফীরে ॥
ভনহিঁ বিদ্যাপতি দুহুক মুদিত মন
মধুকর লোভিত কেলী।
অসহ সহথি কত কোমল কামিনী
জামিনি জিব দয় গেলী ॥ ২৯

লোভিত মধুকর কৌশল অনুসরি
অবগাহিয়া নবরস পান করে।

...

আরতি পতি পরতীতি মানে না—
কেলির নামে কী করে!

...

রোষে যেন মাটিতে উপেক্ষায়
পদ্মকে চাপিল।
এক হাত অধরে, এক হাত নীবিতে,

কিন্তু তিন হাত তো নেই—
কুচযুগে যে পাঁচটা পাঁচটা
শশী উদিত হই[ল]
কী দিয়ে ধনী সেটা গোপন করে!
অম্ব আকুল, ব্যাকুল লোচনাম্বুর
নীরে [পূরিল]
মন্মথ মীনকে বংশী দিয়া বিঁধিল,
তাহা[র...] দশ দিকে ফিরিতেছে।

...

কোমল কামিনী অসহ কত সয়—
যামিনী জীবন দিয়া গেল। ২৯

৭

সখী সঁ নায়িকা বচন

সখি হে কিলয় বুঝাএব কন্তে।
তনিকা জন্ম হোইত হম গেলহুঁ
ঐলহুঁ তনিকর অন্তে ॥
জাহি লয় গেলহুঁ সে চল আএল
তৈঁ তরু রহলি ছপাঈ।
সে পুনি গেল তাহি হম আনলি
তৈঁ হম পরম অন্যাঈ।
জৈঁতহি নাল কমল হম তোরলি
করয় চাহ অবশেখে।
কোহ কোহাএল মধুকর ধায়ল
তেঁহি অধর করু দংশে ॥
লেলি ভরল কুম্ভ তৈঁ উর গাসলি
সসরি খসল কেশ পাশে।
সখি দস আগুপাছু ভয় চললিহি
তেঁ উর্ধ স্বাস ন বাকে ॥
ভনহিঁ বিদ্যাপতি সুনু বর জৌমতি
ঈ সভ রাখু মন গোঈ।
দিন দিন ননদি সঁ প্রীতি বঢ়াএব
বোলি বেকত জনু হোঈ ॥ ৩৯

[যঁ]াহার জন্মে গেলেম [তঁ]াহার অন্তে আসিলাম।
সূর্যোদয়ে অথবা চন্দ্রোদয়ে (?) গেলেম,
সূর্যাস্তে বা চন্দ্রাস্তে আসিলাম।
যাহার জন্য গেলেম সে চলিয়া আসি[ল],
তাই তরুতলে লুকাইলাম।
সে পুন গেল, তাকে আমি আনিলা[ম],
সে আমার পরম অন্যায়।
যখন কমল নাল ভাঙিয়া অবশেষে হাতে লইলাম
শব্দ করিয়া মধুকর ধাইল,
আমার অধর দংশন করিল।
কুম্ভ ভরিয়া লইলাম,
তাই উরস্থল গ্রাসিয়া কেশপাশ সরিয়া খসিয়া পড়িল।
দশজন সখী আগুপাছু হইয়া চলিল,
তেঁই উর্‌ধ্বশ্বাস ও বাক্য নাই।...

মনে গোপন করিয়া রাখ।
দিনে দিনে ননদীর সহিত প্রীতি বাড়াই[বি],
বললে পাছে ব্যক্ত হয়ে পড়ে। ৩৯

৮

ননদি সঁ নায়িকা বচন

ননদী সরূপ নিরূপহ দোসে।
বিনু বিচার ব্যভিচার বুঝেবহ
সাসু করয়বহ রোসে॥
কৌতুক কমল নাল হম তোড়লি
করয় চাহলি অবতংসে।
রোষ কোষ সঁ মধুকর ধাওল
তেঁহি অধর করু দংশে॥
সরোবর ঘাট বাট কণ্টক তরু
হেরি নহিঁ সকলহুঁ আগু।
সাঁকর বাট উবটি হম চললহুঁ
তেঁ কুচ কণ্টক লাগু॥

গরূঅ কুম্ভ সির থির নহিঁ থাকয়
তেঁও ধসল কেশ পাসে।
সখি জন সঁ হম পাছু পড়লহুঁ
তেঁ ভেল দীর্ঘ নিশাসে॥
পথ অপরাধ পিশুন পরচারল
তথিহুঁ উতর হম দেলা।
অমরখ তাহি ধৈরজ নহিঁ রহলৈ
তেঁ গদ গদ সুর ভেলা॥
বনহি বিদ্যাপতি সুনু বর জউবতি
ঈ সভ রাখহ গোঈ।
নন্‌দী সঁ রস রীতি বচাওব
গুপুত বেকত নহিঁ হোঈ॥ ৪০

বিনা বিচারে ব্যভিচার বুঝ, শাশুড়িকে রাগাও।
কৌতুকে কমলনাল তুলিয়া
অবতংস করিতে চাহিলাম,
রোষে আক্রোশে মধুকর ধাইয়া অধর দংশন করিল।
সরোবর-ঘাটে বাটে কণ্টকতরু,
সকলগুলে[!] আবার চোখেও পড়ে না।

…

তাই কেশপাশ ধসিল,
আমি সখীদের পিছিয়ে পড়েছিলুম
তাই দীর্ঘনিশ্বাস।
পথে অপরাধের নিন্দা প্রচারিল,
আমি তার উত্তর দিলেম।
মূর্খ, তাই ধৈর্য ছিল না—
স্বরটা সেই জন্যে গদ্‌গদ-গোছ হয়েছে।

…

ননদী হইতে রসরীতি বাঁচিয়ে রেখো,
দেখো গোপন যেন ব্যক্ত না হয়ে পড়ে। ৪০

৯

সখী সঁ নায়িকা বচন

... একহিঁ নগর বসু মাধব সজনী
পর ভাবিনি বস ভেল।
...
অভিনব এক কমল ফুল সজনী
দৌনা নীমক ডার।
সেহো ফুল ওতহি সুখাএল সজনী
রসময় ফুলল নেবার।
বিধি বস আজ আএল ছথি সজনী
এত দিন ওতহি গমায়।
কোন পরি করব সমাগম সজনী
মোর মন নহিঁ পতিআয় ॥ ৪৩

... এক নগরেই মাধব বাস করে,
কিন্তু পরভাবিনীর বশ হইল।
...
অভিনব এক কমলফুল
নিমের দোনায় ডারে।
সে ফুল আতপে শুকাইল,
রসময় হইয়া ফুটিতে পারিল না।
বিধিবশে আজ আইল,
পরে আবার কাহার সহিত সমাগম হইবে—
আমার মন প্রত্যয় যায় না। ৪৩

১০

নায়ক সঁ নায়িকা বচন

লোচন অরুণ বুঝলি বড় ভেদ।
রৈনি উজাগরি গুরুঅ নিবেদ ॥
ততহিঁ জাহ হরি ন করহ লাথ।
রৈনি গমৌলহ জনিকেঁ সাথ ॥
কুচ কুঙ্কুম মাখল হিঅ তোর।

জনি অনুরাগ রাগি কর গোর ॥
আনক ভূষণ লাগল অঙ্গ।
উকুতি বেকত হোঅ আনক সঙ্গ ॥
ভনহিঁ বিদ্যাপতি বজবহুঁ বাধ।
বড়াক অনয় মৌন পয় সাধ ॥ ৪৪

[লোচ]ন অরুণ, ইহার ভেদ বুঝিতেছি—
রাত্রিজাগরণগুরু নির্বেদ।
[যাও যাও] আর ভাণ কোরো না।
[যার] সঙ্গে রাত কাটালে [তা]র কাছে যাও।
[কুচকু]ঙ্কুম তোর হৃদয়ে [মা]খিল— যেন
অনু[রাগে]র রঙে গৌর [করিয়া]ছ।
অন্যের ভূষণ [অঙ্গে] লাগিল,
ইহাতে [অ]ন্যের সঙ্গ ব্যক্ত হইতেছে।
[বিদ্যা]পতি ভনে— এরূপ বলা ভালো নয়,
[বড়ো]র অন্যায়ে মৌন হয়ে থাকাই উচিত। ৪৪

১১

নায়িকা সঁ দূতি বচন

কমল ভ্রমর জগ অছএ অনেক।
সভ তঁহ সে বড় জাহি বিবেক ॥
মানিনি তোরিত করিঅ অভিসার।
অবসর থোড়হু বহুত উপকার ॥
মধু নহিঁ দেলহ্ রহলি কি খাগি।
সে সম্পতি জে পরহিত লাগি ॥
অতি অতিশয় ওলনা তুঅ দেল।
জাব জীব অনুতাপক ভেল ॥
তোহেঁ নহিঁ মন্দ মন্দ তুঅ কাজ।
ভলো মন্দ হোঅ মন্দ সমাজ ॥
ভনহিঁ বিদ্যাপতি দুতি কহ গোএ।
নিজ ক্ষতি বিনু পরিহিত নহিঁ হোএ ॥ ৪৫

কমল ভ্রমর জগতে অনেক আছে,
সব চেয়ে সেই বড়ো যাহার বিবেক আছে।
মানিনী ত্বরায় অভিসার করো—
অল্প অবসর, কিন্তু বহু উপকার।
মধু না দিলি …
সেই সম্পত্তি যাহা পরহিতের জন্য।…
যাবজ্জীবন অনুতাপ রহিল।
[তো]তে মন্দ না থাক্,
[তো]র কাজ মন্দ।
মন্দ সমাজে ভালোও মন্দ হয়।
বিদ্যাপতি কহে— হে দূতী,
গোপনে বলো যে,
নিজক্ষতি বিনা পরহিত হয় না। ৪৫

১২

নায়িকাক প্রতি সখিক প্রবোধন

ধন জৌবন রস রঙ্গে।
দিন দশ দেখিঅ তুলিত তরঙ্গে॥
সুঘটিত বিহ বিঘটাবে
বাঁক বিধাতা কী ন করাবে॥
ঈও ভল নহি রীতী।
হঠে ন করিঅ দূরি পুরুব পিরীতী॥
সচ° কিত হেরয় আসা।
সুমরি সমাগম সুপহুক পাসা॥
নয়ান তেজয় জল ধারা।
ন চেতয় চীর ন পহিরয় হারা॥
লখ জোজন বস চন্দা।
তৈঅও কুমুদিনি করয় অনন্দা॥
জকরা জাসঁ রীতি।
দূরহুক দূর গেলেঁ দো গুন পিরীতী॥
বিদ্যাপতি কবি গাহে।
বোলল বোল সুপহু নিরবাহে॥৪৬

[ধ]ন যৌবন রসরঙ্গে
দিন দশ তরঙ্গ তোলে।
[বিধি] সুঘটিতকে বিঘটায়—
বাঁকা বিধাতা কী না করায় !
[ইহা ভ]ালো রীতি নয়—
জোর করে পূর্ব পিরীত দূর কোরো না।
[সচ]কিতে আশাপথ দেখো
সুপ্রভুর সমাগম স্মরণ করিয়া।
[নয়নে] জল, কাপড় পরাও নেই—
হার পরাও!
[লাখ] যোজনে চাঁদ
তবুও কুমুদিনী আনন্দ করে।
দূরে গেলে দ্বিগুণ পিরীতি ...
কথিত কথা নির্বাহ করে। ৪৬

১৩

কোন বন বসথি মহেস।
কেও নহিঁ কহথি উদেস
তপোবন বসথি মহেস।
ভৈরব করথি কলেস ॥
কান কুণ্ডল হাথ গোল ং।
তাহি বন পিআ মিঠি বোল ॥
জাহি বন সিকিও ন ডোল।
তাহি বন পিয়া হসি বোল ॥
একহিঁ বচন বিচ ভেল।
পহু উঠি পরদেস গেল ॥ ৪৭

কোন্ বনে মহেশ বসে
কেহ উদ্দেশ কহে না।
তপোবনে বসে মহেশ,
ভৈরব করিছে ক্লেশ—
কানে কুণ্ডল, হাতে গোলা,

তাহে বনে, পিয়ার মিঠি বোল।
যে বনে তৃণ না দোলে
সে বনে পিয়া হেসে বোলে।
একটি কথা মাঝে হইল—
প্রভু উঠি পরদেশ গেল। ৪৭

১৪

নায়িকা কৃত স্বদুখ বর্ণন

এক দিন ছলি নব রীতি রে।
জল মিন জেহন পিরীতি রে ॥
একহিঁ বচন ভেল বীচ রে।
হসি পহু উতরো ন দেল রে ॥
একহিঁ পলঙ্গ পর কান্হ রে।
মোর লেখ দুর দেশ ভান রে ॥
জাহি বন সিকিও ন ডোল রে।
তাহি বন পিআ হসি বোল রে
ধরব জোগিনিআক ভেস রে।
করব মেঁ পহুক উদেস রে ॥
ভনহিঁ বিদ্যাপতি ভান রে।
সুপুরুখ ন করে নিদান রে ॥ ৪৮

একদিন নূতন রীতি হয়েছিল,
জলে মীনে যেমন পিরীতি রে।—
একটি কথা মাঝে হল,
হাসি প্রভু উত্তর না দিল।—
একই পালঙ্গ-'পরে কান,
মোর মনে দূরদেশ-জ্ঞান।
যে বনে কিছুই না দোলে
সে বনে পিয়া হাসি বোলে।
ধরিব যোগিনীর বেশ রে,
করিব প্রভুর উদ্দেশ রে।
ভনয়ে বিদ্যাপতি ভান রে—
সুপুরুষ না করে নিদান রে। ৪৮

১৫

পরকীয়া নায়িকা সঁ নায়ক বচন

পূর্বক প্রেম ঐলহুঁ তুঅ হেরি।
হমরা অবৈত বৈসলি মুখ ফেরি ॥
পহিল বচন উতরো নহিঁ দেলি।
নৈন কটাক্ষ সঁ জিব হরি লেলি ॥
তুঅ শশিমুখি ধনি ন করিঅ মান।
হমহুঁ ভ্রমর অতি বিকল পরান ॥
আস দেই ফেরি ন করিঐ নিরাসে।
হোহু প্রসন হে পুরহ মোর আসে ॥
ভনহি বিদ্যাপতি সুনু পরমানে।
দুহু মন উপজল বিরহক বানে ॥ ৪৯

পূর্বপ্রেমে আসিনু তোমা হেরিতে।
আমি আসতেই বসিলে মুখ ফিরায়ে—
প্রথম বচনে উত্তর না দিলে,
নয়নকটাক্ষে জীবন হরি নিলে।
তুমি শশিমুখী ধনী না করিয়ো মান—
আমি যে ভ্রমর, অতি বিকল পরান।
আশ দাও, পুন নাহি করিয়ো নিরাশ।
হও হে প্রসন্ন, পূরাও মম আশ।
ভনয়ে বিদ্যাপতি শুন এ প্রমাণ—
দুহু মনে উপজিল বিরহের বাণ। ৪৯

১৬

নায়িকা সঁ নায়ক বচন

মানিনি আব উচিত নহিঁ মান।
এখনুক রঙ্গ এহন সন লগইছি
জাগল পয় পচোবান ॥
জুড়ি রইনি চকমক কর চানন
এহন সময় নহিঁ আন।

এহি অবসর পহু মিলন জেহন সুখ
জকরহিঁ হোএ সে জান ॥
রভসি রভসি অলি বিলসি বিলসি করি
জেকর অধর মধু পান।
অপন অপন পহু সবহু জেমাওলি
ভূখল তুঅ জজমান ॥
ত্রিবলি তরঙ্গ সিতাসিত সঙ্গম
উরজ শম্ভু নিরমান।
আরতি পতি পরতিগ্রহ মগইছি
করু ধনি সরবস দান ॥
দীপ দিপক দেখি থির ন রহয় মন
দৃঢ় করু অপন গেআন।
সঞ্চিত মদন বেদন অতি দারুন
বিদ্যাপতি কবি ভান ॥ ৫০

মানিনী, এখন উচিত নহে মান।
এখনকার রঙ্গ এমন-মতো লাগিছে—
জাগিল পঞ্চবাণ।
জুড়িয়া রজনী চকমক করে চন্দ্র—
এমন সময় নাহি আন।
হেন অবসরে প্রভুমিলন যেমন সুখ,
যাহার হয় সেই জানে—
রভসি রভসি অলি বিলসি বিলসি করে
যেমন (?) অধরমধুপান।
আপন আপন প্রভু সবাই সন্তোষিল,
ক্ষুধিত তোমারই যজমান ॥
ত্রিবলীতরঙ্গ গঙ্গাযমুনাসঙ্গম,
উরজ শম্ভুনির্মাণ—
পতি আরতি-প্রতিগ্রহ মাগিছে—
করো, ধনী, সর্বস্ব দান।
একজন দীপ, অপর আলো, মন স্থির রহে না—
করো দৃঢ় আপন-জ্ঞেয়ান।

সঞ্চিত মদনবেদন অতি দারুণ—
বিদ্যাপতি কবি ভাণ। ৫০

১৭

নায়িকা বিলাপ

মাধব ঈ নহিঁ উচিত বিচারে।
জনিক এহন ধনি কাম কলা সনি
সে কিঅ করু ব্যভচারে ॥
প্রাণহুঁ তাহি অধিক কয় মানব
হৃদয়ক হার সমানে।
কোন পরিযুক্তি আন কৈঁ তাকব
কী থিক হুনক গেআনে ॥
কৃপিন পুরুখ কৈঁ কেও নহিঁ নিক কহ
জগ ভরি কর উপহাসে।
নিজ ধন অছৈতি নৈ উপভোগব
কেবল পরহিক আসে ॥
ভনহিঁ বিদ্যাপতি সুনু মথুরাপতি[২]
ঈ থিক অনুচিত কাজে।
মাঁগি লাএব বিত সে যদি হোয় নিত
অপন করব কোন কাজে ॥ ৫১

মাধব এ নহে উচিত বিচার—
যাহার এমন ধনী কামকলাসম
সে কি রে করে ব্যভিচার!
প্রাণ হতে তারে অধিক মানি
হৃদয়ের হার-সমান।
কোন্ যুক্তিতে সে অন্যেরে তাকায়—
এ কিরূপ তার জ্ঞান!
কৃপণ পুরুষে কেহ খ্যাতি নাহি করে,
জগ ভরি করে উপহাস।
নিজধন থাকিতে না করে উপভোগ,
কেবল পরের প্রতি আশ।

ভনয়ে বিদ্যাপতি— শুন মথুরাপতি,
এ বড়ো অনুচিত কাজ—
মেগে-আনা বিত্ত সে যদি হয় নিত্য তবে
আপন বিত্ত করিবে কোন্ কাজ! ৫১

১৮

হরি সঁ নায়িকা বচন

আজু পরল মোহি কোন অপরাধে।
কিঅ ন হেরিঐ হরি লোচন আধে ॥
আন দিন গহি গৃম লাবিঅ গেহা।
বহু বিধি বচন বুঝাএব নেহা ॥
মন দে রুসি রহল পহু সোঈ।
পুরখক হৃদয় এহন নহিঁ হোঈ ॥
ভনহিঁ বিদ্যাপতি সুনু পরমান।
বাঢ়ল প্রেম উসরি গেল মান ॥ ৫২

আজু’ পড়িনু আমি কোন্ অপরাধে—
কেন না হেরিছে হরি লোচন-আধে!
অন্যদিন গ্রীবা ধরি নিয়ে আসে গেহ।
বহুবিধ বচনে বুঝাও স্নেহ।
মনে হয় রুষিয়া রহিল প্রভু সেই।
পুরুষের হৃদয় এমন নাহি হয়।
ভনয়ে বিদ্যাপতি শুন এ প্রমাণ—
বাড়িল প্রেম, চলিয়া গেল মান। ৫২

১৯

সখী সঁ নায়িকা বচন

মাধব কি কহব তিহরো গেআনে।
সুপহু কহলি জব রোস কয়ল তব
কর মূনল দুহু কানে ॥

আয়ল গমনক বেরি ন নীন টরু
তেঁ কিছু পুছিও ন ভেলা।
এহন করমহিন হম সনি কে ধনি
কর সঁ পরসমনি গেলা ॥
জোঁ হম জনিতহুঁ এহন নিঠুর পহু
কুচ কঞ্চন গিরি সাধী।
কৌসল করতল বাহুঁ লতা লয়
দৃঢ় কয় রখিতহুঁ বাধী ॥
ই সুমিরিঐ জব জঁ ন মরিঐ তব
বুঝি পড় হৃদয় পখানে।
হেমগিরি কুমরি চরন হৃদয় ধরু
কবি বিদ্যাপতি ভানে ॥ ৫৩

মাধব কী কহিব তাহার জ্ঞেয়ানে।[*]
সুপ্রভু কহনু' যবে রোষ করিল তবে,
করে মুদিল দুই কানে।
আইল গমনবেলা, নীদ না টুটিল,
সে তো কিছু নাহি শুধাইল!
এমন কর্মহীন মম সম কোন্ ধনী!
হাত হইতে স্পর্শমণি গেল!
যদি আমি জানিতাম এমন নিঠুর প্রভু,
কুচে কাঞ্চনগিরি সাধি
কৌশল করিয়া বাহুলতা লয়ে
দৃঢ় করি রাখিতাম বাঁধি।
ইহা স্মরিয়া যবে জীবন না মরিল তবে
বুঝি বড়ো হৃদয় পাষাণ।
হেমগিরিকুমারী-চরণ হৃদয়ে ধরি
কবিবিদ্যাপতি-ভাণ। ৫৩

---

[*] অর্থাৎ, মাধবের জ্ঞা[নের] কথা কী ক[হিব]।

২০

সখী সঁ নায়িকা বচন

কি কহব আহে সখি নিঅ অগেআনে।
সগরো রইনি গমাওলি মানে॥
জখন হমর মন পরসন ভেলা।
দারুন অরুণ তখন উগি গেলা॥
গুরু জন জাগল কি করব কেলী।
তনু ঝপইত হম আকুল ভেলী॥
অধিক চতুরপন ভেলহুঁ অজ্ঞানী।
লাভক লোভ মুরহু ভেল হানী॥
ভনহিঁ বিদ্যাপতি নিঅ মতি দোসে।
অবসর কাল উচিত নহি রোসে॥ ৫৪

কী কহিব, আহে সখী, নিজ অজ্ঞানে—
সকল রজনী গোঙাইনু মানে।
যখন আমার মন পরশ করিল
দারুণ অরুণ তখন উদিত হইল।
গুরুজন জাগিল, কী করিব কেলি—
তনু ঝাঁপইতে আমি আকুল হইনু।
অধিক চতুরপনে হইনু অজ্ঞানী,
লাভের লোভে মূলেই হল হানি।
ভনয়ে বিদ্যাপতি— নিজমতি-দোষ!
অবসরকালে উচিত নহে রোষ। ৫৪

২১

নায়িকা-কৃত স্বদুখ বর্ণন

মাধব তোঁ হে জনি জাহ বিদেসে।
হমরো রঙ্গ রভস লয় জৈবহ
লৈবহ কোন সনেসে॥
বনহিঁ গমন করু হোএতি দোসর মতি
বিসরি জাএব পতি মোরা।

হিরা মনি মানিক একো নহিঁ মাঁগব
ফেরি মাঁগব পহু তোরা ॥
জখন গমন করু নয়ন নীর ভরু
দেখিও ন ভেল পহু তোরা।
একহি নগর বসি পহু ভেল পরবস
কৈসে পূরত মন মোরা ॥
পহু সঙ্গ কামিনি বহুত সোহাগিনি
চন্দ্র নিকট জেসে তারা।
ভনহিঁ বিদ্যাপতি সুনু বর জৌমতি
অপন হৃদয় ধরু সারা ॥ ৫৫

মাধব, তুঁহুঁ যদি যাও বিদেশে
আমার রঙ্গ রভস লয়ে যাবে হে—
রাখিবে কোন্ সন্দেশে!
বনে গমন কর হইয়া দুসরমতি (ভিন্নমতি),
বিসরি যাইবে পতি মোরে।
হীরা মণি মানিক কিছু নাহি মাগিব,
ফের মাগিব প্রভু তোরে।
যখন গমন করো, নয়নে নীর ভরি
দেখিতে না পাইনু প্রভু তোরে।
এক নগরেতে বসি প্রভু হইল পরবশ,
কেমনে পূরিবে মন মোর!
প্রভুসঙ্গে কামিনী বড়োই সোহাগিনী,
চন্দ্র-নিকটে যেন তারা!
ভনয়ে বিদ্যাপতি— শুন বরযুবতী,
আপন হৃদয়ে ধরো সার। ৫৫

২২

নায়িকা বিরহ

মোহি তেজি পিআ মোর গেলাহ বিদেস।
কৌনি পর খেপব বারি বএস ॥
সেজ ভেল পরিমল ফূল ভেল বাস।
কতয় ভমর মোর পরল উপাস ॥

সুমরি সুমরি চিত নহী রহে থীর।
মদন দহন তন দগধ শরীর ॥
ভনহিঁ বিদ্যাপতি কবি জয় রাম।
কী করত নাহ দৈব ভেল বাম ॥ ৫৬

মোরে তেজি পিয়া মোর গেল যে বিদেশ,
কার 'পরে ক্ষেপিব এ বালিকা-বয়েস।
শয্যা হইল সুগন্ধি, ফুলের হইল বাস—
আমার ভ্রমর কত করিছে উপবাস!
স্মরিয়া স্মরিয়া চিত নাহি রহে স্থির—
মদনদহন দগধে শরীর।
ভনয়ে বিদ্যাপতি কবি জয়রাম—
কী করিবে নাথ, দৈব হল বাম। ৫৬

২৩

নায়িকা বিরহ

সুন্দরি বিরহ সয়ন ঘর গেল।
কিএ বিধাতা লিখি মোহি দেল ॥
উঠলি চিহায় বৈসলি সির নায়।
চহু দিসি হেরি হেরি রহলি লজায় ॥
নেহুক বন্ধু সেহো ছুটি গেল।
দুহু কর পহুক খেলাওন ভেল ॥
ভনহিঁ বিদ্যাপতি অপরূপ নেহ।
জেহন বিরহ হো তেহন সিনেহ ॥ ৫৭

সুন্দরী বিরহশয়নঘরে গেল—
কী যে বিধাতা কপালে লিখি দিল!
চিয়াইয়া উঠিল, বসিল শির নোয়াইয়া,
চৌদিশ হেরি হেরি রহিল লজ্জায়—
স্নেহের বন্ধু সেও চলে গেল!
দুহু কর প্রভুর খেলেনা হইল!

ভনয়ে বিদ্যাপতি অপরূপ লেহ—
যেমন বিরহ হয় তেমনি সিনেহ। ৫৭

২৪

নায়িকা বিরহ

মাধব হমর রটল দুর দেস।
কেও ন কহে সখি কুশল সনেস॥
জুগ জুগ জিবথু বসথু লখ কোস।
হমর অভাগ হুনক কোন দোস॥
হমর করম ভেল বিহঁ বিপরীত।
তেজলন্হি মাধব পুরবিল প্রীত॥
হৃদয়ক বেদন বান সমান।
আনক দুখ কেঁ আন নহি জান॥
ভনহিঁ বিদ্যাপতি কবি জয় রাম।
কি করত নাহ দৈব ভেল বাম॥৫৮

মাধব আমার রটিল দূর দেশ—
কেহ না কহে, সখী, কুশলসন্দেশ।
যুগ যুগ বাঁচুক, থাকুক লক্ষ ক্রোশ—
আমার অভাগ্য, তাহার কোন্ দোষ!
আমার করমে হইল বিধি বিপরীত,
তেজিল মাধব পূরবের প্রীত।
হৃদয়ের বেদনা বাণসমান—
অন্যের দুঃখ নাহি জানে আন।
ভনয়ে বিদ্যাপতি কবি জয়রাম—
কী করিবে নাথ, দৈব হইল বাম। ৫৮

২৫

নায়িকা বিরহ

মন পরবস ভেল পরদেস নাহ।
দেখি নিশাকর তন উঠ ধাহ॥

মদন বেদন দে মানস অন্তু।
কাহি কহব দুখ পরদেস কন্তু॥
সুমরি সনেহ গেহ নহিঁ আব।
দারুন দাদুর কোকিল রাব॥
সসরি সসরি খসু নিবিবন আজ।
বড় মনোরথ ঘর পহু ন সমাজ॥
ভনহিঁ বিদ্যাপতি সুনু পরমান।
বুঝু নৃপ রাঘব নব পচোবান॥ ৬১

মন হইল পরবশ, পরদেশ নাথ—
দেখি নিশাকর জ্বলি উঠে গাত।
মদনবেদন করে মানস-অন্ত—
কাহারে কহিব দুখ, পরদেশ কান্ত।
স্মরিয়া স্নেহ গেহে নাহি আসে।
দারুণ দাদুর কোকিল ভাষে।
স'রে স'রে খসিতেছে নীবিবন্ধ আজ—
বড়ো মনোরথ, ঘরে প্রভু নাহি আজ।
ভনয়ে বিদ্যাপতি, শুন এ প্রমাণ—
বুঝে নৃপ রাঘব নব পাঁচবাণ। ৬১

২৬

নায়িকা বিরহ

প্রথম একাদস[১] দৈ পহু গেল।
সেহো রে বিতিত মোর কত দিন ভেল।
রতি অবতার বয়স মোর ভেল।
তৈও নহিঁ পহু মোর দরসন দেল॥
অব ন ধরম সখি বাঁচত মোর।
দিন দিন মদন দুগুন সর জোর॥
চান সুরুজ মোহি সহিও ন হোএ।
চানন লাগ বিখম সর সোএ॥
ভনহিঁ বিদ্যাপতি গুনবতি নারি।
ধৈরজ ধৈরহু মিলত মুরারি॥ ৬২

প্রথম ও একাদশ[১] দিয়া প্রভু গেল,
সেও রে অতীত কত দিন হল!
রতি-অবতার বয়স মোর হইল,
তবুও প্রভু না মোরে দরশন দিল!
এখন ধরম বুঝি নাহি বাঁচে মোর,
দিনে দিনে মদন দ্বিগুণ করে জোর!
চাঁদ সূর্য মোরে সহ্য না হয়,
চন্দন লাগে বিষমশরসম!
ভনয়ে বিদ্যাপতি— গুণবতী নারী,
ধৈরজ ধরহ, মিলবে মুরারি। ৬২

২৭

উধব সঁ গোপী বচন

চানন ভেল বিখম সর রে
ভূখন ভেল ভারী।
সপনহুঁ হরি নহিঁ আএল রে
গোকুল গিরধারী ॥
একসর ঠাঢি কদম তরু[১] রে
পথ হেরথি মুরারী।
হরি বিনু দেহ দগধ ভেল রে
ঝামরু ভেল সারী ॥
জাহু জাহু তোঁহেঁ উধব হে,
তোঁ হে মধুপুর জাহে।
চন্দ্র বদন নহিঁ জীউতি রে
বধ লাগত কাহে ॥
ভনহিঁ বিদ্যাপতি তন মন দে
সুনু গুনমতি নারি।
আজু আওত হরি গোকুল রে
পথ চলু ঝটঝারি ॥ ৬৪

চন্দন হইল বিষম শর,
ভূষণ হইল ভারী—

স্বপনেও হরি নাহি আইল
গোকুলগিরিধারী!
একাকী দাঁড়ায়ে কদমতলে
পথ নেহারে মুরারি!
হরি বিনা দেহ দগধ হইল,
ম্লান হইল সমস্ত!
যাও যাও তুমি উদ্ধব হে,
তুমি হে মধুপুরে যাও।
চন্দ্রবদন নাহি বাঁচিবে—
বধ লাগিবে কাহাকে?
ভনয়ে বিদ্যাপতি তন মন দিয়া
শুন গুণমতী নারী—
আজি আসিছে হরি গোকুলে রে,
পথে চলো ঝটঝারি। ৬৪

২৮

সখী সঁ নায়িকা বচন

গগন গরজি ঘন ঘোর
(হে সখি) কখন আওত পহু মোর ॥
উগলনহি পাঁচোবান
(হে সখি) অব ন বচত মোর প্রান ॥
করব কওন পরকার
(হে সখি) জৌবন ভেল জিব কাল ॥ ৬৫

গগন গরজে ঘন ঘোর,
কখন আসিবে প্রভু মোর!
উদিল পঞ্চবাণ,
এখন বাঁচে না মোর প্রাণ!
করিব কোন্ প্রকার?
যৌবন হইল জীবনের কাল। ৬৫

২৯

নায়িকা বিরহ

মাধব মাস তীথি ছল মাধব,
অবধ করিএ পহু গেলা।

কুচ জুগ সম্ভু পরসি হসি কহলন্হি
তেঁ পরতীতি মোহি ভেলা ॥
অবধি ওর ভেল সময় বেআপিত
জীবন বহি গেল আসে।
তখনুক বিরহ জুবতি নহি জীউতি
কি করত মাধব মাসে ॥
ছন ছন কয় কঁ দিবস গমাওলি
দিবস দিবস কয় মাসে।
মাস মাস কয় বরখ গমাওলি
আব জিবন কোন আসে ॥
আম মজর ধরু মন মোর গহবর
কোকিল সবদ ভেল মন্দা।
এহন বএস তেজি পহু পরদেস গেল
কুসুম পিউল মকরন্দা ॥
কুমকুম চানন আগি লগাওল
কেও কহে সীতল চন্দা।
পহু পরদেস অনেক কেঁ রাখথি
বিপতি চিন্হিঐ ভল মন্দা ॥ ৬৬

মাধব মাসে মাধবতিথিতে
অবধি করিয়া প্রভু গেল।
কুচযুগশম্ভু পরশি হাসি কহল,
তাই প্রতীতি মোর হইল।
অবধি শেষ হইল, সময় বেয়াপিত—
জীবন বহি গেল আশে।
তখনকার বিরহেই যুবতী বাঁচে না,
মাধবমাসে কী করে!
ক্ষণ ক্ষণ করিয়া দিবস গোঁয়াইল,
দিবস দিবস করি মাসে!
দিবস দিবস করি বরষ গোঁয়াইল—
এখন জীবন কোন্ আশে!
আম্রমঞ্জরী ধরে— মন মোর গহ্বর (আঁধার)—
কোকিলশব্দ হইল মন্দ!
এমন বয়স ত্যেজি প্রভু পরদেশ গেল!

পিইল কুসুম মকরন্দ—
কুঙ্কুম চন্দন অগ্নি লাগাইল,
কে কহে শীতল চন্দ্র!
প্রভু বিদেশে অনেককে রক্ষা করিতেছেন—
বিপদের সময়েই ভালো মন্দ চেনা যায়। ৬৬

৩০

সখী সঁ নায়িকা বচন

মোহন মধুপুর বাস
(হে সখি) হমহুঁ জাএব তনি পাস ॥
রখলন্‌হি কুবজাক নেহ
(হে সখি) তেজলন্‌হি হমরো সনেহ ॥
কত দিন তাকব বাট
(হে সখি) রটলা জমুনাক ঘাট ॥
ওতহি রহথু দৃঢ় ফেরি
(হে সখি) দরসন দেথু এক বেরি ॥ ৬৮

মোহন, মধুপুরে বাস—
আমি যাইব তার পাশ।
রাখিল কুবুজার স্নেহ—
তেজিল আমার স্নেহ!
কত দিন তাকাইব বাট—
গেছে সে যমুনার ঘাট।
সেখানেই থাকুক দৃঢ় করি—
দরশন দিক একবার। ৬৮

৩১

সখী সঁ নায়িকা বচন

আস লতা [হম’] লগাওলি সজনী
নৈনক নীর পটায়।
সে ফল অব তরুণত ভেল সজনী
আঁচর তর ন সমায় ॥

কাঁচ সাঁচ পহু দেখি গেল সজনী
তসু মন ভেল কুহ ভান।
দিন দিন ফল তরুণত ভেল সজনী
পহু মন ন করু গেআন ॥
সভ কের পহু পরদেস বসি সজনী
আএল সুমিরি সিনেহ।
হমর এহন পহু নিরদয় সজনী
নহিঁ মন বাঢ়য় নেহ ॥ ৬৯

আশালতা লাগাইনু
নয়নের নীর সিঞ্চিয়া।
তাহার ফল এখন তরুণতা প্রাপ্ত হই[ল,]
আঁচলের তলে আর সামলায় না।
কাঁচার মতো প্রভু আমায় দেখিয়া গে[ল]—
তার মন হইল কুয়াশাসমান।
দিনে দিনে ফল তরুণ হইল
ইহা সে মনে জ্ঞান করে না?
সকলকারই পরদেশবাসী প্রভু
স্নেহ স্মরিয়া আসিল—
আমার এমন নির্দয় প্রভু
মনে তার স্নেহ বাড়ে না। ৬৯

৩২

সখী সঁ নায়িকা বচন

কোন গুন পহু পরবস ভেল সজনী
বুঝলি তনিক ভল মন্দ।
মনমথ মন মথ তনি বিনু সজনী
দেহ দহয় নিশি চন্দ ॥
কহ ও পিশুন শত অবগুন সজনী
তনি সম মোহি নহি আন।
কতেক জতন সঁ মেটাবিঅ সজনী
মেটয় ন রেখ পখান ॥

জঁ দুরজন কটু ভাখয় সজনী
        মোর মন ন হোঅ বিরাম।
অনুভব রাহু পরাভব সজনী
        হরিন ন তেজ হিম ধাম ॥
জইও তরণি জল শোখয় সজনী
        কমল ন তেজয় পাঁক।
জে জন রতল জাহি সঁ সজনী
        কি করত বিহি ভয় বাঁক ॥ ৭৫

   বুঝিনু তাহার ভালো মন্দ
মন্মথ মন মথে তাহা বিনে সজনী…
তার শত নিন্দা কহ, তবু তার মতো
আমার আর কেহ নাই।
মুছিতে কতই যত্ন করো,
কিন্তু পাষাণের রেখা মোছে না।
যখন দুর্জন কটু ভাষে,
আমার মনের বিরাম হয় না।
রাহুপরাভব অনুভব করিয়া
হরিণ কখনো চাঁদকে ত্যাগ করে না।
যদিও তরণীর (নদী) জল শুখায়,
তবু কমল পাঁককে ছাড়ে না।
যেজন যাহাতে অনুরক্ত,
কী করে তার বাঁকা বিধির ভয়! ৭৫

৩৩

নায়িকা বচন পথিক সঁ

পিআ মোর বালক হম তরুণী।
কোন তপ চুকলৌঁহ ভেলৌঁহ জননী ॥
পহির লেলি সখি এক দছিনাক চীর।
পিআ কেঁ দেখৈতি মোর দগধ শরীর ॥
পিআ লেলি গোদ কঁ চললি বজার।
হটিআক লোগ পুছে কে লাগু তোহার ॥
নহিঁ মোর দেওর কি নহিঁ ছোট ভাঈ।
পুরব লিখল ছল স্বামী হমার ॥

বাট রে বটোহিআ কি তোঁহী মোর ভাঈ।
হমরো সমাদ নৈহর লেনেঁ জাহূ ॥
কহিহ্নু ববা কিনয় ধেনু গাঈ*।
দুধবা পিলায় কঁ পোসত জমাঈ ॥
নহিঁ মোরা টকা অছি নহিঁ ধেনু গাঈ।
কৌনে বিধি পোসব বালক জমাঈ ॥ ৭৯

… কোন্ ভপে আমি তার মায়ের মতো!
এক দক্ষিণের কাপড় আমি পরিয়া লইলাম …
পিয়াকে কোলে নিয়ে বাজারে চললেম।
হাটের লোকেরা শুধায় 'এ তোর কে হয়'—
এ আমার দেওর নয়, এ আমার ছোটো ভাই নয়,
পূর্বভাগ্যফলে এ আমার স্বামী।
চলো রে পথিক, তুমি আমার ভাই—
আমার সম্বাদ নিয়ে যাও;
বাবাকে বোলো যেন একটা ধেনু গা[ই]* কেনে]
যে, জামাইকে দুধ খাইয়ে পোষা যায়।
টাকা নেই, গাই নেই—
কী বিধিতে বালক জামাই পোষা! ৭৯

৩৪

পরকীয়া নায়িকা ও নায়ক সঁ প্রত্যুত্তর

সুন্দরি হে তোঁ সুবুধি সেআনি।
মরী পিআস পিআবহু পানি ॥
কে তোঁ থিকাহ্ ককর কুল জানি।
বিনু পরিচয় নহিঁ দেব পিঢ়ি পানী ॥
থিকহুঁ পথুকজন রাজ কুমার।
ধনিক বিওগে ভরমি সংসার ॥
আবহ বৈসহ্ পিব লহ পানি।
জে তোঁ খোজবহ্ সে দেব আনি ॥
সসুর ভৈঁসুর মোর গেলাহ্ বিদেস।
স্বামিনাথ গেল ছথি তনিক উদেস ॥

সাসু ঘর আন্‌হরি নৈন নহিঁ সূঝ।
বালক মোর বচন নহিঁ বুঝ ॥ ৮০

'পিয়াসে মরিতেছি আ[মাকে] জল খাওয়াও।'
কে তুমি? কাহার কুল?
বিনা পরিচয়ে পিঁ[ড়ি …] দিই না।
'আমি পথিক রাজকুমার,
ধনীর বিয়োগে সংসার ভ্রমিতেছি।'
তবে বোসো, জল খাওয়াচ্ছি—
যা [খোঁজ?] তাই এনে দিচ্ছি।
শ্বশুর ভাশুর মোর গেল বিদেশ,
স্বামী গেল [তাদের উদ্দেশ?],
ঘরে অন্ধ শাশুড়ি চোখে দেখে না—
ছেলে আমার কথা বোঝে না। ৮০

৩৫

মৈনা কৃত শিব বর্ণন

ঘর ঘর ভরমী জনম নিত
        তনিকাঁ কেহন বিবাহ।
সে অব করব গোরী বর
        ঈ হোএ কতয় নিবাহ ॥
কতয় ভবন কত আগন
        বাপ কতয় কত মাএ।
কতহুঁ ঠওর নহিঁ ঠেহর
        কেকর এহন জমাএ ॥
কোন করল এহ অসুজন
        কেও ন হিনক পরিবার।
জে কয়ল হিনক নিবন্ধন
        ধৃক থিক সে পজিআর ॥
কুল পরিবার একো নহিঁ জনিকা
        পরিজন ভূত বৈতাল।
দেখি দেখি ঝুর হোএ তন
        কে সহে হৃদয়ক সাল ॥

বিদ্যাপতি কহ সুন্দরি
ধরহু মন অবগাহ।
জে অছি জনিক বিবাহী
তনিকাঁ সেহ পৈ নাহ॥ ৮০

নিত্য ঘরে ঘরে ভ্রমে, তার কেমন বিবাহ!
গৌরী তাকেই বর করবে এ কেমনে [নির্বাহ] হয়!
কোথায় ভবন, কোথায় অঙ্গন,
কোথা বাপ ভাই!
কোথাও ঘরের ঠাওর (স্থিরতা) নেই—
কাহার/কে করে এমন জামাই!
কে এমন অসুজনতা করিল!
ইহার কেহ পরিবার নাই—
যে ইহার নিবন্ধন করিল সে পঞ্জিকারকে ধিক্!
যার কুল পরিবার কিছুই নাই, ভূত বেতাল পরিজন—
দেখে দেখে শরীর ঝুরিছে— এ হৃদয়শল্য কে সহে!
যে যার বিবাহী আছে
সে তার নাথ হয়— বিধির নির্বন্ধ। ৮১

পাঠ এবং অর্থ :

১ আধারগ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ-কর্তৃক উদ্ধৃত গোবিন্দদাসের অনুরূপ পদ—

[ভী]তক (ভিত্তির) চীতপুতলি হেরি যো ধনি
চমকি চমকি ঘন কাঁপ
[অ]ব আঁধিয়ারে আপন তনু ঝাঁপই
কর দেই ফণিমণি ঝাঁপ।

২ 'ভ্রমর'? মূল এবং শেষ বাক্যে রবীন্দ্রনাথের ব্যাখ্যাও দ্রষ্টব্য।

৩ আধারগ্রন্থ দ্রষ্টব্য। গ্রীয়র্সন সাহেবের পাঠ বা অর্থখ্যাপন রবীন্দ্রনাথ গ্রহণ করেন নাই। 'সচ' (true) পৃথক্ শব্দ ধরেন নাই, অপরপক্ষে 'গোল' বলিতে bow (ইংরাজি অনুবাদের চোরা মুদ্রণপ্রমাদ) গ্রাহ্য না হইলেও শব্দসূচী-ধৃত 'an ascetic's bowl' অর্থ অসংগত হইত না।

৪ তত্রৈব : মধুরাপতি

৫ প্রথম ও একাদশ ব্যঞ্জনাক্ষর, অর্থাৎ, কট : প্রতিশ্রুতি

৬ তরু? কদম তরু মুরারির পথ নেহারে?

৭ বৈশাখের সপ্তমী তিথিতে

৮ গ্রীয়র্সন বলেন : ছন্দোরক্ষার্থে এইরূপ একটি শব্দের বিশেষ প্রয়োজন ছিল!

৯ দুগ্ধবতী গাভী

১০ রবীন্দ্রনাথের লেখায় এইরূপই আছে।

মন্তব্য ॥ আধারগ্রন্থ সম্পর্কে পরবর্তী গ্রন্থপরিচয় দ্রষ্টব্য। ১৮৮২ খৃস্টাব্দে বঙ্গীয় এসিয়াটিক সোসাইটি -কর্তৃক প্রকাশিত ইহার যে প্রতি শান্তিনিকেতনের রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত, তাহার আখ্যাপত্রে পেন্সিলে রবীন্দ্রনাথের ইংরাজি স্বাক্ষর এবং তাঁহার হাতেই '১লা ফাল্গুন ১৮৮৪' লেখা। আদ্যন্ত গ্রন্থ কবি-কর্তৃক বিশেষ মনঃসংযোগে অধীত এবং নানা টীকা টিপ্পনী ও ভাষান্তর দিয়া চিহ্নিত। গ্রন্থের বিদ্যাপতি অংশে যে ৮২টি পদ আছে তন্মধ্যে ৫২টি পদ রবীন্দ্রনাথের ভাষান্তর অথবা মন্তব্য -সহ ১৩৪৮ সনের অগ্রহায়ণ-ফাল্গুন সংখ্যা প্রবাসীতে মুদ্রিত। এ স্থলে সম্পূর্ণ 'রূপান্তর'গুলি বা অর্থবহ বিশেষ বিশেষ কাব্যখণ্ড মাত্র সংকলিত, এজন্য সংখ্যা ৩৫টির বেশি নহে। যে মৈথিলী পদগুলি সম্পূর্ণ সংকলন করা হইয়াছে, বর্তমান গ্রন্থে তাহাদের ক্রমিক সংখ্যা— ১, ৭, ৮, ১০-১২, ১৪-২৭, ৩৫। সকল ক্ষেত্রে এগুলিরও সমস্তই রবীন্দ্রনাথ ভাষান্তরিত বা রূপান্তরিত করিয়াছেন এমন নয়।

প্রত্যেক মৈথিলী পদের শেষে, আধারগ্রন্থে উহার যে ক্রমিক সংখ্যা তাহাই সংকলন করা হইয়াছে; বাংলা রূপান্তরে তাহার অনুবৃত্তি।

রবীন্দ্রনাথ গ্রীয়র্সন সাহেবের অর্থ কয়েক স্থলে গ্রহণ করেন নাই মনে হয়। উল্লিখিত তৃতীয় টীকায় তাহার নিদর্শন মিলিবে।

সংশোধন ॥ আধারগ্রন্থের বিস্তারিত 'সংযোজন-সংশোধন' মিলাইয়া (সেইসঙ্গে গ্রীয়র্সন সাহেবের স্বচ্ছন্দ ইংরাজি রূপান্তর তথা শব্দসূচী দেখিয়া) পূর্বমুদ্রিত বহুবিধ ভ্রান্ত পাঠ ত্যাগ করা হইয়াছে। মূল পদাবলী অংশে ইহার অতিরিক্ত সংশোধন অত্যন্ত বিরল। তৃতীয় এবং চতুর্থ টীকায় যে পাঠান্তর গ্রহণের ইঙ্গিত আছে, তাহা রবীন্দ্রনাথের অভিমত অনুসারী। রবীন্দ্র-রচনার পাঠোদ্ধারেও বহু সংশোধনের অবকাশ ছিল, রবীন্দ্রভবনের গ্রন্থখানির সাহায্যে সে বিষয়ে বিশেষ যত্ন করা গিয়াছে।

লিপ্যন্তর ॥ একই কালে মিথিলার ও বাংলার লোকপ্রচলিত উচ্চারণ সম্পর্কে সাধারণের মনে যাহাতে ভুল ধারণা না হয়, দেবনাগরী হরপের বিন্দুচিহ্নকে নির্বিচারে অনুস্বারে পরিণত করা হয় নাই। এজন্যই মংডল, সংচি, নংদী, কুংভ, বংধু, কংত, সুংদরি বা সুংদরী না হইয়া— মণ্ডল, সঞ্চি, নন্দী (ননদী), কুম্ভ, বন্ধু, কন্ত (কান্ত), সুন্দরি বা সুন্দরী হইয়াছে। মৈথিলী পদের বানান আর সকল দিক দিয়া অবিকৃত রাখার চেষ্টা হইয়াছে; উহা প্রধানতই উচ্চারণ-সংগত, দেবভাষার ব্যুৎপত্তির ভয়ে ভীত নহে।

সমাসবদ্ধ পদ হইলেই সংযুক্তভাবে ছাপা হইবে এ রীতি না থাকায়, বিরহ শয়ন, সখী বচন, রাধা কৃষ্ণ বিলাস বর্ণন, সরোবর ঘাট বাট কণ্টক তরু, কুচ জুগ কুঙ্কুম রাগ— এরূপ আধারগ্রন্থে ছিল আর বর্তমান সংকলনেও আছে। রবীন্দ্রনাথকৃত ভাষান্তর, বানানের বা বিরামচিহ্নের অধুনা-প্রচলিত রীতির সহিত সংগতি রাখিয়াই ছাপা হইয়াছে। সমাসবদ্ধ শব্দাবলীও একত্র সংহত বা হাইফেনের সংকেতে পরস্পর যুক্ত।

হিন্দী বা মৈথিলী ভাষায় অন্তঃস্থ 'ব'এর উচ্চারণ স্বতন্ত্র। মূলে যেখানে যেখানে ঐ বর্ণের ব্যবহার, লিপ্যন্তরে (মৈথিলী পদে) 'ৱ' হরপটি ব্যবহৃত হইয়াছে।

'রভসি ২' বা 'যাও ২' আধারগ্রন্থে যদিবা থাকে, বর্তমান সংকলনে 'রভসি রভসি' বা 'যাও যাও' আকার লইয়াছে — ইহাও বলিতে হয়।

বিশেষ সম্পাদনা ॥ রবীন্দ্র-রচনার পাঠনির্ণয়ে যে-সকল ক্ষেত্রে পূর্বেই জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে অনুমানের আশ্রয় লওয়া হইয়াছিল অথবা এখনো অনুমান ভিন্ন গতি নাই (বই বাঁধাইতে গিয়া কবির হাতের লেখা বেশ কিছু ছাঁটাই হইয়াছে) বিশেষ বন্ধনী-মধ্যে—[ ]—সেই-সব আনুমানিক পাঠ দেওয়া হইয়াছে। টীকা-টিপ্পনী-বোধক কয়েকটি বিশেষ অঙ্কচিহ্ন বা ক্রমিক সংখ্যাদি সম্পাদনার সুবিধার জন্য সংযোজিত।

পরিশিষ্ট ২

ত্রয়ী : সংস্কৃত গুরুমুখী ও মরাঠী

তিনটি কবিতা : রবীন্দ্রনাথ-কৃত রূপান্তর বলিয়া অনুমিত

১

তারাকদম্বকুসুমান্যবকীর্য দিক্ষু
ক্ষেমায় সর্বজগতাং স্বকরৈঃ প্রকামং।
হিণ্ডীরপাণ্ডুররুচিঃ শশলাঞ্ছনোঽয়ং
নীরাজয়ন্ ভুবনভাবনমুজ্জিহীতে ॥
স্বৈরং শৈলবনাবলীং বিঘটয়ন্ সংক্ষোভয়ন্ সাগরং
প্রধ্মাতৈর্গিরিকন্দরান্ মুখরয়ন্ ব্রহ্মাণ্ডমুদ্‌বোধয়ন্।
বায়ো ত্বং শুভশঙ্খচামরভবাং প্রীতিং বিধেহি প্রভোঃ
সন্ধ্যামঙ্গলদীপকোঽয়মুদগাৎ ব্যোম্নি স্ফুরত্তারকে ॥

—তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, মাঘ ১৭৯৮ শক

তারকাকুসুমচয়
ছড়ায়ে আকাশময়
চন্দ্রমা আরতি তাঁর করিছে গগনে।
দুলায়ে পাদপগুলি
সাগরে তরঙ্গ তুলি
জাগাইয়া জগতের জীবজন্তুগণে
পর্বতকন্দরে গিয়া
শুভ শঙ্খ বাজাইয়া
পবন হরষে তাঁরে চামর দুলায়।
অগণ্য তারকাবলী
চৌদিকে রয়েছে জ্বলি,
মঙ্গলকনকদীপ গগনের গায়।

২

গগন মৈ থালু রবি-চন্দু দীপক বনে।
তারিকামণ্ডল জনক মোতী ॥
ধূপু মলআনলো পবণু চবরো করে।
সগল বনরাই ফূলন্ত জোতী ॥
কৈসী আরতী হোই
ভবখণ্ডনা তেরী আরতী।
অনহতা সবদ বাজন্ত ভেরী ॥

—নানক : গুরুগ্রন্থসাহেব

গগনের থালে রবি চন্দ্র দীপক জ্বলে,
তারকামণ্ডল চমকে মোতি রে।
ধূপ মলয়ানিল, পবন চামর করে,
সকল বনরাজি ফুলন্ত জ্যোতি রে।
কেমন আরতি, হে ভবখণ্ডন, তব আরতি—
অনাহত শব্দ বাজন্ত ভেরী রে।

৩

কঁই তো দিবস দেখেন মী ডোলাঁ
কল্যাণ মঙ্গলামঙ্গলাচেঁ ॥
আয়ুষ্যাচ্যা শেবটী পায়াসবেঁ ভেটী।
কলিবরেঁ তুটী জাল্যা ত্বরে ॥
সরো হে সঞ্চিত পদবীচা গোবা
উতাবীল দেবা মন জালে ॥
পাউল্যপাউলীঁ করিতাঁ বিচার
অনন্ত বিকার চিত্তা অঙ্গী ॥
ম্হণউনি ভয়াভীত হোতো জীব।
ভাকিতসেঁ কীঁব অট্টহাসেঁ ॥
তুকা ম্হণে হোইল আইকিলে কানী।
তরী চক্রপাণী ধাঁব ঘালা ॥
দুঃখাচ্যা উত্তরী আলবিলে পায়।
পাহাণঁ তেঁ কায় অজুন অন্ত ॥

—তুকারাম

সেদিন হেরিবে কবে এ মোর নয়ান—
কেবলই মঙ্গল যবে, কেবলই কল্যাণ।
পরমায়ু-অবসানে ভেটিব চরণ,
টুটিবে সত্বর মোর সকল বন্ধন।
সকল বন্ধন মোর হোক অপসৃত—
উতলা হয়েছে, দেব, তাই মোর চিত।
পদে পদে দেখি আমি করিয়া বিচার
মন-অঙ্গে রহিয়াছে অনন্ত বিকার।
ভয়ে ভীত তাই মোর চকিত পরান—
সকাতরে চাহি কৃপা, করো পরিত্রাণ।
তুকা ভণে তব কানে পশিবে এ কথা—
দীন-উদ্ধারণ প্রভু, শীঘ্র এসো হেথা।
চরণ ধরিয়া ডাকি তোমারে একান্ত—
এখনো কি দুঃখ মোর হইবে না অন্ত?

অনূদিত কবিতা

কবি

ওই যেতেছেন কবি কাননের পথ দিয়া,
কভু বা অবাক, কভু ভকতি-বিহ্বল হিয়া।
নিজের প্রাণের মাঝে
একটি যে বীণা বাজে,
সে বীণা শুনিতেছেন হৃদয় মাঝারে গিয়া।
বনে যতগুলি ফুল আলো করি ছিল শাখা,
কারো কচি তনুখানি নীল বসনেতে ঢাকা,
কারো বা সোনার মুখ,
কেহ রাঙা টুকটুক,
কারো বা শতেক রঙ যেন ময়ূরের পাখা,
কবিরে আসিতে দেখি হরষেতে হেলি দুলি
হাব ভাব করে কত রূপসী সে মেয়েগুলি।
বলাবলি করে, আর ফিরিয়া ফিরিয়া চায়,
"প্রণয়ী মোদের ওই দেখ লো চলিয়া যায়।"

সে অরণ্যে বনস্পতি মহান্ বিশাল-কায়া
হেথায় জাগিছে আলো, হোথায় ঘুমায় ছায়া।
কোথাও বা বৃদ্ধবট —
মাথায় নিবিড় জট ;
ত্রিবলী অঙ্কিত দেহ প্রকাণ্ড তমাল শাল;
কোথাও বা ঋষির মতো
অশথের গাছ যত
দাঁড়ায়ে রয়েছে মৌন ছড়ায়ে আঁধার ডাল।
মহর্ষি গুরুরে হেরি অমনি ভকতিভরে
সসম্ভ্রমে শিষ্যগণ যেমন প্রণাম করে,
তেমনি কবিরে দেখি গাছেরা দাঁড়াল নুয়ে,
লতা-শ্মশ্রুময় মাথা ঝুলিয়া পড়িল ভুঁয়ে।
একদৃষ্টে চেয়ে দেখি প্রশান্ত সে মুখছবি,
চুপি চুপি কহে তারা "ওই সেই। ওই কবি।"

—Victor Hugo

বিসর্জন

যে তোরে বাসেরে ভালো, তারে ভালোবেসে বাছা,
চিরকাল সুখে তুই রোস্।
বিদায়! মোদের ঘরে রতন আছিলি তুই,
এখন তাহারি তুই হোস্।

আমাদের আশীর্বাদ নিয়ে তুই যা রে
এক পরিবার হতে অন্য পরিবারে।
সুখ শান্তি নিয়ে যাস্ তোর পাছে পাছে,
দুঃখ জ্বালা রেখে যাস্ আমাদের কাছে।

হেথা রাখিতেছি ধরে, সেথা চাহিতেছে তোরে,
দেরী হ'ল, যা' তাদের কাছে।
প্রাণের বাছাটি মোর, লক্ষ্মীর প্রতিমা তুই,
দুইটি কর্তব্য তোর আছে।
একটু বিলাপ যাস আমাদের দিয়ে,
তাহাদের তরে আশা যাস সাথে নিয়ে;
এক বিন্দু অশ্রু দিস আমাদের তরে,
হাসিটি লইয়া যাস তাহাদের ঘরে।

—Victor Hugo

তারা ও আঁখি

কাল সন্ধ্যাকালে ধীরে সন্ধ্যার বাতাস,
বহিয়া আনিতেছিল ফুলের সুবাস।
রাত্রি হ'ল, আঁধারের ঘনীভূত ছায়ে
পাখিগুলি একে একে পড়িল ঘুমায়ে।
প্রফুল্ল বসন্ত ছিল ঘেরি চারি ধার
আছিল প্রফুল্লতর যৌবন তোমার,
তারকা হাসিতেছিল আকাশের মেয়ে,
ও আঁখি হাসিতেছিল তাহাদের চেয়ে।
দুজনে কহিতেছিনু কথা কানে কানে,
হৃদয় গাহিতেছিল মিষ্টতম তানে।
রজনী দেখিনু অতি পবিত্র বিমল,
ও মুখ দেখিনু অতি সুন্দর উজ্জ্বল।
সোনার তারকাদের ডেকে ধীরে ধীরে,
কহিনু, "সমস্ত স্বর্গ ঢালো এর শিরে!"
বলিনু আঁখিরে তব "ওগো আঁখি-তারা,
ঢালো গো আমার 'পরে প্রণয়ের ধারা।"

—Victor Hugo

সূর্য ও ফুল

মহীয়সী মহিমার আগ্নেয় কুসুম
সূর্য, ধায় লভিবারে বিশ্রামের ঘুম।
ভাঙা এক ভিত্তি-'পরে ফুল শুভ্রবাস,
চারি দিকে শুভ্রদল করিয়া বিকাশ

মাথা তুলে চেয়ে দেখে সুনীল বিমানে
অমর আলোকময় তপনের পানে,
ছোটো মাথা দুলাইয়া কহে ফুল গাছে—
"লাবণ্য-কিরণ ছটা আমারো তো আছে।"
—Victor Hugo

সম্মিলন

সেথায় কপোত-বধূ লতার আড়ালে
দিবানিশি গাহে শুধু প্রেমের বিলাপ।
নবীন চাঁদের করে একটি হরিণী
আমাদের গৃহদ্বারে আরামে ঘুমায়।
তার শান্ত নিদ্রাকালে নিশ্বাস পতনে
প্রহর গণিতে পারি স্তব্ধ রজনীর।
সুখের আবাসে সেই কাটাব জীবন,
দুজনে উঠিব মোরা, দুজনে বসিব,
নীল আকাশের নীচে ভ্রমিব দুজনে,
বেড়াইব মাঠে মাঠে উঠিব পর্বতে
সুনীল আকাশ যেথা পড়েছে নামিয়া।
অথবা দাঁড়াব মোরা সমুদ্রের তটে,
উপলমণ্ডিত সেই স্নিগ্ধ উপকূল
তরঙ্গের চুম্বনেতে উচ্ছ্বাসে মাতিয়া
থর থর কাঁপে আর জ্বল' জ্বল' জ্বলে!
যত সুখ আছে সেথা আমাদের হবে,
আমরা দুজনে সেথা হব দুজনের,
অবশেষে বিজন সে দ্বীপের মাঝারে
ভালোবাসা, বেঁচে থাকা, এক হ'য়ে যাবে।
মধ্যাহ্নে যাইব মোরা পর্বতগুহায়,
সে প্রাচীন শৈল-গুহা স্নেহের আদরে
অবসান রজনীর মৃদু জোছনারে
রেখেছে পাষাণ কোলে ঘুম পাড়াইয়া।
প্রচ্ছন্ন আঁধারে সেথা ঘুম আসি ধীরে
হয়তো হরিবে তোর নয়নের আভা।
সে ঘুম অলস প্রেমে শিশিরের মতো।
সে ঘুম নিভায়ে রাখে চুম্বন-অনল
আবার নূতন করি জ্বালাবার তরে।
অথবা বিরলে সেথা কথা কব মোরা,

কহিতে কহিতে কথা, হৃদয়ের ভাব
এমন মধুর স্বরে গাহিয়া উঠিবে
আর আমাদের মুখে কথা ফুটিবে না।
মনের সে ভাবগুলি কথায় মরিয়া
আমাদের চোখে চোখে বাঁচিয়া উঠিবে!
চোখের সে কথাগুলি বাক্যহীন মনে
ঢালিবে অজস্র স্রোতে নীরব সংগীত,
মিলিবেক চৌদিকের নীরবতা সনে।
মিশিবেক আমাদের নিশ্বাসে নিশ্বাসে।
আমাদের দুই হৃদি নাচিতে থাকিবে,
শোণিত বহিবে বেগে দোঁহার শিরায়।
মোদের অধর দুটি কথা ভুলি গিয়া
ক'বে শুধু উচ্ছ্বসিত চুম্বনের ভাষা।
দুজনে দুজন আর রব না আমরা,
এক হয়ে যাব মোরা দুইটি শরীরে।
দুইটি শরীর? আহা তাও কেন হল?
যেমন দুইটি উল্কা জ্বলন্ত শরীর,
ক্রমশ দেহের শিখা করিয়া বিস্তার
স্পর্শ করে, মিশে যায়, এক দেহ ধরে,
চিরকাল জ্বলে তবু ভস্ম নাহি হয়,
দুজনেরে গ্রাস করি দোঁহে বেঁচে থাকে;
মোদের যমক-হৃদে একই বাসনা,
দণ্ডে দণ্ডে পলে পলে বাড়িয়া বাড়িয়া,
তেমনি মিলিয়া যাবে অনন্ত মিলন।
এক আশা রবে শুধু দুইটি ইচ্ছার
এক ইচ্ছা রবে শুধু দুইটি হৃদয়ে,
একই জীবন আর একই মরণ,
একই স্বরগ আর একই নরক,
এক অমরতা কিংবা একই নির্বাণ,
হায় হায় এ কী হল এ কী হল মোর!
আমার হৃদয় চায় উধাও উড়িয়া
প্রেমের সুদূর রাজ্যে করিতে ভ্রমণ,
কিন্তু গুরুভার এই মরতের ভাষা
চরণে বেঁধেছে তার লোহার শৃঙ্খল।
নামি বুঝি, পড়ি বুঝি, মরি বুঝি মরি।

—Shelley

বিদেশী ফুলের গুচ্ছ

Shelley

মধুর সূর্যের আলো, আকাশ বিমল,
সঘনে উঠিছে নাচি তরঙ্গ উজ্জ্বল।
মধ্যাহ্নের স্বচ্ছ করে
সাজিয়াছে থরে থরে
ক্ষুদ্র নীল দ্বীপগুলি, শুভ্র শৈলশির।
কাননে কুঁড়িরে ঘিরি
পড়িতেছে ধীরি ধীরি
পৃথিবীর অতি মৃদু নিশ্বাসসমীর।
একই আনন্দে যেন গায় শত প্রাণ—
বাতাসের গান আর পাখিদের গান।
সাগরের জলরব
পাখিদের কলরব
এসেছে কোমল হয়ে স্তব্ধতার সংগীত-সমান।

২

আমি দেখিতেছি চেয়ে সমুদ্রের জলে
শৈবাল বিচিত্রবর্ণ ভাসে দলে দলে।
আমি দেখিতেছি চেয়ে
উপকূল-পানে ধেয়ে
মুঠি মুঠি তারাবৃষ্টি করে ঢেউগুলি।
বিরলে বালুকাতীরে
একা বসে রয়েছি রে,
চারি দিকে চমকিছে জলের বিজুলি।
তালে তালে ঢেউগুলি করিছে উত্থান—
তাই হতে উঠিতেছে কী একটি তান।
মধুর ভাবের ভরে
হৃদয় কেমন করে,
আমার সে ভাব আজি বুঝিবে কি আর কোনো প্রাণ।

৩

হায় মোর নাই আশা, নাইকো আরাম—
ভিতরে নাইকো শান্তি, বাহিরে বিরাম।

নাই সে সন্তোষধন
জ্ঞানী ঋষি যোগীগণ।
ধ্যানসাধনায় যাহা পায় করতলে—
আনন্দ-মগন-মন
করে তারা বিচরণ,
বিমল মহিমালোক অন্তরেতে জ্বলে।
নাই যশ, নাই প্রেম, নাই অবসর—
পূর্ণ করে আছে এরা সকলেরি ঘর।
সুখে তারা হাসে খেলে,
সুখের জীবন বলে—
আমার কপালে বিধি লিখিয়াছে আরেক অক্ষর।

৪

কিন্তু নিরাশাও শান্ত হয়েছে এমন
যেমন বাতাস এই, সলিল যেমন
মনে হয় মাথা থুয়ে
এইখানে থাকি শুয়ে
অতিশয় শ্রান্তকায় শিশুটির মতো।
কাঁদিয়া দুঃখের প্রাণ
করে দিই অবসান—
যে দুঃখ বহিতে হবে, বহিয়াছি কত।
আসিবে ঘুমের মতো মরণের কোল,
ধীরে ধীরে হিম হয়ে আসিবে কপোল।
মুমূর্ষু শ্রবণতলে
মিশাইবে পলে পলে
সাগরের অবিরাম একতান অন্তিম কল্লোল।

শ্রাবণ ১২৯১

Mrs. Browning

সারাদিন গিয়েছিনু বনে
ফুলগুলি তুলেছি যতনে।
প্রাতে মধুপানে রত
মুগ্ধ মধুপের মতো
গান গাহিয়াছি আনমনে।

এখন চাহিয়া দেখি, হায়,
ফুলগুলি শুকায় শুকায়।
যত চাপিলাম মুঠি
পাপড়িগুলি গেল টুটি—
কান্না ওঠে, গান থেমে যায়।

কী বলিছ সখা হে আমার—
ফুল নিতে যাব কি আবার।
থাক্ বঁধু, থাক্ থাক্,
আর কেহ যায় যাক,
আমি তো যাব না কভু আর।

শ্রান্ত এ হৃদয় অতি দীন,
পরান হয়েছে বলহীন।
ফুলগুলি মুঠা ভরি
মুঠায় রহিবে মরি,
আমি না মরিব যত দিন।

শ্রাবণ ১২৯১

Ernest Myers

আমায় রেখো না ধরে আর,
আর হেথা ফুল নাহি ফুটে।
হেমন্তের পড়িছে নীহার,
আমায় রেখো না ধরে আর।
যাই হেথা হতে যাই উঠে,
আমার স্বপন গেছে টুটে।
কঠিন পাষাণপথে
যেতে হবে কোনোমতে
পা দিয়েছি যবে।
একটি বসন্তরাতে
ছিলে তুমি মোর সাথে—
পোহালো তো, চলে যাও তবে।

শ্রাবণ ১২৯১

Aubrey De Vere

প্রভাতে একটি দীর্ঘশ্বাস
একটি বিরল অশ্রুবারি
ধীরে ওঠে, ধীরে ঝরে যায়,
শুনিলে তোমার নাম আজ।
কেবল একটুখানি লাজ—
এই শুধু বাকি আছে হায়।
আর সব পেয়েছে বিনাশ।
এক কালে ছিল যে আমারি
গেছে আজ করি পরিহাস।

শ্রাবণ ১২৯১

Augusta Webster

১

গোলাপ হাসিয়া বলে, 'আগে বৃষ্টি যাক চলে,
দিক দেখা তরুণ তপন—
তখন ফুটাব এ যৌবন।'
গেল মেঘ, এল উষা, আকাশের আঁখি হতে
মুছে দিল বৃষ্টিবারিকণা—
সে তো রহিল না।

কোকিল ভাবিছে মনে, 'শীত যাবে কত ক্ষণে,
গাছপালা ছাইবে মুকুলে—
তখন গাহিব মন খুলে।'
কুয়াশা কাটিয়া যায়, বসন্ত হাসিয়া চায়,
কানন কুসুমে ভরে গেল—
সে যে মরে গেল!

শ্রাবণ ১২৯১

২

এত শীঘ্র ফুটিলি কেন রে!
ফুটিলে পড়িতে হয় ঝরে—
মুকুলের দিন আছে তবু,
ফোটা ফুল ফোটে না তো আর।
বড়ো শীঘ্র গেলি মধুমাস,
দু দিনেই ফুরালো নিশ্বাস।
বসন্ত আবার আসে বটে,
গেল যে সে ফেরে না আবার।

শ্রাবণ ১২৯১

P. B. Marston

হাসির সময় বড়ো নেই,
দু দণ্ডের তরে গান গাওয়া।
নিমেষের মাঝে চুমো খেয়ে
মুহূর্তে ফুরাবে চুমো খাওয়া।
বেলা নাই শেষ করিবারে
অসম্পূর্ণ প্রেমের মন্ত্রণা—
সুখস্বপ্ন পলকে ফুরায়,
তার পরে জাগ্রত যন্ত্রণা।
কিছু ক্ষণ কথা কয়ে লও,
তাড়াতাড়ি দেখে লও মুখ,
দু দণ্ডের খোঁজ দেখাশুনা—
ফুরাইবে খুঁজিবার সুখ।
বেলা নাই কথা কহিবারে
যে কথা কহিতে ফাটে প্রাণ।
দেবতারে দুটো কথা ব'লে
পূজার সময় অবসান।
কাঁদিতে রয়েছে দীর্ঘ দিন—
জীবন করিতে মরুময়,
ভাবিতে রয়েছে চিরকাল—
ঘুমাইতে অনন্ত সময়।

শ্রাবণ ১২৯১

Victor Hugo

বেঁচেছিল, হেসে হেসে
খেলা করে বেড়াত সে—
হে প্রকৃতি, তারে নিয়ে কী হল তোমার!
শত রঙ-করা পাখি
তোর কাছে ছিল না কি—
কত তারা, বন, সিন্ধু, আকাশ অপার!
জননীর কোল হতে   কেন তারে কেড়ে নিলি!
লুকায়ে ধরার কোলে   ফুল দিয়ে ঢেকে দিলি!
শত-তারা-পুষ্প-ময়ী
মহতী প্রকৃতি অয়ি,
নাহয় একটি শিশু নিলি চুরি ক'রে—
অসীম ঐশ্বর্য তব
তাহে কি বাড়িল নব?

নূতন আনন্দকণা মিলিল কি ওরে?
অথচ তোমারি মতো   বিশাল মায়ের হিয়া
সব শূন্য হয়ে গেল   একটি সে শিশু গিয়া।

শ্রাবণ ১২৯১

Moore

নিদাঘের শেষ গোলাপ কুসুম
একা বন আলো করিয়া,
রূপসী তাহার সহচরীগণ
শুকায়ে পড়েছে ঝরিয়া।
একাকিনী আহা, চারি দিকে তার
কোনো ফুল নাহি বিকাশে,
হাসিতে তাহার মিশাইতে হাসি
নিশাস তাহার নিশাসে।

বোঁটার উপরে শুকাইতে তোরে
রাখিব না একা ফেলিয়া—
সবাই ঘুমায়, তুইও ঘুমাগে
তাহাদের সাথে মিলিয়া।
ছড়ায়ে দিলাম দলগুলি তোর
কুসুমসমাধিশয়নে
যেথা তোর বনসখীরা সবাই
ঘুমায় মুদিত নয়নে।
তেমনি আমার সখারা যখন
যেতেছেন মোরে ফেলিয়া
প্রেমহার হতে একটি একটি
রতন পড়িছে খুলিয়া,
প্রণয়ীহৃদয় গেল গো শুকায়ে
প্রিয়জন গেল চলিয়া—
তবে এ আঁধার আঁধার জগতে
রহিব বলো কী বলিয়া।

আষাঢ় ১২৮৮

Mrs. Browning

ওই আদরের নামে ডেকো সখা মোরে!
ছেলেবেলা ওই নামে আমায় ডাকিত—

তাড়াতাড়ি খেলাধুলা সব ত্যাগ করে
অমনি যেতেম ছুটে,
কোলে পড়িতাম লুটে,
রাশি-করা ফুলগুলি পড়িয়া থাকিত।

নীরব হইয়া গেছে সে স্নেহের স্বর—
কেবল স্তব্ধতা বাজে
আজি এ শ্মশান-মাঝে,
কেবল ডাকি গো আমি 'ঈশ্বর ঈশ্বর'!

মৃত কণ্ঠে আর যাহা শুনিতে না পাই
সে নাম তোমারি মুখে শুনিবারে চাই।
হাঁ সখা, ডাকিয়ো তুমি সেই নাম ধরে—
ডাকিলেই সাড়া পাবে,
কিছু না বিলম্ব হবে,
তখনি কাছেতে যাব সব ত্যাগ করে।

আষাঢ় ১২৮৮

Christina Rossetti

কেমনে কী হল পারি নে বলিতে,
এইটুকু শুধু জানি—
নবীন কিরণে ভাসিছে সে দিন
প্রভাতের তনুখানি।
বসন্ত তখনো কিশোর কুমার,
কুঁড়ি উঠে নাই ফুটি,
শাখায় শাখায় বিহগ বিহগী
বসে আছে দুটি দুটি।

কী যে হয়ে গেল পারি নে বলিতে,
এইটুকু শুধু জানি—
বসন্তও গেল, তাও চলে গেল
একটি না কয়ে বাণী।
যা-কিছু মধুর সব ফুরাইল,
সেও হল অবসান—
আমারেই শুধু ফেলে রেখে গেল
সুখহীন ম্রিয়মাণ।

কার্তিক ১২৮৮

Swinburne

রবির কিরণ হতে আড়াল করিয়া রেখে
মনটি আমার আমি গোলাপে রাখিনু ঢেকে—
সে বিছানা সুকোমল, বিমল নীহার চেয়ে,
তারি মাঝে মনখানি রাখিলাম লুকাইয়ে।
একটি ফুল না নড়ে, একটি পাতা না পড়ে—
তবু কেন ঘুমায় না, চমকি চমকি চায়—
ঘুম কেন পাখা নেড়ে উড়িয়ে পালিয়ে যায়?
আর কিছু নয়, শুধু গোপনে একটি পাখি
কোথা হতে মাঝে মাঝে উঠিতেছে ডাকি ডাকি।
ঘুমা তুই, ওই দেখ বাতাস মুদেছে পাখা,
রবির কিরণ হতে পাতায় আছিস ঢাকা—
ঘুমা তুই, ওই দেখ তো চেয়ে দুরন্ত বায়
ঘুমেতে সাগর-'পরে ঢুলে পড়ে পায় পায়।
দুখের কাঁটায় কি রে বিঁধিতেছে কলেবর?
বিষাদের বিষদাঁতে করিছে কি জরজর?
কেন তবে ঘুম তোর ছাড়িয়া গিয়াছে আঁখি?
কে জানে, গোপনে কোথা ডাকিছে একটি পাখি।

শ্যামল কানন এই মোহমন্ত্রজালে ঢাকা,
অমৃতমধুর ফল ভরিয়ে রয়েছে শাখা,
স্বপনের পাখিগুলি চঞ্চল ডানাটি তুলি
উড়িয়া চলিয়া যায় আঁধার প্রান্তর-'পরে—
গাছের শিখর হতে ঘুমের সংগীত ঝরে।
নিভৃত কানন-'পর শুনি না ব্যাধের স্বর,
তবে কেন এ হরিণী চমকায় থাকি থাকি।
কে জানে, গোপনে কোথা ডাকিছে একটি পাখি।

কার্তিক ১২৮৮

Christina Rossetti

দেখিনু যে এক আশার স্বপন
    শুধু তা স্বপন, স্বপনময়—
    স্বপন বই সে কিছুই নয়।
অবশ হৃদয় অবসাদময়
হারাইয়া সুখ শ্রান্ত অতিশয়—
    আজিকে উঠিনু জাগি
কেবল একটি স্বপন লাগি।

বীণাটি আমার নীরব হইয়া
গেছে গীতগান ভুলি,
ছিঁড়িয়া টুটিয়া ফেলেছি তাহার
একে একে তারগুলি।
নীরব হইয়া রয়েছে পড়িয়া
সুদূর শ্মশান-'পরে,
কেবল একটি স্বপন-তরে!

থাম্ থাম্ ওরে হৃদয় আমার,
থাম্ থাম্ একেবারে,
নিতান্তই যদি টুটিয়া পড়িবি
একেবারে ভেঙে যা রে—
এই তোর কাছে মাগি।
আমার জগৎ, আমার হৃদয়—
আগে যাহা ছিল এখন তা নয়
কেবল একটি স্বপন লাগি।

কার্তিক ১২৮৮

Hood

নহে নহে এ নহে মরণ।
সহসা এ প্রাণপূর্ণ নিশ্বাসবাতাস
নীরবে করে যে পলায়ন,
আলোতে ফুটায় আলো এই আঁখিতারা
নিবে যায় একদা নিশীথে,
বহে না রুধিরনদী, সুকোমল তনু
ধূলায় মিলায় ধরণীতে,
ভাবনা মিলায় শূন্যে, মৃত্তিকার তলে
রুদ্ধ হয় অমর হৃদয়—
এই মৃত্যু? এ তো মৃত্যু নয়।
কিন্তু রে পবিত্র শোক যায় না যে দিন
পিরিতির স্মিরিতিমন্দিরে,
উপেক্ষিত অতীতের সমাধির 'পরে
তৃণরাজি দোলে ধীরে ধীরে,
মরণ-অতীত চির-নূতন পরান
স্মরণে করে না বিচরণ—
সেই বটে সেই তো মরণ!

কোনো জাপানি কবিতার ইংরাজি অনুবাদ হইতে

বাতাসে অশথপাতা পড়িছে খসিয়া,
বাতাসেতে দেবদারু উঠিছে শ্বসিয়া।
দিবসের পরে বসি রাত্রি মুদে আঁখি,
নীড়েতে বসিয়া যেন পাহাড়ের পাখি।
শ্রান্ত পদে ভ্রমি আমি নগরে নগরে
বিজন অরণ্য দিয়া পর্বতে সাগরে।
উড়িয়া গিয়াছে সেই পাখিটি আমার,
খুঁজিয়া বেড়াই তারে সকল সংসার।
দিন রাত্রি চলিয়াছি, শুধু চলিয়াছি—
ভুলে যেতে ভুলিয়া গিয়াছি।

আমি যত চলিতেছি রৌদ্র বৃষ্টি বায়ে
হৃদয় আমার তত পড়িছে পিছায়ে।
হৃদয় রে, ছাড়াছাড়ি হল তোর সাথে—
এক ভাব রহিল না তোমাতে আমাতে।
নীড় বেঁধেছিনু যেথা যা রে সেইখানে,
একবার ডাক্ গিয়ে আকুল পরানে।
কে জানে, হতেও পারে, সে নীড়ের কাছে
হয়তো পাখিটি মোর লুকাইয়ে আছে।
কেঁদে কেঁদে বৃষ্টিজলে আমি ভ্রমিতেছি—
ভুলে যেতে ভুলিয়ে গিয়েছি।

দেশের সবাই জানে কাহিনী আমার।
বলে তারা, 'এত প্রেম আছে বা কাহার!'
পাখি সে পলায়ে গেছে কথাটি না ব'লে,
এমন তো সব পাখি উড়ে যায় চলে।
চিরদিন তারা কভু থাকে না সমান
এমন তো কত শত রয়েছে প্রমাণ।
ডাকে আর গায় আর উড়ে যায় পরে,
এ ছাড়া বলো তো তারা আর কী বা করে?
পাখি গেল যার, তার এক দুঃখ আছে—
ভুলে যেতে ভুলে সে গিয়াছে!

সারা দিন দেখি আমি উড়িতেছে কাক,
সারা রাত শুনি আমি পেচকের ডাক।

চন্দ্র উঠে অস্ত যায় পশ্চিমসাগরে,
    পূরবে তপন উঠে জলদের স্তরে।
পাতা ঝরে, শুভ্র রেণু উড়ে চারি ধার—
বসন্তমুকুল এ কি? অথবা তুষার?
হৃদয়, বিদায় লই এবে তোর কাছে—
বিলম্ব হইয়া গেল, সময় কি আছে?
শান্ত হ' রে, একদিন সুখী হবি তবু—
মরণ সে ভুলে যেতে ভোলে না তো কভু!

আষাঢ় ১২৮৮

নাটক ও প্রহসন

মালঞ্চ

মালঞ্চ

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

পিঠের দিকে বালিশগুলো উঁচু-করা। নীরজা আধশোওয়া পড়ে আছে রোগশয্যায়। পায়ের উপরে সাদা রেশমের চাদর টানা, মেঝে সাদা মার্বেলে বাঁধানো, দেয়ালে রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের ছবি, ঘরে পালঙ্ক, একটি টিপাই ও দুটি বেতের মোড়া ছাড়া আর-কোনো আসবাব নেই, এক কোণে পিতলের কলসীতে রজনীগন্ধার গুচ্ছ।

পুব দিকের জানলা খোলা। দেখা যায় নীচের বাগানে অর্কিডের ঘর, ছিটেবেড়ার তৈরি। বেড়ার গায়ে গায়ে অপরাজিতার লতা।

নীরজা। রোশনি!

আয়া এল ঘরে। প্রৌঢ়া, কাঁচা-পাকা চুল। শক্ত হাতে মোটা পিতলের কঙ্কণ। ঘাঘরার উপর শাড়ি। মাংসবিরল দেহের ভঙ্গিতে ও শুষ্ক মুখের ভাবে একটা চিরস্থায়ী কঠিনতা।

রোশনি। জল এনে দেব খোঁখী?

নীরজা। না বোস্।

মেঝের উপর আয়া বসল হাঁটু উঁচু করে

আজ ভোরবেলায় দরজা খোলার শব্দ শুনলুম। সরলাকে নিয়ে বুঝি উনি বাগানে গিয়েছিলেন? ...আমাকেও তো এমনি করে ভোরে জাগিয়ে বাগানের কাজে রোজ নিয়ে যেতেন, ঠিক ঐ সময়েই। সে তো বেশি দিনের কথা নয়।

রোশনি। এতগুলো মালী মাইনে খাচ্ছে তবু ওঁকে নইলে বাগান শুকিয়ে যেত বুঝি?

নীরজা। নিয়ুমার্কেটে ভোরবেলাকার ফুলের চালান না পাঠিয়ে আমার একদিনও কাটত না। আজও ফুলের চালান গিয়েছিল। গাড়ির শব্দ শুনেছি। আজকাল চালান কে দেখে দেয় রোশনি?

আয়া কোনো উত্তর করলে না— ঠোঁট চেপে রইল বসে

আর যাই হোক, আমি যতদিন ছিলুম মালীরা ফাঁকি দিতে পারে নি।

রোশনি। আর সেদিন নেই। লুঠ চলছে এখন দু-হাতে।

নীরজা। সত্যি নাকি?

রোশনি। আমি কি মিথ্যে বলছি? কলকাতার নতুন বাজারে ক-টা ফুলই বা পৌঁছয়? জামাইবাবু বেরিয়ে গেলেই খিড়কির দরজায় ফুলের বাজার বসে যায়।

নীরজা। এরা কেউ দেখে না?

রোশনি। চোখ থাকতেও যদি না দেখে তো কী আর বলব?

নীরজা। জামাইবাবুকে বলিস-নে কেন?

রোশনি। বলব! এত বড়ো বুকের পাটা কার! এখন কি আর সে রাজত্তি আছে? মান বাঁচিয়ে চলতে হয়। তুমি একটু জোর করে বলো-না কেন খোঁখী! তোমারি তো সব!

নীরজা। হোক-না, হোক-না! বেশ তো এমনি চলুক-না কিছুদিন, যখন ছারখার হয়ে আসবে আপনিই পড়বে ধরা। তখন বুঝবে মায়ের চেয়ে সৎমায়ের ভালোবাসা বড়ো নয়। ওঁর সরলার চেয়ে বাগানের দরদ কেউ জানে না! চুপ করে থাক্-না, দর্পহারী মধুসূদন আছেন।

রোশনি। কিন্তু তাও বলি খোঁখী, তোমার ঐ হলা মালীটাকে দিয়ে কোনো কাজ পাওয়া যায় না।

নীরজা। আমি মালীকে দোষ দিই নে। নতুন মনিবকে ও সইবে কেমন করে? ওদের হল সাতপুরুষে মালীগিরি, আর তোমার দিদিমণির বইপড়া বিদ্যে। ওকে হুকুম করতে আসে। হলা আমার কাছে নালিশ করেছিল, শুধিয়েছিল এ-সব ছিষ্টিছাড়া আইন মানতে হবে না কি? আমি ওকে বলে দিলুম—'শুনিস্ কেন? চুপ করে থাক্, কিচ্ছু করতে হবে না।'

রোশনি। সেদিন জামাইবাবু রাগ করে ওকে ছাড়িয়ে দিতে গিয়েছিলেন। বাগানে গোরু ঢুকেছিল। তিনি বললেন, 'গোরু তাড়াস-নে কেন?' ও মুখের উপর জবাব করলে, 'আমি তাড়াব গোরু? গোরুই তো আমাকে তাড়া করে। আমার প্রাণের ভয় নেই?'

নীরজা। তা যাই হোক, ও যাই করুক, ও আমার নিজের হাতে তৈরি। ওকে তাড়িয়ে বাগানে নতুন লোক আনলে, সে আমি সইতে পারব না। তা গোরুই ঢুকুক আর গণ্ডারই তাড়া করুক। কী দুঃখে ও গোরু তাড়ায় নি সে আমি কি বুঝি নে? ওর যে আগুন জ্বলেছে বুকে।—ঐ যে হলা চলেছে দাঁতন করতে করতে দিঘির দিকে। ডাক্ তো ওকে।

রোশনি। হলা, হলা।

হলধরের প্রবেশ

নীরজা। কী রে, আজকাল নতুন ফরমাশ আছে কিছু?

হলা। আছে বৈকি বউদিদি, শুনে চোখে জল আসে।

নীরজা। কী রকম?

হলা। পাশে মল্লিকদের বাড়ি ভাঙা হচ্ছে, হুকুম হল তারি ইট-পাটকেল সব গাছের গোড়ায় গোড়ায় দিতে। আমি বললুম, রোদের বেলা গরম লাগবে গাছের। কান দেয় না আমার কথায়।

নীরজা। বাবুকে বলিস-নে কেন?

হলা। বলেছিলুম। বাবু ধমক দিয়ে বললে, চুপ করে থাক্। বউদিদি, আমাকে ছুটি দাও, আমি তো আর এ সইতে পারি নে।

নীরজা। তাই দেখেছি বটে তুই ঝুড়ি করে রাবিশ বয়ে আনছিলি।

হলা। বউদিদি, তুমিই তো আমার চিরদিনের মনিব—তোমার চোখের সামনে আমার এত অপমান ঘটতে দেবে?

নীরজা। আচ্ছা যা, তোদের দিদিমণি যখন তোকে ইটসুরকি বইতে বলবে বলিস আমি তোকে বারণ করেছি। এখন যা—দাঁড়িয়ে রইলি যে?

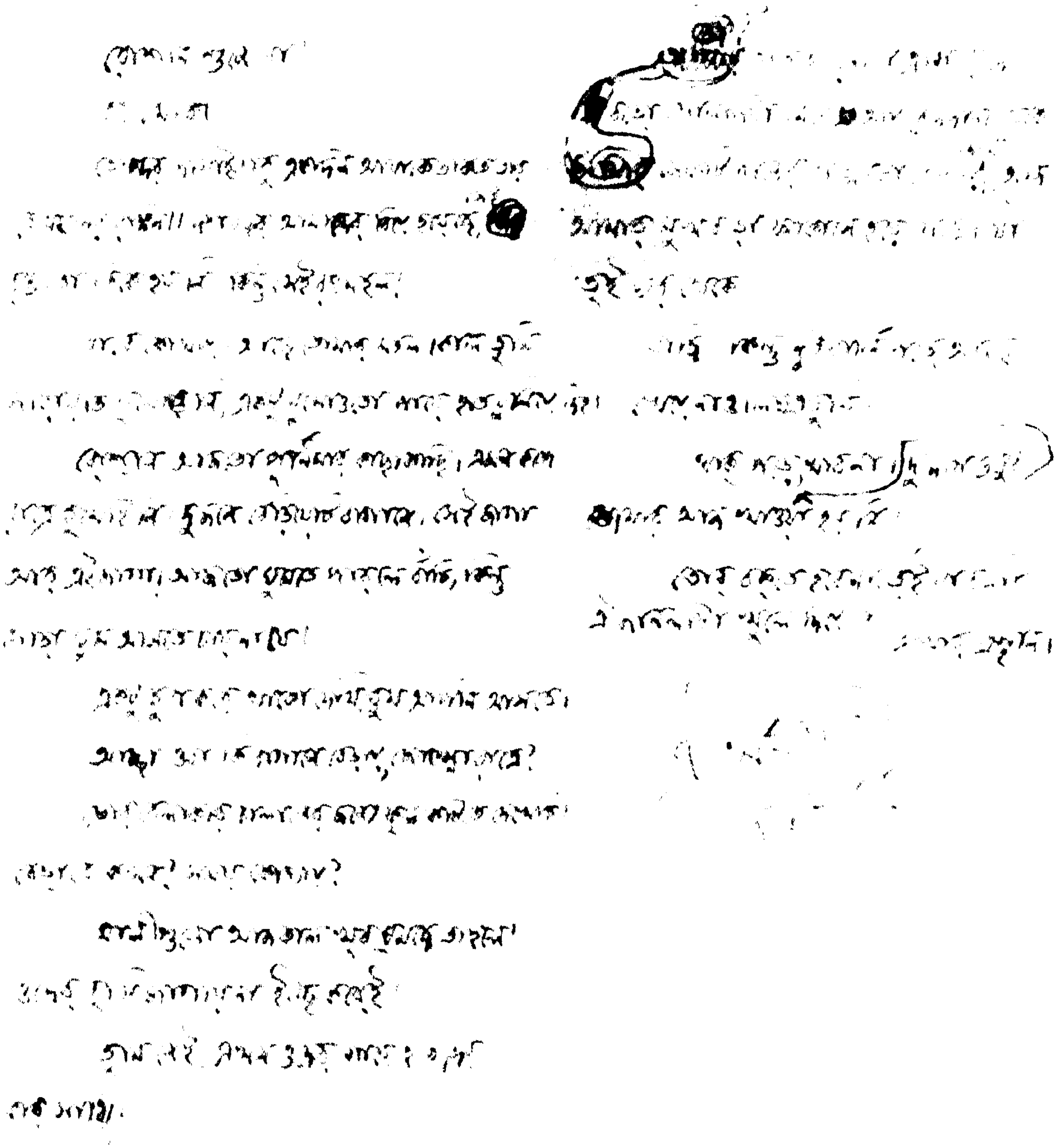

'মালঞ্চ' নাটকের পাণ্ডুলিপিচিত্র: একটি পৃষ্ঠা

হলা। দেশ থেকে চিঠি এসেছে হালের গোরু একটা মারা গেছে। না কিনতে পারলে চাষ বন্ধ। কাকে জানাব দুঃখ!

নীরজা। সব তোর মিথ্যে কথা।

হলা। মিথ্যে হলেও তো দয়া করতে হয়। হলা তোমার দুঃখী তো বটে।

নীরজা। আচ্ছা সে হবে। রোশনি, সরকারবাবুকে বলে দিস ওকে দুটো টাকা দেবে। আবার কী! যা চলে।

হলা। বউয়ের জন্যে একটা তোমার পুরোনো কাপড়— দেশে পাঠিয়ে দিই জয়জয়কার।

নীরজা। রোশনি, ওকে দে তো ঐ আলনার কাপড়খানা।

রোশনি। সে কি কথা! ও যে তোমার ঢাকাই শাড়ি।

নীরজা। হোক্‌-না ঢাকাই শাড়ি! আমার কিসের দরকার? কবেই বা আর পরব?

রোশনি। সে হবে না খোঁখী। ওকে তোমার সেই লালপেড়ে কলের কাপড়টা দিয়ে দেব।

হলা। (নীরজার পা ধরে) আমার কপাল ভেঙেছে বউদিদি।

নীরজা। কেন রে? কী হল তোর?

হলা। আয়াজিকে মাসি বলে এসেছি, এতদিন জানতেম হতভাগা হলাকে আয়াজি ভালোই বাসেন। আজ বউদিদি, তোমার যদি দয়া হল উনি কেন দেন বাগ্‌ড়া? আমার যদি এমন দশা না হবে তবে তোমার হলাকে পরের হাতে দিয়ে তুমি আজ বিছানায় পড়ে!

নীরজা। না রে, তোর মাসি তোকে ভালোই বাসে— এইমাত্র তোর গুণগান করছিল। রোশনি, দিয়ে দাও ওকে কাপড়টা, নইলে ও ধন্না দিয়ে পড়ে থাকবে।

আয়া অপ্রসন্ন মুখে কাপড়টা ফেলে দিলে ওর সামনে। হলা সেটা তুলে নিয়েই প্রণাম করে বললে—

হলা। এই গামছাটা দিয়ে মুড়ে নিই বউদিদি, নইলে দাগ লাগবে।

সম্মতির অপেক্ষা না রেখে তোয়ালে দিয়ে মুড়ে নিয়ে দ্রুতপদে প্রস্থান

নীরজা। আচ্ছা আয়া, তুই ঠিক জানিস বাবু বেরিয়ে গেছেন?

রোশনি। নিজের চক্ষে দেখলুম। কী তাড়া! টুপিটা নিতে ভুলে গেলেন।

নীরজা। এমন তো একদিনও হয় নি। সকালবেলায় ফুল একটা দিয়ে যেতেন— সময় হল না। জানি জানি আগেকার দিনের আর কিছুই থাকবে না। আমি থাকব পড়ে আমার সংসারের আঁস্তাকুড়ে নিবে-যাওয়া উনুনের পোড়া কয়লা ঝেঁটিয়ে ফেলবার জায়গায়। সে কোন্ দেবতা এমন বিচার যার?

সরলা আসছে দেখে আয়া মুখ বাঁকা করে চলে গেল।

সরলার প্রবেশ। হাতে তার একটি অর্কিড।... সরলা ছিপছিপে লম্বা, শামলা রঙ। দেখবামাত্র সব চেয়ে লক্ষ্য হয় তার বড়ো বড়ো চোখ, উজ্জ্বল এবং করুণ। মোটা খদ্দরের শাড়ি, চুল অযত্নে বাঁধা, শ্লথ বন্ধনে নেমে পড়েছে কাঁধের দিকে। অসজ্জিত দেহ যৌবনের সমাগমকে অনাদৃত করে রেখেছে। নীরজা তার মুখের দিকে তাকালে না। যেন কেউ আসে নি ঘরে। সরলা আস্তে আস্তে ফুলটি বিছানায় তার সামনে রেখে দিলে।

নীরজা। (বিরক্তিতে) কে আনতে বলেছে?

সরলা। আদিৎদা।

নীরজা। নিজে এলেন না যে?

সরলা। নিয়ুমার্কেটের দোকানে তাড়াতাড়ি যেতে হল চা-খাওয়া সেরেই।

নীরজা। এত তাড়া কিসের?

সরলা। কাল রাত্রে তালা ভেঙে টাকা চুরির খবর এসেছে।

নীরজা। টানাটানি করে পাঁচ মিনিটও কি সময় দিতে পারতেন না?

সরলা। কাল রাত্রে তোমার ব্যথা বেড়েছিল, ঘুমোতে পার নি। ভোরবেলায় ঘুমিয়ে পড়েছিলে, দরজা পর্যন্ত এসে ফিরে গেলেন। আমাকে বলে গেলেন, দুপুরের মধ্যে যদি নিজে না আসতে পারেন তবে এই ফুলটি তোমাকে দিই যেন।

নীরজা। (ফুলটা অবজ্ঞার সঙ্গে ঠেলে দিয়ে) জানো মার্কেটে এ ফুলের দাম কত? পাঠিয়ে দাও সেখানে, মিছে নষ্ট করবার দরকার কী।... জানো এ ফুলের নাম?

সরলা। এমারিলিস।

নীরজা। ভারি তো জানো তুমি। ওর নাম গ্র্যাণ্ডিফ্লোরা।

সরলা। তা হবে।

নীরজা। তা হবে মানে কী? নিশ্চয়ই তাই। আমি জানি নে?

ধীরে ধীরে সরলা প্রস্থানোদ্যত

শুনে যাও। কী করছিলে সমস্ত সকাল, কোথায় ছিলে?

সরলা। অর্কিডের ঘরে।

নীরজা। অর্কিডের ঘরে তোমার ঘন ঘন যাবার এত কী দরকার?

সরলা। পুরোনো অর্কিড চিরে ভাগ করে নতুন অর্কিড করবার জন্য আদিৎদা আমাকে বলে গিয়েছিলেন।

নীরজা। আনাড়ির মতো সব নষ্ট করবে তুমি। আমি নিজের হাতে হলা মালীকে তৈরি করে শিখিয়েছি, তাকে হুকুম করলে সে কি পারত না?... দাও বন্ধ করে দাও ঐ জানলা।

সরলা। (জানালা বন্ধ করে দিয়ে) এইবার কমলালেবুর রস নিয়ে আসি।

নীরজা। না, কিছু আনতে হবে না। এখন যেতে পারো।

সরলা। মকরধ্বজ খাবার সময় হয়েছে।

নীরজা। না, দরকার নেই মকরধ্বজ। তোমার উপর বাগানের আর-কোনো কাজের ফরমাশ আছে নাকি?

সরলা। গোলাপের ডাল পুঁততে হবে।

নীরজা। তার সময় এই বুঝি! এ বুদ্ধি তাঁকে দিলে কে, শুনি।

সরলা। মফস্বল থেকে হঠাৎ অনেকগুলো অর্ডার এসেছে দেখে কোনোমতে আসছে বর্ষার আগেই বেশি করে গাছ বানাতে পণ করেছেন। আমি বারণ করেছিলুম।

নীরজা। বারণ করেছিলে বুঝি? আচ্ছা আচ্ছা, ডেকে দাও হলা মালীকে।

হলা মালীকে সরলা ডেকে আনল

(হলা মালীর প্রতি) বাবু হয়ে উঠেছ? গোলাপের ডাল পুঁততে হাতে খিল ধরে, দিদিমণি তোমার অ্যাসিস্টেন্ট মালী না কি? বাবু শহর থেকে ফেরবার আগেই যতগুলো পারিস ডাল পুঁতবি ; আজ তোদের ছুটি নেই বলে দিচ্ছি। পোড়া ঘাসপাতার সঙ্গে বালি মিশিয়ে জমি তৈরি করে নিস ঝিলের ডান পাড়িতে।

শ্রান্তিতে নীরজা বালিশে মাথা এলিয়ে চুপ করে পড়ে রইল। ধীরে ধীরে ঘর থেকে সরলার প্রস্থান

হলা। বউদিদি, একটা পিতলের ঘটি। কটকের তৈরি। এ জিনিসের দরদ তুমিই বুঝবে, তোমার ফুলদানি মানাবে ভালো।

নীরজা। এর দাম কত হবে?

হলা। (জিভ কেটে) এমন কথা বোলো না। ঐ ঘটির দাম নেব? তোমার খেয়ে-পরেই মানুষ!

ঘটি টেবিলে রেখে অন্য ফুলদানি থেকে ফুল নিয়ে সাজিয়ে দিলে। যাবার মুখো হয়ে ফিরে দাঁড়িয়ে

আমার ভাগনীর বিয়েতে সেই বাজুবন্ধের কথাটা ভুলো না বউদিদি। পিতলের জিনিস যদি দিই তাতে তোমারি নিন্দে হবে।

নীরজা। আচ্ছা আচ্ছা, স্যাকরাকে ফরমাশ দেব, তুই এখন যা।

[হলার প্রস্থান

দ্বিতীয় দৃশ্য

নীরজা শয্যায় অর্ধশায়িত। তার খুড়তুতো দেওর রমেনের প্রবেশ

রমেন। বউদি, দাদা পাঠিয়ে দিলেন। আজ আফিসে কাজের ভিড়, হোটেলে খাবেন, দেরি হবে ফিরতে।

নীরজা। (হেসে) খবর দেবার ছুতো করে এক দৌড়ে ছুটে এসেছ, ঠাকুরপো। কেন, আপিসের বেহারাটা মরেছে বুঝি?

রমেন। তোমার কাছে আসতে তুমি ছাড়া অন্য ছুতোর দরকার কিসের বউদি? বেহারা বেটা কী বুঝবে এই দূতপদের দরদ।

নীরজা। ওগো মিষ্টি ছড়াচ্ছ অস্থানে। এ ঘরে এসেছ কোন্ ভুলে? তোমার মালিনী আছেন আজ একাকিনী নেবু কুঞ্জবনে। দেখো গে যাও।

রমেন। কুঞ্জবনের বনলক্ষ্মীকে দর্শনী দিই আগে, তার পরে যাব মালিনীর সন্ধানে।

এই বলে বুকের পকেট থেকে একখানা গল্পের বই বের করে নীরজার হাতে দান

নীরজা। "অশ্রুশিকল"— এই বইটাই চাচ্ছিলুম। আশীর্বাদ করি, তোমার মালঞ্চের মালিনী চিরদিন বুকের কাছে বাঁধা থাক্ হাসির শিকলে।— ঐ যাকে তুমি বলো তোমার কল্পনার দোসর— তোমার স্বপ্নসঙ্গিনী। কী সোহাগ গো!

রমেন। আচ্ছা বউদি, একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, ঠিক উত্তর দিয়ো।

নীরজা। কী কথা?

রমেন। সরলার সঙ্গে আজ কি তোমার ঝগড়া হয়ে গেছে?

নীরজা। কেন বলো তো?

রমেন। দেখলুম ঝিলের ধারে ঘাটে চুপ করে সে বসে আছে। মেয়েদের তো পুরুষদের মতো কাজ-পালানো উড়ো-মন নয়। এমন বেকার দশা আমি সরলার কোনোদিন দেখি নি। জিজ্ঞাসা

করলুম 'মন কোন্ দিকে?' ও বললে— 'যে দিকে তপ্ত হাওয়া শুকনো পাতা ওড়ায় সেই দিকে।' আমি বললুম— 'ওটা হল হেঁয়ালি, স্পষ্ট ভাষায় কথা কও।' সে বললে— 'সব কথারই কি ভাষা আছে?' আবার দেখি হেঁয়ালি। তখন গানের বুলিটা মনে পড়ল 'কাহার বচন দিয়েছে বেদন'।

নীরজা। হয়তো তোমার দাদার বচন।

রমেন। হতেই পারে না।

নীরজা। কেন হতেই পারে না?

রমেন। দাদা যে পুরুষমানুষ। সে তোমার ঐ মালীগুলোকে হুংকার দিতে পারে, কিন্তু 'পুষ্পরাশাবিবাগ্নিঃ'— এও কি সম্ভব হয়?

নীরজা। আচ্ছা, বাজে কথা বকতে হবে না। একটা কাজের কথা বলি, আমার অনুরোধ রাখতেই হবে। দোহাই তোমার, সরলাকে তুমি বিয়ে করো। আইবড়ো মেয়েকে উদ্ধার করলে মহাপুণ্য।

রমেন। পুণ্যের লোভ রাখি নে কিন্তু ঐ কন্যার লোভ রাখি, এ কথা বলছি তোমার কাছে হলফ করে।

নীরজা। তা হলে বাধাটা কোথায়? ওর কি মন নেই?

রমেন। সে কথা জিজ্ঞাসাও করি নি। বলেছিই তো ও আমার কল্পনার দোসরই থাকবে, সংসারের দোসর হবে না।

নীরজা। (হঠাৎ তীব্র আগ্রহের সঙ্গে রমেনের হাত চেপে ধরে) কেন হবে না, হতেই হবে। মরবার আগে তোমাদের বিয়ে দেখবই, নইলে ভূত হয়ে তোমাদের জ্বালাতন করব বলে রাখছি।

রমেন। (বিস্মিতভাবে নীরজার দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে মাথা নেড়ে) বউদি, আমি সম্পর্কে ছোটো, কিন্তু বয়সে বড়ো। উড়ো বাতাসে আগাছার বীজ আসে ভেসে, প্রশ্রয় পেলে শিকড় ছড়ায়, তার পরে আর ওপড়ায় কার সাধ্যি।

নীরজা। আমাকে উপদেশ দিতে হবে না। আমি তোমার গুরুজন, তোমাকে উপদেশ দিচ্ছি, বিয়ে করো। দেরি কোরো না। এই ফাল্গুনমাসে ভালো দিন আছে।

রমেন। আমার পাঁজিতে তিনশো পঁয়ষট্টি দিনই ভালো দিন। কিন্তু দিন যদি বা থাকে, রাস্তা নেই। আমি একবার গেছি জেলে, এখনো আছি পিছল পথে জেলের কবলটার দিকে, ও পথে প্রজাপতির পেয়াদার চল নেই।

নীরজা। এখনকার মেয়েরাই বুঝি জেলখানাকে ভয় করে?

রমেন। না করতে পারে কিন্তু সপ্তপদীগমনের রাস্তা ওটা নয়। ও রাস্তায় বধূকে পাশে না রেখে মনের মধ্যে রাখলে জোর পাওয়া যায়। রইল চিরদিন আমার মনে।

হরলিক্স দুধের পাত্রটা টিপাইয়ের উপর রেখে সরলা চলে যাচ্ছিল

নীরজা। যেয়ো না, শোনো সরলা, এই ফোটোগ্রাফটা কার, চিনতে পারো?

সরলা। ও তো আমার।

নীরজা। তোমার সেই আগেকার দিনের ছবি। যখন তোমার জ্যাঠামশায়ের ওখানে তোমরা বাগানের কাজ করতে। দেখে মনে হচ্ছে বয়েস পনেরো হবে। মারাঠি মেয়ের মতো মালকোঁচা দিয়ে শাড়ি পরেছ।

সরলা। এ তুমি কোথা থেকে পেলে?

নীরজা। আমি জানতুম ওঁর একটা ডেস্কের মধ্যে ছিল, সেখান থেকে আনিয়ে নিয়েছি। ঠাকুরপো, তখনকার চেয়ে সরলাকে এখন আরো অনেক ভালো দেখতে হয়েছে। তোমার কী মনে হয়।

রমেন। তখনকার সরলাকে জানতুম না তাই আমার কাছে এখনকার সরলাই সত্য।

নীরজা। ওর এখনকার চেহারা হৃদয়ের কোন্ একটা রহস্যে ভরে উঠেছে— যেন যে মেঘ ছিল সাদা তার ভিতর থেকে শ্রাবণের জল আজ ঝরি-ঝরি করছে— একেই তোমরা রোম্যান্টিক বলো ; না ঠাকুরপো!

সরলার প্রস্থানোদ্যম—

নীরজা। সরলা, একটু রোসো।— ঠাকুরপো, একবার পুরুষমানুষের চোখ দিয়ে সরলাকে দেখে নিই। ওর কী সকলের আগে তোমাদের চোখে পড়ে বলো দেখি!

রমেন। সমস্তটাই একসঙ্গে।

নীরজা। নিশ্চয়ই ওর চোখ দুটো, কেমন একরকম মিষ্টি করে চাইতে জানে। না, উঠো না সরলা। আর-একটু বোসো। ওর দেহটাও কেমন নিরেট নিটোল।

রমেন। তুমি কি ওকে নীলেম করতে বসেছ না কি বউদি? জানোই তো অমনিতেই আমার উৎসাহের কিছু কমতি নেই।

নীরজা। ঠাকুরপো, দেখো সরলার হাত-দুখানি, যেমন জোরালো তেমনি সুডোল, কোমল, তেমনি তার শ্রী। এমনটি আর দেখেছ?

রমেন। (হেসে) আর কোথাও দেখেছি কি না তার উত্তরটা তোমার মুখের সামনে রূঢ় শোনাবে।

নীরজা। অমন দুটি হাতের 'পরে দাবি করবে না?

রমেন। চিরদিনের দাবি নাই করলেম, ক্ষণে ক্ষণে দাবি করে থাকি। তোমাদের ঘরে যখন চা খেতে আসি তখন চায়ের চেয়ে বেশি কিছু পাই ঐ হাতের গুণে। সেই রসগ্রহণে পাণিগ্রহণের যেটুকু সম্পর্ক থাকে অভাগার পক্ষে সেই যথেষ্ট।

সরলা মোড়া ছেড়ে উঠে পড়ল। ঘর থেকে বেরোবার উপক্রম করতেই রমেন দ্বার আগলে বললে—

একটা কথা দাও ; তবে পথ ছাড়ব।

সরলা। কী বলো!

রমেন। আজ শুক্লা চতুর্দশী, আমি মুসাফির আসব তোমার বাগিচায়, কথা যদি থাকে তবু কইবার দরকারই হবে না। আকাল পড়েছে, পেট ভরে দেখাই জোটে না। হঠাৎ এই ঘরে মুষ্টিভিক্ষার দেখা— এ মঞ্জুর নয়। আজ তোমাদের গাছতলায় বেশ একটু রয়ে বসে মনটা ভরিয়ে নিতে চাই।

সরলা। আচ্ছা এসো তুমি।

রমেন। (খাটের কাছে ফিরে এসে) তবে আসি বউদি।

নীরজা। আর থাকবার দরকার কী? বউদির যে কাজটুকু ছিল সে তো সারা হল।

[সরলা ও রমেনের প্রস্থান

নীরজা। রোশনি, শুনে যা।

রোশনির প্রবেশ

রোশনি। কী খোঁখী।

নীরজা। তোদের জামাইবাবু একদিন আমাকে ডাকত রঙমহলের রঙ্গিণী। দশ বছর আমাদের বিয়ে হয়েছে, সেই রঙ তো এখনো ফিকে হয় নি কিন্তু সেই রঙমহল!

রোশনি। যাবে কোথায়, আছে তোমার মহল। কাল তুমি সারারাত ঘুমোও নি, একটু ঘুমোও তো, পায়ে হাত বুলিয়ে দিই।

নীরজা। রোশনি, আজ তো পূর্ণিমার কাছাকাছি। এমন কত রাত্রে ঘুমোই নি। দুজনে বেড়িয়েছি বাগানে। সেই জাগা আর এই জাগা! আজ তো ঘুমোতে পারলে বাঁচি, কিন্তু পোড়া ঘুম আসতে চায় না যে।

রোশনি। একটু চুপ করে থাকো দেখি, ঘুম আপনি আসবে।

নীরজা। আচ্ছা, ওরা কি বাগানে বেড়ায় জ্যোৎস্নারাত্রে?

রোশনি। ভোরবেলাকার চালানের জন্য ফুল কাটতে দেখেছি। বেড়াবে কখন, সময় কোথায়?

নীরজা। মালীগুলো আজকাল খুব ঘুমোচ্ছে— তা হলে ওদের বুঝি জাগায় না ইচ্ছে করেই?

রোশনি। তুমি নেই এখন ওদের গায়ে হাত দেয় কার সাধ্যি।

নীরজা। ঐ না শুনলেম শব্দ?

রোশনি। হাঁ, বাবুর গাড়ি এল।

নীরজা। হাত-আয়নাটা এগিয়ে দে। বড়ো গোলাপটা নিয়ে আয় ফুলদানী থেকে, সেফটি পিনের বাক্সটা কোথায় দেখি। আজ আমার মুখ বড়ো ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। যা তুই ঘর থেকে।

রোশনি। যাচ্ছি কিন্তু দুধ বার্লি পড়ে আছে, খেয়ে নাও, লক্ষ্মী তুমি।

নীরজা। থাক্ পড়ে, খাব না।

রোশনি। দু দাগ ওষুধ তোমার আজ খাওয়া হয় নি।

নীরজা। তোর বকতে হবে না, তুই যা বলছি, ঐ জানলাটা খুলে দিয়ে যা।

[আয়ার প্রস্থান

ঢং ঢং করে তিনটে বাজল। দূরে ঝিলের জল টলমল করছে, জানলা দিয়ে তার কিছুটা দেখা যাচ্ছে, নীরজা সে দিকে চেয়ে আছে। দ্রুত পদে আদিত্য ছুটে এল ঘরে। হাত জোড়া বাসন্তী রঙের দেশী ল্যাবার্নাম ফুলের মঞ্জরীতে। তাই দিয়ে ঢেকে দিল নীরজার পায়ের কাছটা। বিছানায় বসেই তার হাত চেপে ধরে বললে—

আদিত্য। আজ কতক্ষণ তোমাকে দেখি নি নীরু!

নীরজা আর থাকতে পারল না, ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। আদিত্য খাটের থেকে নেমে মেঝের উপর হাঁটু গেড়ে নীরজার গলা জড়িয়ে ধরে ললাটের চুলগুলো সিঁথিতে পাট করে তুলে দিতে দিতে বললে—

আদিত্য। মনে মনে তুমি নিশ্চয় জানো আমার দোষ ছিল না।

নীরজা। অত নিশ্চয় করে কী করে জানব বলো? আমার কি আর সেদিন আছে?

আদিত্য। দিনের কথা হিসেব করে কী হবে? তুমি তো আমার সেই তুমিই আছ।

নীরজা। আজ যে আমার সকল তাতেই ভয় করে। জোর পাই নে যে মনে।

আদিত্য। অল্প একটু ভয় করতে ভালো লাগে। না? খোঁটা দিয়ে আমাকে একটুখানি উসকিয়ে দিতে চাও। এ চাতুরী মেয়েদের স্বভাবসিদ্ধ।

নীরজা। আর ভুলে যাওয়া বুঝি পুরুষদের স্বভাবসিদ্ধ? নয়?

আদিত্য। ভুলতে ফুরসত দাও কই!

নীরজা। বোলো না, বোলো না, পোড়া বিধাতার সাপে লম্বা ফুরসত দিয়েছি যে।

আদিত্য। উলটো বললে। সুখের দিনে ভোলা যায়, ব্যথার দিনে নয়।

নীরজা। সত্যি বলো, আজ সকালে তুমি ভুলে চলে যাও নি?

আদিত্য। কী কথা বলো তুমি। চলে যেতে হয়েছিল কিন্তু যতক্ষণ না ফিরেছি মনে স্বস্তি ছিল না।

নীরজা। কেমন করে বসেছ তুমি! তোমার পা দুটো বিছানায় তোলো।

আদিত্য। বেড়ি দিতে চাও পাছে পালাই?

নীরজা। হাঁ, বেড়ি দিতেই চাই। জনমে মরণে তোমার পা দুখানি নিঃসন্দেহে রইল আমার কাছে বাঁধা।

আদিত্য। মাঝে মাঝে একটু একটু সন্দেহ কোরো, তাতে আদরের স্বাদ বাড়ায়।

নীরজা। না, একটুও সন্দেহ না। এতটুকুও না। তোমার মতো এমন স্বামী কোন্ মেয়ে পেয়েছে? তোমাকেও সন্দেহ, তাতে যে আমাকেই ধিক্কার।

আদিত্য। আমি তা হলে তোমাকেই সন্দেহ করব, নইলে জমবে না নাটক।

নীরজা। তা কোরো, কোনো ভয় নেই। সেটা হবে প্রহসন।

আদিত্য। যাই বলো আজ কিন্তু রাগ করেছিলে আমার 'পরে!

নীরজা। কেন আবার সে কথা? শাস্তি তোমাকে দিতে হবে না।— নিজের মধ্যেই তার দণ্ডবিধান।

আদিত্য। দণ্ড কিসের জন্য? রাগের তাপ যদি মাঝে মাঝে দেখা না দেয় তা হলে বুঝব ভালোবাসার নাড়ি ছেড়ে গেছে।

নীরজা। যদি কোনোদিন ভুলে তোমার উপরে রাগ করি, নিশ্চয় জেনো সে আমি নয়, কোনো অপদেবতা আমার উপরে ভর করেছে।

আদিত্য। অপদেবতা আমাদের সকলেরই একটা করে থাকে, মাঝে মাঝে অকারণে জানান দেয়। সুবুদ্ধি যদি আসে, রাম নাম করি, দেয় সে দৌড়।

আয়া এল ঘরে

রোশনি। জামাইবাবু, আজ সকাল থেকে খোঁখী দুধ খায় নি, ওষুধ খায় নি, মালিশ করে নি। এমন করলে আমরা ওর সঙ্গে পারব না।

বলেই হন হন করে হাত দুলিয়ে চলে গেল

আদিত্য। (দাঁড়িয়ে উঠে) এবার তবে আমি রাগ করি?

নীরজা। হাঁ, করো, অন্যায় করেছি, কিন্তু মাপ কোরো তার পরে।

আদিত্য। (দরজার কাছে এসে) সরলা! সরলা!

সরলা এল ঘরে

(সরলাকে বিরক্তভাবে) নীরুকে ওষুধ দাও নি আজ, সারাদিন কিছু খেতেও দেওয়া হয় নি?

নীরজা। ওকে বক্‌ছ কেন? ওর দোষ কী? আমিই দুষ্টুমি করে খাই নি। আমাকে বকো-না। সরলা, তুমি যাও। মিছে কেন দাঁড়িয়ে বকুনি খাবে।

আদিত্য। যাবে কি, ওষুধ বের করে দিক, হরলিক্‌স্‌ মিল্ক তৈরি করে আনুক।

নীরজা। আহা, সমস্ত দিন ওকে মালীর কাজে খাটিয়ে মারো তার উপরে আবার নার্সের কাজ কেন! একটু দয়া হয় না তোমার মনে? আয়াকে ডাকো-না।

আদিত্য। আয়া কি ঠিকমতো পারবে এ-সব কাজ?

নীরজা। ভারি তো কাজ, খুব পারবে। আরো ভালোই পারবে।

আদিত্য। কিন্তু—

নীরজা। কিন্তু আবার কিসের। আয়া! আয়া!

আদিত্য। অত উত্তেজিত হোয়ো না। একটা বিপদ ঘটবে দেখছি।

সরলা। আমি আয়াকে ডেকে দিচ্ছি।

সরলা চলে গেল

আয়া এসে ওষুধ পথ্য করাল

আদিত্য। (আয়াকে) সরলাদিদিকে ডেকে দাও।

নীরজা। কথায় কথায় কেবলই সরলাদিদি, বেচারাকে তুমি অস্থির করে তুলবে দেখছি।

আদিত্য। কাজের কথা আছে।

নীরজা। থাক্‌-না এখন কাজের কথা।

আদিত্য। বেশিক্ষণ লাগবে না।

নীরজা। সরলা মেয়েমানুষ, ওর সঙ্গে এত কাজের কথা কিসের? তার চেয়ে হলা মালীকে ডাকো-না।

আদিত্য। তোমাকে বিয়ে করবার পর থেকে একটা কথা আবিষ্কার করেছি যে, মেয়েরাই কাজের, পুরুষরা হাড়ে অকেজো। আমরা কাজ করি দায়ে পড়ে, তোমরা কাজ করো প্রাণের উৎসাহে। এই সম্বন্ধে একটা থীসিস্‌ লিখব মনে করেছি। আমার ডায়রি থেকে বিস্তর উদাহরণ পাওয়া যাবে।

নীরজা। সেই মেয়েকেই আজ তার প্রাণের কাছ থেকে বঞ্চিত করেছে যে বিধাতা, তাকে কী বলে নিন্দে করব? ভূমিকম্পে হুড়মুড় করে আমার কাজের চূড়া পড়েছে ভেঙে, তাই তো পোড়ো বাড়িতে ভূতের বাসা হল।

সরলার প্রবেশ

আদিত্য। অর্কিড-ঘরের কাজ হয়ে গেছে?

সরলা। হাঁ, হয়ে গেছে।

আদিত্য। সবগুলো?

সরলা। সবগুলোই।

আদিত্য। আর গোলাপের কাটিং?

সরলা। মালী তার জমি তৈরি করছে।

আদিত্য। জমি! সে তো আমি আগেই তৈরি করে রেখেছি। হলা মালীর উপর ভার দিয়েছ, তা হলেই দাঁতনকাঠির চাষ হবে আর কি।

নীরজা। সরলা, যাও তো, কমলালেবুর রস করে নিয়ে এসো গে, তাতে একটু আদার রস দিয়ো, আর মধু।

সরলা মাথা হেঁট করে বেরিয়ে গেল

(আদিত্যকে) আজ তুমি ভোরে উঠেছিলে যেমন আমরা রোজ উঠতুম?

আদিত্য। হাঁ, উঠেছিলুম।

নীরজা। ঘড়িতে তেমনি এলারমের দম দেওয়া ছিল?

আদিত্য। ছিল বৈকি।

নীরজা। সেই নিম গাছতলায় সেই কাঁটাগাছের গুঁড়ি। তার উপরে চায়ের সরঞ্জাম। সব ঠিক রেখেছিল বাসু?

আদিত্য। রেখেছিল। নইলে খেসারতের দাবিতে নালিশ রুজু করতুম তোমার আদালতে।

নীরজা। দুটো চৌকিই পাতা ছিল?

আদিত্য। পাতা ছিল সেই আগেকার মতোই। আর ছিল সেই নীল-পাড়-দেওয়া বাসন্তী রঙের চায়ের সরঞ্জাম, দুধের জাগ রুপোর, ছোটো সাদা পাথরের বাটিতে চিনি, আর ড্রাগন-আঁকা জাপানি ট্রে।

নীরজা। অন্য চৌকিটা খালি রাখলে কেন?

আদিত্য। ইচ্ছে করে রাখি নি। আকাশে তারাগুলো গোনাগুনতি ঠিকই ছিল, কেবল শুক্লপঞ্চমীর চাঁদ রইল দিগন্তের বাইরে। সুযোগ থাকলে তাকে আনতেম ধরে।

নীরজা। সরলাকে কেন ডাকো না তোমার চায়ের টেবিলে?

আদিত্য। সকালবেলায় বোধ হয় সে জপতপ কিছু করে, আমার মতো ভজনপূজনহীন ম্লেচ্ছ তো নয়।

নীরজা। চা খাওয়ার পরে আজ বুঝি অর্কিড-ঘরে তাকে নিয়ে গিয়েছিলে?

আদিত্য। হাঁ, কিছু কাজ ছিল, ওকে বুঝিয়ে দিয়েই ছুটতে হল দোকানে।

নীরজা। আচ্ছা, একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, সরলার সঙ্গে রমেনের বিয়ে দাও না কেন?

আদিত্য। ঘটকালি কি আমার ব্যাবসা?

নীরজা। না, ঠাট্টা নয়। বিয়ে তো করতেই হবে, রমেনের মতো পাত্র পাবে কোথায়?

আদিত্য। পাত্র আছে একদিকে, পাত্রী আছে আর-একদিকে, মাঝখানটাতে মন আছে কি না সে খবর নেবার ফুরসত পাই নি। দূরের থেকে মনে হয় যেন ঐখানটাতেই খটকা।

নীরজা। কোনো খটকা থাকত না যদি তোমার সত্যিকার আগ্রহ থাকত।

আদিত্য। বিয়ে করবে অন্যপক্ষ, সত্যিকার আগ্রহটা থাকবে একা আমার, এটাতে কি কাজ চলে? তুমি চেষ্টা দেখো-না।

নীরজা। কিছুদিন গাছপালা থেকে ঐ মেয়েটার দৃষ্টিটাকে ছুটি দাও দেখি, ঠিক জায়গায় আপনি চোখ পড়বে।

আদিত্য। শুভদৃষ্টির আলোতে গাছপালা পাহাড়-পর্বত সমস্তই স্বচ্ছ হয়ে যায়। ও একজাতের এক্‌স্‌রেজ আর-কি।

নীরজা। মিছে বক্‌ছ। আসল কথা, তোমার ইচ্ছে নয় বিয়েটা ঘটে।

আদিত্য। এতক্ষণে ধরেছ ঠিক। সরলা গেলে আমার বাগানের দশা কী হবে বলো। লাভলোকসানের কথাটাও ভাবতে হয়। ও কি ও, হঠাৎ তোমার বেদনাটা বেড়ে উঠল না কি?

নীরজা। (রুক্ষভাবে) কিছু হয় নি। আমার জন্যে তোমাকে তত ব্যস্ত হতে হবে না।

আদিত্য ওঠবার উপক্রম করছে

...আমাদের বিয়ের পরেই ঐ অর্কিড-ঘরের প্রথম পত্তন, ভুলে যাও নি তো সে কথা? তার পরে দিনে দিনে আমরা দুজনে মিলে ঐ ঘরটাকে সাজিয়ে তুলেছি। ওটাকে নষ্ট করতে দিতে তোমার মনে একটুও লাগে না?

আদিত্য। (বিস্মিতভাবে) সে কেমন কথা? নষ্ট হতে দেবার শখ আমার দেখলে কোথায়?

নীরজা। (উত্তেজিত হয়ে) সরলা কী জানে ফুলের বাগানের?

আদিত্য। বলো কী? সরলা জানে না? যে-মেসোমশায়ের ঘরে আমি মানুষ তিনি যে সরলার জ্যাঠামশায়। তুমি তো জানো তাঁরি বাগানে আমার হাতে-খড়ি। জ্যাঠামশায় বলতেন ফুলের বাগানের কাজ মেয়েদেরই, আর গোরু দোওয়ানো। তাঁর সব কাজে ও ছিল তাঁর সঙ্গিনী।

নীরজা। আর তুমি ছিলে সঙ্গী।

আদিত্য। ছিলেম বৈকি। কিন্তু আমাকে করতে হত কলেজের পড়া, ওর মতো অত সময় দিতে পারি নি। ওকে মেসোমশায় নিজে পড়াতেন।

নীরজা। সেই বাগান নিয়ে তোমার মেসোমশায়ের সর্বনাশ হয়ে গেল, এমনি ও মেয়ের পয়! আমার তো তাই ভয় করে। অলক্ষুণে মেয়ে। দেখো-না মাঠের মতো কপাল, ঘোড়ার মতো লাফিয়ে চলন। মেয়েমানুষের পুরুষালি বুদ্ধিটা ভালো নয়। ওতে অকল্যাণ ঘটায়।

আদিত্য। তোমার আজ কী হয়েছে বলো তো নীরু? কী কথা বলছ? মেসোমশায় বাগান করতেই জানতেন, ব্যাবসা করতে জানতেন না। ফুলের চাষ করতে তিনি ছিলেন অদ্বিতীয়, নিজের লোকসান করতেও তাঁর সমকক্ষ কেহ ছিল না। সকলের কাছে তিনি নাম পেতেন, দাম পেতেন না। বাগান করবার জন্যে আমাকে যখন মূলধনের টাকা দিয়েছিলেন আমি কি জানতুম তখনি তাঁর তহবিল ডুবুডুবু। আমার একমাত্র সান্ত্বনা এই যে, তাঁর মরবার আগেই সমস্ত দিয়েছি শোধ করে।

সরলা কমলালেবুর রস নিয়ে এল

নীরজা। (সরলাকে) ঐখানে রেখে যাও।

রেখে সরলা চলে গেল

(আদিত্যকে) সরলাকে তুমি বিয়ে করলে না কেন?

আদিত্য। শোনো একবার কথা! বিয়ের কথা কোনোদিন মনেও আসে নি।

নীরজা। মনেও আসে নি? এই বুঝি তোমার কবিত্ব!

আদিত্য। জীবনে কবিত্বের বালাই প্রথম দেখা দিল যেদিন তোমাকে দেখলুম। তার আগে আমরা দুই বুনো মিলে দিন কাটিয়েছি বনের ছায়ায়, নিজেদের ছিলুম ভুলে। হাল আমলের সভ্যতায় যদি মানুষ হতুম তা হলে কী হত বলা যায় না।

নীরজা। কেন, সভ্যতার অপরাধটা কী?

আদিত্য। এখনকার সভ্যতাটা দুঃশাসনের মতো হৃদয়ের বস্ত্র হরণ করতে চায়। অনুভব করবার পূর্বেই জানিয়ে দেয় চোখে আঙুল দিয়ে। গন্ধের ইশারা ওর পক্ষে বেশি সূক্ষ্ম, খবর নেয় পাপড়ি ছিঁড়ে।

নীরজা। সরলাকে তো দেখতে মন্দ নয়।

আদিত্য। সরলাকে জানতুম সরলা বলেই। ও দেখতে ভালো কি মন্দ সে তত্ত্বটা সম্পূর্ণ বাহুল্য ছিল।

নীরজা। আচ্ছা সত্যি বলো। ওকে তুমি ভালোবাসতে না?

আদিত্য। নিশ্চয় ভালোবাসতুম। আমি কি জড়পদার্থ যে, ওকে ভালোবাসব না। মেসোমশায়ের ছেলে রেঙ্গুনে ব্যারিস্টারি করে, তার জন্যে কোনো ভাবনা নেই। তাঁর বাগানটি নিয়ে সরলা থাকবে এই ছিল তাঁর জীবনের সাধ। এমন-কি, তাঁর বিশ্বাস ছিল, এই বাগানই ওর সমস্ত মনপ্রাণ অধিকার করবে। ওর বিয়ে করবার গরজ থাকবে না। তার পরে তিনি চলে গেলেন। অনাথা হল সরলা, পাওনাদারের হাতে বাগানটি গেল বিকিয়ে। সেদিন আমার বুক ভেঙে গিয়েছিল, দেখো নি কি তুমি? ও যে ভালোবাসার জিনিস, ভালোবাসব না ওকে? মনে তো আছে একদিন সরলার মুখে হাসিখুশি ছিল উচ্ছ্বসিত। মনে হত যেন পাখির ওড়া ছিল ওর পায়ের চলার মধ্যে। আজ ও চলেছে বুকভরা বোঝা বয়ে বয়ে, তবু ভেঙে পড়ে নি। একদিনের জন্যে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে নি আমারও কাছে, নিজেকে তার অবকাশও দিলে না।

নীরজা। থামো গো থামো, অনেক শুনেছি ওর কথা তোমার কাছে; আর বলতে হবে না। অসামান্য মেয়ে। সেইজন্যে বলেছি ওকে সেই বারাসতের মেয়ে-স্কুলের হেড্‌মিস্‌ট্রেস করে দাও। তারা তো কতবার ধরাধরি করেছে।

আদিত্য। বারাসতের মেয়ে-ইস্কুল! কেন, আন্ডামানও তো আছে?

নীরজা। না, ঠাট্টা নয়। সরলাকে তোমার বাগানের আর যে-কোনো কাজ দিতে হয় দিয়ো কিন্তু ঐ অর্কিড-ঘরের কাজ দিতে পারবে না।

আদিত্য। কেন, হয়েছে কী?

নীরজা। আমি তোমাকে বলে দিচ্ছি সরলা অর্কিড ভালো বোঝে না।

আদিত্য। আমিও তোমাকে বলছি, আমার চেয়ে সরলা ভালো বোঝে। মেসোমশায়ের প্রধান শখ ছিল অর্কিডে। তিনি নিজের লোক পাঠিয়ে সেলিবিস দ্বীপ থেকে, জাভা থেকে, এমন-কি, চীন থেকে অর্কিড আনিয়েছেন, তার দরদ বোঝে এমন লোক তখন কেউ ছিল না।

নীরজা। আচ্ছা, আচ্ছা, বেশ বেশ, ও না-হয় আমার চেয়ে ঢের ভালো বোঝে, এমন-কি, তোমার চেয়েও। তা হোক, তবু বলছি ঐ অর্কিডের ঘর শুধু কেবল তোমার আমার, ওখানে সরলার কোনো অধিকার নেই। তোমার সমস্ত বাগানটা ওকেই দিয়ে দাও-না যদি তোমার নিতান্ত ইচ্ছে হয়, কেবল খুব অল্প একটু কিছু রেখো যেটুকু কেবল আমাকেই উৎসর্গ-করা। এতকাল

পরে অন্তত এইটুকু দাবি করতে পারি। কপাল-দোষে না-হয় আজ আছি বিছানায় পড়ে, তাই বলে—

কথা শেষ করতে পারল না, বালিশে মুখ গুঁজে অশান্ত হয়ে কাঁদতে লাগল। আদিত্য স্তম্ভিত হয়ে বসে ভাবতে লাগলে— কিছুক্ষণ পরে নীরজার হাত ধরে বললে—

আদিত্য। কেঁদো না নীরু, বলো কী করব। তুমি কি চাও সরলাকে বাগানের কাজে না রাখি?

নীরজা। (হাত ছিনিয়ে নিয়ে) কিচ্ছু চাই নে; কিচ্ছু না; ও তোমারই বাগান, তুমি যাকে খুশি রাখতে পারো আমার তাতে কী?

আদিত্য। নীরু, এমন কথা তুমি বলতে পারলে, আমারই বাগান? তোমার নয়? আমাদের মধ্যে এই ভাগ হয়ে গেল কবে থেকে?

নীরজা। যবে থেকে তোমার রইল বিশ্বের আর সমস্ত-কিছু, আর আমার রইল কেবল এই ঘরের কোণ। আমার এই ভাঙা প্রাণ নিয়ে দাঁড়াব কিসের জোরে তোমার ঐ আশ্চর্য সরলার সামনে! আমার সে শক্তি আজ কোথায় যে তোমার সেবা করি, তোমার বাগানের কাজ করি?

আদিত্য। নীরু, তুমি তো কতদিন এর আগে আপনি সরলাকে ডেকে পাঠিয়েছ, নিয়েছ ওর পরামর্শ। মনে নেই কি এই কয়েক বছর আগে বাতাবী নেবুর সঙ্গে কলম্বা নেবুর কলম বেঁধেছ দুইজনে, আমাকে আশ্চর্য করে দেবার জন্যে।

নীরজা। তখন তো ওর এত গুমর ছিল না। বিধাতা যে আমারই দিকে আজ অন্ধকার করে দিলে, তাই তো তোমার কাছে হঠাৎ ধরা পড়েছে— ও এত জানে, ও তত জানে, অর্কিড চিনতে আমি ওর কাছে লাগি নে। সেদিন তো এ-সব কথা কোনোদিন শুনি নি। তবে আজ আমার এই দুর্ভাগ্যের দিনে কেন তুলনা করতে এলে? আর আমি ওর সঙ্গে পারব কেন? মাপে সমান হব কী নিয়ে?

আদিত্য। নীরু, আজ তোমার কাছে এই যা-সব শুনছি তার জন্য একটুও প্রস্তুত ছিলুম না। মনে হচ্ছে এ যেন আমার নীরুর কথা নয়, এ যেন আর কেউ।

নীরজা। না গো না, সেই নীরুই বটে। তার কথা এতদিনেও তুমি বুঝলে না এই আমার সব চেয়ে শাস্তি। বিয়ের পর যেদিন আমি জেনেছিলেম তোমার বাগান তোমার প্রাণের মতো প্রিয়, সেদিন থেকে ঐ বাগান আর আমার মধ্যে ভেদ রাখি নি একটুও। নইলে তোমার বাগানের সঙ্গে আমার ভীষণ ঝগড়া বাধত। ওকে সইতে পারতুম না। ও হত আমার সতীন। তুমি তো জানো আমার দিনরাতের সাধনা। জানো কেমন করে ওকে মিলিয়ে নিয়েছি আমার মধ্যে। একেবারে এক হয়ে গেছি ওর সঙ্গে।

আদিত্য। জানি বৈকি। আমার সব-কিছুকে নিয়েই যে তুমি।

নীরজা। ও-সব কথা রাখো। আজ দেখলুম ঐ বাগানের মধ্যে অনায়াসে প্রবেশ করলে আর-একজন, কোথাও একটুকু ব্যথা লাগল না। আমার দেহখানাকে চিরে ফেলবার কথা কি মনে করতেও পারতে, আর কারু প্রাণ তার মধ্যে চালিয়ে দেবার জন্যে? আমার বাগান কি আমার দেহ নয়? আমি হলে কি এমন করতে পারতুম?

আদিত্য। কী করতে তুমি?

নীরজা। বলব কী করতুম? বাগান ছারখার হয়ে যেত হয়তো। ব্যাবসা হত দেউলে। একটার জায়গায় দশটা মালী রাখতুম কিন্তু আসতে দিতুম না আর-কোনো মেয়েকে। বিশেষত এমন

কাউকে যার মনে গুমর আছে সে আমার চেয়েও বাগানের কাজ ভালো জানে। ওর এই অহংকার দিয়ে তুমি আমাকে অপমান করবে প্রতিদিন, যখন আমি আজ মরতে বসেছি, যখন উপায় নেই নিজের শক্তির প্রমাণ করবার। এমনটা কেন হতে পারল বলব?

আদিত্য। বলো।

নীরজা। তুমি আমার চেয়ে ওকে ভালোবাস বলে। এতদিন সে কথা লুকিয়ে রেখেছিলে।

আদিত্য কিছুক্ষণ মাথার চুলের মধ্যে হাত গুঁজে বসে রইল

আদিত্য। (বিহ্বলকণ্ঠে) নীরু, দশ বৎসর তুমি আমাকে জেনেছ। সুখে দুঃখে নানা অবস্থায় নানা কাজে, তার পরেও তুমি যদি এমন কথা আজ বলতে পারো তবে আমি কোনো জবাব করব না। চললুম। কাছে থাকলে তোমার শরীর খারাপ হবে। ফর্নারির পাশে যে জাপানি ঘর আছে সেইখানে থাকব; যখন আমাকে দরকার হবে ডেকে পাঠিয়ো।

আদিত্য চলে গেল, নীরজা সেদিকে রইল চেয়ে।

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

দিঘির ওপারের পাড়িতে চাল্‌তা গাছের আড়ালে চাঁদ উঠছে, জলে পড়েছে ঘন কালো ছায়া। এপারে বাসন্তী গাছে কচিপাতা শিশুর ঘুমভাঙা চোখের মতো রাঙা। জোনাকির দল ঝলমল করছে জারুল গাছের ডালে। শান-বাঁধানো ঘাটের বেদীর উপর স্তব্ধ হয়ে বসে আছে সরলা। বাতাস নেই কোথাও, পাতায় নেই কাঁপন। সরলার পিছন দিকে এসে রমেন বললে—

রমেন। আসতে পারি কি?

সরলা। এসো।

রমেন বসল ঘাটের সিঁড়ির ওপর, পায়ের কাছে

(ব্যস্ত হয়ে) কোথায় বসলে রমেন দাদা, উপরে এসো।

রমেন। জানো, দেবীদের বর্ণনা আরম্ভ পদপল্লব থেকে। পাশে জায়গা থাকে তো পরে বসব। দাও তোমার হাতখানি, অভ্যর্থনা শুরু করি বিলিতে মতে।

সরলার হাতখানি নিয়ে চুম্বন করলে

সম্রাজ্ঞীর অভিবাদন গ্রহণ করো।

উঠে দাঁড়িয়ে অল্প একটুখানি আবির নিয়ে
দিলে ওর কপালে মাখিয়ে

সরলা। এ আবার কী?

রমেন। জানো না আজ দোলপূর্ণিমা? তোমাদের গাছে গাছে ডালে ডালে রঙের ছড়াছড়ি। বসন্তে মানুষের গায়ে তো রঙ লাগে না, লাগে তার মনে। সেই রঙটাকে বাইরে প্রকাশ করতে হবে; নইলে, বনলক্ষ্মী, অশোকবনে তুমি নির্বাসিত হয়ে থাকবে।

সরলা। তোমার সঙ্গে কথার খেলা করি এমন ওস্তাদী নেই আমার।

রমেন। কথার দরকার কিসের? পুরুষপাখিই গান করে, তোমরা মেয়েপাখি চুপ করে শুনলেই উত্তর দেওয়া হল। এইবার বসতে দাও পাশে।

পাশে এসে বসলে। অনেকক্ষণ চুপ করে রইল দুই জনেই।

সরলা। রমেনদা, জেলে যাওয়া যায় কী করে, পরামর্শ দাও আমাকে।

রমেন। জেলে যাবার রাস্তা এত অসংখ্য এবং আজকাল এত সহজ যে কী করে জেলে না যাওয়া যায় সেই পরামর্শই কঠিন হয়ে উঠল। এ যুগে গোরার বাঁশি ঘরে টিঁকতে দিল না।

সরলা। না, আমি ঠাট্টা করছি নে, অনেক ভেবে দেখলুম আমার মুক্তি ঐখানেই।

রমেন। ভালো করে খুলে বলো তোমার মনের কথাটা।

সরলা। বলছি সব কথা। সম্পূর্ণ বুঝতে পারতে যদি আদিৎদার মুখখানা দেখতে পেতে।

রমেন। আভাসে কিছু দেখেছি।

সরলা। আজ বিকেলবেলায় একলা ছিলেম বারান্দায়। আমেরিকা থেকে ফুলগাছের ছবি-দেওয়া ক্যাটালগ এসেছে। দেখছিলেম পাতা উলটিয়ে, রোজ বিকেলে সাড়ে চারটার মধ্যে চা খাওয়া সেরে আদিৎদা আমাকে ডেকে নেন বাগানের কাজে। আজ দেখি অন্যমনে বেড়াচ্ছেন ঘুরে ঘুরে। মালীরা কাজ করে যাচ্ছে তাকিয়েও দেখছেন না। মনে হল আমার বারান্দার দিকে আসবেন বুঝি, দ্বিধা করে গেলেন ফিরে। অমন শক্ত লম্বা মানুষ, জোরে চলা, জোরে কাজ, সবদিকেই সজাগ দৃষ্টি, কড়া মনিব অথচ মুখে ক্ষমার হাসি ; আজ সেই মানুষের সেই চলন নেই, দৃষ্টি নেই বাইরে, কোথায় তলিয়ে আছেন মনের ভিতরে। অনেকক্ষণ পরে ধীরে ধীরে এলেন কাছে। অন্যদিন হলে তখনি হাতের ঘড়িটা দেখিয়ে বলতেন, সময় হয়েছে, আমিও উঠে পড়তুম। আজ তা না বলে আস্তে আস্তে পাশে চৌকি টেনে নিয়ে বসলেন। বললেন, "ক্যাটালগ দেখছ বুঝি?" আমার হাত থেকে ক্যাটালগ নিয়ে পাতা ওলটাতে লাগলেন, কিছু যে দেখলেন তা মনে হল না। হঠাৎ একবার আমার মুখের দিকে চাইলেন, যেন পণ করলেন আর দেরি না করে এখনি কী একটা বলাই চাই। আবার তখনি পাতার দিকে চোখ নামিয়ে বললেন, "দেখেছ সরি, কত বড়ো ন্যাস্‌টার্শিয়াম।" কণ্ঠে গভীর ক্লান্তি। তার পর অনেকক্ষণ কথা নেই, চলল পাতা ওলটানো। আর-একবার হঠাৎ আমার মুখের দিকে চাইলেন, চেয়েই ধাঁ করে বই বন্ধ করে আমার কোলের উপর ফেলে দিয়ে উঠে পড়লেন। আমি বললেম, "যাবে না বাগানে?" আদিৎদা বললেন, "না ভাই, বাইরে বেরোতে হবে, কাজ আছে।" বলেই তাড়াতাড়ি নিজেকে যেন ছিঁড়ে নিয়ে চলে গেলেন।

রমেন। আদিৎদা তোমাকে কী বলতে এসেছিলেন, কী আন্দাজ করো তুমি।

সরলা। বলতে এসেছিলেন, তোমার এক বাগান ভেঙেছে, এবার হুকুম এল তোমার কপালে আর-এক বাগান ভাঙবে।

রমেন। তাই যদি ঘটে সরি, তা হলে জেলে যাবার স্বাধীনতা যে আমার থাকবে না।

সরলা। (ম্লান হেসে) তোমার সে রাস্তা কি আমি বন্ধ করতে পারি? সম্রাট বাহাদুর স্বয়ং খোলাসা রাখবেন।

রমেন। তুমি বৃন্তচ্যুত হয়ে পড়ে থাকবে রাস্তায়, আর আমি শিকলে ঝংকার দিতে দিতে চমক লাগিয়ে চলব জেলখানায়, এ কি কখনো হতে পারে? এখন থেকে তা হলে যে আমাকে এই বয়সে ভালোমানুষ হতে শিখতে হবে।

সরলা। কী করবে তুমি?

রমেন। তোমার অশুভগ্রহের সঙ্গে লড়াই ঘোষণা করে দেব। কুষ্ঠি থেকে তাকে তাড়াব। তার পরে লম্বা ছুটি পাব, এমন-কি, কালাপানির পার পর্যন্ত।

সরলা। তোমার কাছে কোনো কিছুই লুকোতে পারি নে। একটা কথা আমার কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে কিছুদিন থেকে। আজ সেটা তোমাকে বলব, কিছু মনে কোরো না।

রমেন। না বললে মনে করব।

সরলা। ছেলেবেলা থেকে আদিৎদার সঙ্গে একত্রে মানুষ হয়েছি, ভাই-বোনের মতো নয়, দুই ভাইয়ের মতো। নিজের হাতে দুজনে পাশাপাশি মাটি কুপিয়েছি, গাছ কেটেছি। জ্যাঠাইমা আর মা দু-তিন দিন পরে পরে মারা যান টাইফয়েডে, আমার বয়স তখন ছয়। বাবার মৃত্যু তার দু বছর পরে, জ্যাঠামশাই-এর মস্ত সাধ ছিল আমিই তাঁর বাগানটিকে বাঁচিয়ে রাখব আমার প্রাণ দিয়ে। তেমনি করেই আমাকে তৈরি করেছিলেন। কাউকে তিনি অবিশ্বাস করতে জানতেন না। যে বন্ধুদের টাকা ধার দিয়েছিলেন তারা শোধ করে বাগানকে দায়মুক্ত করবে এতে তাঁর সন্দেহ ছিল না। শোধ করেছেন কেবল আদিৎদা, আর কেউ না। এই ইতিহাস হয়তো তুমি কিছু কিছু জান কিন্তু তবু আজ সব কথা গোড়া থেকে বলতে ইচ্ছে করছে।

রমেন। সমস্ত আবার নূতন লাগছে আমার।

সরলা। তার পরে জান হঠাৎ সবই ডুবল। যখন ডাঙায় টেনে তুলল বন্যা থেকে, তখন আর-একবার আদিৎদার পাশে এসে ঠেকল আমার ভাগ্য। মিললুম তেমনি করেই, আমরা দুই ভাই, আমরা দুই বন্ধু। তার পর থেকে আদিৎদার আশ্রয়ে আছি এও যেমন সত্যি, তাঁকে আশ্রয় দিয়েছি সেও তেমনি সত্যি। পরিমাণে আমার দিক থেকে কিছু কম হয় নি এ আমি জোর করে বলব। তাই আমার পক্ষে একটুও কারণ ঘটে নি সংকোচ করবার। এর আগে একত্রে ছিলেম যখন, তখন আমাদের যে বয়স ছিল সেই বয়সটা নিয়েই যেন মিললুম, সেই সম্বন্ধ নিয়ে। এমনি করেই চিরদিন চলে যেতে পারত।— আর বলে কী হবে।

রমেন। কথাটা শেষ করে ফেলো।

সরলা। হঠাৎ আমাকে ধাক্কা মেরে কেন জানিয়ে দিলে যে আমার বয়স হয়েছে। যেদিনকার আড়ালে একসঙ্গে কাজ করেছি সেদিনকার আবরণ উড়ে গেছে এক মুহূর্তে। তুমি নিশ্চয় সব জান রমেনদা, আমার কিছুই ঢাকা থাকে না তোমার চোখে। আমার উপরে বউদির রাগ দেখে প্রথম প্রথম ভারি আশ্চর্য লেগেছিল, কিছুতেই বুঝতে পারি নি। এতদিন দৃষ্টি পড়ে নি নিজের উপর, বউদিদির বিরাগের আগুনের আভায় দেখতে পেলেম নিজেকে, ধরা পড়লুম নিজের কাছে। আমার কথা বুঝতে পারছ কি?

রমেন। তোমার ছেলেবেলাকার তলিয়ে-থাকা ভালোবাসা নাড়া খেয়ে ভেসে উঠছে উপরের তলায়।

সরলা। আমি কী করবো বলো? নিজের কাছ থেকে নিজে পালাই কী করে?

বলতে বলতে রমেনের হাত চেপে ধরলে। রমেন চুপ করে রইল।

যতক্ষণ এখানে আছি ততক্ষণ বেড়ে চলেছে আমার অন্যায়।

রমেন। অন্যায় কার উপরে?

সরলা। বউদির উপরে।

রমেন। দেখো সরলা, আমি মানি নে ও-সব পুঁথির কথা। দাবির হিসেব বিচার করবে কোন্

সত্য দিয়ে? তোমাদের মিলন কত কালের; তখন কোথায় ছিল বউদি?

সরলা। কী বলছ রমেনদা! আপন ইচ্ছের দোহাই দিয়ে এ কী আবদারের কথা? আদিৎদার কথাও তো ভাবতে হবে।

রমেন। হবে বৈকি। তুমি কি ভাবছ যে-আঘাতে চমকিয়ে দিয়েছে তোমাকে সেই আঘাতটাই তাঁকেও লাগে নি?

পিছন হতে আদিত্যের প্রবেশ

আদিত্য। (পেছন থেকে) রমেন নাকি?

রমেন। হাঁ দাদা।

রমেন উঠে পড়ল

আদিত্য। তোমার বউদি তোমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন, আয়া এসে এইমাত্র জানিয়ে গেল।

রমেন চলে গেল, সরলাও তখনি উঠে যাবার উপক্রম করলে

আদিত্য। যেয়ো না সরি, একটু বোসো।... আমরা দুজনে এ সংসারে জীবন আরম্ভ করেছিলেম একেবারে এক হয়ে। এত সহজ আমাদের মিল যে, এর মধ্যে কোনো ভেদ কোনো কারণে ঘটতে পারে সে কথা মনে করাই অসম্ভব। তাই কি নয় সরি?

সরলা। অঙ্কুরে যা এক থাকে, বেড়ে উঠে তা ভাগ হয়ে যায় এ কথা না মেনে তো থাকবার জো নেই আদিৎদা।

আদিত্য। সে ভাগ তো বাইরে, কেবল চোখে দেখার ভাগ। অন্তরে তো প্রাণের মধ্যে ভাগ হয় না। আজ তোমাকে আমার কাছ থেকে সরিয়ে নেবার ধাক্কা এসেছে। আমাকে যে এত বেশি বাজবে এ আমি কোনোদিন ভাবতেই পারতুম না। সরি, তুমি কি জান, কী ধাক্কাটা এল হঠাৎ আমাদের 'পরে?

সরলা। জানি ভাই, তুমি জানবার আগে থাকতেই।

আদিত্য। সইতে পারবে সরি?

সরলা। সইতেই হবে।

আদিত্য। মেয়েদের সহ্য করবার শক্তি কি আমাদের চেয়ে বেশি, তাই ভাবি।

সরলা। তোমরা পুরুষমানুষ দুঃখের সঙ্গে লড়াই করো, মেয়েরা যুগে যুগে দুঃখ কেবল সহ্যই করে। চোখের জল আর ধৈর্য এ ছাড়া আর তো কিছু সম্বল নেই তাদের।

আদিত্য। তোমাকে আমার কাছ থেকে ছিঁড়ে নিয়ে যাবে এ আমি ঘটতে দেব না, দেব না। এ অন্যায়, এ নিষ্ঠুর অন্যায়।

বলে উত্তেজনায় হাতের মুঠি শক্ত করলে। সরলা কোলের উপর আদিত্যের হাতখানা নিয়ে তার উপরে ধীরে ধীরে হাত বুলিয়ে দিতে লাগল। বলে গেল যেন আপন মনে ধীরে ধীরে—

সরলা। ন্যায় অন্যায়ের কথা নয় ভাই, সম্বন্ধের বন্ধন যখন ফাঁস হয়ে ওঠে তার ব্যথা বাজে নানা লোকের মধ্যে, টানাটানি পড়ে নানা দিক থেকে, কাকেই বা দোষ দেব?

আদিত্য। তুমি সহ্য করতে পারবে তা জানি। একদিনের কথা মনে পড়ছে। কী চুল ছিল তোমার, এখনো আছে। সেই চুলের গর্ব ছিল তোমার মনে। সবাই সেই গর্বে প্রশ্রয় দিত। একদিন ঝগড়া হল তোমার সঙ্গে। দুপুরবেলা বালিশের 'পরে চুল মেলে দিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলে। আমি

কাঁচি হাতে অন্তত আধ হাত-খানেক কেটে দিলেম। তখনি জেগে তুমি দাঁড়িয়ে উঠলে, তোমার ঐ কালো চোখ আরো কালো হয়ে উঠল। শুধু বললে—'মনে করেছ আমাকে জব্দ করবে?' বলে আমার হাত থেকে কাঁচি টেনে নিয়ে ঘাড় পর্যন্ত চুল কেটে ফেললে কচকচ করে। মেসোমশায় তোমাকে দেখে আশ্চর্য। বললেন 'এ কী কাণ্ড।' তুমি শান্তমুখে অনায়াসে বললে, 'বড়ো গরম লাগে।' তিনিও একটু হেসে সহজেই মেনে নিলেন। প্রশ্ন করলেন না, ভর্ৎসনা করলেন না, কেবল কাঁচি নিয়ে সমান করে দিলেন তোমার চুল। তোমারি তো জ্যাঠামশায়।

সরলা (হেসে) তোমার যেমন বুদ্ধি, তুমি ভাবছ এটা আমার ক্ষমার পরিচয়? একটুকুও নয়। সেদিন তুমি আমাকে যতটা জব্দ করেছিলে তার চেয়ে অনেক বেশি জব্দ করেছিলুম আমি তোমাকে। ঠিক কি না বলো।

আদিত্য। খুব ঠিক। সেই কাটা চুল দেখে আমি কেবল কাঁদতে বাকি রেখেছিলুম। তার পরদিন তোমাকে মুখ দেখাতে পারি নি লজ্জায়। পড়বার ঘরে চুপ করে ছিলেম বসে। তুমি ঘরে ঢুকেই হাত ধরে আমাকে হিড় হিড় করে টেনে নিয়ে গেলে বাগানের কাজে, যেন কিছুই হয় নি। আর-একদিনের কথা মনে পড়ে, সেই যেদিন ফাল্গুন মাসে অকালে ঝড় উঠে আমার বিছন লাগাবার ঘরের চাল উড়িয়ে নিয়েছিল তখন তুমি এসে—

সরলা। থাক্ আর বলতে হবে না। (দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে) সে-সব দিন আর আসবে না।

তাড়াতাড়ি উঠে পড়ল

ব্যাকুলভাবে সরলার হাত চেপে ধরে

আদিত্য। না, যেয়ো না, এখনি যেয়ো না। কখন এক-সময়ে যাবার দিন আসবে তখন—(বলতে বলতে উত্তেজিতভাবে) কোনোদিন কেন যেতে হবে? কী অপরাধ ঘটেছে? ঈর্ষা? আজ দশ বৎসর সংসার-যাত্রায় আমার পরীক্ষা হল তারি এই পরিণাম! কী নিয়ে ঈর্ষা? তা হলে তো তেইশ বছরের ইতিহাস মুছে ফেলতে হয়, যখন থেকে তোমার সঙ্গে আমার দেখা।

সরলা। তেইশ বছরের কথা বলতে পারি নে ভাই, কিন্তু তেইশ বছরের এই শেষ বেলাতে ঈর্ষার কি কোনো কারণই ঘটে নি? সত্যি কথা তো বলতে হবে। নিজেকে ভুলিয়ে লাভ কী? তোমার আমার মধ্যে কোনো কথা যেন অস্পষ্ট না থাকে।

আদিত্য কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসে রইল। পরে বলে উঠল—

আদিত্য। অস্পষ্ট আর রইল না। অন্তরে অন্তরে বুঝেছি, তুমি নইলে আমার জগৎ হবে ব্যর্থ। যাঁর কাছ থেকে পেয়েছি তোমাকে জীবনের প্রথম বেলায়, তিনি ছাড়া আর কেউ তোমাকে কেড়ে নিতে পারবে না।

সরলা। কথা বোলো না আদিৎদা, দুঃখ আর বাড়িয়ো না। একটু স্থির হয়ে দাও ভাবতে।

আদিত্য। ভাবনা নিয়ে তো পিছনের দিকে যাওয়া যায় না। দুজনে যখন জীবন আরম্ভ করেছিলেম মেসোমশায়ের কোলের কাছে, সে তো না ভেবে চিন্তে। আজ কোনো রকমের নিড়ুনি দিয়ে কি উপড়ে ফেলতে পারবে সেই আমাদের দিনগুলিকে? তোমার কথা বলতে পারি নে সরি, আমার তো সাধ্য নেই।

সরলা। পায়ে পড়ি, দুর্বল কোরো না আমাকে। দুর্গম কোরো না উদ্ধারের পথ।

আদিত্য। (সরলার দুই হাত চেপে ধরে) উদ্ধারের পথ নেই, সে পথ আমি রাখব না। ভালোবাসি তোমাকে, এ কথা আজ এত সহজ করে সত্য করে বলতে পারছি, এতে আমার বুক

ভরে উঠেছে। তেইশ বছর যা ছিল কুঁড়িতে, আজ দৈবের কৃপায় তা ফুটে উঠেছে। আমি বলছি, তাকে চাপা দিতে গেলে সে হবে ভীরুতা, সে হবে অধর্ম।

সরলা। চুপ, চুপ, আর বোলো না। আজকের রাত্তিরের মতো মাপ করো, মাপ করো আমাকে।

আদিত্য। সরি, আমিই কৃপাপাত্র, জীবনের শেষদিন পর্যন্ত। আমিই তোমার ক্ষমার যোগ্য। কেন আমি ছিলুম অন্ধ? কেন আমি তোমাকে চিনলুম না, কেন বিয়ে করতে গেলুম ভুল করে? তুমি তো কর নি, কত পাত্র এসেছিল তোমাকে কামনা করে সে তো আমি জানি।

সরলা। জ্যাঠামশায় যে আমাকে উৎসর্গ করে দিয়েছিলেন তাঁর বাগানের কাজে, নইলে হয়তো—

আদিত্য। না না— তোমার মনের গভীরে ছিল তোমার সত্য উজ্জ্বল। না জেনেও তার কাছে তুমি বাঁধা রেখেছিলে নিজেকে। আমাকে কেন তুমি চেতন করে দাও নি? আমাদের পথ কেন হল আলাদা?

সরলা। থাক্ থাক্, যাকে মেনে নিতেই হবে তাকে না মানবার জন্য ঝগড়া করছ কার সঙ্গে? কী হবে মিথ্যে ছটফট করে? কাল দিনের বেলায় যা হয় একটা উপায় স্থির করা যাবে।

আদিত্য। আচ্ছা চুপ করলুম। কিন্তু এমন জ্যোৎস্নারাত্রে আমার হয়ে কথা কইবে এমন কিছু রেখে যাব তোমার কাছে।

কোমরে-বাঁধা ঝুলি থেকে বের করলে পাঁচটি নাগেশ্বর ফুলের একটি ছোটো তোড়া

আমি জানি নাগকেশর তুমি ভালোবাস। তোমার কাঁধের ঐ আঁচলের উপর পরিয়ে দেব? এই এনেছি সেফটিপিন।

সরলা আপত্তি করলে না। আদিত্য বেশ একটু সময় নিয়ে ধীরে ধীরে যথাস্থানে তোড়াটি পরিয়ে দিলে। সরলা উঠে দাঁড়াল, আদিত্য সামনে দাঁড়িয়ে দুই হাত ধরে তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল—

কী আশ্চর্য তুমি সরি, কী আশ্চর্য!

সরলা হাত ছিনিয়ে নিয়ে দৌড়ে চলে গেল। আদিত্য অনুসরণ করলে না। যতক্ষণ দেখা যায় চুপ করে দাঁড়িয়ে দেখলে। তার পরে বসে পড়ল সেই ঘাটের বেদীর 'পরে।

চাকরের প্রবেশ

চাকর। খাবার এসেছে।

আদিত্য। আজ আমি খাব না।

দ্বিতীয় দৃশ্য

নীরজার ঘর। ঘরের সব আলো নেবানো। জানলা খোলা। জ্যোৎস্না পড়েছে বিছানায়, পড়েছে নীরজার মুখে, আর শিয়রের কাছে আদিত্যের দেওয়া সেই ল্যাবার্নম গুচ্ছের উপর। বাকি সমস্ত অস্পষ্ট। বালিশে হেলান দিয়ে নীরজা অর্ধেক উঠে বসে আছে, চেয়ে আছে জানালার বাইরে। সেদিকে অর্কিডের ঘর পেরিয়ে দেখা যাচ্ছে সুপুরিগাছের সার। এইমাত্র হাওয়া জেগেছে, দুলে উঠছে পাতাগুলো। মেঝের উপর পড়ে আছে থালায় বরফি আর কিছু আবির। দরজার কাছ থেকে রমেন জিজ্ঞাসা করল—

রমেন। বউদি, ডেকেছ কি?

নীরজা। (রুদ্ধ গলা পরিষ্কার করে) এসো।

রমেন মোড়া টেনে এনে বসল বিছানার পাশে। নীরজা অনেকক্ষণ কোনো কথা বললে না। তার ঠোঁট কাঁপতে লাগল যেন বেদনার ঝড় পাক খেয়ে উঠছে। কিছু পরে সামলে নিলে, ল্যাবার্নম গুচ্ছের দুটো খসে-পড়া ফুল দলিত হয়ে গেল তার মুঠোর মধ্যে। তার পরে কোনো কথা না বলে একখানা চিঠি দিলে রমেনের হাতে। রমেন পত্রখানি পড়তে লাগল—

"এতদিনের পরিচয়ের পরে আজ হঠাৎ দেখা গেল আমার নিষ্ঠায় সন্দেহ করা সম্ভবপর হল তোমার পক্ষে। এ নিয়ে যুক্তিতর্ক করতে লজ্জা বোধ করি। তোমার মনের বর্তমান অবস্থায় আমার সকল কথা সকল কাজই বিপরীত হবে তোমার অনুভবে। সেই অকারণ পীড়ন তোমার দুর্বল শরীরকে আঘাত করবে প্রতি মুহূর্তে। আমার পক্ষে দূরে থাকাই ভালো যে পর্যন্ত না তোমার মন সুস্থ হয়। এও বুঝলুম সরলাকে এখানকার কাজ থেকে বিদায় করে দিই এই তোমার ইচ্ছা। হয়তো দিতে হবে। ভেবে দেখলুম তা ছাড়া আর অন্য পথ নেই। তবু বলে রাখি আমার শিক্ষা দীক্ষা উন্নতি সমস্তই সরলার জ্যাঠামশায়ের প্রসাদে। আমার জীবনে সার্থকতার পথ দেখিয়ে দিয়েছেন তিনিই। তাঁরই স্নেহের ধন সরলা সর্বস্বান্ত নিঃসহায়। আজ ওকে যদি ভাসিয়ে দিই তো অধর্ম হবে। তোমার প্রতি ভালোবাসার খাতিরেও পারব না।

অনেক ভেবে স্থির করেছি, আমাদের ব্যবসায়ে নতুন বিভাগ একটা খুলব, ফুল-সবজির বীজ তৈরির বিভাগ। মানিকতলায় বাড়ি সুদ্ধ জমি পাওয়া যেতে পারবে। সেইখানেই সরলাকে বসিয়ে দেব কাজে। এই কাজ আরম্ভ করবার মতো নগদ টাকা হাতে নেই আমার। আমাদের এই বাগানবাড়ি বন্ধক রেখে টাকা তুলতে হবে। এ প্রস্তাবে রাগ কোরো না এই আমার একান্ত অনুরোধ। মনে রেখো, সরলার জ্যাঠামশায় আমার এই বাগানের জন্যে আমাকে মূলধন বিনা সুদে ধার দিয়েছিলেন, শুনেছি তারও কিছু অংশ তাঁকে ধার করতে হয়েছিল। শুধু তাই নয়, কাজ শুরু করে দেবার মতো বীজ, কলমের গাছ, দুর্লভ ফুলের চারা, অর্কিড, ঘাসকাটা কল ও অন্যান্য অনেক যন্ত্র দান করেছেন বিনামূল্যে। এত বড়ো সুযোগ যদি আমাকে না দিতেন আজ ত্রিশ টাকা বাড়ি ভাড়ায় কেরানিগিরি করতে হত, তোমার সঙ্গে বিবাহ ঘটত না কপালে। তোমার সঙ্গে কথা হবার পর এই প্রশ্নই বার বার মনে আমার হয়েছে, আমিই ওকে আশ্রয় দিয়েছি, না, আমাকেই আশ্রয় দিয়েছে সরলা। এই সহজ কথাটাই ভুলে ছিলুম, তুমিই আমাকে দিলে মনে করিয়ে। এখন তোমাকেও মনে রাখতে হবে। কখনো ভেবো না সরলা আমার গলগ্রহ। ওদের ঋণ শোধ করতে পারব না কোনোদিন, ওর দাবিরও অন্ত থাকবে না আমার 'পরে। তোমার সঙ্গে কখনো যাতে ওর দেখা না হয় সে চেষ্টা রইল মনে। কিন্তু আমার সঙ্গে ওর সম্বন্ধ যে বিচ্ছিন্ন হবার নয় সে কথা আজ যেমন বুঝেছি এমন এর আগে কখনো বুঝি নি। সব কথা বলতে পারলুম না, আমার দুঃখ আজ কথার অতীত হয়ে গেছে। যদি অনুমানে বুঝতে পার তো পারলে, নইলে জীবনে এই প্রথম আমার বেদনা, যা রইল তোমার কাছে অব্যক্ত।"

চিঠি পড়া শেষ হলে রমেন চুপ করে রইল।

নীরজা। (ব্যাকুলভাবে) কিছু একটা বলো ঠাকুরপো।

রমেন নিরুত্তর; নীরজা তখন বিছানার উপর লুটিয়ে পড়ে বালিশে মাথা ঠুকতে ঠুকতে বললে—

অন্যায় করেছি, আমি অন্যায় করেছি। কিন্তু কেউ কি তোমরা বুঝতে পার না কিসে আমার মাথা দিল খারাপ করে?

রমেন। কী করছ বউদি, শান্ত হও, তোমার শরীর যে যাবে ভেঙে।

নীরজা। এই ভাঙা শরীরই তো আমার কপাল ভেঙেছে। ওর জন্যে মমতা কিসের? তাঁর 'পরে আমার অবিশ্বাস এ দেখা দিল কোথা থেকে? এ যে অক্ষম জীবন নিয়ে আমার নিজেরই উপরে অবিশ্বাস। সেই তাঁর নীরু আজ আছে কোথায়, যাকে তিনি কখনো বলতেন 'বনলক্ষ্মী'। আজ কে নিলে কেড়ে তার উপবন? আমার কি একটা নাম ছিল? কাজ সেরে আসতে যেদিন তাঁর দেরি হত আমি বসে থাকতুম তাঁর খাবার আগলে, তখন আমাকে ডেকেছেন 'অন্নপূর্ণা'। সন্ধ্যাবেলায় তিনি বসতেন দিঘির ঘাটে, ছোটো রুপোর থালায় বেলফুল রাশ করে তার উপরে পান সাজিয়ে দিতাম তাঁকে, হেসে আমাকে বলতেন, 'তাম্বুলকরঙ্কবাহিনী'। সেদিন সংসারের সব পরামর্শই আমার কাছ থেকে নিয়েছেন তিনি। আমাকে নাম দিয়েছিলেন, 'গৃহসচিব' কখনো-বা 'হোম সেক্রেটারি'। আমি যেন সমুদ্রে এসেছিলেম ভরা নদী, ছড়িয়েছিলেম নানা শাখা নানা দিকে। সব শাখাতেই আজ একদণ্ডে জল গেল শুকিয়ে, বেরিয়ে পড়ল পাথর।

রমেন। বউদি, আবার তুমি সেরে উঠবে— তোমার আসন আবার অধিকার করবে পূর্ণ শক্তি দিয়ে।

নীরজা। মিছে আশা দিয়ো না ঠাকুরপো। ডাক্তার কী বলে সে আমার কানে আসে। সেইজন্যেই এতদিনের সুখের সংসারকে এত করে আঁকড়ে ধরছে আমার এই কাঙাল নৈরাশ্য।

রমেন। দরকার কী বউদি? আপনাকে এতদিন তো ঢেলে দিয়েছ তোমার সংসারে। তার চেয়ে বড়ো কথা আর কিছু আছে কি? যেমন দিয়েছ তেমনি পেয়েছ, এত পাওয়াই বা কোন্ মেয়ে পায়? যদি ডাক্তারের কথা সত্যি হয়, যদি যাবার দিন এসেই থাকে, তা হলে যাকে বড়ো করে পেয়েছ তাকে বড়ো করে ছেড়ে দাও। এতদিন যে-গৌরবে কাটিয়েছ সে গৌরবকে খাটো করে দিয়ে যাবে কেন? এ বাড়িতে তোমার শেষ স্মৃতিকে যাবার সময় নূতন মহিমা দিয়ো।

নীরজা। বুক ফেটে যায় ঠাকুরপো, বুক ফেটে যায়! আমার এতদিনের আনন্দকে পিছনে ফেলে রেখে হাসিমুখে চলে যেতে পারতুম। কিন্তু কোনোখানে কি এতটুকু ফাঁক থাকবে না যেখানে আমার জন্যে একটা বিরহের দীপ টিমটিম্ করেও জ্বলবে? এ কথা ভাবতে গেলে যে মরতেও ইচ্ছে করে না। ঐ সরলা সমস্তটাই দখল করবে একেবারে পুরোপুরি, বিধাতার এই কি বিচার?

রমেন। সত্যি কথা বলব বউদি, রাগ কোরো না। তোমার কথা ভালো বুঝতেই পারি নে। যা নিজে ভোগ করতে পারবে না, তাও প্রসন্নমনে দান করতে পারো না যাকে এতদিন এত দিয়েছ? তোমার ভালোবাসার উপর এত বড়ো খোঁটা থেকে যাবে? তোমার সংসারে তোমারই শ্রদ্ধার প্রদীপ তুমি আপনিই আজ চুরমার করতে বসেছ তার ব্যথা তুমি চলে যাবে এড়িয়ে, কিন্তু চিরদিন সে আমাদের বাজবে যে। মিনতি করে বলছি, তোমার সারা জীবনের দাক্ষিণ্যকে শেষ মুহূর্তে কৃপণ করে যেয়ো না।

ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল নীরজা। চুপ করে বসে রইল রমেন, সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা মাত্র করলে না।

কান্নার বেগ থেমে গেলে নীরজা বিছানায় উঠে বসল

নীরজা। আমার একটি ভিক্ষা আছে ঠাকুরপো।

রমেন। হুকুম করো বউদি।

নীরজা। বলি শোনো। যখন চোখের জলে ভিতরে ভিতরে বুক ভেসে যায় তখন ঐ পরমহংসদেবের ছবির দিকে তাকিয়ে থাকি। কিন্তু ওঁর বাণী তো হৃদয়ে পৌঁছয় না। আমার মন

ছোটো। যেমন করে পার আমাকে গুরুর সন্ধান দাও। না হলে কাটবে না বন্ধন। আসক্তিতে জড়িয়ে পড়ব। যে-সংসারে সুখের জীবন কাটিয়েছি, মরার পরে সেইখানেই দুঃখের হাওয়ায় যুগ-যুগান্তর কেঁদে কেঁদে বেড়াতে হবে, তার থেকে উদ্ধার করো আমাকে, উদ্ধার করো।

রমেন। তুমি তো জানো বউদি, শাস্ত্রে যাকে বলে পাষণ্ড আমি তাই। কিছু মানি নে। প্রভাস মিত্তির অনেক টানাটানি করে একবার আমাকে তার গুরুর কাছে নিয়ে গিয়েছিল। বাঁধা পড়বার আগেই দিলেম দৌড়। জেলখানার মেয়াদ আছে, এ বাঁধন বেমেয়াদি।

নীরজা। ঠাকুরপো, তোমার মন জোরালো, তুমি কিছুতে বুঝবে না আমার বিপদ। বেশ জানি যতই আঁকুবাঁকু করছি ততই ডুবছি অগাধ জলে, সামলাতে পারছি নে।

রমেন। বউদি, একটা কথা বলি শোনো। যতক্ষণ মনে করবে তোমার ধন কেউ কেড়ে নিয়ে যাচ্ছে ততক্ষণ বুকের পাঁজর জ্বলবে আগুনে। পাবে না শান্তি। কিন্তু স্থির হয়ে বসে বলো দেখি একবার, 'দিলেম আমি। সকলের চেয়ে যা দুর্মূল্য তাই দিলেম তাঁকে যাঁকে সকলের চেয়ে ভালোবাসি।' তা হলে সব ভার যাবে এক মুহূর্তে নেমে। মন ভরে উঠবে আনন্দে। গুরুকে দরকার নেই ; এখনি বলো— 'দিলেম দিলেম, কিছুতেই হাত রাখলেম না, আমার সব-কিছু দিলেম। নির্মুক্ত হয়ে নির্মল হয়ে যাবার জন্যে প্রস্তুত হলেম, কোনো দুঃখের গ্রন্থি জড়িয়ে রেখে গেলেম না সংসারে।'

নীরজা। আহা, বলো, বলো ঠাকুরপো, বার বার করে শোনাও আমাকে। তাঁকে এ পর্যন্ত যা-কিছু দিতে পেরেছি তাতেই পেয়েছি আনন্দ, আজ যা দিতে পারছি নে, তাতেই এত করে মারছে। দেব, দেব, দেব, সব দেব আমার, আর দেরি নয়, এখনি। তুমি তাঁকে ডেকে নিয়ে এসো।

রমেন। আজ নয় বউদি, কিছুদিন ধরে মনটাকে বেঁধে নাও, সহজ হোক তোমার সংকল্প।

নীরজা। না না, সইতে পারছি নে। যখন থেকে বলে গেছেন এ বাড়ি ছেড়ে জাপানি ঘরে গিয়ে থাকবেন তখন থেকে এ শয্যা আমার কাছে চিতাশয্যা হয়ে উঠেছে। যদি ফিরে না আসেন, এ রাত্তির কাটবে না, বুক ফেটে মরে যাব। অমনি ডেকে এনো সরলাকে, আমি শেল উপড়ে ফেলব বুকের থেকে, ভয় পাব না, এই তোমাকে বলছি নিশ্চয় করে।

রমেন। সময় হয় নি বউদি, আজ থাক্‌।

নীরজা। সময় যায় পাছে এই ভয়। এক্ষনি ডেকে আনো।

পরমহংসদেবের ছবির দিকে তাকিয়ে দু হাত জোড় করে

বল দাও ঠাকুর, বল দাও, মুক্তি দাও মতিহীন অধম নারীকে। আমার দুঃখ আমার ভগবানকে ঠেকিয়ে রেখেছে, পূজা অর্চনা সব গেল আমার। ঠাকুরপো একটা কথা বলি, আপত্তি কোরো না।

রমেন। কী বলো।

নীরজা। একবার আমাকে ঠাকুর-ঘরে যেতে দাও দশ মিনিটের জন্যে, তা হলে আমি বল পাব। কোনো ভয় থাকবে না।

রমেন। আচ্ছা যাও, আপত্তি করব না।

নীরজা। আয়া—

আয়ার প্রবেশ

রোশনি। কী খোঁখী।

নীরজা। ঠাকুর-ঘরে নিয়ে চল আমাকে।

রোশনি। সে কী কথা! ডাক্তারবাবু—

নীরজা। ডাক্তারবাবু যমকে ঠেকাতে পারবে না, আর আমার ঠাকুরকে ঠেকাবে?

রমেন। আয়া, তুমি ওঁকে নিয়ে যাও। ভয় নেই, ভালোই হবে।

[আয়া-সহ নীরজার প্রস্থান

আদিত্যের প্রবেশ

আদিত্য। এ কী, নীরু ঘরে নেই কেন?

রমেন। এখুনি আসবেন, তিনি ঠাকুর-ঘরে গেছেন।

আদিত্য। ঠাকুর-ঘরে? ঘর তো কাছে নয়। ডাক্তারের নিষেধ আছে যে!

রমেন। শুনো না দাদা। ডাক্তারের ওষুধের চেয়ে কাজে লাগবে। একবার কেবল ফুলের অঞ্জলি দিয়ে প্রণাম করেই চলে আসবেন।

আদিত্য। রমেন, তুমি আমাদের সব কথা জান আমি জানি।

রমেন। হাঁ, জানি।

আদিত্য। আজ চুকিয়ে দেব সব, আজ পর্দা ফেলব উঠিয়ে।

রমেন। তুমি তো একলা নও দাদা। বোঝা ঘাড় থেকে ঝেড়ে ফেললেই তো হল না। বউদি রয়েছেন ও দিকে। সংসারের গ্রন্থি জটিল।

আদিত্য। তোমার বউদি আর আমার মধ্যে মিথ্যাকে খাড়া করে রাখতে পারব না। বাল্যকাল থেকে সরলার সঙ্গে আমার যে সম্বন্ধ তার মধ্যে কোনো অপরাধ নেই সে কথা মান তো?

রমেন। মানি বৈকি।

আদিত্য। সেই সহজ সম্বন্ধের তলায় গভীর ভালোবাসা ঢাকা ছিল, জানতে পারি নি, সে কি আমাদের দোষ?

রমেন। কে বলে দোষ?

আদিত্য। আজ সেই কথাটাই যদি গোপন করি তা হলেই মিথ্যাচরণের অপরাধ হবে। আমি মুখ তুলেই বলব।

রমেন। গোপনই বা করতে যাবে কী জন্যে, আর সমারোহ করে প্রকাশই বা করবে কেন? বউদিদির যা জানবার তা তিনি আপনিই জেনেছেন। আর কটা দিন পরেই তো এই পরম দুঃখের জটা আপনিই এলিয়ে যাবে। তুমি তা নিয়ে মিথ্যে টানাটানি কোরো না। বউদি যা বলতে চান শোনো, তার উত্তরে তোমারও যা বলা উচিত আপনিই সহজ হয়ে যাবে।

নীরজা ঘরে ঢুকেই আদিত্যকে দেখেই মেঝের উপর লুটিয়ে পড়ে পায়ে মাথা রেখে অশ্রুগদ্‌গদ কণ্ঠে বললে

নীরজা। মাপ করো, মাপ করো আমাকে, অপরাধ করেছি। এতদিন পরে ত্যাগ কোরো না আমাকে, দূরে ফেলো না আমাকে।

আদিত্য দুই হাতে তাকে তুলে ধরে বুকে করে নিয়ে আস্তে আস্তে বিছানায় শুইয়ে দিলে বললে—

আদিত্য। নীরু, তোমার ব্যথা কি আমি বুঝি নে?

নীরজার কান্না থামতে চায় না। আদিত্য আস্তে আস্তে ওর মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগল। নীরজা আদিত্যের হাত টেনে নিয়ে বুকে চেপে ধরে বললে—

নীরজা। সত্যি বলো আমাকে মাপ করেছ। তুমি প্রসন্ন না হলে মরার পরেও আমার সুখ থাকবে না।

আদিত্য। তুমি তো জানো নীরু, মাঝে মাঝে মনান্তর হয়েছে আমাদের মধ্যে। কিন্তু মনের মিল কি ভেঙেছে তা নিয়ে?

নীরজা। এর আগে তো কোনোদিন বাড়ি ছেড়ে চলে যাও নি তুমি। এবারে গেলে কেন? এত নিষ্ঠুর তোমাকে করেছে কিসে?

আদিত্য। অন্যায় করেছি নীরু, মাপ করতে হবে।

নীরজা। কী বলো তার ঠিক নেই। তোমার কাছ থেকেই আমার সব শাস্তি, সব পুরস্কার অভিমানে তোমার বিচার করতে গিয়েই তো আমার এমন দশা ঘটেছিল। ঠাকুরপোকে বলেছিলুম সরলাকে ডেকে আনতে, এখনো আনলেন না কেন?

আদিত্য। রাত হয়েছে, এখন থাক্।

নীরজা। ঐ শোনো, আমার মনে হচ্ছে ওরা অপেক্ষা করছে দরজার বাইরে। ঠাকুরপো, ঘরে এসো তোমরা।

সরলাকে নিয়ে রমেন ঘরে ঢুকল। নীরজা বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়াল।
সরলা প্রণাম করলে নীরজার পা ছুঁয়ে।

এসো বোন, আমার কাছে এসো।

সরলার হাত ধরে বিছানায় বসালে। বালিশের নীচে থেকে গহনার কেস টেনে নিয়ে
একটি মুক্তোর মালা বের করে সরলাকে পরিয়ে দিলে।

একদিন ইচ্ছে করেছিলুম, যখন চিতায় আমার দাহ হবে এই মালাটি যেন আমার গলায় থাকে। কিন্তু তার চেয়ে এই ভালো। আমার হয়ে মালা তুমি গলায় পরে থাকো, শেষদিন পর্যন্ত। বিশেষ বিশেষ দিনে এ মালা কতকাল পরেছি সে তোমার দাদা জানেন। তোমার গলায় থাকলে সেই দিনগুলি ওঁর মনে পড়বে।

সরলা। অযোগ্য আমি দিদি, অযোগ্য। কেন আমাকে লজ্জা দিচ্ছ?

আদিত্য। ঐ মালাটা আমাকে দাও-না সরলা। ওর মূল্য আমার কাছে যতখানি এমন আর কারো কাছে নয়। ও আমি আর কাউকে দিতে পারব না।

নীরজা। আমার কপাল! এত করেও বোঝাতে পারলুম না বুঝি। সরলা, শুনেছিলেম এই বাগান থেকে তোমার চলে যাবার কথা হয়েছিল। সে আমি কোনোমতেই ঘটতে দেব না। তোমাকে আমি আমার সংসারের যা-কিছু, সমস্তর সঙ্গে রাখব বেঁধে, এই হারটি তারই চিহ্ন। এই আমার বাঁধন তোমার হাতে দিয়েছিলুম যাতে নিশ্চিন্ত হয়ে মরতে পারি।

সরলা। ভুল করছ দিদি, আমাকে বাঁধতে চেয়ো না। ভালো হবে না তাতে।

নীরজা। সে কী কথা?

সরলা। আমি সত্যি কথাই বলব। এতদিন আমাকে বিশ্বাস করতে পারতে। কিন্তু আজ আমাকে বিশ্বাস কোরো না, এই আমি তোমাদের সকলের সামনে বলছি। ভাগ্য যার থেকে আমাকে বঞ্চনা করেছে, কাউকে বঞ্চনা করে সে আমি নেব না। এই রইল তোমার পায়ে আমার

প্রণাম। আমি চললেম। অপরাধ আমার নয়, অপরাধ সেই আমার ঠাকুরের যাঁকে সরল বিশ্বাসে রোজ দুবেলা পুজো করেছি। সেও আজ আমার শেষ হল।

এই বলে সরলা দ্রুতপদে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। আদিত্য নিজেকে ধরে রাখতে পারলে না। সেও গেল চলে।

নীরজা। ঠাকুরপো, এ কী হল ঠাকুরপো। বলো ঠাকুরপো, একটা কথা কও।

রমেন। এইজন্যেই বলেছিলেম আজ রাত্রে ডেকো না।

নীরজা। কেন, মন খুলে আমি তো সবই দিয়ে দিয়েছি। ও কি তাও বুঝল না?

রমেন। বুঝেছে বৈকি। বুঝেছে যে মন তোমার খোলে নি। সুর বাজল না।

নীরজা। কিছুতে বিশুদ্ধ হল না আমার মন। এত মার খেয়েও। কে বিশুদ্ধ করে দেবে? ওগো সন্ন্যাসী, আমাকে বাঁচাও-না। ঠাকুরপো, কে আমার আছে, কার কাছে যাব আমি?

রমেন। আমি আছি বউদি। তোমার দায় আমি নেব। তুমি এখন ঘুমোও।

নীরজা। ঘুমোব কেমন করে? এ বাড়ি থেকে আবার যদি উনি চলে যান তা হলে মরণ নইলে আমার ঘুম হবে না।

রমেন। চলে উনি যেতে পারবেন না, সে ওঁর ইচ্ছায় নেই, শক্তিতে নেই। এই নাও ঘুমের ওষুধ, তোমাকে ঘুম পাড়িয়ে তবে আমি যাব।

নীরজা। যাও ঠাকুরপো, তুমি যাও, ওরা দুজনে কোথায় গেল দেখে এসো, নইলে আমি নিজেই যাব, তাতে আমার শরীর ভাঙে ভাঙুক।

রমেন। আচ্ছা, আচ্ছা, আমি যাচ্ছি।

[রমেনের প্রস্থান

দৃশ্যান্তর

আদিত্য ও সরলা

সরলা। কেন এলে? ভালো করো নি। ফিরে যাও। আমার সঙ্গে তোমাকে এমন করে দেব না জড়াতে।

আদিত্য। তুমি দেবে কি না সে তো কথা নয়, জড়িয়ে যে গেছেই। সেটা ভালো হোক বা মন্দ হোক, তাতে আমাদের হাত নেই।

সরলা। সে-সব কথা পরে হবে, ফিরে যাও, রোগীকে শান্ত করো গে।

আদিত্য। আমাদের এই বাগানের আর-একটা শাখা বাড়াব সেই কথাটা—

সরলা। আজ থাক্। আমাকে দু-চারদিন ভাবার সময় দাও। এখন আমার ভাববার শক্তি নেই।

রমেনের প্রবেশ

রমেন। যাও দাদা, বউদিকে ওষুধ খাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে দাও গে, দেরি কোরো না। কিছুতেই কোনো কথা কইতে দিয়ো না ওঁকে। রাত হয়ে গেছে।

[আদিত্যের প্রস্থান

সরলা। শ্রদ্ধানন্দ পার্কে কাল তোমাদের একটা সভা আছে না?

রমেন। আছে।

সরলা। তুমি যাবে না?

রমেন। যাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু এবার আর যাওয়া হল না।

সরলা। কেন?

রমেন। সে কথা তোমাকে বলে কী হবে?

সরলা। তোমাকে ভীতু বলে সবাই নিন্দে করবে।

রমেন। যারা আমায় পছন্দ করে না তারা নিন্দে করবে বৈকি।

সরলা। তা হলে শোনো আমার কথা, আমি তোমাকে মুক্তি দেব। সভায় তোমাকে যেতেই হবে।

রমেন। আর-একটু স্পষ্ট করে বলো।

সরলা। আমিও যাব সভায় নিশেন হাতে নিয়ে।

রমেন। বুঝেছি।

সরলা। পুলিশে বাধা দেয় সেটা মানতে রাজি আছি কিন্তু তুমি বাধা দিলে মানব না।

রমেন। আচ্ছা, বাধা দেব না।

সরলা। এই রইল কথা।

রমেন। রইল।

সরলা। আমরা দুজন একসঙ্গে যাব কাল বিকেল পাঁচটার সময়।

রমেন। হাঁ যাব, কিন্তু ঐ দুর্জনরা তার পরে আমাদের আর একসঙ্গে থাকতে দেবে না।

আদিত্যের প্রবেশ

সরলা। ও কী, এখনি এলে যে বড়ো?

আদিত্য। দু-একটা কথা বলতে বলতেই নীরজা ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়ল, আমি আস্তে আস্তে চলে এলুম।

রমেন। আমার কাজ আছে— চললুম।

সরলা। (হেসে) বাসা ঠিক করে রেখো, ভুলো না।

রমেন। কেনো ভয় নেই। চেনা জায়গা।

[রমেনের প্রস্থান

সরলা। (আদিত্যের প্রতি) যে-সব কথা বলবার নয় সে আমাকে বোলো না আজ, পায়ে পড়ি।

আদিত্য। কিছু বলব না, ভয় নেই।

সরলা। আচ্ছা, তা হলে আমিই কিছু বলতে চাই শোনো, বলো কথা রাখবে।

আদিত্য। অরক্ষণীয় না হলে কথা নিশ্চয় রাখব তুমি তা জানো।

সরলা। বুঝতে বাকি নেই আমি কাছে থাকলে একেবারেই চলবে না। এই সময়ে দিদির সেবা করতে পারলে খুশি হতুম, কিন্তু সে আমার ভাগ্যে সইবে না। আমাকে অনুপস্থিত থাকতেই হবে। একটু থামো, কথাটা শেষ করতে দাও! শুনেইছ ডাক্তার বলেছেন বেশি দিন ওঁর সময় নেই। এইটুকুর মধ্যে ওঁর মনের কাঁটা তোমাকে উপড়ে দিতেই হবে। এই কয়দিনের মধ্যে আমার ছায়া কিছুতেই পড়তে দিয়ো না ওঁর জীবনে।

আদিত্য। আমার মন থেকে আপনিই ছায়া যদি পড়ে, তবে কী করতে পারি?

সরলা। না না, নিজের সম্বন্ধে অমন অশ্রদ্ধার কথা বোলো না। সাধারণ বাঙালি ছেলের মতো ভিজে মাটির তলতলে মন কি তোমার? কক্ষনো না, আমি তোমাকে জানি।

আদিত্যের হাত ধরে

আমার হয়ে এই ব্রতটি তুমি নাও। দিদির জীবনান্তকালের শেষ কটা দিন দাও তোমার দাক্ষিণ্যে পূর্ণ করে। একেবারে ভুলিয়ে দাও যে আমি এসেছিলেম ওঁর সৌভাগ্যের ভরা ঘট ভেঙে দেবার জন্য।

আদিত্য নিরুত্তর

কথা দাও ভাই।

আদিত্য। দেব কিন্তু তোমাকেও একটা কথা দিতে হবে। বলো রাখবে?

সরলা। তোমার সঙ্গে আমার তফাত এই যে, আমি যদি তোমাকে কিছু প্রতিজ্ঞা করাই সেটা সাধ্য, কিন্তু তুমি যদি করাও সেটা হয়তো অসম্ভব হবে।

আদিত্য। না, হবে না।

সরলা। আচ্ছা, বলো।

আদিত্য। যে কথা মনে মনে বলি সে কথা তোমার কাছে মুখে বলতে অপরাধ নেই। তুমি যা বলছ তা শুনব এবং সেটা বিনা ত্রুটিতে পালন করা সম্ভব হবে যদিও নিশ্চিত জানি একদিন তুমি পূর্ণ করবে আমার সমস্ত শূন্যতা। কেন চুপ করে রইলে?

সরলা। জানি নে যে ভাই, প্রতিজ্ঞাপালনে কী বিঘ্ন একদিন ঘটতে পারে।

আদিত্য। বিঘ্ন তোমার অন্তরে আছে কি? সেই কথাটা বলো আগে।

সরলা। কেন আমাকে দুঃখ দাও? তুমি কি জান না এমন কথা আছে ভাষায় বললে যার আলো যায় নিভে।

আদিত্য। আচ্ছা, এই শুনলুম, এই শুনেই চললুম কাজে।

সরলা। আর ফিরে তাকাবে না।

আদিত্য। না, কিন্তু... একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, এখন কী করবে, থাকবে কোথায়?

সরলা। সে ভার নিয়েছেন রমেনদা।

আদিত্য। রমেন তোমাকে আশ্রয় দেবে? সে লক্ষ্মীছাড়ার চালচুলো আছে কি?

সরলা। ভয় নেই তোমার, পাকা আশ্রয়। নিজের সম্পত্তি নয়, কিন্তু বাধা ঘটবে না।

আদিত্য। আমি জানতে পারব তো?

সরলা। নিশ্চয় জানতে পারবে কথা দিয়ে যাচ্ছি। কিন্তু ইতিমধ্যে আমাকে দেখবার জন্যে একটুও ব্যস্ত হতে পারবে না এই সত্য করো।

আদিত্য। তোমারও মন ব্যস্ত হবে না?

সরলা। যদি হয় অন্তর্যামী ছাড়া আর কেউ জানতে পারবে না।

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

নীরজার ঘর

নীরজা ও রোশনি

নীরজা। রোশনি।

রোশনি। কী খোখী।

নীরজা। কাল থেকে সরলাকে দেখছি নে কেন?

রোশনি। সে কী কথা, জান না, সরকার বাহাদুর যে তাকে পুলিপোলাও চালান দিয়েছে?

নীরজা। কেন, কী করেছিল?

রোশনি। দারোয়ানের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে বড়োলাটের মেমসাহেবের ঘরে ঢুকেছিল।

নীরজা। কী করতে?

রোশনি। মহারানীর সীলমোহর থাকে যে-বাক্সোয় সেইটে চুরি করতে, আচ্ছা বুকের পাটা!

নীরজা। লাভ কী?

রোশনি। ঐ শোনো, সেটা পেলেই তো সব হল। লাটসাহেবের ফাঁসি দিতে পারত। সেই মোহরের ছাপেই তো রাজ্যিখানা চলছে।

নীরজা। আর ঠাকুরপো?

রোশনি। সিঁধকাঠি বেরিয়েছে তাঁর পাগড়ির ভিতর থেকে, দিয়েছে তাকে হরিণবাড়িতে, পাথর ভাঙাবে পঁচাশ বছর। আচ্ছা খোখী, একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, বাড়ি থেকে যাবার সময় সরলাদিদি তার জাফরানি রঙের শাড়িখানা আমাকে দিয়ে গেল। বললে 'তোমার ছেলের বউকে দিয়ো।' চোখে আমার জল এল, কম দুঃখ তো দিই নি ওকে। এই শাড়িটা যদি রেখে দিই কোম্পানির বাহাদুর ধরবে না তো?

নীরজা। ভয় নেই তোর। কিন্তু শিগগির যা বাইরের ঘরে খবরের কাগজ পড়ে আছে নিয়ে আয়।

রোশনি কাগজ নিয়ে এল। কাগজ পড়ে নীরজা বললে—

রোশনি, তোদের সরলা দিদিমণির কাণ্ডটা দেখলি? হাটের লোকের সামনে ভদ্রঘরের মেয়ে—

রোশনি। মনে পড়লে গায়ে কাঁটা দেয়, চোর-ডাকাতের বাড়া। ছি ছি!

নীরজা। ওর সব-তাতেই গায়ে-পড়া বাহাদুরি। বেহায়াগিরির একশেষ। বাগান থেকে আরম্ভ করে জেলখানা পর্যন্ত। মরতে মরতেও দেমাক ঘোচে না।

রোশনি। কিন্তু খোখী, দিদিমণির মনখানা দরাজ।

নীরজা। ঠিক বলেছিস রোশনি, ঠিক বলেছিস। ভুলে গিয়েছিলুম। শরীর খারাপ থাকলেই মন খারাপ হয়। আগের থেকে যেন নিচু হয়ে গেছি। ছি ছি, নিজেকে মারতে ইচ্ছে করে। সরলা খাঁটি মেয়ে। মিথ্যে কথা জানে না। অমন মেয়ে দেখা যায় না। আমার চেয়ে অনেক ভালো। শিগগির

আমাদের গণেশ সরকারকে ডেকে দে।

আয়া চলে গেল, পেন্সিল নিয়ে নীরজা একখানা চিঠি লিখতে বসল। গণেশ এল।

(গণেশকে) চিঠি পৌঁছিয়ে দিতে পারবে জেলখানায় সরলাদিদিকে?

গণেশ। পারব। কিছু খরচ লাগবে। কিন্তু কী লিখলে মা শুনি, কেননা পুলিশের হাত দিয়ে যাবে চিঠিখানা।

নীরজা। (পত্র পাঠ) ধন্য তোমার মহত্ত্ব! এবার জেলখানা থেকে বেরিয়ে যখন আসবে তখন দেখবে তোমার পথের সঙ্গে আমার পথ মিলে গেছে।

গণেশ। ঐ যে পথটার কথা লিখেছ, ভালো শোনাচ্ছে না। আমাদের উকিলবাবুকে দেখিয়ে ঠিক করা যাবে।

[গণেশের প্রস্থান

ওষুধের পেয়ালা হাতে নিয়ে আদিত্যের প্রবেশ

নীরজা। এ আবার কী?

আদিত্য। ডাক্তার বলে গেছে ঘণ্টায় ঘণ্টায় ওষুধ খাওয়াতে হবে।

বিছানার পাশে বসল

নীরজা। ওষুধ খাওয়াবার জন্যে বুঝি আর পাড়ায় লোক জুটল না। নাহয় দিনের বেলাকার জন্যে একজন নার্স রেখে দাও-না, যদি মনে এতই উদ্‌বেগ থাকে।

আদিত্য। সেবার ছলে কাছে আসবার সুযোগ যদি পাই ছাড়ব কেন?

নীরজা। তার চেয়ে কোনো সুযোগে তোমার বাগানের কাজে যদি যাও তো আমি ঢের বেশি খুশি হব। আমি পড়ে আছি, আর দিনে দিনে বাগান যে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে।

আদিত্য। হোক-না নষ্ট। সেরে ওঠো আগে, তার পর সেদিনকার মতো দুজনে মিলে কাজ করব।

নীরজা। সরলা চলে গেছে, তুমি একলা পড়েছ, কাজে মন যাচ্ছে না। কিন্তু উপায় কী? তাই বলে লোকসান করতে দিয়ো না।

আদিত্য। লোকসানের কথা আমি ভাবছি নে নীরু। বাগান করাটা যে আমার ব্যাবসা সে কথা এতদিন তুমিই ভুলিয়ে রেখেছিলে, কাজে তাই সুখ ছিল। এখন মন যায় না।

নীরজা। অমন করে আক্ষেপ করছ কেন? বেশ তো কাজ করছিলে এই সেদিন পর্যন্ত। কিছুদিনের জন্যে যদি বাধা পড়ে তাই নিয়ে এত ব্যাকুল হোয়ো না।

আদিত্য। পাখাটা কি চালিয়ে দেব?

নীরজা। বাড়াবাড়ি কোরো না তুমি, এ-সব কাজ তোমাদের নয়। এতে আমাকে আরো ব্যস্ত করে তোলে। যদি কোনোরকম করে দিন কাটাতে চাও তো তোমাদের তো হর্টিকাল্‌চরিস্ট্‌ ক্লাব আছে।

আদিত্য। তুমি যে রঙিন লিলি ভালোবাস, বাগানে অনেক খুঁজে একটাও পাই নি। এবারে ভালো বৃষ্টি হয় নি বলে গাছগুলোর তেজ নেই।

নীরজা। কী তুমি মিছিমিছি বকছ! তার চেয়ে হলাকে ডেকে দাও, আমি শুয়ে শুয়েই

বাগানের কাজ করব। তুমি কি বলতে চাও আমি শয্যাগত বলেই আমার বাগানও হবে শয্যাগত। শোনো আমার কথা। শুক্‌নো সীজন ফুলের গাছগুলো উপড়িয়ে ফেলে সেখানে জমি তৈরি করিয়ে নাও। আমার সিঁড়ির নীচের ঘরে সরষের খোলের বস্তা আছে। হলার কাছে আছে তার চাবি।

আদিত্য। তাই নাকি? হলা তো এতদিন কিছুই বলে নি।

নীরজা। বলতে ওর রুচবে কেন? ওকে কি তোমরা কম হেনস্তা করেছ? কাঁচা সাহেব এসে প্রবীণ কেরানিকে যে-রকম গ্রাহ্য করে না সেই রকম আর-কি।

আদিত্য। হলা মালী সম্বন্ধে সত্য কথা বলতে যদি চাই তবে সেটা অপ্রিয় হয়ে উঠবে।

নীরজা। আচ্ছা, আমি এই বিছানায় পড়ে থেকেই ওকে দিয়ে কাজ করাব, দেখবে দুদিনেই বাগানের চেহারা ফেরে কি না। বাগানের ম্যাপটা আমার কাছে দিয়ো। আর আমার বাগানের ডায়েরিটা। আমি ম্যাপে পেন্সিলের দাগ দিয়ে সমস্ত ব্যবস্থা করে দেব।

আদিত্য। আমার তাতে কোনো হাত থাকবে না?

নীরজা। না, যাবার আগে এ বাগানে সম্পূর্ণ আমার ছাপ মেরে দেব। বলে রাখছি, রাস্তার ধারের ঐ বট্‌ল্‌পামগুলো আমি একটাও রাখব না। ওখানে ঝাউগাছের সার লাগিয়ে দেব। অমন করে মাথা নেড়ো না। হয়ে গেলে তখন দেখো। তোমাদের ঐ লন্‌টা আমি রাখব না, ওখানে মার্বলের একটা বেদী বাঁধিয়ে দেব।

আদিত্য। বেদীটা কি ও জায়গায় মানাবে? একটু যেন যাকে বলে সস্তা নবাবী।

নীরজা। চুপ করো। খুব মানাবে। তুমি কোনো কথা বলতে পারবে না। কিছুদিনের জন্যে এ বাগানটা হবে একলা আমার, সম্পূর্ণ আমার। তার পর সেই আমার বাগানটা আমি তোমাকে দিয়ে যাব। ভেবেছিলে আমার শক্তি গেছে। দেখিয়ে দেব কী করতে পারি। আরো তিনজন মালী আমার চাই, আর মজুর লাগবে জন-ছয়েক। মনে আছে একদিন তুমি বলেছিলে বাগান সাজিয়ে তোলার শিক্ষা আমার হয় নি। হয়েছে কি না তার পরীক্ষা দিয়ে যাব। তোমাকে মনে রাখতেই হবে যে এ আমার বাগান, আমারই বাগান, আমার স্বত্ব কিছুতে যাবে না।

আদিত্য। আচ্ছা সেই ভালো, তা হলে আমি কী করব?

নীরজা। তুমি তোমার দোকান নিয়ে থাকো ; সেখানে তোমার আফিসের কাজ তো কম নয়।

আদিত্য। তোমাকে নিয়ে থাকাও তা হলে নিষিদ্ধ।

নীরজা। হাঁ, সর্বদা কাছে থাকবার মতো সে আমি আর নেই— এখন আমি কেবল আর-একজনকে মনে করিয়ে দিতে পারি— তাতে লাভ কী?

আদিত্য। আচ্ছা বেশ। যখন তুমি আমাকে সহ্য করতে পারবে, তখনি আসব। ডেকে পাঠিয়ো আমাকে। আজ সাজিতে তোমার জন্য গন্ধরাজ এনেছি, রেখে যাই তোমার বিছানায়, কিছু মনে কোরো না।

বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ল

আদিত্যের হাত ধরে

নীরজা। না, যেয়ো না, একটু বোসো।

ফুলদানিতে একটা ফুল দেখিয়ে

জানো এ ফুলের নাম?

আদিত্য। না, জানি নে।

নীরজা। আমি জানি। বলব, পেট্যুনিয়া। তুমি মনে করো আমি কিছু জানি নে, মূর্খু আমি।

আদিত্য। (হেসে) সহধর্মিণী তুমি, যদি মূর্খ হও অন্তত আমার সমান মূর্খ। আমাদের জীবনে মূর্খতার কারবার আধাআধি ভাগে চলছে।

নীরজা। সে কারবার আমার ভাগ্যে এইবারে শেষ হয়ে এল। ঐ যে দারোয়ানটা ঐখানে বসে তামাক কুটছে ও থাকবে দেউড়িতে, কিছুদিন পরে আমি থাকব না। ঐ যে গোরুর গাড়িটা পাথুরে কয়লা আজাড় করে দিয়ে খালি ফিরে যাচ্ছে ওর যাতায়াত চলবে রোজ, কিন্তু চলবে না আমার এই হৃদ্‌যন্ত্রটা।

আদিত্যের হাত হঠাৎ জোর করে চেপে ধরে

একেবারেই থাকব না, কিছুই থাকব না? বলো আমাকে, তুমি তো অনেক বই পড়েছ, বলো-না আমাকে সত্যি করে।

আদিত্য। যাদের বই পড়েছি তাদের বিদ্যে যতদূর আমারও ততদূর। যমের দরজার কাছটাতে এসে থেমেছি আর এগোয় নি।

নীরজা। বলো-না তুমি কী মনে করো। একটুও থাকব না? এতটুকুও না?

আদিত্য। এখন আছি এটাই যদি সম্ভব হয়, তখন থাকব সেও সম্ভব।

নীরজা। নিশ্চয় সম্ভব, ঐ বাগানটা সম্ভব, আর আমিই হব অসম্ভব, এ হতেই পারে না, কিছুতেই না। সন্ধেবেলায় অমনি করেই অস্পষ্ট আলোয় কাকেরা ফিরবে বাসায়, এমনি করেই দুলবে সুপুরিগাছের ডাল ঠিক আমারই চোখের সামনে। সেদিন তুমি মনে রেখো, আমি আছি, আমি আছি, সমস্ত বাগানময় 'আমি আছি'। মনে কোরো বাতাস যখন তোমার চুল ওড়াচ্ছে আমার আঙুলের ছোঁওয়া আছে তাতে। বলো মনে করবে।

আদিত্য। হাঁ, মনে করব।

বলল বটে, কিন্তু এমন সুরে বলতে পারলে না যাতে তার বিশ্বাসের প্রমাণ হয়।

নীরজা। (অস্থির হয়ে) তোমাদের বই যারা লেখে ভারী তো পণ্ডিত তারা। কিছু জানে না। আমি নিশ্চয় জানি, আমার কথা বিশ্বাস করো। আমি থাকব, আমি এইখানেই থাকব, আমি তোমারই কাছে থাকব, একেবারে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। এই তোমাকে বলে যাচ্ছি, কথা দিয়ে যাচ্ছি, তোমার বাগানের গাছপালা সমস্তই আমি দেখব। যেমন আগে দেখতুম তার চেয়ে অনেক ভালো করে দেখব। কাউকে দরকার হবে না। কাউকে না।

শুয়ে ছিল, উঠে বালিশে ঠেসান দিয়ে বসে

আমাকে দয়া কোরো, দয়া কোরো। তোমাকে এত ভালোবাসি সেই কথা মনে করে আমাকে দয়া কোরো। এতদিন তুমি আমাকে যেমন আদরে স্থান দিয়েছ তোমার ঘরে, সেদিনও তেমনি করেই স্থান দিয়ো। ঋতুতে ঋতুতে তোমার যে-সব ফুল ফুটবে তেমনি করেই মনে মনে তুলে দিয়ো আমার হাতে। যদি নিষ্ঠুর হও তুমি, তা হলে তো এখানে আমি থাকতে পারব না। আমার বাগান যদি কেড়ে নাও তা হলে হাওয়ায় হাওয়ায় কোন্‌ শূন্যে আমি ভেসে বেড়াব?

নীরজার দুই চক্ষু দিয়ে জল ঝরে পড়তে লাগল। আদিত্য মোড়া ছেড়ে বিছানার উপর উঠে বসল।

নীরজার মুখ বুকে টেনে নিয়ে আস্তে আস্তে হাত বুলোতে লাগল তার মাথায়।

আদিত্য। নীরু, শরীর নষ্ট কোরো না।

নীরজা। যাক গে আমার শরীর। আমি আর কিছু চাই নে, আমি কেবল তোমাকে চাই এই সমস্ত-কিছু নিয়ে। শোনো একটা কথা বলি, রাগ কোরো না আমার উপর, রাগ কোরো না, (বলতে বলতে স্বর রুদ্ধ হয়ে এল। একটু শান্ত হয়ে—) সরলার উপর অন্যায় করেছি। তোমার পায়ে ধরে বলছি আর অন্যায় করব না। যা হয়েছে তার জন্যে আমাকে মাপ করো। কিন্তু আমাকে ভালোবাস তুমি, যা চাও আমি সব করব।

আদিত্য। শরীরের সঙ্গে সঙ্গে মন ছিল অসুস্থ নীরু, তাই নিজেকে মিথ্যা পীড়ন করেছ।

নীরজা। শোনো বলি। কাল রাত্রি থেকে বার বার পণ করেছি, এবার দেখা হলে নির্মল মনে ওকে বুকে টেনে নেব আপন বোনের মতো। তুমি আমাকে এই শেষ প্রতিজ্ঞা রক্ষায় সাহায্য করো। বলো, আমি তোমার ভালোবাসা থেকে বঞ্চিত হব না। তা হলে সবাইকে আমার ভালোবাসা দিয়ে যেতে পারব।

এ কথার কোনো উত্তর না করে মুদে এল নীরজার চোখ। খানিক বাদে নীরজা জিজ্ঞাসা করলে—

সরলা কবে খালাস পাবে সেই দিনই গুনছি। ভয় হয় পাছে তার আগে মরে যাই। পাছে বলে যেতে না পারি যে আমার মন একেবারে সাদা হয়ে গেছে। এইবার আলো জ্বালাও। আমাকে পড়ে শোনাও অক্ষয় বড়ালের 'এষা'।

বালিশের নীচ থেকে বই বের করে দিলে। আদিত্য পড়ে শোনাতে লাগল। শুনতে শুনতে যেই একটু ঘুম এসেছে আয়া ঘরে এসে বললে—

রোশনি। চিঠি।

আদিত্যের হাতে প্রদান

নীরজা। ও কী, ও কার চিঠি?

আদিত্য। (একটু চুপ করে থেকে) টেলিগ্রাম এসেছে!

নীরজা। কিসের টেলিগ্রাম?

আদিত্য। মেয়াদ শেষ হবার আগেই সরলা ছাড়া পেয়েছে।

নীরজা। ছাড়া পেয়েছে? দেখি। (টেলিগ্রাম হাতে নিয়ে) তা হলে তো আর দেরি নেই। এখনি আসবে। ওকে নিশ্চয় এনো আমার কাছে। (বলতে বলতে মূর্ছার উপক্রম)

আদিত্য। ও কী! কী হল নীরু! নার্স, ডাক্তার আছেন?

নেপথ্য হতে

নার্স। আছেন বাইরের ঘরে।

আদিত্য। এখনি নিয়ে এসো, এই যে ডাক্তার।

ডাক্তারের প্রবেশ

এইমাত্র বেশ সহজ শরীরে কথা বলছিল, বলতে বলতে অজ্ঞান হয়ে গেল।

ডাক্তার নীরজার নাড়ী দেখে চুপ করে রইল। কিছুক্ষণ পরে রোগী চোখ মেলেই বললে—

নীরজা। ডাক্তার, আমাকে বাঁচাতেই হবে। সরলাকে না দেখে যেতে পারব না, ভালো হবে না তাতে। আশীর্বাদ করব তাকে। শেষ আশীর্বাদ।

আবার এল চোখ বুজে, হাতের মুঠো শক্ত হল, বলে উঠল—

ঠাকুরপো, কথা রাখব, কৃপণের মতো মরব না।

এক-একবার চেতনা ক্ষীণ হয়ে জগৎ ঝাপসা হয়ে আসছে, আবার নিবু-নিবু প্রদীপের মতো জীবন-শিখা উঠছে জ্বলে। স্বামীকে থেকে থেকে জিজ্ঞাসা করছে—

কখন আসবে সরলা?
(থেকে থেকে ডেকে ওঠে) রোশনি।
রোশনি। কী খোঁখী?
নীরজা। ঠাকুরপোকে ডেকে দে এক্ষুনি।
(এক-একবার আপনি বলে ওঠে—) কী হবে আমার, ঠাকুরপো! দেব দেব দেব, সব দেব।

ভৃত্যের প্রবেশ

ভৃত্য। (আদিত্যের কানে কানে) সরলা দিদিমণি এসেছেন।

আদিত্যের প্রস্থান ও সরলাকে নিয়ে প্রবেশ
নীরজার কানের কাছে মাথা নামিয়ে

আদিত্য। সরলা এসেছে।
নীরজা। (চোখ ঈষৎ মেলে আদিত্যকে) তুমি যাও।

আদিত্য ও ডাক্তারের প্রস্থান। নীরজা একবার ডেকে উঠল—

ঠাকুরপো।

সব নিস্তব্ধ
সরলা এসে প্রণাম করবার জন্য পায়ে হাত দিতেই যেন বিদ্যুতের আঘাতে ওর সমস্ত শরীর আক্ষিপ্ত হয়ে উঠল। পা দ্রুত আপনি গেল সরে। ভাঙা গলায়—

পারলুম না, পারলুম না, দিতে পারব না, পারব না।

বলতে বলতে অস্বাভাবিক জোর এল দেহে, চোখের তারা প্রসারিত হয়ে জ্বলতে লাগল। চেপে ধরলে সরলার হাত, তীক্ষ্ণ কণ্ঠে—

জায়গা হবে না তোর রাক্ষসী, জায়গা হবে না। আমি থাকব, থাকব, থাকব।

হঠাৎ ঢিলে সেমিজ-পরা পাংশুবর্ণ শীর্ণ মূর্তি বিছানা ছেড়ে খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে উঠল। অদ্ভুত গলায়—

পালা, পালা, পালা এখনি, নইলে দিনে দিনে শেল বিঁধব তোর বুকে— শুকিয়ে ফেলব তোর রক্ত।

বলেই পড়ে গেল মেঝের উপর। ছুটে আদিত্যের ঘরে প্রবেশ—
নীরজার মৃত্যু

হাস্যকৌতুক

হাস্যকৌতুক

হেঁয়ালিনাট্য

বৈকুণ্ঠ, তস্য পুত্র খগেশ এবং অন্যান্য পাঁচজন

বৈকুণ্ঠ। আমার ছেলের কী বুদ্ধি! প্রায় আমারই মতো। যখন তর্ক করে মুখের কাছে দাঁড়ানো যায় না। বাবা খগেশ, অনেক লোক উপস্থিত আছেন, এইখেনে একবার তর্ক করতে আরম্ভ করো দেখি।

অন্য পাঁচজন। (মনে মনে) তা হলে পালাতে হয় বুঝি!

খগেশ। আচ্ছা, রাজি আছি। এখন কাকে ওড়াতে হবে কাকে রাখতে হবে বলে দাও।

অন্য পাঁচজন। (মনে মনে) আপনাকে আর বাবাকে রেখে বাকি সকলকে উড়িয়ে দাও।

বৈকুণ্ঠ। বাবা, যেটা হাতের কাছে পাও সেইটেই ওড়াও! ইহকাল ওড়াও, পরকাল ওড়াও।

খগেশ। তা হলে রোসো বাবা, আগে dinnerটা খেয়ে নেওয়া যাক, তার পরে খেয়ে-দেয়ে বেশ ঠাণ্ডা হয়ে রয়ে-বসে চুরট টানতে টানতে চুরটের ধোঁয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড আরামে উড়িয়ে দেব, যারা যারা উপস্থিত থাকবে দেখে আশ্চর্য হয়ে যাবে।

বৈকুণ্ঠ। That's right খগেশ! আপনারা সকলেই দেখছেন আমার খগেশ কেমন sensible। ওর মাথায় কোনোরকম nonsense নেই। যেটা real এবং immediate want তার প্রতি ওর প্রথম নজর— তার পরে সেটা satisfied হলে পরে কাগজের চুরটের মতো জগতের ডগায় তর্কের দেশলাই ধরিয়ে ওটাকে quietly বসে বসে ধোঁয়া করেই ওড়াও বা ছাই করেই ফেলো তাতে আরাম বৈ কারো কোনো ক্ষতিবৃদ্ধি নেই।

খগেশ। হাঃ হাঃ হাঃ, বাবা has put the matter very well indeed। আমি দেখেছি বাবা যেমন clearly and with great precision একটা proposition lay down করতে পারেন, এমন there are very few men who—

বৈকুণ্ঠ। সে আর তোমার বলবার দরকার নেই। I know that। আর কিছু না, এর secret হচ্ছে clear head এবং proper training। আমাদের দেশের লোকের ঐ দুটো জিনিসেরই বিশেষ অভাব and in consequence, none of them has the least idea how to think out a subject!

খগেশ। And I must confess তুমি আমার বাবা হওয়াতে আমার ঐ এক মস্ত advantage হয়েছে, certainly I possess a clear head, আর তার জন্যে আমি তোমার কাছে really grateful আছি বাবা!

অন্য পাঁচজন। বাপ-বেটার কী বিনয়!

খগেশ। Nonsense! বিনয়!— আচ্ছা, এসো, এই বিষয়ে একটা settle করা যাক। I don't believe in বিনয়। It must be either hypocrisy or ignorance। যারা really clever they know they are clever and why should they not make it known to other people! Now, come, বিনয় কাকে বলে—let us have a definition of it।

অন্য পাঁচজন। (মাথা চাপড়াইয়া) clear head নেই। খগেশবাবু, তোমার বাবার মতো বাবা আমাদের ছিল না। বিনয়ের definition আমাদের ঠাহর হচ্ছে না!

বৈকুণ্ঠ। ওহে ও যজ্ঞেশ্বর, শুনে যাও, শুনে যাও। আমার ছেলে খগেশ এ দিকে তর্ক করতে আরম্ভ করেছে— It's a treat to hear him argue।—(খগেশের পিঠ চাপড়াইয়া) Go on খগেশ!

যজ্ঞেশ্বর। আজ আমাদের ওখেনে খেতে গেলে না যে!

খগেশ। (হঠাৎ অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া) Now, come— কেন খেতে যাব!

যজ্ঞেশ্বর। কথা ছিল যে।

খগেশ। কী কথা ছিল ভালো করে analyse করে দেখা যাক। তুমি আমাকে বললে, 'খগি, কাল আমাদের বাড়ি খেতে যাবে কি?' আমি বললুম, 'হাঁ।' ভেবে দেখো it was no promise। তুমি simply একটি fact জানতে চেয়েছিলে, এবং তখন যেটা likely answer বোধ হল সেইটে তোমাকে বললুম। মনে করো if you had asked me 'খগি, কাল তুমি কি কালো মোজা পরবে' and if I happened to have answered 'হাঁ' এবং আজ যদি আমি কালো মোজা না পরতুম, what then! কিন্তু তুমি যদি বলতে—

যজ্ঞেশ্বর। বুঝেছি খগেশ, আর কাজ নেই।

খগেশ। কাজ আছে। তুমি নাকি হঠাৎ এসে একটা wrong statement করে সকলের মনে একটা vague impression create করে দিয়েছ যে আমি আমার promise রাখি নে, তারই absurdity আমি প্রমাণ করে দিতে চাই! Now, to the point— তুমি আমাকে next question জিজ্ঞাসা করলে, 'কখন আসবে?' আমি বললুম, 'তা বলতে পারি নে, আমি ঘড়ি ধরে কাজ করি নে।' তুমি একটা further question জিজ্ঞাসা করলে, আমি তার একটা indefinite উত্তর দিলুম —and the last question was, 'তুমি কী খাবে? মাংস না ডাল ভাত?' আমি বললুম, 'যা পাব তাই খাব।' There it ended। এর থেকে কী কী প্রমাণ হচ্ছে দেখা যাক—

যজ্ঞেশ্বর। রক্ষে করো বাপু, আমার বাড়িতে যে তোমার পা পড়ে নি সে আমার পরম সৌভাগ্য বলতে হবে।

অন্য পাঁচজন। পা পড়ে নি বলছেন কি, মাথা পড়ে নি বলুন— আপনার নেমন্তন্নের মধ্যে যদি ওর clear headটা হঠাৎ গিয়ে পড়ত সে তো কামানের গোলা পড়ত, আপনার বন্ধুবান্ধবেরা সশঙ্কিত হয়ে উঠত। clear head অতি ভয়ানক জিনিস! বিশেষ সভাস্থলে।

যজ্ঞেশ্বর। তা ঠিক বলেছেন।

বৈকুণ্ঠ। (পিঠ থাবড়াইয়া) তুমি বলে যাও-না খগেশ! থামলে কেন? বেশ বলছিলে।

খগেশ। যার এক-পাতা logic পড়া আছে সে কখনো deny করতে পারবে না যে—

যজ্ঞেশ্বর। তোমার যা বলবার বলো, আমরা চললুম।

বৈকুণ্ঠ। কেন কেন!

যজ্ঞেশ্বর। ভদ্রসমাজে— নিমন্ত্রণে বা বন্ধুবান্ধবের সভায়— ভদ্রলোকেরা গল্পসল্প করে, আমোদ করে, আলোচনা করে, কিন্তু পারতপক্ষে তর্ক করে না। যারা কথায় কথায় তর্ক

উচিয়ে খোঁকিয়ে আসে, তাদের একরকম সংকীর্ণ তীক্ষ্ণ বুদ্ধি থাকতে পারে বটে, কিন্তু তারা ভদ্র নয়।

বৈকুণ্ঠ। কিন্তু idea-র precision—

খগেশ। perception-এর clearness—

বৈকুণ্ঠ। expression-এর luminous lucidity—

খগেশ। the sense of utter futility of all fog and fallacy—

যজ্ঞেশ্বর। ও-সবই থাকতে পারে, কিন্তু তাই বলে তার্কিকতা-নামক তীক্ষ্ণ ও নর্তনশীল জিহ্বাগ্রভাগ সগর্বে সকলকে প্রদর্শন করবার জন্যে সর্বদা বের করে উচিয়ে রেখে দিতে হবে— ভদ্রসমাজে তার কোনো আবশ্যক নেই।

খগেশ। 'ভদ্রসমাজে'র definition কী?

বৈকুণ্ঠ। and what is 'তর্ক'।

খগেশ। জিহ্বাই বা কী? where is the analogy?

বৈকুণ্ঠ। এবং 'আবশ্যক' কাকে বলে?

খগেশ। তোমার idea of 'সর্বদা'ই বা কিরকম।

সকলে। আর এক দণ্ড এখানে থাকা নয়।

খগেশ। দেখেছ বাবা? একটা proposition-এর মধ্যে string of inaccuracies!

বৈকুণ্ঠ। want of precision and proper training!

ভারতী ও বালক
আষাঢ় ১২৯৪

নাটকের পাত্রগণ

গোবিন্দমাণিক্য	ত্রিপুরার রাজা
নক্ষত্ররায়	গোবিন্দমাণিক্যের কনিষ্ঠ ভ্রাতা
রঘুপতি	রাজপুরোহিত
জয়সিংহ	রঘুপতির পালিত রাজপুত যুবক
রাজমন্দিরের সেবক	
চাঁদপাল	দেওয়ান
নয়নরায়	সেনাপতি
মন্ত্রী	
পৌরগণ	

বিসর্জন

প্রথম দৃশ্য

রাজসভা

রাজা, রঘুপতি ও নক্ষত্ররায়ের প্রবেশ

সভাসদ্‌গণ উঠিয়া

সকলে। জয় হোক মহারাজ!
রঘুপতি। রাজার ভাণ্ডারে
এসেছি বলির পশু সংগ্রহ করিতে।
গোবিন্দ। মন্দিরেতে জীববলি এ বৎসর হতে
হইল নিষেধ।
নয়নরায়। বলি নিষেধ!
মন্ত্রী। নিষেধ!
নক্ষত্ররায়। তাই তো! বলি নিষেধ!
রঘুপতি। এ কি স্বপ্নে শুনি?
গোবিন্দ। স্বপ্ন নহে প্রভু! এতদিন স্বপ্নে ছিনু,
আজ জাগরণ। বালিকার মূর্তি ধ'রে
স্বয়ং জননী মোরে বলে গিয়েছেন,
জীবরক্ত সহে না তাঁহার।
রঘুপতি। এতদিন
সহিল কী করে? সহস্র বৎসর ধ'রে
রক্ত করেছেন পান, আজি এ অরুচি!
গোবিন্দ। করেন নি পান। মুখ ফিরাতেন দেবী
করিতে শোণিতপাত তোমরা যখন।
রঘুপতি। মহারাজ, কী করিছ ভালো করে ভেবে
দেখো। শাস্ত্রবিধি তোমার অধীন নহে।
গোবিন্দ। সকল শাস্ত্রের বড়ো দেবীর আদেশ।
রঘুপতি। একে ভ্রান্তি, তাহে অহংকার! অজ্ঞ নর,
তুমি শুধু শুনিয়াছ দেবীর আদেশ,
আমি শুনি নাই?

নক্ষত্ররায়। তাই তো, কী বলো মন্ত্রী,
এ বড়ো আশ্চর্য! ঠাকুর শোনেন নাই?
গোবিন্দ। দেবী-আজ্ঞা নিত্যকাল ধ্বনিছে জগতে।
সেই তো বধিরতম যেজন সে বাণী
শুনেও শুনে না।
রঘুপতি। পাষণ্ড, নাস্তিক তুমি!
গোবিন্দ। ঠাকুর, সময় নষ্ট হয়। যাও এবে
মন্দিরের কাজে। প্রচার করিয়া দিয়ো
পথে যেতে যেতে, আমার ত্রিপুররাজ্যে
যে করিবে জীবহত্যা জীবজননীর
পূজাচ্ছলে, তারে দিব নির্বাসনদণ্ড।
রঘুপতি। এই কি হইল স্থির?
গোবিন্দ। স্থির এই।

উঠিয়া

রঘুপতি। তবে
উচ্ছন্ন! উচ্ছন্ন যাও!

ছুটিয়া আসিয়া

চাঁদপাল। হাঁ হাঁ! থামো! থামো!
গোবিন্দ। বোসো চাঁদপাল। ঠাকুর, বলিয়া যাও।
মনোব্যথা লঘু করে যাও নিজ কাজে।
রঘুপতি। তুমি কি ভেবেছ মনে ত্রিপুর-ঈশ্বরী
ত্রিপুরার প্রজা? প্রচারিবে তাঁর 'পরে
তোমার নিয়ম? হরণ করিবে তাঁর
বলি? হেন সাধ্য নাই তব, আমি আছি
মায়ের সেবক।

[প্রস্থান

রাজার চিন্তা

নয়নরায়। ভেবে দেখো মহারাজ,
যুগে যুগে যে পেয়েছে শতসহস্রের
ভক্তির সম্মতি, তাহারে করিতে নাশ
তোমার কী আছে অধিকার।

সনিশ্বাসে

গোবিন্দ। থাক্ তর্ক।
যাও মন্ত্রী, আদেশ প্রচার করো গিয়ে—
আজ হতে বন্ধ বলিদান।

[প্রস্থান

মন্ত্রী। একি হল!
নক্ষত্ররায়। তাই তো হে মন্ত্রী, এ কী হল! শুনেছিনু
মগের মন্দিরে বলি নেই, অবশেষে
মগেতে হিন্দুতে ভেদ রহিল না কিছু।
কী বল হে চাঁদপাল, তুমি কেন চুপ?
চাঁদপাল। ভীরু আমি ক্ষুদ্র প্রাণী, বুদ্ধি কিছু কম,
না বুঝে পালন করি রাজার আদেশ।

দ্বিতীয় দৃশ্য

মন্দির

জয়সিংহ

রঘুপতির প্রবেশ

পা ধুইবার জল প্রভৃতি অগ্রসর করিয়া

জয়সিংহ। গুরুদেব!
রঘুপতি। যাও, যাও!
জয়সিংহ। আনিয়াছি জল।
রঘুপতি। থাক্, রেখে দাও জল।
জয়সিংহ। বসন।
রঘুপতি। কে চাহে
বসন!
জয়সিংহ। অপরাধ করেছি কি?
রঘুপতি। আবার?
কে নিয়েছে অপরাধ তব?—
ঘোর কলি
এসেছে ঘনায়ে। বাহুবল রাহুসম
ব্রহ্মতেজ গ্রাসিবারে চায়—সিংহাসন
তোলে শির যজ্ঞবেদী-'পরে। হায় হায়,
কলির দেবতা তোমরাও চাটুকার
সভাসদ্‌সম, নতশিরে রাজ-আজ্ঞা

বহিতেছ? চতুর্ভুজা, চারি হস্ত আছ
জোড় করি! বৈকুণ্ঠ কি আবার নিয়েছে
কেড়ে দৈত্যগণ? গিয়েছে দেবতা যত
রসাতলে? শুধু, দানবে মানবে মিলে
বিশ্বের রাজত্ব দর্পে করিতেছে ভোগ?
দেবতা না যদি থাকে, ব্রাহ্মণ রয়েছে।
ব্রাহ্মণের রোষযজ্ঞে দণ্ড সিংহাসন
হবিকাষ্ঠ হবে।

জয়সিংহের নিকট গিয়া সস্নেহে

বৎস, আজ করিয়াছি
রুক্ষ আচরণ তোমা-'পরে— চিত্ত বড়ো
ক্ষুব্ধ মোর।

জয়সিংহ। কী হয়েছে প্রভু!

রঘুপতি। কী হয়েছে!
শুধাও অপমানিত ত্রিপুরেশ্বরীরে।
এই মুখে কেমনে বলিব কী হয়েছে!

জয়সিংহ। কে করেছে অপমান?

রঘুপতি। গোবিন্দমাণিক্য।

জয়সিংহ। গোবিন্দমাণিক্য! প্রভু, কারে অপমান?

রঘুপতি। কারে! তুমি, আমি, সর্বশাস্ত্র, সর্বদেশ,
সর্বকাল, সর্বদেশকাল-অধিষ্ঠাত্রী
মহাকালী, সকলেরে করে অপমান
ক্ষুদ্র সিংহাসনে বসি। মা'র পূজা-বলি
নিষেধিল স্পর্ধাভরে।

জয়সিংহ। গোবিন্দমাণিক্য!

রঘুপতি। হাঁ গো, হাঁ, তোমার রাজা গোবিন্দমাণিক্য!
তোমার সকল-শ্রেষ্ঠ— তোমার প্রাণের
অধীশ্বর! অকৃতজ্ঞ! পালন করিনু
এত যত্নে স্নেহে তোরে শিশুকাল হতে,
আমা-চেয়ে প্রিয়তর আজ তোর কাছে
গোবিন্দমাণিক্য?

জয়সিংহ। প্রভু, পিতৃকোলে বসি
আকাশে বাড়ায় হাত ক্ষুদ্র মুগ্ধ শিশু
পূর্ণচন্দ্র-পানে— দেব, তুমি পিতা মোর,
পূর্ণশশী মহারাজ গোবিন্দমাণিক্য।
কিন্তু এ কী বকিতেছি! কী কথা শুনিনু!

মায়ের পূজার বলি নিষেধ করেছে
রাজা? এ আদেশ কে মানিবে?
রঘুপতি। না মানিলে
নির্বাসন।
জয়সিংহ। মাতৃপূজাহীন রাজ্য হতে
নির্বাসন দণ্ড নহে। এ প্রাণ থাকিতে
অসম্পূর্ণ নাহি রবে জননীর পূজা।
যার 'পরে রয়েছে যে ভার, বল তার
আছে সে কাজের। করিবই মা'র পূজা
যদি সত্য মায়ের সেবক হই মোরা।
চলো প্রভু, বাজাই মায়ের ডঙ্কা, ডেকে
আনি পুরবাসীগণে, মন্দিরের দ্বার
খুলে দিই।— ওরে, আয় তোরা, আয়, আয়,
অভয়ার পূজা হবে— নির্ভয়ে আয় রে
তোরা মায়ের সন্তান! আয় পুরবাসী!

[জয়সিংহ ও রঘুপতির প্রস্থান

পুরবাসীগণের প্রবেশ

অক্রূর। ওরে, আয় রে আয়!
সকলে। জয় মা!
হারু। আয় রে, মায়ের সামনে বাহু তুলে নৃত্য করি।

রঘুপতি ও জয়সিংহের প্রবেশ

রঘুপতি। শুনলুম সৈন্য আসছে। জয়সিংহ, অস্ত্র নিয়ে তুমি এইখানে দাঁড়াও। তোরা আয়, তোরা এইখানে দাঁড়া। মন্দিরের দ্বার আগলাতে হবে। আমি তোদের অস্ত্র এনে দিচ্ছি।
গণেশ। অস্ত্র কেন ঠাকুর?
রঘুপতি। মায়ের পুজো বন্ধ করবার জন্যে রাজার সৈন্য আসছে।
হারু। সৈন্য আসছে! প্রভু, তবে আমরা প্রণাম হই।

সরোষে

রঘুপতি। দাঁড়া তোরা!

করজোড়ে

জয়সিংহ। যেতে দাও প্রভু— প্রাণভয়ে ভীত এরা
বুদ্ধিহীন, আগে হতে রয়েছে মরিয়া।

আমি আছি মায়ের সৈনিক। এক দেহে
সহস্র সৈন্যের বল। অস্ত্র থাক্ পড়ে।
ভীরুদের যেতে দাও।

স্বগত

রঘুপতি। সে কাল গিয়েছে।
অস্ত্র চাই, অস্ত্র চাই— শুধু ভক্তি নয়।

প্রকাশ্যে

জয়সিংহ, তবে বলি আনো, করি পূজা।

বাহিরে বাদ্যোদ্যম

জয়সিংহ। সৈন্য নহে প্রভু, আসিছে রানীর পূজা।

রানীর অনুচর ও পুরবাসীগণের প্রবেশ

সকলে। ওরে, ভয় নেই— সৈন্য কোথায়?— মা'র পূজা আসছে।
হারু। আমরা আছি খবর পেয়েছে, সৈন্যেরা শীঘ্র এ দিকে আসছে না।
কানু। ঠাকুর, রানীমা পুজো পাঠিয়েছেন।
রঘুপতি। জয়সিংহ, শীঘ্র পূজার আয়োজন করো।

[জয়সিংহের প্রস্থান

পুরবাসীগণের নৃত্যগীত। গোবিন্দমাণিক্যের প্রবেশ

গোবিন্দ। চলে যাও হেথা হতে— নিয়ে যাও বলি।
রঘুপতি, শোন নাই আদেশ আমার?
রঘুপতি। শুনি নাই।
গোবিন্দ। তবে তুমি এ রাজ্যের নহ।
রঘুপতি। নহি আমি। আমি আছি যেথা, সেথা এলে
রাজদণ্ড খসে যায় রাজহস্ত হতে,
মুকুট ধুলায় পড়ে লুটে। কে আছিস,
আন মা'র পূজা।

বাদ্যোদ্যম

গোবিন্দ। চুপ কর্!

অনুচরের প্রতি

কোথা আছে
সেনাপতি, ডেকে আন্। হায় রঘুপতি,
অবশেষে সৈন্য দিয়ে ঘিরিতে হইল
ধর্ম! লজ্জা হয় ডাকিতে সৈনিকদল;
বাহুবল দুর্বলতা করায় স্মরণ।

রঘুপতি। অবিশ্বাসী, সত্যই কি হয়েছে ধারণা
কলিযুগে ব্রহ্মতেজ গেছে— তাই এত
দুঃসাহস? যায় নাই। যে দীপ্ত অনল
জ্বলিছে অন্তরে, সে তোমার সিংহাসনে
নিশ্চয় লাগিবে। নতুবা এ মনানলে
ছাই করে পুড়াইব সব শাস্ত্র, সব
ব্রহ্মগর্ব, সমস্ত তেত্রিশ কোটি মিথ্যা।
আজ নহে মহারাজ, রাজ-অধিরাজ,
এই দিন মনে কোরো আর-এক দিন।

জয়সিংহের প্রবেশ

জয়সিংহ। আয়োজন
হয়েছে পূজার। প্রস্তুত রয়েছে বলি।
গোবিন্দ। বলি কার তরে?
জয়সিংহ। মহারাজ, তুমি হেথা!
তবে শোনো নিবেদন— একান্ত মিনতি
যুগলচরণতলে, প্রভু, ফিরে লও
তব গর্বিত আদেশ। মানব হইয়া
দাঁড়ায়ো না দেবীরে আচ্ছন্ন করি—
রঘুপতি। ধিক্
জয়সিংহ, ওঠো, ওঠো! চরণে পতিত
কার কাছে? আমি যার গুরু, এ সংসারে
এই পদতলে তার একমাত্র স্থান।
মূঢ়, ফিরে দেখ্— গুরুর চরণ ধরে
ক্ষমা ভিক্ষা কর্। রাজার আদেশ নিয়ে
করিব দেবীর পূজা, করালকালিকা,
এত কি হয়েছে তোর অধঃপাত! থাক্
পূজা, থাক্ বলি— দেখিব রাজার দর্প
কতদিন থাকে। চলে এসো জয়সিংহ !

[রঘুপতি ও জয়সিংহের প্রস্থান

গোবিন্দ। এ সংসারে বিনয় কোথায়? মহাদেবী,
যারা করে বিচরণ তব পদতলে
তারাও শেখে নি হায় কত ক্ষুদ্র তারা!
হরণ করিয়া লয়ে তোমার মহিমা
আপনার দেহে বহে, এত অহংকার!

[প্রস্থান

তৃতীয় দৃশ্য

মন্দির

রঘুপতি, জয়সিংহ ও নক্ষত্ররায়

নক্ষত্ররায়। কী জন্য ডেকেছ গুরুদেব?
রঘুপতি। কাল রাত্রে
স্বপন দিয়েছে দেবী, তুমি হবে রাজা।
নক্ষত্ররায়। আমি হব রাজা! হা হা! বল কী ঠাকুর!
রাজা হব? এ কথা নূতন শোনা গেল!
রঘুপতি। তুমি রাজা হবে।
নক্ষত্ররায়। বিশ্বাস না হয় মোর।
রঘুপতি। দেবীর স্বপন সত্য। রাজটিকা পাবে
তুমি, নাহিকো সন্দেহ।
নক্ষত্ররায়। নাহিকো সন্দেহ!—
কিন্তু, যদি নাই পাই?
রঘুপতি। আমার কথায়
অবিশ্বাস!
নক্ষত্ররায়। অবিশ্বাস কিছুমাত্র নেই,
কিন্তু দৈবাতের কথা— যদি নাই হয়!
রঘুপতি। অন্যথা হবে না কভু।
নক্ষত্ররায়। অন্যথা হবে না?
দেখো প্রভু, কথা যেন ঠিক থাকে শেষে।
রাজা হয়ে মন্ত্রীটারে দেব দূর করে,
সর্বদাই দৃষ্টি তার রয়েছে পড়িয়া
আমা-'পরে, যেন সে বাপের পিতামহ।
বড়ো ভয় করি তারে— বুঝেছ ঠাকুর?
তোমারে করিব মন্ত্রী।
রঘুপতি মন্ত্রিত্বের পদে
পদাঘাত করি আমি।
নক্ষত্ররায়। আচ্ছা, জয়সিংহ
মন্ত্রী হবে। কিন্তু, হে ঠাকুর, সবই যদি
জানো তুমি, বলো দেখি কবে রাজা হব।
রঘুপতি। রাজরক্ত চান দেবী।
নক্ষত্ররায়। রাজরক্ত চান!
রঘুপতি। রাজরক্ত আগে আনো, পরে রাজা হবে।

নক্ষত্ররায়। পাব কোথা!
রঘুপতি। ঘরে আছে গোবিন্দমাণিক্য।
তাঁরি রক্ত চাই।
নক্ষত্ররায়। তাঁরি রক্ত চাই!
রঘুপতি। স্থির
হয়ে থাকো জয়সিংহ, হোয়ো না চঞ্চল।—
বুঝেছ কি? শোনো তবে— গোপনে তাঁহারে
বধ ক'রে, আনিবে সে তপ্ত রাজরক্ত
দেবীর চরণে।—
জয়সিংহ, স্থির যদি
না থাকিতে পারো, চলে যাও অন্য ঠাঁই।—
বুঝেছ নক্ষত্ররায়? দেবীর আদেশ,
রাজরক্ত চাই— শ্রাবণের শেষ রাত্রে।
তোমরা রয়েছ দুই রাজভ্রাতা— জ্যেষ্ঠ
যদি অব্যাহতি পায়, তোমার শোণিত
আছে। তৃষিত হয়েছে যবে মহাকালী,
তখন সময় আর নাই বিচারের।
নক্ষত্ররায়। সর্বনাশ! হে ঠাকুর, কাজ কী রাজত্বে!
রাজরক্ত থাক্ রাজদেহে, আমি যাহা
আছি সেই ভালো।
রঘুপতি। মুক্তি নাই, মুক্তি নাই
কিছুতেই! রাজরক্ত আনিতেই হবে!
নক্ষত্ররায়। বলে দাও, হে ঠাকুর, কী করিতে হবে।
রঘুপতি। প্রস্তুত হইয়া থাকো। যখন যা বলি
অবিলম্বে করিবে সাধন; কার্যসিদ্ধি
যতদিন নাহি হয়, বন্ধ রেখো মুখ।
এখন বিদায় হও।
নক্ষত্ররায়। হে মা কাত্যায়নী!

[প্রস্থান

জয়সিংহ। একি শুনিলাম! দয়াময়ী মাতঃ, একি
কথা! তোর আজ্ঞা! ভাই দিয়ে ভ্রাতৃহত্যা!
বিশ্বের জননী!— গুরুদেব! হেন আজ্ঞা
মাতৃ-আজ্ঞা ব'লে করিলে প্রচার! ...
রঘুপতি। বন্ধ হোক বলিদান
তবে।
জয়সিংহ। হোক বন্ধ।— না না গুরুদেব, তুমি
জানো ভালোমন্দ। সরল ভক্তের বিধি

শাস্ত্রবিধি নহে। আপন আলোকে আঁখি
দেখিতে না পায়, আলোক আকাশ হতে
আসে। প্রভু, ক্ষমা করো, ক্ষমা করো দাসে;
ক্ষমা করো স্পর্ধা মূঢ়তার। ক্ষমা করো
নিতান্ত বেদনাবশে উদ্‌ভ্রান্ত প্রলাপ।
বলো প্রভু, সত্যই কি রাজরক্ত চান
মহাদেবী?

রঘুপতি। হায় বৎস, হায়! অবশেষে
অবিশ্বাস মোর প্রতি?

জয়সিংহ। অবিশ্বাস! কভু
নহে। তোমারে ছাড়িলে, বিশ্বাস আমার
দাঁড়াবে কোথায়? বাসুকির শিরশ্চ্যুত
বসুধার মতো, শূন্য হতে শূন্যে পাবে
লোপ। রাজরক্ত চায় তবে মহামায়া,
সে রক্ত আনিব আমি। দিব না ঘটিতে
ভ্রাতৃহত্যা।

রঘুপতি। দেবতার আজ্ঞা পাপ নহে।

জয়সিংহ। পুণ্য তবে, আমিই সে করিব অর্জন।

রঘুপতি। সত্য করে বলি, বৎস, তবে। তোরে আমি
ভালোবাসি প্রাণের অধিক— পালিয়াছি
শিশুকাল হতে তোরে, মায়ের অধিক
স্নেহে— তোরে আমি নারিব হারাতে।

জয়সিংহ। মোর
স্নেহে ঘটিতে দিব না পাপ, অভিশাপ
আনিব না এ স্নেহের 'পরে।

রঘুপতি। ভালো ভালো,
সে কথা হইবে পরে— কল্য হবে স্থির।

[উভয়ের প্রস্থান

চাঁদপাল ও গোবিন্দমাণিক্যের প্রবেশ

চাঁদপাল। মহারাজ, সাবধানে থেকো। চারি দিকে
চক্ষুকর্ণ পেতে আছি, রাজ-ইষ্টানিষ্ট
কিছু না এড়ায় মোর কাছে। মহারাজ,
তব প্রাণহত্যা-তরে গুপ্ত আলোচনা
স্বকর্ণে শুনেছি।

গোবিন্দ। প্রাণহত্যা! কে করিবে?

চাঁদপাল। বলিতে সংকোচ মানি। ভয় হয়, পাছে

সত্যকার ছুরি চেয়ে নিষ্ঠুর সংবাদ
অধিক আঘাত করে রাজার হৃদয়ে।
গোবিন্দ। অসংকোচে বলে যাও। রাজার হৃদয়
সতত প্রস্তুত থাকে আঘাত সহিতে।
কে করেছে হেন পরামর্শ?
চাঁদপাল। যুবরাজ
নক্ষত্ররায়।
গোবিন্দ। নক্ষত্র!
চাঁদপাল। স্বকর্ণে শুনেছি
মহারাজ, রঘুপতি যুবরাজে মিলে
গোপনে মন্দিরে বসে স্থির হয়ে গেছে
সব কথা।
গোবিন্দ। দুই দণ্ডে স্থির হয়ে গেল
আজন্মের বন্ধন টুটিতে! হায় বিধি!
চাঁদপাল। দেবতার কাছে তব রক্ত এনে দেবে—
গোবিন্দ। দেবতার কাছে! তবে আর নক্ষত্রের
নাই দোষ। জানিয়াছি, দেবতার নামে
মনুষ্যত্ব হারায় মানুষ। ভয় নাই,
যাও তুমি কাজে। সাবধানে রব আমি। [চাঁদপালের প্রস্থান

রক্ত নহে ফুল আনিয়াছি মহাদেবী!
ভক্তি শুধু— হিংসা নহে, বিভীষিকা নহে।
এ জগতে দুর্বলেরা বড়ো অসহায়
মা জননী, বাহুবল বড়োই নিষ্ঠুর,
স্বার্থ বড়ো ক্রূর, লোভ বড়ো নিদারুণ,
অজ্ঞান একান্ত অন্ধ— গর্ব চলে যায়
অকাতরে ক্ষুদ্রেরে দলিয়া পদতলে।
হেথা স্নেহ-প্রেম অতি ক্ষীণ বৃন্তে থাকে,
পলকে খসিয়া পড়ে স্বার্থের পরশে।
তুমিও জননী, যদি খড়্গ উঠাইলে,
মেলিলে রসনা, তবে সব অন্ধকার!
ভাই তাই ভাই নহে আর, পতি প্রতি
সতী বাম, বন্ধু শত্রু, শোণিতে পঙ্কিল
মানবের বাসগৃহ, হিংসা পুণ্য, দয়া
নির্বাসিত। আর নহে, আর নহে, ছাড়ো
ছদ্মবেশ। এখনো কি হয় নি সময়?
এখনো কি রহিবে প্রলয়রূপ তব?
এই-যে উঠিছে খড়্গ চারি দিক হতে

মোর শির লক্ষ্য করি, মাতঃ, এ কি তোরি
চারি ভুজ হতে? তাই হবে! তবে তাই
হোক। বুঝি মোর রক্তপাতে হিংসানল
নিবে যাবে। ধরণীর সহিবে না এত
হিংসা। রাজহত্যা! ভাই দিয়ে ভ্রাতৃহত্যা!
সমস্ত প্রজার বুকে লাগিবে বেদনা,
সমস্ত ভায়ের প্রাণ উঠিবে কাঁদিয়া।
মোর রক্তে হিংসার ঘুচিবে মাতৃবেশ,
প্রকাশিবে রাক্ষসী-আকার। এই যদি
দয়ার বিধান তোর, তবে তাই হোক!

জয়সিংহের প্রবেশ

জয়সিংহ। বল্ চণ্ডী, সত্যই কি রাজরক্ত চাই?
এই বেলা বল্, বল্ নিজমুখে, বল্
মানবভাষায় বল্ শীঘ্র— সত্যই কি
রাজরক্ত চাই?
নেপথ্যে। চাই।
জয়সিংহ। তবে মহারাজ,
নাম লহো ইষ্টদেবতার। কাল তব
নিকটে এসেছে।
গোবিন্দ। কী হয়েছে জয়সিংহ?
জয়সিংহ। শুনিলে না নিজকর্ণে? দেবীরে শুধানু
সত্যই কি রাজরক্ত চাই— দেবী নিজে
কহিলেন 'চাই'।
গোবিন্দ। দেবী নহে জয়সিংহ,
কহিলেন রঘুপতি অন্তরাল হতে,
পরিচিত স্বর।
জয়সিংহ। কহিলেন রঘুপতি!
অন্তরাল হতে?— নহে নহে, আর নহে!
কেবলই সংশয় হতে সংশয়ের মাঝে
নামিতে পারি নে আর! যখনি কূলের
কাছে আসি, কে মোরে ঠেলিয়া দেয় যেন
অতলের মাঝে! সে যে অবিশ্বাসদৈত্য!
আর নহে! গুরু হোক কিংবা দেবী হোক,
একই কথা।—

ছুরিকা উন্মোচন। ... ছুরি ফেলিয়া

ফুল নে মা। নে মা! ফুল নে মা!

পায়ে ধরি, শুধু ফুল নিয়ে হোক তোর
পরিতোষ! আর রক্ত না মা, আর রক্ত
নয়! এও যে রক্তের মতো রাঙা, দুটি
জবাফুল! পৃথিবীর মাতৃবক্ষ ফেটে
উঠিয়াছে ফুটে, সন্তানের রক্তপাতে
ব্যথিত ধরার স্নেহবেদনার মতো।
নিতে হবে! এই নিতে হবে! আমি
নাহি ডরি তোর রোষ। রক্ত নাহি দিব।
রাঙা তোর আঁখি! তোল্ তোর খড়্গ! আন্
তোর শ্মশানের দল! আমি নাহি ডরি।

[গোবিন্দমাণিক্যের প্রস্থান

এ কী হল হায়! দেবী গুরু যাহা ছিল
এক দণ্ডে বিসর্জন দিনু— বিশ্বমাঝে
কিছু রহিল না আর!

রঘুপতির প্রবেশ

রঘুপতি। সকল শুনেছি
আমি। সব পণ্ড হল। কী করিলি, ওরে
অকৃতজ্ঞ!
জয়সিংহ। দণ্ড দাও প্রভু!
রঘুপতি। সব ভেঙে
দিলি? ব্রহ্মশাপ ফিরাইলি অর্ধপথ
হতে! লঙ্ঘিলি গুরুর বাক্য! ব্যর্থ করে
দিলি দেবীর আদেশ! আপন বুদ্ধিরে
করিলি সকল হতে বড়ো! আজন্মের
স্নেহঋণ শুধিলি এমনি করে!
জয়সিংহ। দণ্ড
দাও পিতা!
রঘুপতি। কোন্ দণ্ড দিব?
জয়সিংহ। প্রাণদণ্ড।
রঘুপতি। নহে। তার চেয়ে গুরুদণ্ড চাই। স্পর্শ
কর্ দেবীর চরণ।
জয়সিংহ। করিনু পরশ।
রঘুপতি। বল্ তবে, 'আমি এনে দিব রাজরক্ত
শ্রাবণের শেষ রাত্রে দেবীর চরণে।'
জয়সিংহ। আমি এনে দিব রাজরক্ত, শ্রাবণের
শেষ রাত্রে দেবীর চরণে।
রঘুপতি। চলে যাও।

চতুর্থ দৃশ্য

মন্দির। বাহিরে ঝড়

রঘুপতি

পূজোপকরণ লইয়া

রঘুপতি। এতদিনে আজ বুঝি জাগিয়াছ দেবী!
ওই রোষহুহুংকার! অভিশাপ হাঁকি
নগরের 'পর দিয়া ধেয়ে চলিয়াছ।
তিমিররূপিণী!— ওই বুঝি তোর
প্রলয়সঙ্গিনীগণ দারুণ ক্ষুধায়
প্রাণপণে নাড়া দেয় বিশ্বমহাতরু!
আজ মিটাইব তোর দীর্ঘ উপবাস।
ভক্তেরে সংশয়ে ফেলি এতদিন ছিলি
কোথা দেবী? তোর খড়্গ তুই না তুলিলে
আমরা কি পারি? আজ কী আনন্দ তোর
চণ্ডীমূর্তি দেখে! সাহসে ভরেছে চিত্ত,
সংশয় গিয়েছে, হতমান নতশির
উঠেছে নূতন তেজে। ওই পদধ্বনি
শুনা যায়, ওই আসে তোর পূজা!
জয় মহাদেবী! ...
জয়সিংহ যদি নাই আসে! কভু নহে।
সত্যভঙ্গ কভু নাহি হবে তার— জয়
মহাকালী, সিদ্ধিদাত্রী, জয় ভয়ংকরী!—
যদি বাধা পায়— যদি ধরা পড়ে শেষে—
যদি প্রাণ যায় তার প্রহরীর হাতে—
জয় মা অভয়া, জয় ভক্তের সহায়!
জয় মা জাগ্রত দেবী, জয় সর্বজয়া!
ভক্তবৎসলার যেন দুর্নাম না রটে
এ সংসারে, শত্রুপক্ষ নাহি হাসে যেন
নিঃশঙ্ক কৌতুকে। মাতৃ-অহংকার যদি
চূর্ণ হয় সন্তানের, মা বলিয়া তবে
কেহ ডাকিবে না তোরে। ওই পদধ্বনি!
জয়সিংহ বটে! জয় নৃমুণ্ডমালিনী,
পাষণ্ডদলনী মহাশক্তি!

জয়সিংহের দ্রুত প্রবেশ

জয়সিংহ,
রাজরক্ত কই?
জয়সিংহ। আছে আছে। ছাড়ো মোরে।
নিজে আমি করি নিবেদন।— রাজরক্ত
চাই তোর, দয়াময়ী, জগৎপালিনী
মাতা? নহিলে কিছুতে তোর মিটিবে না
তৃষা! আমি রাজপুত, পূর্বপিতামহ
ছিল রাজা, এখনো রাজত্ব করে মোর
মাতামহবংশ— রাজরক্ত আছে দেহে।
এই রক্ত দিব। এই যেন শেষ রক্ত
হয় মাতা, এই রক্তে শেষ মিটে যেন
অনন্ত পিপাসা তোর, রক্তভৃষাতুরা!

বক্ষে ছুরি-বিন্ধন

রঘুপতি। জয়সিংহ! জয়সিংহ! নির্দয়! নিষ্ঠুর!
এ কী সর্বনাশ করিলি রে! জয়সিংহ,
অকৃতজ্ঞ, গুরুদ্রোহী, পিতৃমর্মঘাতী,
স্বেচ্ছাচারী! জয়সিংহ, কুলিশকঠিন!
ওরে জয়সিংহ, মোর একমাত্র প্রাণ,
প্রাণাধিক, জীবন-মন্থন-করা ধন!
জয়সিংহ, বৎস মোর, হে গুরুবৎসল!
ফিরে আয়, ফিরে আয়, তোরে ছাড়া আর
কিছু নাহি চাহি! অহংকার অভিমান
দেবতা ব্রাহ্মণ সব যাক! তুই আয়!

প্রতিমার পদতলে মাথা রাখিয়া

ফিরে দে, ফিরে দে, ফিরে দে, ফিরে দে!

উপন্যাস ও গল্প

ইঁদুরের ভোজ

ছেলেরা বললে, ভারি অন্যায়, আমরা নতুন পণ্ডিতের কাছে কিছুতেই পড়ব না।

নতুন পণ্ডিতমশায় যিনি আসছেন তাঁর নাম কালীকুমার তর্কালংকার।

ছুটির পরে ছেলেরা রেলগাড়িতে যে যার বাড়ি থেকে ফিরে আসছে ইস্কুলে। ওদের মধ্যে একজন রসিক ছেলে কালো কুমড়োর বলিদান বলে একটা ছড়া বানিয়েছে, সেইটে সকলে মিলে চীৎকার শব্দে আওড়াচ্ছে। এমন সময় আড়খোলা ইস্টেশন থেকে গাড়িতে উঠলেন একজন বুড়ো ভদ্রলোক। সঙ্গে আছে তাঁর কাঁথায় মোড়া বিছানা। ন্যাকড়া দিয়ে মুখ বন্ধ করা দু-তিনটে হাঁড়ি, একটা টিনের ট্রাঙ্ক, আর কিছু পুঁটুলি। একটা ষণ্ডা-গোছের ছেলে, তাকে ডাকে সবাই বিচকুন ব'লে, সে চেঁচিয়ে উঠল— এখানে জায়গা হবে না বুড়ঢা, যাও দুসরা গাড়িতে।

বুড়ো বললেন, বড়ো ভিড়, কোথাও জায়গা নেই, আমি এই কোণটুকুতে থাকব, তোমাদের কোনো অসুবিধা হবে না। ব'লে ওদের বেঞ্চি ছেড়ে দিয়ে নিজে এক কোণে মেঝের উপর বিছানা পেতে বসলেন।

ছেলেদের জিজ্ঞাসা করলেন, বাবা, তোমরা কোথায় যাচ্ছ, কী করতে।

বিচকুন বলে উঠল, শ্রাদ্ধ করতে। বুড়ো জিজ্ঞাসা করলেন, কার শ্রাদ্ধ? উত্তরে শুনলেন, কালো কুমড়ো টাটকা লঙ্কার। ছেলেগুলো সব সুর করে চেঁচিয়ে উঠল—

কালো কুমড়ো টাটকা লঙ্কা
দেখিয়ে দেব লবোডঙ্কা।

আসানসোলে গাড়ি এসে থামল, বুড়ো মানুষটি নেবে গেলেন, সেখানে স্নান করে নেবেন। স্নান সেরে গাড়িতে ফিরতেই বিচকুন বললে, এ গাড়িতে থাকবেন না মশায়।

কেন বলো তো।

ভারি ইঁদুরের উৎপাত।

ইঁদুরের? সে কী কথা।

দেখুন-না আপনার ঐ হাঁড়ির মধ্যে ঢুকে কী কাণ্ড করেছিল।

ভদ্রলোক দেখলেন তাঁর যে হাঁড়িতে কদমা ছিল সে হাঁড়ি ফাঁকা। আর যেটাতে ছিল খইচুর তার একটা দানাও বাকি নেই।

বিচকুন বললে, আর আপনার ন্যাকড়াতে কী একটা বাঁধা ছিল সেটা সুদ্ধ নিয়ে দৌড় দিয়েছে।

সেটাতে ছিল ওঁর বাগানের গুটি-পাঁচেক পাকা আম।

ভদ্রলোক একটু হেসে বললেন, আহা, ইঁদুরের অত্যন্ত ক্ষিদে পেয়েছে দেখছি।

বিচকুন বললে, না না, ও জাতটাই ওরকম, ক্ষিদে না পেলেও খায়।

ছেলেগুলো চীৎকার করে হেসে উঠল, বললে, হাঁ মশায়, আরো থাকলে আরো খেত।

ভদ্রলোক বললেন, ভুল হয়েছে, গাড়িতে এত ইঁদুর একসঙ্গে যাবে জানলে আরো কিছু আনতুম।

এত উৎপাতেও বুড়ো রাগ করলে না দেখে ছেলেরা দমে গেল— রাগলে মজা হত।

বর্ধমানে এসে গাড়ি থামল। ঘণ্টাখানেক থামবে। অন্য লাইনে গাড়ি বদল করতে হবে। ভদ্রলোকটি বললেন, বাবা, এবারে তোমাদের কষ্ট দেব না, অন্য কামরায় জায়গা হবে।

না না, সে হবে না, আমাদের গাড়িতেই উঠতে হবে। আপনার পুঁটুলিতে যদি কিছু বাকি থাকে আমরা সবাই মিলে পাহারা দেব, কিছুই নষ্ট হবে না।

ভদ্রলোক বললেন, আচ্ছা বাবা, তোমরা গাড়িতে ওঠো, আমি আসছি।

ছেলেরা তো উঠল গাড়িতে। একটু বাদেই মিঠাইওয়ালার ঠেলাগাড়ি ওদের কামরার সামনে এসে দাঁড়ালো, সেইসঙ্গে ভদ্রলোক।

এক-এক ঠোঙা এক-একজনের হাতে দিয়ে বললেন, এবারে ইঁদুরের ভোজে অনটন হবে না।

ছেলেগুলো হুর্‌রে ব'লে লাফালাফি করতে লাগল। আমের ঝুড়ি নিয়ে আমওয়ালা এল— ভোজে আমও বাদ গেল না।

ছেলেরা তাঁকে বললে, আপনি কী করতে কোথায় যাচ্ছেন বলুন।

তিনি বললেন, আমি কাজ খুঁজতে চলেছি, যেখানে কাজ পাব সেখানেই নেবে পড়ব।

ওরা জিজ্ঞাসা করলে, কী কাজ আপনি করেন?

তিনি বললেন, আমি টুলো পণ্ডিত, সংস্কৃত পড়াই।

ওরা সবাই হাততালি দিয়ে উঠল; বললে, তা হলে আমাদের ইস্কুলে আসুন।

তোমাদের কর্তারা আমাকে রাখবেন কেন?

রাখতেই হবে। কালো কুমড়ো টাটকা লঙ্কাকে আমরা পাড়ায় ঢুকতেই দেব না।

মুশকিলে ফেললে দেখছি! যদি সেক্রেটারিবাবু আমাকে পছন্দ না করেন?

পছন্দ করতেই হবে— না করলে আমরা সবাই ইস্কুল ছেড়ে চলে যাব।

আচ্ছা বাবা, তোমরা আমাকে তবে নিয়ে চলো।

গাড়ি এসে পৌঁছল স্টেশনে। সেখানে স্বয়ং সেক্রেটারিবাবু উপস্থিত। বৃদ্ধ লোকটিকে দেখে বললেন, আসুন, আসুন তর্কালংকার মশায়! আপনার বাসা প্রস্তুত আছে।

ব'লে পায়ের ধুলো নিয়ে প্রণাম করলেন।

প্রবন্ধ

শিক্ষা

সংযোজন

শিক্ষা

স্ত্রীশিক্ষা

আমরা শ্রীমতী লীলা মিত্রের কাছ হইতে স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে একখানি চিঠি পাইয়াছি, তাহা আলোচনা করিয়া দেখিবার যোগ্য। চিঠিখানি এই—

এক দল লোক বলেন, স্ত্রীশিক্ষার প্রয়োজন নাই, কারণ স্ত্রীলোক শিক্ষিতা হইলে পুরুষের নানা বিষয়ে নানা অসুবিধা। শিক্ষিতা স্ত্রী স্বামীকে দেবতা বলিয়া মনে করে না, স্বামীসেবায় তার তেমন মন থাকে না, পড়াশুনা লইয়াই সে ব্যস্ত ইত্যাদি।

আবার আর-এক দল বলেন, স্ত্রীশিক্ষার প্রয়োজন খুবই আছে, কেননা আমরা পুরুষরা শিক্ষিত, আমরা যাহাদের লইয়া ঘরসংসার করিব তাহারা যদি আমাদের ভাব চিন্তা আশা আকাঙ্ক্ষা বুঝিতেই না পারে তবে আমাদের পারিবারিক সুখের ব্যাঘাত হইবে ইত্যাদি।

দুই দলই নিজেদের দিক হইতে স্ত্রীশিক্ষার বিচার করিতেছেন। নারীর যে পুরুষের মতো ব্যক্তিত্ব আছে, সে যে অন্যের জন্য সৃষ্ট নয়, তাহার নিজের জীবনের যে সার্থকতা আছে, তাহা স্ত্রীশিক্ষার স্বপক্ষের বা বিপক্ষের কোনো উকিল স্বীকার করেন না। উকিলরা যে পক্ষ লইয়াছেন বস্তুত তাহা তাঁহাদের নিজেরই পক্ষ। মামলার নিষ্পত্তিতে যাঁহাদের প্রকৃত স্বার্থ তাঁহাদের কথা কাহারো মনে উদয় হয় না, এইটেই আশ্চর্য।

বিদ্যা যদি মনুষ্যত্বলাভের উপায় হয় এবং বিদ্যালাভে যদি মানবমাত্রেরই সহজাত অধিকার থাকে তবে নারীকে কোন্ নীতির দোহাই দিয়া সে অধিকার হইতে বঞ্চিত করা যাইতে পারে বুঝিতে পারি না।

আবার, যাঁরা স্ত্রীলোককে তাঁহাদের নিজের জন্যই সৃষ্ট বলিয়া স্থির করিয়া বসিয়াছেন, তাঁরা যেটুকু বিদ্যা স্ত্রীর জন্য উচ্ছিষ্ট রাখিতে চান তাহা হইতে স্ত্রীলোকের মনুষ্যত্বের যথোচিত পুষ্টি আশা করা বাতুলতা।

যাঁহারা শিক্ষাদানে স্ত্রী-পুরুষ উভয়কেই সমভাবে সাহায্য করিতে প্রস্তুত তাঁহারা সাধারণ পুরুষের পঙ্‌ক্তিতে পড়েন না; তাঁহাদের আসন অনেক উচ্চে, সুতরাং তাঁহাদের কথা ছাড়িয়া দেওয়াই উচিত।

অতএব, গরজ যাঁহাদের তাঁহাদিগকেই কার্যক্ষেত্রে নামিতে হইবে। নিজের উদ্যমে ও শক্তিতে নিজেকে মুক্ত না করিলে অন্যে মুক্তি দিতে পারে না। অন্যে যেটাকে মুক্তি বলিয়া উপস্থিত করে সেটা বন্ধনেরই অন্য মূর্তি। পুরুষ যে স্ত্রীশিক্ষার ছাঁচ গড়িয়াছে সেটা পুরুষের খেলার যোগ্য পুতুল গড়িবার ছাঁচ।

কিন্তু যিনি এ কার্যে অবতীর্ণা হইবেন তাঁহাকে সাধারণ স্ত্রীলোকের মতো গতানুগতিক হইলে চলিবে না। সংসারের লোকে যাহাকে সুখ বলে সেটাকে তিনি আদর্শ করিবেন না। এ কথা তাঁহাকে মনে রাখিতে হইবে, সন্তান গর্ভে ধারণ করাই তাঁহার চরম সার্থকতা নয়। তিনি পুরুষের

আশ্রিতা, লজ্জাভয়ে লীনাঙ্গিনী, সামান্য ললনা নহেন ; তিনি তাহার সংকটে সহায়, দুরূহ চিন্তায় অংশী এবং সুখে দুঃখে সহচরী হইয়া সংসারপথে তাহার প্রকৃত সহযাত্রী হইবেন।—

এই চিঠির মূল কথাটা আমি মানি। যাহা-কিছু জানিবার যোগ্য তাহাই বিদ্যা, তাহা পুরুষকেও জানিতে হইবে, মেয়েকেও জানিতে হইবে— শুধু কাজে খাটাইবার জন্য যে তাহা নয়, জানিবার জন্যই।

মানুষ জানিতে চায়, সেটা তার ধর্ম ; এইজন্য জগতের আবশ্যক অনাবশ্যক সকল তত্ত্বই তার কাছে বিদ্যা হইয়া উঠিয়াছে। সেই তার জানিতে চাওয়াকে যদি খোরাক না জোগাই কিংবা তাকে কুপথ্য দিয়া ভুলাইয়া রাখি তবে তার মানবপ্রকৃতিকেই দুর্বল করি, এ কথা বলাই বাহুল্য।

কিন্তু, মানুষকে পুরা পরিমাণে মানুষ করিব এ কথা আমাদের সকলের অন্তরের কথা নয়। যখন সর্বসাধারণকে শিক্ষা দেওয়ার প্রস্তাব হয় তখন এক দল শিক্ষিত লোক বলিয়া থাকেন, তাহা হইলে আমরা চাকর পাইব কোথা হইতে? বোধ হয় শীঘ্রই এ সম্বন্ধে রসিক লোকে প্রহসন লিখিবেন যাহাতে দেখা যাইবে— বাবুর চাকর কবিতা লিখিতেছে কিংবা নক্ষত্রলোকের নাড়িনক্ষত্র গণনা করিবার জন্য বড়ো বড়ো অঙ্ক ফাঁদিয়া বসিয়াছে, বাবু তাহাকে ধুতি কোঁচাইবার জন্য ডাকিতে সাহস করিতেছেন না পাছে তার ধ্যানের ব্যাঘাত হয়। মেয়েদের সম্বন্ধেও সেই এক কথা যে, তারা যদি লেখাপড়া শেখে তবে যে ঝাঁটা বঁটি ও শিলনোড়া বাবুদের ভাগে পড়ে।

অথচ ইঁহাদের তর্কের যুক্তিটা এই যে, মেয়েদের প্রকৃতিই স্বতন্ত্র। কিন্তু তাই যদি হয় তবে তাঁহাদের ভয়টা কিসের? পৃথিবীকে আমরা চ্যাপ্‌টা ভাবি কিন্তু তাহা গোল, এ কথা জানিলে পুরুষের পৌরুষ কমে না। তেমনি, বাসুকির মাথার উপর পৃথিবী নাই এ খবরটা পাইলে মেয়েদের মেয়েলিভাব নষ্ট হইবে এ কথা যদি বলি তবে বুঝিতে হইবে, মেয়েরা মেয়েই নয়, আমরা তাহাদিগকে অজ্ঞানের ছাঁচে ঢালিয়া মেয়ে করিয়া গড়িয়া তুলিয়াছি।

বিধাতা একদিন পুরুষকে পুরুষ এবং মেয়েকে মেয়ে করিয়া সৃষ্টি করিলেন, এটা তাঁর একটা আশ্চর্য উদ্ভাবন, সে কথা কবি হইতে আরম্ভ করিয়া জীবতত্ত্ববিৎ সকলেই স্বীকার করেন। জীবলোকে এই যে একটা ভেদ ঘটিয়াছে এই ভেদের মুখ দিয়া একটা প্রবল শক্তি পরম আনন্দের উৎস উৎসারিত হইয়া উঠিয়াছে। ইস্কুল-মাস্টার কিংবা টেক্সট্‌বুক-কমিটি তাঁহাদের এক্সেসাইজের খাতা কিংবা পাঠ্য ও অপাঠ্য বইয়ের বোঝা দিয়া এই শক্তি এবং সৌন্দর্যপ্রবাহের মুখে বাঁধ বাঁধিয়া দিতে পারেন, এমন কথা আমি মানি না। মোটের উপর, বিধাতা এবং ইস্কুল-মাস্টার এই দুইয়ের মধ্যে আমি বিধাতাকে বেশি বিশ্বাস করি। সেইজন্য আমার ধারণা এই যে, মেয়েরা যদি- বা কান্ট-হেগেল্‌ও পড়ে তবু শিশুদের স্নেহ করিবে এবং পুরুষদের নিতান্ত দূর-ছাই করিবে না।

কিন্তু তাই বলিয়া শিক্ষাপ্রণালীতে মেয়ে পুরুষে কোথাও কোনো ভেদ থাকিবে না, এ কথা বলিলে বিধাতাকে অমান্য করা হয়। বিদ্যার দুটো বিভাগ আছে। একটা বিশুদ্ধ জ্ঞানের, একটা ব্যবহারের। যেখানে বিশুদ্ধ জ্ঞান সেখানে মেয়ে-পুরুষের পার্থক্য নাই, কিন্তু যেখানে ব্যবহার সেখানে পার্থক্য আছেই। মেয়েদের মানুষ হইতে শিখাইবার জন্য বিশুদ্ধ জ্ঞানের শিক্ষা চাই, কিন্তু তার উপরে মেয়েদের মেয়ে হইতে শিখাইবার জন্য যে ব্যবহারিক শিক্ষা তার একটা বিশেষত্ব আছে, এ কথা মানিতে দোষ কী?

মেয়েদের শরীরের এবং মনের প্রকৃতি পুরুষের হইতে স্বতন্ত্র বলিয়াই তাহাদের ব্যবহারের ক্ষেত্র স্বভাবতই স্বতন্ত্র হইয়াছে। আজকাল বিদ্রোহের ঝোঁকে এক দল মেয়ে এই গোড়াকার

কথাটাকেই অস্বীকার করিতেছেন। তাঁরা বলেন, মেয়েদের ব্যবহারের ক্ষেত্র পুরুষের সঙ্গে একেবারে সমান।

এটা তাঁদের নিতান্তই ক্ষোভের কথা। ক্ষোভের কারণ এই যে, পুরুষ আপন কর্মের পথ ধরিয়া জগতে নানা বিচিত্র ক্ষেত্রে কর্তৃত্ব লাভ করিয়াছে, কিন্তু মেয়েদের কর্ম যেখানে সেখানে অধিকাংশ বিষয়েই তাহাদিগকে দায়ে পড়িয়া পুরুষের অনুগত হইতে হইয়াছে। এই আনুগত্যকে তাঁরা অনিবার্য বলিয়া মনে করেন না।

তাঁরা বলেন, পুরুষ এতদিন কেবলমাত্র গায়ের জোরেই মেয়েদের কাঁধের উপর এই আনুগত্যটা চাপাইয়া দিয়াছে। জগতের সর্বত্রই এই কথাটা যদি এতদিন ধরিয়া সত্য হইয়া থাকে, যদি মেয়েদের প্রকৃতির বিরুদ্ধে পুরুষের শক্তি তাহাদিগকে সংসারের তলায় ফেলিয়া রাখিয়া থাকে তবে বলিতেই হইবে, দাসত্বই মেয়েদের পক্ষে স্বাভাবিক। দাসত্ব বলিতে এই বোঝায়, দায়ে পড়িয়া অনিচ্ছাসত্ত্বে পরের দায় বহন করা। যাদের পক্ষে এটা প্রকৃতিসিদ্ধ নয়, তারা বরঞ্চ মরে তবু এমন উৎপাত সহ্য করে না।

এতদিনের মানবের ইতিহাসে যদি এই কথাটাই সর্বদেশে সপ্রমাণ হইয়া থাকে যে দাসীত্ব মেয়েদের স্বাভাবিক, তবে পৃথিবীর সেই অর্ধেক মানুষের লজ্জায় সমস্ত পৃথিবী আজ মুখ তুলিতে পারিত না। কিন্তু আমি বলি, বিদ্রোহী মেয়েরা স্বজাতির বিরুদ্ধে এই যে অপবাদ ঘোষণা করিয়া বেড়াইতেছেন এটা সম্পূর্ণ মিথ্যা।

আসল কথা এই, স্ত্রী হওয়া, মা হওয়া, মেয়েদের স্বভাব ; দাসী হওয়া নয়। ভালোবাসার অংশ মেয়েদের স্বভাবে বেশি আছে— এ নহিলে সন্তান মানুষ হইত না, সংসার টিকিত না। স্নেহ আছে বলিয়াই মা সন্তানের সেবা করে, তার মধ্যে দায় নাই ; প্রেম আছে বলিয়াই স্ত্রী স্বামীর সেবা করে, তার মধ্যে দায় নাই।

কিন্তু দায় আসিয়া পড়ে যখন স্নেহপ্রেমের সম্বন্ধ স্বাভাবিক সম্বন্ধ না হয়। সকল স্বামীকেই সকল স্ত্রী যদি স্বভাবতই ভালোবাসিতে পারিত তাহা হইলে কথাই ছিল না, তাহা সম্ভবপর নহে। অথচ যতদিন সমাজ বলিয়া একটা পদার্থ আছে ততদিন মানুষকে অনেক বিষয়ে এবং অনেক পরিমাণে একটা নিয়ম মানিয়া চলিতেই হইবে।

কিন্তু, সেই নিয়ম সৃষ্টি করিবার সময় সমাজ ভিতরে ভিতরে স্বভাবেরই অনুসরণ করিতে থাকে। মেয়েদের সম্বন্ধে সমাজ আপনিই এটা ধরিয়া লইয়াছে যে, মেয়েদের পক্ষে ভালোবাসাটাই সহজ। তাই মেয়েদের সম্বন্ধে নিয়ম ভালোবাসার নিয়ম। সমাজ তাই মেয়েদের কাছে এই দাবি করে যে, তারা এমন করিয়া কাজ করিবে যেন তারা সংসারকে ভালোবাসিতেছে। বাপ মা ভাই বোন স্বামী ও ছেলেমেয়ের সেবা তারা করিবে। তাদের কাজ ভালোবাসার কাজ, এইটেই তাদের আদর্শ।

এইজন্য মেয়েদের সংসারে কোনো কারণে যেখানে তাদের ভালোবাসা নাই সেখানেও তাহাদিগকে সমাজ ভালোবাসার আদর্শেই বিচার করিয়া থাকে। যে স্বামীকে স্ত্রী ভালোবাসিতে পারে নাই তার সম্বন্ধেও তার ব্যবহারকে ভালোবাসার মাপকাঠিতেই মাপিতে হয়। সংসারকে সে ভালো বাসুক আর না বাসুক তার আচরণকে কষিয়া দেখিবার ঐ একটিমাত্র কষ্টিপাথর আছে, সেটা ভালোবাসার কষ্টিপাথর।

ভালোবাসার ধর্মই আত্মসমর্পণে, সুতরাং তার গৌরবও তাহাতেই। যেটাকে আনুগত্য বলিয়া লজ্জা করা হইতেছে সেটা লজ্জার বিষয় হয় যদি তাহাতে প্রীতি না থাকে, কেবলমাত্র দায় থাকে।

মেয়েরা আপনার স্বভাবের দ্বারাই সমাজে এমন একটা জায়গা পাইয়াছে যেখানে সংসারের কাছে তারা আত্মসমর্পণ করিতেছে। যদি কোনো কারণে সমাজের এমন অবস্থা ঘটে যাতে এই আত্মসমর্পণ ভালোবাসার আদর্শ হইতে বহুল পরিমাণে ভ্রষ্ট হইয়া থাকে, তবে তাহা মেয়েদের পক্ষে পীড়া ও অবমাননা।

মেয়েরা স্বভাবতই ভালোবাসে এবং একনিষ্ঠ আত্মসমর্পণের আদর্শকেই সামাজিক শিক্ষায় তাদের মনে বদ্ধমূল করিয়া দিয়াছে, এই সুবিধাটুকু ধরিয়া অনেক স্বার্থপর পুরুষ তাদের প্রতি অত্যাচার করে। যেখানে পুরুষ যথার্থ পৌরুষের আদর্শ হইতে ভ্রষ্ট সেখানে মেয়েরা আপন উচ্চ আদর্শের দ্বারাই পীড়িত ও বঞ্চিত হইতে থাকে, ইহার দৃষ্টান্ত আমাদের দেশে যত বেশি এমন আর-কোনো দেশে আছে কিনা আমি সন্দেহ করি। কিন্তু তাই বলিয়া এ কথাটাকে উড়াইয়া দেওয়া যায় না যে, সমাজে মেয়েরা যে ব্যবহারের ক্ষেত্রটি অধিকার করিয়াছে সেখানে স্বভাববশতই তারা আপনিই আসিয়া পৌঁছিয়াছে, বাহিরের কোনো অত্যাচার তাহাদিগকে বাধ্য করে নাই।

এ কথা মনে রাখিতে হইবে, সমাজে পুরুষের দাসত্ব মেয়েদের চেয়ে অল্প নহে, বরঞ্চ বেশি। এতকালের সভ্যতার সাধনার পরেও মানুষের সমাজ আজও দাসের হাতের খাটুনিতে চলিতেছে। এ সমাজে যথার্থ স্বাধীনতা অতি অল্প লোকেই ভোগ করে। রাজ্যতন্ত্রে বাণিজ্যতন্ত্রে এবং সমাজের সর্ববিভাগেই দাসের দল প্রাণপাত করিয়া সমাজ-জগন্নাথের প্রকাণ্ড রথ টানিয়া চলিতেছে। কোথায় লইয়া চলিতেছে তাহাও জানে না, কাহার রথ টানিতেছে তাহাও দেখিতে পায় না। সমস্ত জীবন দিনের পর দিন এমন দায় বহন করিতেছে যাহার মধ্যে প্রীতি নাই, সৌন্দর্য নাই। এই দাসত্বের বারো-আনা ভাগ পুরুষের কাঁধে চাপিয়াছে। মেয়েদের ভালোবাসার উপরই সমাজ ঝোঁক দিয়াছে এইজন্য মেয়েদের দায় ভালোবাসার দায়। পুরুষের শক্তির উপরই সমাজ ঝোঁক দিয়াছে, এইজন্য পুরুষের দায় শক্তির দায়। অবস্থাগতিকে সেই দায় এত অতিরিক্ত হইতে পারে যাহাতে ভালোবাসা উৎপীড়িত হয় ও শক্তি দুর্বল হইয়া পড়ে। তখন সমাজের সংস্কার আবশ্যক হয়। সেই সংস্কারের জন্য আজ সমস্ত মানবসমাজে বেদনা জাগিয়াছে। কিন্তু সংস্কার যতদূর পর্যন্ত যাক সৃষ্টির গোড়া পর্যন্ত গিয়া পৌঁছিবে না এবং শেষ পর্যন্ত কবির দল এই বলিয়া আনন্দ করিতে পারিবেন যে, পুরুষ পুরুষই থাকিবে, মেয়েরা মেয়ে থাকিয়া যাইবে বলিয়াই তার 'সংকটে সহায়, দুরূহ চিন্তায় অংশী এবং সুখে দুঃখে সহচরী হইয়া সংসারে তাহার প্রকৃত সহযাত্রী হইবেন'।

ভাদ্র-আশ্বিন ১৩২২

ছাত্রশাসনতন্ত্র

প্রেসিডেন্সি কলেজে ছাত্রদের সহিত কোনো কোনো য়ুরোপীয় অধ্যাপকের যে বিরোধ ঘটিয়াছে তাহা লইয়া কোনো কথা বলিতে সংকোচ বোধ করি। তার একটা কারণ, ব্যাপারটা দেখিতেও ভালো হয় নাই, শুনিতেও ভালো নয়। আর-একটা কারণ, ইংরেজ ও ভারতবাসীর সম্পর্কটার মধ্যে যেখানে কিছু ব্যথা আছে সেখানে নাড়া দিতে ইচ্ছা করে না।

কিন্তু কথাটাকে চাপা দিলে চলিবে না। চাপা থাকেও নাই, বাহির হইয়া পড়িয়াছে। মনে মনে বা কানে কানে বা মুখে মুখে সকলেই এর বিচার করিতেছে।

বিকৃতি ভিতরে জমিতে থাকিলে একদিন সে আর আপনাকে ধরিয়া রাখিতে পারে না। লাল হইয়া শেষকালে ফাটিয়া পড়ে। তখনকার মতো সেটা সুদৃশ্য নয়।

বাহিরে ফুটিয়া পড়াটাকেই দোষ দেওয়া বিশ্ববিধানকে দোষ দেওয়া ; এমনতরো অপবাদে বিশ্ববিধাতা কান দেন না। ভিতরে ভিতরে জমিতে দেওয়া লইয়াই আমাদের নালিশ চলে।

যাক, বাহির যখন হইয়াছেই তখন বিচার করিয়া কোনো-একটা জায়গায় শাস্তি না দিলে নয়। এইটেই সংকটের সময়। জিনিসটা ভদ্র রকমের নহে, এটা ঠিক। ইহার আক্রোশটা প্রকাশ করিব কার উপরে? প্রায় দেখা যায় সহজে যার উপরে জোর খাটে শাসনের ধাক্কাটা তারই উপরে পড়ে। ঘরের গৃহিণী যেখানে বউকে মারিতে ভয় পায় সেখানে ঝিকে মারিয়া কর্তব্য পালন করে।

বিচারসভা বসিয়াছে। ইতিমধ্যেই ছাত্রদের সম্বন্ধে শাসন কড়া করিবার জন্য কোনো মিশনারি কলেজের কর্তা কর্তৃপক্ষের নিকট আবদার প্রকাশ করিয়াছেন। কথাটা শুনিতেও হঠাৎ সংগত বোধ হয়। কারণ, ছাত্রেরা অধ্যাপকদের অসম্মান করিলে সেটা যে কেবল অপরাধ হয় তাহা নহে, সেটা অস্বাভাবিক হইয়া উঠে। যেখান হইতে আমরা জ্ঞান পাই, সেখানে আমাদের শ্রদ্ধা যাইবে, এটা মানবপ্রকৃতির ধর্ম। তাহার উল্টা দেখিলে বাহিরের শাসনে এই বিকৃতির প্রতিকার করিতে হইবে, সে কথা সকলেই স্বীকার করিবেন।

কিন্তু প্রতিকারের প্রণালী স্থির করিবার পূর্বে ভাবিয়া দেখা চাই, স্বভাব ওলটায় কিসে।

কাগজে দেখিতে পাই, অনেকে এই বলিয়া আক্ষেপ করিতেছেন যে, যে ভারতবর্ষে গুরুশিষ্যের সম্বন্ধ ধর্মসম্বন্ধ সেখানে এমনতরো ঘটনা বিশেষভাবে গর্হিত। শুধু গর্হিত এ কথা বলিয়া পার পাইব না, চিরকালীন এই সংস্কার অস্থিমজ্জার মধ্যে থাকা সত্ত্বেও ব্যবহারে তাহার ব্যতিক্রম ঘটিতেছে কেন এর একটা সত্য উত্তর বাহির করিতে হইবে।

বাংলাদেশের ছাত্রদের মনস্তত্ত্ব যে বিধাতার একটা খাপছাড়া খেয়াল একথা মানি না। ছেলেরা যে বয়সে কলেজে পড়ে সেটা একটা বয়ঃসন্ধির কাল। তখন শাসনের সীমানা হইতে স্বাধীনতার এলাকায় সে প্রথম পা বাড়াইয়াছে। এই স্বাধীনতা কেবল বাহিরের ব্যবহারগত নহে ; মনোরাজ্যেও সে ভাষার খাঁচা ছাড়িয়া ভাবের আকাশে ডানা মেলিতে শুরু করিয়াছে। তার মন প্রশ্ন করিবার, তর্ক করিবার, বিচার করিবার অধিকার প্রথম লাভ করিয়াছে। শরীর-মনের এই বয়ঃসন্ধিকালটিই বেদনাকাতরতায় ভরা। এই সময়েই অল্পমাত্র অপমান মর্মে গিয়া বিঁধিয়া থাকে এবং আভাসমাত্র প্রীতি জীবনকে সুধাময় করিয়া তোলে। এই সময়েই মানবসংস্রবের জোর তার 'পরে যতটা খাটে এমন আর-কোনো সময়েই নয়।

এই বয়সটাই মানুষের জীবন মানুষের সঙ্গপ্রভাবেই গড়িয়া উঠিবার পক্ষে সকলের চেয়ে অনুকূল, স্বভাবের এই সত্যটিকে সকল দেশের লোকেই মানিয়া লইয়াছে। এইজন্যই আমাদের দেশে বলে : প্রাপ্তে তু ষোড়শে বর্ষে পুত্রং মিত্রবদাচরেৎ। তার মানে এই বয়সেই ছেলে যেন বাপকে পুরাপুরি মানুষ বলিয়া বুঝিতে পারে, শাসনের কল বলিয়া নহে ; কেননা, মানুষ হইবার পক্ষে মানুষের সংস্রব এই বয়সেই দরকার। এইজন্যই সকল দেশেই য়ুনিভার্সিটিতে ছাত্ররা এমন একটুখানি সম্মানের পদ পাইয়া থাকে যাহাতে অধ্যাপকদের বিশেষ কাছে তারা আসিতে পারে এবং সে সুযোগে তাদের জীবনের 'পরে মানব-সংস্রবের হাত পড়িতে পায়। এই বয়সে ছাত্রগণ শিক্ষার উদ্যোগপর্ব শেষ করিয়া মনুষ্যত্বের সার জিনিসগুলিকে আত্মসাৎ করিবার পালা আরম্ভ করে ; এই কাজটি স্বাধীনতা ও আত্মসম্মান ছাড়া হইবার জো নাই। সেইজন্যই এই বয়সে আত্মসম্মানের সম্বন্ধে দরদ বড়ো বেশি হয়। চিবাইয়া খাইবার বয়স আসিলে বেশ একটু জানান

দিয়া দাঁত ওঠে, তেমনি মনুষ্যত্বলাভের যখন বয়স আসে তখন আত্মসম্মানবোধটা একটু ঘটা করিয়াই দেখা দেয়।

এই বয়ঃসন্ধির কালে ছাত্ররা মাঝে মাঝে এক-একটা হাঙ্গাম বাধাইয়া বসে। যেখানে ছাত্রদের সঙ্গে অধ্যাপকের সম্বন্ধ স্বাভাবিক সেখানে এই-সকল উৎপাতকে জোয়ারের জলের জঞ্জালের মতো ভাসিয়া যাইতে দেওয়া হয় ; কেননা, তাকে টানিয়া তুলিতে গেলেই সেটা বিশ্রী হইয়া উঠে।

বিধাতার নিয়ম অনুসারে বাঙালি ছাত্রদেরও এই বয়ঃসন্ধির কাল আসে, তখন তাহাদের মনোবৃত্তি যেমন এক দিকে আত্মশক্তির অভিমুখে মাটি ফুঁড়িয়া উঠিতে চায় তেমনি আর-এক দিকে যেখানে তারা কোনো মহত্ত্ব দেখে, যেখান হইতে তারা শ্রদ্ধা পায়, স্নান পায়, দরদ পায়, প্রাণের প্রেরণা পায়, সেখানে নিজেকে উৎসর্গ করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠে। মিশনরি কলেজের বিধাতা-পুরুষের বিধানে ঠিক এই বয়সেই তাহাদিগকে শাসনে পেষণে দলনে দমনে নির্জীব জড়পিণ্ড করিয়া তুলিবার জাঁতাকল বানাইয়া তোলা জগদ্‌বিধাতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ; ইহাই প্রকৃত নাস্তিকতা।

জেলখানার কয়েদি নিয়মের নড়চড় করিলে তাকে কড়া শাসন করিতে কারো বাধে না ; কেননা তাকে অপরাধী বলিয়াই দেখা হয়, মানুষ বলিয়া নয়। অপমানের কঠোরতায় মানুষের মনে কড়া পড়িয়া তাকে কেবলই অমানুষ করিতে থাকে, সে হিসাবটা কেহ করিতে চায় না ; কেননা, মানুষের দিক দিয়া তাকে হিসাব করাই হয় না। এইজন্য জেলখানার সর্দারি যে করে সে মানুষকে নয়, অপরাধীকেই সকলের চেয়ে বড়ো করিয়া দেখে।

সৈন্যদলাকে তৈরি করিয়া তুলিবার ভার যে লইয়াছে সে মানুষকে একটিমাত্র সংকীর্ণ প্রয়োজনের দিক হইতেই দেখিতে বাধ্য। লড়াইয়ের নিখুঁত কল বানাইবার ফরমাস তার উপরে সুতরাং, সেই কলের হিসাবে যে-কিছু ত্রুটি সেইটে সে একান্ত করিয়া দেখে এবং নির্মমভাবে সংশোধন করে।

কিন্তু ছাত্রকে জেলের কয়েদি বা ফৌজের সিপাই বলিয়া আমরা তো মনে ভাবিতে পারি না আমরা জানি, তাহাদিগকে মানুষ করিয়া তুলিতে হইবে। মানুষের প্রকৃতি সূক্ষ্ম এবং সজীব তন্তুজালে বড়ো বিচিত্র করিয়া গড়া। এইজন্যই মানুষের মাথা ধরিলে মাথায় মুগুর মারিয়া সেটা সারানো যায় না ; অনেক দিক বাঁচাইয়া প্রকৃতির সাধ্যসাধনা করিয়া তার চিকিৎসা করিতে হয় এমন লোকও আছে এ সম্বন্ধে যারা বিজ্ঞানকে খুবই সহজ করিয়া আনিয়াছে ; তারা সকল ব্যাধিরই একটিমাত্র কারণ ঠিক করিয়া রাখিয়াছে, সে ভূতে পাওয়া। এবং তারা মিশনরি কলেজের ওঝাটির মতো ব্যাধির ভূতকে মারিয়া ঝাড়িয়া, গরম লোহার ছ্যাঁকা দিয়া চীৎকার করিয়া তাড়াইতে চায়। তাহাতে ব্যাধি যায়। এবং প্রাণপদার্থের প্রায় পনেরো আনা তার অনুসরণ করে।

এ হইল আনাড়ির চিকিৎসা। যারা বিচক্ষণ তারা ব্যাধিটাকেই স্বতন্ত্র করিয়া দেখে না ; চিকিৎসার সময় তারা মানুষের সমস্ত ধাতটাকে অখণ্ড করিয়া দেখে ; মানবপ্রকৃতির জটিলতা ও সূক্ষ্মতাকে তারা মানিয়া লয় এবং বিশেষ কোনো ব্যাধিকে শাসন করিতে গিয়া সমস্ত মানুষকে নিকাশ করিয়া বসে না।

অতএব যাদের উচিত ছিল জেলের দারোগা বা ড্রিল সার্জেন্ট্ বা ভূতের ওঝা হওয়া তাদের কোনোমতেই উচিত হয় না ছাত্রদিগকে মানুষ করিবার ভার লওয়া। ছাত্রদের ভার তাঁরাই লইবার অধিকারী যাঁরা নিজের চেয়ে বয়সে অল্প, জ্ঞানে অপ্রবীণ ও ক্ষমতায় দুর্বলকেও সহজেই শ্রদ্ধা

করিতে পারেন ; যাঁরা জানেন, শক্তস্য ভূষণং ক্ষমা ; যাঁরা ছাত্রকেও মিত্র বলিয়া গ্রহণ করিতে কুণ্ঠিত হন না।

যিশুখৃস্ট বলিয়াছেন, 'শিশুদিগকে আমার কাছে আসিতে দাও।' তিনি শিশুদিগকে বিশেষ করিয়া শ্রদ্ধা করিয়াছেন। কেননা, শিশুদের মধ্যেই পরিপূর্ণতার ব্যঞ্জনা আছে। যে মানুষ বয়সে পাকা হইয়া অভ্যাসে সংস্কারে ও অহমিকায় কঠিন হইয়া গেছে সে মানুষ সেই পূর্ণতার ব্যঞ্জনা হারাইয়াছে ; বিশ্বগুরুর কাছে আসা তার পক্ষেই বড়ো কঠিন।

ছাত্রেরা গড়িয়া উঠিতেছে ; ভাবের আলোকে, রসের বর্ষণে তাদের প্রাণকোরকের গোপন মর্মস্থলে বিকাশবেদনা কাজ করিতেছে। প্রকাশ তাদের মধ্যে থামিয়া যায় নাই ; তাদের মধ্যে পরিপূর্ণতার ব্যঞ্জনা। সেইজন্যই, সংগুরু ইহাদিগকে শ্রদ্ধা করেন, প্রেমের সহিত কাছে আহ্বান করেন, ক্ষমার সহিত ইহাদের অপরাধ মার্জনা করেন এবং ধৈর্যের সহিত ইহাদের চিত্তবৃত্তিকে ঊর্ধ্বের দিকে উদ্‌ঘাটন করিতে থাকেন। ইহাদের মধ্যে পূর্ণমনুষ্যত্বের মহিমা প্রভাতের অরুণরেখার মতো অসীম সম্ভাব্যতার গৌরবে উজ্জ্বল ; সেই গৌরবের দীপ্তি যাদের চোখে পড়ে না, যারা নিজের বিদ্যা পদ বা জাতির অভিমানে ইহাদিগকে পদে পদে অবজ্ঞা করিতে উদ্যত, তারা গুরুপদের অযোগ্য। ছাত্রদিগকে যারা স্বভাবতই শ্রদ্ধা করিতে না পারে ছাত্রদের নিকট হইতে ভক্তি তারা সহজে পাইতে পারিবে না। কাজেই ভক্তি জোর করিয়া আদায় করিবার জন্য তারাই রাজদরবারে কড়া আইন ও চাপরাশওয়ালা পেয়াদার দরবার করিয়া থাকে।

ছাত্রদিগকে কড়া শাসনের জালে যাঁরা মাথা হইতে পা পর্যন্ত বাঁধিয়া ফেলিতে চান তাঁরা অধ্যাপকদের যে কত বড়ো ক্ষতি করিতেছেন সেটা যেন ভাবিয়া দেখেন। পৃথিবীতে অল্প লোকই আছে নিজের অন্তরের মহৎ আদর্শ যাহাদিগকে সত্য পথে আহ্বান করিয়া লইয়া যায়। বাহিরের সঙ্গে ঘাত-প্রতিঘাতের ঠেলাতেই তারা কর্তব্য সম্বন্ধে সতর্ক হইয়া থাকে। বাহিরের সঙ্গে বোঝাপড়া আছে বলিয়াই তারা আত্মবিস্মৃত হইতে পারে না।

এইজন্যই চারি দিকে যেখানে দাসত্ব মনিবের সেখানে দুর্গতি, শূদ্র যেখানে শূদ্র ব্রাহ্মণের সেখানে অধঃপতন। কঠোর শাসনের চাপে ছাত্রেরা যদি মানবস্বভাব হইতে ভ্রষ্ট হয়, সকলপ্রকার অপমান দুর্ব্যবহার ও অযোগ্যতা যদি তারা নির্জীবভাবে নিঃশব্দে সহিয়া যায়, তবে অধিকাংশ অধ্যাপকদিগকেই তাহা অধোগতির দিকে টানিয়া লইবে। ছাত্রদের মধ্যে অবজ্ঞার কারণ তাঁরা নিজে ঘটাইয়া তুলিয়া তাহাদের অবমাননার দ্বারা নিজেকে অহরহ অবমানিত করিতে থাকিবেন। অবজ্ঞার ক্ষেত্রে নিজের কর্তব্য কখনোই কেহ সাধন করিতে পারে না।

অপর পক্ষ বলিবেন, তবে কি ছেলেরা যা খুশি তাই করিবে আর সমস্তই সহিয়া লইতে হইবে? আমার কথা এই, ছেলেরা যা খুশি তাই কখনোই করিবে না। তারা ঠিক পথেই চলিবে, যদি তাহাদের সঙ্গে ঠিকমতো ব্যবহার করা হয়। যদি তাহাদিগকে অপমান কর, তাহাদের জাতি বা ধর্ম বা আচারকে গালি দাও, যদি দেখে তাহাদের পক্ষে সুবিচার পাইবার আশা নাই, যদি অনুভব করে যোগ্যতাসত্ত্বেও তাহাদের স্বদেশীয় অধ্যাপকেরা অযোগ্যের কাছে মাথা হেঁট করিতে বাধ্য, তবে ক্ষণে ক্ষণে তারা অসহিষ্ণুতা প্রকাশ করিবেই ; যদি না করে তবে আমরা সেটাকে লজ্জা এবং দুঃখের বিষয় বলিয়া মনে করিব।

অপরপক্ষে একটি সংগত কথা বলিবার আছে। য়ুরোপীয়ের পক্ষে ভারতবর্ষ বিদেশ, এখানকার আবহাওয়া ক্লান্তিকর, তাঁহাদের পানাহার উত্তেজক, আমরা তাঁহাদের অধীনস্থ জাতি, আমাদের বর্ণ ধর্ম ভাষা আচার সমস্তই স্বতন্ত্র। তার উপরে, এ দেশে প্রত্যেক ইংরেজই রাজশক্তি

বহন করেন, সুতরাং রাজাসন তাঁর সঙ্গে সঙ্গেই চলিতে থাকে ; এইজন্য ছাত্রকে কেবলমাত্র ছাত্র বলিয়া দেখা তাঁর পক্ষে শক্ত, তাকে প্রজা বলিয়াও দেখেন। অতএব, অতি সামান্য কারণেই অসহিষ্ণু হওয়া তাঁর পক্ষে স্বাভাবিক। বাঙালি ছাত্রদের মানুষ করিবার ভার কেবল তাঁর নয়, ইংরেজ-রাজের প্রতিষ্ঠা রক্ষার ভারও তাঁর। অতএব, একে তিনি ইংরেজ, তার উপর তিনি ইম্পীরিএল সার্ভিসের অধ্যাপক, তার উপরে তিনি রাজার অংশ, তার উপরে তাঁর বিশ্বাস তিনি পতিত-উদ্ধার করিবার জন্য আমাদের প্রতি কৃপা করিয়াই এ দেশে আসিয়াছেন— এমন অবস্থায় সকল সময়ে তাঁর মেজাজ ঠিক না থাকিতেও পারে। অতএব, তিনি কিরূপ ব্যবহার করিবেন সে বিচার না করিয়া ছাত্রদেরই ব্যবহারকে আষ্টেপৃষ্ঠে কঠিন করিয়া বাঁধিয়া দিতে হইবে। সমুদ্রকে বলিলে চলিবে না যে, তুমি এই পর্যন্ত আসিবে তার ঊর্ধ্বে নয়', তীরে যারা আছে তাহাদিগকেই বলিতে হইবে, 'তোমরা হঠো, হঠো, আরো হঠো।'

তাই বলিতেছি এ কথা সত্য বলিয়া মানিতেই হইবে যে, নানা অনিবার্য কারণে ইংরেজ অধ্যাপক বাঙালি ছাত্রের সহিত বিশুদ্ধ অধ্যাপকের মতো ব্যবহার করিয়া উঠিতে পারেন না। কেম্‌ব্রিজে অক্সফোর্ডে ছাত্রদের সহিত অধ্যাপকদের সম্বন্ধ কিরূপ তর্কস্থলে আমরা সে নজির উত্থাপন করিয়া থাকি, কিন্তু তাহাতে লাভ কী! সেখানে যে সম্বন্ধ স্বাভাবিক এখানে যে তাহা নহে, সে কথা স্বীকার করিতেই হইবে। অতএব, স্বাভাবিকতায় যেখানে গর্ত আছে সেখানে শাসনের ইঁটপাটকেল দিয়া ভরাট করিবার কথাটাই সর্বাগ্রে মনে আসে।

সমস্যাটা আমাদের পক্ষে শক্ত হইয়াছে এই কারণেই। এইজন্যই আমাদের স্বদেশীয় বিজ্ঞেরাও ছাত্রদিগকে পরামর্শ দিয়া থাকেন যে, 'বাপু, তোমরা কোনোমতে এগ্‌জামিন পাস করিয়াই সন্তুষ্ট থাকো, মানুষ হইবার দুরাশা মনে রাখিয়ো না।'

এ বেশ ভালো কথা। কিন্তু সুবুদ্ধির কথা চিরদিন খাটে না ; মানবপ্রকৃতি সুবুদ্ধির পাকা ভিতের উপরে পাথরে গাঁথিয়া তৈরি হয় নাই। তাকে বাড়িতে হইবে, এইজন্যই সে কাঁচা। এইজন্যই কৃত্রিম ঘেরটাকে সে খানিকটা দূর পর্যন্ত সহ্য করে ; তার পরে প্রাণের বাড় আর আপনাকে ধরিয়া রাখিতে পারে না, একদিন হঠাৎ বেড়া ফাটিয়া ভাঙিয়া পড়ে। যে প্রাণ কচি তারই জয় হয়, যে বাঁধন পাকা সে টেঁকে না।

অতএব, স্বভাবকে যদি কেবল এক পক্ষেই মানি এবং অপর পক্ষে একেবারেই অগ্রাহ্য করি তবে কিছুদিন মনে হয়, সেই এক-তরফা নিষ্পত্তিতে বেশ কাজ চলিতেছে। তার পরে একদিন হঠাৎ দেখিতে পাই কাজ একেবারেই চলিতেছে না। তখন দ্বিগুণ রাগ হয় ; যা এতদিন ঠাণ্ডা ছিল তার অকস্মাৎ চঞ্চলতা গুরুতর অপরাধ বলিয়াই গণ্য হইতে থাকে এবং সেই কারণেই শাস্তির মাত্রা দণ্ডবিধির সহজ বিধানকে ছাড়াইয়া যায়। তার পর হইতে সমস্ত ব্যাপারটা এমনি জটিল হইয়া উঠে যে কমিশনের পঞ্চায়েত তার মধ্যে পথ খুঁজিয়া পায় না ; তখন বলিতে বাধ্য হয় যে, 'কুড়াল দিয়া কাটিয়া, আগুন দিয়া পোড়াইয়া, স্টীমরোলার দিয়া পিষিয়া রাস্তা তৈরি করো।'

কথাটা বেশ। কর্ণধার কানে ধরিয়া ঝিঁকা মারিতে মারিতে স্কুলের খেয়া পার করিয়া দিল, তার পরে লৌহশাসনের কলের গাড়িতে প্রাণরসকে অন্তররুদ্ধ তপ্তবাষ্পে পরিণত করিয়া য়ুনিভার্সিটির শেষ ইস্‌টেশনে গিয়া নামিলাম, সেখানে চাকরির বালুমরুতে দীর্ঘ মধ্যাহ্ন জীবিকা-মরীচিকার পিছনে ধুঁকিতে ধুঁকিতে চলিলাম, তার পরে সূর্য যখন অস্ত যায় তখন যমরাজের সদর গেটের কাছে গিয়া মাথার বোঝা নামাইয়া দিয়া মনে করিলাম 'জীবন সার্থক হইল'। জীবনযাত্রার এমন নিরাপদ এবং শান্তিময় আদর্শ অন্য কোথাও নাই। এই আদর্শ আমাদের দেশে যদি চিরদিন টেঁকা সম্ভবপর হইত তাহা হইলে কোনো কথা বলিতাম না।

কিন্তু টিঁকিল না। তার কারণ, আমরা তো কেবলমাত্র খৃস্টানকলেজের প্রধান অধ্যক্ষ এবং পতিত-উদ্ধারের দুঃসাধ্যব্রতধারীদের কাছ হইতেই শিক্ষা পাই নাই। আমরা যে ইংলন্ডের কাছ হইতে শিখিতেছি। সেও আজ একশো বছরের উপর হইয়া গেল। সে শিক্ষা তো বন্ধ্যা নহে, নূতন প্রাণকে সে জন্ম দিবেই। তার পরে সেই প্রাণের ক্ষুধাতৃষ্ণা যে অন্নপানীয়ের দাবি করিবে তাকে একেবারে প্রত্যাখ্যান করিতে কেহ পারিবে না।

মনে আছে, ছেলেবেলা যখন ইংরেজি মাস্টারের কাছে ইংরেজি শব্দের ইংরেজি প্রতিশব্দ মুখস্থ করিতে হইত তখন I শব্দের একটা প্রতিশব্দ বহু কষ্টে কণ্ঠস্থ করিয়াছিলাম, সে হইতেছে : Myself—I, by Myself I । ইংরেজি এই I শব্দের প্রতিশব্দটি আয়ত্ত করিতে কিছু দিন সময় লাগিয়াছে ; ক্রমে ক্রমে অল্প অল্প করিয়া ওটা একরকম সড়গড় হইয়া আসিল। এখন মাস্টারমশায় I হইতে ঐ myself-টাকে কালির দাগে লাঞ্ছিত করিয়া রবারের ঘর্ষণে একেবারে মুছিয়া ফেলিতে ইচ্ছা করিতেছেন। আমাদের খৃস্টান হেড্‌মাস্টার বলিতেছেন, 'আমাদের দেশে I শব্দের যে অর্থ তোমাদের দেশে সে অর্থ হইতেই পারে না।' কিন্তু ওটাকে কণ্ঠস্থ করিতে যদি আমাদের দুইশো বছর লাগিয়া থাকে ওটাকে সম্পূর্ণ বহিষ্কৃত করিতে তার ডবল সময়েও কুলায় কিনা সন্দেহ করি। কেননা, ঐ I শব্দের ইংরেজি মন্ত্রটা ভয়ংকর কড়া, গুরু যদি গোড়া হইতেই ওটা সম্পূর্ণ চাপিয়া যাইতে পারিতেন তো কোনো বালাই থাকিত না ; এখন ওটা কান হইতে প্রাণের মধ্যে পৌঁছিয়াছে, এখন প্রাণটাকে মারিয়া ওটাকে উপড়ানো যায়। কিন্তু প্রাণ বড়ো শক্ত জিনিস।

ইংলন্ড যতক্ষণ পর্যন্ত ভারতবর্ষের সঙ্গে আপন সম্পর্ক রাখিয়াছে ততক্ষণ পর্যন্ত আপনাকে আপনি লঙ্ঘন করিতে পারিবে না। যাহা তার সর্বোচ্চ সম্পদ তাহা ইচ্ছা করিয়াই হউক, ইচ্ছার বিরুদ্ধেই হউক, আমাদিগকে দিতেই হইবে। ইহাই বিধাতার অভিপ্রায়, তার সঙ্গে প্রিন্‌সিপাল সাহেবের অভিপ্রায় মিলুক আর নাই মিলুক। তাই আজ আমাদের ছাত্রেরা কেবলমাত্র ইংরেজি কেতাবের ইংরেজি নোট কুড়ানোর উঞ্ছবৃত্তিতেই নিজেকে কৃতার্থ মনে করিবে না, আজ তারা আত্মসম্মানকে বজায় রাখিতে চাহিবেই ; আজ তারা নিজেকে কলের পুতুল বলিয়া ভুল করিতে পারিবে না ; আজ তারা জেলের দারোগাকে নিজের গুরু বলিয়া মানিয়া শাসনের চোটে তাকে গুরুভক্তি দেখাইতে রাজি হইবে না। আজ যাহা সত্য হইয়া উঠিয়াছে তাকে গালি দিলেও তাহা মিথ্যা হইবে না এবং তার গালে চড় মারিলেও সে যে সত্য ইহাই আরো বেশি করিয়া প্রমাণ হইতে থাকিবে।

যে কথা লইয়া আজ আলোচনা চলিতেছে এ যদি একটা সামান্য ও সাময়িক আন্দোলন মাত্র হইত তাহা হইলে আমি কোনো কথাই বলিতাম না। কিন্তু ইহার মূলে খুব একটা বড়ো কথা আছে, সেইজন্যই এই প্রসঙ্গে চুপ করিয়া থাকা অন্যায় মনে করি।

মানুষের ইতিহাস ভিন্ন দেশে ভিন্ন মূর্তি ধরে। ভারতবর্ষের ইতিহাসেরও বিশেষত্ব আছে। সেই ইতিহাসের গোড়া হইতেই আমরা দেখিয়া আসিতেছি, এ দেশ কোনো বিশেষ একটি জাতির বা বিশেষ একটি সভ্যতার দেশ নয়। এ দেশে আর্যসভ্যতাও যেমন সত্য দ্রাবিড় সভ্যতাও তেমনি সত্য, এ দেশে হিন্দুও যত বড়ো মুসলমানও তার চেয়ে নিতান্ত কম নয়। এইজন্যই এখানকার ইতিহাস নানা বিরোধের বাষ্পসংঘাতে প্রকাণ্ড নীহারিকার মতো ঝাপসা হইয়া আছে। এই ইতিহাসে আমরা নানা শক্তির আলোড়ন দেখিয়া আসিতেছি, কিন্তু একটা অখণ্ড ঐতিহাসিক মূর্তির উদ্ভাবন এখনো দেখি নাই। এই পরিব্যাপ্ত বিপুলতার মধ্য হইতে একটি নিরবচ্ছিন্ন 'আমি'র সুস্পষ্ট ক্রন্দন জাগিল না।

স্ফটিক যখন দ্রব অবস্থায় থাকে তখন তাহা মূর্তিহীন ; আমরা সেই অবস্থায় অনেক দিন কাটাইলাম। এমন সময় সমুদ্রপার হইতে একটি আঘাত এই তরল পদার্থের উপর হইতে নীচে, এক প্রান্ত হইতে আর-এক প্রান্তে সঞ্চারিত হইয়াছে ; তাই অনুভব করিতেছি দানা বাঁধিবার মতো একটা সর্বব্যাপী আবেগ ইহার কণায় কণায় যেন নড়িয়া উঠিল। মূর্তি ধরিয়া উঠিবার একটা বেদনা ইহার সর্বত্র যেন চঞ্চল হইয়া উঠিতেছে।

তাই দেখিতেছি, ভারতবর্ষের ইতিহাসে যেমন আর্য আছে দ্রাবিড় আছে, যেমন মুসলমান আছে, তেমনি ইংরেজও আসিয়া পড়িয়াছে। তাই, ভারতবর্ষের প্রকৃত ইতিহাস কেবল আমাদের ইতিহাস নহে, তাহা ইংরেজেরও ইতিহাস। এখন আমাদিগকে দেখিতে হইবে, ইতিহাসের এই-সমস্ত অংশগুলি ঠিকমতো করিয়া মেলে, সমস্তটাই এক সজীব শরীরের অঙ্গ হইয়া উঠে। ইহার মধ্যে কোনো-একটা অংশকে বাদ দিব সে আমাদের সাধ্য নাই। মুসলমানকে বাদ দিতে পারি নাই, ইংরেজকেও বাদ দিতে পারিব না। এ কেবল বাহুবলের অভাববশত নহে, আমাদের ইতিহাসটার প্রকৃতিই এই ; তাহা কোনো এক-জাতির ইতিহাস নয়, তাহা একটা মানব-রাসায়নিক প্রক্রিয়ার ইতিহাস।

এই-যে নানা যুগ, নানা জাতি ও নানা সভ্যতা ভারতবর্ষের ইতিহাসকে গড়িয়া তুলিতেছে, আজ সেই ঐতিহাসিক অভিপ্রায়ের অনুগত করিয়া আমাদের অভিপ্রায়কে সজাগ করিতে হইবে। মনে রাখিতে হইবে আমাদের দেশ ইংলন্ড নয়, ইটালি নয়, আমেরিকা নয় ; সেখানকার মাপে কোনোমতেই আমাদের ইতিহাসকে ছাঁটা চলিবে না। এখানে একেবারে মূলে তফাত। ও-সকল দেশ মোটের উপরে একটা ঐক্যকে লইয়াই নিজেরা ইতিহাস ফাঁদিয়াছে, আমরা অনৈক্য লইয়াই প্রথম হইতে শুরু করিয়াছি এবং আজ পর্যন্ত কেবল তাহা বাড়িয়াই চলিয়াছে।

আমাদিগকে ভাবিতে হইবে, এই লইয়াই আমরা কী করিতে পারি। বাহিরকে কেমন করিয়া বাহির করিয়া দিব, স্বভাবতই অন্য ইতিহাসের এই ভাবনা ; বাহিরকে কেমন করিয়া আপন করিয়া লইব, স্বভাবতই আমাদের ইতিহাসের এই ভাবনা।

ইংরেজকে আমাদের দেশের পক্ষে আপন করিয়া না লইতে পারিলে আমাদের স্বাস্থ্য নাই, কল্যাণ নাই। ইংরেজের শাসন যতক্ষণ আমাদের পক্ষে কলের শাসন থাকিবে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের সম্বন্ধ মানবসম্বন্ধ না হইবে, ততক্ষণ Pax Britannica আমাদিগকে 'শান্তি' দিবে, জীবন দিবে না। আমাদের অন্নের হাঁড়িতে জল চড়াইবে মাত্র, চুলাতে আগুন ধরাইবে না। অর্থাৎ, ততক্ষণ ইংরেজ ভারতবর্ষের সৃজনকার্যে বিশ্বকর্মার ঘনিষ্ঠ সহযোগী হইবে না, বাহির হইতে মজুরি করিয়া কেবল ইঁট কাঠ ফেলিয়া দিয়া চলিয়া যাইবে। ইহাকেই একজন ইংরেজ কবি বলিয়াছেন the white man's burden। কিন্তু 'বার্ডেন' কেন হইতে যাইবে? এ কেন সৃজনকার্যের আনন্দ না হইবে? সৃষ্টিকর্তার ডাকে ইংরেজ এখানে আসিয়াছে, তাকে সৃষ্টিকার্যে যোগ দিতেই হইবে। যদি আনন্দের সঙ্গে যোগ দিতে পারে তবেই সব দিকে ভালো, যদি না পারে তবে এই land of regrets-এর তপ্ত বালুকাপথ তাহাদের কঙ্কালে খচিত হইয়া যাইবে, তবু ভার বহিতেই হইবে। ভারত-ইতিহাসের গঠনকাজে যদি তাহাদের প্রাণের যোগ না ঘটে, কেবলমাত্র কাজের যোগ ঘটে, তাহা হইলে ভারতবর্ষের বিধাতা বেদনা পাইবেন, ইংরেজও সুখ পাইবে না।

তাই ভারত-ইতিহাসের প্রধান সমস্যা এই, ইংরেজকে পরিহার করা নয়, ইংরেজের সঙ্গে ভারতবর্ষের সম্বন্ধকে সজীব ও স্বাভাবিক করিয়া তোলা। এত দিন পর্যন্ত হিন্দু মুসলমান ও ভারতবর্ষের নানা বিচিত্র জাতিতে মিলিয়া এ দেশের ইতিহাস আপনা-আপনি যেমন-তেমন করিয়া

গড়িয়া উঠিতেছিল। আজ ইংরেজ আসার পর এই কাজে আমাদের চেতনা জাগিয়াছে; ইতিহাসরচনায় আজ আমাদের ইচ্ছা কাজ করিতে উদ্যত হইয়াছে।

এইজন্যই ইচ্ছায় ইচ্ছায় মাঝে মাঝে দ্বন্দ্ব বাধিবার আশঙ্কা আছে। কিন্তু যাঁরা এ দেশের সঞ্জীবনমন্ত্রের তপস্বী রাগদ্বেষে ক্ষুব্ধ হইলে তাঁদের চলিবে না। তাঁহাদিগকে এ কথা মনে রাখিতে হইবে যে, ইচ্ছায় ইচ্ছায় মিল করাই চাই। কারণ, ইংরেজ ভারতের ইতিহাস-ধারাকে বাধা দিতে আসে নাই, তাহাতে যোগ দিতে আসিয়াছে। ইংরেজকে নহিলে ভারত-ইতিহাস পূর্ণ হইতেই পারে না। সেইজন্যই আমরা কেবলমাত্র ইংরেজের আপিস চাই না, ইংরেজের হৃদয় চাই।

ইংরেজ যদি আমাদিগকে অবাধে অনায়াসে অবজ্ঞা করিতে পায় তাহা হইলেই আমরা তার হৃদয় হারাইব। শ্রদ্ধা আমাদিগকে দাবি করিতেই হইবে; আমরা খৃস্টান প্রিন্‌সিপালের নিকট হইতেও এক গালে চড় খাইয়া অন্য গাল ফিরাইয়া দিতে পারিব না।

ইংরেজের সঙ্গে ভারতবাসীর জীবনের সম্বন্ধ কোথায় সহজে ঘটিতে পারে? বাণিজ্যের ক্ষেত্রে নয়, রাজকীয় ক্ষেত্রেও নয়। তার সর্বোৎকৃষ্ট স্থান বিদ্যাদানের ক্ষেত্র। জ্ঞানের আদানপ্রদানের ব্যাপারটি সাত্ত্বিক। তাহা প্রাণকে উদ্‌বোধিত করে। সেইজন্য এইখানেই প্রাণের নাগাল পাওয়া সহজ। এইখানেই গুরুর সঙ্গে শিষ্যের সম্বন্ধ যদি সত্য হয় তবে ইহজীবনে তার বিচ্ছেদ নাই। তাহা পিতার সঙ্গে পুত্রের সম্বন্ধের চেয়েও গভীরতর।

আমাদের য়ুনিভার্সিটিতে এই সুযোগ ঘটিয়াছিল। এইখানে ইংরেজ এমন একটি স্থান পাইতে পারিত যাহা সে রাজসিংহাসনে বসিয়াও পায় না। এই সুযোগ যখন ব্যর্থ হইতে দেখা যায় তখন আক্ষেপের সীমা থাকে না।

ব্যর্থতার কারণ আমাদের ছাত্ররাই, এ কথা আমি কিছুতেই মানিতে পারি না। আমাদের দেশের ছাত্রদের আমি ভালো করিয়াই জানি। ইংরেজ ছেলের সঙ্গে একটা বিষয়ে ইহাদের প্রভেদ আছে। ইহারা ভক্তি করিতে পাইলে আর কিছু চায় না। অধ্যাপকের কাছ হইতে একটুমাত্রও যদি ইহারা খাঁটি স্নেহ পায় তবে তাঁর কাছে হৃদয় উৎসর্গ করিয়া দিয়া যেন হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচে। আমাদের ছেলেদের হৃদয় নিতান্তই সস্তা দামে পাওয়া যায়।

এইজন্যই আমার যে-একটি বিদ্যালয় আছে সেখানে ইংরেজ অধ্যাপক আনিবার জন্য অনেকদিন হইতে উদ্যোগ করিয়াছি। বহুকাল পূর্বে একজনকে আনিয়াছিলাম। তিনি সুদীর্ঘকাল ভারতবর্ষের আবহাওয়ায় পাকিয়াছিলেন। তাহাতে তাঁর অন্তঃকরণে পিত্তাধিক্য ঘটিয়াছিল। তিনি তাঁর ক্লাসে ছেলেদের জাতি তুলিয়া গালি দিতেন; তারা বাঙালির ঘরে জন্মিয়াছে এই অপরাধ তিনি সহিতে পারিতেন না। সেই ছেলেরা যদিচ প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্র নয়, তাদের বয়স নয়-দশ বৎসর হইবে, তবু তারা তাঁর ক্লাসে যাওয়া ছাড়িল। হেড্‌মাস্টারের তাড়নাতেও কোনো ফল হইল না। দেখিলাম হিতে বিপরীত ঘটিল। এই মাস্টারটিকে white man's burden হইতে সে যাত্রায় নিষ্কৃতি দিলাম।

কিন্তু, আশা ছাড়ি নাই এবং আমার কামনাও সফল হইয়াছে। আজ ইংরেজ গুরুর সঙ্গে বাঙালি ছাত্রের জীবনের গভীর মিলন ঘটিয়া আশ্রম পবিত্র হইয়াছে। এই পুণ্য মিলনটি সমস্ত ভারতক্ষেত্রে দেখিবার জন্য বিধাতা অপেক্ষা করিতেছেন। যে-দুটি ইংরেজ তাপস সেখানে আছেন তাঁরা নিজের ধর্ম প্রচার করিতে যান নাই, তাঁরা পতিত-উদ্ধারের দুঃসহ কর্তব্যভার গ্রহণ করেন নাই; তাঁরা গ্রীকদের মতো বর্বর জাতিকে সভ্যতায় দীক্ষিত করিবার জন্য ধরাধামে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন এমন অভিমান মনে রাখেন না। তাঁরা তাঁদের পরমগুরুর মতো করিয়াই দুই হাত

বাড়াইয়া বলিয়াছেন, 'ছেলেদের আসিতে দাও আমার কাছে, হোক-না তারা বাঙালির ছেলে। ছেলেরা তাঁদের অত্যন্ত কাছে আসিতে লেশমাত্র বিলম্ব করে নাই, হোন্-না তাঁরা ইংরেজ। আজ এই কথা বলিতে পারি, এই দুটি ইংরেজের সঙ্গে আমার ছেলেদের যে সম্বন্ধ ঘটিয়াছে তাহা তাহাদের জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত অক্ষুণ্ণ থাকিবে। এই ছেলেরা ইংরেজবিদ্বেষের বিষে জীবন পূর্ণ করিয়া সংসারে প্রবেশ করিবে না।

প্রথমে যে শিক্ষকটি আসিয়াছিলেন তিনি শিক্ষকতায় পাকা ছিলেন। তাঁর কাছে পড়িতে পাইলে ছেলেদের ইংরেজি উচ্চারণ ও ব্যাকরণ দুরস্ত হইয়া যাইত। সেই লোভে আমি কঠোর শাসনে ছাত্রগুলিকে তাঁর ক্লাসে পাঠাইতে পারিতাম। মনে করিতে পারিতাম, শিক্ষক যেমনই দুর্ব্যবহার করুন ছাত্রদের কর্তব্য সমস্ত সহিয়া তাঁকে মানিয়া চলা। কিছুদিন তাদের মনে বাজিত, হয়তো কিছুদিন পরে তাদের মনে বাজিতও না, কিন্তু তাদের অ্যাক্সেন্ট বিশুদ্ধ হইত। তা হউক, কিন্তু এই মানবের ছেলেদের কি ভগবান নাই? আমরাই কি চুল পাকিয়াছে বলিয়া তাদের বিধাতাপুরুষ? ইংরেজি ভাষায় বিশুদ্ধ অ্যাক্সেন্টের জোরে সেই ভগবানের বিচারে আমি কি খালাস পাইতাম?

ইংরেজ অধ্যাপকের সহিত বাঙালি ছাত্রদের সম্বন্ধ সরল ও স্বাভাবিক হওয়া বর্তমানে বিশেষ কঠিন হইয়াছে। তার কারণ কী, একদিন ইংলন্ডে থাকিতে তাহা খুব স্পষ্ট করিয়া বুঝিতে পারিয়াছিলাম। রেলগাড়িতে একজন ইংরেজ আমার পাশে বসিয়াছিলেন ; প্রথমটা আমাকে দেখিয়া তাঁর ভালোই লাগিল। এমন-কি, তাঁর মনে হইল ইংলন্ডে আমি ধর্মপ্রচার করিতে আসিয়াছি। য়ুরোপের লোককে সাধু উপদেশ দিবার অধিকার আমাদেরও আছে, এ মত তিনি বিশেষ উৎসাহের সহিত প্রকাশ করিলেন। এমন সময় হঠাৎ তাঁর কৌতূহল হইল আমি ভারতবর্ষের কোন্ প্রদেশ হইতে আসিয়াছি তাহা জানিবার জন্য। আমি বলিলাম, আমি বাংলাদেশের লোক। শুনিয়া তিনি লাফাইয়া উঠিলেন। কোনো দুষ্কর্মই যে বাংলাদেশের লোকের অসাধ্য নহে, তাহা তিনি তীব্র উত্তেজনার সঙ্গে বলিতে লাগিলেন।

কোনো জাতির উপর যখন রাগ করি তখন সে জাতির প্রত্যেক মানুষ আমাদের কাছে একটা অ্যাবস্ট্র্যাক্ট সত্তা হইয়া উঠে। তখন সে আর বিশেষ্য থাকে না, বিশেষণ হয়। আমার সহযাত্রী যতক্ষণ না জানিয়াছিলেন আমি বাঙালি ততক্ষণ তিনি আমার সঙ্গে ব্যক্তিবিশেষের মতো ব্যবহার করিতেছিলেন, সুতরাং আদব-কায়দার ত্রুটি হয় নাই। কিন্তু যেই তিনি শুনিলেন আমি বাঙালি অমনি আমার ব্যক্তিবিশেষত্ব বাষ্প হইয়া গিয়া একটা বিকট বিশেষণে আসিয়া দাঁড়াইল, সেই বিশেষণটি অভিধানে যাকে বলে 'নিদারুণ'। বিশেষণ-পদার্থের সঙ্গে সাধারণ ভদ্রতা রক্ষার কথা মনেই হয় না। কেননা, ওটা অপদার্থ বলিলেই হয়।

রাশিয়ানের উপর ইংরেজের যখন রাগ ছিল তখন রাশিয়ান-মাত্রেই তার কাছে একটা বিশেষণ হইয়া উঠিয়াছিল। আজ ইংরেজি কাগজে প্রায়ই দেখিতে পাই, রাশিয়ানের ধর্মপরতা সহৃদয়তার সীমা নাই। মানুষকে বিশেষণ হইতে বিশেষ্যের কোঠায় ফেলিবামাত্র তার মানবধর্ম প্রকাশ হইয়া পড়ে ; তখন তার সঙ্গে সহজ ব্যবহার করিতে আর বাধে না।

বাঙালি আজ ইংরেজের কাছে বিশেষণ হইয়া উঠিয়াছে। এইজন্য বাঙালির বাস্তবসত্তা ইংরেজের চোখে পড়া আজ বড়ো কঠিন। এইজন্যই ইচ্ছা করিয়াছিলাম, বর্তমান য়ুরোপীয় যুদ্ধে বাঙালি যুবকদিগকে ভলন্টিয়ার রূপে লড়িতে দেওয়া হয়। ইংরেজের সঙ্গে এক যুদ্ধে মরিতে পারিলে বাঙালিও ইংরেজের চোখে বাস্তব হইয়া উঠিত, ঝাপ্‌সা থাকিত না ; সুতরাং তার পর হইতে তাকে বিচার করা সহজ হইত।

সে সুযোগ তো চলিয়া গেল। এখনো আমরা অস্পষ্টতার আড়ালেই রহিয়া গেলাম। অস্পষ্টতাকে মানুষ সন্দেহ করে। আজ বাংলাদেশে একজন মানুষও আছে কি যে এই সন্দেহ হইতে মুক্ত?

যাহা হউক, আমাদের মধ্যে এই অস্পষ্টতার গোধূলি ঘনাইয়া আসিয়াছে। এইটেই ছায়াকে বস্তু ও বস্তুকে ছায়া ভ্রম করিবার সময়। এখন পরে পরে কেবলই ভুল-বোঝাবুঝির সময় বাড়িয়া চলিল।

কিন্তু এই অন্ধকারটাকে কি কড়া শাসনের ধুলা উড়াইয়াই পরিষ্কার করা যায়? এখনই কি আলোকের প্রয়োজন সব চেয়ে অধিক নয়? সে আলোক প্রীতির আলোক, সে আলোক সমবেদনার প্রদীপে পরস্পর মুখ-চেনাচিনি করিবার আলোক। এই দুর্যোগের সময়েই কি খৃস্টান কলেজের কর্তৃপক্ষেরা তাঁহাদের গুরুর চরিত ও উপদেশ স্মরণ করিবেন না? এখনই কি 'চ্যারিটির'র প্রয়োজন সব চেয়ে অধিক নয়? এই-যে দেশব্যাপী সংশয় ঘনাইয়া উঠিয়া সত্যকে আচ্ছন্ন ও বিকৃত করিয়া তুলিতেছে, ইহাকে সম্পূর্ণ কাটাইয়া তুলিবার শক্তি তাঁদেরই হাতে যাঁরা উপরে আছেন। পৃথিবীর কুয়াশা কাটাইয়া দিবার ভার আকাশের সূর্যের। যখন বারিবর্ষণের প্রয়োজন একান্ত তখন যাঁরা বজ্র-বর্ষণের পরামর্শ দিতেছেন তাঁরা যে কেবলমাত্র সহৃদয়তা ও ঔদার্যের অভাব দেখাইতেছেন তাহা নহে, তাঁরা ভীরুতার পরিচয় দিতেছেন। পৃথিবীর অধিকাংশ অন্যায় উপদ্রব ভয় হইতে, সাহস হইতে নয়।

উপসংহারে আমি এই কথা কর্তৃপক্ষকে বিশেষভাবে স্মরণ করিতে অনুনয় করি। যে বিদ্যালয়ে ইংরেজ অধ্যাপকের কাছে বাঙালি ছাত্রেরা শিক্ষালাভ করিতেছে সেই বিদ্যালয় হইতে নবযুগের বাঙালি যুবক ইংরেজজাতির 'পরে শ্রদ্ধা ভক্তি প্রীতি বহন করিয়া সংসারে প্রবেশ করিবে, ইহাই আশা করিতে পারিতাম। যে বয়সে যে ক্ষেত্রে নূতন নূতন জ্ঞানের আলোকে ও ভাবের বর্ষণে ছাত্রদের মধ্যে নবজীবনের প্রথম বিকাশ ঘটিতেছে সেই বয়সে ও সেই ক্ষেত্রেই ইংরেজ গুরু যদি তাহাদের হৃদয়কে প্রীতির দ্বারা আকর্ষণ করিতে পারেন তবেই এই যুবকেরা ইংরেজের সঙ্গে ভারতবাসীর সম্বন্ধকে সজীব ও সুদৃঢ় করিয়া তুলিতে পারিবে। এই শুভক্ষণে এবং এই পুণ্যক্ষেত্রে ইংরেজ অধ্যাপকের সঙ্গে বাঙালি ছাত্রের সম্বন্ধ যদি সন্দেহের বিদ্বেষের ও কঠিন শাসনের সম্বন্ধ হয় তবে আমাদের পরস্পরের ভিতরকার এই বিরোধের বিষ ক্রমশই দেশের নাড়ীর মধ্যে গিয়া প্রবেশ করিবে; ইংরেজের প্রতি অবিশ্বাস পুরুষানুক্রমে আমাদের মজ্জাগত হইয়া অন্ধ সংস্কারে পরিণত হইতে থাকিবে। সে অবস্থায় বাংলাদেশের রাষ্ট্রশাসন-ব্যাপারে জঞ্জাল কেবলই বাড়িতে থাকিবে বলিয়া যে আশঙ্কা তাহাকেও আমি তেমন গুরুতর বলিয়া মনে করি না; আমার ভয় এই যে, ইংরেজের কাছ হইতে আমরা যে দান দিনে দিনে আনন্দে গ্রহণ করিতে পারিতাম সে দান প্রত্যহ আমাদের হৃদয়ের দ্বার হইতে ফিরিয়া যাইতে থাকিবে। শ্রদ্ধার সঙ্গে দান করিলেই শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করা সম্ভব হয়। যেখানে সেই শ্রদ্ধার সম্পর্ক নাই সেখানে আদানপ্রদানের সম্বন্ধ কলুষিত হইয়া উঠে। জেলখানার কয়েদিরা হাতে বেড়ি পরিয়া যে অন্ন খাইতে বসে তাকে যজ্ঞের ভোজ বলা বিদ্রূপ করা। জ্ঞানের ভোজ আনন্দের ভোজ। সেখানেও যে-সকল কর্তারা ভোক্তার জন্য আজ লোহার হাতকড়ি ফর্মাশ দিতেছেন তাঁরা কাল নিতান্ত ভালোমানুষটির মতো আশ্চর্য হইয়া বলিবেন 'এত করিয়াও বাঙালির ছেলের মন পাওয়া গেল না— কৃতজ্ঞতাবৃত্তি ইহাদের একেবারেই নাই' এবং তাঁরা রাত্রে শুইতে যাইবার সময় এবং প্রাতঃকালে জাগিয়া উঠিয়া প্রার্থনা করিবেন: Father, do not forgive them!

চৈত্র ১৩২২

অসন্তোষের কারণ

ভারতবর্ষের নানা স্থানেই নূতন নূতন বিশ্ববিদ্যালয়-স্থাপনের চেষ্টা চলিতেছে। ইহাতে বুঝা যায়, শিক্ষা সম্বন্ধে আমাদের মনে একটা অসন্তোষ জন্মিয়াছে। কেন সেই অসন্তোষ? দুইটি কারণ আছে; একটা বাহিরের, একটা ভিতরের।

সকলেই জানেন, আমাদের দেশে ইংরেজি শিক্ষার যখন প্রথম পত্তন হইয়াছিল তখন তাহার লক্ষ্য ছিল এই যে, ব্রিটিশ ভারতের রাজ্যশাসন ও বাণিজ্যচালনের জন্য ইংরেজিজানা দেশি কর্মচারী গড়িয়া তোলা। অনেকদিন হইতেই সেই গড়নের কাজ চলিতেছে। যতকাল ছাত্রসংখ্যা অল্প ছিল ততকাল প্রয়োজনের সঙ্গে আয়োজনের সামঞ্জস্য ছিল; কাজেই সে দিক হইতে কোনো পক্ষে অসন্তোষের কোনো কারণ ঘটে নাই। যখন হইতে ছাত্রের পরিমাণ অত্যন্ত বাড়িয়া উঠিয়াছে তখন হইতেই এই শিক্ষাব্যবস্থার একটা প্রধান উদ্দেশ্য অধিকাংশ ছাত্রেরই পক্ষে ব্যর্থ হইতেছে। যদি আমাদের দেশের শিক্ষায় ছাত্রদিগকে চাকরি ছাড়া অন্যান্য জীবিকার সংস্থানে পটু করিয়া তুলিত তাহা হইলে এই সম্বন্ধে নালিশের কথা থাকিত না। কিন্তু পটু না করিয়া সর্বপ্রকারে অপটুই করিতেছে, এ কথা আমরা নিজের প্রতি তাকাইলে বুঝিতে পারি।

এই তো গেল বাহিরের দিকে নালিশ। ভিতরের দিকের নালিশ এই যে, এত কাল ধরিয়া ইংরেজের স্কুলে পড়িতেছি, কিন্তু ছাত্রদশা তো কোনোমতেই ঘুচিল না। বিদ্যা বাহির হইতেই কেবল জমা করিলাম, ভিতর হইতে কিছু তো দিলাম না। কলসে কেবলই জল ভরিতে থাকিব, অথচ সে জল কোনোদিনই যথেষ্ট পরিমাণে দান-পানের উপযোগী ভরা হইবে না, এ যে বিষম বিপত্তি। ভয়ে ভয়ে ইংরেজের ডাক্তার ছাত্র পুঁথি মিলাইয়া ডাক্তারি করিয়া চলিল, কিন্তু শারীরবিদ্যায় বা চিকিৎসাশাস্ত্রে একটা-কোনো নূতন তত্ত্ব বা তথ্য যোগ করিল না। ইংরেজের এঞ্জিনিয়ার ছাত্র সতর্কতার সহিত পুঁথি মিলাইয়া এঞ্জিনিয়ারি করিয়া পেন্সন লইতেছে, কিন্তু যন্ত্রতত্ত্বে বা যন্ত্র-উদ্ভাবনায় মনে রাখিবার মতো কিছুই করিতেছে না। শিক্ষার এই শক্তিহীনতা আমরা স্পষ্টই বুঝিতেছি। আমাদের শিক্ষাকে আমাদের বাহন করিলাম না, শিক্ষাকে আমরা বহন করিয়াই চলিলাম, ইহারই পরম দুঃখ গোচরে অগোচরে আমাদের মনের মধ্যে জমিয়া উঠিতেছে।

অথচ, বুদ্ধির এই কৃশতা নির্জীবতা যে আমাদের প্রকৃতিগত নয় তার বর্তমান প্রমাণ : জগদীশ বসু, প্রফুল্ল রায়, ব্রজেন্দ্র শীল। আমাদের শিক্ষার একান্তদীনতা ও পরবশতা সত্ত্বেও ইঁহাদের বুদ্ধি ও বিদ্যা বিশ্বজ্ঞানের মহাকাশে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছে। আর, অতীতকালের একটা মস্ত প্রমাণ এই যে, আমাদের প্রাচীন চিকিৎসাশাস্ত্র নানা শাখায় প্রশাখায়, নানা পরীক্ষায় ও উদ্ভাবনায় বিচিত্র বৃহৎ ও প্রাণবান হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু পরের-ইস্কুলে-শেখা চিকিৎসাবিদ্যায় আজ আমাদের এত ক্ষীণতা ও ভীরুতা কেন!

ইহার প্রধান কারণ, ভাণ্ডারঘর যেমন করিয়া আহার্য দ্রব্য সঞ্চয় করে আমরা তেমনি করিয়াই শিক্ষা সঞ্চয় করিতেছি, দেহ যেমন করিয়া আহার্য গ্রহণ করে তেমন করিয়া নহে। ভাণ্ডারঘর যাহা-কিছু পায় হিসাব মিলাইয়া সাবধানে তাহার প্রত্যেক কণাটিকে রাখিবার চেষ্টা করে। দেহ যাহা পায় তাহা রাখিবার জন্য নহে, তাহাকে অঙ্গীকৃত করিবার জন্য। তাহা গোরুর গাড়ির মতো ভাড়া খাটিয়া বাহিরে বহন করিবার জন্য নহে, তাহাকে অন্তরে রূপান্তরিত করিয়া রক্তে মাংসে স্বাস্থ্যে শক্তিতে পরিণত করিবার জন্য। আজ আমাদের মুশকিল হইয়াছে এই যে, এই এত বছরের নোটবুকের বস্তা-ভরা শিক্ষার মাল লইয়া আজ আমাদের গোরুর গাড়িও বাহিরে তেমন করিয়া

ভাড়া খাটিতেছে না, অথচ সেটাকে মনের আনন্দে দিব্য পাক করিয়া ও পরিপাক করিয়া পেট ভরাই সে ব্যবস্থাও কোথাও নাই। তাই আমাদের বাহিরের থলিটাও রহিল ফাঁকা, অন্তরের পাকযন্ত্রটাও রহিল উপবাসী। গাড়োয়ান তাহার লাইসেন্সের পদক গলায় ঝুলাইয়া মালখানার দ্বারে চোখের জল মুছিতেছে, তাহার একমাত্র আশাভরসা কন্যার পিতার কাছে। এমন অবস্থাতেও এখনো যে যথেষ্ট পরিমাণে অসন্তোষ জন্মে নাই তাহার কারণ, বৃথা আশা মরিতে মরিতেও মরে না এবং নিষ্ফল অভ্যাস আপন বেড়ার বাহিরে ফললাভের কোনো ক্ষেত্র চোখেই দেখিতে পায় না। উপবাসকৃশ অক্ষম আপন ব্যর্থতার মধ্যেই চিত হইয়া পড়িয়া মনে করিতে থাকে, এইখানেই এক পাশ হইতে আর-এক পাশে ফিরিয়া কাঁদিয়া-কাটিয়া দৈবকৃপায় যেমন-তেমন একটা সদুপায় হইবেই। জামা কিনিতে গেলাম, পাইলাম একপাটি মোজা ; এখন ভাবিতেছি, ঐটেকেই কাটিয়া ছাঁটিয়া কোনোমতে জামা করিয়া পরিব। ভাগ্য আমাদের সেই চেষ্টা দেখিয়া অট্টহাস্য করিতেছে।

বর্তমান শিক্ষাপ্রণালীটাই যে আমাদের ব্যর্থতার কারণ, অভ্যাসগত অন্ধ মমতার মোহে সেটা আমরা কিছুতেই মনে ভাবিতে পারি না। ঘুরিয়া ফিরিয়া নূতন বিশ্ববিদ্যালয় গড়িবার বেলাতেও প্রণালী বদল করিবার কথা মনেই আসে না ; তাই, নূতনের ঢালাই করিতেছি সেই পুরাতনের ছাঁচে। নূতনের জন্য ইচ্ছা খুবই হইতেছে অথচ ভরসা কিছুই হইতেছে না। কেননা ঐটেই যে রোগ, এত দিনের শিক্ষা-বোঝার চাপে সেই ভরসাটাই যে সমূলে মরিয়াছে।

অনেককাল এমনি করিয়া কাটিল, আর সময় নষ্ট করা চলিবে না। এখন মনুষ্যত্বের দিকে তাকাইয়া লক্ষ্যেরও পরিবর্তন করিতে হইবে। সাহস করিয়া বলিতে হইবে, যে শিক্ষা বাহিরের উপকরণ তাহা বোঝাই করিয়া আমরা বাঁচিব না, যে শিক্ষা অন্তরের অমৃত তাহার সাহায্যেই আমরা মৃত্যুর হাত এড়াইব।

শিক্ষাকে কেমন করিয়া সত্য এবং প্রাণের জিনিস করা যায়, সেই কথার আলোচনা যথাসাধ্য ক্রমে ক্রমে করা যাইবে।

জ্যৈষ্ঠ ১৩২৬

বিদ্যার যাচাই

আমার মনে আছে, বালককালে একজনকে জানিতাম তিনি ইংরেজিতে পরম পণ্ডিত ছিলেন, বাংলাদেশে তিনি ইংরেজি শিক্ষার প্রথম যুগের শেষভাগের ছাত্র। ডিরোজিয়ো প্রভৃতি শিক্ষকদের কাছে তিনি পাঠ লইয়াছিলেন। তিনি জানি না কী মনে করিয়া কিছুদিন আমাদিগকে ইংরেজি সাহিত্য সম্বন্ধে উপদেশ দিতে ইচ্ছা করিলেন। ইংরেজি কবিদের সম্বন্ধে তিনি মনে একটা শ্রেণীবিভাগ-করা ফর্দ লট্‌কাইয়া রাখিয়াছিলেন। তার মধ্যে পয়লা দোসরা এবং তেসরা নম্বর পর্যন্ত সমস্ত পাকাপাকি ঠিক করা ছিল। সেই ফর্দ তিনি আমাদিগকে লিখিয়া দিয়া মুখস্থ করিতে বলিলেন। তখন আমাদের যেটুকু ইংরেজি জানা ছিল তাহাতে পয়লা নম্বর দূরে থাক্‌ তেসরা নম্বরেরও কাছ ঘেঁষিতে পারি এমন শক্তি আমাদের ছিল না। তথাপি ইংরেজি কবিদের সম্বন্ধে বাঁধা বিচারটা আগে হইতেই আমাদের আয়ত্ত করিয়া দেওয়াতে দোষ ছিল না। কেননা, রুচিরসনা দিয়া রসবিচার ইংরেজি কাব্য সম্বন্ধে আমাদের পক্ষে প্রশস্ত নহে। যেহেতু আমাদিগকে চাখিয়া

নহে কিন্তু গিলিয়া খাইতে হইবে কাজেই কোন্‌টা মিষ্ট কোন্‌টা অম্ল সেটা নোটবুকে লেখা না থাকিলে ভুল করার আশঙ্কা আছে। ইহার ফল কী হইয়াছে বলি। আমাদের শিশু বয়সে দেখিতাম, কবি বায়রন সম্বন্ধে আমাদের দেশের ইংরেজি-পোড়োদের মনে অসীম ভক্তি ছিল। আধুনিক পোড়োদের মনে সে ভক্তি আদবেই নাই। অল্প কিছু দিন আগেই আমাদের যুবকেরা টেনিসনের নাম শুনিলেই যেরূপ রোমাঞ্চিত হইতেন এখন আর সেরূপ হন না। উক্ত কবিদের সম্বন্ধে ইংলন্ডে কাব্যবিচারকদের রায় অল্পবিস্তর বদল হইয়া গিয়াছে, ইহা জানা কথা। সেই বদল হইবার স্বাভাবিক কারণ সেখানকার মনের গতি ও সামাজিক গতির মধ্যেই আছে। কিন্তু, সে কারণ তো আমাদের মধ্যে নাই। অথচ তাহার ফলটা ঠিক ঠিক মিলিতেছে। আদালতটাই আমাদের এখানে নাই, কাজেই বিদেশের বিচারের নকল আনাইয়া আমাদিগকে বড়ো সাবধানে কাজ চালাইতে হয়। যে কবির যে দর আধুনিক বাজারে প্রচলিত পাছে তাহার উল্‌টা বলিলেই আহাম্মক বলিয়া দাগা পড়ে, এইজন্য বিদেশের সাহিত্যের বাজার-দরটা সর্বদা মনে রাখিতে হয়। নহিলে আমাদের ইস্কুল-মাস্টারি চলে না, নহিলে মাসিকপত্রে ইব্‌সেন মেটার্লিঙ্ক ও রাশিয়ান ঔপন্যাসিকদের কথা পাড়িবার বেলা লজ্জা পাইতে হয়। শুধু সাহিত্য নহে, অর্থনীতি সমাজনীতি প্রভৃতি সম্বন্ধেও বিদেশের পরিবর্তনশীল বিচারবুদ্ধির সঙ্গে অবিকল তাল মিলাইয়া যদি না চলি, যদি জন স্টুয়ার্ট মিলের মন্ত্র কার্লাইল-রাস্কিনের আমলে আওড়াই, বিলাতে যে সময়ে ব্যক্তিস্বতন্ত্র্যবাদের হাওয়া বদল হইয়াছে সেই সময় বুঝিয়া আমরাও যদি সংঘবাদের সুরে কণ্ঠ না মিলাই, তবে আমাদের দেশের হাই ইংরেজি স্কুলের মাস্টার ও ছাত্রদের কাছে মুখ দেখাইবার জো থাকিবে না।

ইংরেজি ইস্কুলে এত দীর্ঘ কাল দাগা বুলাইয়াও কেন আমরা কোনো বিষয়ে জোরের সঙ্গে মৌলিন্য প্রকাশ করিতে পারিলাম না, এই প্রশ্ন আমাদের মনে উঠিয়াছে। ইহার কারণ, বিদ্যাটাও যেখান হইতে ধার করিয়া লইতেছি বুদ্ধিটাও সেখান হইতে ধার-করা। কাজেই নিজের বিচার খাটাইয়া এ বিদ্যা তেজের সঙ্গে ব্যবহার করিতে ভরসা পাই না। বিদ্যা এবং বুদ্ধির ক্ষেত্রে ইংরেজের ছেলে পরবশ নহে, তাহার চারি দিকেই স্বাধীন সৃষ্টি ও স্বাধীন বিচারের হাওয়া বহিতেছে। একজন ফরাসি বিদ্বান নির্ভয়ে ইংরেজি বিদ্যার বিচার করিতে পারে ; তার কারণ যে ফরাসি বিদ্যা তাহার নিজের সেই বিদ্যার মধ্যেই বিচারের শক্তি ও বিধি রহিয়াছে। এইজন্য মাল যেখান হইতেই আসে যাচাই করিবার ভার তাহার নিজেরই হাতে, এইজন্য নিজের হিসাব মতো সে মূল্য দেয় এবং কোন্‌টা লইবে কোন্‌টা ছাড়িবে সে সম্বন্ধে নিজের রুচি ও মতই তাহার পক্ষে প্রামাণ্য। কাজেই জ্ঞানের ও ভাবের কারবারে নিজের 'পরেই ইহাদের ভরসা। এই ভরসা না থাকিলে মৌলিন্য কিছুতেই থাকিতে পারে না।

আমাদের মুশকিল এই যে, আগাগোড়া সমস্ত বিদ্যাটাই আমরা পরের কাছ হইতে পাই। সে বিদ্যা মিলাইব কিসের সঙ্গে, বিচার করিব কী দিয়া? নিজের যে বাটখারা দিয়া পরিমাপ করিতে হয় সেই বাটখারাই নাই। কাজেই আমদানি মালের উপরে ওজনের ও দামের যে টিকিট মারা থাকে সেই টিকিটটাকেই ষোলো আনা মানিয়া লইতে হয়। এইজন্যই ইস্কুলমাস্টার এবং মাসিকপত্র-লেখকদের মধ্যে এই টিকিটে লিখিত মালের পরিচয় ও অঙ্ক যে যতটা ঠিকমতো মুখস্থ রাখিতে ও আওড়াইতে পারে তাহার ততই পসার বাড়ে। এতকাল ধরিয়া কেবল এমনি করিয়াই কাটিল, কিন্তু চিরকাল ধরিয়াই কি এমনি করিয়া কাটিবে?

আষাঢ় ১৩২৬

বিদ্যাসমবায়

এলাহাবাদ ইংরেজি-বাংলা স্কুলের কোনো ছাত্রকে একদা এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল যে 'রিভার্' শব্দের সংজ্ঞা কী। মেধাবী বালক তার নির্ভুল উত্তর দিয়াছিল। তাহার পরে যখন তাহাকে জিজ্ঞাসা করা হইল কোনো দিন সে কোনো রিভার্ দেখিয়াছে কি না, তখন গঙ্গাযমুনার তীরে বসিয়া এই বালক বলিল যে, 'না, আমি দেখি নাই।' অর্থাৎ এই বালকের ধারণা হইয়াছিল, যাহা চেষ্টা করিয়া, কষ্ট করিয়া, বানান করিয়া, অভিধান ধরিয়া, পরের ভাষায় শেখা যায় তাহা আপন জিনিস নয় ; তাহা বহুদূরবর্তী, অথবা তাহা কেবল পুঁথিলোক-ভুক্ত। এই ছেলে তাই নিজের জানা দেশটাকে মনে মনে জিয়োগ্রাফি বিদ্যা হইতে বাদ দিয়াছিল। অবশ্য, পরে এক সময়ে এ শিখিয়াছিল যে, যে দেশে তাহার জন্ম ও বাস সেও ভূগোলবিদ্যার সামগ্রী, সেও একটা দেশ, সেখানকার রিভার্ও রিভার্। কিন্তু মনে করা যাক, তার বিদ্যাচর্চার শেষ পর্যন্ত এই খবরটি সে পায় নাই— শেষ পর্যন্তই সে জানিয়াছে যে আর-সকল জাতিরই দেশ আছে, কেবল তারই দেশ নাই— তবে কেবল যে তার পক্ষে সমস্ত পৃথিবীর জিয়োগ্রাফি অস্পষ্ট ও অসমাপ্ত থাকিয়া যাইবে তাহা নহে, তাহার মনটা অন্তরে অন্তরে গৃহহীন গৌরবহীন হইয়া রহিবে। অবশেষে বহুকাল পরে যখন কোনো বিদেশী জিয়োগ্রাফি-পণ্ডিত আসিয়া কথাচ্ছলে তাহাকে বলে যে 'তোমাদের একটা প্রকাণ্ড বড়ো দেশ আছে, তার হিমালয় প্রকাণ্ড বড়ো পাহাড় তার সিন্ধু ব্রহ্মপুত্র প্রকাণ্ড বড়ো নদী', তখন হঠাৎ এই-সমস্ত খবরটায় তাহার মাথা ঘুরিয়া যায় ; নূতন জ্ঞানটাকে সে সংযতভাবে বহন করিতে পারে না ; অনেককালের অগৌরবটাকে একদিনে শোধ দিবার জন্য সে চীৎকারশব্দে চার দিকে বলিয়া বেড়ায়, 'আর-সকলের দেশ দেশমাত্র, আমাদের দেশ স্বর্গ।' একদিন যখন সে মাথা হেঁট করিয়া আওড়াইয়াছে যে 'পৃথিবীতে আর-সকলেরই দেশ আছে, কেবল আমাদেরই নাই' তখনো বিশ্বসত্যের সঙ্গে তার অজ্ঞানকৃত বিচ্ছেদ ঘটিয়াছিল ; আর আজ যখন সে মাথা তুলিয়া অসংগত তারস্বরে হাঁকিয়া বেড়ায় যে 'আর-সকলের দেশ আছে, আর আমাদের আছে স্বর্গ' তখনো বিশ্বসত্যের সঙ্গে তার বিচ্ছেদ। পূর্বের বিচ্ছেদ ছিল অজ্ঞানের, সুতরাং তাহা মার্জনীয় ; এখনকার বিচ্ছেদ শিক্ষিত মূঢ়তার, সুতরাং তাহা হাস্যকর এবং ততোধিক অনিষ্টকর।

সাধারণত, ভারতীয় বিদ্যা সম্বন্ধে আমাদের যে ধারণা সেও এই শ্রেণীর। শিক্ষা-ব্যবস্থার মধ্যে আমাদের নিজ দেশের বিদ্যার স্থান নাই, অথবা তার স্থান সব-পিছনে ; সেইজন্য আমাদের সমস্ত শিক্ষার মধ্যে এই কথাটি প্রচ্ছন্ন থাকে যে, আমাদের নিজ দেশের বিদ্যা বলিয়া পদার্থই নাই, যদি থাকে সেটা অপদার্থ বলিলেই হয়। এমন সময় হঠাৎ বিদেশী পণ্ডিতের মুখে আমাদের বিদ্যার সম্বন্ধে একটু যদি বাহবা শুনিতে পাই অমনি উন্মত্ত হইয়া বলিতে থাকি, পৃথিবীতে আর-সকলের বিদ্যা মানবী, আমাদের বিদ্যা দৈবী। অর্থাৎ, আর-সকল দেশের বিদ্যা মানবের স্বাভাবিক বুদ্ধিবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশ ভ্রম কাটাইয়া বাড়িয়া উঠিতেছে, কেবল আমাদের দেশেই বিদ্যা ব্রহ্মা বা শিবের প্রসাদে এক মুহূর্তে ঋষিদের ব্রহ্মরন্ধ্র দিয়া ভ্রমলেশবিবর্জিত হইয়া অনন্ত কালের উপযোগী আকারে বাহির হইয়া আসিয়াছে। ইংরেজিতে যাকে বলে স্পেশাল ক্রিয়েশন্ ইহা তাই, ইহাতে ক্রমবিকাশের প্রাকৃতিক নিয়ম খাটে না, ইহা ইতিহাসের ধারাবাহিক পথের অতীত, সুতরাং ইহাকে ঐতিহাসিক বিচারের অধীন করা চলে না ; ইহাকে কেবলমাত্র বিশ্বাসের দ্বারা বহন করিতে হইবে, বুদ্ধি দ্বারা গ্রহণ করিতে হইবে না। অহংকারের আঁখি লাগিয়া এ কথা আমরা একেবারে ভুলিয়া যাই যে, কোনো-একটি বিশেষ জাতির জন্যই বিধাতা সর্বাপেক্ষা অনুকূল ব্যবস্থা স্বহস্তে করিয়া দিয়াছেন, এ-সব কথা বর্বরকালের কথা। স্পেশাল ক্রিয়েশনের কথা আজিকার

দিনে আর ঠাঁই পায় না। আজ আমরা এই বুঝি যে, সত্যের সহিত সত্যের সম্বন্ধ, সকল বিদ্যার উদ্ভব যে নিয়মে বিশেষ বিদ্যার উদ্ভব সেই নিয়মেই। পৃথিবীতে কেবলমাত্র কয়েদীই অপর সাধারণের সহিত বিচ্ছিন্ন হইয়া সলিটারি সেলে থাকে। সত্যের অধিকার সম্বন্ধে বিধাতা কেবলমাত্র ভারতবর্ষকেই সেই সলিটারি সেলে অন্তরায়িত করিয়া রাখিয়াছেন, এ কথা ভারতের গৌরবের কথা নয়।

দীর্ঘকাল আমাদের বিদ্যাকে আমরা একঘরে করিয়া রাখিয়াছিলাম। দুই রকম করিয়া একঘরে করা যায়— এক অবজ্ঞার দ্বারা, আর-এক অতিসম্মানের দ্বারা। দুইয়েরই ফল এক। দুইয়েতেই তেজ নষ্ট করে। এক কালে জাপানের মিকাডো তাঁর দুর্ভেদ্য রাজকীয় সম্মানের বেড়ার মধ্যে প্রচ্ছন্ন থাকিতেন, প্রজাদের সঙ্গে তাঁর সম্বন্ধ ছিল না বলিলেই হয়। তার ফলে, শোগুন ছিল সত্যকার রাজা আর মিকাডো ছিলেন নামমাত্র রাজা। যখন মিকাডোকে যথার্থই আধিপত্য দিবার সংকল্প হইল তখন তাঁর অতিসম্মানের দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীর ভাঙিয়া তাঁহাকে সর্বসাধারণের গোচর করিয়া দেওয়া হইল। আমাদের ভারতীয় বিদ্যার প্রাচীরও তেমনি দুর্লঙ্ঘ্য ছিল। নিজেকে তাহা সকল দেশের বিদ্যা হইতে একান্ত স্বতন্ত্র করিয়া রাখিয়াছিল, পাছে বিপুল বিশ্বসাধারণের সম্পর্কে তার মধ্যে বিকার আসে। তার ফলে আমাদের দেশে সে হইল বিদ্যারাজ্যের মিকাডো, আর যে বিদেশী বিদ্যা বিশ্ববিদ্যার সঙ্গে অবিরত যোগ রক্ষা করিয়া নিয়তই আপন প্রাণশক্তিকে পরিপুষ্ট করিয়া তুলিতেছে সেই শোগুন হইয়া আমাদিগকে প্রবল প্রতাপে শাসন করিতেছে। আমরা অন্যটিকে উদ্দেশে নমস্কার করিয়া ইহাকেই প্রত্যক্ষ সেলাম করিলাম, ইহাকেই খাজনা দিলাম এবং ইহারই কানমলা খাইলাম। ঘরে আসিয়া ইহাকে ম্লেচ্ছ বলিয়া গাল দিলাম ; ইহার শাসনে আমাদের মতিগতি বিকৃত হইতেছে বলিয়া আক্ষেপ করিলাম ; এ দিকে স্ত্রীর গহনা বেচিয়া, নিজের বাস্তুবাড়ি বন্ধক রাখিয়া, ইহার খাজনার শেষ কড়িটি শোধ করিবার জন্য ছেলেটাকে নিত্য ইহার কাছারিতে হাঁটাহাঁটি করাইতে লাগিলাম।

শিশু যে সেই ধাত্রীর কোলে থাকে। সাধারণের ভিড় হইতে তাহাকে রক্ষা করিয়াই মানুষ করিতে হয়। তাহার ঘরটি নিভৃত, তাহার দোলাটি নিরাপদ। কিন্তু, তাহাকে যদি চিরদিনই ঢাকাঢুকি দিয়া ঘরের কোণে অঞ্চলের আড়াল করিয়া রাখি তাহা হইলে উলটা ফল হয়। অর্থাৎ, যে শিশু একদা অত্যন্ত স্বতন্ত্র ও সুরক্ষিত ছিল বলিয়াই পরিপুষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল সেই শিশুই বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া তাহার নিভৃত বেষ্টনের মধ্যে অকর্মণ্য, কাণ্ডজ্ঞানবিবর্জিত হইয়া উঠে। শুটির মধ্যে যে বীজ লালিত হইয়াছে খেতের মধ্যে সেই বীজের বর্ধিত হওয়া চাই।

একদিন চৈন পারসিক মৈশর গ্রীক রোমীয় প্রভৃতি প্রত্যেক বড়ো জাতিই ভারতীয়ের মতোই ন্যূনাধিক পরিমাণে নিজের সুরক্ষিত স্বাতন্ত্র্যের মধ্যে নিজ সভ্যতাকে বড়ো করিয়া তুলিয়াছিল। পৃথিবীর এখন বয়স হইয়াছে ; জাতিগত বিদ্যাস্বাতন্ত্র্যকে একান্তভাবে লালন করিবার দিন আজ আর নাই। আজ বিদ্যাসমবায়ের যুগ আসিয়াছে। সেই, সমবায়ে যে বিদ্যা যোগ দিবে না, যে বিদ্যা কৌলীন্যের অভিমানে অনূঢ়া হইয়া থাকিবে সে নিষ্ফল হইয়া মরিবে।

অতএব, আমাদের দেশে বিদ্যাসমবায়ের একটি বড়ো ক্ষেত্র চাই, যেখানে বিদ্যার আদান প্রদান ও তুলনা হইবে, যেখানে ভারতীয় বিদ্যাকে মানবের সকল বিদ্যার ক্রমবিকাশের মধ্যে রাখিয়া বিচার করিতে হইবে।

তাহা করিতে গেলে ভারতীয় বিদ্যাকে তাহার সমস্ত শাখা-উপশাখার যোগে সমগ্র করিয়া জানা চাই। ভারতীয় বিদ্যার সমগ্রতার জ্ঞানটিকে মনের মধ্যে পাইলে তাহার সঙ্গে বিশ্বের সমস্ত

বিদ্যার সম্বন্ধনির্ণয় স্বাভাবিক প্রণালীতে হইতে পারে। কাছের জিনিসের বোধ দূরের জিনিসের বোধের সহজ ভিত্তি।

বিদ্যার নদী আমাদের দেশে বৈদিক, পৌরাণিক, বৌদ্ধ, জৈন, প্রধানত এই চারি শাখায় প্রবাহিত। ভারতচিত্তগঙ্গোত্রীতে ইহার উদ্ভব। কিন্তু যে দেশে নদী চলিতেছে কেবল সেই দেশের জলেই সেই নদী পুষ্ট না হইতেও পারে। ভারতের গঙ্গার সঙ্গে তিব্বতের ব্রহ্মপুত্র মিলিয়াছে। ভারতের বিদ্যার স্রোতেও সেইরূপ মিলন ঘটিয়াছে। বাহির হইতে মুসলমান যে জ্ঞান ও ভাবের ধারা এখানে বহন করিয়া আনিয়াছে সেই ধারা ভারতের চিত্তকে স্তরে স্তরে অভিষিক্ত করিয়াছে, তাহা আমাদের ভাষায় আচারে শিল্পে সাহিত্যে সংগীতে নানা আকারে প্রকাশমান। অবশেষ সম্প্রতি য়ুরোপীয় বিদ্যার বন্যা সকল বাঁধ ভাঙিয়া দেশকে প্লাবিত করিয়াছে; তাহাকে হাসিয়া উড়াইতেও পারি না, কাঁদিয়া ঠেকানোও সম্ভবপর নহে।

অতএব, আমাদের বিদ্যায়তনের বৈদিক, পৌরাণিক, বৌদ্ধ, জৈন, মুসলমান ও পার্সি বিদ্যার সমবেত চর্চায় আনুষঙ্গিকভাবে য়ুরোপীয় বিদ্যাকে স্থান দিতে হইবে।

সমস্ত পৃথিবীকে বাদ দিয়া যাহারা ভারতকে একান্ত করিয়া দেখে তাহারা ভারতকে সত্য করিয়া দেখে না। তেমনি যাহারা ভারতের কেবল এক অংশকেই ভারতের সমগ্রতা হইতে খণ্ডিত করিয়া দেখে তাহারাও ভারতচিত্তকে নিজের চিত্তের মধ্যে উপলব্ধি করিতে পারে না। এই কারণবশতই পোলিটিক্যাল ঐক্যের অপেক্ষা গভীরতর উচ্চতর মহত্তর যে ঐক্য আছে তার কথা আমরা শ্রদ্ধার সহিত গ্রহণ করিতে পারি না। পৃথিবীর সকল ঐক্যের যাহা শাশ্বত ভিত্তি তাহাই সত্য ঐক্য। সে ঐক্য চিত্তের ঐক্য, আত্মার ঐক্য। ভারতে সেই চিত্তের ঐক্যকে পোলিটিকাল ঐক্যের চেয়ে বড়ো বলিয়া জানিতে হইবে; কারণ, এই ঐক্যে সমস্ত পৃথিবীকে ভারতবর্ষ আপন অঙ্গনে আহ্বান করিতে পারে। অথচ, দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদের বর্তমান শিক্ষা এমন যে, সেই শিক্ষার গুণেই ভারতীয় চিত্তকে আমরা তাহার স্বরাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিতেছি না। ভারতের হিন্দু বৌদ্ধ জৈন মুসলমান শিখ পার্সি খৃস্টানকে এক বিরাট চিত্তক্ষেত্রে সত্যসাধনার যজ্ঞে সমবেত করাই ভারতীয় বিদ্যায়তনের প্রধান কাজ— ছাত্রদিগকে কেবল ইংরেজি মুখস্থ করানো, অঙ্ক কষানো, সায়ান্স্‌ শেখানো নহে। লইবার জন্য অঞ্জলিকে বাঁধিতে হয়, দিবার জন্যও; দশ আঙুল ফাঁক করিয়া দেওয়াও যায় না, লওয়াও যায় না। ভারতের চিত্তকে একত্র সন্নিবিষ্ট করিলে তবে আমরা সত্যভাবে লইতেও পারিব, দিতেও পারিব।

আশ্বিন-কার্তিক ১৩২৬

শিক্ষার মিলন

এ কথা মানতেই হবে যে, আজকের দিনে পৃথিবীতে পশ্চিমের লোক জয়ী হয়েছে। পৃথিবীকে তারা কামধেনুর মতো দোহন করছে, তাদের পাত্র ছাপিয়ে গেল। আমরা বাইরে দাঁড়িয়ে হাঁ করে তাকিয়ে আছি, দিন দিন দেখছি আমাদের ভোগে অন্নের ভাগ কম পড়ে যাচ্ছে। ক্ষুধার তাপ বাড়তে থাকলে ক্রোধের তাপও বেড়ে ওঠে; মনে মনে ভাবি, যে মানুষটা খাচ্ছে ওটাকে একবার সুযোগমতো পেলে হয়। কিন্তু ওটাকে পাব কি, ঐ-ই আমাদের পেয়ে বসেছে; সুযোগ এ পর্যন্ত ওরই হাতে আছে, আমাদের হাতে এসে পৌঁছয় নি।

কিন্তু কেন এসে পৌঁছয় নি? বিশ্বকে ভোগ করবার অধিকার ওরা কেন পেয়েছে? নিশ্চয়ই সে কোনো-একটা সত্যের জোরে। আমরা কোনো উপায়ে দল বেঁধে বাইরে থেকে ওদের খোরাক বন্ধ করে নিজের খোরাক বরাদ্দ করব, কথাটা এতই সোজা নয়। ড্রাইভারটার মাথায় বাড়ি দিলেই যে এঞ্জিনটা তখনই আমার বশে চলবে, এ কথা মনে করা ভুল। বস্তুত, ড্রাইভারের মূর্তি ধরে ওখানে একটা বিদ্যা এঞ্জিন চালাচ্ছে। অতএব শুধু আমার রাগের আগুনে এঞ্জিন চলবে না, বিদ্যাটা দখল করা চাই— তা হলেই সত্যের বর পাব।

মনে করো এক বাপের দুই ছেলে। বাপ স্বয়ং মোটর হাঁকিয়ে চলেন। তাঁর ভাবখানা এই, ছেলেদের মধ্যে মোটর চালাতে যে শিখবে মোটর তারই হবে। ওর মধ্যে একটি চালাক ছেলে আছে, তার কৌতূহলের অন্ত নেই। সে তন্ন তন্ন করে দেখে গাড়ি চলে কী করে। অন্য ছেলেটি ভালোমানুষ, সে ভক্তিভরে বাপের পায়ের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে ; তাঁর দুই হাত মোটরের হাল্ যে কোন্ দিকে কেমন করে ঘোরাচ্ছে তার দিকেও খেয়াল নেই। চালাক ছেলেটি মোটরের কলকারখানা পুরোপুরি শিখে নিলে এবং একদিন গাড়িখানা নিজের হাতে বাগিয়ে নিয়ে ঊর্ধ্বস্বরে বাঁশি বাজিয়ে দৌড় মারলে। গাড়ি চালাবার শখ দিন রাত এমনি তাকে পেয়ে বসল যে, বাপ আছেন কি নেই সে হুঁশই তার রইল না। তাই বলেই তার বাপ যে তাকে তলব করে গালে চড় মেরে তার গাড়িটা কেড়ে নিলেন তা নয় ; তিনি স্বয়ং যে রথের রথী তাঁর ছেলেও যে সেই রথেরই রথী, এতে তিনি প্রসন্ন হলেন। ভালোমানুষ ছেলে দেখলে, ভায়াটি তার পাকা ফসলের খেত লণ্ডভণ্ড করে তার মধ্যে দিয়ে দিনে দুপুরে হাওয়া গাড়ি চালিয়ে বেড়াচ্ছে ; তাকে রোখে কার সাধ্য, তার সামনে দাঁড়িয়ে বাপের দোহাই পাড়লে মরণং ধ্রুবং— তখনো সে বাপের পায়ের দিকে তাকিয়ে রইল আর বললে, 'আমার আর কিছুতে দরকার নেই।'

কিন্তু দরকার নেই বলে কোনো সত্যকার দরকারকে যে মানুষ খাটো করেছে তাকে দুঃখ পেতেই হবে। প্রত্যেক দরকারেরই একটা মর্যাদা আছে, সেইটুকুর মধ্যে তাকে মানলে তবেই ছাড়পত্র পাওয়া যায়। দরকারকে অবজ্ঞা করলে তার কাছে চিরঋণী হয়ে সুদ দিতে দিতে জীবন কেটে যায়। তাকে ঠিক পরিমাণে মেনে তবে আমরা মুক্তি পাই। পরীক্ষকের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবার সব চেয়ে প্রশস্ত রাস্তা হচ্ছে পরীক্ষায় পাস করা।

বিশ্বের একটা বাইরের দিক আছে, সেই দিকে সে মস্ত একটা কল। সে দিকে তার বাঁধা নিয়মের এক চুল এদিক-ওদিক হবার জো নেই। এই বিরাট বস্তুবিশ্ব আমাদের নানা রকমে বাধা দেয় ; কুঁড়েমি করে বা মূর্খতা করে যে তাকে এড়াতে গেছে বাধাকে সে ফাঁকি দিতে পারে নি, নিজেকেই ফাঁকি দিয়েছে। অপর পক্ষে বস্তুর নিয়ম যে শিখেছে শুধু যে বস্তুর বাধা তার কেটেছে তা নয়, বস্তু স্বয়ং তার সহায় হয়েছে— বস্তু বিশ্বের দুর্গম পথে ছুটে চলবার বিদ্যা তার হাতে, সকল জায়গায় সকলের আগে গিয়ে সে পৌঁছতে পারে বলে বিশ্বভোজের প্রথম ভাগটা পড়ে তারই পাতে ; আর, পথ হাঁটতে হাঁটতে যাদের বেলা বয়ে যায় তারা গিয়ে দেখে যে, তাদের ভাগ্যে হয় অতি সামান্যই বাকি, নয় সমস্তই ফাঁকি।

এমন অবস্থায়, পশ্চিমের লোকে যে বিদ্যার জোরে বিশ্ব জয় করেছে সেই বিদ্যাকে গাল পাড়তে থাকলে দুঃখ কমবে না, কেবল অপরাধ বাড়বে। কেননা, বিদ্যা যে সত্য। কিন্তু এ কথা যদি বল' শুধু তো বিদ্যা নয় বিদ্যার সঙ্গে সঙ্গে শয়তানিও আছে তা হলে বলতে হবে, ঐ শয়তানির যোগেই ওদের মরণ। কেননা, শয়তানি সত্য নয়।

জন্তুরা আহার পায় বাঁচে, আঘাত পায় মরে, যেটাকে পায় সেটাকেই বিনা তর্কে মেনে নেয়।

কিন্তু মানুষের সব চেয়ে বড়ো স্বভাব হচ্ছে মেনে না নেওয়া। জন্তুরা বিদ্রোহী নয়, মানুষ বিদ্রোহী। বাইরে থেকে যা ঘটে, যাতে তার নিজের কোনো হাত নেই, কোনো সায় নেই, সেই ঘটনাকে মানুষ একেবারে চূড়ান্ত বলে স্বীকার করে নি বলেই জীবের ইতিহাসে সে আজ অত বড়ো গৌরবের পদ দখল করে বসেছে। আসল কথা, মানুষ একেবারেই ভালোমানুষ নয়। ইতিহাসের আদিকাল থেকে মানুষ বলেছে, বিশ্বঘটনার উপরে সে কর্তৃত্ব করবে। কেমন করে করবে? না, ঘটনার পিছনে যে প্রেরণা আছে, যার থেকে ঘটনাগুলো বেরিয়ে এসেছে, তারই সঙ্গে কোনোমতে যদি রফা করতে বা তাকে বাধ্য করতে পারে তা হলেই সে আর ঘটনার দলে থাকবে না, ঘটয়িতার দলে গিয়ে ভর্তি হবে। সাধনা আরম্ভ করলে মন্ত্রতন্ত্র নিয়ে। গোড়ায় তার বিশ্বাস ছিল, জগতে যা-কিছু ঘটছে এ-সমস্তই একটা অদ্ভুত জাদুশক্তির জোরে, অতএব তারও যদি জাদুশক্তি থাকে তবেই শক্তির সঙ্গে অনুরূপ শক্তির যোগে সে কর্তৃত্ব লাভ করতে পারে।

সেই জাদুমন্ত্রের সাধনায় মানুষ যে চেষ্টা শুরু করেছিল আজ বিজ্ঞানের সাধনায় তার সেই চেষ্টার পরিণতি। এই চেষ্টার মূল কথাটা হচ্ছে : মানব না, মানাব। অতএব, যারা এই চেষ্টায় সিদ্ধি লাভ করেছে তারাই বাহিরের বিশ্বে প্রভু হয়েছে, দাস নেই। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে নিয়মের কোথাও একটুও ত্রুটি থাকতে পারে না, এই বিশ্বাসটাই বৈজ্ঞানিক বিশ্বাস। এ বিশ্বাসের জোরেই জিত হয়। পশ্চিমের লোকে এই বৈজ্ঞানিক বিশ্বাসে ভর করে নিয়মকে চেপে ধরেছে, আর তারা বাইরের জগতের সকল সংকট তরে যাচ্ছে। এখনো যারা বিশ্বব্যাপারে জাদুকে অস্বীকার করতে ভয় পায় এবং দায়ে ঠেকলে জাদুর শরণাপন্ন হবার জন্যে যাদের মন ঝোঁকে, বাইরের বিশ্বে তারা সকল দিকেই মার খেয়ে মরছে, তারা আর কর্তৃত্ব পেল না।

পূর্বদেশে আমরা যে সময়ে রোগ হলে ভূতের ওঝাকে ডাকছি, দৈন্য হলে গ্রহশান্তির জন্যে দৈবজ্ঞের দ্বারে দৌড়াচ্ছি, বসন্তমারীকে ঠেকিয়ে রাখবার ভার দিচ্ছি শীতলাদেবীর 'পরে, আর শত্রুকে মারবার জন্যে মারণ উচাটন মন্ত্র আওড়াতে বসেছি, ঠিক সেই সময়ে পশ্চিম মহদেশে ভল্‌টেয়ারকে একজন মেয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'শুনেছি নাকি মন্ত্রগুণে পালকে পাল ভেড়া মেরে ফেলা যায়, সে কি সত্য?' ভল্‌টেয়ার জবাব দিয়েছিলেন, 'নিশ্চয়ই মেরে ফেলা যায়, কিন্তু তার সঙ্গে যথোচিত পরিমাণে সেঁকো বিষ থাকা চাই।' য়ুরোপের কোনো কোণে-কানাচে জাদুমন্ত্রের 'পরে বিশ্বাস কিছুমাত্র নেই এমন কথা বলা যায় না, কিন্তু এ সম্বন্ধে সেঁকো বিষটার প্রতি বিশ্বাস সেখানে প্রায় সর্ববাদিসম্মত। এইজন্যেই ওরা ইচ্ছা করলেই মারতে পারে, আর আমরা ইচ্ছে না করলেও মরতে পারি।

আজ এ কথা বলা বাহুল্য যে, বিশ্বশক্তি হচ্ছে ত্রুটিবিহীন বিশ্বনিয়মেরই রূপ; আমাদের নিয়ন্ত্রিত বুদ্ধি এই নিয়ন্ত্রিত শক্তিকে উপলব্ধি করে। বুদ্ধির নিয়মের সঙ্গে এই বিশ্বের নিয়মের সামঞ্জস্য আছে; এইজন্যে, এই নিয়মের 'পরে অধিকার আমাদের প্রত্যেকের নিজের মধ্যেই নিহিত এই কথা জেনে তবেই আমরা আত্মশক্তির উপর নিঃশেষে ভর দিয়ে দাঁড়াতে পেরেছি। বিশ্বব্যাপারে যে মানুষ আকস্মিকতাকে মানে সে নিজেকে মানতে সাহস করে না, সে যখন-তখন যাকে-তাকে মেনে বসে; শরণাগত হবার জন্যে সে একেবারে ব্যাকুল। মানুষ যখন ভাবে বিশ্বব্যাপারে তার নিজের বুদ্ধি খাটে না তখন সে আর সন্ধান করতে চায় না, প্রশ্ন করতে চায় না; তখন সে বাইরের দিকে কর্তাকে খুঁজে বেড়ায়। এইজন্যে বাইরের দিকে সকলেরই কাছে সে ঠকছে, পুলিশের দারোগা থেকে ম্যালেরিয়ার মশা পর্যন্ত। বুদ্ধির ভীরুতাই হচ্ছে শক্তিহীনতার প্রধান আড্ডা।

পশ্চিমদেশে পোলিটিকাল স্বাতন্ত্র্যের যথার্থ বিকাশ হতে আরম্ভ হয়েছে কখন থেকে? অর্থাৎ কখন থেকে দেশের সকল লোক এই কথা বুঝেছে যে, রাষ্ট্রনিয়ম ব্যক্তিবিশেষের বা সম্প্রদায়বিশেষের খেয়ালের জিনিস নয়, সেই নিয়মের সঙ্গে তাদের প্রত্যেকের সম্মতির সম্বন্ধ আছে? যখন থেকে বিজ্ঞানের আলোচনায় তাদের মনকে ভয়মুক্ত করেছে। যখন থেকে তারা জেনেছে, সেই নিয়মই সত্য যে নিয়ম ব্যক্তিবিশেষের কল্পনার দ্বারা বিকৃত হয় না, খেয়ালের দ্বারা বিচলিত হয় না। বিপুলকায় রাশিয়া সুদীর্ঘকাল রাজার গোলামি করে এসেছে, তার দুঃখের আর অন্ত ছিল না। তার প্রধান কারণ, সেখানকার অধিকাংশ প্রজাই সকল বিষয়েই দৈবকে মেনেছে, নিজের বুদ্ধিকে মানে নি। আজ যদি-বা তার রাজা গেল, কাঁধের উপরে তখনি আর-এক উৎপাত চড়ে বসে তাকে রক্তসমুদ্র সাঁতরিয়ে নিয়ে দুর্ভিক্ষের মরুডাঙায় আধমরা করে পৌঁছিয়ে দিলে। এর কারণ স্বরাজের প্রতিষ্ঠা বাইরে নয়, যে আত্মবুদ্ধির প্রতি আস্থা আত্মশক্তির প্রধান অবলম্বন সেই আস্থার উপরে।

আমি একদিন একটি গ্রামের উন্নতি করতে গিয়েছিলুম। গ্রামের লোকেদের জিজ্ঞাসা করলুম, 'সেদিন তোদের পাড়ায় আগুন লাগল, একখানা চালাও বাঁচাতে পারলি নে কেন?' তারা বললে, 'কপাল!' আমি বললেম, 'কপাল নয় রে, কুয়োর অভাব। পাড়ায় একখানা কুয়ো দিস নে কেন?' তারা তখনি বললে, 'আজ্ঞে কর্তার ইচ্ছে হলেই হয়।' যাদের ঘরে আগুন লাগাবার বেলায় থাকে দৈব তাদেরই জল দান করবার ভার কোনো-একটি কর্তার। সুতরাং, যে করে হোক এরা একটা কর্তা পেলে বেঁচে যায়। তাই এদের কপালে আর-সকল অভাবই থাকে, কিন্তু কোনো কালেই কর্তার অভাব হয় না।

বিশ্বরাজ্যে দেবতা আমাদের স্বরাজ দিয়ে বসে আছেন। অর্থাৎ, বিশ্বের নিয়মকে তিনি সাধারণের নিয়ম করে দিয়েছেন। এই নিয়মকে নিজের হাতে গ্রহণ করার দ্বারা আমরা প্রত্যেকে যে কর্তৃত্ব পেতে পারি তার থেকে কেবলমাত্র আমাদের মোহ আমাদের বঞ্চিত করতে পারে, আর-কেউ না, আর-কিছুতে না। এইজন্যেই আমাদের উপনিষৎ এই দেবতা সম্বন্ধে বলেছেন : যাথাতথ্যতোহর্থান্ ব্যদধাৎ শাশ্বতীভ্যঃ সমাভ্যঃ। অর্থাৎ, অর্থের বিধান তিনি যা করেছেন সে বিধান যথাতথ, তাতে খামখেয়ালি এতটুকুও নেই, এবং সে বিধান শাশ্বত কালের, আজ একরকম কাল একরকম নয়। এর মানে হচ্ছে, অর্থরাজ্যে তাঁর বিধান তিনি চিরকালের জন্যে পাকা করে দিয়েছেন। এ না হলে মানুষকে চিরকাল তাঁর আঁচল-ধরা হয়ে দুর্বল হয়ে থাকতে হত ; কেবলই এ ভয়ে, ও ভয়ে সে ভয়ে, পেয়াদার ঘুষ জুগিয়ে ফতুর হতে হত। কিন্তু, তাঁর পেয়াদার ছদ্মবেশধারী মিথ্যা বিভীষিকার হাত থেকে আমাদের বাঁচিয়েছে যে দলিল সে হচ্ছে তাঁর বিশ্বরাজ্যে আমাদের স্বরাজের দলিল ; তারই মহা আশ্বাসবাণী হচ্ছে ; যাথাতথ্যতোহর্থান্ ব্যদধাৎ শাশ্বতীভ্যঃ সমাভ্যঃ। তিনি অনন্তকাল থেকে অনন্তকালের জন্য অর্থের যে বিধান করেছেন তা যথাতথ। তিনি তাঁর সূর্য চন্দ্র গ্রহ নক্ষত্রে এই কথা লিখে দিয়েছেন, 'বস্তুরাজ্যে আমাকে না হলেও তোমার চলবে, ওখান থেকে আমি আড়ালে দাঁড়ালুম। এক দিকে রইল আমার বিশ্বের নিয়ম, আর-এক দিকে রইল তোমার বুদ্ধির নিয়ম, এই দুয়ের যোগে তুমি বড়ো হও। জয় হোক তোমার, এ রাজ্য তোমারই হোক, এর ধন তোমার, অস্ত্র তোমারই।' এই বিধিদত্ত স্বরাজ যে গ্রহণ করেছে অন্য সকল রকম স্বরাজ সে পাবে, আর পেয়ে রক্ষা করতে পারবে।

কিন্তু নিজের বুদ্ধিবিভাগে যে লোক কর্তাভজা পোলিটিক্যাল বিভাগেও কর্তাভজা হওয়া ছাড়া তার আর গতি নেই। বিধাতা স্বয়ং যেখানে কর্তৃত্ব দাবি করেন না সেখানেও যারা কর্তা জুটিয়ে বসে, যেখানে সম্মান দেন সেখানেও যারা আত্মাবমাননা করে, তাদের স্বরাজে রাজার পর রাজার আমদানি হবে ; কেবল ছোট্টো ঐ স্ব'টুকুকে বাঁচানোই দায় হবে।

মানুষের বুদ্ধিকে ভূতের উপদ্রব এবং অদ্ভুতের শাসন থেকে মুক্তি দেবার ভার যে পেয়েছে তার বাসাটা পূর্বেই হোক আর পশ্চিমেই হোক তাকে ওস্তাদ বলে কবুল করতে হবে। দেবতার অধিকার আধ্যাত্মিক মহলে, আর দৈত্যের অধিকার বিশ্বের আধিভৌতিক মহলে। দৈত্য বলছি আমি বিশ্বের সেই শক্তিরূপকে যা সূর্যনক্ষত্র নিয়ে আকাশে আকাশে তালে তালে চক্রে চক্রে লাঠিম ঘুরিয়ে বেড়ায়। সেই আধিভৌতিক রাজ্যের প্রধান বিদ্যাটা আজ শুক্রাচার্যের হাতে। সেই বিদ্যাটার নাম সঞ্জীবনী বিদ্যা। সেই বিদ্যার জোরে সম্যকরূপে জীবনরক্ষা হয়, জীবনপোষণ হয়, জীবনের সকলপ্রকার দুর্গতি দূর হতে থাকে ; অন্নের অভাব, বস্ত্রের অভাব, স্বাস্থ্যের অভাব মোচন হয় ; জড়ের অত্যাচার, জন্তুর অত্যাচার, মানুষের অত্যাচার থেকে এই বিদ্যাই রক্ষা করে। এই বিদ্যা যথাতথ বিধির বিদ্যা ; এ যখন আমাদের বুদ্ধির সঙ্গে মিলবে তখনই স্বাতন্ত্র্যলাভের গোড়াপত্তন হবে, অন্য উপায় নেই।

এই শিক্ষা থেকে ভ্রষ্টতার একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক। হিন্দুর কুয়ো থেকে মুসলমানে জল তুললে তাতে জল অপবিত্র করে। এটা বিষম মুশকিলের কথা। কেননা, পবিত্রতা হল আধ্যাত্মিক রাজ্যের আর কুয়োর জলটা হল বস্তুরাজ্যের। যদি বলা যেত, মুসলমানকে ঘৃণা করলে মন অপবিত্র হয় তা হলে সে কথা বোঝা যেত ; কেননা, সেটা আধ্যাত্মিক মহলের কথা। কিন্তু মুসলমানের ঘড়ার মধ্যে অপবিত্রতা আছে বললে তর্কের সীমানাগত জিনিসকে তর্কের সীমানার বাইরে নিয়ে গিয়ে বুদ্ধিকে ফাঁকি দেওয়া হয়। পশ্চিম-ইস্কুল-মাস্টারের আধুনিক হিন্দু ছাত্র বলবে, আসলে ওটা স্বাস্থ্যতত্ত্বের কথা। কিন্তু স্বাস্থ্যতত্ত্বের কোনো অধ্যায়ে তো পবিত্রতার বিচার নেই ; ইংরেজের ছাত্র বলবে, আধিভৌতিকে যাদের শ্রদ্ধা নেই আধ্যাত্মিকের দোহাই দিয়ে তাদের ভুলিয়ে কাজ করাতে হয়। এ জবাবটা একেবারেই ভালো নয়। কারণ, যাদের বাইরে থেকে ভুলিয়ে কাজ আদায় করতে হয় চিরদিনই বাইরে থেকে তাদের কাজ করাতে হবে ; নিজের থেকে কাজ করার শক্তি তাদের থাকবে না, সুতরাং কর্তা না হলে তাদের অচল হবে। আর-একটি কথা, ভুল যখন সত্যের সহায়তা করতে যায় তখনো সে সত্যকে চাপা দেয়। 'মুসলমানের ঘড়া হিন্দুর কুয়োর জল অপরিষ্কার করে' না ব'লে যেই বলা হয় 'অপবিত্র করে', তখনই সত্যনির্ণয়ের সমস্ত পথ বন্ধ করা হয়। কেননা কোনো জিনিস কিছুকে অপরিষ্কার করে কি না-করে সেটা প্রমাণসাপেক্ষ। সে স্থলে হিন্দুর ঘড়া, মুসলমানের ঘড়া— হিন্দুর কুয়োর জল, মুসলমানের কুয়োর জল— হিন্দুপাড়ার স্বাস্থ্য, মুসলমানপাড়ার স্বাস্থ্য— যথানিয়মে ও যথেষ্ট পরিমাণে তুলনা করে পরীক্ষা করে দেখা চাই। পবিত্রতাঘটিত দোষ অন্তরের ; কিন্তু স্বাস্থ্যঘটিত দোষ বাইরের, অতএব বাইরে থেকে তার প্রতিকার চলে। স্বাস্থ্যতত্ত্ব হিসাবে ঘড়া পরিষ্কার রাখার নিয়ম বৈজ্ঞানিক নিয়ম ; তা মুসলমানের পক্ষেও যেমন হিন্দুর পক্ষেও তেমনি ; সেটা যাতে উভয় পক্ষে সমান গ্রহণ ক'রে উভয়ের কুয়ো উভয়েই ব্যবহার করতে পারে সেইটেই চেষ্টার বিষয়। কিন্তু বাহ্য বস্তুকে অপরিষ্কার না বলে অপবিত্র বলার দ্বারা চিরকালের জন্যেই এ সমস্যাকে সাধারণের বুদ্ধি ও চেষ্টার বাইরে নির্বাসিত করে রাখা হয়। এটা কি কাজ সারার পক্ষেও ভালো রাস্তা? এক দিকে বুদ্ধিকে মুগ্ধ রেখে আর-এক দিকে সেই মূঢ়তার সাহায্য নিয়েই ফাঁকি দিয়ে কাজ চালানো, এটা কি কোনো উচ্চ অধিকারের পথ? চালিত যে তার দিকে অবুদ্ধি, আর চালক যে তার দিকে অসত্য, এই দু'য়ের সম্মিলনে কি কোনো কল্যাণ হতে পারে? এইরকম বুদ্ধিগত কাপুরুষতা থেকে দেশকে বাঁচাবার জন্যে আমাদের যেতে হবে শুক্রাচার্যের ঘরে। সে ঘর পশ্চিম-দুয়ারি বলে যদি খামকা বলে বসি 'ও ঘরটা অপবিত্র' তা হলে যে বিদ্যা বাইরের নিয়মের কথা শেখায় তার থেকে বঞ্চিত হব, আর যে বিদ্যা অন্তরের পবিত্রতার কথা বলে তাকেও ছোটো করা হবে।

এই প্রসঙ্গে একটা তর্ক ওঠবার আশঙ্কা আছে। এ কথা অনেকে বলবেন, পশ্চিমদেশ যখন বুনো ছিল, পশুচর্ম প'রে মৃগয়া করত, তখন কি আমরা নিজের দেশকে অন্ন জোগাই নি? বস্ত্র জোগাই নি? ওরা যখন দলে দলে সমুদ্রের এ পারে, ও পারে, দস্যুবৃত্তি করে বেড়াত আমরা কি তখন স্বরাজশাসনবিধি আবিষ্কার করি নি? নিশ্চয় করেছি, কিন্তু কারণটা কী? আর তো কিছুই নয়, বস্তুবিদ্যা ও নিয়মতত্ত্ব ওরা যতটা শিখেছিল আমরা তার চেয়ে বেশি শিখেছিলেম। পশুচর্ম পরতে যে বিদ্যা লাগে তাঁত বুনতে তার চেয়ে অনেক বেশি বিদ্যার দরকার, পশু মেরে খেতে যে বিদ্যা খাটাতে হয় চাষ করে খেতে তার চেয়ে অনেক বেশি বিদ্যা লাগে। দস্যুবৃত্তিতে যে বিদ্যা রাজ্যচালনে ও পালনে তার চেয়ে অনেক বেশি। আজ আমাদের পরস্পরের অবস্থাটা যদি একেবারে উল্‌টে গিয়ে থাকে তার মধ্যে দৈবের কোনো ফাঁকি নেই। কলিঙ্গের রাজাকে পথে ভাসিয়ে দিয়ে বনের ব্যাধকে আজ সিংহাসনে যে চড়িয়ে দিয়েছে সে তো কোনো দৈব নয়, সে ঐ বিদ্যা। অতএব, আমাদের সঙ্গে ওদের প্রতিযোগিতার জোর কোনো বাহ্য ক্রিয়াকলাপে কমবে না; ওদের বিদ্যাকে আমাদের বিদ্যা করতে পারলে তবেই ওদের সামলানো যাবে। এ কথার একমাত্র অর্থ, আমাদের সর্বপ্রধান সমস্যা শিক্ষাসমস্যা। অতএব শুক্রাচার্যের আশ্রমে আমাদের যেতে হচ্ছে।

এই পর্যন্ত এগিয়ে একটা কথায় এসে মন ঠেকে যায়। সামনে এই প্রশ্নটা দেখা দেয়, 'সব মানলেম, কিন্তু পশ্চিমের যে শক্তিরূপ দেখে এলে তাতে কি তৃপ্তি পেয়েছ?' না, পাই নি। সেখানে ভোগের চেহারা দেখেছি, আনন্দের না। অনবচ্ছিন্ন সাত মাস আমেরিকায় ঐশ্বর্যের দানবপুরীতে ছিলেম। দানব মন্দ অর্থে বলছি নে, ইংরেজিতে বলতে হলে হয়তো বলবেন, টাইট্যানিক ওয়েল্‌থ্‌। অর্থাৎ, যে ঐশ্বর্যের শক্তি প্রবল, আয়তন বিপুল। হোটেলের জানলার কাছে রোজ ত্রিশ-পঁয়ত্রিশতলা বাড়ির ভ্রূকুটির সামনে ব'সে থাকতেম আর মনে মনে বলতেম, লক্ষ্মী হলেন এক, আর কুবের হল আর— অনেক তফাত। লক্ষ্মীর অন্তরের কথাটি হচ্ছে কল্যাণ, সেই কল্যাণের দ্বারা ধন শ্রীলাভ করে। কুবেরের অন্তরের কথাটি হচ্ছে সংগ্রহ, সেই সংগ্রহের দ্বারা ধন বহুলত্ব লাভ করে। বহুলত্বের কোনো চরম অর্থ নেই। দুই দুগুণে চার, চার দুগুণে আট, আট দুগুণে ষোলো, অঙ্কগুলো ব্যাঙের মতো লাফিয়ে চলে; সেই লাফের পাল্লা কেবলই লম্বা হতে থাকে। এই নিরন্তর উল্লম্ফনের ঝোঁকের মাঝখানে যে প'ড়ে গেছে তার রোখ চেপে যায়, রক্ত গরম হয়ে ওঠে, বাহাদুরির মত্ততায় সে ভোঁ হয়ে যায়। আর, যে লোক বাইরে বসে আছে তার যে কত বড়ো পীড়া এইখানে তার একটা উপমা দিই।

একদিন আশ্বিনের ভরা নদীতে আমি বজরার জানলায় বসেছিলেম, সেদিন পূর্ণিমার সন্ধ্যা। অদূরে ডাঙার উপরে এক গহনার নৌকোর ভোজপুরি মাল্লার দল উৎকট উৎসাহে আত্মবিনোদনের কাজে লেগে গিয়েছিল। তাদের কারো হাতে ছিল মাদল, কারো হাতে করতাল। তাদের কণ্ঠে সুরের আভাসমাত্র ছিল না, কিন্তু বাহুতে শক্তি ছিল সে কথা কার সাধ্য অস্বীকার করে। খচমচ শব্দে তালের নাচন ক্রমেই দুন চৌদুন লয়ে চড়তে লাগল। রাত এগারোটা হয়, দুপুর বাজে, ওরা থামতেই চায় না। কেননা, থামবার কোনোই সংগত কারণ নেই। সঙ্গে যদি গান থাকত তা হলে সমও থাকত; কিন্তু অরাজক তালের গতি আছে শান্তি নেই, উত্তেজনা আছে পরিতৃপ্তি নেই। সেই তালমাতালের দল প্রতিক্ষণেই ভাবছিল ভরপুর মজা হচ্ছে। আমি ছিলেম তাণ্ডবের বাইরে, আমিই বুঝছিলেম গানহীন তালের দৌরাত্ম্য বড়ো অসহ্য।

তেমনি করেই আট্‌লান্টিকের ও পারে ইঁটপাথরের জঙ্গলে ব'সে আমার মন প্রতিদিনই

পীড়িত হয়ে বলেছে, তাদের খচমচ'র অন্ত নেই, কিন্তু সুর কোথায়! আরো চাই, আরো চাই, আরো চাই, এ বাণীতে তো সৃষ্টির সুর লাগে না। তাই সেদিন সেই ভ্রূকুটিকুটিল অভ্রভেদী ঐশ্বর্যের সামনে দাঁড়িয়ে ধনমানহীন ভারতের একটি সন্তান প্রতিদিন ধিক্কারের সঙ্গে বলেছে: ততঃ কিম্!

এ কথা বার বার বলেছি, আবার বলি, আমি বৈরাগ্যের নাম করে শূন্য ঝুলির সমর্থন করি নে। আমি এই বলি, অন্তরে গান ব'লে সত্যটি যদি ভরপুর থাকে তবে তার সাধনায় সুর-তালের চেষ্টা থাকে রসের সংযমরক্ষার; বাহিরের বৈরাগ্য অন্তরের পূর্ণতার সাক্ষ্য দেয়। কোলাহলের উচ্ছৃঙ্খল নেশায় সংযমের কোনো বালাই নেই। অন্তরে প্রেম ব'লে সত্যটি যদি থাকে তবে তার সাধনায় ভোগকে হতে হয় সংযত, সেবাকে হতে হয় খাঁটি। এই সাধনার সতীত্ব থাকা চাই। এই সতীত্বের যে বৈরাগ্য অর্থাৎ সংযম সেই হল প্রকৃত বৈরাগ্য। অন্নপূর্ণার সঙ্গে বৈরাগীর যে মিলন সেই হল প্রকৃত মিলন।

যখন জাপানে ছিলেম তখন প্রাচীন জাপানের যে রূপ সেখানে দেখেছি সে আমাকে গভীর তৃপ্তি দিয়েছে। কেননা, অর্থহীন বহুলতা তার বাহন নয়। প্রাচীন জাপান আপন হৃৎপদ্মের মাঝখানে সুন্দরকে পেয়েছিল। তার সমস্তই বেশভূষা, কর্ম খেলা, তার বাসা আসবাব, তার শিষ্টাচার ধর্মানুষ্ঠান, সমস্ত একটি মূল ভাবের দ্বারা অধিকৃত হয়ে সেই এককে সেই সুন্দরকে বৈচিত্র্যের মধ্যে প্রকাশ করেছে। একান্ত রিক্ততাও নিরর্থক, একান্ত বহুলতাও তেমনি। প্রাচীন জাপানের যে জিনিসটি আমার চোখে পড়েছিল তা রিক্ততাও নয়, বহুলতাও নয়, তা পূর্ণতা। এই পূর্ণতাই মানুষের হৃদয়কে আতিথ্য দান করে; সে ডেকে আনে, সে তাড়িয়ে দেয় না। আধুনিক জাপানকেও এর পাশাপাশি দেখেছি। সেখানে ভোজপুরি মাল্লার দল আড্ডা করেছে; তাদের যে প্রচণ্ড খচমচ উঠেছে সুন্দরের সঙ্গে তার মিল হল না, পূর্ণিমাকে তা ব্যঙ্গ করতে লাগল।

পূর্বে যা বলেছি তার থেকে এ কথা সবাই বুঝবেন যে, আমি বলি নে রেলওয়ে টেলিগ্রাফ কলকারখানার কোনোই প্রয়োজন নেই। আমি বলি, প্রয়োজন আছে কিন্তু তার বাণী নেই; বিশ্বের কোনো সুরে সে সায় দেয় না, হৃদয়ের কোনো ডাকে সে সাড়া দেয় না। মানুষের যেখানে অভাব সেইখানে তৈরি হয় তার উপকরণ, মানুষের যেখানে পূর্ণতা সেইখানে প্রকাশ হয় তার অমৃতরূপ। এই অভাবের দিকে উপকরণের মহলে মানুষের ঈর্ষা বিদ্বেষ; এইখানে তার প্রাচীর, তার পাহারা; এইখানে সে আপনাকে বাড়ায়, পরকে তাড়ায়। সুতরাং এইখানেই তার লড়াই। যেখানে তার অমৃত, যেখানে মানুষ—বস্তুকে নয়—আত্মাকে প্রকাশ করে, সেখানে সকলকে সে ডেকে আনে; সেখানে ভাগের দ্বারা ভোজের ক্ষয় হয় না। সুতরাং সেইখানেই শান্তি।

য়ুরোপ যখন বিজ্ঞানের চাবি দিয়ে বিশ্বের রহস্যনিকেতনের দরজা খুলতে লাগল তখন যে দিকে চায় সেই দিকেই দেখে বাঁধা নিয়ম। নিয়ত এই দেখার অভ্যাসে তার এই বিশ্বাসটা ঢিলে হয়ে এসেছে যে, নিয়মেরও পশ্চাতে এমন কিছু আছে যার সঙ্গে আমাদের মানবত্বের অন্তরঙ্গ আনন্দময় মিল আছে। নিয়মকে কাজে খাটিয়ে আমরা ফল পাই, কিন্তু ফল পাওয়ার চেয়েও মানুষের একটা বড়ো লাভ আছে। চা-বাগানের ম্যানেজার কুলিদের 'পরে যে নিয়ম চালনা করে সে নিয়ম যদি পাকা হয় তা হলে চায়ের ফলনের পক্ষে কাজে লাগে। কিন্তু, বন্ধু সম্বন্ধে ম্যানেজারের তো পাকা নিয়ম নেই। তার বেলায় নিয়মের কথাই ওঠে না। ঐ জায়গাটাতে চায়ের আয় নেই, ব্যয় আছে। কুলির নিয়মটা আধিভৌতিক বিশ্বনিয়মের দলে, সেইজন্যে সেটা চা-বাগানেও খাটে। কিন্তু, যদি এমন ধারণা হয় যে, ঐ বন্ধুতার সত্য কোনো বিরাট সত্যের অঙ্গ নয়,

তা হলে সেই ধারণায় মানবত্বকে শুকিয়ে ফেলে ; কলকে তো আমরা আত্মীয় ব'লে বরণ করতে পারি নে ; তা হলে কলের বাইরে কিছু যদি না থাকে তবে আমাদের যে আত্মা আত্মীয়কে খোঁজে সে দাঁড়ায় কোথায়? এক রোখে বিজ্ঞানের চর্চা করতে করতে পশ্চিমদেশে এই আত্মাকে কেবলই সরিয়ে সরিয়ে ওর জন্যে আর জায়গা রাখলে না। এক-ঝোঁকা আধ্যাত্মিক বুদ্ধিতে আমরা দারিদ্র্যে দুর্বলতায় কাত হয়ে পড়েছি, আর ওরাই কি এক-ঝোঁকা আধিভৌতিক চালে এক পায়ে লাফিয়ে মনুষ্যত্বের সার্থকতার মধ্যে গিয়ে পৌঁচচ্ছে?

বিশ্বের সঙ্গে যাদের এমনিতরো চা-বাগানের ম্যানেজারির সম্বন্ধ তাদের সঙ্গে যে-সে লোকের পেরে ওঠা শক্ত। সুদক্ষতার বিদ্যাটা এরা আয়ত্ত করে নিয়েছে। ভালোমানুষ লোক তাদের সন্ধানপর আড়কাঠির হাতে ঠকে যায়, ধরা দিলে ফেরবার পথ পায় না। কেননা, ভালোমানুষ লোকের নিয়মবোধ নেই, যেখানে বিশ্বাস করবার নয় ঠিক সেইখানেই আগে-ভাগে সে বিশ্বাস করে বসে আছে— তা সে বৃহস্পতিবারের বারবেলা হোক, রক্ষামন্ত্রের তাবিজ হোক, উকিলের দালাল হোক, আর চা-বাগানের আড়কাঠি হোক। কিন্তু এই নেহাত ভালোমানুষেরও একটা জায়গা আছে যেটা নিয়মের উপরকার ; সেখানে দাঁড়িয়ে সে বলতে পারে, 'সাত জন্মে আমি যেন চা-বাগানের ম্যানেজার না হই, ভগবান, আমার 'পরে এই দয়া করো।' অথচ এই অনবচ্ছিন্ন চা-বাগানের ম্যানেজারসম্প্রদায় নিখুঁত করে উপকার করতে জানে ; জানে তাদের কুলির বস্তি কেমন করে ঠিক যেন কাঁচিছাঁটা সোজা লাইনে পরিপাটি করে বানিয়ে দিতে হয় ; দাওয়াইখানা ডাক্তারখানা হাট-বাজারের যে ব্যবস্থা করে সে খুব পরিপাটি। এদের এই নির্মানুষিক সুব্যবস্থায় নিজেদের মুনফা হয়, অন্যদের উপকারও হতে পারে। কিন্তু নাস্তি ততঃ সুখলেশঃ সত্যং।

কেউ না মনে করেন, আমি কেবলমাত্র পশ্চিমের সঙ্গে পূর্বের সম্বন্ধ নিয়েই এই কথাটা বলছি। যান্ত্রিকতাকে অন্তরে বাহিরে বড়ো ক'রে তুলে পশ্চিম-সমাজে মানবসম্বন্ধের বিশ্লিষ্টতা ঘটেছে। কেননা, স্ক্রু দিয়ে আঁটা, আঠা দিয়ে জোড়ার বন্ধনকেই ভাবনায় এবং চেষ্টায় প্রধান ক'রে তুললে, অন্তরতম যে আত্মিক বন্ধনে মানুষ স্বতঃপ্রসারিত আকর্ষণে পরস্পর গভীরভাবে মিলে যায় সেই সৃষ্টি শক্তিসম্পন্ন বন্ধন শিথিল হতে থাকে। অথচ, মানুষকে কলের নিয়মে বাঁধার আশ্চর্য সফলতা আছে ; তাতে পণ্যদ্রব্য রাশীকৃত হয়, বিশ্ব জুড়ে হাট বসে, মেঘ ভেদ করে কোঠাবাড়ি ওঠে। এ দিকে সমাজব্যাপারে শিক্ষা বলো, আরোগ্য বলো, জীবিকার সুযোগসাধন বলো, নানাপ্রকার হিতকর্মেও মানুষের যোলো আনা জিত হয়। কেননা, পূর্বেই বলেছি, বিশ্বের বাহিরের দিকে এই কল জিনিসটা সত্য। সেইজন্যে এই যান্ত্রিকতায় যাদের মন পেকে যায় তারা যতই ফললাভ করে, ফললাভের দিকে তাদের লোভের ততই অন্ত থাকে না। লোভ যতই বাড়তে থাকে মানুষকে মানুষ খাটো করতে ততই আর দ্বিধা করে না।

কিন্তু লোভ তো একটা তত্ত্ব নয়, লোভ হচ্ছে রিপু। রিপুর কর্ম নয় সৃষ্টি করা। তাই, ফললাভের লোভ যখন কোনো সভ্যতার অন্তরে প্রধান আসন গ্রহণ করে তখন সেই সভ্যতায় মানুষের আত্মিক যোগ বিশ্লিষ্ট হতে থাকে। সেই সভ্যতা যতই ধন লাভ করে, বল লাভ করে, সুবিধাসুযোগের যতই বিস্তার করতে থাকে, মানুষের আত্মিক সত্যকে ততই সে দুর্বল করে।

একা মানুষ ভয়ংকর নিরর্থক ; কেননা, একার মধ্যে ঐক্য নেই। বহুকে নিয়ে যে এক সেই হল সত্য এক। বহু থেকে বিচ্ছিন্ন যে সেই লক্ষ্মীছাড়া এক ঐক্য থেকে বিচ্ছিন্ন এক। ছবি এক লাইনে হয় না, সে হয় নানা লাইনের ঐক্যে। ছবির মধ্যে প্রত্যেক লাইনটি ছোটো বড়ো সমস্ত লাইনের আত্মীয়। এই আত্মীয়তার সামঞ্জস্যে ছবি হল সৃষ্টি। এঞ্জিনিয়র সাহেব নীলরঙের

মোমজামার উপর বাড়ির প্ল্যান আঁকেন, তাকে ছবি বলি নে ; কেননা, সেখানে লাইনের সঙ্গে লাইনের অন্তরের আত্মিক সম্বন্ধ নয়, বাহির-মহলের ব্যবহারিক সম্বন্ধ। তাই ছবি হল সৃজন, প্ল্যান হল নির্মাণ।

তেমনি ফললাভের লোভের ব্যবসায়িকতাই যদি মানুষের মধ্যে প্রবল হয়ে ওঠে তবে মানবসমাজ প্রকাণ্ড প্ল্যান হয়ে উঠতে থাকে, ছবির আর কিছু বাকি থাকে না। তখন মানুষের মধ্যে আত্মিক সম্বন্ধ খাটো হতে থাকে। তখন ধন হয় সমাজের রথ, ধনী হয় সমাজের রথী, আর শক্ত বাঁধনে বাঁধা মানুষগুলো হয় রথের বাহন। গড়গড় শব্দে এই রথটা এগিয়ে চলাকেই মানুষ বলে সভ্যতার উন্নতি। তা হোক, কিন্তু এই কুবেরের রথযাত্রায় মানুষের আনন্দ নেই। কেননা কুবেরের 'পরে মানুষের অন্তরের ভক্তি নেই। ভক্তি নেই ব'লেই মানুষের-বাঁধন দড়ির বাঁধন হয়, নাড়ীর বাঁধন হয় না। দড়ির বাঁধনের ঐক্যকে মানুষ সইতে পারে না, বিদ্রোহী হয়। পশ্চিমদেশে আজ সামাজিক বিদ্রোহ কালো হয়ে ঘনিয়ে এসেছে এ কথা সুস্পষ্ট। ভারতে আচারের বাহ্য বন্ধনে যেখানে মানুষকে এক করতে চেয়েছে সেখানে সেই ঐক্যে সমাজকে নির্জীব করেছে, য়ুরোপে ব্যবহারের বাহ্য বন্ধনে যেখানে মানুষকে এক করতে চেয়েছে সেখানে সেই ঐক্যে সমাজকে সে বিশ্লিষ্ট করেছে। কেননা আচারই হোক আর ব্যবহারই হোক, তারা তো তত্ত্ব নয় ; তাই তারা মানুষের আত্মাকে বাদ দিয়ে সকল ব্যবস্থা করে।

তত্ত্ব কাকে বলে? যিশু বলেছেন : আমি আর আমার পিতা এক। এ হল তত্ত্ব। পিতার সঙ্গে আমার যে ঐক্য সেই হল সত্য ঐক্য, ম্যানেজারের সঙ্গে কুলির যে ঐক্য সে সত্য ঐক্য নয়।

চরম তত্ত্ব আছে উপনিষদে—

ঈশাবাস্যমিদং সর্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনম্।

পশ্চিমসভ্যতার অন্তরাসনে লোভ রাজা হয়ে বসেছে, পূর্বেই তার নিন্দা করেছি। কিন্তু, নিন্দাটা কিসের? ঈশোপনিষদে তত্ত্বস্বরূপে এরই উত্তরটি দেওয়া হয়েছে। ঋষি বলেছেন : মা গৃধঃ। লোভ কোরো না। কেন করব না? যেহেতু লোভে সত্যকে মেলে না। নাইবা মিলল, আমি ভোগ করতে চাই। ভোগ কোরো না, এ কথা তো বলা হচ্ছে না। ভুঞ্জীথাঃ, ভোগই করবে ; কিন্তু সত্যকে ছেড়ে আনন্দকে ভোগ করবার পন্থা নেই। তা হলে সত্যটা কী? সত্য হচ্ছে এই : ঈশাবাস্যমিদং সর্বম্। সংসারে যা কিছু চলছে সমস্ত ঈশ্বরের দ্বারা আচ্ছন্ন। যা-কিছু চলছে সেইটেই যদি চরম সত্য হত, তার বাইরে আর-কিছুই না থাকত, তা হলে চলমান বস্তুকে যথাসাধ্য সংগ্রহ করাই মানুষের সব চেয়ে বড়ো সাধনা হত। তা হলে লোভই মানুষকে সব চেয়ে বড়ো চরিতার্থতা দিত। কিন্তু ঈশ সমস্ত পূর্ণ করে রয়েছেন এইটেই যখন শেষ কথা তখন আত্মার দ্বারা এই সত্যকে ভোগ করাই হবে পরম সাধনা। আর, তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ। ত্যাগের দ্বারাই এই ভোগের সাধন হবে, লোভের দ্বারা নয়। সাত মাস ধরে আমেরিকায় আকাশের বক্ষোবিদারী ঐশ্বর্যপুরীতে বসে এই সাধনার উলটোপথে চলা দেখে এলেম। সেখানে 'যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ' সেটাই মস্ত হয়ে প্রকাশ পাচ্ছে, আর 'ঈশাবাস্যমিদং সর্বম্' সেটাই ডলারের ঘন ধুলায় আচ্ছন্ন। এইজন্যেই সেখানে 'ভুঞ্জীথাঃ' এই বিধানের পালন সত্যকে নিয়ে নয়, ধনকে নিয়ে ; ত্যাগকে নিয়ে নয়, লোভকে নিয়ে।

ঐক্য দান করে সত্য। ভেদবুদ্ধি ঘটায় ধন। তা ছাড়া সে অন্তরাত্মাকে শূন্য রাখে ; সেইজন্যে সেই শূন্যতার ক্ষোভে পূর্ণতাকে বাইরের দিক থেকে ছিনিয়ে নিতে ইচ্ছা করে। সুতরাং কেবল

সংখ্যাবৃদ্ধির দিকে দিনরাত উর্ধ্বশ্বাসে দৌড়তে হয়; 'আরো' 'আরো' হাঁকতে-হাঁকতে হাঁপাতে-হাঁপাতে নামতার কোঠায় কোঠায় আকাঙ্ক্ষার ঘোড়দৌড় করাতে-করাতে ঘূর্ণি লাগে; ভুলেই যেতে হয় অন্য যা-কিছু পাই আনন্দ পাচ্ছি নে।

তা হলে চরিতার্থতা কোথায়? তার উত্তর একদিন ভারতবর্ষের ঋষিরা দিয়েছেন। তাঁরা বলেন, চরিতার্থতা পরম একের মধ্যে। গাছ থেকে আপেল পড়ে একটা, দুটো, তিনটে, চারটে। আপেল পড়ার অন্তবিহীন সংখ্যাগণনার মধ্যেই আপেল পড়ার সত্যকে পাওয়া যায় এ কথা যে বলে প্রত্যেক সংখ্যার কাছে এসে তাকে তার মন ধাক্কা দিয়ে বলবে 'ততঃ কিম্'। তার দৌড়ও থামবে না, তার প্রশ্নের উত্তরও মিলবে না। কিন্তু অসংখ্য আপেল পড়া যেমনি একটি আকর্ষণতত্ত্বে এসে ঠেকে অমনি বুদ্ধি খুশি হয়ে বলে ওঠে, 'বাস্! হয়েছে।'

এই তো গেল আপেল পড়ার সত্য। মানুষের সত্যটা কোথায়? সেন্‌সস্ রিপোর্টে? এক দুই তিন চার পাঁচে? মানুষের স্বরূপপ্রকাশ কি অন্তহীন সংখ্যায়? এই প্রকাশের তত্ত্বটি উপনিষৎ বলেছেন—

যস্তু সর্বাণি ভূতানি আত্মন্যেবানুপশ্যতি
সর্বভূতেষু চাত্মানং ততো ন বিজুগুপ্সতে।

যিনি সর্বভূতকে আপনারই মতো দেখেন এবং আত্মাকে সর্বভূতের মধ্যে দেখেন তিনি প্রচ্ছন্ন থাকেন না। আপনাকে আপনাতেই যে বদ্ধ করে সে থাকে লুপ্ত; আপনাকে সকলের মধ্যে যে উপলব্ধি করে সেই হয় প্রকাশিত। মনুষ্যত্বের এই প্রকাশ ও প্রচ্ছন্নতার একটা মস্ত দৃষ্টান্ত ইতিহাসে আছে। বুদ্ধদেব মৈত্রীবুদ্ধিতে সকল মানুষকে এক দেখেছিলেন, তাঁর সেই ঐক্যতত্ত্ব চীনকে অমৃত দান করেছিল। আর যে বণিক লোভের প্রেরণায় চীনে এল এই ঐক্যতত্ত্বকে সে মানলে না; সে অকুণ্ঠিতচিত্তে চীনকে মৃত্যুদান করেছে, কামান দিয়ে ঠেসে ঠেসে তাকে আফিম গিলিয়েছে। মানুষ কিসে প্রকাশ পেয়েছে আর কিসে প্রচ্ছন্ন হয়েছে, এর চেয়ে স্পষ্ট ক'রে ইতিহাসে আর কখনো দেখা যায় নি।

আমি জানি, আজকের দিনে আমাদের দেশে অনেকেই বলে উঠবেন, 'ঐ কথাটাই তো আমরা বার বার বলে আসছি। ভেদবুদ্ধিটা যাদের এত উগ্র, বিশ্বটাকে তাল পাকিয়ে পাকিয়ে এক-এক গ্রাসে গেলবার জন্যে যাদের লোভ এত বড়ো হাঁ করেছে, তাদের সঙ্গে আমাদের কোনো কারবার চলতে পারে না। কেননা, ওরা আধ্যাত্মিক নয়, আমরা আধ্যাত্মিক। ওরা অবিদ্যাকেই মানে, আমরা বিদ্যাকে। এমন অবস্থায় ওদের সমস্ত শিক্ষাদীক্ষা বিষের মতো পরিহার করা চাই।' এক দিকে এটাও ভেদবুদ্ধির কথা, অপর দিকে এটা সাধারণ বিষয়বুদ্ধির কথাও নয়। ভারতবর্ষ এই মোহকে সমর্থন করেন নি। তাই মনু বলেছেন—

ন তথৈতানি শক্যন্তে সংনিয়ন্তুমসেবয়া।
বিষয়েষু প্রজুষ্টানি যথা জ্ঞানেন নিত্যশঃ।

বিষয়ের সেবা-ত্যাগের দ্বারা তেমন করে সংযমন হয় না, বিষয়ে নিযুক্ত থেকে জ্ঞানের দ্বারা নিত্য-নিত্য যেমন করে হয়। এর কারণ, বিষয়ের দায় আধিভৌতিক বিশ্বের দায়, সে দায়কে ফাঁকি দিয়ে আধ্যাত্মিকের কোঠায় ওঠা যায় না; তাকে বিশুদ্ধরূপে পূর্ণ করে তবে উঠতে হয়। তাই উপনিষৎ বলেছেন: অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্বা বিদ্যয়ামৃতমশ্নুতে। অবিদ্যার পথ দিয়ে মৃত্যু থেকে বাঁচতে হবে, তার পরে বিদ্যার তীর্থে অমৃত লাভ হবে। শুক্রাচার্য এই মৃত্যু থেকে বাঁচাবার বিদ্যা নিয়ে আছেন, তাই অমৃতলোকের ছাত্র কচকেও এই বিদ্যা শেখবার জন্যে দৈত্যপাঠশালার খাতায় নাম লেখাতে হয়েছিল।

আত্মিক সাধনার একটা অঙ্গ হচ্ছে জড়বিশ্বের অত্যাচার থেকে আত্মাকে মুক্ত করা। পশ্চিম-মহাদেশের লোকেরা সাধনার সেই দিকটার ভার নিয়েছে। এইটে হচ্ছে সাধনার সব-নিচেকার ভিত, কিন্তু এটা পাকা করতে না পারলে অধিকাংশ মানুষের অধিকাংশ শক্তিই পেটের দায়ে জড়ের গোলামি করতে ব্যস্ত থাকবে। পশ্চিম তাই হাতের আস্তিন গুটিয়ে খন্তা কোদাল নিয়ে এমনি ক'রে মাটির দিকে ঝুঁকে পড়েছে যে উপর-পানে মাথা তোলবার ফুরসত তার নেই বললেই হয়। এই পাকা ভিতের উপর উপর-তলা যখন উঠবে তখনই হাওয়া-আলোর যারা ভক্ত তাদের বাসাটি হবে বাধাহীন। তত্ত্বজ্ঞানের ক্ষেত্রে আমাদের জ্ঞানীরা বলেছেন, না-জানাই বন্ধনের কারণ, জানাতেই মুক্তি। বস্তুবিশ্বেও সেই একই কথা। এখানকার নিয়মতত্ত্বকে যে না জানে সেই বদ্ধ হয়, যে জানে সেই মুক্তিলাভ করে। তাই বিষয়রাজ্যে আমরা যে বাহ্য বন্ধন কল্পনা করি সেও মায়া; এই মায়া থেকে নিষ্কৃতি দেয় বিজ্ঞানে। পশ্চিম-মহাদেশ বাহ্য বিশ্বে মায়ামুক্তির সাধনা করছে; সেই সাধনা ক্ষুধা তৃষ্ণা শীত গ্রীষ্ম রোগ দৈন্যের মূল খুঁজে বের ক'রে সেইখানে লাগাচ্ছে ঘা; এই হচ্ছে মৃত্যুর মার থেকে মানুষকে রক্ষা করবার চেষ্টা আর পূর্ব-মহাদেশ অন্তরাত্মার যে সাধনা করেছে সেই হচ্ছে অমৃতের অধিকার লাভ করবার উপায়। অতএব, পূর্বপশ্চিমের চিত্ত যদি বিচ্ছিন্ন হয় তা হলে উভয়েই ব্যর্থ হবে; তাই পূর্বপশ্চিমের মিলনমন্ত্র উপনিষৎ দিয়ে গেছেন। বলেছেন—

বিদ্যাঞ্চাবিদ্যাঞ্চ যস্তদ্‌বেদোভয়ং সহ
অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্বা বিদ্যয়ামৃতমশ্নুতে।

যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ, এইখানে বিজ্ঞানকে চাই। ঈশাবাস্যমিদং সর্বম্, এইখানে তত্ত্বজ্ঞানকে চাই। এই উভয়কে মেলাবার কথা যখন ঋষি বলেছেন তখন পূর্বপশ্চিমকে মিলতে হবে। এই মিলনের অভাবে পূর্বদেশ দৈন্যপীড়িত, সে নির্জীব; আর এই মিলনের অভাবে পশ্চিম অশান্তির দ্বারা ক্ষুব্ধ, সে নিরানন্দ।

এই ঐক্যতত্ত্ব সম্বন্ধে আমার কথা ভুল বোঝবার আশঙ্কা আছে। তাই যে কথাটা একবার আভাসে বলেছি সেইটে আর-একবার স্পষ্ট বলা ভালো। একাকার হওয়া এক হওয়া নয়। যারা স্বতন্ত্র তারাই এক হতে পারে। পৃথিবীতে যারা পরজাতির স্বাতন্ত্র্য লোপ করে তারাই সর্বজাতির ঐক্য লোপ করে। ইম্পীরিয়ালিজ্‌ম্ হচ্ছে অজগর সাপের ঐক্যনীতি; গিলে খাওয়াকেই সে এক করা বলে প্রচার করে। পূর্বে আমি বলেছি, আধিভৌতিককে আধ্যাত্মিক যদি আত্মসাৎ করে বসে তা হলে সেটাকে সমন্বয় বলা চলে না; পরস্পরের স্ব-ক্ষেত্রে উভয়ে স্বতন্ত্র থাকলে তবেই সমন্বয় সত্য হয়। তেমনি মানুষ যেখানে স্বতন্ত্র সেখানে তার স্বাতন্ত্র্য স্বীকার করলে তবেই মানুষ যেখানে এক সেখানে তার সত্য ঐক্য পাওয়া যায়। সেদিনকার মহাযুদ্ধের পর য়ুরোপ যখন শান্তির জন্যে ব্যাকুল হয়ে উঠল তখন থেকে সেখানে কেবলই ছোটো ছোটো জাতির স্বাতন্ত্র্যের দাবি প্রবল হয়ে উঠছে। যদি আজ নবযুগের আরম্ভ হয়ে থাকে তা হলে এই যুগে অতিকায় ঐশ্বর্য, অতিকায় সাম্রাজ্য, সংঘবন্ধনের সমস্ত অতিশয়তা টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে যাবে। সত্যকার স্বাতন্ত্র্যের উপর সত্যকার ঐক্যের প্রতিষ্ঠা হবে। যারা নবযুগের সাধক ঐক্যের সাধনার জন্যেই তাদের স্বাতন্ত্র্যের সাধনা করতে হবে আর তাদের মনে রাখতে হবে, এই সাধনায় জাতিবিশেষের মুক্তি নয়, নিখিল মানবের মুক্তি।

যারা অন্যকে আপনার মতো জেনেছে 'ন ততো বিজুগুপ্‌সতে', তারাই প্রকাশ পেয়েছে, এই তত্ত্বটি কি মানুষের পুঁথিতেই লেখা আছে? মানুষের সমস্ত ইতিহাসই কি এই তত্ত্বের নিরন্তর

অভিব্যক্তি নয়? ইতিহাসের গোড়াতেই দেখি মানুষের দল পর্বতসমুদ্রের এক-একটি বেড়ার মধ্যে একত্র হয়েছে। মানুষ যখন একত্র হয় তখন যদি এক হতে না পারে তা হলেই সে সত্য হতে বঞ্চিত হয়। একত্রিত মনুষ্যদলের মধ্যে যারা যদুবংশের মাতাল বীরদের মতো কেবলই হানাহানি করেছে, কেউ কাউকে বিশ্বাস করে নি, পরস্পরকে বঞ্চিত করতে গিয়েছে, তারা কোন্ কালে লোপ পেয়েছে। আর, যারা এক আত্মাকে আপনাদের সকলের মধ্যে দেখতে চেয়েছিল তারাই মহাজাতিরূপে প্রকাশ পেয়েছে।

বিজ্ঞানের কল্যাণে জলে স্থলে আকাশে আজ এত পথ খুলেছে, এত রথ ছুটেছে যে, ভূগোলের বেড়া আজ আর বেড়া নেই। আজ, কেবল নানা ব্যক্তি নয়, নানা জাতি কাছাকাছি এসে জুটল : অমনি মানুষের সত্যের সমস্যা বড়ো হয়ে দেখা দিল। বৈজ্ঞানিক শক্তি যাদের একত্র করেছে তাদের এক করবে কে? মানুষের যোগ যদি সংযোগ হল তো ভালোই, নইলে সে দুর্যোগ। সেই মহাদুর্যোগ আজ ঘটেছে। একত্র হবার বাহ্যশক্তি হূ হূ করে এগোল, এক করবার আন্তর শক্তি পিছিয়ে পড়ে রইল। ঠিক যেন গাড়িটা ছুটেছে এঞ্জিনের জোরে, বেচারা ড্রাইভারটা 'আরে আরে! হাঁ হাঁ' করতে করতে তার পিছন পিছন দৌড়েছে— কিছুতে নাগাল পাচ্ছে না। অথচ, এক দল লোক এঞ্জিনের প্রচণ্ড বেগ দেখে আনন্দ করে বললে, 'শাবাশ! একেই তো বলে উন্নতি।' এ দিকে, আমরা পূর্বদেশের ভালোমানুষ যারা ধীরমন্দগমনে পায়ে হেঁটে চলি ওদের ঐ উন্নতির ধাক্কা আজও সামলে উঠতে পারছি নে। কেননা যারা কাছেও আসে, তফাতেও থাকে, তারা যদি চঞ্চল পদার্থ হয় তা হলে পদে পদে ঠকাঠক ধাক্কা দিতে থাকে। এই ধাক্কার মিলন সুখকর নয়, অবস্থাবিশেষে কল্যাণকর হতেও পারে।

যাই হোক, এর চেয়ে স্পষ্ট আজ আর কিছুই নয় যে, জাতিতে জাতিতে একত্র হচ্ছে অথচ মিলছে না। এরই বিষম বেদনায় সমস্ত পৃথিবী পীড়িত। এত দুঃখেও দুঃখের প্রতিকার হয় না কেন? তার কারণ এই যে, গণ্ডির ভিতরে যারা এক হতে শিখেছিল গণ্ডির বাইরে তারা এক হতে শেখে নি।

মানুষ সাময়িক ও স্থানিক কারণে গণ্ডির মধ্যে সত্যকে পায় ব'লেই সত্যের পূজা ছেড়ে গণ্ডির পূজা ধরে ; দেবতার চেয়ে পাণ্ডাকে মানে ; রাজাকে ভোলে, দারোগাকে কিছুতে ভুলতে পারে না। পৃথিবীতে নেশন গড়ে উঠল সত্যের জোরে ; কিন্তু ন্যাশন্যালিজ্‌ম্ সত্য নয়, অথচ সেই জাতীয় গণ্ডি-দেবতার পূজার অনুষ্ঠানে চারি দিক থেকে নরবলির জোগান চলতে লাগল। যতদিন বিদেশী বলি জুটত ততদিন কোনো কথা ছিল না ; হঠাৎ ১৯১৪ খৃস্টাব্দে পরস্পরকে বলি দেবার জন্যে স্বয়ং যজমানদের মধ্যে টানাটানি পড়ে গেল। তখন থেকে ওদের মনে সন্দেহ জাগতে আরম্ভ হল, একেই কি বলে ইষ্টদেবতা! এ যে ঘর পর কিছুই বিচার করে না! এ যখন একদিন পূর্বদেশের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কোমল অংশ বেছে তাতে দাঁত বসিয়েছিল এবং 'ভিক্ষু যথা ইক্ষু খায় ধরি ধরি চিবায় সমস্ত'— তখন মহাপ্রসাদের ভোজ খুব জমেছিল, সঙ্গে সঙ্গে মদমত্ততারও অবধি ছিল না। আজ মাথায় হাত দিয়ে ওদের কেউ কেউ ভাবছে, 'এর পুজো আমাদের বংশে সইবে না।' যুদ্ধ যখন পুরোদমে চলছিল তখন সকলেই ভাবছিল, যুদ্ধ মিটলেই অকল্যাণ মিটবে। যখন মিটল তখন দেখা গেল, ঘুরে ফিরে সেই যুদ্ধটাই এসেছে সন্ধিপত্রের মুখোশ প'রে। কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে যার প্রকাণ্ড লেজটা দেখে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড আঁতকে উঠেছিল, আজ লঙ্কাকাণ্ডের গোড়ায় দেখি সেই লেজটার উপর মোড়কে মোড়কে সন্ধিপত্রের স্নেহসিক্ত কাগজ জড়ানো চলেছে ; বোঝা যাচ্ছে, ঐটাতে আগুন যখন ধরবে তখন কারোর ঘরের চাল আর বাকি থাকবে না। পশ্চিমের মনীষী

লোকেরা ভীত হয়ে বলছেন যে, যে দুর্বুদ্ধি থেকে দুর্ঘটনার উৎপত্তি এত মারের পরেও তার নাড়ী বেশ তাজা আছে। এই দুর্বুদ্ধিরই নাম ন্যাশন্যালিজ্‌ম্‌, দেশের সর্বজনীন আত্মম্ভরিতা। এ হল রিপু, ঐক্যতত্ত্বের উলটো দিকে অর্থাৎ আপনার দিকটাতেই এর টান। কিন্তু জাতিতে জাতিতে আজ একত্র হয়েছে এই কথাটা যখন অস্বীকার করবার জো নেই, এত বড়ো সত্যের উপর যখন কোনো একটামাত্র প্রবল জাতি আপন সাম্রাজ্যরথ চালিয়ে দিয়ে চাকার তলায় একে ধুলো করে দিতে পারে না, তখন এর সঙ্গে সত্য ব্যবহার করতেই হবে। তখন ঐ রিপুটাকে এর মাঝখানে আনলে শকুনির মতো কপট দ্যূতের ডিপ্লমাসিতে বারে বারে সে কুরুক্ষেত্র বাধিয়ে দেবে।

বর্তমান যুগের সাধনার সঙ্গেই বর্তমান যুগের শিক্ষার সংগতি হওয়া চাই। রাষ্ট্রীয় গণ্ডিদেবতার যারা পূজারি তারা শিক্ষার ভিতর দিয়ে নানা ছুতোয় জাতীয় আত্মম্ভরিতার চর্চা করাকে কর্তব্য মনে করে। জর্মনি একদা শিক্ষাব্যবস্থাকে তার রাষ্ট্রনৈতিক ভেদবুদ্ধির ক্রীতদাসী করেছিল বলে পশ্চিমের অন্যান্য নেশন তার নিন্দা করেছে। পশ্চিমের কোন্‌ বড়ো নেশন এ কাজ করে নি? আসল কথা, জর্মনি সকল বিভাগেই বৈজ্ঞানিক রীতিকে অন্যান্য সকল জাতির চেয়ে বেশি আয়ত্ত করেছে, সেইজন্যে পাকা নিয়মের জোরে শিক্ষাবিধিকে নিয়ে স্বাজাত্যের ডিমে তা দেবার ইনক্যুবেটার যন্ত্র সে বানিয়েছিল ; তার থেকে যে বাচ্ছা জন্মেছিল দেখা গেছে অন্যদেশী বাচ্ছার চেয়ে তার দম অনেক বেশি। কিন্তু তার প্রতিপক্ষ পক্ষীদের ডিমেতেও তা দিয়েছিল সেদিককার শিক্ষাবিধি। আর, আজ ওদের অধিকাংশ খবরের কাগজের প্রধান কাজটা কী? জাতীয় আত্মম্ভরিতার কুশল কামনা করে প্রতিদিন অসত্যপীরের সিন্নি মানা।

স্বাজাত্যের অহমিকা থেকে মুক্তিদান করার শিক্ষাই আজকের দিনের প্রধান শিক্ষা। কেননা কালকের দিনের ইতিহাস সার্বজাতিক সহযোগিতার অধ্যায় আরম্ভ করবে। যে-সকল রিপু যে-সকল চিন্তার অভ্যাস ও আচারপদ্ধতি এর প্রতিকূল তা আগামী কালের জন্যে আমাদের অযোগ্য ক'রে তুলবে। স্বদেশের গৌরববুদ্ধি আমার মনে আছে, কিন্তু আমি একান্ত আগ্রহে ইচ্ছা করি যে, সেই বুদ্ধি যেন কখনো আমাকে এ কথা না ভোলায় যে একদিন আমার দেশে সাধকেরা যে মন্ত্র প্রচার করেছিলেন সে হচ্ছে ভেদবুদ্ধি দূর করবার মন্ত্র। শুনতে পাচ্ছি সমুদ্রের ও পারের মানুষ আজ আপনাকে এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করছে, 'আমাদের কোন্‌ শিক্ষা কোন্‌ চিন্তা, কোন্‌ কর্মের মধ্যে মোহ প্রচ্ছন্ন হয়েছিল যার জন্যে আমাদের আজ এমন নিদারুণ শোক?' তার উত্তর আমাদের দেশ থেকেই দেশে দেশান্তরে পৌঁছুক যে, 'মানুষের একত্বকে তোমরা সাধনা থেকে দূরে রেখেছিলে, সেইটেই মোহ, এবং তার থেকেই শোক।'—

যস্মিন্‌ সর্বাণি ভূতানি আত্মৈবাভূদ্‌ বিজানতঃ
তত্র কো মোহঃ কঃ শোক একত্বমনুপশ্যতঃ।

আমরা শুনতে পাচ্ছি সমুদ্রের ও পারে মানুষ ব্যাকুল হয়ে বলছে, 'শান্তি চাই।' এই কথা তাদের জানাতে হবে, শান্তি সেখানেই যেখানে মঙ্গল, মঙ্গল সেখানেই যেখানে ঐক্য। এইজন্য পিতামহেরা বলেছেন : শান্তং শিবমদ্বৈতম্‌। অদ্বৈতই শান্ত, কেননা অদ্বৈতই শিব। স্বদেশের গৌরববুদ্ধি আমার মনে আছে, সেইজন্যে এই সম্ভাবনার কল্পনাতেও আমার লজ্জা হয় যে, অতীত যুগের যে আবর্জনাভার সরিয়ে ফেলবার জন্যে আজ রুদ্রদেবতার হুকুম এসে পৌঁচেছে এবং পশ্চিমদেশ সেই হুকুমে জাগতে শুরু করেছে আমরা পাছে স্বদেশে সেই আবর্জনার পীঠ স্থাপন ক'রে আজ যুগান্তরের প্রত্যুষেও তামসী পূজাবিধি দ্বারা তার অর্চনা করবার আয়োজন করতে থাকি। যিনি শান্ত, যিনি শিব, যিনি সার্বজাতিক মানবের পরমাশ্রয় অদ্বৈত, তাঁরই ধ্যানমন্ত্র

কি আমাদের ঘরে নেই? সেই ধ্যানমন্ত্রের সহযোগেই কি নবযুগের প্রথম প্রভাতরশ্মি মানুষের মনে সনাতন সত্যের উদ্‌বোধন এনে দেবে না?

এইজন্যেই আমাদের দেশের বিদ্যানিকেতনকে পূর্বপশ্চিমের মিলননিকেতন ক'রে তুলতে হবে, এই আমার অন্তরের কামনা। বিষয়লাভের ক্ষেত্রে মানুষের বিরোধ মেটে নি, সহজে মিটতেও চায় না। সত্যলাভের ক্ষেত্রে মিলনের বাধা নেই। যে গৃহস্থ কেবলমাত্র আপন পরিবারকে নিয়েই থাকে, আতিথ্য করতে যার কৃপণতা, সে দীনাত্মা। শুধু গৃহস্থের কেন, প্রত্যেক দেশেরই কেবল নিজের ভোজনশালা নিয়ে চলবে না, তার অতিথিশালা চাই যেখানে বিশ্বকে অভ্যর্থনা ক'রে সে ধন্য হবে। শিক্ষাক্ষেত্রেই তার প্রধান অতিথিশালা। দুর্ভাগা ভারতবর্ষে বর্তমান কালে শিক্ষার যত-কিছু সরকারি ব্যবস্থা আছে তার পনেরো-আনা অংশই পরের কাছে বিদ্যাভিক্ষার ব্যবস্থা। ভিক্ষা যার বৃত্তি আতিথ্য করে না ব'লে লজ্জা করাও তার ঘুচে যায়। সেইজন্যেই বিশ্বের আতিথ্য করে না ব'লে ভারতীয় আধুনিক শিক্ষালয়ের লজ্জা নেই। সে বলে, 'আমি ভিখারি, আমার কাছে আতিথ্যের প্রত্যাশা কারো নেই।' কে বলে নেই? আমি তো শুনেছি পশ্চিমদেশ বারংবার জিজ্ঞাসা করছে, 'ভারতের বাণী কই?' তার পর সে যখন আধুনিক ভারতের দ্বারে এসে কান পাতে তখন বলে, 'এ তো সব আমারই বাণীর ক্ষীণ প্রতিধ্বনি, যেন ব্যঙ্গের মতো শোনাচ্ছে।' তাই তো দেখি, আধুনিক ভারত যখন ম্যাক্‌সম্যুলরের পাঠশালা থেকে বাহির হয়েই আর্যসভ্যতার দম্ভ করতে থাকে তখন তার মধ্যে পশ্চিম গড়ের বাদ্যের কড়িমধ্যম লাগে, আর পশ্চিমকে যখন সে প্রবল ধিক্কারের সঙ্গে প্রত্যাখ্যান করে তখনো তার মধ্যে সেই পশ্চিম রাগেরই তারসপ্তকের নিখাদ তীব্র হয়ে বাজে।

আমার প্রার্থনা এই যে, ভারত আজ সমস্ত পূর্বভূভাগের হয়ে সত্যসাধনার অতিথিশালা প্রতিষ্ঠা করুক। তার ধনসম্পদ নেই জানি, কিন্তু তার সাধনসম্পদ আছে। সেই সম্পদের জোরে সে বিশ্বকে নিমন্ত্রণ করবে এবং তার পরিবর্তে সে বিশ্বের সর্বত্র নিমন্ত্রণের অধিকার পাবে। দেউড়িতে নয়, বিশ্বের ভিতর-মহলে তার আসন পড়বে। কিন্তু আমি বলি, এই মানসম্মানের কথা এও বাহিরের, একেও উপেক্ষা করা চলে। এই কথাই বলবার কথা যে, সত্যকে চাই অন্তরে উপলব্ধি করতে এবং সত্যকে চাই বাহিরে প্রকাশ করতে; কোনো সুবিধার জন্যে নয়, সম্মানের জন্যে নয়, মানুষের আত্মাকে তার প্রচ্ছন্নতা থেকে মুক্তি দেবার জন্যে। মানুষের সেই প্রকাশতত্ত্বটি আমাদের শিক্ষার মধ্যে প্রচার করতে হবে, কর্মের মধ্যে প্রচলিত করতে হবে, তা হলেই সকল মানুষের সম্মান করে আমরা সম্মানিত হব; নবযুগের উদ্‌বোধন করে আমরা জরামুক্ত হব। আমদের শিক্ষালয়ের সেই শিক্ষামন্ত্রটি এই—

> যস্তু সর্বাণি ভূতানি আত্মনোবানুপশ্যতি
> সর্বভূতেষু চাত্মানং ততো ন বিজুগুপ্সতে।

আশ্বিন ১৩২৮

বিশ্ববিদ্যালয়ের রূপ

অপরিচিত আসনে অনভ্যস্ত কর্তব্যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় আমাকে আহ্বান করেছেন। তার প্রত্যুত্তরে আমি আমার সাদর অভিবাদন জানাই।

এই উপলক্ষে নিজের ন্যূনতা-প্রকাশ হয়তো শোভন রীতি। কিন্তু প্রথার এই অলংকারগুলি বস্তুত শোভন নয়, এবং তা নিষ্ফল। কর্তব্যক্ষেত্রে প্রবেশ করার উপক্রমেই আগে থাকতে ক্ষমা প্রার্থনা ক'রে রাখলে সাধারণের মন অনুকূল হতে পারে, এই ব্যর্থ আশার ছলনায় মনকে ভোলাতে চাই নে। ক্ষমা প্রার্থনা করলেই অযোগ্যতার ত্রুটি সংশোধন হয় না, তাতে কেবল ত্রুটি স্বীকার করাই হয়। যাঁরা অকরুণ তাঁরা সেটাকে বিনয় ব'লে গ্রহণ করেন না, আত্মগ্লানি বলেই গণ্য করেন।

যে কর্মে আমাকে আমন্ত্রণ করা হয়েছে সে সম্বন্ধে আমার সম্বল কী আছে তা কারো অগোচর নেই। অতএব ধরে নিতে পারি, কর্মটি আমার যে উপযুক্ত সে বিচার কর্তৃপক্ষদের দ্বারা পূর্বেই হয়ে গেছে।

এই ব্যবস্থার মধ্যে কিছু নূতনত্ব আছে— তার থেকে অনুমান করা যায়, বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে সম্প্রতি কোনো-একটি নূতন সংকল্পের সূচনা হয়েছে। হয়তো মহৎ তার গুরুত্ব। এইজন্য সুস্পষ্টরূপে তাকে উপলব্ধি করা চাই।

বহুকাল থেকে কোনো-একটি বিশেষ পরিচয়ে আমি সাধারণের দৃষ্টির সম্মুখে দিন কাটিয়েছি। আমি সাহিত্যিক ; অতএব, সাহিত্যিকরূপেই আমাকে এখানে আহ্বান করা হয়েছে এ কথা স্বীকার করতেই হবে। সাহিত্যিকের পদবী আমার পক্ষে নিরুদ্‌বেগের বিষয় নয়, বহু দিনের কঠোর অভিজ্ঞতায় সে আমি নিশ্চিত জানি। সাহিত্যিকের সমাদর রুচির উপরে নির্ভর করে, যুক্তিপ্রমাণের উপর নয়। এ ভিত্তি কোথাও কাঁচা, কোথাও পাকা, কোথাও কুটিল ; সর্বত্র এ সমান ভার সয় না। তাই বলি কবির কীর্তি কীর্তিস্তম্ভ নয়, সে কীর্তিতরণী। আবর্তসংকুল বহুদীর্ঘ কালস্রোতের সকল পরীক্ষা সকল সংকট উত্তীর্ণ হয়েও যদি তার এগিয়ে চলা বন্ধ না হয়, অন্তত নোঙর ক'রে থাকবার একটা ভদ্র ঘাট যদি সে পায়, তবেই সাহিত্যের পাকা খাতায় কোনো একটা বর্গে তার নাম চিহ্নিত হতে পারে। ইতিমধ্যে লোকের মুখে মুখে নানা অনুকূল প্রতিকূল বাতাসের আঘাত খেতে খেতে তাকে ঢেউ কাটিয়ে চলতে হবে। মহাকালের বিচারদরবারে চূড়ান্ত শুনানির লগ্ন ঘণ্টায় ঘণ্টায় ঘটে না, বৈতরণীর পরপারে তাঁর বিচারসভা।

বিশ্ববিদ্যালয়ে বিদ্বানের আসন চিরপ্রসিদ্ধ। সেই পাণ্ডিত্যের গৌরব-গম্ভীর পদে সহসা-সাহিত্যিককে বসানো হল। সুতরাং এই রীতিবিপর্যয় অত্যন্ত বেশি ক'রে চোখে পড়বার বিষয় হয়েছে। এরকম বহুতীক্ষ্ণদৃষ্টি-সংকুল কুশাঙ্কুরিত পথে সহজে চলাফেরা করা আমার চেয়ে অনেক শক্ত মানুষের পক্ষেও দুঃসাধ্য। আমি যদি পণ্ডিত হতুম তবে নানা লোকের সম্মতি-অসম্মতির দ্বন্দ্ব সত্ত্বেও পথের বাধা কঠোর হত না। কিন্তু স্বভাবতই এবং অভ্যাসবশতই আমার চলন অব্যবসায়ীর চালে। বাহির থেকে আমি এসেছি আগন্তুক, এইজন্য প্রশ্রয় প্রত্যাশা করতে আমার ভরসা হয় না।

অথচ আমাকে নির্বাচন করার মধ্যেই আমার সম্বন্ধে একটি অভয়পত্রী প্রচ্ছন্ন আছে, সেই আশ্বাসের আভাস পূর্বেই দিয়েছি। নিঃসন্দেহ আমি এখানে চলে এসেছি কোনো-একটি ঋতুপরিবর্তনের মুখে। পুরাতনের সঙ্গে আমার অসংগতি থাকতে পারে, কিন্তু নূতন বিধানের নবোদ্যম হয়তো আমাকে তার আনুচর্যে গ্রহণ করতে অপ্রসন্ন হবে না।

বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মক্ষেত্রে প্রথম-পদার্পণ-কালে এই কথাটির আলোচনা ক'রে অন্যের কাছে না হোক, অন্তত নিজের কাছে বিষয়টিকে স্পষ্ট ক'রে তোলার প্রয়োজন আছে। অতএব, আমাকে জড়িত করে যে ব্রতটির উপক্রম হল তার ভূমিকা এখানে স্থির করে নিই।

বিশ্ববিদ্যালয় একটি বিশেষ সাধনার ক্ষেত্র। সাধারণভাবে বলা চলে, সে সাধনা বিদ্যার সাধনা। কিন্তু তা বললে কথাটা সুনির্দিষ্ট হয় না; কেননা বিদ্যা শব্দের অর্থ ব্যাপক এবং তার সাধনা বহুবিচিত্র।

এ দেশে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি বিশেষ আকার প্রকার ক্রমশ পরিণত হয়ে উঠেছে। ভারতবর্ষের আধুনিক ইতিহাসেই তার মূল নিহিত। এই উপলক্ষে তার বিস্তারিত বিচার অসংগত হবে না। বাল্যকাল হতে যাঁরা এই বিদ্যালয়ের নিকট-সংস্রবে আছেন তাঁরা আপন অভ্যাস ও মমত্বের বেষ্টনী থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে একে বৃহৎ কালের পরিপ্রেক্ষণিকায় দেখতে হয়তো কিছু বাধা পেতে পারেন। সামীপ্যের এবং অভ্যাসের সম্বন্ধ না থাকাতে আমার পক্ষে সেই ব্যক্তিগত বাধা নেই; অতএব আমার অসংসক্ত মনে এর স্বরূপ কিরকম প্রতিভাত হচ্ছে সেটা সকলের পক্ষে স্বীকার করবার যোগ্য না হলেও বিচার করবার যোগ্য।

বলা বাহুল্য, য়ুরোপীয় ভাষায় যাকে য়ুনিভর্সিটি বলে প্রধানত তার উদ্ভব য়ুরোপে। অর্থাৎ য়ুনিভর্সিটির যে চেহারার সঙ্গে আমাদের আধুনিক পরিচয় এবং যার সঙ্গে আধুনিক শিক্ষিতসমাজের ব্যবহার সেটা সমূলে ও শাখা-প্রশাখায় বিলিতি। আমাদের দেশের অনেক ফলের গাছকে আমরা বিলিতি বিশেষণ দিয়ে থাকি, কিন্তু দিশি গাছের সঙ্গে তাদের কুলগত প্রভেদ থাকলেও প্রকৃতিগত ভেদ নেই। আজ পর্যন্ত আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় সম্বন্ধে সে কথা সম্পূর্ণ বলা চলবে না। তার নামকরণ, তার রূপকরণ, এ দেশের সঙ্গে সংগত নয়; এ দেশের আবহাওয়ায় তার স্বভাবীকরণও ঘটে নি।

অথচ এই য়ুনিভর্সিটির প্রথম প্রতিরূপ একদিন ভারতবর্ষেই দেখা দিয়েছিল। নালন্দা বিক্রমশিলা তক্ষশিলার বিদ্যায়তন কবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তার নিশ্চিত কালনির্ণয় এখনো হয় নি, কিন্তু ধরে নেওয়া যেতে পারে যে, য়ুরোপীয় য়ুনিভর্সিটির পূর্বেই তাদের আবির্ভাব। তাদের উদ্ভব ভারতীয় চিত্তের আন্তরিক প্রেরণায়, স্বভাবের অনিবার্য আবেগে। তার পূর্ববর্তীকালে বিদ্যার সাধনা ও শিক্ষা বিচিত্র আকারে ও বিবিধ প্রণালীতে দেশে নানা স্থানে ব্যাপ্ত হয়েছিল, এ কথা সুনিশ্চিত। সমাজের সেই সর্বত্রপরিকীর্ণ সাধনাই পুঞ্জীভূত কেন্দ্রীভূত রূপে এক সময়ে স্থানে স্থানে দেখা দিল।

এর থেকে মনে পড়ে ভারতবর্ষে বেদব্যাসের যুগ, মহাভারতের কাল। দেশে যে বিদ্যা, যে মননধারা, যে ইতিহাসকথা দূরে দূরে বিক্ষিপ্ত ছিল, এমন-কি দিগন্তের কাছে বিলীনপ্রায় হয়ে এসেছে, এক সময়ে তাকে সংগ্রহ করা তাকে সংহত করার নিরতিশয় আগ্রহ জেগেছিল সমস্ত দেশের মনে। নিজের চিৎপ্রকর্ষের যুগব্যাপী ঐশ্বর্যকে সুস্পষ্টরূপে নিজের গোচর করতে না পারলে তা ক্রমশ অনাদরে অপরিচয়ে জীর্ণ হয়ে বিলুপ্ত হয়। কোনো এক কালে এই আশঙ্কায় দেশ সচেতন হয়ে উঠেছিল; দেশ একান্ত ইচ্ছা করেছিল, আপন সূত্রচ্ছিন্ন রত্নগুলিকে উদ্ধার করতে, সংগ্রহ করতে, তাকে সূত্রবদ্ধ করে সমগ্র করতে এবং তাকে সর্বলোকের ও সর্বকালের ব্যবহারে উৎসর্গ করতে। দেশ আপন বিরাট চিন্ময়ী প্রকৃতিকে প্রত্যক্ষরূপে সমাজে স্থিরপ্রতিষ্ঠ করতে উৎসুক হয়ে উঠল। যা আবদ্ধ ছিল বিশেষ বিশেষ পণ্ডিতের অধিকারে তাকেই অনবচ্ছিন্নরূপে সর্বসাধারণের আয়ত্তগোচর করবার এই এক আশ্চর্য অধ্যবসায়। এর মধ্যে একটি প্রবল চেষ্টা, অক্লান্ত সাধনা, একটি সমগ্রদৃষ্টি ছিল। এই উদ্যোগের মহিমাকে শক্তিমতী প্রতিভা আপন লক্ষ্যীভূত করেছিল, তার স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় মহাভারত নামটিতেই। মহাভারতের মহৎ সমুজ্জ্বল রূপ যাঁরা ধ্যানে দেখেছিলেন 'মহাভারত' নামকরণ তাঁদেরই কৃত। সেই রূপটি

একই কালে ভৌমণ্ডলিক রূপ এবং মানস রূপ। ভারতবর্ষের মনকে দেখেছিলেন তাঁরা মনে। সেই বিশ্বদৃষ্টির প্রবল আনন্দে তাঁরা ভারতবর্ষে চিরকালের শিক্ষার প্রশস্ত ভূমি পত্তন করে দিলেন। সে শিক্ষা ধর্মে কর্মে রাজনীতিতে সমাজনীতিতে তত্ত্বজ্ঞানে বহুব্যাপক। তার পর থেকে ভারতবর্ষ আপন নিষ্ঠুর ইতিহাসের হাতে আঘাতের পর আঘাত পেয়েছে, তার মর্মগ্রন্থি বার বার বিশ্লিষ্ট হয়ে গেছে, দৈন্য এবং অপমানে সে জর্জর কিন্তু ইতিহাসবিস্মৃত সেই যুগের সেই কীর্তি এতকাল লোকশিক্ষার অবাধ জলসেকপ্রণালীকে নানা ধারায় পূর্ণ ও সচল করে রেখেছে। গ্রামে গ্রামে ঘরে ঘরে তার প্রভাব আজও বিরাজমান। সেই মূল প্রস্রবণ থেকে এই শিক্ষার ধারা যদি নিরন্তর প্রবাহিত না হত তা হলে দুঃখ দারিদ্র্যে অসম্মানে দেশ বর্বরতার অন্ধকূপে মনুষ্যত্ব বিসর্জন করত। সেইদিন ভারতবর্ষে যথার্থ আপন সজীব বিশ্ববিদ্যালয়ের সৃষ্টি। তার মধ্যে জীবনীশক্তির বেগ যে কত প্রবল তা স্পষ্টই বুঝতে পারি যখন দেখতে পাই সমুদ্রপারে জাভাদ্বীপে সর্বসাধারণের সমস্ত জীবন ব্যাপ্ত ক'রে কী-একটি কল্পলোকের সৃষ্টি সে করেছে; এই আর্যেতর জাতির চরিত্রে, তার কল্পনায়, তার রূপরচনায় কিরকম সে নিরন্তর সক্রিয়। জ্ঞানের একটা দিক আছে, তা বৈষয়িক। সে রয়েছে জ্ঞানের বিষয় সংগ্রহ করবার লোভকে অধিকার ক'রে, সে উত্তেজিত করে পাণ্ডিত্যের অভিমানকে। এই কৃপণের ভাণ্ডারের অভিমুখে কোনো মহৎ প্রেরণা উৎসাহ পায় না। ভারতে এই-যে মহাভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়-যুগের উল্লেখ করলেম সেই যুগের মধ্যে তপস্যা ছিল; তার কারণ, ভাণ্ডারপূরণ তার লক্ষ্য ছিল না; তার উদ্দেশ্য ছিল সর্বজনীন চিত্তের উদ্দীপন, উদ্‌বোধন, চারিত্রসৃষ্টি। পরিপূর্ণ মনুষ্যত্বের যে আদর্শ জ্ঞানে কর্মে হৃদয়ভাবে ভারতের মনে উদ্ভাসিত হয়েছিল এই উদ্যোগ তাকেই সঞ্চারিত করতে চেয়েছিল চিরদিনের জন্য সর্বসাধারণের জীবনের মধ্যে, তার আর্থিক ও পারমার্থিক সদগতির দিকে, কেবলমাত্র তার বুদ্ধিতে নয়।

নালন্দা বিক্রমশিলার বিদ্যায়তন সম্বন্ধেও এই কথা খাটে। সে যুগে সে বিদ্যার মহৎমূল্য দেশের লোক গভীরভাবে উপলব্ধি করেছিল; তাকে সমগ্র সম্পূর্ণতায় কেন্দ্রীভূত ক'রে সর্বজনীন জ্ঞানসত্র রচনা করবার ইচ্ছা স্বতই ভারতবর্ষের মনে সমুদ্যত হয়েছিল সন্দেহ নেই। ভগবান বুদ্ধ একদিন যে ধর্ম প্রচার করেছিলেন সে ধর্ম তার নানা তত্ত্ব, নানা অনুশাসন, তার সাধনার নানা প্রণালী নিয়ে সাধারণচিত্তের আন্তর্ভৌম স্তরে প্রবেশ ক'রে ব্যাপ্ত হয়েছিল। তখন দেশ প্রবলভাবে কামনা করেছিল এই বহুশাখায়িত পরিব্যাপ্ত ধারাকে কোনো কোনো সুনির্দিষ্ট কেন্দ্রস্থলে উৎসরূপে উৎসারিত ক'রে দিতে সর্বসাধারণের স্নানের জন্য, পানের জন্য, কল্যাণের জন্য।

এই ইচ্ছাটি যে কিরকম সত্য ছিল, কিরকম উদার, কিরকম বেগবান ছিল, তার প্রমাণ পাওয়া যায় এই অনুষ্ঠানের মধ্যেই, এর অকৃপণ ঐশ্বর্যে। বিখ্যাত চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ বিস্ময়োচ্ছ্বসিত ভাষায় এই বিদ্যানিকেতনের বর্ণনা করেছেন। তাঁর লেখনীচিত্রে দেখতে পাই এর অলংকরণরেখায়িত শুক্তিরক্ত স্তম্ভশ্রেণী, এর অভ্রভেদী হর্ম্যশিখর, ধূপসুগন্ধি মন্দির, ছায়ানিবিড় আম্রবন, নীলপদ্মে-প্রফুল্ল গভীর সরোবর। তিনটি বড়ো বড়ো বাড়িতে এখানকার গ্রন্থাগার ছিল; তাদের নাম রত্নসাগর, রত্নোদধি, রত্নরঞ্জক। রত্নোদধি নয়তলা; সেইখানে প্রজ্ঞাপারমিতাসূত্র এবং অন্যান্য শাস্ত্রগ্রন্থ রক্ষিত ছিল। বহু রাজা পরে পরে এই সংঘের বিস্তারসাধন করেছেন; চারি দিকে উন্নত চৈত্য উঠেছে, সেই চৈত্যগুলির মধ্যে মধ্যে শিক্ষাভবন, তর্কসভাগৃহ, প্রত্যেক সরোবরের চারি দিকে বেদী ও মন্দির; স্থানে স্থানে শিক্ষক ও প্রচারকদের জন্যে চারতলা বাসস্থান। এখানকার গৃহনির্মাণে কিরকম সযত্ন সতর্কতা সেই প্রসঙ্গে ডাক্তার স্পুনার বলেন, আধুনিক কালে যে রকমের ইঁট ও গাঁথুনি প্রচলিত এখানকার গৃহনির্মাণের উপকরণ ও যোজনাপদ্ধতি তার চেয়ে

অনেক গুণে শ্রেষ্ঠ। ইৎসিঙ বলেন, এই বিদ্যালয়ের প্রয়োজন নির্বাহের জন্য দুই শতের অধিক গ্রাম উৎসর্গ করা হয়েছে ; বহুসহস্র ছাত্র ও অধ্যাপকের জীবিকার উপযুক্ত ভোজ্য প্রত্যহ প্রচুর পরিমাণে গ্রামের অধিবাসীরা নিয়মিত জুগিয়ে থাকে।

এই বিদ্যায়তনগুলির মধ্যে, শুধু বিদ্যার সঞ্চয় মাত্র নয়, বিদ্যার গৌরব ছিল প্রতিষ্ঠিত। যে-সকল আচার্য অধ্যাপক ছিলেন, হিউয়েন সাঙ বলেন, তাঁদের যশ বহুদূরব্যাপী ; তাঁদের চরিত্র পবিত্র, অনিন্দনীয়। তাঁরা সদ্ধর্মের অনুশাসন অকৃত্রিম শ্রদ্ধার সঙ্গে পালন করেন। অর্থাৎ যে বিদ্যা প্রচারের ভার ছিল তাঁদের 'পরে সমস্ত দেশ এবং দূরদেশের ছাত্রেরা তাকে সম্মান করত ; সেই সম্মানকে উজ্জ্বল ক'রে রক্ষা করার দায়িত্ব ছিল তাঁদের 'পরে—কেবল মেধা দ্বারা নয়, বহুশ্রুতের দ্বারা নয়, চরিত্রের দ্বারা, অস্খলিত কঠোর তপস্যার দ্বারা। এটা সম্ভব হতে পেরেছিল, কেননা সমস্ত দেশের শ্রদ্ধা এই সাত্ত্বিক আদর্শ তাঁদের কাছে প্রত্যাশা করেছে। আচার্যেরা জানতেন, দূর দূর দেশকে জ্ঞানবিতরণের মহৎ ভার তাঁদের 'পরে ; সমুদ্র পর্বত পার হয়ে, প্রাণপণ কঠিন দুঃখ স্বীকার ক'রে, বিদেশের ছাত্রেরা আসছে তাঁদের কাছে জ্ঞানপিপাসায়। এইভাবে বিদ্যার 'পরে সর্বজনীন শ্রদ্ধা থাকলে যাঁরা বিদ্যা বিতরণ করেন আপন যোগ্যতা সম্বন্ধে শৈথিল্য তাঁদের পক্ষে সহজ হয় না। সমস্ত দেশের কলাপ্রতিভাও আপন শ্রদ্ধার অর্ঘ্য এখানে পূর্ণ শক্তিতে নিবেদন করেছিল। সেই উপলক্ষে দেশ আপন শিল্পরচনার উৎকর্ষ এই বিদ্যামন্দিরের ভিত্তিতে ভিত্তিতে মিলিত করেছে, ঘোষণা করেছে ; ভারতের কলাবিদ্যা ভারতের বিশ্ববিদ্যাকে প্রণাম করেছে।

একটি কথা এই প্রসঙ্গে মনে রাখা চাই, তখনকার রাজাদের প্রাসাদভবন বা ভোগের স্থান কোনো বিশেষ সমারোহে ইতিহাসের স্মৃতিকে অধিকারচেষ্টা করেছিল, তার প্রমাণ পাই নে। এই চেষ্টা যে নিন্দনীয় তা বলি নে ; কেননা সাধারণত দেশ আপন ঐশ্বর্যগৌরব প্রকাশ করবার উপলক্ষ রচনা করে আপন নৃপতিকে বেষ্টন ক'রে, সমস্ত প্রজার আত্মসম্মান সেইখানে কলানৈপুণ্যে শোভাপ্রাচুর্যে সমুজ্জ্বল হয়ে ওঠে। যে কারণেই হোক, অতীত ভারতবর্ষের সেই চেষ্টাকে আমরা আজ দেখতে পাই নে। হয়তো রাজাসনের ধ্রুবত্ব ছিল না ব'লেই সেখানে ক্রমাগতই ধ্বংসধূমকেতুর সম্মার্জনী কাজ করেছে। কিন্তু নালন্দা বিক্রমশিলা প্রভৃতি স্থানে স্মৃতিরক্ষাচেষ্টার বিরাম ছিল না। তার প্রতি দেশের ভক্তি, দেশের বেদনা যে কত প্রবল ছিল এই তার একটি প্রমাণ।

আপন সর্বশ্রেষ্ঠ বিদ্যার প্রতি সর্বজনের যে উদার শ্রদ্ধা প্রভূতত্যাগস্বীকারে অকুণ্ঠিত সেই অকৃত্রিম শ্রদ্ধাই ছিল স্বদেশীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের যথার্থ প্রাণ-উৎস।

এ কথা সহজেই কল্পনা করা যায় যে, জ্ঞানসাধনার এই-সকল বিরাট যজ্ঞভূমিতে মানুষের মনের সঙ্গে মনের কিরকম অতি বৃহৎ ও নিবিড় সংঘর্ষ চলেছিল, তাতে ধীশক্তি বহ্নিশিখা কিরকম নিরন্তর প্রোজ্জ্বল হয়ে থাকত। ছাপানো টেক্‌স্ট্‌ বুক্‌ থেকে নোট দেওয়া নয়, অন্তর থেকে অন্তরে অবিশ্রাম উদ্যম সঞ্চার করা। বিদ্যায় বুদ্ধিতে জ্ঞানে দেশের যাঁরা সুধীশ্রেষ্ঠ দূর দূরান্তর থেকে এখানে তাঁরা সম্মিলিত। ছাত্রেরাও তীক্ষ্ণবুদ্ধি, শ্রদ্ধাবান্‌, সুযোগ্য ; দ্বারপণ্ডিতের কাছে কঠিন পরীক্ষা দিয়ে তবে তারা পেয়েছে প্রবেশের অধিকার। হিউয়েন সাঙ লিখেছেন, এই পরীক্ষায় দশ জনের মধ্যে অন্তত সাত-আট জন বর্জিত হত। অর্থাৎ তৎকালীন ম্যাট্রিকুলেশনের যে ছাঁকনি ছিল তাতে মোটা মোটা ফাঁক ছিল না। তার কারণ, সমস্ত পৃথিবীর হয়ে আদর্শকে বিশুদ্ধ ও উন্নত রাখবার দায়িত্ব ছিল জাগরূক। লোকের মনে উদ্‌বেগ ছিল, পাছে অযথা প্রশ্রয়ের দ্বারা বিদ্যার অধঃপতনে দেশের পক্ষে মানসিক আত্মঘাত ঘটে। নানা প্রকৃতির মন এখানে এক জায়গায়

সমবেত হত ; তারা একজাতীয় নয়, একদেশীয় নয়। এক লক্ষ্য দৃঢ় রেখে এক জীবিকাব্যবস্থায় তারা পরস্পরের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ঐক্য লাভ করেছিল। বিদ্যার সম্মিলনক্ষেত্রে এই ঐক্যের মূল্য যে কতখানি তাও মনে রাখা চাই। তখন পৃথিবীর আরো নানা স্থানে বড়ো বড়ো সভ্যতার উদ্ভব হয়েছিল ; কিন্তু, জ্ঞানের তপস্যা-উপলক্ষে মানবমনের এমন বিশাল সমবায় আর কোথাও শোনা যায় নি। এর মূল কারণ, বিশ্বজনীন মনুষ্যত্বের প্রতি সুগভীর শ্রদ্ধা, বিদ্যার প্রতি গৌরববোধ, চিত্তসম্পদ যাঁরা নিজে পেয়েছেন বা সৃষ্টি করেছেন সেই পাওয়ার ও সৃষ্টির পরম আনন্দে সেই সম্পদ দেশবিদেশের সকলকে দান করবার একাগ্র দায়িত্বজ্ঞান। আজ নিজের প্রতি, মানুষের প্রতি, নিজের সাধনার প্রতি, আলস্যবিজড়িত অশ্রদ্ধার দিনে বিশেষ ক'রে আমাদের মনে করবার সময় এসেছে যে, মানব-ইতিহাসে সর্বাগ্রে ভারতবর্ষেই জ্ঞানের বিশ্বদানযজ্ঞ উদার দাক্ষিণ্যের সঙ্গে প্রবর্তিত হয়েছিল। বাংলাদেশের পক্ষ থেকে আরো-একটি কথা আমাদের মনে রাখবার যোগ্য, নালন্দায় হিউয়েন সাঙের যিনি গুরু ছিলেন তিনি ছিলেন বাঙালি, তাঁর নাম শীলভদ্র। তিনি বাংলাদেশের কোনো-এক স্থানের রাজা ছিলেন, রাজ্য ত্যাগ করে বেরিয়ে আসেন। এই সঙ্ঘে যাঁরা শিক্ষাদান করতেন তাঁদের সকলের মধ্যে একলা কেবল ইনিই সমস্ত শাস্ত্র, সমস্ত সূত্র ব্যাখ্যা করতে পারতেন।

সেকালে বৌদ্ধভারতে সঙ্ঘ ছিল নানা স্থানে। সেই-সকল সঙ্ঘে সাধকেরা শাস্ত্রজ্ঞেরা তত্ত্বজ্ঞানীরা শিষ্যেরা সমবেত হয়ে জ্ঞানের আলোক জ্বালিয়ে রাখতেন, বিদ্যার পুষ্টিসাধন করতেন। নালন্দা বিক্রমশিলা তাদেরই বিশ্বরূপ, তাদেরই স্বাভাবিক পরিণতি।

উপনিষদের কালেও ভারতবর্ষে এইরকম বিদ্যাকেন্দ্রের সৃষ্টি হয়েছিল, তার কিছু কিছু প্রমাণ পাওয়া যায়। শতপথব্রাহ্মণের অন্তর্গত বৃহদারণ্যক উপনিষদে আছে, আরুণির পুত্র শ্বেতকেতু পাঞ্চালদেসের 'পরিষদ্'-এ জৈবালি প্রবাহণের কাছে এসেছিলেন। এই স্থানটি আলোচনা করলে বোঝা যায়, ঐ পরিষদ ঐ দেশের বড়ো বড়ো জ্ঞানীদের সমবায়ে। এই পরিষদ জয় করতে পারলে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ হত। অনুমান করা যায় যে, সমস্ত পাঞ্চালদেশের মধ্যে উচ্চতম শিক্ষার উদ্দেশে সম্মিলিতভাবে একটা প্রতিষ্ঠান ছিল, বিদ্যার পরীক্ষা দেবার জন্যে সেখানে অন্যত্র থেকে লোক আসত। উপনিষদ-কালের বিদ্যা যে স্বভাবতই স্থানে স্থানে শিক্ষা-আলোচনা তর্কবিতর্ক ও জ্ঞানসংগ্রহের জন্য আপন আশ্রয়রূপে পরিষদ রচনা করেছিল, তা নিশ্চিত অনুমান করা যেতে পারে।

য়ুরোপের ইতিহাসেও সেইরকম ঘটেছে। সেখানে খৃস্টধর্মের আরম্ভকালে পুরাতন ধর্মের সঙ্গে নূতন ধর্মের দ্বন্দ্ব এবং নিষ্ঠুর উৎপীড়নের দ্বারা নবদীক্ষিতদের ভক্তির পরীক্ষা চলেছিল। অবশেষে ক্রমে যখন এই ধর্ম সাধারণ্যে স্বীকৃত হল তখন স্বভাবতই পূজার ধারার পাশেপাশেই তত্ত্বের ধারা প্রবাহিত হল। বাঁধ যদি বেঁধে না দেওয়া যায় তবে ব্যক্তিবিশেষের বিশেষ প্রকৃতির প্ররোচনায় ভক্তির বিষয় বিচিত্র রূপ ও বিকৃত রূপ নিতে থাকে। তখন তর্ক অবলম্বন ক'রে বিচারের প্রয়োজন হয়। বিশ্বাস তখন বুদ্ধির সাহায্যে, জ্ঞানের সাহায্যে আপন স্থায়ী ও বিশুদ্ধ ভিত্তির সন্ধান করে। তখন তার প্রশ্ন ওঠে ; কষ্টে দেবায় হবিষা বিধেম। ভক্তি তখন কেবলমাত্র পূজার বিষয় না হয়ে বিদ্যার বিষয় হয়ে ওঠে। এইরকম অবস্থায় য়ুরোপের নানা স্থানে আচার্য ও ছাত্রদের সঙ্ঘ সৃষ্টি হচ্ছিল। তার মধ্যে থেকে নির্বাচনের দরকার হল। কোথায় শিক্ষা শ্রদ্ধেয়, কোথায় তা প্রামাণিক, তা স্থির করবার ভার নিলে রোমের প্রধান ধর্মসঙ্ঘ, তারই সঙ্গে রাজার শাসন ও উৎসাহ।

সকলেই জানেন, সে সময়কার আলোচ্য বিদ্যায় প্রধান স্থান ছিল তর্কশাস্ত্রের। তখনকার পণ্ডিতেরা জানতেন, ডায়েলেক্‌টিক সকল বিজ্ঞানের মূলবিজ্ঞান। এর কারণ স্পষ্টই বোঝা যায়। শাস্ত্রের উপদেশগুলি বাক্যের দ্বারা বদ্ধ। সেই-সকল আপ্তবাক্যের অবিসম্বাদিত অর্থে পৌঁছতে গেলে শাব্দিক তর্কের প্রয়োজন হয়। য়ুরোপের মধ্যযুগে সেই তর্কের যুক্তিজাল যে কিরকম সূক্ষ্ম ও জটিল হয়ে উঠেছিল তা সকলেরই জানা আছে। শাস্ত্রজ্ঞানের বিশুদ্ধতার জন্য এই ন্যায়শাস্ত্র। সমাজরক্ষার জন্য আর দুটি বিদ্যার বিশেষ প্রয়োজন, আইন এবং চিকিৎসা। তখনকার য়ুরোপীয় বিশ্ববিদ্যালয় এই কয়টি বিদ্যাকেই প্রধানত গ্রহণ করেছিল। নালন্দাতে বিশেষভাবে শিক্ষার বিষয় ছিল হেতুবিদ্যা, চিকিৎসাবিদ্যা, শব্দবিদ্যা। তার সঙ্গে ছিল তন্ত্র।

ইতিমধ্যে য়ুরোপের মানুষের অন্তর ও বাহিরের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সেখানকার য়ুনিভর্সিটিতে মস্ত দুটি মূলগত পরিবর্তন ঘটেছে। ধর্মশাস্ত্রের প্রতি সেখানকার মনুষ্যত্বের ঐকান্তিক যে নির্ভর ছিল সেটা ক্রমে ক্রমে শিথিল হয়ে এল। একদিন সেখানে মানুষের জ্ঞানের ক্ষেত্রের প্রায় সমস্তটা ধর্মশাস্ত্রের সম্পূর্ণ অন্তর্গত না হোক, অন্তত শাসনগত ছিল। লড়াই করতে করতে অবশেষে সেই অধিকারের কর্তৃত্বভার তার হাত থেকে স্খলিত হয়েছে। বিজ্ঞানের সঙ্গে যেখানে শাস্ত্রবাক্যের বিরোধ সেখানে শাস্ত্র আজ পরাভূত, বিজ্ঞান আজ আপন স্বতন্ত্র বেদীতে একেশ্বররূপে প্রতিষ্ঠিত। ভূগোল ইতিহাস প্রভৃতি মানুষের অন্যান্য শিক্ষণীয় বিষয় বৈজ্ঞানিক যুক্তিপদ্ধতির অনুগত হয়ে ধর্মশাস্ত্রের বন্ধন থেকে মুক্তি পেয়েছে। বিশ্বের সমস্ত জ্ঞাতব্য ও মন্তব্য বিষয় সম্বন্ধে মানুষের জিজ্ঞাসার প্রবণতা আজ বৈজ্ঞানিক। আপ্তবাক্যের মোহ তার কেটে গেছে।

এইসঙ্গে আর-একটা বড়ো পরিবর্তন ঘটেছে ভাষা নিয়ে। একদিন লাটিন ভাষাই ছিল সমস্ত য়ুরোপের শিক্ষার ভাষা, বিদ্যার আধার। তার সুবিধা এই ছিল, সকল দেশের ছাত্রই এক পরিবর্তনহীন সাধারণভাষার যোগে শিক্ষালাভ করতে পারত। কিন্তু তার প্রধান ক্ষতি ছিল এই যে, বিদ্যার আলোক পাণ্ডিত্যের ভিত্তিসীমা এড়িয়ে বাইরে অতি অল্পই পৌঁছত। যখন থেকে য়ুরোপের প্রত্যেক জাতিই আপন আপন ভাষাকে শিক্ষার বাহনরূপে স্বীকার করলে তখন শিক্ষা ব্যাপ্ত হল সর্বসাধারণের মধ্যে। তখন বিশ্ববিদ্যালয় সমস্ত দেশের চিত্তের সঙ্গে অন্তরঙ্গরূপে যুক্ত হল। শুনতে কথাটা স্বতোবিরুদ্ধ, কিন্তু সেই ভাষাস্বাতন্ত্র্যের সময় থেকেই সমস্ত য়ুরোপে বিদ্যার যথার্থ সমবায়সাধন হয়েছে। এই স্বাতন্ত্র্য য়ুরোপের চিৎপ্রকর্ষকে খণ্ডিত না ক'রে আশ্চর্যরূপে সম্মিলিত করেছে। য়ুরোপে এই স্বদেশী ভাষায় বিদ্যার মুক্তির সঙ্গে সঙ্গে তার জ্ঞানের ঐশ্বর্য বেড়ে উঠল, ব্যাপ্ত হল সমস্ত প্রজার মধ্যে, যুক্ত হল প্রতিবেশী ও দূরবাসীদের জ্ঞানসাধনার সঙ্গে, স্বতন্ত্র ক্ষেত্রের সমস্ত শস্য সংগৃহীত হল য়ুরোপের সাধারণ ভাণ্ডারে। এখন সেখানে য়ুনিভর্সিটি যেমন— উদারভাবে সকল দেশের তেমনি একান্তভাবে আপন দেশের। এইটিই হচ্ছে মানুষের প্রকৃতির অনুগত। কারণ, মানুষ যদি সত্যভাবে নিজেকে উপলব্ধি না করে তা হলে সত্যভাবে নিজেকে উৎসর্গ করতে পারে না। বিশ্বজনীনতার দাক্ষিণ্য বাস্তব হতে পারে না সেইসঙ্গে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের উৎকর্ষ যদি বাস্তব না হয়। এশিয়ার মধ্যযুগে বৌদ্ধধর্মকে তিব্বত চীন মঙ্গোলিয়া গ্রহণ করেছিল, কিন্তু গ্রহণ করেছিল নিজের ভাষাতেই। এইজন্যেই সে-সকল দেশে সে ধর্ম সর্বজনের অন্তরের সামগ্রী হতে পেরেছে, এক-একটি সমগ্রজাতিকে মানুষ করেছে, তাকে মোহান্ধকার থেকে উদ্ধার করেছে।

য়ুনিভর্সিটির উৎপত্তি সম্বন্ধে বিস্তারিত বর্ণনার প্রয়োজন নেই। আমার বলবার মোট কথাটি এই যে, বিশেষ দেশ, বিশেষ জাতি যে বিদ্যার সম্বন্ধে বিশেষ প্রীতি গৌরব ও দায়িত্ব অনুভব

করেছে তাকেই রক্ষা ও প্রচারের জন্যে স্বভাবতই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম সৃষ্টি। যে ইচ্ছা সকল সৃষ্টির মূলে, সমস্ত দেশের সেই ইচ্ছাশক্তির থেকেই তার উদ্ভব। এই ইচ্ছার মূলে থাকে শক্তির ঐশ্বর্য। সেই ঐশ্বর্য দাক্ষিণ্য দ্বারা নিজেকে স্বতই প্রকাশ করতে চায়; তাকে নিবারণ করা যায় না।

সমস্ত সভ্যদেশ আপন বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে জ্ঞানের অবারিত আতিথ্য করে থাকে। যার সম্পদে উদ্‌বৃত্ত আছে সেই ডাকে অতিথিকে। গৃহস্থ আপন অতিথিশালায় বিশ্বকে স্বীকার করে। নালন্দায় ভারত আপন জ্ঞানের অন্নসত্র খুলেছিল স্বদেশ-বিদেশের সকল অভ্যাগতের জন্য। ভারত সেদিন অনুভব করেছিল, তার এমন সম্পদ পর্যাপ্ত পরিমাণে আছে সকল মানুষকে দিতে পারলে তবেই যার চরম সার্থকতা। পাশ্চাত্য মহাদেশের অধিকাংশ দেশেই বিদ্যার এই অতিথিশালা বর্তমান। সেখানে স্বদেশী-বিদেশীর ভেদ নেই। সেখানে জ্ঞানের বিশ্বক্ষেত্রে সব মানুষই পরস্পর আপন। সমাজের আর-আর প্রায় সকল অংশেই ভেদের প্রাচীর প্রতিদিন দুর্লঙ্ঘ্য হয়ে উঠছে : কেবল মানুষের আমন্ত্রণ রইল জ্ঞানের এই মহাতীর্থে। কেননা এইখানে দৈন্যস্বীকার, এইখানে কৃপণতা, ভদ্রজাতির পক্ষে সকলের চেয়ে আত্মলাঘব। সৌভাগ্যবান দেশের প্রাঙ্গণ এইখানে বিশ্বের দিকে উন্মুক্ত।

আমাদের দেশে য়ুনিভর্সিটির পত্তন হল বাহিরের দানের থেকে। সে দানে দাক্ষিণ্য অধিক নেই। তার রাজানুচিত কৃপণতা থেকে আজ পর্যন্ত দুঃখ পাচ্ছি। ইংরেজের দেশে রাজদ্বারে যে অতিথিশালা খোলা আছে লন্ডন য়ুনিভর্সিটিতে, এ দেশের দরিদ্রপাড়ায় তারই একটা ছোটো শাখা স্থাপন হল। ভারতীয় বিদ্যা ব'লে কোনো-একটা পদার্থ যে কোথাও আছে এই বিদ্যালয়ে গোড়াতেই তাকে অস্বীকার করা হয়েছে। এর স্বভাবটা পৃথিবীর সকল য়ুনিভর্সিটির একেবারে বিপরীত। এর দানের বিভাগ অবরুদ্ধ, কেবল গ্রহণের বিভাগ আপন ক্ষুধিত কবল উদঘাটিত করে আছে। তাতে গ্রহণের কাজও ঠিকমতো ঘটে না। কেননা, যেখানে দেওয়া-নেওয়ার চলাচল নেই সেখানে পাওয়াটাই থাকে অসম্পূর্ণ।

আধুনিককালে জীবনযাত্রা সকল দিকেই জটিল। নূতন নূতন নানা সমস্যার আলোড়নে মানুষের মন সর্বদাই উৎক্ষুব্ধ। নিয়ত তার নানা প্রশ্নের নানা উত্তর, তার নানা বেদনার নানা প্রকাশ সমাজে তরঙ্গিত, সাহিত্যে বিচিত্র ভঙ্গিতে আবর্তিত। বিশ্ববিদ্যালয়ে নানা যুগের ধ্রুব আদর্শগুলি যেমন মনের সামনে বিধৃত, সঞ্চিত, তেমনি প্রচলিত সাহিত্যে প্রকাশ পাচ্ছে প্রবহমান চিত্তের লীলাচাঞ্চল্য। পাশ্চাত্য বিশ্ববিদ্যালয়ে বাহিরের এই চিত্তমথনের সঙ্গে যোগ বিচ্ছিন্ন নয়। মানুষের শিক্ষার এই দুই ধারা সেখানে গঙ্গাযমুনার মতো মেলে। কেননা সেখানে সমস্ত দেশের একই চিত্র তার বিদ্যাকে নিরবচ্ছিন্নভাবে সৃষ্টি করে তুলছে, পৃথিবীর সৃষ্টিকার্য যেমন জলে স্থলে উভয়তই সক্রিয়।

এ সংবাদ বোধ হয় সকলেই জানেন যে, বর্তমান কালের সঙ্গে পদক্ষেপ মিলিয়ে চলবার জন্যে ইংলন্ডের য়ুনিভর্সিটিগুলিতে সম্প্রতি বিশেষভাবে আধুনিক শিক্ষাবিস্তারের চেষ্টা প্রবৃত্ত। গত য়ুরোপীয় যুদ্ধের পরে অক্‌স্‌ফোর্ডে দর্শন রাষ্ট্রতত্ত্ব অর্থনীতির আধুনিক ধারার চর্চা স্বীকার করা হয়েছে। চারি দিকে কী ঘটছে, সমাজ কোন্‌ দিকে চলেছে, সেইটে যারা ভালো করে জানতে চায় তাদের সাহায্য করবার জন্যে য়ুনিভর্সিটির এই উদ্যোগ। ম্যাঞ্চেস্টর য়ুনিভর্সিটি আধুনিক অর্থতত্ত্ব এবং আধুনিক ইতিহাসের প্রতি বিশেষভাবে মনোযোগ করছে। বর্তমান কালের চিন্তাদ্বন্দ্ব ও কর্মসংঘাতের দিনে এইরূপ শিক্ষার ফলে ছাত্র ও ছাত্রীরা উপযুক্তভাবে আপন কর্তব্য ও জীবনযাত্রার জন্য প্রস্তুত হতে পারে।

আমাদের দেশে বিদেশ-থেকে-পাওয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে দেশের মনের এরকম সম্মিলন ঘটতে পারে নি। তা ছাড়া য়ুরোপীয় বিদ্যাও এখানে বদ্ধজলের মতো, তার চলৎ রূপ আমরা দেখতে পাই নে। যে-সকল প্রবীণ মত আসন্ন পরিবর্তনের মুখে, আমাদের সম্মুখে তারা স্থির থাকে ধ্রুবসিদ্ধান্তরূপে। সনাতনত্বমুগ্ধ আমাদের মন তাদের ফুলচন্দন দিয়ে পূজা করে থাকে। য়ুরোপীয় বিদ্যাকে আমরা স্থাবরভাবে পাই এবং তার থেকে বাক্য চয়ন করে আবৃত্তি করাকেই আধুনিক রীতির বৈদগ্ধ্য ব'লে জানি, এই কারণে তার সম্বন্ধে নূতন চিন্তার সাহস আমাদের থাকে না। দেশের জনসাধারণের সমস্ত দুরূহ প্রশ্ন, গুরুতর প্রয়োজন, কঠোর বেদনা আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিচ্ছিন্ন। এখানে দূরের বিদ্যাকে আমরা আয়ত্ত করি জড় পদার্থের মতো বিশ্লেষণের দ্বারা, সমগ্র উপলব্ধির দ্বারা নয়। আমরা ছিঁড়ে ছিঁড়ে বাক্য মুখস্থ করি এবং সেই টুকরো-করা মুখস্থবিদ্যার পরীক্ষা দিয়ে নিষ্কৃতি পাই। টেক্‌স্‌ট্‌বুক-সংলগ্ন আমাদের মন পরাশ্রিত প্রাণীর মতো নিজের খাদ্য নিজে সংগ্রহ করবার, নিজে উদ্ভাবন করবার শক্তি হারিয়েছে।

ইংরেজি ভাষা আমাদের প্রয়োজনের ভাষা, এইজন্যে সমস্ত শিক্ষার কেন্দ্রস্থলে এই বিদেশী ভাষার প্রতি আমাদের লোভ ; সে প্রেমিকের প্রীতি নয়, কৃপণের আসক্তি। ইংরেজি সাহিত্য পড়ি, প্রধান লক্ষ্য থাকে ইংরেজি ভাষা আয়ত্ত করা। অর্থাৎ ফুলের কীটের মতো আমাদের মন, মধুকরের মতো নয়। মুষ্টিভিক্ষায় যে দান সংগ্রহ করি ফর্দ ধরে তার পরীক্ষা দিয়ে থাকি। সে পরীক্ষায় পরিমাণের হিসাব দেওয়া ; সেই পরিমাণগত পরীক্ষার তাগিদে শিক্ষা করতে হয় ওজনদরে। বিদ্যাকে চিত্তের সম্পদ ব'লে গ্রহণ করা অনাবশ্যক হয় যদি তাকে বাহ্যবস্তুরূপে বহন করি। এরকম বিদ্যার দানেও গৌরব নেই, গ্রহণেও না। এমন দৈন্যের অবস্থাতেও কখনো কখনো এমন শিক্ষক মেলে শিক্ষাদান যাঁর স্বভাবসিদ্ধ। তিনি নিজগুণেই জ্ঞান দান করেন, নিজের অন্তর থেকে শিক্ষাকে অন্তরের সামগ্রী করেন, তাঁর অনুপ্রেরণায় ছাত্রদের মনে মননশক্তির সঞ্চার হয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরে বিশ্বক্ষেত্রে আপন বিদ্যাকে ফলবান ক'রে কৃতী ছাত্রেরা তার সত্যতার প্রমাণ দেয়।

যে বিশ্ববিদ্যালয় সত্য সে এইরকম শিক্ষককে আকর্ষণ করে ; শিক্ষার সাহায্যে সেখানে মনোলোকে সৃষ্টিকার্য চলে, এই সৃষ্টিই সকল সভ্যতার মূলে। কিন্তু আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে এমনতরো যথার্থ শিক্ষক না হলেও চলে। হয়তো-বা ভালোই চলে। কেননা এখানকার পরীক্ষাপদ্ধতিতে যে ফলের প্রতি দৃষ্টি সে আহরণ-করা ফল, ফলন-করা ফল নয়। দৈন্যের নিষ্ঠুর তাগিদে এমনতরো শিক্ষার প্রতি দেশের লোভ আছে, কিন্তু ভক্তি নেই। তাই শিক্ষক ও ছাত্রদের উদ্যমকে পরিপূর্ণমাত্রায় সতর্ক করে রাখবার প্রয়োজন হয় না। কেননা, দেশের প্রত্যাশা উচ্চ নয় : বাজার-দরের হিসাব ক'রে যে পরীক্ষার মার্কা সে চায় সত্যের নিকষে তার মূল্য অতি সামান্য। এইজন্য দুর্মূল্য বিদ্যাকে সম্পূর্ণ সত্য ক'রে তোলবার মতো শ্রদ্ধা রক্ষা করা এত কঠিন ; তাই শৈথিল্য তার মজ্জায় প্রবেশ করেছে।

অভাব থেকে বিশ্ববিদ্যালয়-প্রতিষ্ঠার দৃষ্টান্ত অন্যত্র আছে। যেমন জাপানে। জাপান যখন স্পষ্ট বুঝলে যে, আধুনিক য়ুরোপ আজ যে বিদ্যার প্রভাবে বিশ্ববিজয়ী তাকে আয়ত্ত করতে না পারলে সকল দিকেই পরাভব সুনিশ্চিত তখন জাপান প্রাণপণ আকাঙ্ক্ষার বেগে আপন সদ্যপ্রতিষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয়ে সেই য়ুরোপীয় বিদ্যার পীঠস্থান রচনা করলে। বিদ্যাসাধনায় আধুনিক মানব-সমাজে তার লেশমাত্র অগৌরব না ঘটে এই তার একান্ত স্পর্ধা। সুতরাং সমস্ত জাতির শিক্ষাদানকার্যে সিদ্ধির আদর্শকে খাটো ক'রে নিজেকে বঞ্চনা করার কথা তার মনেও আসতে পারে না। আমাদের

দেশে বিদ্যায় সফলতার কৃত্রিম আদর্শ অনেকটা পরিমাণে পরের হাতে। বিদেশী মনিবেরা ন্যূন পরিমাণে কতটুকু হলে তাঁদের আশু প্রয়োজনের হিসাবে সন্তুষ্ট হন তার একটা ওজন বুঝে নিয়েছিলুম। প্রথম থেকেই প্রধানত এইজন্যই বিদ্যার আন্তরিক আদর্শের প্রতি নিষ্ঠা আমাদের হ্রাস হয়ে এসেছে।

জাপানে বিদ্যাকে সত্য ক'রে তোলবার ইচ্ছার প্রমাণ পাওয়া গেল যখন স্বদেশী ভাষাকে সে আপন শিক্ষার ভাষা করতে বিলম্ব করলে না। সর্বজনের ভাষার ভিতর দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়কে সর্বজনের ক'রে তুললে; শিক্ষিত ও অশিক্ষিতের মধ্যে চিত্তপ্রসারের পথ অবাধ প্রশস্ত হয়ে উঠল। তাই আজ সেখানে সমস্ত দেশে বুদ্ধির জ্যোতি অবারিতভাবে দীপ্যমান।

আমাদের দেশে মাতৃভাষায় একদা যখন শিক্ষার আসন প্রতিষ্ঠার প্রথম প্রস্তাব ওঠে তখন অধিকাংশ ইংরেজি-জানা বিদ্বান আতঙ্কিত হয়ে উঠেছিলেন। সমস্ত দেশের সামান্য যে-কয়জন লোক ইংরেজি ভাষাটাকে কোনোমতে ব্যবহার করবার সুযোগ পাচ্ছে তাদের ভাগে উক্ত ভাষার অধিকারে পাছে লেশমাত্র কমতি ঘটে এই ছিল তাঁদের ভয়। হায় রে, দরিদ্রের আকাঙ্ক্ষাও দরিদ্র!

এ কথা মানতে হবে, জাপান স্বাধীন দেশ; সেখানকার লোক বিদ্যার যে মূল্য স্থির করেছে সে মূল্য পুরো পরিমাণে মিটিয়ে দিতে কৃপণতা করে নি। আর, হতভাগা আমরা পুলিস ও ফৌজ-বিভাগের ভূরিভোজনের ভুক্তশেষ রাজস্বের উচ্ছিষ্টকণা খুঁটে তারই দামে বিদ্যার ঠাট কোনোমতে বজায় রাখছি ফাঁকা মাল-মসলায়। আমাদের কাঁথার ছিদ্র ঢাকতে হয় ছেঁড়া কাপড়ের তালি দিয়ে। তাতে গৌরব নেই; কেবল কিছু পরিমাণে লজ্জা-নিবারণ ঘটে, লোকদেখানো মান রক্ষা হয়, জীর্ণতা সত্ত্বেও আবরণটা থাকে।

এটা সত্য কথা। কিন্তু আক্ষেপ ক'রে যখন কোনোই ফল নেই তখন এর দোহাই দিয়ে নিজের চেষ্টাকে খর্ব করলে চলবে না; তুফান উঠেছে বলেই হাল আরো শক্ত করেই ধরতে হবে। যে বিদ্যাকে এতদিন আমরা বিদেশের নিলামে সস্তায়-কেনা ভাঙা বেঞ্চিতে বসিয়ে রেখেছি তাকে স্বদেশের চিত্তবেদীতে সমাদরে বসাতেই হবে। বিশ্ববিদ্যালয়কে যখন যথার্থভাবে স্বদেশের সম্পদ করে তুলতে পারব তখন সমস্ত দেশের অন্তরের এই দাবি তার কাছে সার্থক হবে: শ্রদ্ধয়া দেয়ম্। দান করা চাই শ্রদ্ধার সঙ্গে। সেই শ্রদ্ধার অন্ন প্রাণের সঙ্গে মেলে, প্রাণশক্তিকে জাগিয়ে তোলে।

অনেক দিন থেকে ইংরেজি বিদ্যার খাঁচা স্থাবরভাবে আমাদের দেশে রাজবাড়ির দেউড়িতে রক্ষিত ছিল। এর দরজা খুলে দিয়ে দেশের চিত্তশক্তির জন্য যে নীড় নির্মাণ করতে হবে সবপ্রথমে আশুতোষ সে কথা বুঝেছিলেন। প্রবল বলে এই জড়ত্বকে বিচলিত করবার সাহস তাঁর ছিল। সনাতনপন্থীদের দেশে বিশ্ববিদ্যালয়ের চিরাচরিত প্রথার মধ্যে বাংলাকে স্থান দেবার প্রস্তাব প্রথমে তাঁর মনে উঠেছিল ভীরু এবং লোভীদের নানা তর্কের বিরুদ্ধে। বাংলাভাষা আজও সম্পূর্ণরূপে শিক্ষার ভাষা হবার মতো পাকা হয়ে ওঠেনি সে কথা সত্য। কিন্তু আশুতোষ জানতেন যে না হবার কারণ তার নিজের শক্তিদৈন্যের মধ্যে নেই, সে আছে তার অবস্থাদৈন্যের মধ্যে। তাকে শ্রদ্ধা ক'রে, সাহস ক'রে শিক্ষার আসন দিলে তবেই সে আপন আসনের উপযুক্ত হয়ে উঠবে। আর, তা যদি একান্তই অসম্ভব বলে গণ্য করি তবে বিশ্ববিদ্যালয় চিরদিনই বিলেতের-আমদানি টবের গাছ হয়ে থাকবে; সে টব মূল্যবান হতে পারে, অলংকৃত হতে পারে, কিন্তু গাছকে সে চিরদিন পৃথক করে রাখবে ভারতবর্ষের মাটি থেকে; বিশ্ববিদ্যালয় দেশের শখের জিনিস হবে, প্রাণের জিনিস হবে না।

তা ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অগৌরব ঘোচাবার জন্যে পরীক্ষার শেষ দেউড়ি পার ক'রে দিয়ে

আশুতোষ এখানে গবেষণাবিভাগ স্থাপন করেছিলেন— বিদ্যার ফসল শুধু জমানো নয়, বিদ্যার ফসল ফলানোর বিভাগ। লোকের অভাব, অর্থের অভাব, স্বজন-পরজনের প্রতিকূলতা, কিছুই তিনি গ্রাহ্য করেন নি। বিশ্ববিদ্যালয়ের আত্মশ্রদ্ধার প্রবর্তন হয়েছে এইখানেই। তার প্রধান কারণ, বিশ্ববিদ্যালয়কে আশুতোষ আপন করে দেখতে পেরেছিলেন, সেই অভিমানেই এই বিদ্যালয়কে তিনি সমস্ত দেশের আপন করে তোলবার ভরসা করতে পারলেন।

দেশের দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের যে মোটা বেড়াটা উঁচু করে তোলা ছিল তার মধ্যে অবকাশ রচনা করতে তিনি প্রবৃত্ত ছিলেন। সেই প্রবেশপথ দিয়েই আমার মতো লোকের আজ এইখানে অকুণ্ঠিত মনে উপস্থিত হওয়া সম্ভবপর হয়েছে। আমার মহৎ সৌভাগ্য এই যে, বিশ্ববিদ্যালয়কে স্বদেশী ভাষায় দীক্ষিত করে নেবার পুণ্য অনুষ্ঠানে আমারও কিছু হাত রইল, অন্তত নামটা রয়ে গেল। আমি মনে করি যে, স্বদেশের সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের মিলনসেতুরূপেই আমাকে আহ্বান করা হয়েছে। স্বদেশী ভাষায় চিরজীবন আমি যে সাধনা করে এসেছি সেই সাধনাকে সম্মান দেবার জন্যেই বিশ্ববিদ্যালয় আজ তাঁর সভায় আমাকে আসন দিলেন। দুই কালের সন্ধিস্থলে আমাকে রাখলেন একটি চিহ্নের মতো। দেখলেম যথারীতি আমাকে পদবী দেওয়া হয়েছে, অধ্যাপক। এ পদবীতে যথেষ্ট সম্মান আছে, কিন্তু আমার পক্ষে এটা অসংগত। এর দায়িত্ব আছে, সেও আমার পক্ষে গ্রহণ করা অসম্ভব। সাহিত্যের প্রত্নতত্ত্ব, তার শব্দের উৎপত্তি ও বিশ্লিষ্ট উপাদান, অর্থাৎ সাহিত্যের নাড়ীনক্ষত্র আমার অভিজ্ঞতার বহির্ভূত। আমি অনুশীলন করেছি তার অখণ্ড রূপ, তার গতি, তার ভঙ্গি, তার ইঙ্গিত।

তখন আমার বয়স সতেরো, ইংরেজিভাষার জটিল গহনে আলো-আঁধারে কোনোমতে হাৎড়ে চলতে পারি মাত্র। সেই সময়ে লন্ডন য়ুনিভার্সিটিতে মাস-তিনেকের জন্যে সাহিত্যের ক্লাসে ছাত্র ছিলেম। আমাদের অধ্যাপক ছিলেন শুভ্রকেশ সৌম্যমূর্তি হেন্‌রি মর্লি। সাহিত্য তিনি পড়াতেন তার অন্তরতর রসটুকু দেবার জন্যে। শেক্‌স্‌পিয়রের কোরায়োলেনস, টমাস ব্রাউনের বেরিয়ল আরন্‌ এবং মিল্‌টনের প্যারাডাইস রিগেন্‌ড্‌ আমাদের পাঠ্য ছিল। নোট প্রভৃতির সাহায্যে বইগুলি নিজে পড়ে আসতুম তার অর্থ গ্রহণের জন্যে। অধ্যাপক ক্লাসে বসে মূর্তিমান নোট-বইয়ের কাজ করতেন না। যে কাব্য পড়াতেন তার ছবিটি পাওয়া যেত তাঁর মুখে মুখে, আবৃত্তি করে যেতেন তিনি অতি সরসভাবে, যেটি শব্দার্থের চেয়ে অনেক বেশি, অনেক গভীর সেটি পাওয়া যেত তাঁর কণ্ঠ থেকে। মাঝে মাঝে দুরূহ জায়গায় দ্রুত বুঝিয়ে যেতেন, পঠনধারার ব্যাঘাত করতেন না। রচনাশক্তির উৎকর্ষসাধন সাহিত্যশিক্ষার আর-একটি আনুষঙ্গিক লক্ষ্য। এই দায়িত্বও তাঁর ছিল। ভাষাশিক্ষা সাহিত্যশিক্ষার কাজ মুখ্যত ভাষাতত্ত্ব দিয়ে নয়, সাহিত্যের প্রত্নতত্ত্ব দিয়ে নয়, রসের পরিচয় দিয়ে ও রচনায় ভাষার ব্যবহার দিয়ে। যেমন আর্টশিক্ষার কাজ আর্কিয়লজি আইকনোগ্রাফি দিয়ে নয়, আর্টেরই আন্তরিক রসস্বরূপের ব্যাখ্যা দিয়ে। সপ্তাহে একদিন তিনি সমগ্রভাবে ছাত্রদের প্রদত্ত রচনার ব্যাখ্যা করতেন; তার পদচ্ছেদ, প্যারাগ্রাফবিভাগ, শব্দপ্রয়োগের সূক্ষ্ম ত্রুটি বা শোভনতা, সমস্তই তাঁর আলোচ্য ছিল। সাহিত্য ও ভাষার স্বরূপবোধ, তার আঙ্গিকের অর্থাৎ টেক্‌নিকের পরিচয় ও চর্চাই সাহিত্যশিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য, এই কথাটিই তাঁর ক্লাস থেকে জেনেছিলেম।

বয়স যদি পর্যবসিতপ্রায় না হত আর যদি আমার কর্তব্য হত ক্লাসে সাহিত্যশিক্ষকতা করা, তবে এই আদর্শ-অনুসারেই কাজ করবার চেষ্টা করতুম। সম্ভবত আমার পক্ষে তার পরিণাম

শোকাবহ হত। কর্তৃপক্ষ এবং ছাত্রেরা কেউ দীর্ঘকাল আমাকে সহ্য করতেন না। সেই সম্ভবপর সংকট কাটিয়ে এসেছি।

আজ আমার শেষ বয়সে আমার কাছ থেকে কোনো রীতিমতো কর্মপদ্ধতির প্রত্যাশা করা ধর্মবিরুদ্ধ, তাতে প্রত্যবায় আছে। আমার ক্লান্ত জীবনের সায়াহ্নকালে আমাকে বাংলা-অধ্যাপকের সুলভ সংস্করণরূপে চালাতে গেলে তাতে কাজেরও ক্ষতি হবে। আমার পক্ষেও সেটা স্বাস্থ্যকর হবে না। আমি এই জানি যে, আজ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে বঙ্গবাণী-বীণাপাণির মন্দিরদ্বারে বরণ ক'রে নেবার ভার আমার 'পরে। সেই কথা মনে রেখে আমি তাকে অভিনন্দিত করি। এই কামনা করি যে, যখন ধূমমলিন নিশীথ-প্রদীপের নির্বাপণের ক্ষণ এল তখন বঙ্গদেশের চিত্তাকাশে নবসূর্যোদয়ের প্রত্যূষকে যথার্থ স্বদেশীয় বিশ্ববিদ্যালয় যেন ভৈরবরাগে ঘোষণা করে, এবং বাংলার প্রতিভাকে নব নব সৃষ্টির পথ দিয়ে অক্ষয় কীর্তিলোকে উত্তীর্ণ করে দেয়।

ভাষণ : ডিসেম্বর ১৯৩২

শিক্ষার বিকিরণ

ভোজ্য জিনিসে ভাণ্ডার উঠল ভরে, রান্নাঘরে হাঁড়ি চড়েছে, তবু ভোজ বলে না তাকে। আঙিনায় পাত পড়ল কত, ডাকা হয়েছে কতজনকে, সেই হিসাবেই ভোজের মর্যাদা। আমরা যে এডুকেশন শব্দটা আবৃত্তি ক'রে মনে মনে খুশি থাকি সেটাতে ভাঁড়ার-ঘরের চেহারা আছে, কিন্তু বাইরে তাকিয়ে দেখি ধূ ধূ করছে আঙিনা। শিক্ষার আলোর জন্যে উঁচু লণ্ঠন ঝোলানো হয়েছে ইস্কুলে কলেজে, কিন্তু সেটা যদি রুদ্ধ দেয়ালে বন্দী আলোক হয় তা হলে বলব আমাদের অদৃষ্ট মন্দ। সমস্ত-পট-জোড়া ভূমিকার মধ্যেই ছবির প্রকাশ, তেমনি পরিস্ফুটতা পাবার জন্যে শিক্ষা চায় দেশজোড়া ভূমিকা। ব্যাপক-ভূমিকা-ভ্রষ্ট শিক্ষা কতই অস্পষ্ট, অসম্পূর্ণ, কেবল অভ্যাসবশতই তার দৈন্যের বেদনা আমাদের মন থেকে মরে গিয়েছে। এডুকেশন নিয়ে অন্য দেশের সঙ্গে স্বদেশের যখন তুলনা করি তখন দৃশ্য অংশটাই লক্ষ করি, অদৃশ্য অংশের হিসাব রাখি নে। মিলিয়ে দেখি য়ুনিভর্সিটি সেখানেও আছে, আমাদের দেশেও তার প্রতিরূপ দুটো-একটা দেখা দিচ্ছে। ভুলে যাই এমন কোনো ভাগ্যবান দেশ নেই যেখানে বাঁধা শিক্ষালয়ের বাইরে সমস্ত সমাজ জুড়ে আবাঁধা শিক্ষার একটা দিগন্তবিকীর্ণ বৃহত্তর পরিধি না আছে।

এক কালে আমাদের দেশেও ছিল। য়ুরোপের মধ্যযুগের মতো আমাদের দেশে শাস্ত্রিক শিক্ষাই ছিল প্রধান। এই শিক্ষার বিশেষ চর্চা টোলে, চতুষ্পাঠিতে, কিন্তু সমস্ত দেশেই বিস্তীর্ণ ছিল বিদ্যার ভূমিকা। বিশিষ্ট জ্ঞানের সঙ্গে সাধারণ জ্ঞানের নিত্যই ছিল চলাচল। ওয়েসিসের সঙ্গে মরুভূমি যে বৈপরীত্যের সম্বন্ধ তেমন ছিল না পণ্ডিতমণ্ডলীর সঙ্গে অপণ্ডিত লোকালয়ের। দেশে এমন অনাদৃত অংশ ছিল না যেখানে রামায়ণ মহাভারত পুরাণকথা ধর্মব্যাখ্যা নানা প্রণালী বেয়ে প্রতিনিয়ত ছড়িয়ে না পড়ত। এমন-কি, যে-সকল তত্ত্বজ্ঞান দর্শনশাস্ত্রে কঠোর অধ্যবসায়ে আলোচিত তারও সেচন চলেছিল সর্বক্ষণ জনসাধারণের চিত্তভূমিতে। গাছের খাদ্য যথেষ্ট-পরিমাণ জল দিয়ে তরল হলে তবেই গাছ তাকে শাখায় প্রশাখায় গ্রহণ করতে পারে, তেমনি করেই সেদিন কঠিন বিদ্যাকে রসে বিগলিত করে সর্বজনের মনে সঞ্চারিত করা হয়েছে। যে সময়ে আমাদের দেশে পূর্তকর্ম ধর্মের অঙ্গ ছিল তখন গ্রামে গ্রামে জলাশয়ের আয়োজন স্বতই

ছিল বিস্তৃত, সর্বজনে মিলে আপনিই আপনার তৃষ্ণার জল জুগিয়েছে; রাজপরিষদের কোনো ব্যয়কুণ্ঠ আমলা-সেরেস্তায় জলের জন্য মাথা খুঁড়তে হয় নি। তেমনি করেই সমাজ দেশের বিদ্যা আপনিই দেশময় বিতরণ করেছে। না যদি করত তবে সমস্ত দেশ আজ বর্বরতায় কালো কর্কশ হয়ে উঠত। বিদ্যা তখন বিদ্বানের সম্পত্তি ছিল না, সে ছিল সমস্ত সমাজের সম্পদ।

যেখানে খবরের কাগজেরও পত্রমর্মর শোনা যায় না এমন একটি সামান্য গ্রামে চাষিরা একদিন আমাকে নিমন্ত্রণ করেছিল। সেখানে প্রায় সকলেই মুসলমান। আমার অভ্যর্থনা উপলক্ষে চলছিল একটা গানের পালা। চাঁদোয়ার তলায় কেরোসিন-লণ্ঠন জ্বলছে, মাটির উপর ছেলে বুড়ো সকলেই বসে আছে স্তব্ধ হয়ে। যাত্রাগানের প্রধান বিষয়টা গুরু-শিষ্যের মধ্যে তত্ত্বালোচনা— দেহতত্ত্ব, সৃষ্টিতত্ত্ব, মুক্তিতত্ত্ব। থেকে থেকে তারই সঙ্গে নাচ গান কৌতুকের দ্রুতমুখরিত ঝংকার। এই পালার একটি বিশেষ অংশ আজও আমার মনে আছে। কথাটা এই, যাত্রী প্রবেশ করতে চলেছে বৃন্দাবনে, পাহারাওয়ালা আটক করলে তার পথ; বললে, 'তুমি চোর, ভিতরে তোমাকে যেতে দেওয়া হবে না।' যাত্রী বললে, 'সে কী কথা কোথায় দেখলে আমার চোরাই মাল।' দ্বারী বললে, 'ঐ-যে তোমার কাপড়ের নীচে লুকোনো, ঐ-যে তোমার আপনি, ওটা যোলো-আনা আমার রাজার পাওনা, ফাঁকি দিয়ে রেখেছ নিজেরই জিম্মায়।' এই বলতে বলতে মহা ঢাক ঢোল বেজে উঠল, চলল পরচুলো ঝাঁকানি দিয়ে ঘন ঘন নাচ। যেন ঐখানটা পাঠের প্রধান অংশ, অধ্যাপকমশায় পেন্‌সিলের মোটা দাগ ডবল ক'রে টেনে দিলেন। রাত এগোতে লাগল, দুপুর পেরিয়ে একটা বাজে, শ্রোতারা স্থির হয়ে বসে শুনছে। সব কথা স্পষ্ট বুঝুক বা না বুঝুক, এমন একটা-কিছুর স্বাদ পাচ্ছে যেটা প্রতিদিনের নীরস তুচ্ছতা ভেদ করে পথ খুলে দিলে চিরন্তনের দিকে।

এমনি কতকাল চলেছে দেশে; বার বার বিচিত্র রসের যোগে লোকে শুনেছে ধ্রুব-প্রহ্লাদের কথা, সীতার বনবাস, কর্ণের কবচদান, হরিশ্চন্দ্রের সর্বস্বত্যাগ। তখন দুঃখ ছিল অনেক, অবিচার ছিল, জীবনযাত্রার অনিশ্চয়তা ছিল পদে পদে, কিন্তু সেইসঙ্গে এমন একটি শিক্ষার প্রবাহ ছিল যাতে করে ভাগ্যের বিমুখতার মধ্যে মানুষকে তার আন্তরিক সম্পদের অবারিত পথ দেখিয়েছে, মানুষের যে শ্রেষ্ঠতাকে অবস্থার হীনতায় হেয় করতে পারে না তার পরিচয়কে উজ্জ্বল করেছে। আর যাই হোক, আমেরিকান টকির দ্বারা এ কাজটা হয় না।

অন্য সকল দেশে আবশ্যিক শিক্ষার প্রবর্তন হয়েছে অল্পদিন হল। আমাদের দেশে যে জনশিক্ষা তাকে আবশ্যিক বলব না, তাকে বলব স্বৈচ্ছিক। সে অনেক কালের। তার পশ্চাতে কোনো আইন ছিল না, তাগিদ ছিল না; তার স্বতঃসঞ্চার ছিল ঘরে ঘরে যেমন রক্তচলাচল হয় সর্বদেহে।

তার পরে সময়ের পরিবর্তন হল। ইতিমধ্যে শিক্ষিতসমাজ যখন রাজদ্বারের দিকে মুখ ফিরিয়ে মন্ত্রিসভায় প্রবেশাধিকারের আবেদন কখনো-বা করুণকণ্ঠে কখনো-বা কৃত্রিম আক্রোশে পেশ করছিলেন তখন তাঁদের পিছনের দিকে গ্রামে গ্রামে পিপাসার জল এল পাঁকের কাছে নেমে, এ দিকে শহরে শহরে দ্বারে দ্বারে ঝরতে লাগল কলের জল। আমরা বিস্মিত হয়ে বললেম, একেই বলে উন্নতি। দেশের যেটা বৃহৎ রূপ সেটা লুকোল আমাদের অগোচরে, যে প্রাণ যে আলো দেশের সর্বত্র বিকীর্ণ ছিল সেটা প্রতিসংহৃত হল ছোটো ছোটো কেন্দ্রে।

এ কালে যাকে আমরা এডুকেশন বলি তার আরম্ভ শহরে। তার পিছনে ব্যাবসা ও চাকরি চলেছে আনুষঙ্গিক হয়ে। এই বিদেশী শিক্ষাবিধি রেলকামরার দীপের মতো। কামরাটা উজ্জ্বল,

কিন্তু যে যোজন যোজন পথ গাড়ি চলেছে ছুটে সেটা অন্ধকারে লুপ্ত। কারখানার গাড়িটাই যেন সত্য, আর প্রাণবেদনায় পূর্ণ সমস্ত দেশটাই যেন অবাস্তব।

শহরবাসী একদল মানুষ এই সুযোগে শিক্ষা পেলে মান পেলে, অর্থ পেলে ; তারাই হল এন্‌লাইটেন্‌ড্‌, আলোকিত। সেই আলোর পিছনে বাকি দেশটাতে লাগল পূর্ণ গ্রহণ। ইস্কুলের বেঞ্চিতে বসে যাঁরা ইংরেজি পড়া মুখস্থ করলেন শিক্ষাদীপ্ত দৃষ্টির অন্ধতায় তাঁরা দেশ বলতে বুঝলেন শিক্ষিতসমাজ, ময়ূর বলতে বুঝলেন তার পেখমটা, হাতি বলতে তার গজদন্ত। সেই দিন থেকে জলকষ্ট বলো, পথকষ্ট বলো, রোগ বলো, অজ্ঞান বলো, জমে উঠল কাংস্যবাদ্যমন্দ্রিত নাট্যমঞ্চের নেপথ্যে নিরানন্দ নিরালোক গ্রামে গ্রামে। নগরী হল সুজলা, সুফলা, টানাপাখা-শীতলা ; সেইখানেই মাথা তুললে আরোগ্যনিকেতন, শিক্ষার প্রাসাদ। দেশের বুকে এক প্রান্ত থেকে আর-এক প্রান্তে এত বড়ো বিচ্ছেদের ছুরি আর-কোনোদিন চালানো হয় নি, সে কথা মনে রাখতে হবে। একে আধুনিকের লক্ষণ বলে নিন্দা করলে চলবে না। কেননা কোনো সভ্য দেশেরই অবস্থা এরকম নয়। আধুনিকতা সেখানে সপ্তমীর চাঁদের মতো অর্ধেক আলোয় অর্ধেক অন্ধকারে খণ্ডিত হয়ে নেই। জাপানে পাশ্চাত্য বিদ্যার সংস্রব ভারতবর্ষের চেয়ে অল্প কালের, কিন্তু সেখানে সেটা তালি-দেওয়া ছেঁড়া কাঁথা নয়, সেখানে পরিব্যাপ্ত বিদ্যার প্রভাবে সমস্ত দেশের মনে চিন্তা করবার শক্তি অবিচ্ছিন্ন সঞ্চারিত। এই চিন্তা এক ছাঁচে ঢালা নয়। আধুনিক কালেরই লক্ষণ অনুসারে এই চিন্তায় বৈচিত্র্য আছে অথচ ঐক্যও আছে, সেই ঐক্য যুক্তির ঐক্য।

কেউ কেউ তথ্য গণনা করে দেখিয়েছেন, পূর্বকালে এ দেশে গ্রাম্য পাঠশালায় প্রাথমিক শিক্ষার যে উদ্যোগ ছিল ব্রিটিশ শাসনে ক্রমেই তা কমেছে। কিন্তু, তার চেয়ে সর্বনেশে ক্ষতি হয়েছে, জনশিক্ষাবিধির সহজ পথগুলি লোপ পেয়ে আসাতে। শোনা যায়, একদিন বাংলাদেশ জুড়ে নানা শাখায় খাল কাটা হয়েছিল অতি আশ্চর্য নৈপুণ্যে ; হাল আমলের অনাদরে এবং নির্বুদ্ধিতায় সে-সমস্ত বন্ধ হয়ে গেচে বলেই তাদের কূলে কূলে এত চিতা আজ জ্বলেছে। তেমনি এ দেশে শিক্ষার খালগুলোও গেল বন্ধ হয়ে, আর অন্তর-বাহিরের সমস্ত দীনতা বল পেয়ে উঠছে। শিক্ষার একটা বড়ো সমস্যার সমাধান হয়েছিল আমাদের দেশে। শাসনের শিক্ষা আনন্দের শিক্ষা হয়ে দেশের হৃদয়ে প্রবেশ করেছিল, মিলেছিল সমস্ত সমাজের প্রাণক্রিয়ার সঙ্গে। দেশব্যাপী সেই প্রাণের খাদ্যে আজ দুর্ভিক্ষ। পূর্বসঞ্চয় কিছু বাকি আছে, তাই এখনো দেখতে পাচ্ছি নে এর মারমূর্তি।

মধ্য-এশিয়ার মরুভূমিতে সে-সব পর্যটক প্রাচীন যুগের চিহ্ন সন্ধান করেছেন তাঁরা দেখেছেন, সেখানে কত সমৃদ্ধ জনপদ আজ বালি চাপা পড়ে হারিয়ে গেছে। এক কালে সে-সব জায়গায় জলের সঞ্চয় ছিল, নদীর রেখাও পাওয়া যায়। কখন রস এল শুকিয়ে, এক-পা এক-পা করে এগিয়ে এল মরু, শুষ্ক রসনা মেলে লেহন করে নিল প্রাণ, লোকালয়ের শেষ স্বাক্ষর মিলিয়ে গেল অসীম পাণ্ডুরতার মধ্যে। বিপুলসংখ্যক গ্রাম নিয়ে আমাদের যে দেশ সেই দেশের মনোভূমিতেও রসের জোগান আজ অবসিত। যে রস অনেক কাল থেকে নিম্ন স্তরে ব্যাপ্ত হয়ে আছে তাও দিনে দিনে শুষ্ক বাতাসের উষ্ণ নিশ্বাসে উবে যাবে, অবশেষে প্রাণনাশা মরু অগ্রসর হয়ে তৃষ্ণার অজগর সাপের মতো পাকে পাকে গ্রাস করতে থাকবে আমাদের এই গ্রামে-গাঁথা দেশকে। এই মরুর আক্রমণটা আমাদের চোখে পড়ছে না, কেননা, বিশেষ শিক্ষার গতিকেই দেশ-দেখা চোখ আমরা হারিয়েছি ; গবাক্ষলণ্ঠনের আলোর মতো আমাদের সমস্ত দৃষ্টির লক্ষ্য কেন্দ্রীভূত শিক্ষিতসমাজের দিকে।

আমি একদিন দীর্ঘকাল ছিলুম বাংলাদেশের গ্রামের নিকটসংস্রবে। গরমের সময়ে একটা দুঃখের দৃশ্য পড়ত চোখে। নদীর জল গিয়েছে নেমে, তীরের মাটি গিয়েছে ফেটে, বেরিয়ে পড়েছে পাড়ার পুকুরের পঙ্কস্তর ধূ ধূ করছে তপ্ত বালু। মেয়েরা বহুদূর পথ থেকে ঘড়ায় করে নদীর জল বয়ে আনছে, সেই জল বাংলাদেশের অশ্রুজলমিশ্রিত। গ্রামে আগুন লাগলে নিবোবার উপায় পাওয়া যায় না; ওলাউঠো দেখা দিলে নিবারণ করা দুঃসাধ্য হয়ে ওঠে।

এই গেল এক, আর-এক দুঃখের বেদনা আমার মনে বেজেছিল। সন্ধে হয়ে এসেছে, সমস্ত দিনের কাজ শেষ করে চাষিরা ফিরেছে ঘরে। এক দিকে বিস্তৃত মাঠের উপর নিস্তব্ধ অন্ধকার, আর-এক দিকে বাঁশঝাড়ের মধ্যে এক-একটি গ্রাম যেন রাত্রির বন্যার মধ্যে জেগে আছে ঘনতর অন্ধকারের দ্বীপের মতো। সেই দিক থেকে শোনা যায় খোলের শব্দ, আর তারই সঙ্গে একটানা সুরে কীর্তনের কোনো-একটা পদের হাজারবার তারস্বরে আবৃত্তি। শুনে মনে হত, এখানেও চিত্তজলাশয়ের জল তলায় এসে পড়েছে। তাপ বাড়ছে, কিন্তু ঠাণ্ডা করবার উপায় কতটুকুই বা! বছরের পর বছর যে অবস্থাদৈন্যের মধ্যে দিন কাটে তাতে কী করে প্রাণ বাঁচবে যদি মাঝে মাঝে এটা অনুভব না করা যায় যে, হাড়ভাঙা মজুরির উপরেও মন বলে মানুষের একটা-কিছু আছে যেখানে তার অপমানের উপশম, দুর্ভাগ্যের দাসত্ব এড়িয়ে যেখানে হাঁফ ছাড়বার জায়গা পাওয়া যায়! তাকে সেই তৃপ্তি দেবার জন্যে একদিন সমস্ত সমাজ প্রভূত আয়োজন করেছিল। তার কারণ, সমাজ এই বিপুল জনসাধারণকে স্বীকার করে নিয়েছিল আপন লোক ব'লে। জানত এরা নেমে গেলে সমস্ত দেশ যায় নেমে। আজ মনের উপবাস ঘোচাবার জন্যে কেউ তাদের কিছুমাত্র সাহায্য করে না। তাদের আত্মীয় নেই, তারা নিজে নিজেই আগেকার দিনের তলানি নিয়ে কোনোমতে একটু সান্ত্বনা পাবার চেষ্টা করে। আর-কিছুদিন পরে এটুকুও যাবে শেষ হয়ে; সমস্ত দিনের দুঃখধন্দার রিক্ত প্রান্তে নিরানন্দ ঘরে আলো জ্বলবে না, সেখানে গান উঠবে না আকাশে। ঝিল্লি ডাকবে বাঁশবনে, ঝোপঝাড়ের মধ্য থেকে শেয়ালের ডাক উঠবে প্রহরে প্রহরে; আর সেই সময়ে শহরে শিক্ষাভিমানীর দল বৈদ্যুত আলোয় সিনেমা দেখতে ভিড় করবে।

এক দিকে আমাদের দেশে সনাতন শিক্ষার ব্যাপ্তি রুদ্ধ হয়ে জনসাধারণের মধ্যে জ্ঞানের অনাবৃষ্টি চিরকালীন হয়ে দাঁড়ালো, অন্য দিকে আধুনিক কালের নতুন বিদ্যার যে আবির্ভাব হল তার প্রবাহ বইল না সর্বজনীন দেশের অভিমুখে। পাথরে-গাঁথা কুণ্ডের মতো স্থানে স্থানে সে আবদ্ধ হয়ে রইল; তীর্থের পাণ্ডাকে দর্শনী দিয়ে দূর থেকে এসে গণ্ডূষ ভর্তি করতে হয়, নানা নিয়মে তার আটঘাট বাঁধা। মন্দাকিনী থাকেন শিবের ঘোরালো জটাজুটের মধ্যে বিশেষভাবে; তবুও দেবললাট থেকে তিনি তাঁর ধারা নামিয়ে দেন, ব'হে যান সাধারণভাবে ঘাটে ঘাটে মর্তজনের দ্বারের সম্মুখ দিয়ে, ঘটে ঘটে ভরে দেন আপন প্রসাদ। কিন্তু আমাদের দেশে প্রবাসিনী আধুনিকী বিদ্যা তেমন নয়। তার আছে বিশিষ্ট রূপ, সাধারণ রূপ নেই। সেইজন্যে ইংরেজি শিখে যাঁরা বিশিষ্টতা পেয়েছেন তাঁদের মনের মিল হয় না সর্বসাধারণের সঙ্গে। দেশে সকলের চেয়ে বড়ো জাতিভেদ এইখানেই শ্রেণীতে শ্রেণীতে অস্পৃশ্যতা।

ইংরেজি ভাষায় অবগুণ্ঠিত বিদ্যা স্বভাবতই আমাদের মনের সহবর্তিনী হয়ে চলতে পারে না। সেইজন্যেই আমরা অনেকেই যে পরিমাণে শিক্ষা পাই সে পরিমাণে বিদ্যা পাই নে। চার দিকের আবহাওয়ার থেকে এ বিদ্যা বিচ্ছিন্ন; আমাদের ঘর আর ইস্কুলের মধ্যে ট্রাম চলে, মন চলে না। ইস্কুলের বাইরে পড়ে আছে আমাদের দেশ; সেই দেশে ইস্কুলের প্রতিবাদ রয়েছে বিস্তর, সহযোগিতা নেই বললেই হয়। সেই বিচ্ছেদে আমাদের ভাষা ও চিন্তা অধিকাংশ স্থলেই ইস্কুলের

ছেলের মতোই। ঘুচল না আমাদের নোট্‌বইয়ের শাসন, আমাদের বিচারবুদ্ধিতে নেই সাহস; আছে নজির মিলিয়ে অতি সাবধানে পা ফেলে চলা। শিক্ষার সঙ্গে দেশের মনের সহজ মিলন ঘটাবার আয়োজন আজ পর্যন্ত হল না। যেন কনে রইল বাপের বাড়ির অন্তঃপুরে; শ্বশুরবাড়ি নদীর ও পারে বালির চর পেরিয়ে। খেয়া-নৌকাটা গেল কোথায়?

পারাপারের একখানা ডোঙা দেখিয়ে দেওয়া হয়, তাকে বলে সাহিত্য। এ কথা মানতেই হবে, আধুনিক বঙ্গসাহিত্য বর্তমান যুগের অন্নে বস্ত্রে মানুষ। এই সাহিত্য আমাদের মনে লাগিয়েছে এ কালের ছোঁয়া, কিন্তু খাদ্য তো ও পার থেকে পুরোপুরি বহন করে আনছে না। যে বিদ্যা বর্তমান যুগের চিত্তশক্তিকে বিচিত্র আকারে প্রকাশ করছে, উদঘাটন করছে বিশ্বরহস্যের নব নব প্রবেশদ্বার, বাংলাসাহিত্যের পাড়ায় তার যাওয়া-আসা নেই বললেই হয়। চিন্তা করে যে মন, যে মন বিচার করে, বুদ্ধির সঙ্গে ব্যবহারের যোগসাধন করে যে, সে পড়ে আছে পূর্ব-যুগান্তরে; আর যে মন রসসম্ভোগ করে সে যাতায়াত শুরু করেছে আধুনিক ভোজের নিমন্ত্রণশালার আঙিনায়। স্বভাবতই তার ঝোঁক পড়েছে সেই দিকটাতে যে দিকে চলেছে মদের পরিবেশন, যেখানে ঝাঁঝালো গন্ধে বাতাস হয়েছে মাতাল।

গল্প কবিতা নাটক নিয়ে বাংলাসাহিত্যের পনেরো-আনা আয়োজন। অর্থাৎ ভোজের আয়োজন, শক্তির আয়োজন নয়। পাশ্চাত্য দেশের চিত্তোৎকর্ষ বিচিত্র চিত্তশক্তির প্রবল সমবায় নিয়ে। মনুষ্যত্ব সেখানে দেহ মন প্রাণের সকল দিকেই ব্যাপৃত। তাই সেখানে যদি ত্রুটি থাকে তো পূর্তিও আছে। বটগাছের কোনো ডাল বা ঝড়ে ভাঙল, কোনোখানে বা পোকায় ছিদ্র করেছে, কোনো বৎসর বা বৃষ্টির কার্পণ্য, কিন্তু সবসুদ্ধ জড়িয়ে বনস্পতি জমিয়ে রেখেছে আপন স্বাস্থ্য, আপন বলিষ্ঠতা। তেমনি পাশ্চাত্য দেশের মনকে ক্রিয়াবান্‌ করে রেখেছে তার বিদ্যা, তার শিক্ষা, তার সাহিত্য, সমস্ত মিলে; তার কর্মশক্তির অক্লান্ত উৎকর্ষ ঘটিয়েছে এই-সমস্তের উৎকর্ষ।

আমাদের সাহিত্যে রসেরই প্রাধান্য। সেইজন্যে যখন কোনো অসংযম কোনো চিত্তবিকার অনুকরণের নালা বেয়ে এই সাহিত্যে প্রবেশ করে তখন সেটাই একান্ত হয়ে ওঠে, কল্পনাকে রুগ্‌ণ বিলাসিতার দিকে গাঁজিয়ে তোলে। প্রবল প্রাণশক্তি জাগ্রত না থাকলে দেহের ক্ষুদ্র বিকার কথায় কথায় বিষফোড়া হয়ে রাঙিয়ে ওঠে। আমাদের দেশে সেই আশঙ্কা। এ নিয়ে দোষ দিলে আমরা নজির দেখাই পাশ্চাত্য সমাজের; বলি, এটাই তো সভ্যতার আধুনিকতম পরিণতি। কিন্তু সেইসঙ্গে সকল দিকে আধুনিক সভ্যতার যে সচিন্ত সচল প্রবল বৃহৎ সমগ্রতা আছে সেটার কথা চাপা রাখি।

একদা পাড়াগাঁয়ে যখন বাস করতুম তখন সাধু সাধকের বেশধারী কেউ কেউ আমার কাছে আসত; তারা সাধনার নামে উচ্ছৃঙ্খল ইন্দ্রিয়চর্চার সংবাদ আমাকে জানিয়েছে। তাতে ধর্মের প্রশ্রয় ছিল, তাদেরই কাছে শুনেছি, এই প্রশ্রয় সুরঙ্গপথে শহর পর্যন্ত গোপনে শিষ্যে প্রশিষ্যে শাখায়িত। এই পৌরুষনাশী ধর্মনামধারী লালসার লোলতা ব্যাপ্ত হবার প্রধান কারণ এই যে, আমাদের সাহিত্যে সমাজে সেই-সমস্ত উপাদানের অভাব যাতে বড়ো বড়ো চিন্তাকে, বুদ্ধির সাধনাকে, আশ্রয় করে কঠিন গবেষণার দিকে মনের ঔৎসুক্য জাগিয়ে রাখতে পারে।

এজন্যে অন্তত বাঙালি সাহিত্যিকদের দোষ দেওয়া যায় না। আমাদের সাহিত্য সারগর্ভ নয় বলে একে নিন্দা করা সহজ, কিন্তু কী করলে একে সারালো করা যায় তার পন্থা নির্ণয় করা তত সহজ নয়। রুচির সম্বন্ধে লোকে বেপরোয়া, কেননা ও দিকে কোনো শাসন নেই। অশিক্ষিত রুচিও রসের সামগ্রী থেকে যা-হোক-কোনো-একটা আস্বাদন পায়। আর, যদি সে মনে করে

তারই বোধ রসবোধের চরম আদর্শ তবে তা নিয়ে তর্ক তুললে ফৌজদারি পর্যন্ত পৌঁছতে পারে। কবিতা গল্প নাটকের বাজারের দিকে যারা সমজদারের রাজপথটা পায় নি অন্তত তারা আনাড়িপাড়ার মাঠ দিয়েও চলতে পারে, কোনো মাশুল দিতে হয় না কোথাও। কিন্তু যে বিদ্যা মননের সেখানে কড়া পাহারার সিংহদ্বার পেরিয়ে যেতে হয়, মাঠ পেরিয়ে নয়। যে-সব দেশের 'পরে লক্ষ্মী প্রসন্ন, এবং সরস্বতীও, তারা সেই বিদ্যার দিকে নতুন নতুন পথ পাকা করছে প্রত্যহ ; পণ্যের আদানপ্রদান চলছে দূরে নিকটে, ঘরে বাইরে। আমাদের দে১৬৷৷১শেও তো বিলম্ব করলে চলবে না।

বাংলার আকাশে দুর্দিন এসেছে চার দিকে থেকে ঘনাঘোর ক'রে। একদা রাজদরবারে বাঙালির প্রতিপত্তি ছিল যথেষ্ট। ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশে বাঙালি কর্মে পেয়েছে খ্যাতি, শিক্ষাপ্রসারণে হয়েছে অগ্রণী। সেদিন সেখানকার লোকের কাছে সে শ্রদ্ধা পেয়েছে, পেয়েছে অকুণ্ঠিত কৃতজ্ঞতা। আজ রাজপুরুষ তার প্রতি অপ্রসন্ন ; অন্যান্য প্রদেশে তার সম্বন্ধে আতিথ্য সংকুচিত, দ্বার অবরুদ্ধ। এ দিকে বাংলার আর্থিক দুর্গতিও চরমে এল।

অবস্থার দৈন্যে অশিক্ষার আত্মগ্লানিতে যেন বাঙালি নীচে তলিয়ে না যায়, যেন তার মন মাথা তুলতে পারে দুর্ভাগ্যের ঊর্ধ্বে, এই দিকে আমাদের সমস্ত চেষ্টা জাগাতে হবে তো। মানুষের মন যখন ছোটো হয়ে যায় তখন ক্ষুদ্রতার নখচঞ্চুর আঘাতে সকল উদ্যোগকেই সে ক্ষুণ্ণ করে। বাংলাদেশে এই ভাঙন-ধরানো ঈর্ষা নিন্দা দলাদলি এবং দুয়ো দেবার উত্তেজনা তো বরাবরই আছে, তার উপরে চিত্তের আলো যতই ম্লান হয়ে আসবে ততই নিজের 'পরে অশ্রদ্ধাবশতই অন্য-সকলকে খর্ব করবার অহৈতুক প্রয়াস আরো উঠবে বিষাক্ত হয়ে। আজ হিন্দু-মুসলমানে যে-একটা লজ্জাজনক আড়াআড়ি দেশকে আত্মঘাতে প্রবৃত্ত করছে তার মূলেও আছে সর্বদেশব্যাপী অবুদ্ধি। অলক্ষ্মী সেই অশিক্ষিত অবুদ্ধির সাহায্যেই আমাদের ভাগ্যের ভিত্তি ভাঙবার কাজে চর লাগিয়েছে ; আত্মীয়কে তুলছে শত্রু ক'রে, বিধাতাকে করছে আমাদের বিপক্ষ। শেষকালে নিজের সর্বনাশ করবার জেদ এতদূর পর্যন্ত আজ এগোল যে, বাঙালি হয়ে বাংলাভাষার মধ্যেও ফাটল ধরাবার চেষ্টা আজ সম্ভবপর হয়েছে ; শিক্ষার ও সাহিত্যের যে উদার ক্ষেত্রে সকল মতভেদ সত্ত্বেও একরাষ্ট্রীয় মানুষের মেলবার জায়গা সেখানেও স্বহস্তে কাঁটাগাছ রোপণ করবার উৎসাহ ব্যথা পেল না, লজ্জা পেল না। দুঃখ পাই তাতে ধিক্কার নেই, কিন্তু দেশজোড়া অশিক্ষাগ্রস্ত হেয়তা আমাদের মাথা হেঁট করে দিল, ব্যর্থ করে দিল আমাদের সকল মহৎ উদ্যম। রাষ্ট্রিক হাটে রাষ্ট্রাধিকার নিয়ে দর-দস্তুর করে হট্টগোল যতই পাকানো যাক, সেখানে গোল টেবিলের চক্রবাত্যায় প্রতিকারের চরম উপায় মিলবে না। তরীর তলায় যেখানে বাঁধন আলগা সেইখানে অবিলম্বে হাত লাগাতে হবে।

সকলের গোড়ায় চাই শিক্ষিত মন। ইস্কুল-কলেজের বাইরে শিক্ষা বিছিয়ে দেবার উপায় সাহিত্য। কিন্তু সেই সাহিত্যকে সর্বাঙ্গীণরূপে শিক্ষার আধার করতে হবে ; দেখতে হবে তাকে গ্রহণ করবার পথ সর্বত্র সুগম হয়েছে। এজন্যে কোন্ বন্ধুকে ডাকব? বন্ধু যে আজ দুর্লভ হল। তাই বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারেই আবেদন উপস্থিত করছি।

মস্তিষ্কের সঙ্গে স্নায়ুজালের অবিচ্ছিন্ন যোগ সমস্ত দেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গে। বিশ্ববিদ্যালয়কে সেই মস্তিষ্কের স্থান নিয়ে স্নায়ুতন্ত্র প্রেরণ করতে হবে দেশের সর্বদেহে। প্রশ্ন এই, কেমন ক'রে করা যেতে পারে। তার উত্তরে আমার প্রস্তাব এই যে, একটা পরীক্ষার বেড়াজাল দেশ জুড়ে পাতা হোক। এমন সহজ ও ব্যাপক ভাবে তার ব্যবস্থা করতে হবে যাতে ইস্কুল-কলেজের বাইরে

থেকেও দেশে পরীক্ষাপাঠ্য বইগুলি স্বেচ্ছায় আয়ত্ত করবার উৎসাহ জন্মে। অন্তঃপুরে মেয়েরা কিংবা পুরুষদের যারা নানা বাধায় বিদ্যালয়ে ভর্তি হতে পারে না তারা অবকাশকালে নিজের চেষ্টায় অশিক্ষার লজ্জা নিবারণ করছে, এইটি দেখবার উদ্দেশ্যে বিশ্ববিদ্যালয় জেলায় জেলায় পরীক্ষার কেন্দ্র স্থাপন করতে পারে। বহু বিষয় একত্র জড়িত ক'রে বিশ্ববিদ্যালয়ে ডিগ্রি দেওয়া হয়, এ ক্ষেত্রে উপাধি দেবার উপলক্ষে সেরকম বহুলতার প্রয়োজন নেই। প্রায়ই ব্যক্তিবিশেষের মনের প্রবণতা থাকে বিষয়বিশেষে। সেই বিষয়েই আপন বিশেষ অধিকারের পরিচয় দিতে পারলে সমাজে সে আপন বিশেষ স্থান পাবার অধিকারী হয়। সেটুকু অধিকার থেকে তাকে বঞ্চিত করবার কোনো কারণ দেখি নে।

বিশ্ববিদ্যালয় আপন পীঠস্থানের বাহিরেও যদি ব্যাপক উপায়ে আপন সত্তা প্রসারণ করে তবেই বাংলাভাষায় যথোচিত পরিমাণে শিক্ষাপাঠ্য গ্রন্থরচনা সম্ভবপর হবে। নইলে কোনো কালেই বাংলাসাহিত্যে বিষয়ের দৈন্য ঘুচতেই পারে না। যে-সব শিক্ষণীয় বিষয় জানা থাকলে আত্মসম্মান রক্ষা হয় তার জন্যে অগত্যা যদি ইংরেজি ভাষারই দ্বারস্থ হতে হয় তবে সেই অকিঞ্চনতায় মাতৃভাষাকে চিরদিন অপমানিত করে রাখা হবে। বাঙালি যারা বাংলাভাষাই জানে শিক্ষিতসমাজে তারা কি চিরদিন অন্ত্যজ শ্রেণীতেই গণ্য হয়ে থাকবে? এমনও এক সময় ছিল যখন ইংরেজি ইস্কুলের পয়লা শ্রেণীর ছাত্রেরা 'বাংলা জানি নে' বলতে অগৌরব বোধ করত না, এবং দেশের লোকেরাও সসম্ভ্রমে তাদের চৌকি এগিয়ে দিয়েছে। সেদিন আজ আর নেই বটে, কিন্তু বাঙালির ছেলেকে মাথা হেঁট করতে হয় 'শুধু কেবল বাংলা ভাষা জানি' বলতে। এ দিকে রাষ্ট্রক্ষেত্রে স্বরাজ পাবার জন্যে প্রাণপণ দুঃখ স্বীকার করি, কিন্তু শিক্ষার ক্ষেত্রে স্বরাজ পাবার উৎসাহ আমাদের জাগে নি বললে কম বলা হয়। এমন মানুষ আজও দেশে আছে যারা তার বিরুদ্ধতা করতে প্রস্তুত, যারা মনে করে শিক্ষাকে বাংলাভাষার আসনে বসালে তার মূল্য যাবে ক'মে। বিলেতে যাতায়াতের প্রথম যুগে ইঙ্গবঙ্গী নেশা যখন উৎকট ছিল তখন সেই মহলে স্ত্রীকে শাড়ি পরালে প্রেস্‌টিজ-হানি হত। শিক্ষা-সরস্বতীকে শাড়ি পরালে আজও অনেক বাঙালি বিদ্যার মানহানি কল্পনা করে। অথচ এটা জানা কথা যে, শাড়ি-পরা বেশে দেবী আমাদের ঘরের মধ্যে চলাফেরা করতে আরাম পাবেন, খুরওয়ালা বুটজুতোয় পায়ে পায়ে বাধা পাবার কথা।

একদিন অপেক্ষাকৃত অল্পবয়সে যখন আমার শক্তি ছিল তখন কখনো কখনো ইংরেজি সাহিত্য মুখে মুখে বাংলা করে শুনিয়েছি। আমার শ্রোতারা ইংরেজি জানতেন সবাই। তবু তাঁরা স্বীকার করেছেন, ইংরেজি সাহিত্যের বাণী বাংলাভাষায় তাঁদের মনে সহজে সাড়া পেয়েছে। বস্তুত আধুনিক শিক্ষা ইংরেজিভাষাবাহিনী বলেই আমাদের মনের প্রবেশ-পথে তার অনেকখানি মারা যায়। ইংরেজি খানার টেবিলে আহারের জটিল পদ্ধতি যার অভ্যস্ত নয় এমন বাঙালির ছেলে বিলেতে পাড়ি দেবার পথে পি. অ্যাণ্ড ও. কোম্পানির ডিনারকামরায় যখন খেতে বসে তখন ভোজ্য ও রসনার মধ্যপথে কাঁটাছুরির দৌত্য তার পক্ষে বাধাগ্রস্ত বলেই ভরপুর ভোজের মাঝখানেও ক্ষুধিত জঠরের দাবি সম্পূর্ণ মিটতে চায় না। আমাদের শিক্ষার ভোজেও সেই দশা ; আছে সবই, অথচ মাঝপথে অনেকখানি অপচয় হয়ে যায়। এ যা বলছি এ কলেজি যজ্ঞের কথা, আমার আজকের আলোচ্য বিষয় এ নিয়ে নয়। আমার বিষয়টা সর্বসাধারণের শিক্ষা নিয়ে। শিক্ষায় জলের কল চালানোর কথা নয়, পাইপ যেখানে পৌঁছয় না সেখানে পানীয়ের ব্যবস্থার কথা। মাতৃভাষায় সেই ব্যবস্থা যদি গোষ্পদের চেয়ে প্রশস্ত না হয় তবে এই বিদ্যাহারা দেশের মরুবাসী মনের উপায় হবে কী?

বাংলা যার ভাষা সেই আমার তৃষিত মাতৃভূমির হয়ে বাংলার বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে চাতকের মতো উৎকণ্ঠিত বেদনায় আবেদন জানাচ্ছি ; তোমার অভ্রভেদী শিখরচূড়া বেষ্টন করে পুঞ্জ পুঞ্জ শ্যামল মেঘের প্রসাদ আজ বর্ষিত হোক ফলে শস্যে, সুন্দর হোক পুষ্পে পল্লবে, মাতৃভাষার অপমান দূর হোক, যুগশিক্ষার উদ্‌বেল ধারা বাঙালিচিত্তের শুষ্ক নদীর রিক্ত পথে বান ডাকিয়ে বয়ে যাক, দুই কূল জাগুক পূর্ণ চেতনায়, ঘাটে ঘাটে উঠুক আনন্দধ্বনি।

ভাষণ : ফেব্রুয়ারি ১৯৩৩

শিক্ষা ও সংস্কৃতি

শিক্ষাবিধি সম্বন্ধে...আলোচনা করব স্থির করেছিলুম, ইতিমধ্যে কোনো-একটি আমেরিকান কাগজে এই বিষয়ে একটি প্রবন্ধ পড়লুম ; পড়ে খুশি হয়েছি। আমার মতটি এই লেখায় ঠিকমতো ব্যক্ত হয়েছে। হবার প্রধান কারণ এই, আমেরিকা দীর্ঘকাল থেকে বৈষয়িক সিদ্ধির নেশায় মেতে ছিল। সেই সিদ্ধির আয়তন ছিল অতি স্থূল, তার লোভ ছিল প্রকাণ্ড মাপের। এর ব্যাপ্তি ক্রমশ বেড়েই চলেছিল। তার ফলে সামাজিক মানুষের যে পূর্ণতা সেটা চাপা পড়ে গিয়ে বৈষয়িক মানুষের কৃতিত্ব সব ছাড়িয়ে উঠেছিল। আজ হঠাৎ সেই অতিকায় বৈষয়িক মানুষটি আপন সিদ্ধিপথের মাঝখানে অনেক দামের জটিল যানবাহনের চাকা ভেঙে, কল বিগ্‌ড়িয়ে, ধুলায় কাত হয়ে পড়েছে। এখন তার ভাবনার কথা এই যে, সব ভাঙাচোরা বাদ দিয়ে মানুষটার বাকি রইল কী। এত কাল ধরে যা-কিছু সে গড়ে তুলছিল, যা-কিছুকে সে সর্বোচ্চ মূল্য দিয়েছিল, তার প্রায় সমস্তই বাইরের। বাইরে যখন ভাঙন ধরে তখন ভিতরটাতে যদি দেখে সমস্ত ফাঁক তা হলে সান্ত্বনা পাবে কী নিয়ে? আসবাবগুলো গেল, কিন্তু মানুষটা কোথায়? সে এই বলে শোক করছে যে, সে আজ ভিক্ষুক ; বলতে পারছে না 'আমার অন্তরে সম্পদ আছে'। আজ তার মূল্য নেই : কেননা সে আপনাকে হাটের মানুষ ক'রে তুলেছিল, সেই হাট গেছে ভেঙে।

একদিন ভারতবর্ষে যখন তার নিজের সংস্কৃতি ছিল পরিপূর্ণ তখন ধনলাঘবকে সে ভয় করত না, লজ্জা করত না : কেননা তার প্রধান লক্ষ্য ছিল অন্তরের দিকে। সেই লক্ষ্য নির্ণয় করা, অভ্যাস করা, তার শ্রেষ্ঠতা স্বীকার করা শিক্ষার সর্বপ্রধান অঙ্গ। অবশ্য, তারই এক সীমানায় বৈষয়িক শিক্ষাকে স্থান দেওয়া চাই, কেননা মানুষের সত্তা ব্যবহারিক-পারমার্থিককে মিলিয়ে। সংস্কৃতির অভাব আছে অথচ দক্ষতা পুরোমাত্রায়, এমন খোঁড়া মানুষ চলেছিল বাইসিক্‌ল্ চড়ে। ভাবে নি কোনো চিন্তার কারণ আছে, এমন সময় বাইসিক্‌ল্ পড়ল ভেঙে। তখন বুঝল, বহুমূল্য যন্ত্রটার চেয়ে বিনা মূল্যের পায়ের দাম বেশি। যে মানুষ উপকরণ নিয়ে বড়াই করে সে জানে না আসলে সে কতই গরিব। বাইসিক্‌লের আদর কমাতে চাই নে, কিন্তু দুটো সজীব পায়ের আদর তার চেয়ে বেশি। যে শিক্ষায় এই সজীব পায়ের জীবনীশক্তিকে বাড়িয়ে তোলে তাকেই ধন্য বলি, যে শিক্ষায় প্রধানত আসবাবের প্রতিই মানুষকে নির্ভরশীল ক'রে তোলে তাকে মূঢ়তার বাহন বলব।

যখন শান্তিনিকেতনে প্রথম বিদ্যালয় স্থাপন করি তখন এই লক্ষ্যটাই আমার মনে প্রবল ছিল। আসবাব জুটে গেলে তাকে ব্যবহার করার জন্যে সাধনার দরকার নেই, কিন্তু আসবাব-নিরপেক্ষ হয়ে কী ক'রে বাহিরে কর্মকুশলতা ও অন্তরে আপন সম্মানবোধ রক্ষা করা যায় এইটেই শিক্ষাসাধ্য। তখন আশ্রমে গরিবের মতোই ছিল জীবনযাত্রা, সেই গরিবিয়ানাকে লজ্জা করাই

লজ্জাকর এ কথাটা তখন মনে ছিল। উপকরণবানের জীবনকে ঈর্ষা করা বা বিশেষভাবে সম্মান করাই যে কুশিক্ষা, এ কথাটা আমি তখনকার শিক্ষকদের স্মরণ করিয়ে রেখেছিলুম।

বলা বাহুল্য, যে দারিদ্র্য শক্তিহীনতা থেকে উদ্‌ভূত সে কুৎসিত। কথা আছে: শক্তস্য ভূষণং ক্ষমা। তেমনি বলা যায়, সামর্থ্যবানেরই ভূষণ অকিঞ্চনতা। অতএব সামর্থ্য শিক্ষা করাই চাই ভোগের অভ্যাস বর্জন ক'রে। সামর্থ্যহীন দারিদ্র্যেই ভারতবর্ষের মাথা হেঁট হয়ে গেছে, অকিঞ্চনতায় নয়। অক্ষমকে দেবতা ক্ষমা করেন না।

'আমি সব পারি, সব পারব' এই আত্মবিশ্বাসের বাণী আমাদের শরীর মন যেন তৎপরতার সঙ্গে বলতে পারে। 'আমি সব জানি' এই কথা বলবার জন্যে আমাদের ইন্দ্রিয় মন উৎসুক হয় তো হোক, কিন্তু তার পরেও চরমের কথা 'আমি সব পারি'। আজ এই বাণী সমস্ত য়ুরোপের। সে বলে, 'আমি সব পারি, সব পারব।' তার আপন ক্ষমতাকে শ্রদ্ধা করার অন্ত নেই। এই শ্রদ্ধার দ্বারা সে নির্ভীক হয়েছে, জলে স্থলে আকাশে সে জয়ী হয়েছে। আমরা দৈবের দিকে তাকিয়ে আছি, সেইজন্যে বহু শতাব্দী ধরে আমরা দৈবকর্তৃক প্রবঞ্চিত।

সুইডেনের বিখ্যাত ভূপর্যটক স্বেন হেডিনের ভ্রমণবৃত্তান্ত অনেক দিন পরে আবার আমি পড়েছিলুম। এশিয়ার দুর্গম মরুপ্রদেশে আবহতত্ত্ব পর্যবেক্ষণের উপায় করবার জন্যে তিনি দুঃসাধ্য অধ্যবসায়ে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। এই অধ্যবসায়ের মূলমন্ত্র হচ্ছে, 'আমি সব জানব, সব পারব।' এই পারবার শক্তি বলতে কী বোঝায় সে তাঁর বই পড়লে বোঝা যায়। আমরা কথায় কথায় ওদের বলে থাকি বস্তুতান্ত্রিক। আত্মার শক্তি যার এত প্রবল, যে জ্ঞান-অর্জনের জন্যে সে প্রাণকে তুচ্ছ করে, যার কিছুতে ভয় নেই, সাংঘাতিক বাধাকে যে স্বীকার করে না, দুঃসহ কৃচ্ছ্রসাধনে যাকে পরাহত করতে পারে না— প্রাণপণ সাধনা এমন-কিছুর জন্যে যা আর্থিক নয়, জীবিকার পক্ষে যা অত্যাবশ্যক নয়, বরঞ্চ বিপরীত— তাকে বলব বস্তুতান্ত্রিক! আর, সে কথা বলবে আমাদের মতো দুর্বল-আত্মা!

'আমরা সব-কিছু পারব' এই কথা সত্য ক'রে বলবার শিক্ষাই আত্মাবমাননা থেকে আমাদের দেশকে পরিত্রাণ করতে পারে, এ কথা ভুললে চলবে না। আমাদের বিদ্যালয়ে সকল কর্মে সকল ইন্দ্রিয়মনের তৎপরতা প্রথম হতেই অনুশীলিত হোক, এইটেই শিক্ষাসাধনার গুরুতর কর্তব্য বলে মনে করতে হবে। জানি এর প্রধান অন্তরায় অভিভাবক; পড়া মুখস্থ করতে করতে জীবনীশক্তি মননশক্তি কর্মশক্তি সমস্ত যতই কৃশ হতে থাকে তাতে বাধা দিতে গেলে তাঁরা উদ্‌বিগ্ন হয়ে ওঠেন। কিন্তু মুখস্থ বিদ্যার চাপে এই-সব চির-পঙ্গু মানুষের অকর্মণ্যতার বোঝা দেশ বহন করবে কী করে? উদ্যোগিনং পুরুষসিংহমুপৈতি লক্ষ্মীঃ। আমাদের শিক্ষালয়ে নবীন প্রাণের মধ্যে অক্লান্ত উদ্যোগিতার হাওয়া বয়েছে যদি দেখতে পাই তা হলেই বুঝব, দেশে লক্ষ্মীর আমন্ত্রণ সফল হতে' চলল। এই আমন্ত্রণ ইকনমিক্‌সে ডিগ্রি নেওয়ায় নয়: চরিত্রকে বলিষ্ঠ কর্মিষ্ঠ করায়, সকল অবস্থার জন্যে নিজেকে নিপুণভাবে প্রস্তুত করায়, নিরলস আত্মশক্তির উপর নির্ভর ক'রে কর্মানুষ্ঠানের দায়িত্ব সাধনা করায়। অর্থাৎ কেবল পাণ্ডিত্যচর্চায় নয়, পৌরুষচর্চায়। সাধারণ ইস্কুলে এই সাধনার সুযোগ নেই, আমাদের আশ্রমে আছে। এখানে নানা বিভাগে নানা কর্ম চলছে, তার মধ্যে শক্তি প্রয়োগ করাতে পারে এমন অবস্থা থাকা চাই।

এই কৃতিত্বশিক্ষা অত্যাবশ্যক হলেও এই-যে যথেষ্ট নয় সে কথা মানতে হবে। আমেরিকান লেখক এই কথাটারই আলোচনা করেছেন। তিনি বলেন, আধুনিক শিক্ষা থেকে একটা জিনিস কেমন করে স্খলিত হয়ে পড়েছে, সে হচ্ছে সংস্কৃতি। চিত্তের ঐশ্বর্যকে অবজ্ঞা ক'রে আমরা

জীবনযাত্রার সিদ্ধিলাভকেই একমাত্র প্রাধান্য দিয়েছি। কিন্তু সংস্কৃতিকে বাদ দিয়ে এই সিদ্ধিলাভ কি কখনো যথার্থভাবে সম্পূর্ণ হতে পারে?

সংস্কৃতি সমগ্র মানুষের চিত্তবৃত্তিকে গভীরতর স্তর থেকে সফল করতে থাকে। তার প্রভাবে মানুষ অন্তর থেকে স্বতই সর্বাঙ্গীণ সার্থকতা লাভ করে। তার প্রভাবে নিষ্কাম জ্ঞানার্জনের অনুরাগ এবং নিঃস্বার্থ কর্মানুষ্ঠানের উৎসাহ স্বাভাবিক হয়ে ওঠে। যথার্থ সংস্কৃতি জড়ভাবে প্রথাপালনের চেয়ে অকৃত্রিম সৌজন্যকে বড়ো মূল্য দিয়ে থাকে। মানুষের সঙ্গে ব্যবহারে কাজ উদ্ধার করবার উপযোগী বিনয়কৌশল তার অনুশাসন নয়; সংস্কৃতিবান্ মানুষ নিজের ক্ষতি করতে পারে, কিন্তু নিজেকে হেয় করতে পারে না। সে আড়ম্বরপূর্বক নিজেকে প্রচার করতে বা স্বার্থপরভাবে সবাইকে ঠেলে নিজেকে অগ্রসর করতে লজ্জা বোধ করে। যা-কিছু ইতর বা কপট তার গ্লানি তাকে বেদনা দেয়। শিল্পে সাহিত্যে মানুষের ইতিহাসে যা-কিছু শ্রেষ্ঠ তার সঙ্গে আন্তরিক পরিচয় থাকাতে সকলপ্রকার শ্রেষ্ঠতাকে সম্মান করতে সে আনন্দ পায়। সে বিচার করতে পারে, ক্ষমা করতে পারে, মতবিরোধের বাধা ভেদ ক'রেও যেখানে যেটুকু ভালো আছে সে তা দেখতে পায়, অন্যের সফলতাকে ঈর্ষা করাকে সে নিজের লাঘব বলেই জানে।

সমগ্র মনুষ্যত্বের স্বকীয় আদর্শ প্রত্যেক বড়ো সমাজেই আছে। সেই আদর্শ কেবল পাঠাগারে নয়, পরিবারের মধ্যেও। আমাদের দেশের বর্তমান দুর্গতির দিনে সেই আদর্শ দুর্বল হয়ে গেছে, তার শোচনীয় দৃষ্টান্ত প্রতিদিন দেখতে পাই। তাই বীভৎস কুৎসা আমাদের দেশে আয়জনক পণ্যদ্রব্য হয়ে উঠেছে। তারস্বরে নিন্দা বিস্তার করে বাতাসকে বিষাক্ত করার অপরাধকে আমরা গ্রাহ্যই করি নে; একটু উপলক্ষ ঘটবা-মাত্র এই বীভৎসতাকে উদ্ভাবিত করার ও প্রশ্রয় দেবার লোক দলে দলে ভিড় করে আসে, ইতর হিংস্রতায় সমস্ত দেশ মারীগ্রস্ত হয়ে ওঠে। তীক্ষ্ণ মেধার গুণে আমরা পড়া মুখস্থ করি। বি. এ., এম. এ. পাস করি; কিন্তু আত্মলাঘবকারী পরস্পরের সৌভাগ্যবিদ্বেষী নিন্দা-লোলুপ যে চরিত্রদৈন্য শুভকর্মে পরস্পর মিলিত হবার পথে পথে সচেষ্টভাবে কাঁটার বীজ বপন করে চলেছে, সকলপ্রকার সদনুষ্ঠানকে জীর্ণ বিদীর্ণ করে দেবার জন্যে মহোল্লাসে উঠে পড়ে লেগেছে, সে কেবল সংস্কৃতির অভাবে মনুষ্যত্বের আদর্শ ক্ষুণ্ণ হয়েছে বলেই সম্ভব হল। সকল কর্মানুষ্ঠানে উৎসাহপূর্বক নিজেদেরকে অকৃতার্থ করে আজ বাঙালি সমস্ত পৃথিবীর কাছে অশ্রদ্ধেয় হয়ে উঠল। শিশুকাল থেকে এই ইতরতার বিষবীজ শিক্ষার ভিতর দিয়ে উন্মূলিত করা আমাদের বিদ্যালয়ের সর্বপ্রধান লক্ষ্য হোক, এই আমি একান্ত মনে কামনা করি। এর একমাত্র উপায় হচ্ছে পরীক্ষা-পাসের জন্যে পড়া মুখস্থ করা নয়, মানুষের ইতিহাসে যা-কিছু ভালো তার সঙ্গে আনন্দময় পরিচয়সাধন করিয়ে তার প্রতি শ্রদ্ধা অনুভব করবার সুযোগ সর্বদা ঘটিয়ে দেওয়া। একদা আশ্রমে আমার কবিসহযোগী সতীশ রায় এই কাজ করতেন এবং আর একজন সহযোগী ছিলেন অজিত চক্রবর্তী। তেমন শিক্ষক নিঃসন্দেহ এখনো আমাদের মধ্যে আছেন, কিন্তু রক্তপিপাসু পরীক্ষাদানবের কাছে শিশুদের মন বলি দিতে তাঁদের এত অত্যন্ত ব্যস্ত থাকতে হয় যে শিক্ষার উপরের তলায় ওঠবার সময় থাকে না।

আমেরিকান লেখক সংস্কৃতির এই ফলশ্রুতি বর্ণনা করেছেন; তিনি বলেন সংস্কৃতির প্রভাবে চিত্তের সেই ঔদার্য ঘটে যাতে ক'রে অন্তঃকরণে শান্তি আসে, আপনার প্রতি শ্রদ্ধা আসে, আত্মসংযম আসে এবং মনে মৈত্রীভাবের সঞ্চার হয়ে জীবনের প্রত্যেক অবস্থাকেই কল্যাণময় করে।

একদিন দেখেছিলেম শান্তিনিকেতনের পথে গোরুর গাড়ির চাকা কাদায় বসে গিয়েছিল;

আমাদের ছাত্ররা সকলে মিলে ঠেলে উদ্ধার করে দিলে। সেদিন কোনো অভ্যাগত আশ্রমে যখন উপস্থিত হলেন তাঁর মোট বয়ে আনবার কুলি ছিল না ; আমাদের কোনো তরুণ ছাত্র অসংকোচে তাঁর বোঝা পিঠে করে নিয়ে যথাস্থানে এনে পৌঁছিয়ে দিয়েছিল। অপরিচিত অতিথিমাত্রের সেবা ও আনুকূল্য তারা কর্তব্য বলে জ্ঞান করত। সেদিন তারা আশ্রমের পথ নির্মাণ করেছে, গর্ত বুজিয়ে দিয়েছে। এ-সমস্তই তাদের সতর্ক ও বলিষ্ঠ সৌজন্যের অঙ্গ ছিল, বইয়ের পাতা অতিক্রম করে তাদের শিক্ষার মধ্যে সংস্কৃতি প্রবেশ করেছিল। সেই-সব ছেলেদের প্রত্যেককে তখন আমি জানতেম ; তার পরে অনেক দিন তাদের অনেককে দেখি নি। আশা করি তারা নিন্দাবিলাসী নয়, পরশ্রীকাতর নয়, অক্ষমকে সাহায্য করতে তারা তৎপর এবং ভালোকে তারা ঠিকমতো যাচাই করতে জানে। ১৫ জুলাই ১৯৩৫

শ্রাবণ ১৩৪২

শিক্ষার স্বাঙ্গীকরণ

আমাদের দেশের আর্থিক দারিদ্র্য দুঃখের বিষয়, লজ্জার বিষয় আমাদের দেশের শিক্ষার অকিঞ্চিৎকরত্ব। এই অকিঞ্চিৎকরত্বের মূলে আছে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার অস্বাভাবিকতা, দেশের মাটির সঙ্গে এই ব্যবস্থার বিচ্ছেদ। চিত্তবিকাশের যে আয়োজনটা স্বভাবতই সকলের চেয়ে আপন হওয়া উচিত ছিল সেইটেই রয়েছে সব চেয়ে পর হয়ে— তার সঙ্গে আমাদের দড়ির যোগ হয়েছে, নাড়ীর যোগ হয় নি ; এর ব্যর্থতা আমাদের স্বাজাতিক ইতিহাসের শিকড়কে জীর্ণ করছে, খর্ব করে দিচ্ছে সমস্ত জাতির মানসিক পরিবৃদ্ধিকে। দেশের বহুবিধ অতিপ্রয়োজনীয় বিধিব্যবস্থায় অনাত্মীয়তার দুঃসহ ভার অগত্যাই চেপে রয়েছে ; আইন আদালত, সকলপ্রকার সরকারি কার্যবিধি, যা বহুকোটি ভারতবাসীর ভাগ্য চালনা করে, তা সেই বহুকোটি ভারতবাসীর পক্ষে সম্পূর্ণ দুর্বোধ, দুর্গম। আমাদের ভাষা, আমাদের আর্থিক অবস্থা, আমাদের অনিবার্য অশিক্ষার সঙ্গে রাষ্ট্রশাসনবিধির বিপুল ব্যবধান-বসত পদে পদে যে দুঃখ ও অপব্যয় ঘটে তার পরিমাণ প্রভূত। তবু বলতে পারি 'এহ বাহ্য'। কিন্তু শিক্ষাব্যাপার দেশের প্রাণগত আপন জিনিস না হওয়া তার চেয়ে মর্মান্তিক। ল্যাবরেটরিতে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় উদ্ভাবিত কৃত্রিম অন্নে দেশের পেট ভরাবার মতো সেই চেষ্টা ; অতি অল্পসংখ্যক পেটেই সেটা পৌঁছয়, এবং সেটাকে সম্পূর্ণ রক্তে পরিণত করবার শক্তি অতি অল্প পাকযন্ত্রেরই থাকে। দেশের চিত্তের সঙ্গে দেশের শিক্ষার এই দূরত্ব এবং সেই শিক্ষার অপমানজনক স্বল্পতা দীর্ঘকাল আমাকে বেদনা দিয়েছে ; কেননা নিশ্চিত জানি সকল পরাশ্রয়তার চেয়ে ভয়াবহ, শিক্ষায় পরধর্ম। এ সম্বন্ধে বরাবর আমি আলোচনা করেছি, আবার তার পুনরুক্তি করতে প্রবৃত্ত হলেম ; যেখানে ব্যথা সেখানে বার বার হাত পড়ে। আমার এই প্রসঙ্গে পুনরুক্তি অনেকেই হয়তো ধরতে পারবেন না ; কেননা অনেকেরই কানে আমার সেই পুরোনো কথা পৌঁছয় নি। যাঁদের কাছে পুনরুক্তি ধরা পড়বে তাঁরা যেন ক্ষমা করেন। কেননা আজ আমি দুঃখের কথা বলতে এসেছি, নূতন কথা বলতে আসি নি। আমাদের দেশে ম্যালেরিয়া যেমন নিত্যই আপনার পুনরাবৃত্তি করতে থাকে, আমাদের দেশের সকল সাংঘাতিক দুঃখগুলির সেই দশা। ম্যালেরিয়া অপ্রতিহার্য নয় এ কথায় যাদের নিশ্চিত বিশ্বাস তাদেরই অজেয় ইচ্ছা ও প্রবল অধ্যবসায়ের কাছে ম্যালেরিয়া দৈববিহিত দুর্যোগের ছদ্মবেশ ঘুচিয়ে দিয়ে বিদায়

গ্রহণ করে। অন্যশ্রেণীয় দুঃখও নিজের পৌরুষের দ্বারা প্রতিহত হতে পারে এই বিশ্বাসের দোহাই পাড়বার কর্তব্যতা স্মরণ করে অপটু দেহ নিয়ে আজ এসেছি।

একদা একজন অব্যবসায়ী ভদ্রসন্তান তাঁর চেয়ে আনাড়ি এক ব্যক্তির বাড়ি তৈরি করবার ভার নিয়েছিলেন। মাল-মসলার জোগাড় হয়েছিল সেরা দরের ; ইমারতের গাঁথুনি হয়েছিল মজবুত ; কিন্তু কাজ হয়ে গেলে প্রকাশ পেল, সিঁড়ির কথাটা কেউ ভাবে নি। শনির চক্রান্তে এমনতরো পৌরব্যবস্থা যদি কোনো রাজ্যে থাকে যেখানে একতলার লোকের নিত্যবাস এক-তলাতেই আর দোতলার লোকের দোতলায়, তবে সেখানে সিঁড়ির কথাটা ভাবা নিতান্তই বাহুল্য। কিন্তু আলোচিত পূর্বোক্ত বাড়িটাতে সিঁড়িযোগে ঊর্ধ্বপথযাত্রায় একতালার প্রয়োজন ছিল ; এই ছিল তার উন্নতিলাভের একমাত্র উপায়।

এ দেশে শিক্ষা-ইমারতে সিঁড়ির সংকল্প গোড়া থেকেই আমাদের রাজমিস্ত্রির প্ল্যানে ওঠে নি। নীচের তলাটা উপরের তলাকে নিঃস্বার্থ ধৈর্যে শিরোধার্য করে নিয়েছে ; তার ভার বহন করেছে, কিন্তু সুযোগ গ্রহণ করে নি ; দাম জুগিয়েছে, মাল আদায় করে নি।

আমার পূর্বকার লেখায় এ দেশের সিঁড়িহারা শিক্ষাবিধানে এই মস্ত ফাঁকটার উল্লেখ করেছিলুম। তা নিয়ে কোনো পাঠকের মনে কোনো-যে উদ্‌বেগ ঘটেছে তার প্রমাণ পাওয়া যায় না। তার কারণ, অভ্রভেদী বাড়িটাই আমাদের অভ্যস্ত, তার গৌরবে আমরা অভিভূত, তার বুকের কাছটাতে উপর-নীচে সম্বন্ধস্থাপনের যে সিঁড়ির নিয়মটা ভদ্র নিয়ম সেটাতে আমাদের অভ্যাস হয় নি। সেইজন্যেই ইতিপূর্বে আমার আলোচ্য বিষয়টা হয়তো সেলাম পেয়ে থাকবে, কিন্তু আসন পায় নি। তবু আর-একবার চেষ্টা দেখতে দোষ নেই, কেননা ভিতরে ভিতরে কখন যে দেশের মনে হাওয়া বদল হয় পরীক্ষা না করে তা বলা যায় না।

শিক্ষা সম্বন্ধে সব চেয়ে স্বীকৃত এবং সব চেয়ে উপেক্ষিত কথাটা এই যে, শিক্ষা জিনিসটি জৈব, ওটা যান্ত্রিক নয়। এর সম্বন্ধে কার্যপ্রণালীর প্রসঙ্গ পরে আসতে পারে, কিন্তু প্রাণক্রিয়ার প্রসঙ্গ সর্বাগ্রে। ইনকুবেটর যন্ত্রটা সহজ নয় ব'লেই কৌশল এবং অর্থব্যয়ের দিক থেকে তার বিবরণ শুনতে খুব মস্ত ; কিন্তু মুর্গির জীবনধর্মানুগত ডিমপাড়াটা সহজ বলেই বেশি কথা জোড়ে না, তবু সেটাই অগ্রগণ্য।

বেঁচে থাকার নিয়ত ইচ্ছা ও সাধনাই হচ্ছে বেঁচে থাকার প্রকৃতিগত লক্ষণ। যে সমাজে প্রাণের জোর আছে সে সমাজ টিকে থাকবার স্বাভাবিক গরজেই আত্মরক্ষাঘটিত দুটি সর্বপ্রধান প্রয়োজনের দিকে অক্লান্তভাবে সজাগ থাকে, অন্ন আর শিক্ষা, জীবিকা আর বিদ্যা। সমাজের উপরের থাকের লোক খেয়ে-প'রে পরিপুষ্ট থাকবে আর নীচের থাকের লোক অর্ধাশনে বা অনশনে বাঁচে কি মরে সে সম্বন্ধে সমাজ থাকবে অচেতন, এটাকে বলা যায় অর্ধাঙ্গের পক্ষাঘাত। এই অসাড়তার ব্যামোটা বর্বরতার ব্যামো।

পশ্চিম-মহাদেশে আজ সর্বব্যাপী অর্থসংকটের সঙ্গে সঙ্গে অন্নসংকট প্রবল হয়েছে। এই অভাব-নিবারণের জন্যে সেখানকার বিদ্বানের দল এবং গবর্মেণ্ট যেরকম অসামান্য দাক্ষিণ্য প্রকাশ করছেন সেরকম উদ্‌বেগ এবং চেষ্টা আমাদের বহুসহিষ্ণু বুভুক্ষার অভিজ্ঞতায় সম্পূর্ণ অপরিচিত। এ নিয়ে বড়ে বড়ো অঙ্কের ঋণ স্বীকার করতেও তাঁদের সংকোচ দেখি নে। আমাদের দেশে দু বেলা দু মুঠো খেতে পায় অতি অল্প লোক, বাকি বারো-আনা লোক আধপেটা খেয়ে ভাগ্যকে দায়ী করে এবং জীবিকার কৃপণ পথ থেকে মৃত্যুর উদার পথে সরে পড়তে বেশি দেরি করে না। এর থেকে যে নির্জীবতার সৃষ্টি হয়েছে তার পরিমাণ কেবল মৃত্যুসংখ্যার তালিকা দিয়ে নিরূপিত

হতে পারে না। নিরুৎসাহ অবসাদ অকর্মণ্যতা রোগপ্রবণতা মেপে দেখবার প্রত্যক্ষ মানদণ্ড যদি থাকত তা হলে দেখতে পেতুম এ দেশের এক প্রান্ত থেকে আর-এক প্রান্ত জুড়ে প্রাণকে ব্যঙ্গ করছে মৃত্যু ; সে অতি কুৎসিত দৃশ্য, অত্যন্ত শোচনীয়। কোনো স্বাধীন সভ্য দেশ মৃত্যুর এরকম সর্বনেশে নাট্যলীলা নিশ্চেষ্টভাবে স্বীকার করতেই পারে না, আজ তার প্রমাণ ভারতের বাইরে নানা দিক থেকেই পাচ্ছি।

শিক্ষা সম্বন্ধেও সেই একই কথা। শিক্ষার অভিসেচনক্রিয়া সমাজের উপরের স্তরকেই দুই-এক ইঞ্চি মাত্র ভিজিয়ে দেবে আর নীচের স্তরপরম্পরা নিত্যনীরস কাঠিন্যে সুদূর-প্রসারিত মরুময়তাকে ক্ষীণ আবরণে ঢাকা দিয়ে রাখবে, এমন চিত্তঘাতী সুগভীর মূর্খতাকে কোনো সভ্য সমাজ অলসভাবে মেনে নেয় নি। ভারতবর্ষকে মানতে বাধ্য করেছে আমাদের যে নির্মম ভাগ্য তাকে শতবার ধিক্কার দিই।

এমন কোনো কোনো গ্রহ উপগ্রহ আছে যার এক অর্ধেকের সঙ্গে অন্য অর্ধেকের চিরস্থায়ী বিচ্ছেদ ; সেই বিচ্ছেদ আলোক-অন্ধকারের বিচ্ছেদ। তাদের একটা পিঠ সূর্যের অভিমুখে, অন্য পিঠ সূর্যবিমুখ। তেমনি করে যে সমাজের এক অংশে শিক্ষার আলোক পড়ে, অন্য বৃহত্তর অংশ শিক্ষাবিহীন, সে সমাজ আত্মবিচ্ছেদের অভিশাপে অভিশপ্ত। সেখানে শিক্ষিত-অশিক্ষিতের মাঝখানে অসূর্যম্পশ্য অন্ধকারের ব্যবধান। দুই ভিন্নজাতীয় মানুষের চেয়েও এদের চিত্তের ভিন্নতা আরো বেশি প্রবল। একই নদীর এক পারের স্রোত ভিতরে ভিতরে অন্য পারের স্রোতের বিরুদ্ধ দিকে চলছে ; সেই উভয় বিরুদ্ধের পার্শ্ববর্তিতাই এদের দূরত্বকে আরো প্রবলভাবে প্রমাণিত করে।

শিক্ষার ঐক্য-যোগে চিত্তের ঐক্য-রক্ষাকে সভ্য সমাজ মাত্রই একান্ত অপরিহার্য ব'লে জানে। ভারতের বাইরে নানা স্থানে ভ্রমণ করেছি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য মহাদেশে। দেখে এসেছি, এশিয়ায় নবজাগরণের যুগে সর্বত্রই জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষাপ্রচারের দায়িত্ব একান্ত আগ্রহের সঙ্গে স্বীকৃত। বর্তমান যুগের সঙ্গে যে-সব দেশ চিত্তের ও বিত্তের আদানপ্রদান বুদ্ধিবিচারের সঙ্গে চালনা করতে না পারবে তারা কেবলই হঠে যাবে, কোণ-ঠেসা হয়ে থাকবে, এই শঙ্কার কারণ দূর করতে কোনো ভদ্র দেশ অর্থাভাবের কৈফিয়ত মানে নি। আমি যখন রাশিয়ায় গিয়েছিলুম তখন সেখানে আট বছর মাত্র নূতন স্বরাজতন্ত্রের প্রবর্তন হয়েছে ; তার প্রথম ভাগে অনেক কাল বিদ্রোহে বিপ্লবে দেশ ছিল শান্তিহীন, অর্থসচ্ছলতা ছিলই না। তবু এই স্বল্পকালেই রাশিয়ার বিরাট রাজ্যে প্রজাসাধারণের মধ্যে যে অদ্ভুত দ্রুতগতিতে শিক্ষাবিস্তার হয়েছে সেটা ভাগ্যবঞ্চিত ভারতবাসীর কাছে অসাধ্য ইন্দ্রজাল বলেই মনে হল।

শিক্ষার ঐক্য-সাধন, ন্যাশনল ঐক্য-সাধনের মূলে, এই সহজ কথা সুস্পষ্ট ক'রে বুঝতে আমাদের দেরি হয়েছে তারও কারণ আমাদের অভ্যাসের বিকার। একদা মহাত্মা গোখ্‌লে যখন সার্বজনিক অবশ্যশিক্ষা প্রবর্তনে উদ্যোগী হয়েছিলেন তখন সব চেয়ে বাধা পেয়েছিলেন বাংলাপ্রদেশের কোনো কোনো গণ্যমান্য লোকের কাছ থেকেই। অথচ, রাষ্ট্রীয় ঐক্যের আকাঙ্ক্ষা এই বাংলাদেশেই সব চেয়ে মুখর ছিল। শিক্ষার অনৈক্যে বিজড়িত থেকেও রাষ্ট্রিক উন্নতির পথে এগিয়ে চলা সম্ভবপর এই কল্পনা এ প্রদেশের মনে বাধা পায় নি, এই অনৈক্যের অভ্যাস এমনিই ছিল মজ্জাগত। অভ্যাসে চিন্তার যে জড়ত্ব আনে আমাদের দেশে তার আর-একটা দৃষ্টান্ত ঘরে ঘরেই আছে। আহারে কুপথ্য বাঙালির প্রাত্যহিক, বাঙালির মুখরোচক ; সেটা আমাদের কাছে এতই সহজ হয়ে গেছে যে, যখন দেহটার আধমরা দশা বিচার করি তখন ডাক্তারের কথা ভাবি,

ওষুধের কথা ভাবি, হাওয়া-বদলের কথা ভাবি, তুকতাক-মন্ত্রতন্ত্রের কথা ভাবি, এমন-কি, বিদেশী শাসনকেও সন্দেহ করি, কিন্তু পথ্যসংস্কারের কথা মনেও আসে না। নৌকোটার নোঙর থাকে মাটি আঁকড়িয়ে, সেটা চোখে পড়ে না ; মনে করি পালটা ছেঁড়া ব'লেই পারঘাটে পৌঁছনো হচ্ছে না।

আমার কথার জবাবে এমন তর্ক হয়তো উঠবে, আমাদের দেশে সমাজ পূর্বেও তো সজীব ছিল, আজও একেবারে মরে নি— তখনো কি আমাদের দেশ শিক্ষায় অশিক্ষায় যেন জলে স্থলে বিভক্ত ছিল না? তখনকার টোলে চতুষ্পাঠীতে তর্কশাস্ত্র ব্যাকরণশাস্ত্রের যে প্যাঁচ-কষাকষি চলত সে তো ছিল পণ্ডিত পালোয়ানদের ওস্তাদি-আখড়াতেই বদ্ধ : তার বাইরে যে বৃহৎ দেশটা ছিল সেও কি সর্বত্র ঐরকম পালোয়ানি কায়দায় তাল ঠুকে পাঁয়তারা করে বেড়াত? যা ছিল বিদ্যানামধারী পরিণত গজের বপ্রক্রীড়া সেই দিগ্‌গজ পণ্ডিতি তো তার শুঁড় আস্ফালন করে নি দেশের ঘরে ঘরে। কথাটা মেনে নিলুম। বিদ্যার যে আড়ম্বর, নিরবচ্ছিন্ন পাণ্ডিত্য, সকল দেশেই সেটা প্রাণের ক্ষেত্র থেকে দূরবর্তী। পাশ্চাত্য দেশেও স্থূলপদবিক্ষেপে তার চলন আছে, তাকে বলে পেডেন্‌ট্রি। আমার বক্তব্য এই যে, এ দেশে একদা বিদ্যার যে ধারা সাধনার দুর্গম তুঙ্গ শৃঙ্গ থেকে নির্ঝরিত হত সেই একই ধারা সংস্কৃতিরূপে দেশকে সকল স্তরেই অভিষিক্ত করেছে। এজন্যে যান্ত্রিক নিয়মে এডুকেশন্ ডিপার্ট্‌মেন্টের কারখানা-ঘর বানাতে হয় নি ; দেহে যেমন প্রাণশক্তির প্রেরণায় মোটা ধমনীর রক্তধারা নানা আয়তনের বহুসংখ্যক শিরা-উপশিরা-যোগে সমস্ত দেহে অঙ্গপ্রত্যঙ্গে প্রবাহিত হতে থাকে তেমনি ক'রেই আমাদের দেশের সমস্ত সমাজদেহে একই শিক্ষা স্বাভাবিক প্রাণপ্রক্রিয়ায় নিরন্তর সঞ্চারিত হয়েছে— নাড়ীর বাহনগুলি কোনোটা-বা স্থূল, কোনোটা-বা অতি সূক্ষ্ম, কিন্তু তবু তারা এক কলেবর-ভুক্ত নাড়ী, এবং রক্তও একই প্রাণ-ভরা রক্ত।

অরণ্য যে মাটি থেকে প্রাণরস শোষণ করে বেঁচে আছে সেই মাটিকে আপনিই প্রতিনিয়ত প্রাণের উপাদান অজস্র জুগিয়ে থাকে। তাকে কেবলই প্রাণময় করে তোলে। উপরের ডালে যে ফল সে ফলায় নীচের মাটিতে তার আয়োজন তার নিজকৃত। অরণ্যের মাটি তাই হয়ে ওঠে আরণ্যিক, নইলে সে হত বিজাতীয় মরু। যেখানে মাটিতে সেই উদ্ভিদসার পরিব্যাপ্ত নয় সেখানে গাছপালা বিরল হয়ে জন্মায়, উপবাসে বেঁকেচুরে শীর্ণ হয়ে থাকে। আমাদের সমাজের বনভূমিতে একদিন উচ্চশীর্ষ বনস্পতির দান নীচের ভূমিতে নিত্যই বর্ষিত হত। আজ দেশে যে পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রবর্তিত হয়েছে মাটিকে সে দান করেছে অতি সামান্য ; ভূমিকে সে আপন উপাদানে উর্বরা করে তুলছে না। জাপান প্রভৃতি দেশের সঙ্গে আমাদের এই প্রভেদটাই লজ্জাজনক এবং শোকাবহ। আমাদের দেশ আপন শিক্ষার ভূমিকা সৃষ্টি সম্বন্ধে উদাসীন। এখানে দেশের শিক্ষা এবং দেশের বৃহৎ মন পরস্পরবিচ্ছিন্ন। সেকালে আমাদের দেশের মস্ত মস্ত শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতের সঙ্গে নিরক্ষর গ্রামবাসীর মনঃপ্রকৃতির বৈপরীত্য ছিল না। সেই শাস্ত্রজ্ঞানের প্রতি তাদের মনের অভিমুখিতা তৈরি হয়ে গিয়েছিল। সেই ভোজে অর্ধভোজন তাদের ছিল নিত্য, কেবল ঘ্রাণে নয়, উদ্‌বৃত্ত উপভোগে।

কিন্তু সায়ান্সে-গড়া পাশ্চাত্যবিদ্যার সঙ্গে আমাদের দেশের মনের যোগ হয়নি ; জাপানে সেটা হয়েছে পঞ্চাশ বছরের মধ্যে, তাই পাশ্চাত্যশিক্ষার ক্ষেত্রে জাপান স্বরাজের অধিকারী। এটা তার পাস-করা বিদ্যা নয়, আপন-করা বিদ্যা। সাধারণের কথা ছেড়ে দেওয়া যাক, সায়ান্সে ডিগ্রি-ধারী পণ্ডিত এ দেশে বিস্তর আছে যাদের মনের মধ্যে সায়ান্সের জমিনটা তল্‌তলে, তাড়াতাড়ি যা-তা

বিশ্বাস করতে তাদের অসাধারণ আগ্রহ, মেকি সায়ান্সের মন্ত্র পড়িয়ে অন্ধ সংস্কারকে তারা সায়ান্সের জাতে তুলতে কুণ্ঠিত হয় না। অর্থাৎ, শিক্ষার নৌকোতে বিলিতি দাঁড় বসিয়েছি, হাল লাগিয়েছি, দেখতে হয়েছে ভালো, কিন্তু সমস্ত নদীটার স্রোত উল্টো দিকে— নৌকো পিছিয়ে পড়ে আপনিই। আধুনিক কালে বর্বর দেশের সীমানার বাইরে ভারতবর্ষই একমাত্র দেশ যেখানে শতকরা আট-দশ জনের মাত্র অক্ষর-পরিচয় আছে। এমন দেশে ঘটা ক'রে বিদ্যাশিক্ষার আলোচনা করতে লজ্জা বোধ করি। দশ জন মাত্র যার প্রজা তার রাজত্বের কথাটা চাপা দেওয়াই ভালো। বিশ্ববিদ্যালয় অক্‌স্‌ফোর্ডে আছে, কেম্‌ব্রিজে আছে, লন্ডনে আছে। আমাদের দেশেও স্থানে স্থানে আছে, পূর্বোক্তের সঙ্গে এদের ভাবভঙ্গি ও বিশেষণের মিল দেখে আমরা মনে ক'রে বসি এরা পরস্পরের সবর্ণ : যেন ওটিন ক্রিম ও পাউডার মাখলেই মেমসাহেবের সঙ্গে সত্যসত্যই বর্ণভেদ ঘুচে যায়। বিশ্ববিদ্যালয় যেন তার ইমারতের দেওয়াল এবং নিয়মাবলীর পাকা প্রাচীরের মধ্যেই পর্যাপ্ত। অক্‌স্‌ফোর্ড কেম্‌ব্রিজ বলতে শুধু এটুকুই বোঝায় না, তার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত শিক্ষিত ইংলন্ডকেই বোঝায়। সেইখানেই তারা সত্য, তারা মরীচিকা নয়। আর আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় হঠাৎ থেমে গেছে তার আপন পাকা প্রাচীরের তলাটাতেই। থেমে যে গেছে সে কেবল বর্তমানের অসমাপ্তিবশত নয়। এখনো বয়স হয় নি ব'লে যে মানুষটি মাথায় খাটো তার জন্যে আক্ষেপ করবার দরকার নেই, কিন্তু যার ধাতের মধ্যেই সম্পূর্ণ বাড়বার জৈবধর্ম নেই তাকে যেন গ্রেনেডিয়ারের স্বজাতীয় বলে কল্পনা না করি।

গোড়ায় যাঁরা এ দেশে তাঁদের রাজতন্ত্রের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষাব্যবস্থার পত্তন করেছিলেন, দেখতে পাই, তাঁদেরও উত্তরাধিকারীরা বাইরের আসবাব এবং ইঁট-কাঠ-চুন-সুরকির প্যাটার্ন দেখিয়ে আমাদের এবং নিজেদেরকে ভোলাতে আনন্দ বোধ করেন। কিছুকাল পূর্বে একদিন কাগজে পড়েছিলুম, অন্য-এক প্রদেশের রাজ্যসচিব বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিত-পত্তনের সময়ে বলেছিলেন যে, যারা বলে ইমারতের বাহুল্যে আমরা শিক্ষার সম্বল খর্ব করি তারা অবুঝ, কেননা শিক্ষা তো কেবল জ্ঞানলাভ নয়, ভালো দালানে বসে পড়াশুনো করা সেও একটা শিক্ষা। অর্থাৎ ক্লাসে বড়ো অধ্যাপকের চেয়ে বড়ো দেওয়ালটা বেশি বৈ কম নয়। আমাদের নালিস এই যে, তলোয়ারটা যেখানে তালপাতার চেয়ে বেশি দামি করা অর্থাভাববশত অসম্ভব ব'লে সংবাদ পাই সেখানে তার খাপটাকে ইস্পাত দিয়ে বাঁধিয়ে দিলে আসল কাজ এগোয় না। তার চেয়ে ঐ ইস্পাতকে গলিয়ে একটা চলনসই গোছের ছুরি বানিয়ে দিলেও কতকটা সান্ত্বনার আশা থাকে।

আসল কথা, প্রাচ্য দেশে মূল্যবিচারের যে আদর্শ তাতে আমরা উপকরণকে অমৃতের সঙ্গে পাল্লা দেওয়ার দরকার বোধ করি নে। বিদ্যা জিনিসটি অমৃত, ইঁটকাঠের দ্বারা তার পরিমাপের কথা আমাদের মনেই হয় না। আন্তরিক সত্যের দিকে যা বড়ো বাহ্য রূপের দিকে তার আয়োজন আমাদের বিচারে না হলেও চলে। অন্তত, এতকাল সেইরকমই আমাদের মনের ভাব ছিল। বস্তুত, আমাদের দেশের প্রাচীন বিশ্ববিদ্যালয় আজও আছে বারাণসীতে। অত্যন্ত সত্য, নিতান্ত স্বাভাবিক, অথচ মস্ত ক'রে চোখে পড়ে না। এ দেশের সনাতন সংস্কৃতির মূল উৎস সেইখানেই, কিন্তু তার সঙ্গে না আছে ইমারত, না আছে অতিজটিল ব্যয়সাধ্য ব্যবস্থাপ্রণালী। সেখানে বিদ্যাদানের চিরন্তন ব্রত দেশের অন্তরের মধ্যে অলিখিত অনুশাসনে লেখা। বিদ্যাদানের পদ্ধতি, তার নিঃস্বার্থ নিষ্ঠা, তার সৌজন্য, তার সরলতা, গুরুশিষ্যের মধ্যে অকৃত্রিম হৃদ্যতার সম্বন্ধ, সর্বপ্রকার আড়ম্বরকে উপেক্ষা করে এসেছে— কেননা, সত্যেই তার পরিচয়। প্রাচ্য দেশের কারিগররা যেরকম অতি সামান্য হাতিয়ার দিয়ে অতি অসামান্য শিল্পদ্রব্য তৈরি ক'রে থাকে পাশ্চাত্য বুদ্ধি তা কল্পনা করতে

পারে না, যে নৈপুণ্যটি ভিতরের জিনিস তার বাহন প্রাণে এবং মনে। বাইরের স্থূল উপাদানটি অত্যন্ত হয়ে উঠলে আসল জিনিসটি চাপা পড়ে।

দুর্ভাগ্যক্রমে এই সহজ কথাটা আমরাই আজকাল পাশ্চাত্যের চেয়েও কম বুঝি। গরিব যখন ধনীকে মনে মনে ঈর্ষা করে তখন এইরকমই বুদ্ধিবিকার ঘটে। কোনো অনুষ্ঠানে যখন আমরা পাশ্চাত্যের অনুকরণ করি তখন ইঁট-কাঠের বাহুল্যে এবং যন্ত্রের চক্রে উপচক্রে নিজেকে ও অন্যকে ভুলিয়ে গৌরব করা সহজ। আসল জিনিসের কার্পণ্যে এইটেরই দরকার হয় বেশি। আসলের চেয়ে নকলের সাজসজ্জা স্বভাবতই যায় বাহুল্যের দিকে। প্রত্যহই দেখতে পাই, পূর্বদেশে জীবনসমস্যার আমরা যে সহজ সমাধান করেছিলুম তার থেকে কেবলই আমরা স্খলিত হচ্ছি। তার ফলে হল এই যে, আমাদের অবস্থাটা রয়ে গেল পূর্ববৎ, এমন-কি, তার চেয়ে কয়েক ডিগ্রি নীচের দিকে, অথচ আমাদের মেজাজটা ধার করে এনেছি অন্য দেশ থেকে যেখানে সমারোহের সঙ্গে তহবিলের বিশেষ আড়াআড়ি নেই।

মনে করে দেখো-না— এ দেশে বহুরোগজর্জর জনসাধারণের আরোগ্যবিধানের জন্যে রিক্ত রাজকোষের দোহাই দিয়ে ব্যয়সংকোচ করতে হয়, দেশজোড়া অতিবিরাট মূর্খতার কালিমা যথোচিত পরিমার্জন করতে অর্থে কুলোয় না, অর্থাৎ যে-সব অভাবে দেশ অন্তরে-বাহিরে মৃত্যুর তলায় তলাচ্ছে তার প্রতিকারের অতি ক্ষীণ উপায় দেউলে দেশের মতোই; অথচ এ দেশে শাসনব্যবস্থায় ব্যয়ের অজস্র প্রাচুর্য একেবারেই দরিদ্র দেশের মতো নয়। তার ব্যয়ের পরিমাণ স্বয়ং পাশ্চাত্য ধনী দেশকেও অনেক দূর এগিয়ে গেছে। এমন-কি, বিদ্যাবিভাগের সমস্ত বাহ্য ঠাট বজায় রাখবার ব্যয় বিদ্যা-পরিবেশনের চেয়ে বেশি। অর্থাৎ গাছের পাতাকে দর্শনধারী আকারে ঝাঁকড়া ক'রে তোলবার খাতিরে ফল ফলাবার রস-জোগানে টানাটানি চলেছে। তা হোক, এর এই বাইরের দিকে অভাবের চেয়ে এর মর্মগত গুরুতর অভাবটাই সব চেয়ে দুশ্চিন্তার বিষয়। সেই কথাটাই বলতে চাই। সেই অভাবটা শিক্ষার যথাযোগ্য আধারের অভাব।

আজকালকার অস্ত্রচিকিৎসায় অঙ্গপ্রত্যঙ্গে বাইরে থেকে জোড়া লাগাবার কৌশল ক্রমশই উৎকর্ষ লাভ করছে। কিন্তু বাইরে-থেকে-জোড়-লাগা জিনিসটা সমস্ত কলেবরের সঙ্গে প্রাণের মিলে মিলিত না হলে সেটাকে সুচিকিৎসা বলে না। তার ব্যাণ্ডেজ-বন্ধনের উত্তরোত্তর প্রভূত পরিস্ফীতি দেখে স্বয়ং রোগীর মনেও গর্ব এবং তৃপ্তি হতে পারে, কিন্তু মুমূর্ষু প্রাণপুরুষের এতে সান্ত্বনা নেই। শিক্ষা সম্বন্ধে এই কথাটা পূর্বেই বলেছি। বলেছি, বাইরের থেকে আহরিত শিক্ষাকে সমস্ত দেশ যতক্ষণ আপন করতে না পারবে ততক্ষণ তার বাহ্য উপকরণের দৈর্ঘ্যপ্রস্থের পরিমাপটাকে হিসাবের খাতায় লাভের কোঠায় ফেললে হুন্ডি-কাটা ধারের টাকাটাকে মূলধনহারা ব্যবসায়ে মুনাফা ব'লে আনন্দ করার মতো হয়। সেই আপন করবার সর্বপ্রধান সহায় আপন ভাষা। শিক্ষার সকল খাদ্য ঐ ভাষার রসায়নে আমাদের আপন খাদ্য হয়। পক্ষীশাবক গোড়া থেকেই পোকা খেয়ে মানুষ; কোনো মানবসমাজে হঠাৎ যদি কোনো পক্ষীমহারাজের একাধিপত্য ঘটে তা হলেই কি এমন কথা বলা চলবে যে, সেই রাজখাদ্যটা খেলেই মানুষ-প্রজাদেরও পাখা গজিয়ে উঠবে।

শিক্ষায় মাতৃভাষাই মাতৃদুগ্ধ, জগতে এই সর্বজনস্বীকৃত নিরতিশয় সহজ কথাটা বহুকাল পূর্বে একদিন বলেছিলেম; আজও তার পুনরাবৃত্তি করব। সেদিন যা ইংরেজি-শিক্ষার মন্ত্র-মুগ্ধ কর্ণকুহরে অশ্রাব্য হয়েছিল আজও যদি তা লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় তবে আশা করি, পুনরাবৃত্তি করবার মানুষ বারে বারে পাওয়া যাবে।

আপন ভাষায় ব্যাপকভাবে শিক্ষার গোড়াপত্তন করবার আগ্রহ স্বভাবতই সমাজের মনে কাজ করে, এটা তার সুস্থ চিত্তের লক্ষণ। রামমোহন রায়ের বন্ধু পাদ্রি এডাম সাহেব বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষার যে রিপোর্ট প্রকাশ করেন তাতে দেখা যায় বাংলা-বিহারে এক লক্ষের উপর পাঠশালা ছিল, দেখা যায় প্রায় প্রত্যেক গ্রামেই ছিল জনসাধারণকে অন্তত ন্যূনতম শিক্ষাদানের ব্যবস্থা। এ ছাড়া প্রায় তখনকার ধনী মাত্রেই আপন চণ্ডীমণ্ডপে সামাজিক কর্তব্যের অঙ্গরূপে পাঠশালা রাখতেন, গুরুমশায় বৃত্তি ও বাসা পেতেন তাঁরই কাছ থেকে। আমার প্রথম অক্ষরপরিচয় আমাদেরই বাড়ির দালানে, প্রতিবেশী পোড়োদের সঙ্গে। মনে আছে এই দালানের নিভৃত খ্যাতিহীনতা ছেড়ে আমার সতীর্থ আত্মীয় দুজন যখন অশ্বরথযোগে সরকারি বিদ্যালয়ে প্রবেশাধিকার পেলেন তখন মানহানির দুঃসহ দুঃখে অশ্রুপাত করেছি এবং গুরুমশায় আশ্চর্য ভবিষ্যৎদৃষ্টির প্রভাবে বলেছিলেন, ঐখান থেকে ফিরে আসবার ব্যর্থ প্রয়াসে আরো অনেক বেশি অশ্রু আমাকে ফেলতে হবে। তখনকার প্রথম শিক্ষার জন্য শিশুশিক্ষা প্রভৃতি যে-সকল পাঠ্যপুস্তক ছিল, মনে আছে, অবকাশকালেও বার বার তার পাতা উল্‌টিয়েছি। এখনকার ছেলেদের কাছে তার প্রত্যক্ষ পরিচয় দিতে কুণ্ঠিত হব, কিন্তু সমস্ত দেশের শিক্ষা-পরিবেশনের স্বাভাবিক ইচ্ছা ঐ অত্যন্ত গরিব-ভাবে ছাপানো বইগুলির পত্রপুটে রক্ষিত ছিল— এই মহৎ গৌরব এখনকার কোনো শিশুপাঠ্য বইয়ে পাওয়া যাবে না। দেশের খাল-বিল-নদী-নালায় আজ জল শুকিয়ে এল, তেমনি রাজার অনাদরে আধমরা হয়ে এল সর্বসাধারণের নিরক্ষরতা দূর করবার স্বাদেশিক ব্যবস্থা।

দেশে বিদ্যাশিক্ষার যে সরকারি কারখানা আছে তার চাকায় সামান্য কিছু বদল করতে হলে অনেক হাতুড়ি-পেটাপিটির দরকার হয়। সে খুব শক্ত হাতের কর্ম। সেই শক্ত হাতই ছিল আশু মুখুজ্জে মশায়ের। বাঙালির ছেলে ইংরেজিবিদ্যায় যতই পাকা হোক, তবু শিক্ষা পুরো করবার জন্যে তাকে বাংলা শিখতেই হবে, ঠেলা দিয়ে মুখুজ্জেমশায় বাংলার বিশ্ববিদ্যালয়কে এতটা দূর পর্যন্ত বিচলিত করেছিলেন। হয়তো ঐ পথটায় তার চলৎশক্তির সূত্রপাত করে দিয়েছেন, হয়তো তিনি বেঁচে থাকলে চাকা আরো এগোত। হয়তো সেই চালনার সংকেত মন্ত্রণাসভার দফ্‌তরে এখনো পরিণতির দিকে উন্মুখ আছে।

তবু আমি যে আজ উদ্‌বেগ প্রকাশ করছি তার কারণ, বিশ্ববিদ্যালয়ের যানবাহনটা অত্যন্ত ভারী এবং বাংলাভাষার পথ এখনো কাঁচা পথ। এই সমস্যা-সমাধান দুরূহ ব'লে পাছে হতে-করতে এমন একটা অতি অস্পষ্ট ভাবী কালে তাকে ঠেলে দেওয়া হয় যা অসম্ভাবিতের নামান্তর, এই আমাদের ভয়। আমাদের গতি মন্দাক্রান্তা, কিন্তু আমাদের অবস্থাটা সবুর করবার মতো নয়। তাই আমি বলি পরিপূর্ণ সুযোগের জন্যে সুদীর্ঘ কাল অপেক্ষা না ক'রে অল্প বহরে কাজটা আরম্ভ করে দেওয়া ভালো, যেমন ক'রে চারাগাছ রোপণ করে সেই সহজ ভাবে। অর্থাৎ তার মধ্যে সমগ্র গাছেরই আদর্শ আছে ; বাড়তে বাড়তে দিনে দিনে সেই আদর্শ সম্পূর্ণ হয়। বয়স্ক ব্যক্তির পাশে শিশু যখন দাঁড়ায় সে আপন সমগ্রতার সম্পূর্ণ ইঙ্গিত নিয়েই দাঁড়ায়। এমন নয়, একটা ঘরে বছর-দুয়েক ধ'রে ছেলেটার কেবল পা'খানা তয়ের হচ্ছে, আর-একটা ঘরে এগিয়েছে হাতের কনুইটা পর্যন্ত। এতদূর অত্যন্ত সতর্কতা সৃষ্টিকর্তার নেই। সৃষ্টির ভূমিকাতেও অপরিণতি সত্ত্বেও সমগ্রতা থাকে।

তেমনি বাংলা-বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি সজীব সমগ্র শিশুমূর্তি দেখতে চাই, সে মূর্তি কারখানা-ঘরে-তৈরি খণ্ড খণ্ড বিভাগের ক্রমশ যোজনা নয়। বয়স্ক বিদ্যালয়ের পাশে এসেই সে দাঁড়াক

বালকবিদ্যালয় হয়ে। তার বালকমূর্তির মধ্যেই দেখি তার বিজয়ী মূর্তি, দেখি ললাটে তার রাজাসন-অধিকারের প্রথম টিকা।

বিদ্যালয়ের কাজে যাঁরা অভিজ্ঞ তাঁরা জানেন, এক দল ছাত্র স্বভাবতই ভাষাশিক্ষায় অপটু। ইংরেজি ভাষায় অনধিকার সত্ত্বেও যদি তারা কোনোমতে ম্যাট্রিকের দেউড়িটা পেরিয়ে যায় উপরের সিঁড়ি ভাঙবার বেলায় বসে পড়ে, আর ঠেলে তোলা যায় না।

এই দুর্গতির অনেকগুলো কারণ আছে। একে তো যে ছেলের মাতৃভাষা বাংলা, ইংরেজি ভাষার মতো বালাই তার আর নেই। ও যেন বিলিতি তলোয়ারের খাপে দিশি খাঁড়া ভরবার কসরত। তারপরে, গোড়ার দিকে ভালো শিক্ষকের কাছে ভালো নিয়মে ইংরেজি শেখার সুযোগ অল্প ছেলেরই হয়, গরিবের ছেলের তো হয়ই না। তাই অনেক স্থলেই বিশল্যকরণীর পরিচয় ঘটে না বলেই গোটা ইংরেজি বই মুখস্থ করা ছাড়া উপায় থাকে না। সেরকম ত্রেতাযুগীয় বীরত্ব ক'জন ছেলের কাছে আশা করা যায়?

শুধু এই কারণেই কি তারা বিদ্যামন্দির থেকে আন্ডামানে চালান যাবার উপযুক্ত? ইংলন্ডে একদিন চুরির দণ্ড ছিল ফাঁসি, এ যে তার চেয়েও কড়া আইন, এ যে চুরি করতে পারে না ব'লেই ফাঁসি। না বুঝে বই মুখস্থ ক'রে পাস করা কি চুরি ক'রে পাস করা নয়? পরীক্ষাগারে বইখানা চাদরের মধ্যে নিয়ে গেলেই চুরি, আর মগজের মধ্যে করে নিয়ে গেলে তাকে কী বলব? আস্ত-বই-ভাঙা উত্তর বসিয়ে যারা পাস করে তারাই তো চোরাই কড়ি দিয়ে পারানি জোগায়।

তা হোক, যে উপায়েই তারা পার হোক, নালিশ করতে চাই নে। তবু এ প্রশ্নটা থেকে যায় যে, বহুসংখ্যক যে-সব হতভাগা পার হতে পারল না তাদের পক্ষে হাওড়ার পুলটাই নাহয় দু ফাঁক হয়েছে, কিন্তু কোনো রকমেরই সরকারি খেয়াও কি তাদের কপালে জুটবে না— একটা লাইসেন্স্ দেওয়া পান্সি, মোটর-চালিত নাই-বা হল, নাহয় হল দিশি হাতে-দাঁড়-টানা?

অন্য স্বাধীন দেশের সঙ্গে আমাদের একটা মস্ত প্রভেদ আছে। সেখানে শিক্ষার পূর্ণতার জন্যে যারা দরকার বোঝে তারা বিদেশী ভাষা শেখে। কিন্তু, বিদ্যার জন্যে যেটুকু আবশ্যক তার বেশি তাদের না শিখলেও চলে। কেননা, তাদের দেশের সমস্ত কাজই নিজের ভাষায়। আমাদের দেশের অধিকাংশ কাজই ইংরেজি ভাষায়। যাঁরা শাসন করেন তাঁরা আমাদের ভাষা শিখতে, অন্তত যথেষ্ট পরিমাণে শিখতে, বাধ্য নন। পর্বত নড়েন না, কাজেই সচল মানুষকেই প্রয়োজনের গরজে পর্বতের দিকে নড়তে হয়। ইংরেজি ভাষা কেবল যে আমাদের জানতে হবে তা নয়, তাকে ব্যবহার করতে হবে। সেই ব্যবহার বিদেশী আদর্শে যতই নিখুঁত হবে সেই পরিমাণেই স্বদেশীদের এবং কর্তাদের কাছে আমাদের সমাদর। আমি একজন ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেটকে জানতুম ; তিনি বাংলা সহজেই পড়তে পারতেন। বাংলাসাহিত্যে তাঁর রুচির আমি প্রশংসা করবই ; কারণ, রবীন্দ্রনাথের রচনা তিনি পড়তেন এবং পড়ে আনন্দ পেতেন। একবার গ্রামবাসীদের এক সভায় তিনি উপস্থিত ছিলেন। গ্রামহিতৈষী বাঙালি বক্তাদের মধ্যে যা যা বক্তব্য ছিল বলা হলে পর ম্যাজিস্ট্রেটের মনে হল, গ্রামের লোককে বাংলায় কিছু বলা তাঁরও কর্তব্য। কোনো প্রকারে দশ মিনিট কর্তব্য পালন করেছিলেন। গ্রামের লোকেরা বাড়ি ফিরে গিয়ে আত্মীয়দের জানালো যে, সাহেবের ইংরেজি বক্তৃতা এইমাত্র তারা শুনে এসেছে। পরভাষা ব্যবহার সম্বন্ধে বিদেশীর কাছে খুব বেশি আশা না করলেও তাকে অসম্মান করা হয় না। ম্যাজিস্ট্রেট নিজেই জানতেন, তাঁর বাংলা-কথনের ভাষা এমন নয় যে, গৌড়জন আনন্দে যার অর্থবোধ করতে পারে সম্যক্। তাই নিয়ে তিনি হেসেও ছিলেন। আমরা হলে কিছুতেই হাসতে পারতুম না, ধরণীকে অনুনয় করতুম

দ্বিধা হতে। ইংরেজি সম্বন্ধে আমাদের বিদেশিত্বের কৈফিয়ত আত্মীয় বা অনাত্মীয়-সমাজে গ্রাহ্য হয় না। একদা বিশ্ববিখ্যাত জর্মন তত্ত্বজ্ঞানী অয়কেনের ইংরেজি বক্তৃতা শুনেছিলেম। আশা করি এ কথাটা অত্যুক্তি ব'লে মনে করবেন না যে, ইংরেজি শুনলে আমি বুঝতে পারি সেটা ইংরেজি। কিন্তু অয়কেনের ইংরেজি শুনে আমার ধাঁধা লেগেছিল। এ নিয়ে অয়কেনকে অবজ্ঞা করতে কেউ পারে নি। কিন্তু এ দশা আমার হলে কী হত সে কথা কল্পনা করলেও কর্ণমূল রক্তবর্ণ হয়ে ওঠে। বাবু-ইংলিশ নামে নিরতিশয় অবজ্ঞা-সূচক একটা শব্দ ইংরেজিতে আছে; কিন্তু ইংরেজি-বাংলা তার চেয়ে বহুগুণে বিকৃত হলেও ওটাকে অনিবার্য ব'লে মেনে নিই, অবজ্ঞা করতে পারি নে। আমাদের কারো ইংরেজিতে ত্রুটি হলে দেশের লোকের কাছে সেটা যেমন হসনীয় হয় এমন কোনো প্রহসন হয় না। সেই হাসির মধ্য থেকে পরাধীনতারই কলঙ্ক দেখা দেয় কালো হয়ে। যতদিন আমাদের এই দশা বহাল থাকবে ততদিন আমাদের শিক্ষাভিমানীকে কেবল যথেষ্ট ইংরেজি নয়, অতিরিক্ত ইংরেজি শিখতে হবে। তাতে যে অতিরিক্ত সময় লাগে সেই সময়টা যথোচিত শিক্ষার হিসাব থেকে কাটা যায়। তা হোক, অত্যাবশ্যকের চেয়ে অতিরিক্তকে যতদিন আমাদের মেনে চলতেই হবে ততদিন ইংরেজি-ভাষায়-পেটাই-করা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজাতীয় ভার আমাদের আগাগোড়াই বহন করা অনিবার্য। কেননা, ভালো ক'রে বাংলা শেখার দ্বারাতেই ভালো ক'রে ইংরেজি শেখার সহায়তা হতে পারে, এ কথা মনে করতে সাহস হবে না। গরজটা অতিশয় জরুরি, তাই মন বলতে থাকে, কী জানি! আমার সেই শিক্ষানেতা গুরুজনের মতো অভিভাবক বাংলাদেশে বেশি পাওয়া যাবে না, তাই বেশি দাবি ক'রে লাভ নেই। বাংলা-বিশ্ববিদ্যালয়ের একেশ্বরত্বের অধিকার আজ সহ্য হবে না। নূতন স্বাধীনতার দাবিকে পুরাতন অধীনতার সেফ্‌গার্ড্‌স্‌এর দ্বারা বেড়া তুলে দেবার আশ্বাস না দিতে পারলে সবটাই ফেঁসে যেতে পারে, এই আমার ভয়। তাই বলছি, আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিতরের দালানে বিদ্যার ভোজের যে আয়োজন চলছে তার রান্নাটা বিলিতি মসলায় বিলিতি ডেক্‌চিতে, তার আহারটা বিলিতি আসনে বিলিতি পাত্রেই চলুক; তার জন্যে প্রাণপণে আমরা যে মূল্য দিতে পারি তাতে ভূরিভোজের আশা করা চলবে না। যারা কার্ড পেয়েছে তারা ভিতর-মহলেই বসুক, আর যারা রবাহূত বাইরের আঙিনায় তাদের জন্যে পাত পেড়ে দেওয়া যাক-না। টেবিল পাতা নাই হল, কলাপাত পড়ুক।

বাংলাদেশে উচ্চশিক্ষাকে চিরকাল অথবা অতি দীর্ঘকাল পরান্নভোজী পরাবসথশায়ী হয়ে থাকতেই হবে, কেননা এ ভাষায় পাঠ্যপুস্তক নেই, এই কঠিন তর্ক তুললে একদা সেটা কথা-কাটাকাটির ঘূর্ণি হাওয়াতেই আবর্তিত হতে পারত; দূর দেশ ছাড়া কাছের পাড়া থেকে দৃষ্টান্ত আহরণ ক'রে ঐ উৎপাতটাকে শান্ত করা যেতে পারত না। আজ হাতের কাছেই সুযোগ মিলেছে।

ভারতের অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনায় দক্ষিণ হায়দ্রাবাদ বয়সে অল্প; সেইজন্যই বোধ করি তার সাহস বেশি, তা ছাড়া এ কথাও বোধ করি সেখানে স্বীকৃত হওয়া সহজ হয়েছে যে, শিক্ষাবিধানে কৃপণতা করার মতো নিজেকে ফাঁকি দেওয়া আর-কিছুই হতে পারে না। ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ে অবিচলিত নিষ্ঠার সহায়তায় আদ্যন্তমধ্যে উর্দু ভাষার প্রবর্তন হয়েছে। তারই প্রবল তাড়নায় ঐ ভাষায় পাঠ্যপুস্তক-রচনা প্রায় পরিপূর্ণ হয়ে উঠল। ইমারতও হল, সিঁড়িও হল, নীচে থেকে উপরে লোক-যাতায়াত চলছে। হতে পারে, সেখানে যথেষ্ট সুযোগ ও স্বাধীনতা ছিল। কিন্তু তবুও চারি দিকের প্রচলিত মত ও অভ্যাসের দুস্তর বাধা অতিক্রম ক'রে যিনি এমন মহৎ সংকল্পকে মনে এবং কাজের ক্ষেত্রে স্থান দিতে পেরেছেন সেই স্যর আকবর হয়্‌দরির সাহসকে

ধন্য বলি। বিনা দ্বিধায় জ্ঞানসাধনার দুর্গমতাকে তাঁদের মাতৃভাষার ক্ষেত্রে সমভূম করে দিয়ে উর্দুভাষীদের তিনি যে মহৎ উপকার করেছেন তার দৃষ্টান্ত যদি আমাদের মন থেকে সংশয় দূর এবং শিক্ষাসংস্কৃতির বিলম্বিত গতিকে ত্বরান্বিত করতে পারে তবে একদা আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় অন্য সকল সভ্য দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের সমপর্যায়ে দাঁড়িয়ে গৌরব করতে পারবে। নইলে প্রতিধ্বনি ধ্বনির সঙ্গে একই মূল্য দাবি করবে কোন্ স্পর্ধায়? বনস্পতির শাখায় যে পরগাছা ঝুলছে সে বনস্পতির সমতুল্য নয়।

বিদেশ থেকে যেখানে আমরা যন্ত্র কিনে এনে ব্যবহার করি সেখানে তার ব্যবহারে ভয়ে ভয়ে অক্ষরে অক্ষরে পুঁথি মিলিয়ে চলতে হয়, কিন্তু সজীব গাছের চারার মধ্যে তার আত্মচালনা-আত্মপরিবর্ধনার তত্ত্ব অনেক পরিমাণে ভিতরে ভিতরে কাজ করতে থাকে। যন্ত্র আমাদের স্বায়ত্ত হতে পারে, কিন্তু তাতে আমাদের স্বানুবর্তিতা থাকে না। স্বাধীন পরিচালনার ক্ষেত্রে যেখানে ন্যাশনল কলেজ গড়া হয়েছে, হিন্দু-বিশ্ববিদ্যালয়-স্থাপনায় যেখানে দেখা গেল অর্থব্যয় অজস্র হয়েছে, সেখানেও ছাঁচ-উপাসক আমরা ছাঁচের মুঠো থেকে আমাদের স্বাতন্ত্র্যকে কিছুতে ছাড়িয়ে নিতে পারছি নে। সেখানেও শুধু যে ইংরেজি য়ুনিভর্সিটির গায়ের মাপে ছেঁটেছুঁটে কুর্তি বানাচ্ছি তা নয়, ইংরেজের জমি থেকে তার ভাষাসুদ্ধ উপড়ে এনে দেশের চিত্তক্ষেত্রকে কোদালে কুড়ুলে ক্ষত বিক্ষত ক'রে বিরুদ্ধ ভূমিতে তাকে রোপণের গলদ্‌ঘর্ম চেষ্টা করছি; তাতে শিকড় না ছড়াচ্ছে চারি দিকে, না পৌঁচচ্ছে গভীরে।

বাংলাভাষার দোহাই দিয়ে যে শিক্ষার আলোচনা বারংবার দেশের সামনে এনেছি তার মূলে আছে আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা। যখন বালক ছিলেম, আশ্চর্য এই যে, তখন অবিমিশ্র বাংলাভাষায় শিক্ষা দেবার একটা সরকারি ব্যবস্থা ছিল। তখনো যে-সব স্কুলের রাস্তা ছিল কলকাতা য়ুনিভর্সিটির প্রবেশদ্বারের দিকে জৃম্ভিত, যারা ছাত্রদের আবৃত্তি করাচ্ছিল 'he is up তিনি হন উপরে', যারা ইংরেজি I সর্বনাম শব্দের ব্যাখ্যা মুখস্থ করাচ্ছিল 'I, by myself I', তাদের আহ্বানে সাড়া দিচ্ছিল সেই-সব পরিবারের ছাত্র যারা ভদ্রসমাজে উচ্চ পদবীর অভিমান করতে পারত। এদেরই দূর পার্শ্বে সংকুচিতভাবে ছিল প্রথমোক্ত শিক্ষাবিভাগ, ছাত্রবৃত্তির পোড়োদের জন্য। তারা কনিষ্ঠ অধিকারী, তাদের শেষ সদগতি ছিল 'নর্মাল স্কুল' নামধারী মাথা-হেঁট করা বিদ্যালয়ে। তাদের জীবিকার শেষ লক্ষ্য ছিল বাংলা-বিদ্যালয়ে স্বল্পসন্তুষ্ট বাংলা-পণ্ডিতি ব্যবসায়ে। আমার অভিভাবক সেই নর্মাল স্কুলের দেউড়ি-বিভাগে আমাকে ভর্তি করেছিলেন। আমি সম্পূর্ণ বাংলাভাষার পথ দিয়েই শিখেছিলেম ভূগোল, ইতিহাস, গণিত, কিছু-পরিমাণ প্রাকৃত বিজ্ঞান, আর সেই ব্যাকরণ যার অনুশাসনে বাংলাভাষা সংস্কৃতভাষার আভিজাত্যের অনুকরণে আপন সাধু ভাষার কৌলীন্য ঘোষণা করত। এই শিক্ষার আদর্শ ও পরিমাণ বিদ্যা হিসাবে তখনকার ম্যাট্রিকের চেয়ে কম দরের ছিল না। আমার বারো বৎসর বয়স পর্যন্ত ইংরেজি-বর্জিত এই শিক্ষাই চলেছিল। তার পরে ইংরেজি বিদ্যালয়ে প্রবেশের অনতিকাল পরেই আমি ইস্কুল-মাস্টারের শাসন হতে ঊর্ধ্বশ্বাসে পলাতক।

এর ফলে শিশুকালেই বাংলাভাষার ভাণ্ডারে আমার প্রবেশ ছিল অবারিত। সে ভাণ্ডারে উপকরণ যতই সামান্য থাক্, শিশুমনের পোষণ ও তোষণের পক্ষে যথেষ্ট ছিল। উপবাসী মনকে দীর্ঘকাল বিদেশী ভাষার চড়াই পথে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে দম হারিয়ে চলতে হয় নি, শেখার সঙ্গে বোঝার প্রত্যহ সাংঘাতিক মাথা-ঠোকাঠুকি না হওয়াতে আমাকে বিদ্যালয়ের হাঁসপাতালে মানুষ হতে হয় নি। এমন-কি, সেই কাঁচা বয়সে যখন আমাকে মেঘনাদবধ পড়তে হয়েছে তখন একদিন মাত্র আমার বাঁ গালে একটা বড়ো চড় খেয়েছিলুম, এইটেই একমাত্র অবিস্মরণীয় অপঘাত;

যতদূর মনে পড়ে মহাকাব্যের শেষ সর্গ পর্যন্তই আমার কানের উপরেও শিক্ষকের হস্তক্ষেপ ঘটে নি, অথবা, সেটা অত্যন্তই বিরল ছিল।

কৃতজ্ঞতার কারণ আরো আছে। মনের চিন্তা এবং ভাব কথায় প্রকাশ করবার সাধনা শিক্ষার একটি প্রধান অঙ্গ। অন্তরে বাহিরে দেওয়া-নেওয়ার এই প্রক্রিয়ার সামঞ্জস্যসাধনাই সুস্থ প্রাণের লক্ষণ। বিদেশী ভাষাই প্রকাশচর্চার প্রধান অবলম্বন হলে সেটাতে যেন মুখোশের ভিতর দিয়ে ভাবপ্রকাশের অভ্যাস দাঁড়ায়। মুখোশ-পরা অভিনয় দেখেছি; তাতে ছাঁচে-গড়া ভাবকে অবিচল করে দেখানো যায় একটা বাঁধা সীমানার মধ্যে, তার বাইরে স্বাধীনতা পাওয়া যায় না। বিদেশী ভাষার আবরণের আড়ালে প্রকাশের চর্চা সেই জাতের। একদা মধুসূদনের মতো ইংরেজি-বিদ্যায় অসামান্য পণ্ডিত এবং বঙ্কিমচন্দ্রের মতো বিজাতীয় বিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র এই মুখোশের ভিতর দিয়ে ভাব বাংলাতে চেষ্টা করেছিলেন; শেষকালে হতাশ হয়ে সেটা টেনে ফেলে দিতে হল।

রচনার সাধনা অমনিতেই সহজ নয়। সেই সাধনাকে পরভাষার দ্বারা ভারাক্রান্ত করলে চিরকালের মতো তাকে পঙ্গু করার আশঙ্কা থাকে। বিদেশী ভাষার চাপে বামন হওয়া মন আমাদের দেশে নিশ্চয়ই বিস্তর আছে। প্রথম থেকেই মাতৃভাষার স্বাভাবিক সুযোগে মানুষ হলে সেই মন কী হতে পারত আন্দাজ করতে পারি নে ব'লে, তুলনা করতে পারি নে।

যাই হোক, ভাগ্যবলে অখ্যাত নর্মাল স্কুলে ভর্তি হয়েছিলুম, তাই কচি বয়সে রচনা করা ও কুস্তি করাকে এক ক'রে তুলতে হয় নি; চলা এবং রাস্তা খোঁড়া ছিল না একসঙ্গে। নিজের ভাষায় চিন্তাকে ফুটিয়ে তোলা, সাজিয়ে তোলার আনন্দ গোড়া থেকেই পেয়েছি। তাই বুঝেছি মাতৃভাষায় রচনার অভ্যাস সহজ হয়ে গেলে তার পরে যথাসময়ে অন্য ভাষা আয়ত্ত ক'রে সেটাকে সাহসপূর্বক ব্যবহার করতে কলমে বাধে না; ইংরেজির অতিপ্রচলিত জীর্ণ বাক্যাবলী সাবধানে সেলাই ক'রে ক'রে কাঁথা বুনতে হয় না। ইস্কুল-পালানে অবকাশে যেটুকু ইংরেজি আমি পথে-পথে সংগ্রহ করেছি সেটুকু নিজের খুশিতে ব্যবহার করে থাকি; তার প্রধান কারণ, শিশুকাল থেকে বাংলাভাষায় রচনা করতে আমি অভ্যস্ত। অন্তত, আমার এগারো বছর বয়স পর্যন্ত আমার কাছে বাংলাভাষার কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল না। রাজসম্মানগর্বিত কোনো সুয়োরানী তাকে গোয়ালঘরের কোণে মুখ চাপা দিয়ে রাখে নি। আমার ইংরেজি-শিক্ষায় সেই আদিম দৈন্য সত্ত্বেও পরিমিত উপকরণ নিয়ে আমার চিত্তবৃত্তি কেবল গৃহিণীপনার জোরে ইংরেজিজানা ভদ্র সমাজে আমার মান বাঁচিয়ে আসছে; যা-কিছু ছেঁড়া-ফাটা, যা-কিছু মাপে খাটো, তাকে কোনোরকমে ঢেকে বেড়াতে পেরেছে। নিশ্চিত জানি তার কারণ, শিশুকাল থেকে আমার মনের পরিণতি ঘটেছে কোনো-ভেজাল-না-দেওয়া মাতৃভাষায়; সেই খাদ্যে খাদ্যবস্তুর সঙ্গে যথেষ্ট খাদ্যপ্রাণ ছিল, যে খাদ্যপ্রাণে সৃষ্টিকর্তা তাঁর জাদুমন্ত্র দিয়েছেন।

অবশেষে আমার নিবেদন এই যে, আজ কোনো ভগীরথ বাংলাভাষায় শিক্ষাস্রোতকে বিশ্ববিদ্যার সমুদ্র পর্যন্ত নিয়ে চলুন, দেশের সহস্র সহস্র মন মূর্খতার অভিশাপে প্রাণহীন হয়ে পড়ে আছে, এই সঞ্জীবনী ধারার স্পর্শে বেঁচে উঠুক, পৃথিবীর কাছে আমাদের উপেক্ষিত মাতৃভাষার লজ্জা দূর হোক, বিদ্যাবিতরণের অন্নসত্র স্বদেশের নিত্যসম্পদ হয়ে আমাদের আতিথ্যের গৌরব রক্ষা করুক।

জানি নে হয়তো অভিজ্ঞ ব্যক্তি বলবেন, এ কথাটা কাজের কথা নয়, এ কবিকল্পনা। তা হোক, আমি বলব, আজ পর্যন্ত কেজো কথায় কেবল জোড়াতাড়ার কাজ চলেছে, সৃষ্টি হয়েছে কল্পনার বলে।

ভাষণ : ফেব্রুয়ারি ১৯৩৬

আশ্রমের শিক্ষা

প্রাচীন ভারতের তপোবন জিনিসটার ঠিক বাস্তব রূপ কী তার ঐতিহাসিক ধারণা আজ সহজ নয়। তপোবনের যে প্রতিরূপ স্থায়ীভাবে আঁকা পড়েছে ভারতের চিত্তে ও সাহিত্যে সে হচ্ছে একটি কল্যাণময় কল্পমূর্তি, বিলাস-মোহমুক্ত প্রাণবান আনন্দের মূর্তি।

আধুনিক কালে জন্মেছি। কিন্তু, এই ছবি রয়ে গেছে আমারও মনে। বর্তমান যুগের বিদ্যায়তনে ভাবলোকের সেই তপোবনকে রূপলোকে প্রকাশ করবার জন্যে একদা কিছুকাল ধরে আমার মনে আগ্রহ জেগেছিল।

দেখেছি মনে মনে তপোবনের কেন্দ্রস্থলে গুরুকে। তিনি যন্ত্র নন, তিনি মানুষ— নিষ্ক্রিয়ভাবে মানুষ নন, সক্রিয়ভাবে ; কেননা মনুষ্যত্বের লক্ষ্য-সাধনেই তিনি প্রবৃত্ত। এই তপস্যার গতিমান ধারায় শিষ্যের চিত্তকে গতিশীল করে তোলা তাঁর আপন সাধনারই অঙ্গ। শিষ্যের জীবন প্রেরণা পায় তাঁর অব্যবহিত সঙ্গ থেকে। নিত্যজাগরূক মানব চিত্তের এই সঙ্গ জিনিসটি আশ্রমের শিক্ষার সব চেয়ে মূল্যবান উপাদান। তার সেই মূল্য অধ্যাপনার বিষয়ে নয়, উপকরণে নয়, পদ্ধতিতে নয়। গুরুর মন প্রতি মুহূর্তে আপনাকে পাচ্ছে বলেই আপনাকে দিচ্ছে। পাওয়ার আনন্দ সপ্রমাণ করছে নিজের সত্যতা দেওয়ার আনন্দেই।

একদা একজন জাপানি ভদ্রলোকের বাড়িতে ছিলাম, বাগানের কাজে ছিল তাঁর বিশেষ শখ। তিনি বৌদ্ধ, মৈত্রীর সাধক। তিনি বলতেন, 'আমি ভালোবাসি গাছপালা। তরুলতায় সেই ভালোবাসার শক্তি প্রবেশ করে, ওদের ফুলে ফলে জাগে সেই ভালোবাসারই প্রতিক্রিয়া।' বলা বাহুল্য, মানবচিত্তের মালীর সম্বন্ধে এ কথা সম্পূর্ণ সত্য। মনের সঙ্গে মন যথার্থভাবে মিলতে থাকলে আপনি জাগে খুশি। সেই খুশি সৃজনশক্তিশীল। আশ্রমের শিক্ষাদান এই খুশির দান। যাদের মনে কর্তব্যবোধ আছে কিন্তু সেই খুশি নেই, তাদের দোসরা পথ। গুরুশিষ্যের মধ্যে পরস্পরসাপেক্ষ সহজ সম্বন্ধকেই আমি বিদ্যাদানের প্রধান মাধ্যস্থ্য বলে জেনেছি।

আরো একটি কথা মনে ছিল। যে গুরুর অন্তরে ছেলেমানুষটি একেবারে শুকিয়ে কাঠ হয়েছে তিনি ছেলেদের ভার নেবার অযোগ্য। উভয়ের মধ্যে শুধু সামীপ্য নয়, আন্তরিক সাযুজ্য ও সাদৃশ্য থাকা চাই, নইলে দেনা-পাওনায় নাড়ীর যোগ থাকে না। নদীর সঙ্গে যদি প্রকৃত শিক্ষকের তুলনা করি তবে বলব, কেবল ডাইনে বাঁয়ে কতকগুলো বুড়ো বুড়ো উপনদীর যোগেই নদী পূর্ণ নয়। তার আদি ঝর্নার ধারাটি মোটা মোটা পাথরগুলোর মধ্যে হারিয়ে যায় নি। যিনি জাত-শিক্ষক ছেলেদের ডাক শুনলেই তাঁর ভিতরকার আদিম ছেলেটা আপনি বেরিয়ে আসে। মোটা গলার ভিতর থেকে উচ্ছ্বসিত হয় প্রাণে-ভরা কাঁচা হাসি। ছেলেরা যদি কোনো দিক থেকেই তাঁকে স্বশ্রেণীয় জীব বলে চিনতে না পারে, যদি মনে করে 'লোকটা যেন একটা প্রাগৈতিহাসিক মহাকায় প্রাণী', তবে নির্ভয়ে তাঁর কাছে হাত বাড়াতেই পারবে না। সাধারণত আমাদের গুরুরা সর্বদা নিজের প্রবীণতা অর্থাৎ নবীনের কাছ থেকে দূরবর্তিতা সপ্রমাণ করতে ব্যগ্র ; প্রায়ই ওটা সস্তায় কর্তৃত্ব করবার প্রলোভনে। ছেলেদের পাড়ায় চোপদার না নিয়ে এগোলে পাছে সম্ভ্রম নষ্ট হয় এই ভয়ে তাঁরা সতর্ক। তাঁদের সঙ্গে সঙ্গে ধ্বনি উঠছে 'চুপ চুপ' ; তাই পাকা শাখায় কচি শাখায় ফুল ফোটাবার ফল ফলাবার মর্মগত সহযোগ রুদ্ধ হয়ে থাকে ; চুপ করে যায় ছেলেদের চিত্তে প্রাণের ক্রিয়া।

আর-একটা কথা আছে। ছেলেরা বিশ্বপ্রকৃতির অত্যন্ত কাছের। আরামকেদারায় তারা আরাম চায় না, সুযোগ পেলেই গাছের ডালে তারা চায় ছুটি। বিরাট প্রকৃতির নাড়ীতে নাড়ীতে প্রথম

প্রাণের বেগ নিগূঢ়ভাবে চঞ্চল। শিশুর প্রাণে সেই বেগ গতিসঞ্চার করে। বয়স্কদের শাসনে অভ্যাসের দ্বারা যে-পর্যন্ত তারা অভিভূত না হয়েছে সে পর্যন্ত কৃত্রিমতার জাল থেকে মুক্তি পাবার জন্যে তারা ছটফট করে। আরণ্য ঋষিদের মনের মধ্যে ছিল চিরকালের অমর ছেলে। তাই কোনো বৈজ্ঞানিক প্রমাণের অপেক্ষা না রেখে তাঁরা বলেছিলেন, এই যা-কিছু সমস্তই প্রাণ হতে নিঃসৃত হয়ে প্রাণেই কম্পিত হচ্ছে। এ কি বের্গ্‌সঁ'এর বচন! এ মহান্ শিশুর বাণী। বিশ্বপ্রাণের স্পন্দন লাগতে দাও ছেলেদের দেহে মনে, শহরের বোবা কালা মরা দেয়ালগুলোর বাইরে।

তার পরে আশ্রমের প্রাত্যহিক জীবনযাত্রার কথা। মনে পড়ছে কাদম্বরীতে একটি বর্ণনা : তপোবনে আসছে সন্ধ্যা, গোষ্ঠে-ফিরে-আসা পাটল হোমধেনুটির মতো। শুনে মনে জাগে, সেখানে গোরু-চরানো, গোদোহন, সমিধ-কুশ-আহরণ, অতিথিপরিচর্যা, যজ্ঞবেদীরচনা আশ্রমবালক-বালিকাদের দিনকৃত্য। এই-সব কর্মপর্যায়ের দ্বারা তপোবনের সঙ্গে নিরন্তর মিলে যায় তাদের নিত্যপ্রবাহিত জীবনের ধারা। সহকারিতার সখ্যবিস্তারে আশ্রম হতে থাকে প্রতিক্ষণে আশ্রমবাসীদের নিজ হাতের রচনা। আমাদের আশ্রমে সতত-উদ্যমশীল এই কর্মসহযোগিতা কামনা করছি।

মানুষের প্রকৃতিতে যেখানে জড়তা আছে সেখানে প্রাত্যহিক জীবনযাত্রা কুশ্রী ও মলিন। স্বভাবের বর্বরতা সেখানে প্রকাশে বাধা পায় না। ধনীসমাজে আন্তরিক শক্তির অভাব থাকলেও বাহ্যিক উপকরণপ্রাচুর্যে কৃত্রিম উপায়ে এই দীনতাকে চাপা দিয়ে রাখা যায়। আমাদের দেশে প্রায় সর্বত্রই ধনীগৃহে সদর-অন্দরের প্রভেদ দেখলে এই প্রকৃতিগত তামসিকতা ধরা পড়ে।

নিজের চার দিককে নিজের চেষ্টায় সুন্দর সুশৃঙ্খল ও স্বাস্থ্যকর করে তোলার দ্বারা একত্র বাসের সতর্ক দায়িত্বের অভ্যাস বাল্যকাল থেকেই সহজ করা চাই। একজনের শৈথিল্য অন্যের অসুবিধা অস্বাস্থ্য ও ক্ষতির কারণ হতে পারে, এই বোধটি সভ্য জীবনযাত্রার ভিত্তিগত। সাধারণত আমাদের দেশের গার্হস্থ্যে এই বোধের ত্রুটি সর্বদাই দেখা যায়।

সহযোগিতার সভ্য নীতিকে প্রত্যহ সচেতন ক'রে তোলা আশ্রমের শিক্ষার প্রধান সুযোগ। সুযোগটিকে সফল করবার জন্যে শিক্ষার প্রথম পর্বে উপকরণ লাঘব অত্যাবশ্যক। একান্ত বস্তুপরায়ণ স্বভাবে প্রকাশ পায় চিত্তবৃত্তির স্থূলতা। সৌন্দর্য এবং সুব্যবস্থা মনের জিনিস। সেই মনকে মুক্ত করা চাই। কেবল আলস্য এবং অনৈপুণ্য থেকে নয়, বস্তুলুব্ধতা থেকেও। রচনাশক্তির আনন্দ ততই সত্য হয় যতই তা জড়বাহুল্যের বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারে। বাল্যকাল থেকেই ব্যবহারসামগ্রী সুনিয়ন্ত্রিত করবার আত্মশক্তিমূলক শিক্ষা আমাদের দেশে অত্যন্ত উপেক্ষিত হয়। সেই বয়সেই প্রতিদিন অল্প-কিছু উপকরণ, যা সহজে হাতের কাছে পাওয়া যায়, তাই দিয়েই সৃষ্টির আনন্দকে উদ্ভাবিত করবার চেষ্টা যেন নিরলস হতে পারে এবং সেইসঙ্গেই সাধারণের সুখ স্বাস্থ্য সুবিধা-বিধানের কর্তব্যে ছাত্রেরা যেন আনন্দ পেতে শেখে, এই আমার কামনা।

আপন পরিবেশের প্রতি ছেলেদের আত্মকর্তৃত্বচর্চাকে আমাদের দেশে অসুবিধাজনক আপদজনক ও ঔদ্ধত্য মনে ক'রে সর্বদা আমরা দমন করি। এতে ক'রে পরনির্ভরতার লজ্জা তাদের চলে যায়, পরের প্রতি আব্দার বেড়ে ওঠে, এমন-কি, ভিক্ষুকতার ক্ষেত্রেও তাদের অভিমান প্রবল হতে থাকে ; তারা আত্মপ্রসাদ পায় পরের ত্রুটি নিয়ে কলহ ক'রে। এই লজ্জাকর দীনতা চার দিকে সর্বদাই দেখা যাচ্ছে। এর থেকে মুক্তি পাওয়াই চাই।

মনে আছে ছাত্রদের প্রাত্যহিক কাজে যখন আমার যোগ ছিল তখন এক দল বয়স্ক ছাত্রদের পক্ষ থেকে আমার কাছে নালিশ এল যে, অন্নভরা বড়ো বড়ো ধাতুপাত্র পরিবেশনের সময় মেজের উপর দিয়ে টানতে টানতে তার তলা ক্ষয়ে গিয়ে ঘরময় নোংরামি ছড়িয়ে পড়ে। আমি

বললেম, 'তোমরা পাচ্ছ দুঃখ, অথচ তাকিয়ে আছ আমি এর প্রতিবিধান করব। এই সামান্য কথাটা তোমাদের বুদ্ধিতে আসছে না যে, ঐ পাত্রটার নীচে একটা বিড়ে বেঁধে দিলেই ঐ ঘর্ষণ থামে। চিন্তা করতে পার না তার একমাত্র কারণ, তোমরা এইটাই স্থির করে রেখেছ যে, নিষ্ক্রিয়ভাবে ভোক্তৃত্বের অধিকারই তোমাদের, আর কর্তৃত্বের অধিকার অন্যের। এতে আত্মসম্মান থাকে না।'

শিক্ষার অবস্থায় উপকরণের কিছু বিরলতা, আয়োজনের কিছু অভাব থাকাই ভালো অভ্যস্ত হওয়া চাই স্বল্পতায়। অনায়াসে-প্রয়োজন-জোগানের দ্বারা ছেলেদের মনটাকে আদুরে ক'রে তোলা তাদের নষ্ট করা। সহজেই তারা যে এত-কিছু চায় তা নয়। আমরাই বয়স্ক লোকের চাওয়াটা কেবলই তাদের উপর চাপিয়ে তাদেরকে বস্তুর নেশায় দীক্ষিত ক'রে তুলি। শরীরমনের শক্তির সম্যক্‌ চর্চা সেখানেই ভালো ক'রে সম্ভব যেখানে বাইরের সহায়তা অনতিশয়। সেখানে মানুষের আপনার সৃষ্টি-উদ্যম আপনি জাগে। যাদের না জাগে প্রকৃতি তাদেরকে আবর্জনার মতো ঝেঁটিয়ে ফেলে দেয়। আত্মকর্তৃত্বের প্রধান লক্ষণ সৃষ্টিকর্তৃত্ব। সেই মানুষই যথার্থ স্বরাট আপনার রাজ্য যে আপনি সৃষ্টি করে। আমাদের দেশে অতিলালিত ছেলেরা সেই স্বচেষ্টতার চর্চা থেকে প্রথম হতেই বঞ্চিত। তাই আমরা অন্যদের শক্ত হাতের চাপে নির্দিষ্ট নমুনামতো রূপ নেবার জন্যে কর্দমাক্ত ভাবে প্রস্তুত।

এই উপলক্ষে আর-একটা কথা বলবার আছে। গ্রীষ্মপ্রধান দেশে শরীরতন্তুর শৈথিল্য বা অন্য যে কারণেই হোক, আমাদের মানস প্রকৃতিতে ঔৎসুক্যের অত্যন্ত অভাব। একবার আমেরিকা থেকে জল-তোলা বায়ুচক্র আনিয়েছিলুম। আশা ছিল, প্রকাণ্ড এই যন্ত্রটার ঘূর্ণিপাখার চালনা দেখতে ছেলেদের আগ্রহ হবে। কিন্তু দেখলুম অতি অল্প ছেলেই ভালো ক'রে ওটার দিকে তাকালে। ওরা নিতান্তই আল্‌গা ভাবে ধরে নিলে, ওটা যা-হোক একটা জিনিস, জিজ্ঞাসার অযোগ্য।

নিরৌৎসুক্যই আন্তরিক নির্জীবতা। আজকের দিনে যে-সব জাতি পৃথিবীর উপর প্রভাব বিস্তার করেছে, সমস্ত পৃথিবীর সব-কিছুরই 'পরে তাদের অপ্রতিহত ঔৎসুক্য। এমন দেশ নেই, এমন কাল নেই, এমন বিষয় নেই, যার প্রতি তাদের মন ধাবিত না হচ্ছে। তাদের এই সজীব চিত্তশক্তি জয়ী হল সর্বজগতে।

পূর্বেই আভাস দিয়েছি, আশ্রমের শিক্ষা পরিপূর্ণভাবে বেঁচে থাকবার শিক্ষা। মরা মন নিয়েও পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীর ঊর্ধ্বশিখরে ওঠা যায়, আমাদের দেশে প্রত্যহ তার পরিচয় পাই। দেখা যায় অতি ভালো কলেজি ছেলেরা পদবী অধিকার করে, বিশ্ব অধিকার করে না। প্রথম থেকেই আমার সংকল্প ছিল আশ্রমের ছেলেরা চার দিকের অব্যবহিত-সম্পর্ক-লাভে উৎসুক হয়ে থাকবে ; সন্ধান করবে, পরীক্ষা করবে, সংগ্রহ করবে। এখানে এমন-সকল শিক্ষক সমবেত হবেন যাঁদের দৃষ্টি বইয়ের সীমানা পেরিয়ে ; যাঁরা চক্ষুষ্মান্‌, যাঁরা সন্ধানী, যাঁরা বিশ্বকুতূহলী, যাঁদের আনন্দ প্রত্যক্ষ জ্ঞানে।

সব-শেষে বলব যেটাকে সব চেয়ে বড়ো বলে মনে করি এবং যেটা সব চেয়ে দুর্লভ। তাঁরাই শিক্ষক হবার উপযুক্ত যাঁরা ধৈর্যবান। ছেলেদের প্রতি স্বভাবতই যাঁদের স্নেহ আছে এই ধৈর্য তাঁদেরই স্বাভাবিক। শিক্ষকদের নিজের চরিত্র সম্বন্ধে গুরুতর বিপদের কথা এই যে, যাদের সঙ্গে তাঁদের ব্যবহার তারা ক্ষমতায় তাঁদের সমকক্ষ নয়। তাদের প্রতি সামান্য কারণে বা কাল্পনিক কারণে অসহিষ্ণু হওয়া, তাদের বিদ্রূপ করা, অপমান করা, শাস্তি দেওয়া অনায়াসেই সম্ভব। দুর্বল পরজাতিকে শাসন করাই যাদের কাজ তারা যেমন নিজের অগোচরেও সহজেই অন্যায়প্রবণ হয়ে

ওঠে, এও তেমনি। ক্ষমতা-ব্যবহারের স্বাভাবিক যোগ্যতা যাদের নেই অক্ষমের প্রতি অবিচার করতে কেবল যে তাদের বাধা থাকে না তা নয়, তাতে তাদের আনন্দ। ছেলেরা অবোধ হয়ে দুর্বল হয়েই তাদের মায়ের কোলে আসে, এইজন্যে তাদের রক্ষার প্রধান উপায়—মায়ের মনে অপর্যাপ্ত স্নেহ। তৎসত্ত্বেও অসহিষ্ণুতা ও শক্তির অভিমান স্নেহকে অতিক্রম করেও ছেলেদের 'পরে অন্যায় অত্যাচারে প্রবৃত্ত করে, ঘরে ঘরে তার প্রমাণ পাই। ছেলেদের কঠিন দণ্ড ও চরম দণ্ড দেবার দৃষ্টান্ত যেখানে দেখা যায় প্রায়ই সেখানে মূলত শিক্ষকেরাই দায়ী। তাঁরা দুর্বলমনা বলেই কঠোরতা দ্বারা নিজের কর্তব্যকে সহজ করতে চান।

রাষ্ট্রতন্ত্রেই হোক আর শিক্ষাতন্ত্রেই হোক, কঠোর শাসননীতি শাসয়িতারই অযোগ্যতার প্রমাণ। শক্তস্য ভূষণং ক্ষমা। ক্ষমা যেখানে ক্ষীণ সেখানে শক্তিরই ক্ষীণতা।

আষাঢ় ১৩৪৩

ছাত্রসম্ভাষণ

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদবী-সম্মান-বিতরণের বার্ষিক অনুষ্ঠানে আজ আমি আহূত। আমার জীর্ণ শরীরের অপটুতা এই দায়িত্বভার গ্রহণের প্রতিকূল ছিল কিন্তু অদ্যকার একটি বিশেষ গৌরবের উপলক্ষ আমাকে সমস্ত বাধার উপর দিয়ে আকর্ষণ করে এনেছে। আজ বাংলাদেশের প্রথমতম বিশ্ববিদ্যালয় আপন ছাত্রদের মাঙ্গল্যবিধানের শুভকর্মে বাংলার বাণীকে বিদ্যামন্দিরের উচ্চ বেদীতে বরণ করেছেন। বহুদিনের শূন্য আসনের অকল্যাণ আজ দূর হল।

দুর্ভাগ্যদিনের সকলের চেয়ে দুঃসহ লক্ষণ এই যে, সেই দিনে স্বতঃস্বীকার্য সত্যকেও বিরোধের কণ্ঠে জানাতে হয়। এ দেশে অনেক কাল জানিয়ে আসতে হয়েছে যে, পরভাষার মধ্য দিয়ে পরিশ্রুত শিক্ষায় বিদ্যার প্রাণীন পদার্থ নষ্ট হয়ে যায়।

ভারতবর্ষ ছাড়া পৃথিবীর অন্য কোনো দেশেই শিক্ষার ভাষা এবং শিক্ষার্থীর ভাষার মধ্যে আত্মীয়তা-বিচ্ছেদের অস্বাভাবিকতা দেখা যায় না। য়ুরোপীয় বিদ্যায় জাপানের দীক্ষা এক শতাব্দীও পার হয়নি। তার বিদ্যারম্ভের প্রথম সূচনায় শিক্ষণীয় বিষয়গুলি অগত্যা বিদেশী ভাষাকে আশ্রয় করতে বাধ্য হয়েছিল। কিন্তু প্রথম থেকেই শিক্ষাবিধির একান্ত লক্ষ্য ছিল, স্বদেশী ভাষার অধিকারে স্বাধীন সঞ্চরণ লাভ করা। কেননা, যে বিদ্যাকে আধুনিক জাপান অভ্যর্থনা করেছিল সে কেবলমাত্র বিশেষ-সুযোগ-প্রাপ্ত সংকীর্ণ শ্রেণীবিশেষের অলংকারপ্রসাধনের সামগ্রী ব'লেই আদরণীয় হয়নি; নির্বিশেষে সমগ্র মহাজাতিকেই শক্তি দেবে, শ্রী দেবে ব'লেই ছিল তার আমন্ত্রণ। এইজন্যই এই শিক্ষার সর্বজনগম্যতা ছিল অত্যাবশ্যক। যে শিক্ষা ঈর্ষাপরায়ণ শক্তিশালী জাতিদের দস্যুবৃত্তি থেকে জাপানকে আত্মরক্ষায় সামর্থ্য দেবে, যে শিক্ষা নগণ্যতা থেকে উদ্ধার ক'রে মানবের মহাসভায় তাকে সম্মানের অধিকারী করবে, সেই শিক্ষার প্রসারসাধনচেষ্টায় অর্থে বা অধ্যবসায়ে সে লেশমাত্র কৃপণতা করেনি। সকলের চেয়ে অনর্থকর কৃপণতা, বিদ্যাকে বিদেশী ভাষার অন্তরালে দূরত্ব দান করা, ফসলের বড়োমাঠকে বাইরে শুকিয়ে রেখে টবের গাছকে আঙিনায় এনে জলসেচন করা। দীর্ঘকাল ধরে আমাদের প্রতি ভাগ্যের এই অবজ্ঞা আমরা সহজেই স্বীকার ক'রে এসেছি। নিজের সম্বন্ধে অশ্রদ্ধা শিরোধার্য করতে অভ্যস্ত হয়েছি ; জেনেছি যে,

সম্মুখবর্তী কয়েকটি মাত্র জনবিরল পঙ্‌ক্তিতে ছোটো হাতার মাপে ব্যয়কুণ্ঠ পরিবেশনকেই বলে দেশের এড়ুকেশন। বিদ্যাদানের এই অকিঞ্চিৎকরত্বকে পেরিয়ে যেতে পারে শিক্ষার এমন ঔদার্যের কথা ভাবতেই আমাদের সহস হয়নি, যেমন সাহারামরুবাসী বেদুয়িনরা ভাবতেই সাহস পায় না যে, দূরবিক্ষিপ্ত কয়েকটি ক্ষুদ্র ওয়েসিসের বাইরে ব্যাপক সফলতায় তাদের ভাগ্যের সম্মতি থাকতে পারে। আমাদের দেশে শিক্ষা ও অশিক্ষার মধ্যে যে প্রভেদ সে ঐ সাহারা ও ওয়েসিসেরই মতো, অর্থাৎ পরিমাণগত ভেদ এবং জাতিগত ভেদ। আমাদের দেশের রাষ্ট্রশাসন এক, কিন্তু শিক্ষার সংকোচ-বশত চিত্তশাসন এক হতে পারে নি। বর্তমান কালে চীন জাপান পারস্য আরব তুরস্কে প্রাচ্যজাতীয়দের মধ্যে এই ব্যর্থতাজনক আত্মবিচ্ছিন্নতার প্রতিকার হয়েছে, হয়নি কেবলমাত্র আমাদেরই দেশে।

প্রাণীবিবরণে দেখা যায়, একজাতীয় জীব আছে যারা পরাসক্ত হয়ে জন্মায়, পরাসক্ত হয়েই মরে। পরের অঙ্গীভূত হয়ে কেবল প্রাণধারণমাত্রে তাদের বাধা ঘটে না, কিন্তু নিজের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের পরিণতি ও ব্যবহারে তারা চিরদিনই থাকে পঙ্গু হয়ে। আমাদের বিদ্যালয়ের শিক্ষা সেই জাতীয়। আরম্ভ থেকেই এই শিক্ষা বিদেশী ভাষার আশ্রয়ে পরজীবী। একেবারেই যে তার পোষণ হয় না তা নয়, কিন্তু তার পূর্ণতা হওয়া অসাধ্য। আত্মশক্তিব্যবহারে সে যে পঙ্গু হয়ে আছে সে কথা সে আপনি অনুভব করতেও অক্ষম হয়ে পড়েছে, কেননা ঋণ করে তার দিন চলে যায়। গৌরব বোধ করে এই ঋণলাভের পরিমাণ হিসাব ক'রে। মহাজন-মহলে সে দাসখত লিখিয়ে দিয়েছে। যারা এই শিক্ষায় পার হল তারা যা ভোগ করে তা উৎপন্ন করে না। পরের ভাষায় পরের বুদ্ধি দ্বারা চিন্তিত বিষয়ের প্রশ্রয় পেতে স্বাভাবিক প্রণালীতে নিজে চিন্তা করবার, বিশ্লেষণ ও সংশ্লেষণ করবার আন্তরিক প্রেরণা ও সাহস তাদের দুর্বল হয়ে আসে। পরের কথিত বাণীর আবৃত্তি যতই যন্ত্রের মতো অবিকল হয় ততই তারা পরীক্ষায় কৃতার্থ হবার অধিকারী ব'লে গণ্য হতে থাকে। বলা বাহুল্য যে, পরাসক্ত মনকে এই চিরদৈন্য থেকে মুক্ত করবার একটা প্রধান উপায়, শিক্ষণীয় বিষয়কে শিশুকাল থেকে নিজের ভাষার ভিতর দিয়ে গ্রহণ করা ও প্রয়োগ করার চর্চা। কে না জানে, আহার্যকে আপন প্রাণের সামগ্রী ক'রে নেবার উপায় হচ্ছে ভোজ্যকে নিজের দাঁত দিয়ে চিবিয়ে নিজের রসনার রসে জারিয়ে নেওয়া?

এ প্রসঙ্গে এ কথা স্বীকার করা চাই যে, আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি ভাষার সম্মানের আসন বিচলিত হতে পারবে না। তার কারণ এ নয় যে, বর্তমান অবস্থায় আমাদের জীবনযাত্রায় তার প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য। আজকের দিনে য়ুরোপের জ্ঞানবিজ্ঞান সমস্ত মানবলোকের শ্রদ্ধা অধিকার করেছে, স্বাজাত্যের অভিমানে এ কথা অস্বীকার করলে অকল্যাণ। আর্থিক ও রাষ্ট্রিক ক্ষেত্রে আত্মরক্ষার পক্ষে এই শিক্ষার যেমন প্রয়োজন তেমনি মনকে ও ব্যবহারকে মূঢ়তামুক্ত করবার জন্য তার প্রভাব মূল্যবান্। যে চিত্ত এই প্রভাবকে প্রতিরোধ করে, এ'কে অঙ্গীকার ক'রে নিতে অক্ষম হয়, সে আপন সংকীর্ণ সীমাবদ্ধ নিরালোক জীবনযাত্রায় ক্ষীণজীবী হয়ে থাকে। যে জ্ঞানের জ্যোতি চিরন্তন তা যে-কোনো দিগন্ত থেকেই বিকীর্ণ হোক, অপরিচিত ব'লে তাকে বাধা দেয় বর্বরতার অস্বচ্ছ মন। সত্যের প্রকাশমাত্রই জাতিবর্ণনির্বিশেষে সকল মানুষের অধিকারগম্য; এই অধিকার মনুষ্যত্বের সহজাত অধিকারেরই অঙ্গ। রাষ্ট্রগত বা ব্যক্তিগত বিষয়সম্পদে মানুষের পার্থক্য অনিবার্য, কিন্তু চিত্তসম্পদের দানসত্রে সর্বদেশে সর্বকালে মানুষ এক। সেখানে দান করবার দাক্ষিণ্যেই দাতা ধন্য ও গ্রহণ করবার শক্তি দ্বারাই গ্রহীতার আত্মসম্মান। সকল দেশেই

অর্থভাণ্ডারের দ্বারে কড়া পাহারা, কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের জ্ঞানভাণ্ডারে সর্বমানবের ঐক্যের দ্বার অর্গলবিহীন। লক্ষ্মী কৃপণ; কারণ লক্ষ্মীর সঞ্চয় সংখ্যা-গণিতের সীমায় আবদ্ধ, ব্যয়ের দ্বারা তার ক্ষয় হতে থাকে। সরস্বতী অকৃপণ; কেননা, সংখ্যার পরিমাপে তাঁর ঐশ্বর্যের পরিমাপ নয়, দানের দ্বারা তার বৃদ্ধিই ঘটে। বোধ করি, বিশেষভাবে বাংলাদেশের এই গৌরব করবার কারণ আছে যে, য়ুরোপীয় সংস্কৃতির কাছ থেকে সে আপন প্রাপ্য গ্রহণ করতে বিলম্ব করে নি। এই সংস্কৃতির বাধাহীন সংস্পর্শে অতি অল্পকালের মধ্যে তার সাহিত্য প্রচুর শক্তি ও সম্পদ লাভ করেছে এ কথা সকলের স্বীকৃত। এই প্রভাবের প্রধান সার্থকতা এই দেখেছি যে, অনুকরণের দুর্বল প্রবৃত্তিকে কাটিয়ে ওঠবার উৎসাহ সে প্রথম থেকে দিয়েছে। আমাদের দেশে ইংরেজি শিক্ষার প্রথম যুগে যাঁরা বিদ্বান ব'লে গণ্য ছিলেন তাঁরা যদিচ পড়াশুনোয় চিঠিপত্রে কথাবার্তায় একান্তভাবেই ইংরেজি ভাষা ব্যবহারে অভ্যস্ত হয়েছিলেন, যদিচ তখনকার ইংরেজি-শিক্ষিত চিত্তে চিন্তার ঐশ্বর্য ভাবরসের আয়োজন মুখ্যত ইংরেজি প্রেরণা থেকেই উদ্ভাবিত, তবু সেদিনকার বাঙালি লেখকেরা এই কথাটি অচিরে অনুভব করেছিলেন যে দূরদেশী ভাষার থেকে আমরা বাতির আলো সংগ্রহ করতে পারি মাত্র, কিন্তু আত্মপ্রকাশের জন্য প্রভাত-আলো বিকীর্ণ হয় আপন ভাষায়। পরভাষার মদগর্বে আত্মবিস্মৃতির দিনে এই সহজ কথার নূতন আবিষ্কৃতির দুটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত দেখেছি আমাদের নবসাহিত্যসৃষ্টির উপক্রমেই। ইংরেজি ভাষায় ও সাহিত্যে মাইকেলের অধিকার ছিল প্রশস্ত, অনুরাগ ছিল সুগভীর। সেইসঙ্গে গ্রীক লাটিন আয়ত্ত ক'রে য়ুরোপীয় সাহিত্যের অমরাবতীতে তিনি আমন্ত্রিত হয়েছেন ও তৃপ্ত হয়েছেন সেখানকার অমৃতরসভোগে। স্বভাবতই প্রথমে তাঁর মন গিয়েছিল ইংরেজি ভাষায় কাব্য রচনা করতে। কিন্তু, এ কথা বুঝতে তাঁর বিলম্ব হয় নি যে ধার-করা ভাষায় সুদ দিতে হয় অত্যধিক, তার উদ্‌বৃত্ত থাকে অতি সামান্য। তিনি প্রথমেই মাতৃভাষায় এমন একটি কাব্যের আবাহন করলেন যে কাব্যে স্খলিতগতি প্রথমপদচারণার ভীরু সতর্কতা নেই। এই কাব্যে বাহিরের গঠনে আছে বিদেশী আদর্শ, অন্তরে আছে কৃত্তিবাসি বাঙালি কল্পনার সাহায্যে মিল্‌টন-হোমার-প্রতিভার অতিথিসংকার। এই আতিথ্যে অগৌরব নেই, এতে নিজের ঐশ্বর্যের প্রমাণ হয় এবং তার বৃদ্ধি হতে থাকে।

এই যেমন কাব্যসাহিত্যে মধুসূদন তেমনি আধুনিক বাংলা গদ্যসাহিত্যের পথমুক্তির আদিতে আছেন বঙ্কিমচন্দ্র। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বপ্রথম ছাত্রদের মধ্যে তিনি ছিলেন একজন বরণীয় ব্যক্তি। বলা বাহুল্য, তাঁর চিত্ত অনুপ্রাণিত হয়েছিল প্রধানভাবে ইংরেজি শিক্ষায়। ইংরেজি কথাসাহিত্য থেকে তিনি যে প্ররোচনা পেয়েছিলেন তাকে প্রথমেই ইংরেজি ভাষায় রূপ দিতে চেষ্টা করেছেন। সেই চেষ্টার অকৃতার্থতা বুঝতে তাঁর বিলম্ব হয়নি। কিন্তু, যেহেতু বিদেশী শিক্ষা থেকে তিনি যথার্থ সংস্কৃতি লাভ করেছিলেন তাই সেই সংস্কৃতিই তাঁকে আপন সার্থকতার সন্ধানে স্বদেশী ভাষায় টেনে এনেছিল। যেমন দূর গিরিশিখরের জলপ্রপাত যখন শৈলবক্ষ ছেড়ে প্রবাহিত হয় জনস্থানের মধ্য দিয়ে তখন দুইতীরবর্তী ক্ষেত্রগুলিকে ফলবান্ ক'রে তোলে তাদের নিজেরই ভূমি-উদ্ভিন্ন ফলশস্যে, তেমনি নূতন শিক্ষাকে বঙ্কিমচন্দ্র ফলবান্ ক'রে তুলেছেন নিজেরই ভাষাপ্রকৃতির স্বকীয় দানের দ্বারা। তার আগে বাংলাভাষায় গদ্যপ্রবন্ধ ছিল ইস্কুলে-পোড়োদের উপদেশের বাহন। বঙ্কিমের আগে বাঙালি শিক্ষিতসমাজ নিশ্চিত স্থির করেছিলেন যে, তাঁদের ভাবরস-ভোগের ও সত্যসন্ধানের উপকরণ একান্তভাবে য়ুরোপীয় সাহিত্য হতেই সংগ্রহ করা সম্ভব, কেবল অল্পশিক্ষিতদের ধাত্রীবৃত্তি করবার জন্যেই দরিদ্র বাংলাভাষার যোগ্যতা। কিন্তু

বঙ্কিমচন্দ্র ইংরেজি শিক্ষার পরিণত শক্তিকেই রূপ দিতে প্রবৃত্ত হলেন বাংলাভাষায় বঙ্গদর্শন মাসিক পত্রে। বস্তুত নবযুগপ্রবর্তক প্রতিভাবানের সাধনায় ভারতবর্ষে সর্বপ্রথমে বাংলাদেশেই য়ুরোপীয় সংস্কৃতির ফসল ভাবী কালের প্রত্যাশা নিয়ে দেখা দিয়েছিল, বিদেশ থেকে আনীত পণ্যআকারে নয়, স্বদেশের ভূমিতে উৎপন্ন শস্যসম্পদের মতো। সেই শস্যের বীজ যদি-বা বিদেশ থেকে উড়ে এসে আমাদের ক্ষেত্রে পড়ে থাকে তবু তার অঙ্কুরিত প্রাণ এখানকার মাটিরই। মাটি যাকে গ্রহণ করতে পারে সে ফসল বিদেশী হলেও আর বিদেশী থাকে না। আমাদের দেশের বহু ফলে ফুলে তার পরিচয় আছে।

ইংরেজি শিক্ষার সার্থকতা আমাদের সাহিত্যে বঙ্গীয় দেহ নিয়ে বিচরণ করছে বাংলার ঘরে ঘরে, এই প্রদেশের শিক্ষানিকেতনেও সে তেমনি আমাদের অন্তরঙ্গ হয়ে দেখা দেবে, এজন্য অনেক দিন আমাদের মাতৃভূমি অপেক্ষা করেছে।

বাংলার বিশ্ববিদ্যালয় আপন স্বাভাবিক ভাষায় স্বদেশে সর্বজনের আত্মীয়তালাভে গৌরবান্বিত হবে, সেই আশার সংকেত আজকের দিনের অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে প্রকাশ করার সুযোগ আমি পেয়েছি। তাই সমস্ত বাংলাদেশের গর্ব ও আনন্দ বহন ক'রে এই সভায় আজ আমার উপস্থিতি। নতুবা এখানে স্থান পাবার মতো প্রবেশিকার মূল্য দেওয়া আমার দ্বারা সাধ্য হয় নি। আমার জীবনে প্রথম বয়সে স্বল্পক্ষণস্থায়ী ছাত্রদশা কেটেছে অভ্রভেদী শিক্ষাসৌধের অধস্তন তলায়। তার পর কিশোরবয়সে অভিভাবকদের নির্দেশমতো একদিন সসংকোচে আমি প্রবেশ করেছিলুম বহিরঙ্গছাত্ররূপে প্রেসিডেন্সি কলেজের প্রথমবার্ষিক শ্রেণীতে। সেই এক দিন আর দ্বিতীয় দিনে পৌঁছল না। আকারে প্রকারে সমস্ত ক্লাসের সঙ্গে আমার এমন-কিছু ছন্দের ব্যত্যয় ছিল যাতে আমাকে দেখবামাত্র পরিহাস উঠল উচ্ছ্বসিত হয়ে। বুঝলুম মণ্ডলীর বাহির থেকে অসামঞ্জস্য নিয়ে এসেছি। পরের দিন থেকেই অনধিকার প্রবেশের দুঃসাহসিকতা থেকে বিরত হয়েছিলেম এবং আর যে কোনো দিন বিশ্ববিদ্যালয়ের চৌকাঠ পার হয়ে অধিকারীবর্গের এক পাশে স্থান পাব এমন দুরাশা আমার মনে ছিল না। অবশেষে একদিন মাতৃভাষার সাধনা-পুণ্যেই আজ সেই দুর্লভ অধিকার আমার মিলবে, সেদিন তা স্বপ্নের অতীত ছিল।

বর্তমান যুগ য়ুরোপীয় সভ্যতা-কর্তৃক সম্পূর্ণ অধিকৃত এ কথা মানতেই হবে। এই যুগ একটি বিশেষ উদ্যমশীল চিত্তপ্রকৃতির ভূমিকা সমস্ত জগতে প্রবর্তিত করছে। মানুষের বুদ্ধিগত জ্ঞানগত বিচিত্র চিন্তা ও কর্ম নব নব আকার নিচ্ছে এই ভূমিকার 'পরেই। বুদ্ধিপরিশীলনার বিশেষ গতি ও বিস্তৃতি সভ্য পৃথিবী জুড়ে সমস্ত মানুষের মধ্যেই একটা ঐক্যলাভে প্রবৃত্ত হয়েছে। বিজ্ঞান সাহিত্য ইতিহাস অর্থনীতি রাষ্ট্রনীতি প্রভৃতি সকল বিষয়ই এবং চিন্তা করবার পদ্ধতি, সন্ধান করবার প্রণালী, সত্য যাচাই করবার আদর্শ, য়ুরোপীয় চিত্তের ভূমিকার উপরে উদ্ভাবিত ও আলোচিত হচ্ছে। এটা সম্ভবপর হতই না, যদি এর উপযোগিতা সর্বত্র নিয়ত পরীক্ষার দ্বারা স্বীকৃত না হত, যদি-না এই চিত্ত জয়যুক্ত হত তার সর্বপ্রকার অধ্যবসায়ে। সংসারযাত্রার কৃতার্থতালাভের জন্য আজ পৃথিবীতে সকল নবজাগ্রত দেশই য়ুরোপের এই চিত্তস্রোতকে জনসাধারণের মধ্যে প্রবাহিত ক'রে দেবার চেষ্টায় অবিরাম প্রবৃত্ত। সর্বত্রই বিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলি প্রজাদের মনঃক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে নববিদ্যাসেচনের প্রণালী। এমন দেশও প্রত্যক্ষ দেখেছি নবযুগের প্রভাবে যে আজ বহু দীর্ঘ শতাব্দীর উপেক্ষা-সঞ্চিত স্তূপাকার নিরক্ষরতার বাধা অল্প কালের মধ্যে আশ্চর্য শক্তিতে উত্তীর্ণ হয়েছে; সেখানে যে জনমন একদা ছিল অখ্যাত

আকারে আত্মপ্রকাশহীন অকৃতিত্বে লুপ্তপ্রায় সে আজ অবারিত শক্তি নিয়ে মানবসমাজের পুরোভাগে সসম্মানে অগ্রসর। এ দিকে যথোচিত অর্থ-অভাবে শ্রদ্ধা-অভাবে উৎসাহ-অভাবে দীনসম্বল আমাদের দেশের বিদ্যানিকেতনগুলি স্বল্পপরিমিত ছাত্রদেরকে স্বল্পমাত্র বিদ্যায় পরীক্ষা পার করবার স্বল্পায়তন খেয়ানৌকোর কাজ করে চলেছে। দেশের আত্মচেতনাহারা বিরাট মনকে স্পর্শ করছে তার প্রান্ততম সীমায়; সে স্পর্শও ক্ষীণ, যেহেতু তা প্রাণবান নয়, যেহেতু সে স্পর্শ আসছে বহিঃস্থিত আবরণের বাধার ভিতর দিয়ে। এই কারণে প্রাচ্যমহাদেশের যে-যে অংশে নবদিনের উদ্‌বোধন দেখা দিয়েছে, জ্ঞানজ্যোতির্‌বিকীর্ণ আত্মপরিচয়ের সম্মান-লাভে তাদের সকলের থেকে বহুদূর পশ্চাতে আছে ভারতবর্ষ।

আমার এবং বাংলাদেশের লেখকবর্গের হয়ে আমি এ কথা বলব যে, আমরা নবযুগের সংস্কৃতিকে দেশের মর্মস্থানে প্রতিষ্ঠিত করবার কাজ করে আসছি। বর্তমান যুগের নতুন বিদ্যাকে দেশের প্রাণনিকেতনে চিরন্তন করবার এই স্বতঃসক্রিয় উদ্‌যোগকে অনেকদিন পর্যন্ত আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে আপন আমন্ত্রণক্ষেত্র থেকে পৃথক ক'রে রেখেছেন, তাকে ভিন্নজাতীয় ব'লে গণ্য করেছেন। আশুতোষ সর্বপ্রথমে এই বিচ্ছেদের মধ্যে সেতু বেঁধেছিলেন যখন তিনি আমার মতো বাংলাভাষাচর লেখককে বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাক্তার উপাধি দিতে সাহস করলেন। সেদিন যথেষ্ট সাহসের প্রয়োজন ছিল। কারণ, ইংরেজি ভাষা সম্পর্কে কৃত্রিম কৌলীন্যগর্ব আদিকাল থেকেই এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তরে অন্তরে সংস্কারগত হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু আশুতোষ বিশ্ববিদ্যালয়ের পরভাষাশ্রিত আভিজাত্য-বোধকে অকস্মাৎ আঘাত করতে কুণ্ঠিত হলেন না, বিশ্ববিদ্যালয়ের তুঙ্গ মঞ্চচূড়া থেকে তিনিই প্রথম নমস্কার প্রেরণ করলেন তাঁর মাতৃভাষার দিকে। তার পরে তিনিই বাংলাবিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাক্ষেত্রে বাংলাভাষার ধারাকে অবতরণ করলেন, সাবধানে তার স্রোতঃপথ খনন করে দিলেন। পিতৃনির্দিষ্ট সেই পথকে আজ প্রশস্ত ক'রে দিচ্ছেন তাঁর সুযোগ্য পুত্র বাংলাদেশের আশীর্ভাজন শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ। বিশ্ববিদ্যালয়ের দীক্ষামন্ত্র থেকে বঞ্চিত আমার মতো ব্রাত্য বাংলালেখককে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি দিয়ে আশুতোষ প্রথম রীতি লঙ্ঘন করেছেন; আজ তাঁরই পুত্র সেই ব্রাত্যকেই আজকের দিনের অনুষ্ঠানে বাংলাভাষায় অভিভাষণ পাঠ করতে নিমন্ত্রণ করে পুনশ্চ সেই রীতিরই দুটো গ্রন্থি একসঙ্গে মুক্ত করেছেন। এতে বোঝা গেল বাংলাদেশে শিক্ষাজগতে ঋতুপরিবর্তন হয়েছে, পাশ্চাত্য-আবহাওয়ার-শীতে আড়ষ্ট শাখায় আজ এল নবপল্লবের উৎসব।

অন্যত্র ভারতবর্ষে সম্প্রতি এমন বিশ্ববিদ্যালয় দেখা দিয়েছে যেখানে স্থানীয় প্রজাসাধারণের ভাষা না হোক, শ্রেণীবিশেষের ব্যবহৃত ভাষা শিক্ষার বাহনরূপে আদ্যোপান্ত গণ্য হয়েছে এবং সেখানকার প্রধানবর্গ এবং দুঃসাধ্য চেষ্টাকে আশ্চর্য সফলতা দিয়ে প্রশংসাভাজন হয়েছেন। এই অচিন্তিতপূর্ব সংকল্প এবং আশাতীত সিদ্ধিও কম গৌরবের বিষয় নয়। কিন্তু কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় যে সাধনায় প্রবৃত্ত হয়েছেন সমস্ত প্রদেশের প্রজাসাধারণ তার লক্ষ্য। বাংলাভাষার অধিকৃত এই প্রদেশের কোনো কোনো অঙ্গ যদিও শাসনকর্তাদের কাটারি দ্বারা কৃত্রিম বিভাগে বিক্ষত হয়ে বহিষ্কৃত হয়েছে তবু অন্তত পাঁচ কোটি লোকের মাতৃভাষাকে এই শিক্ষার কেন্দ্র আপন ভাষারূপে স্বীকার করবার ইচ্ছা ঘোষণা করেছেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় স্বদেশের প্রতি এই-যে সম্মান নিবেদন করলেন এর দ্বারা তিনি আজ সম্মাননীয়। যে শৌর্যবান পুরুষ স্বদেশের এই সৌভাগ্যের সূচনা করে গেছেন আজকের দিনে সেই আশুতোষের প্রতিও আমাদের সম্মান নিবেদন করি।

আমি জানি, য়ুরোপীয় শিক্ষা ও সভ্যতার মহত্ত্ব সম্বন্ধে সুতীব্র প্রতিবাদ জাগবার দিন আজ এসেছে। এই সভ্যতা বস্তুগত ধন-সঞ্চয়ে ও শক্তি-আবিষ্কারে অদ্ভুত দ্রুত গতিতে অগ্রসর হচ্ছে। কিন্তু সমগ্র মনুষ্যত্বের মহিমা তো তার বাহ্য রূপ এবং বাহ্য উপকরণ নিয়ে নয়। হিংস্রতা, লুব্ধতা, রাষ্ট্রিক কূটনীতির কুটিলতা পাশ্চাত্য মহাদেশ থেকে যে-রকম প্রচণ্ড মূর্তি ধ'রে মানুষের স্বাধিকারকে নির্মমভাবে দলন করতে উদ্যত হয়েছে ইতিহাসে এমন আর কোনো দিন হয় নি। মানুষের দুরাকাঙ্ক্ষাকে এমন বৃহৎ আয়তনে, এমন প্রভূত পরিমাণে, এমন সর্ববাধাজয়ী নৈপুণ্যের সঙ্গে জয়যুক্ত করতে কোনো দিন মানুষ সক্ষম হয় নি। আজ তা হতে পেরেছে বিশ্বপরাভবকারী বিজ্ঞানের জোরে। উনিশ শতকের আরম্ভে ও মাঝামাঝি কালে যখন য়ুরোপীয় সভ্যতার সঙ্গে আমাদের প্রথম পরিচয় হয়েছিল তখন ভক্তির সঙ্গে, আনন্দের সঙ্গে আমাদের মনে প্রবল ধারণা জন্মেছিল যে, এই সভ্যতা সর্বমানবের প্রতি অকৃত্রিম শ্রদ্ধা নিয়ে জগতে আবির্ভূত; নিশ্চিত স্থির করেছিলুম যে, সত্যনিষ্ঠা ন্যায়পরতা ও মানুষের সম্বন্ধে সুগভীর শ্রেয়োবুদ্ধি এর চরিত্রগত লক্ষণ; ভেবেছিলুম মানুষকে অন্তরে বাহিরে সর্বপ্রকার বন্ধন থেকে মুক্তি দেবার ব্রত এই সভ্যতা গ্রহণ করেছে। দেখতে দেখতে আমাদের জীবিতকালের মধ্যেই তার ন্যায়বুদ্ধি, তার মানবমৈত্রী এমনি ক্ষুণ্ণ হল, ক্ষীণ হল যে, বলদর্পিতের পেষণযন্ত্রে পীড়িত মানুষ এই সভ্যতার বিচার সভায় ধর্মের দোহাই দেবে এমন ভরসা আজ কোথাও রইল না। পাশ্চাত্য ভূখণ্ডের যে-সকল বিশ্ববিশ্রুত দেশ এই সভ্যতার প্রধান বাহন তারা পরস্পরকে ছিন্নবিচ্ছিন্ন করবার উদ্দেশ্যে পাশব নখদন্তের অদ্ভুত উৎকর্ষ সাধনে সমস্ত বুদ্ধি ও ঐশ্বর্যকে নিযুক্ত করেছে। মানুষের প্রতি মানুষের এমন অপরিসীম ভীতি, এমন দৃঢ়বদ্ধমূল অবিশ্বাস অন্য কোনো যুগেই দেখা যায় নি। মানবজগতের যে ঊর্ধ্বলোক থেকে আলোক আসে, মুক্তির মন্ত্র যেখানকার বাতাসে সঞ্চারিত হয়, মানবচিত্তের সেই দ্যুলোক রিপু-পদদলিত পৃথিবীর উৎক্ষিপ্ত ধূলিতে আবিল, সাংঘাতিক মারীবীজে নিবিড়ভাবে পরিপূর্ণ। ইতিপূর্বে পৃথিবীতে আমরা যে-সকল মহা মহা সভ্যতার পরিচয় পেয়েছি তাদের প্রধান সাধনা ছিল, মানবজগতের ঊর্ধ্বলোককে নির্মল রাখা, সেখানে পুণ্যজ্যোতির বিকিরণকে অবরোধমুক্ত করা। ধর্মের শাশ্বত নীতির প্রতি বিশ্বাস-হীন আজকের দিনে এই সাধনা অশ্রদ্ধাভাজন; সমস্ত পৃথিবীকে নিষ্ঠুর শক্তিতে অভিভূত করবার স্বাভাবিক দায়িত্ব নিয়ে এসেছে ব'লে যারা গর্ব করে এই সাধনা তাদের মতো শাসক ও শোষক জাতির পক্ষে অনুপযুক্ত ব'লে গণ্য। উগ্র লোভের তীব্র মাদকরস-পানে উন্মত্ত সভ্যতার পদভারে কম্পান্বিত সমস্ত পাশ্চাত্য মহাদেশ। যে শিক্ষায় কর্মবুদ্ধির সঙ্গে শুভবুদ্ধির এমন বিচ্ছেদ, যে সভ্যতা অসংযত মোহাবেশে আত্মহননোদ্যত, তার গৌরব ঘোষণা করব কোন্ মুখে!

কিন্তু একদিন মনুষ্যত্বের প্রতি সম্মান দেখেছি এই পাশ্চাত্যের সাহিত্যে ও ইতিহাসে। নিজেকে নিজেই সে আজ ব্যঙ্গ করলেও তার চিত্তের সেই উদার অভ্যুদয়কে মরীচিকা ব'লে অস্বীকার করতে পারি নে। তার উজ্জ্বল সত্তাই মিথ্যা এবং তার ম্লান বিকৃতিই সত্য, এ কথা বলব না।

সভ্যতার পদস্খলন ও আত্মখণ্ডন ঘটেছে বার বার, নিজের শ্রেষ্ঠ দানকে সে বার বার নিজে প্রত্যাখ্যান করেছে। এই দুর্ঘটনা দেখেছি আমাদের স্বদেশেও এবং অন্য দেশেও। দেখা গেছে, মানবমহিমার শোচনীয় পতন ইতহাসের পর্বে পর্বে। কিন্তু এই-সকল সভ্যতা যেখানে মহামূল্য সত্যকে কোনো দিন কোনো আকারে প্রকাশ করেছে সেইখান থেকেই সে চিরদিনের মতো জয়

করেছে মানুষের মনকে; জয় করেছে আপন বাহ্য প্রতাপের ধূলিশায়ী ভগ্নস্তূপের উপরে দাঁড়িয়েও। য়ুরোপ মহৎ শিক্ষার উপাদান উপহার দিয়েছে মানুষকে। দেবার শক্তি যদি না থাকত তা হলে কোনো কালেই তার বিশ্বজয়ের যুগ আসত না এ কথা বলা বাহুল্য। সে দিয়েছে আপন অদম্য শৌর্যের, অসংকুচিত আত্মত্যাগের দৃষ্টান্ত; দেখিয়েছে প্রাণান্তকর প্রয়াস জ্ঞান-বিতরণের কাজে, আরোগ্যসাধনের উদ্‌যোগে। আজও এই সাংঘাতিক অধঃপতনের দিনে য়ুরোপের শ্রেষ্ঠ যাঁরা নিঃসন্দেহই ন্যায়ের পক্ষে, দুর্বলের পক্ষে, দুঃশাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জাগিয়ে তাঁরা বলদৃপ্তের শাস্তিকে স্বীকার করছেন, দুঃখীর দুঃখকে আপন করে নিচ্ছেন। বারে বারে অকৃতার্থ হলেও তাঁরাই আশুপরাভবের মধ্য দিয়েও এই সভ্যতার প্রতিভূ। যে প্রেরণায় চারি দিকের কঠোর অত্যাচার ও চরিত্রবিকৃতির মধ্যে তাঁদের লক্ষ্যকে অবিচলিত রেখেছে সে প্রেরণাই এই সভ্যতার মর্মগত সত্য, তার থেকেই পৃথিবী শিক্ষা গ্রহণ করবে, পাশ্চাত্য জাতির লজ্জাজনক অমানুষিক আত্মাবমাননা থেকে নয়।

তোমরা যে-সকল তরুণ ছাত্র আজ এই সভায় উপস্থিত, যারা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিংহদ্বার দিয়ে জীবনের জয়যাত্রার পথে অগ্রসর হতে প্রস্তুত, তোমাদের প্রতি আমার অভিনন্দন জানাই। তোমরাই এই বিশ্ববিদ্যালয়ের নূতন গৌরবদিনের প্রভূত সফলতার প্রত্যাশা আগামীকালের পথে বহন করতে যাত্রা করছ।

আজ প্রচণ্ড আলোড়ন উঠেছে পৃথিবীব্যাপী জনসমুদ্রে। যেন সমস্ত সভ্যজগৎকে এক কল্প থেকে আর-এক কল্পের তটে উৎক্ষিপ্ত করবার জন্যে দেব-দৈত্যে মিলে মন্থন শুরু হয়েছে। এবারকারও মন্থনরজ্জু বিষধর সর্প, বহুফণাধারী লোভের সর্প। সে বিষ উদ্‌গার করছে। আপনার মধ্যে সমস্ত বিষটাকে জীর্ণ ক'রে নেবেন এমন মৃত্যুঞ্জয় শিব পাশ্চাত্য সভ্যতার মর্মস্থানে আসীন আছেন কি না এখনো তার প্রমাণ পাই নি। ভারতবর্ষে আমরা আদি কালের রুদ্রলীলাসমুদ্রের তটসীমায়। বর্তমান মানবসমাজের এই দুঃখের আন্দোলনে প্রত্যক্ষভাবে যোগ দেবার উপলক্ষ আমাদের ঘটে নি। কিন্তু, ঘূর্ণির টান বাহির থেকে আসছে আমাদের উপরে এবং ভিতরের থেকেও দুর্গতির ঢেউ আছাড় খেয়ে পড়ছে আমাদের দক্ষিণে বামে। সমস্যার পর দুঃসাধ্য সমস্যা এসে অভিভূত করছে দেশকে। সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে পরস্পর-বিচ্ছেদ ও বিরোধ নানা কদর্য মূর্তিতে প্রকাশিত হয়ে উঠল; বিকৃতি আনলে আমাদের আত্মকল্যাণবোধে। এই সমস্যার সমাধান সহজে হবার নয়, সমাধান না হলেও নিরবচ্ছিন্ন দুর্গতি।

সমস্ত দেশের সংস্কৃতি সৌভ্রাত্র সচ্ছলতা একদা বিকীর্ণ ছিল আমাদের গ্রামে। আজ সেখানে প্রবেশ করলে দেখতে পাবে, মরণদশা তার বুকে খরনখর বিদ্ধ করেছে একটা রক্তশোষী শ্বাপদের মতো। অনশন ও দুঃখদারিদ্র্যের সহচর মজ্জাগত মারী সমস্ত জাতির জীবনীশক্তিকে জীর্ণজর্জর ক'রে দিয়েছে। এর প্রতিকার কোথায় সে কথা ভাবতে হবে আমাদের নিজেকে— অশিক্ষিত কল্পনার দ্বারা নয়, ভাষাবিহ্বল দৃষ্টির বাষ্পাকুলতা দিয়ে নয়। এই পণ ক'রে চলতে হবে যে, পরাস্ত যদি হতেও হয় তবে সে যেন প্রতিকূল অবস্থার কাছে ভীরুর মতো হাল ছেড়ে দিয়ে নয়; যেন নির্বোধের মতো নির্বিচারে আত্মহত্যার মাঝদরিয়ায় ঝাঁপ দিয়ে পড়াকেই গর্বের বিষয় না মনে করি।

ভাবপ্রবণতা আছে আমাদের দেশে অতিপরিমাণে। কর্মোদ্‌যোগে নিজেকে অপ্রমত্তভাবে প্রবৃত্ত করতে আমাদের মন যায় না। অবাস্তবের মোহাবেশ কাটিয়ে পুরুষের মতো উজ্জ্বল বুদ্ধির

আলোকে দেশের সমস্ত অসম্পূর্ণতা মূঢ়তা কদর্যতা সব-কিছুকে অত্যুক্তিবর্জিত করে জেনে দৃঢ় সংকল্পের সঙ্গে দেশের দায়িত্ব গ্রহণ করো। যেখানে বাস্তবের ক্ষেত্রে ভাগ্য আমাদের প্রতিদিন বঞ্চিত করে অবমানিত করে, সেখানে ঘর-গড়া অহংকারে নিজেকে ভোলাবার চেষ্টা দুর্বল চিত্তের দুর্লক্ষণ। সত্যকার কাজ আরম্ভ করার মুখে এ কথা মানাই চাই যে, আমাদের সমাজে, আমাদের স্বভাবে, আমাদের অভ্যাসে, আমাদের বুদ্ধিবিকারে গভীরভাবে নিহিত হয়ে আছে আমাদের সর্বনাশ। যখনই আমাদের দুর্গতির সকল দায়িত্ব একমাত্র বাহিরের অবস্থার অথবা অপর কোনো পক্ষের প্রতিকূলতার উপর আরোপ ক'রে বধির শূন্যের অভিমুখে তারস্বরে অভিযোগ ঘোষণা করি তখনই হতাশ্বাস ধৃতরাষ্ট্রের মতো মন ব'লে ওঠে : তদা নাশংসে বিজয়ায় সঞ্জয়।

আজ আমাদের অভিযান নিজের অন্তর্নিহিত আত্মশত্রুতার বিরুদ্ধে; প্রাণপণ আঘাত হানতে হবে বহুশতাব্দীনির্মিত মূঢ়তার দুর্গভিত্তি-মূলে। আগে নিজের শক্তিকে তামসিকতার জড়িমা থেকে উদ্ধার করে নিয়ে তার পরে পরের শক্তির সঙ্গে আমাদের সম্মানিত সন্ধি হতে পারবে। নইলে আমাদের সন্ধি হবে ঋণের জালে, ভিক্ষুকতার জালে আষ্টেপৃষ্ঠে আড়ষ্টকর পাকে জড়িত। নিজের শ্রেষ্ঠতার দ্বারাই অন্যের শ্রেষ্ঠতাকে আমরা জাগাতে পারি, তাতেই মঙ্গল আমাদের ও অন্যের। দুর্বলের প্রার্থনা যে কুণ্ঠাগ্রস্ত দান সঞ্চয় করে সে দান শতছিদ্র ঘটের জল, যে আশ্রয় পায় চোরাবালিতে সে আশ্রয়ের ভিত্তি।—

হে বিধাতা,
দাও দাও মোদের গৌরব দাও
দুঃসাধ্যের নিমন্ত্রণে
দুঃসহ দুঃখের গর্বে।
টেনে তোলো রসাক্ত ভাবের মোহ হতে।
সবলে ধিক্কৃত করো দীনতার ধুলায় লুণ্ঠন।

দূর করো চিত্তের দাসত্ববন্ধ,
ভাগ্যের নিয়ত অক্ষমতা,
দূর করো মূঢ়তায় অযোগ্যের পদে
মানবমর্যাদা বিসর্জন,
চূর্ণ করো যুগে যুগে স্তূপীকৃত লজ্জারাশি
নিষ্ঠুর আঘাতে।

নিঃসংকোচে
মস্তক তুলিতে দাও
অনন্ত আকাশে
উদাত্ত আলোকে,
মুক্তির বাতাসে।

৫ ফাল্গুন ১৩৪৩

বাংলা শব্দতত্ত্ব

বাংলা শব্দতত্ত্ব

ভাষার কথা

পদ্মায় যখন পুল হয় নাই তখন এপারে ছিল চওড়া রেলপথ, ওপারে ছিল সরু। মাঝখানে একটা বিচ্ছেদ ছিল বলিয়া রেলপথের এই দ্বিধা আমাদের সহিয়াছিল। এখন সেই বিচ্ছেদ মিটিয়া গেছে তবু ব্যবস্থার কার্পণ্যের যখন অর্ধেক রাত্রে জিনিসপত্র লইয়া গাড়ি বদল করিতে হয় তখন রেলের বিধাতাকে দোষ না দিয়া থাকিতে পারি না।

ও তো গেল মানুষ এবং মাল চলাচলের পথ, কিন্তু ভাব চলাচলের পথ হইল ভাষা। কিছুকাল হইতে বাংলাদেশে এই ভাষায় দুই বহরের পথ চলিত আছে। একটা মুখের বুলির পথ, আর-একটা পুঁথির বুলির পথ। দুই-একজন সাহসিক বলিতে শুরু করিয়াছেন যে, পথ এক মাপের হইলে সকল পক্ষেই সুবিধা। অথচ ইহাতে বিস্তর লোকের অমত। এমন-কি তাঁরা এতই বিচলিত যে, সাধু ভাষার পক্ষে তাঁরা যে ভাষা প্রয়োগ করিতেছেন তাহাতে বাংলা ভাষায় আর যাই-হোক, সাধুতার চর্চা হইতেছে না।

এ তর্কে যদিও আমি যোগ দিই নাই তুব আমার নাম উঠিয়াছে। এ সম্বন্ধে আমার যে কী মত তাহা আমি ছাড়া আমার দেশের পনেরো-আনা লোকেই একপ্রকার ঠিক করিয়া লইয়াছেন, এবং যাঁর যা মনে আছে বলিতে কসুর করেন নাই। ভাবিয়াছিলাম চারি দিকের তাপটা কমিলে ঠাণ্ডার সময় আমার কথাটা পাড়িয়া দেখিব। কিন্তু বুঝিয়াছি সে আমার জীবিতকালের মধ্যে ঘটিবার আশা নাই। অতএব আর সময় নষ্ট করিব না।

ছোটোবেলা হইতেই সাহিত্য রচনায় লাগিয়াছি। বোধ করি সেইজন্যই ভাষাটা কেমন হওয়া উচিত সে সম্বন্ধে আমার স্পষ্ট কোনো মত ছিল না। যে-বয়সে লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলাম তখন, পুঁথির ভাষাতেই পুঁথি লেখা চাই, এ কথায় সন্দেহ করিবার সাহস বা বুদ্ধি ছিল না। তাই, সাহিত্য-ভাষার পথটা এই সরু বহরের পথ, তাহা যে প্রাকৃত বাংলা ভাষার চওড়া বহরের পথ নয়, এই কথাটা বিনা দ্বিধায় মনের মধ্যে পাকা হইয়া গিয়াছিল।

একবার যেটা অভ্যাস হইয়া যায় সেটাতে আর নাড়া দিতে ইচ্ছা হয় না। কেননা স্বভাবের চেয়ে অভ্যাসের জোর বেশি। অভ্যাসের মেঠো পথ দিয়া গাড়ির গোরু আপনিই চলে, গাড়োয়ান ঘুমাইয়া পড়িলেও ক্ষতি হয় না। কিন্তু ইহার চেয়ে প্রবল কারণ এই যে, অভ্যাসের সঙ্গে সঙ্গে একটা অহংকারের যোগ আছে। যেটা বরাবর করিয়া আসিয়াছি সেটার যে অন্যথা হইতে পারে এমন কথা শুনিলে রাগ হয়। মতের অনৈক্যে রাগারাগি হইবার প্রধান কারণই এই অহংকার। মনে আছে বহুকাল পূর্বে যখন বলিয়াছিলাম বাঙালির শিক্ষা বাংলা ভাষার যোগেই হওয়া উচিত তখন বিস্তর শিক্ষিত বাঙালি আমার সঙ্গে যে কেবল মতে মেলেন নাই তা নয় তাঁরা রাগ করিয়াছিলেন। অথচ এ জাতীয় মতের অনৈক্য ফৌজদারি দণ্ডবিধির মধ্যে পড়ে না। আসল কথা, যাঁরা ইংরাজি শিখিয়া মানুষ হইয়াছেন, তাঁরা বাংলা শিখিয়া মানুষ হইবার প্রস্তাব শুনিলেই যে উদ্ধত হইয়া ওঠেন, মূলে তার অহংকার।

একদিন নিজের স্বভাবেই ইহার পরিচয় পাইয়াছিলাম, সে কথাটা এইখানেই কবুল করি। পূর্বেই তো বলিয়াছি যে-ভাষা পুঁথিতে পড়িয়াছি সেই ভাষাতেই চিরদিন পুঁথি লিখিয়া হাত পাকাইলাম; এ লইয়া এপক্ষে বা ওপক্ষে কোনোপ্রকার মত গড়িয়া তুলিবার সময় পাই নাই। কিন্তু 'সবুজ পত্র'-সম্পাদকের বুদ্ধি নাকি তেমন করিয়া অভ্যাসের পাকে জড়ায় নাই এইজন্য তিনি ফাঁকায় থাকিয়া অনেকদিন হইতেই বাংলা সাহিত্যের ভাষা সম্বন্ধে একটা মত খাড়া করিয়াছেন।

বহুকাল পূর্বে তাঁর এই মত যখন আমার কানে উঠিয়াছিল আমার একটুও ভালো লাগে নাই। এমন-কি রাগ করিয়াছিলাম। নূতন মতকে পুরাতন সংস্কার অহংকার বলিয়া তাড়া করিয়া আসে, কিন্তু অহংকার যে পুরাতন সংস্কারের পক্ষেই প্রবল এ কথা বুঝিতে সময় লাগে। অতএব, প্রাকৃত বাংলাকে পুঁথির পঙ্‌ক্তিতে তুলিয়া লইবার বিরুদ্ধে আজকের দিনে যে-সব যুক্তি শোনা যাইতেছে সেগুলো আমিও একদিন আবৃত্তি করিয়াছি।

এক জায়গায় আমার মন অপেক্ষাকৃত সংস্কার-মুক্ত। পদ্য রচনায় আমি প্রচলিত আইন-কানুন কোনোদিন মানি নাই। জানিতাম কবিতায় ভাষা ও ছন্দের একটা বাঁধন আছে বটে, কিন্তু সে বাঁধন নূপুরের মতো, তাহা বেড়ির মতো নয়। এইজন্য কবিতার বাহিরের শাসনকে উপেক্ষা করিতে কোনোদিন ভয় পাই নাই।

'ক্ষণিকা'য় আমি প্রথম ধারাবাহিকভাবে প্রাকৃত বাংলা ভাষা ও প্রাকৃত বাংলার ছন্দ ব্যবহার করিয়াছিলাম। তখন সেই ভাষার শক্তি, বেগ ও সৌন্দর্য প্রথম স্পষ্ট করিয়া বুঝি। দেখিলাম এ ভাষা পাড়াগাঁয়ের টাট্টু ঘোড়ার মতো কেবলমাত্র গ্রাম্য-ভাবের বাহন নয়, ইহার গতিশক্তি ও বাহনশক্তি কৃত্রিম পুঁথির ভাষার চেয়ে অনেক বেশি।

বলা বাহুল্য 'ক্ষণিকা'য় আমি কোনো পাকা মত খাড়া করিয়া লিখি নাই, লেখার পরেও একটা মত যে দৃঢ় করিয়া চলিতেছি তাহা বলিতে পারি না। আমার ভাষা রাজাসন এবং রাখালী, মথুরা এবং বৃন্দাবন, কোনোটার উপরেই আপন দাবি সম্পূর্ণ ছাড়ে নাই। কিন্তু কোন্ দিকে তার অভ্যাসের টান এবং কোন্ দিকে অনুরাগের, সে বিচার পরে হইবে এবং পরে করিবে।

এইখানে বলা আবশ্যক চিঠিপত্রে আমি চিরদিন কথ্য ভাষা ব্যবহার করিয়াছি। আমার সতেরো বছর বয়সে লিখিত 'য়ুরোপ যাত্রীর পত্রে' এই ভাষা প্রয়োগের প্রমাণ আছে। তা ছাড়া বক্তৃতাসভায় আমি চিরদিন প্রাকৃত বাংলা ব্যবহার করি, 'শান্তিনিকেতন' গ্রন্থে তাহার উদাহরণ মিলিবে।

যাই হোক এ সম্বন্ধে আমার মনে যে তর্ক আছে সে এই— বাংলা গদ্য-সাহিত্যের সূত্রপাত হইল বিদেশীর ফরমাশে, এবং তার সূত্রধার হইলেন সংস্কৃত পণ্ডিত, বাংলা ভাষার সঙ্গে যাঁদের ভাসুর-ভাদ্রবউয়ের সম্বন্ধ। তাঁরা এ ভাষার কখনো মুখদর্শন করেন নাই। এই সজীব ভাষা তাঁদের কাছে ঘোমটার ভিতরে আড়ষ্ট হইয়া ছিল, সেইজন্য ইহাকে তাঁরা আমল দিলেন না। তাঁরা সংস্কৃত ব্যাকরণের হাতুড়ি পিটিয়া নিজের হাতে এমন একটা পদার্থ খাড়া করিলেন যাহার কেবল বিধিই আছে কিন্তু গতি নাই। সীতাকে নির্বাসন দিয়া যজ্ঞকর্তার ফরমাসে তাঁরা সোনার সীতা গড়িলেন।

যদি স্বভাবের তাগিদে বাংলা গদ্য-সাহিত্যের সৃষ্টি হইত, তবে এমন গড়াপেটা ভাষা দিয়া তার আরম্ভ হইত না। তবে গোড়ায় তাহা কাঁচা থাকিত এবং ক্রমে ক্রমে পাকা নিয়মে তার বাঁধন আঁট হইয়া উঠিত। প্রাকৃত বাংলা বাড়িয়া উঠিতে উঠিতে প্রয়োজনমতো সংস্কৃত ভাষার ভাণ্ডার হইতে আপন অভাব দূর করিয়া লইত।

কিন্তু বাংলা গদ্য-সাহিত্য ঠিক তার উলটা পথে চলিল। গোড়ায় দেখি তাহা সংস্কৃত ভাষা, কেবল তাহাকে বাংলার নামে চালাইবার জন্য কিছু সামান্য পরিমাণে তাহাতে বাংলার খাদ মিশাল করা হইয়াছে। এ একরকম ঠকানো। বিদেশীর কাছে এ প্রতারণা সহজেই চলিয়াছিল।

যদি কেবল ইংরেজকে বাংলা শিখাইবার জন্যই বাংলা গদ্যের ব্যবহার হইত, তবে সেই মেকি-বাংলার ফাঁকি আজ পর্যন্ত ধরা পড়িত না। কিন্তু এই গদ্য যতই বাঙালির ব্যবহারে আসিয়াছে ততই তাহার রূপ পরিবর্তন হইয়াছে। এই পরিবর্তনের গতি কোন্ দিকে? প্রাকৃত বাংলার দিকে। আজ পর্যন্ত বাংলা গদ্য, সংস্কৃত ভাষার বাধা ভেদ করিয়া, নিজের যথার্থ আকৃতি ও প্রকৃতি প্রকাশ করিবার জন্য যুঝিয়া আসিতেছে।

অল্প মূলধনে ব্যাবসা আরম্ভ করিয়া ক্রমশ মুনফার সঙ্গে সঙ্গে মূলধনকে বাড়াইয়া তোলা, ইহাই ব্যাবসার স্বাভাবিক প্রণালী। কিন্তু বাংলা-গদ্যের ব্যাবসা মূলধন লইয়া শুরু হয় নাই, মস্ত একটা দেনা লইয়া তার শুরু। সেই দেনাটা খোলসা করিয়া দিয়া স্বাধীন হইয়া উঠিবার জন্যই তার চেষ্টা।

আমাদের পুঁথির ভাষার সঙ্গে কথার ভাষার মিলন ঘটিতে এত বাধা কেন, তার কারণ আছে। যে গদ্যে বাঙালি কথাবার্তা কয় সে গদ্য বাঙালির মনোবিকাশের সঙ্গে তাল রাখিয়া চলিয়া আসিয়াছে। সাধারণত বাঙালি যে-বিষয় ও যে-ভাব লইয়া সর্বদা আলোচনা করিয়াছে বাংলার চলিত গদ্য সেই মাপেরই। জলের পরিমাণ যতটা, নদী-পথের গভীরতা ও বিস্তার সেই অনুসারেই হইয়া থাকে। স্বয়ং ভগীরথও আগে লম্বা-চওড়া পথ কাটিয়া তার পরে গঙ্গাকে নামাইয়া আনেন নাই।

বাঙালি যে ইতিপূর্বে কেবলই চাষবাস এবং ঘরকন্নার ভাবনা লইয়াই কাটাইয়াছে এ কথা সম্পূর্ণ সত্য নহে। কিন্তু ইতিপূর্বে তার চেয়ে বড়ো কথা যাঁরা চিন্তা করিয়াছেন তাঁরা বিশেষ সম্প্রদায়ে বদ্ধ। তাঁরা প্রধানত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের দল। তাঁদের শিক্ষা এবং ব্যাবসা, দুইয়েরই অবলম্বন ছিল সংস্কৃত পুঁথি। এইজন্য ঠিক বাংলা ভাষায় মনন করা বা মত প্রকাশ করা তাঁদের পক্ষে স্বাভাবিক ছিল না। তাই সেকালের গদ্য উচ্চ চিন্তার ভাষা হইয়া উঠিতে পারে নাই।

অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালেও আমাদের দেশে ভাষা ও চিন্তার মধ্যে এইরূপ দ্বন্দ্ব চলিয়া আসিয়াছে। যাঁরা ইংরেজিতে শিক্ষা পাইয়াছেন তাঁদের পক্ষে ইংরেজিতেই চিন্তা করা সহজ; বিশেষত যে-সকল ভাব ও বিষয় ইংরেজি হইতেই তাঁরা প্রথম লাভ করিয়াছেন সেগুলা বাংলা ভাষায় ব্যবহার করা দুঃসাধ্য। কাজেই আমাদের ইংরেজিশিক্ষা ও বাংলা ভাষা সদরে অন্দরে স্বতন্ত্র হইয়া বাস করিয়া আসিতেছে।

এমন সময় যাঁরা শিক্ষার সঙ্গে ভাষার মিল ঘটাইতে বসিলেন বাংলার চলিত গদ্য লইয়া কাজ চালানো তাঁদের পক্ষে অসম্ভব হইল। শুধু যদি শব্দের অভাব হইত তবে ক্ষতি ছিল না কিন্তু সব চেয়ে বিপদ এই যে, নতুন শব্দ বানাইবার শক্তি প্রাকৃত বাংলার মধ্যে নাই। তার প্রধান কারণ বাংলায় তদ্ধিত প্রত্যয়ের উপকরণ ও ব্যবহার অত্যন্ত সংকীর্ণ। 'প্রার্থনা' সংস্কৃত শব্দ, তার খাঁটি বাংলা প্রতিশব্দ 'চাওয়া'। 'প্রার্থিত' 'প্রার্থনীয়' শব্দের ভাবটা যদি ঐ খাঁটি বাংলায় ব্যবহার করিতে যাই তবে অন্ধকার দেখিতে হয়। আজ পর্যন্ত কোনো দুঃসাহসিক 'চায়িত' ও 'চাওনীয়' বাংলায় চালাইবার প্রস্তাব মাত্র করেন নাই। মাইকেল অনেক জায়গায় সংস্কৃত বিশেষ্যপদকে বাংলার ধাতুরূপের অধীন করিয়া নূতন ক্রিয়াপদে পরিণত করিয়াছেন। কিন্তু বাংলায় এ পর্যন্ত তাহা আপদ আকারেই রহিয়া গেছে, সম্পদরূপে গণ্য হয় নাই।

সংস্কৃত শব্দের সঙ্গে সঙ্গে তার তদ্ধিত প্রত্যয় পর্যন্ত লইতে গেলে সংস্কৃত ব্যাকরণেরও অনেকটা অংশ আপনি আসিয়া পড়ে। সুতরাং দুই নৌকায় পা দিবামাত্রই যে টানাটানি বাধিয়া যায় তাহা ভালো করিয়া সামলাইতে গেলে সাহিত্য-সার্কাসের মল্লগিরি করিতে হয়। তার পর হইতে এ তর্কের আর কিনারা পাওয়া যায় না যে, নিজের ক্ষেত্রে বাংলা ভাষার স্বাধীন অধিকার কতদূর এবং তাহাতে সংস্কৃত শাসনের সীমা কোথায়। সংস্কৃত বৈয়াকরণের উপর যখন জরিপ জমাবন্দীর ভার পড়ে তখন একেবারে বাংলার বাস্তুভিটার মাঝখানটাতে সংস্কৃত ব্যাকরণের খুঁটিগাড়ি হয়, আবার অপর পক্ষের উপর যখন ভার পড়ে তখন তাঁরা বাংলায় সংস্কৃত ব্যাকরণ বিভাগে একেবারে দক্ষযজ্ঞ বাধাইয়া দেন।

কিন্তু মুশকিলের বিষয় এই যে, যে-ভাষায় মল্লবিদ্যার সাহায্য ছাড়া এক-পা চলিবার জো নাই সেখানে সাধারণের পক্ষে পদে পদে অগ্রসর হওয়ার চেয়ে পদে পদে পতনের সম্ভাবনাই বেশি। পথটাই যেখানে দুর্গম সেখানে হয় মানুষের চলিবার তাগিদ থাকে না, নয় চলিতে হইলে পথ অপথ দুটোকেই সুবিধা অনুসারে আশ্রয় করিতে হয়। ঘাটে মাল নামাইতে হইলে যে দেশে মাশুলের দায়ে দেউলে হওয়ার কথা সে দেশে আঘাটায় মাল নামানোর অনুকূলে নিশ্চয়ই স্বয়ং বোপদের চোখ টিপিয়া ইশারা করিয়া দিতেন। কিন্তু বাঁশের চেয়ে কঞ্চি দড় ; বোপদেবের চেলারা যেখানে ঘাটি আগলাইয়া বসিয়া আছেন সেখানে বাংলা ভাষায় বাংলা-সাহিত্যের ব্যাবসা চালানো দুঃসাধ্য হইল।

জাপানিদের ঠিক এই বিপদ। চীনা ভাষার শাসন জাপানি ভাষার উপর অত্যন্ত প্রবল। তার প্রধান কারণ প্রাকৃত জাপানি প্রাকৃত বাংলার মতো ; নূতন প্রয়োজনের ফরমাশ জোগাইবার শক্তি তার নাই। সে শক্তি প্রাচীন চীনা ভাষার আছে। এই চীনা ভাষাকে কাঁধে লইয়া জাপানি ভাষাকে চলিতে হয়। কাউন্ট ওকুমা আমার কাছে আক্ষেপ করিয়া বলিতেছিলেন যে, এই বিষম পালোয়ানীর দায়ে জাপানি-সাহিত্যের বড়োই ক্ষতি করিতেছে। কারণ এ কথা বোঝা কঠিন নয় যে, যে-ভাষায় ভাবপ্রকাশ করাটাই একটা কুস্তিগিরি সেখানে ভাবটাকেই খাটো হইয়া থাকিতে হয়। যেখানে মাটি কড়া সেখানে ফসলের দুর্দিন। যেখানে শক্তির মিতব্যয়িতা, অসম্ভব শক্তির সদ্‌ব্যয়ও সেখানে অসম্ভব। যদি পণ্ডিতমশায়দের এই রায়ই পাকা হয় যে, সংস্কৃত ভাষায় মহামহোপাধ্যায় না হইলে বাংলা ভাষায় কলম ধরা ধৃষ্টতা, তবে যাঁদের সাহস আছে ও মাতৃভাষার উপর দরদ আছে, প্রাকৃত বাংলার জয়পতাকা কাঁধে লইয়া তাঁদের বিদ্রোহে নামিতে হইবে।

ইহার পূর্বেও 'আলালের ঘরের দুলাল' প্রভৃতির মতো বই বিদ্রোহের শাঁখ বাজাইয়াছিল কিন্তু তখন সময় আসে নাই। এখনি যে আসিল এ কথা বলিবার হেতু কী? হেতু আছে। তাহা বলিবার চেষ্টা করি।

ইংরেজি হইতে আমরা যা লাভ করিয়াছি যখন আমাদের দেশে ইংরেজিতেই তার ব্যাবসা চলিতেছিল তখন দেশের ভাষার সঙ্গে দেশের শিক্ষার কোনো সামঞ্জস্য ঘটে নাই। রামমোহন রায় হইতে শুরু করিয়া আজ পর্যন্ত ক্রমাগতই নূতন ভাব ও নূতন চিন্তা আমাদের ভাষার মধ্যে আনাগোনা করিতেছে। এমন করিয়া আমাদের ভাষা চিন্তার ভাষা হইয়া উঠিয়াছে। এখন আমরা ঘরে ঘরে মুখে মুখে যে-সব শব্দ নিরাপদে ব্যবহার করি তাহা আর পঁচিশ বছর পূর্বে করিলে দুর্ঘটনা ঘটিত। এখন আমাদের ভাষা-বিচ্ছেদের উপর সাঁড়া ব্রিজ বাঁধা হইয়াছে। এখন আমরা

মুখের কথাতেও নূতন পুরাতন সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার করি আবার পুঁথির ভাষাতেও এমন শব্দ চলিতেছে পূর্বে সাধু ভাষায় যাদের জল-চল ছিল না। সেইজন্যই পুঁথির ভাষায় ও মুখের ভাষায় সমান বহরের রেল পাতিবার যে-প্রস্তাব উঠিয়াছে, অভ্যাসের আরামে ও অহংকারে ঘা লাগিলেও সেটাকে একেবারে উড়াইয়া দিতে পারি না।

আসল কথা, সংস্কৃত ভাষা যে-অংশে বাংলা ভাষার সহায় সে-অংশে তাহাকে লইতে হইবে, যে-অংশে বোঝা সে-অংশে তাহাকে ত্যাগ করিতে হইবে। বাংলাকে সংস্কৃতের সন্তান বলিয়াই যদি মানিতে হয় তবে সেইসঙ্গে এ কথাও মানা চাই যে তার ষোলো বছর পার হইয়াছে, এখন আর শাসন চলিবে না, এখন মিত্রতার দিন। কিন্তু যতদিন বাংলা বইয়ের ভাষা চলিত ভাষার ঠাট না গ্রহণ করিবে ততদিন বাংলা ও সংস্কৃত ভাষার সত্য সীমানা পাকা হইতে পারিবে না। ততদিন সংস্কৃত বৈয়াকরণের বর্গির দল আমাদের লেখকদের ত্রস্ত করিয়া রাখিবেন। প্রাকৃত বাংলার ঠাটে যখন লিখিব তখন স্বভাবতই সুসংগতির নিয়মে সংস্কৃত ব্যাকরণের প্রভাব বাংলা ভাষার বেড়া ডিঙাইয়া উৎপাত করিতে কুণ্ঠিত হইবে।

পূর্বেই বলিয়াছি, বেড়ার ভিতরকার গাছ যেখানে একটু-আধটু ফাঁক পায় সেইখান দিয়াই আলোর দিকে ডালপালা মেলে, তেমনি করিয়াই বাংলার সাহিত্য-ভাষা সংস্কৃতের গরাদের ভিতর দিয়া, চল্‌তি ভাষার দিকে মাঝে মাঝে মুখ বাড়াইতে শুরু করিয়াছিল। তা লইয়া তাহাকে কম লোকনিন্দা সহিতে হয় নাই। এইজন্যই বঙ্কিমচন্দ্রের অভ্যুদয়ের দিনে তাঁকে কটুকথা অনেক সহিতে হইয়াছে। তাই মনে হয় আমাদের দেশে এই কটু কথার হাওয়াটাই বসন্তের দক্ষিণ হাওয়া। ইহা কুঞ্জবনকে নাড়া দিয়া তাড়া দিয়া অস্থির করিয়া দেয়। কিন্তু এই শাসনটা ফুলের কীর্তন পালার প্রথম খোলের চাঁটি।

পুঁথির বাংলার যে অংশটা লইয়া বিশেষভাবে তর্ক প্রবল, তাহা ক্রিয়ার রূপ। 'হইবে'র জায়গায় 'হবে', 'হইতেছে'র জায়গায় 'হচ্চে' ব্যবহার করিলে অনেকের মতে ভাষার শুচিতা নষ্ট হয়। চীনারা যখন টিকি কাটে নাই তখন টিকির খর্বতাকে তারা মানের খর্বতা বলিয়া মনে করিত। আজ যেই তাহাদের সকলের টিকি কাটা পড়িল অমনি তাহারা হাঁফ ছাড়িয়া বলিতেছে, আপদ গেছে। এক সময়ে ছাপার বহিতে 'হয়েন' লেখা চলিত, এখন 'হন' লিখিলে কেহ বিচলিত হন না। 'হইবা' 'করিবা'র আকার গেল, 'হইবেক' 'করিবেক'-এর কা খসিল, 'করহ' 'চলহ'র হ কোথায়? এখন 'নহে'র জায়গায় 'নয়' লিখিলে বড়ো কেহ লক্ষ্যই করে না। এখন যেমন আমরা 'কেহ' লিখি, তেমনি এক সময়ে ছাপার বইয়েও 'তিনি'র বদলে 'তেঁহ' লিখিত। এক সময়ে 'আমারদিগের' শব্দটা শুদ্ধ বলিয়া গণ্য ছিল, এখন 'আমাদের' লিখিতে কারো হাত কাঁপে না। আগে যেখানে লিখিতাম 'সেহ' এখন সেখানে লিখি 'সেও', অথচ পণ্ডিতের ভয়ে 'কেহ'কে 'কেও' অথবা 'কেউ' লিখিতে পারি না। ভবিষ্যৎবাচক 'করিহ' শব্দটাকে 'করিয়ো' লিখিতে সংকোচ করি না, কিন্তু তার বেশি আর একটু অগ্রসর হইতে সাহস হয় না।

এই তো আমরা পণ্ডিতের ভয়ে সতর্ক হইয়া চলি কিন্তু পণ্ডিত যখন পুঁথির বাংলা বানাইয়াছিলেন আমাদের কিছুমাত্র খাতির করেন নাই। বাংলা গদ্য-পুঁথিতে যখন তাঁরা 'যাইয়াছি' 'যাইল' কথা চালাইয়া দিলেন তখন তাঁরা ক্ষণকালের জন্যও চিন্তা করেন নাই যে, এই ক্রিয়াপদটি একেবারে বাংলাই নয়। যা ধাতু বাংলায় কেবলমাত্র বর্তমান কালেই চলে ; যথা, যাই, যাও, যায়। আর, 'যাইতে' শব্দের যোগে যে-সকল ক্রিয়াপদ নিষ্পন্ন হয় তাহাতেও চলে ; যেমন, 'যাচ্ছি'

'যাচ্ছিল' ইত্যাদি। কিন্তু 'যেল' 'যেয়েছি' 'যেয়েছিলুম' পণ্ডিতদের ঘরেও চলে না। এ স্থলে আমরা বলি 'গেল' 'গিয়েছি' 'গিয়েছিলুম'। তারপরে পণ্ডিতেরা 'এবং' বলিয়া এক অদ্ভুত অব্যয় শব্দ বাংলার স্কন্ধে চাপাইয়াছেন এখন তাহাকে ঝাড়িয়া ফেলা দায়। অথচ সংস্কৃত বাক্যরীতির সঙ্গে এই শব্দ ব্যবহারের যে মিল আছে তাও তো দেখি না। বরঞ্চ সংস্কৃত 'অপর' শব্দের আত্মজ যে 'আর' শব্দ সাধারণে ব্যবহার করিয়া থাকে তাহা শুদ্ধরীতিসংগত। বাংলায় 'ও' বলিয়া একটা অব্যয় শব্দ আছে তাহা সংস্কৃত অপি শব্দের বাংলা রূপ। ইহা ইংরেজি 'and' শব্দের প্রতিশব্দ নহে, too শব্দের প্রতিশব্দ। আমরা বলি আমিও যাব তুমিও যাবে— কিন্তু কখনো বলি না 'আমি ও তুমি যাব'। সংস্কৃতের ন্যায় বাংলাতেও আমরা সংযোজক শব্দ ব্যবহার না করিয়া দ্বন্দ্বসমাস ব্যবহার করি। আমরা বলি 'বিছানা বালিশ মশারি সঙ্গে নিয়ো'। যদি ভিন্ন শ্রেণীয় পদার্থের প্রসঙ্গ করিতে হয় তবে বলি 'বিছানা বালিশ মশারি আর বইয়ের বাক্সটা সঙ্গে নিয়ো'। এর মধ্যে 'এবং ' কিংবা 'ও' কোথাও স্থান পায় না। কিন্তু পণ্ডিতেরা বাংলা ভাষার ক্ষেত্রেও বাংলা ভাষার আইনকে আমল দেন নাই। আমি এই যে দৃষ্টান্তগুলি দেখাইতেছি তার মতলব এই যে, পণ্ডিতমশায় যদি সংস্কৃতরীতির উপর ভর দিয়া বাংলারীতিকে অগ্রাহ্য করিতে পারেন, তবে আমরাই বা কেন বাংলারীতির উপর ভর দিয়া যথাস্থানে সংস্কৃতরীতিকে লঙ্ঘন করিতে সংকোচ করি? 'মনোসাধে' আমাদের লজ্জা কিসের? 'সাবধানী' বলিয়া তখনি জিব কাটিতে যাই কেন? এবং 'আশ্চর্য হইলাম' বলিলে পণ্ডিতমশায় 'আশ্চর্যান্বিত হয়েন' কী কারণে?

আমি যে-কথাটা বলিতেছিলাম সে এই— যখন লেখার ভাষার সঙ্গে মুখের ভাষার অসামঞ্জস্য থাকে তখন স্বভাবের নিয়ম অনুসারেই এই দুই ভাষার মধ্যে কেবলই সামঞ্জস্যের চেষ্টা চলিতে থাকে। ইংরেজি-গদ্যসাহিত্যের প্রথম আরম্ভে অনেকদিন হইতেই এই চেষ্টা চলিতেছিল। আজ তার কথায় লেখায় সামঞ্জস্য ঘটিয়াছে বলিয়াই উভয়ে একটা সাম্যদশায় আসিয়াছে। আমাদের ভাষায় এই অসামঞ্জস্য প্রবল সুতরাং স্বভাব আপনি উভয়ের ভেদ ঘুচাইবার জন্য ভিতরে ভিতরে আয়োজন করিতেছিল। এমন সময় হঠাৎ আইনকর্তার প্রাদুর্ভাব হইল। তাঁরা বলিলেন লেখার ভাষা আজ যেখানে আসিয়া পৌঁছিয়াছে ইহার বেশি আর তার নড়িবার হুকুম নাই।

'সবুজ পত্র' সম্পাদক বলেন বেচারা পুঁথির ভাষার প্রাণ কাঁদিতেছে কথার ভাষার সঙ্গে মালা বদল করিবার জন্য। গুরুজন ইহার প্রতিবাদী। তিনি ঘটকালি করিয়া কৌলীন্যের নির্মম শাসন ভেদ করিবেন এবং শুভ বিবাহ ঘটাইয়া দিবেন— কারণ কথা আছে শুভস্য শীঘ্রং।

যাঁরা প্রতিবাদী তাঁরা এই বলিয়া তর্ক করেন যে, বাংলায় চলিত ভাষা নানা জিলায় নানা ছাঁচের, তবে কি বিদ্রোহীর দল একটা অরাজকতা ঘটাইবার চেষ্টায় আছে! ইহার উত্তর এই যে, যে যেমন খুশি আপন প্রাদেশিক ভাষায় পুঁথি লিখিবে, চলিত ভাষায় লিখিবার এমন অর্থ নয়। প্রথমত খুশিরও একটা কারণ থাকা চাই। কলিকাতার উপর রাগ করিয়া বীরভূমের লোক বীরভূমের প্রাদেশিক ভাষায় আপন বই লিখিবে এমন খুশিটাই তার স্বভাবত হইবে না। কোনো একজন পাগলের তা হইতেও পারে কিন্তু পনেরো-আনার তা হইবে না। দিকে দিকে বৃষ্টির বর্ষণ হয় কিন্তু জমির ঢাল অনুসারে একটা বিশেষ জায়গায় তার জলাশয় তৈরি হইয়া উঠে। ভাষারও সেই দশা। স্বাভাবিক কারণেই কলিকাতা অঞ্চলে একটা ভাষা জমিয়া উঠিয়াছে তাহা বাংলার সকল দেশের ভাষা। কলিকাতার একটা স্বকীয় অপভাষা আছে যাহাতে 'গেনু' 'করনু' প্রভৃতি ক্রিয়াপদ ব্যবহার হয় এবং 'ভেয়ের বে' (ভাইয়ের বিয়ে) 'চেলের দাম' (চালের দাম) প্রভৃতি

অপভ্রংশ প্রচলিত আছে, এ সে ভাষাও নয়। যদি বলো— তবে এই ভাষাকে কে সুনির্দিষ্ট করিয়া দিবে? তবে তার উত্তর এই যে, যে-সকল লেখক এই ভাষা ব্যবহার করিবেন তাঁদের যদি প্রতিভা থাকে তবে তাঁরা তাঁদের সহজ শক্তি হইতেই বাংলার এই সর্বজনীন ভাষা বাহির করিবেন। দান্তে নিজের প্রতিভাবলে প্রমাণ করিয়া দিয়াছেন ইটালির কোন্ প্রাদেশিক ভাষা ইটালির সর্বদেশের সর্বকালের ভাষা। বাংলার কোন্ ভাষাটি সেইরূপ বাংলার বিশ্বভাষা কিছুকাল হইতে আপনিই তার প্রমাণ চলিতেছে। বঙ্কিমের কাল হইতে এ পর্যন্ত বাংলার গদ্য-সাহিত্যে প্রাদেশিক ভাষার প্রাদুর্ভাব ঘটিতেছে বলিয়া কথা উঠিয়াছে কিন্তু সে কোন্ প্রাদেশিক ভাষা? তাহা ঢাকা অঞ্চলের নহে। তাহা কোনো বিশেষ পশ্চিম বাংলা প্রদেশেরও নয়। তাহা বাংলার রাজধানীতে সকল প্রদেশের মথিত একটি ভাষা। সকল ভদ্র ইংরেজের এক ভাষা যেমন ইংলন্ডের সকল প্রাদেশিক ভাষাকে ছাপাইয়া বিশ্বব্যাপী হইয়া উঠিয়াছে, এ-ও সেইরূপ। এ ভাষা এখনো তেমন সম্পূর্ণভাবে ছড়াইয়া পড়ে নাই বটে, কিন্তু সাহিত্যকে আশ্রয় করিলেই ইহার ব্যাপ্তির সীমা থাকিবে না। সমস্ত দেশের লোকের চিত্তের ঐক্যের পক্ষে কি ইহার কোনো প্রয়োজন নাই? শুধু কি পুঁথির ভাষার ঐক্যই একমাত্র ঐক্যবন্ধন? আর এ কথাও কি সত্য নয় যে, পুঁথির ভাষা আমাদের নিত্য ব্যবহারের ভাষা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকিলে তাহা কখনোই পূর্ণ শক্তি লাভ করিতে পারে না? যখন বঙ্গবিভাগের বিভীষিকায় আমাদের গায়ে কাঁটা দিয়াছিল তখন আমাদের ভয়ের একটা প্রধান কারণ ছিল এই যে এটা রাজনৈতিক ভূগোলের ভাগ নয়, ভাষার ভাগকে আশ্রয় করিয়া বাংলার পূর্ব-পশ্চিমে একটা চিত্তের ভাগ হইবে। সমস্ত বাংলাদেশের একমাত্র রাজধানী থাকাতে সেইখানে সমস্ত বাংলাদেশের একটি সাধারণ ভাষা আপনি জাগিয়া উঠিতেছিল। তাহা ফরমাশে গড়া কৃত্রিম ভাষা নহে, তাহা জীবনের সংঘাতে প্রাণলাভ করিয়া সেই প্রাণের নিয়মেই বাড়িতেছে। আমাদের পাকযন্ত্রে নানা খাদ্য আসিয়া রক্ত তৈরি হয়, তাহাকে বিশেষ করিয়া পাকযন্ত্রের রক্ত বলিয়া নিন্দা করা চলে না, তাহা সমস্ত দেহের রক্ত। রাজধানী জিনিসটা স্বভাবতই দেশের পাকযন্ত্র। এইখানে নানা ভাব, নানা বাণী এবং নানা শক্তির পরিপাক ঘটিতে থাকে এবং এই উপায়ে সমস্ত দেশ প্রাণ পায় ও ঐক্য পায়। রাগ করিয়া এবং ঈর্ষা করিয়া যদি বলি প্রত্যেক প্রদেশ আপন স্বতন্ত্র পাকযন্ত্র বহন করুক তবে আমাদের হাত-পা বুক-পিঠ বিধাতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়া বলিতে পারে আমাদের নিজের নিজের একটা করিয়া পাকযন্ত্র চাই। কিন্তু যতই রাগ করি আর তর্ক করি, সত্যের কাছে হার মানিতেই হয় এবং সেইজন্যই সংস্কৃত বাংলা আপনার খোলস ভাঙিয়া যে-ছাঁদে ক্রমশ প্রাকৃত বাংলার রূপ ধরিয়া উঠিতেছে সে-ছাঁদ ঢাকা বা বীরভূমের নয়। তার কারণ নানা প্রদেশের বাঙালি শিখিতে, আয় করিতে, ব্যয় করিতে, আমোদ করিতে, কাজ করিতে অনেক কাল হইতে কলিকাতায় আসিয়া জমা হইতেছে। তাহাদের সকলের সম্মিলনে যে এক-ভাষা গড়িয়া উঠিল তাহা ধীরে ধীরে বাংলার সমস্ত প্রদেশে ছড়াইয়া পড়িতেছে। এই উপায়ে, অন্য দেশে যেমন ঘটিয়াছে, তেমনি এখানেও একটি বিশেষ ভাষা বাংলাদেশের সমস্ত ভদ্রঘরের ভাষা হইয়া উঠিতেছে। ইহা কল্যাণের লক্ষণ। অবশ্য স্বভাবতই এই ভাষার ভূমিকা দক্ষিণ বাংলার ভাষায়। এইটুকু নম্রভাবে স্বীকার করিয়া না লওয়া সদ্‌-বিবেচনার কাজ নহে। ঢাকাতেই যদি সমস্ত বাংলার রাজধানী হইত তবে এতদিনে নিশ্চয়ই ঢাকার লোকভাষার উপর আমাদের সাধারণ ভাষার পত্তন হইত এবং তা লইয়া দক্ষিণ-পশ্চিম বাংলা যদি মুখ বাঁকা করিত তবে সে বক্রতা আপনিই সিধা হইয়া যাইত, মানভঞ্জনের জন্য অধিক সাধাসাধি করিতে হইত না।

এই যে বাংলাদেশের এক-ভাষা, আজকের দিনে যাহা অবাস্তব নহে, অথচ যাহাকে সাহিত্যে ব্যবহার করি না বলিয়া যাহার পরিচয় আমাদের কাছে সর্বাঙ্গসম্পূর্ণ হয় নাই, যখনি শক্তিশালী সাহিত্যিকেরা এই ভাষায় ভাব প্রকাশ করিবেন তখনি ইহা পরিব্যক্ত হইয়া উঠিবে, সেটাতে কেবল ভাষার উন্নতি নয়, দেশের কল্যাণ।

এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে একটা যে তর্ক আছে সেটা একটু ভাবিয়া দেখিতে হইবে। আমরা বাংলা-সাহিত্যে আজ যে-ভাষা ব্যবহার করিতেছি তার একটা বাঁধন পাকা হইয়া গেছে। অধিকাংশ লোকের পক্ষেই এই বাঁধনের প্রয়োজন আছে। নহিলে সাহিত্যে সংযম থাকে না। আবার শক্তি যাদের অল্প অসংযম তাদেরই বেশি। অতএব আমাদের যে চল্‌তি ভাষাকে সাহিত্যে নূতন করিয়া চালাইবার কথা উঠিয়াছে, তাহার আদব-কায়দা এখনো দাঁড়াইয়া যায় নাই। অতএব এ ক্ষেত্রে উচ্ছৃঙ্খল স্বেচ্ছাচারের আশঙ্কা যথেষ্ট আছে। বস্তুত বর্তমানে এই চল্‌তি ভাষার লেখা, পুঁথির ভাষার লেখার চেয়ে অনেক শক্ত। বিধাতার সৃষ্টিতে বৈচিত্র্য থাকিবেই, এইজন্য ভদ্রতা সকলের পক্ষে স্বাভাবিক নয়। তাই অন্তত প্রথাগত ভদ্রতার বিধি যদি পাকা না হয় তবে সমাজ অত্যন্ত কুশ্রী হইয়া উঠে। 'সবুজ পত্র'-সম্পাদকের শাসনে আজকের দিনে বাংলাদেশের সকল লেখকই যদি চল্‌তি ভাষায় সাহিত্য রচনা শুরু করিয়া দেয় তবে সর্বপ্রথমে তাঁকেই কানে হাত দিয়া দেশছাড়া হইতে হইবে এ কথা আমি লিখিয়া দিতে পারি। অতএব সুখের বিষয় এই যে, এখনি এই দুর্যোগের সম্ভাবনা নাই। নূতনকে যারা বহন করিয়া আনে তারা যেমন বিধাতার সৈনিক, নূতনের বিরুদ্ধে যারা অস্ত্র ধরিয়া খাড়া হইয়া উঠে তারাও তেমনি বিধাতারই সৈন্য। কেননা প্রথমেই বিধানের সঙ্গে লড়াই করিয়া নূতনকে আপন রাজ্য গ্রহণ করিতে হয় কিন্তু যতদিনে তার আপন বিধান পাকা না হইয়া উঠে ততদিনের অরাজকতা সামলাইবে কে?

এ কথা স্বীকার করিতেই হইবে সাহিত্যে আমরা যে-ভাষা ব্যবহার করি ক্রমে ক্রমে তার একটা বিশিষ্টতা দাঁড়াইয়া যায়। তার প্রধান কারণ সাহিত্যে আমাদিগকে সম্পূর্ণ করিয়া চিন্তা করিতে এবং তাহা সম্পূর্ণ করিয়া ব্যক্ত করিতে হয়, আমাদিগকে গভীর করিয়া অনুভব করিতে এবং তাহা সরস করিয়া প্রকাশ করিতে হয়। অর্থাৎ সাহিত্যের ক্ষেত্র প্রধানত নিত্যতার ক্ষেত্র। অতএব এই উদ্দেশ্যে ভাষাকে বাছিতে সাজাইতে এবং বাজাইতে হয়। এইজন্যই স্বভাবতই সাহিত্যের ভাষা মুখের ভাষার চেয়ে বিস্তীর্ণ এবং বিশিষ্ট হইয়া থাকে।

আমার কথা এই, প্রতিদিনের যে-ভাষার খাদে আমাদের জীবনস্রোত বহিতে থাকে, সাহিত্য আপন বিশিষ্টতার অভিমানে তাহা হইতে যত দূরে পড়ে ততই তাহা কৃত্রিম হইয়া উঠে। চির-প্রবাহিত জীবনধারার সঙ্গে সাহিত্যের ঘনিষ্ঠতা রাখিতে হইলে তাহাকে এক দিকে সাধারণ, আর-এক দিকে বিশিষ্ট হইতে হইবে। সাহিত্যের বিশিষ্টতা তার সাধারণতাকে যখন ছাড়িয়া চলে তখন তার বিলাসিতা তার শক্তি ক্ষয় করে। সকল দেশের সাহিত্যেরই সেই বিপদ। সকল দেশেই বিশিষ্টতার বিলাসে ক্ষণে ক্ষণে সাহিত্য কৃত্রিমতার বন্ধ্যদশায় গিয়া উত্তীর্ণ হয়। তখন তাহাকে আবার কুলরক্ষার লোভ ছাড়িয়া প্রাণরক্ষার দিকে ঝোঁক দিতে হয়। সেই প্রাণের খোরাক কোথায়? সাধারণের ভাষার মধ্যে, যেখানে বিশ্বের প্রাণ আপনাকে মুহূর্তে মুহূর্তে প্রকাশ করিতেছে। ইংরেজি সাহিত্যিক ভাষা প্রথমে পণ্ডিতের ভাষা ল্যাটিন এবং রাজভাষা ফরাসির একটা কৌলীন্য খিচুড়ি ছিল, তার পরে কুল ছাড়িয়া যখন সে সাধারণের ঘরে আশ্রয় লইল তখনি সে ধ্রুব হইল। কিন্তু তার পরেও বারে বারে সে কৃত্রিমতার দিকে ঝুঁকিয়াছে। আবার তাকে

প্রায়শ্চিত্ত করিয়া সাধারণের জাতে উঠিতে হইয়াছে। এমন-কি বর্তমান ইংরেজি সাহিত্যেও সাধারণের পথে সাহিত্যের এই অভিসার দেখিতে পাই। বার্নার্ড্ শ, ওয়েল্‌স্, বেনেট্, চেস্‌টর্টন্, বেলক প্রভৃতি আধুনিক লেখকগুলি হালকা চালের ভাষায় লিখিতেছেন।

আমাদের সাহিত্য যে-ভাষাবিশিষ্টতার দুর্গে আশ্রয় লইয়াছে সেখান হইতে তাহাকে লোকালয়ের ভাষার মধ্যে নামাইয়া আনিবার জন্য 'সবুজ পত্র'-সম্পাদক কোমর বাঁধিয়াছেন। তাঁর মত এই যে, সাহিত্য পদার্থটি আকারে সাধারণ এবং প্রকারে বিশিষ্ট— এই হইলেই সত্য হয়। এ কথা মানি। কিন্তু হিন্দুস্থানীতে একটা কথা আছে 'পয়লা সামাল্‌না মুশকিল হ্যয়'। স্বয়ং বিধাতাও মানুষ গড়িবার গোড়ায় বানর গড়িয়াছেন, এখনো তাঁর সেই আদিম সৃষ্টির অভ্যাস লোকালয়ে সদাসর্বদা দেখিতে পাওয়া যায়।

শান্তিনিকেতন
চৈত্র ১৩২৩

বঙ্গভাষা

বাংলা ভাষাতত্ত্ব যিনি আলোচনা করিতে চান, বীম্‌স্ সাহেবের তুলনামূলক ব্যাকরণ এবং হ্যর্নলে সাহেবের গৌড়ীয় ভাষার ব্যাকরণ তাঁহার পথ অনেকটা প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছে। তাঁহাদের গ্রন্থ হইতে দুটো-একটা ভুল-ত্রুটি বা স্খলন বাহির করা গৌড়ী-ভাষীদের পক্ষে অসম্ভব না হইতে পারে কিন্তু যথোচিত শ্রদ্ধা ভক্তি ও নম্রতার সহিত তাঁহাদিগকে গুরু বলিয়া স্বীকার না করিয়া থাকা যায় না।

সংসারে জড়পদার্থের রহস্য যথেষ্ট জটিল এবং দুর্গম, কিন্তু সজীব পদার্থের রহস্য একান্ত দুরূহ। ভাষা একটা প্রকাণ্ড সজীব পদার্থ। জীবনধর্মের নিগূঢ় নিয়মে তাহার বিচিত্র শাখাপ্রশাখা কত দিকে কতপ্রকার অভাবনীয় আকার ধারণ করিয়া ব্যাপ্ত হইতে থাকে তাহার অনুসরণ করিয়া উঠা অত্যন্ত কঠিন। বীম্‌স্ সাহেব, হ্যর্নলে সাহেব, হিন্দি ব্যাকরণকার কেলগ সাহেব, মৈথিলী ভাষাতত্ত্ববিৎ গ্রিয়র্সন সাহেব বিদেশী হইয়া ভারতবর্ষ-প্রচলিত আর্য ভাষার পথলুপ্ত অপরিচিত জটিল মহারণ্যতলে প্রবেশপূর্বক অশ্রান্ত পরিশ্রম এবং প্রতিভার বলে যে-সকল প্রচ্ছন্ন তথ্য উদ্ধার করিয়াছেন, তাহা লাভ করিয়া এবং বিশেষত তাঁহাদের আশ্চর্য অধ্যবসায় ও সন্ধানপরতার দৃষ্টান্ত দেখিয়া আমাদের স্বদেশী ভাষার সহিত সম্পর্কশূন্য স্বদেশহিতৈষী-আখ্যাধারীদের লজ্জা ও বিনতি অনুভব করা উচিত।

প্রাকৃত ভাষার সহিত বাংলার জন্মগত যোগ আছে সে-সম্বন্ধে দীনেশচন্দ্রবাবু ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল এবং ডাক্তার হ্যর্নলের সহিত একমত।

হ্যর্নলে সাহেব প্রমাণ করিয়াছেন, প্রাচীন ভারতবর্ষে কথিত প্রাকৃত ভাষা দুই প্রধান শাখায় বিভক্ত ছিল। শৌরসেনী ও মাগধী। মহারাষ্ট্রী লিখিত ভাষা ছিল মাত্র এবং প্রাকৃত ভাষা ভারতবর্ষীয় অনার্যদের মুখে বিকৃতিপ্রাপ্ত হইয়া যে-ভাষায় পরিণত হইয়াছিল তাহার নাম ছিল পৈশাচী।

প্রাচীন ব্যাকরণকারগণ যে-সকল ভাষাকে অপভ্রংশ ভাষা বলিতেন তাহাদের নাম এই : আভীরী (সিন্ধি, মাড়োয়ারি), আবন্তী (পূর্ব-রাজপুতানি), গৌর্জরী (গুজরাটি), বাহ্লিকা (পঞ্জাবি),

শৌরসেনী (পাশ্চাত্য হিন্দি), মাগধী অথবা প্রাচ্যা (প্রাচ্য হিন্দি), ওড্রী (উড়িয়া), গৌড়ী (বাংলা), দাক্ষিণাত্যা অথবা বৈদর্ভিকা (মারাঠি) এবং সৈপ্পলী (নেপালী?)।

উক্ত অপভ্রংশ তালিকার মধ্যে শৌরসেনী ও মাগধী নাম আছে কিন্তু মহারাষ্ট্রী নাম ব্যবহৃত হয় নাই। মহারাষ্ট্রী যে ভারতবর্ষীয় কোনো দেশ-বিশেষের কথিত ভাষা ছিল না তাহা হ্যর্নলে সাহেব প্রতিপন্ন করিয়াছেন। বিশেষত আধুনিক মহারাষ্ট্রদেশ-প্রচলিত ভাষার অপেক্ষা পাশ্চাত্য হিন্দি ভাষার সহিত তাহার ঘনিষ্ঠতর সাদৃশ্য আছে। প্রাকৃত নাটকে দেখা যায় শৌরসেনী গদ্যাংশে এবং মহারাষ্ট্রী পদ্যাংশে ব্যবহৃত হইয়া থাকে, ইহা হইতেও কতকটা প্রমাণ হয় মহারাষ্ট্রী সাহিত্য-ভাষা ছিল, কথায়-বার্তায় তাহার ব্যবহার ছিল না।

কিন্তু আমাদের মতে, ইহা হইতে প্রমাণ হয় না যে, মহারাষ্ট্রী কোনো কালেই কথিত ভাষা ছিল না এবং তাহা সাহিত্যকারদের রচিত কৃত্রিম ভাষা। সর্বদা ব্যবহারের ঘর্ষণে চলিত কথায় ভাষার প্রাচীন রূপ ক্রমশ পরিবর্তিত হইতে থাকে, কিন্তু কাব্যে তাহা বহুকাল স্থায়িত্ব লাভ করে। বাহিরের বিচিত্র সংস্রবে পুরুষসমাজে যেমন ভাষা এবং প্রথার যতটা দ্রুত রূপান্তর ঘটে অন্তঃপুরের স্ত্রীসমাজে সেরূপ ঘটে না— কাব্যেও সেইরূপ। আমাদের বাংলা কাব্যের ভাষায় তাহার অনেক দৃষ্টান্ত পাওয়া যাইবে।

বাংলা কাব্যে "ছিল" শব্দের স্থলে "আছিল", প্রথম পুরুষ "করিল" শব্দের স্থলে "করিলা", "তোমাদিগকে" স্থলে "তোমা সবে" প্রভৃতি যে-সকল রূপান্তর প্রচলিত আছে তাহাই যে কথিত বাংলার প্রাচীন রূপ ইহা প্রমাণ করা শক্ত নহে। এই দৃষ্টান্ত হইতেই সহজে অনুমান করা যায় যে, প্রাকৃত সাহিত্যে মহারাষ্ট্রী নামক পদ্য ভাষা শৌরসেনী অপভ্রংশ অপেক্ষা প্রাচীন আদর্শমূলক হওয়া অসম্ভব নহে।

পূর্বেই বলা হইয়াছে শৌরসেনী-অপভ্রংশ প্রাকৃত-সাহিত্যের গদ্য ভাষা। সাহিত্য-প্রচলিত গদ্য ভাষার সহিত কথিত ভাষার সর্বাংশে ঐক্য থাকে না তাহাও বাংলা ভাষা আলোচনা করিলে দেখা যায়। একটা ভাষা যখন বহুবিস্তৃত দেশে ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে তখন তাহা ভিন্ন ভিন্ন রূপ ধারণ করেই— কিন্তু লিখিবার ভাষা নিয়মে এবং স্থায়ী আকারে বদ্ধ হইয়া দেশান্তর ও কালান্তরের বিকৃত অনেকটা প্রত্যাখ্যানপূর্বক নানাস্থানীয় পণ্ডিতসাধারণের ব্যবহারযোগ্য ও বোধগম্য হইয়া থাকে, এবং তাহাই স্বভাবত ভদ্রসমাজের আদর্শ ভাষারূপে পরিণত হয়। চট্টগ্রাম হইতে ভাগলপুর এবং আসামের সীমান্ত হইতে বঙ্গসাগরের তীর পর্যন্ত বাংলা ভাষার বিচিত্ররূপ আছে সন্দেহ নাই কিন্তু সাহিত্য-ভাষায় স্বতই একটি স্থির আদর্শ রক্ষিত হইয়া থাকে। সুন্দররূপে, সুশৃঙ্খলরূপে, সংহতরূপে, গভীররূপে ও সূক্ষ্মরূপে ভাবপ্রকাশের অনুরোধে এ ভাষা যে কতক পরিমাণে কৃত্রিম হইয়া উঠে তাহাতে সন্দেহ নাই কিন্তু এই সাহিত্যগত ভাষাকেই ভিন্ন ভিন্ন প্রাদেশিক অপভাষার মূল আদর্শ বলিয়া ধরিয়া লইতে হইবে।

প্রাচীন ভারতবর্ষে এইরূপ এক দিকে মাগধী ও অন্য দিকে শৌরসেনী মহারাষ্ট্রী এই দুই মূল প্রাকৃত ছিল। অদ্য ভারতবর্ষে যত আর্য ভাষা আছে তাহা এই দুই প্রাকৃতের শাখাপ্রশাখা।

এই দুই প্রাকৃতের মধ্যে মাগধীই প্রাচীনতর। এমন-কি হ্যর্নলে সাহেবের মতে এক সময়ে ভারতবর্ষে মাগধীই একমাত্র প্রাকৃত ভাষা ছিল। তাহা পশ্চিম হইতে ক্রমে পূর্বাভিমুখে পরিব্যাপ্ত হয়। শৌরসেনী আর একটি দ্বিতীয় ভাষাপ্রবাহ ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়া পশ্চিমদেশ অধিকার করে। হ্যর্নলে সাহেব অনুমান করেন, ভারতবর্ষে পরে পরে দুইবার আর্য ঔপনিবেশিকগণ প্রবেশ করে। তাহাদের উভয়ের ভাষায় মূলগত ঐক্য থাকিলেও কতকটা প্রভেদ ছিল।

প্রাকৃত ব্যাকরণকারগণ নিম্নলিখিত ভাষাগুলিকে মাগধী প্রাকৃতের শাখারূপে বর্ণনা করিয়াছেন— মাগধী, অর্ধমাগধী, দাক্ষিণাত্যা, উৎকলী এবং শাবরী। বেহার এবং বাংলার ভাষাকে মাগধীরূপে গণ্য করা যায়। মাগধীর সহিত শৌরসেনী বা মহারাষ্ট্রী মিশ্রিত হইয়া অর্ধমাগধীরূপ ধারণ করিয়াছে— ইহা যে মগধের পশ্চিমের ভাষা অর্থাৎ ভোজপুরী তাহাতে সন্দেহ নাই। বিদর্ভ অর্থাৎ বেরার ও তাহার নিকটবর্তী প্রদেশের ভাষা দাক্ষিণাত্যা নামে অভিহিত। অতএব ইহাই বর্তমান মরাঠীস্থানীয়। উৎকলী উড়িষ্যার ভাষা, এবং এক দিকে দাক্ষিণাত্যা ও অন্য দিকে মাগধী ও উৎকলীর মাঝখানে শাবরী।

দেখা যাইতেছে, প্রাচ্য হিন্দি, মৈথিলী, উড়িয়া, মহারাষ্ট্রী এবং আসামি এইগুলিই বাংলার স্বজাতীয় ভাষা। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, কাফিরিস্থানের কাফিরি ভাষা এবং আফগানিস্থানের পুশতু মাগধী প্রাকৃতের লক্ষণাক্রান্ত, এবং সে হিসাবে বাংলার কুটুম্বশ্রেণীয়। শৌরসেনী প্রাকৃত মাঝে পড়িয়া মাগধী প্রাকৃতের বিস্তারকে খণ্ডীকৃত করিয়া দিয়াছে।

এক্ষণে বাংলার ভাষাতত্ত্ব প্রকৃতরূপে নিরূপণ করিতে হইলে প্রাকৃত, পালি, প্রাচ্য হিন্দি, মৈথিলী, আসামি, উড়িয়া এবং মহারাষ্ট্রী ব্যাকরণ পর্যালোচনা ও তুলনা করিতে হয়।

কথাটা শুনিতে কঠিন, কিন্তু বাংলার ভাষাতত্ত্ব নির্ণয় জীবনের একটা প্রধান আলোচ্য বিষয়রূপে গণ্য করিয়া লইলে এবং প্রত্যহ অন্তত দুই-এক ঘণ্টা নিয়মিত কাজ করিয়া গেলে এ কার্য একজনের পক্ষে অসাধ্য হয় না। বিশেষত উক্ত ভাষাকয়টির তুলনামূলক এবং স্বতন্ত্র ব্যাকরণ অনেকগুলিই পাওয়া যায়। এবং এইরূপ সম্পূর্ণ একাগ্রতা ও অধ্যবসায়ের গুটিকতক দৃষ্টান্ত না থাকিলে আমাদের বঙ্গসাহিত্য যথোচিত গৌরব লাভ করিতে পারিবে না।

বাংলার ভাষাতত্ত্ব-সন্ধানের একটি ব্যাঘাত, প্রাচীন পুঁথির দুষ্প্রাপ্যতা। কবিকঙ্কণচণ্ডী, রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি প্রাচীন কাব্যগুলি জনসাধারণের সমাদৃত হওয়াতে কালে কালে অল্পে অল্পে পরিবর্তিত ও সংশোধিত হইয়া আসিয়াছে। প্রাচীন আদর্শ পুঁথি কোনো এক পুস্তকালয়ে যথাসম্ভব সংগৃহীত থাকিলে অনুসন্ধিৎসুর পক্ষে সুবিধার বিষয় হয়। সাহিত্য-পরিষদের অধিকারে এইরূপ একটি পুস্তকালয় স্থাপিত হইতে পারিবে ইহাই আমরা আশা করি।...

বৈশাখ ১৩০৫

বাংলা ব্যাকরণের তির্যকরূপ

মারাঠি হিন্দি প্রভৃতি অধিকাংশ গৌড়ীয় ভাষায় শব্দকে আড় করিয়া বলিবার একটা প্রথা আছে। যেমন হিন্দিতে 'কুত্তা' সহজরূপ, 'কুত্তে' বিকৃতরূপ। 'ঘোড়া' সহজরূপ, 'ঘোড়ে' বিকৃতরূপ। মারাঠিতে ঘর ও ঘরা, বাপ ও বাপা, জিভ ও জিভে ইহার দৃষ্টান্ত।

এই বিকৃতরূপকে ইংরেজি পারিভাষিকে oblique form বলা হয়; আমরা তাহাকে তির্যকরূপ নাম দিব।

অন্যান্য গৌড়ীয় ভাষার ন্যায় বাংলা ভাষাতেও তির্যকরূপের দৃষ্টান্ত আছে।

যেমন বাপা, ভায়া (ভাইয়া), চাঁদা, লেজা, ছাগলা, পাগলা, গোরা, কালা, আমা, তোমা, কাগাবগা (কাকবক), বাদলা, বামনা, কোণা ইত্যাদি।

সম্ভবত প্রাচীন বাংলায় এই তির্যক্‌রূপের প্রচলন অধিক ছিল। তাহা নিম্নে উদ্‌ধৃত প্রাচীন বাক্য হইতে বুঝা যাইবে।

'নরা গজা বিশে শয়।'

'গণ' শব্দের তির্যক্‌রূপ 'গণা' কেবলমাত্র 'গণাগুষ্টি' শব্দেই টিকিয়া আছে। 'মুড়া' শব্দের সহজরূপ 'মুড়' 'মাথা-মোড় খোঁড়া' 'ঘাড়-মুড় ভাঙা' ইত্যাদি শব্দেই বর্তমান। যেখানে আমরা বলি 'গড়গড়া ঘুমচ্চে' সেখানে এই 'গড়া' শব্দকে 'গড়' শব্দের তির্যকরূপ বলিয়া গণ্য করিতে হইবে। 'গড় হইয়া প্রণাম করা' ও 'গড়ানো' ক্রিয়াপদে 'গড়' শব্দের পরিচয় পাই। 'দেব' শব্দের তির্যক্‌রূপ 'দেবা' ও 'দেয়া'। মেঘ ডাকা ও ভূতে পাওয়া সম্বন্ধে 'দেয়া' শব্দের ব্যবহার আছে। 'যেমন দেবা তেম্‌নি দেবী' বাক্যে 'দেবা' শব্দের পরিচয় পাওয়া যায়। বাংলায় কাব্যভাষায় 'সব' শব্দের তির্যক্‌রূপ 'সবা' এখনো ব্যবহৃত হয়। যেমন আমাসবা, তোমাসবা, সবারে, সবাই। কাব্যভাষায় 'জন' শব্দের তির্যক্‌রূপ 'জনা'। সংখ্যাবাচক বিশেষণের সঙ্গে 'জন' শব্দের যোগ হইলে চলিত ভাষায় তাহা অনেক স্থলেই 'জনা' হয়। একজনা, দুইজনা ইত্যাদি। 'জনাজনা' শব্দের অর্থ প্রত্যেক জন। আমরা বলিয়া থাকি 'একো জনা একো রকম'।

তির্যক্‌রূপে সহজরূপ হইতে অর্থের কিঞ্চিৎ ভিন্নতা ঘটে এরূপ দৃষ্টান্তও আছে। 'হাত' শব্দকে নির্জীব পদার্থ সম্বন্ধে ব্যবহার কালে তাহাকে তির্যক্‌ করিয়া লওয়া হইয়াছে, যেমন জামার হাতা, অথবা পাকশালার উপকরণ হাতা। 'পা' শব্দের সম্বন্ধেও সেইরূপ 'চৌকির পায়া'। 'পায়া ভারী' প্রভৃতি বিদ্রূপসূচক বাক্যে মানুষের সম্বন্ধে 'পায়া' শব্দের ব্যবহার দেখা যায়। সজীব প্রাণী সম্বন্ধে যাহা খুর, খাট প্রভৃতি সম্বন্ধে তাহাই খুরা। কান শব্দ কলস প্রভৃতির সংস্রবে প্রয়োগ করিবার বেলা 'কানা' হইয়াছে। 'কাঁধা' শব্দও সেইরূপ।

খাঁটি বাংলা ভাষার বিশেষণপদগুলি প্রায়ই হলন্ত নহে এ কথা রামমোহন রায় তাঁহার বাংলা ব্যাকরণে প্রথম নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন। সংস্কৃত শব্দ 'কাণ' বাংলায় তাহা 'কানা'। সংস্কৃত 'খঞ্জ' বাংলায় 'খোঁড়া'। সংস্কৃত 'অর্ধ' বাংলা 'আধা'। শাদা, রাঙা, বাঁকা, কালা, খাঁদা, পাকা, কাঁচা, মিঠা ইত্যাদি বহুতর দৃষ্টান্ত আছে। 'আলো' বিশেষ্য, 'আলা' বিশেষণ। 'ফাঁক' বিশেষ্য 'ফাঁকা' বিশেষণ। 'মা' বিশেষ্য, 'মায়্যা (মায়্যা মানুষ) বিশেষণ। এই আকার প্রয়োগের দ্বারা বিশেষণ নিষ্পন্ন করা ইহাও বাংলা ভাষায় তির্যক্‌রূপের দৃষ্টান্ত বলিয়া গণ্য হইতে পারে।

মারাঠিতে তির্যক্‌রূপে আকার ও একার দুই স্বরবর্ণের যেমন ব্যবহার দেখা যায় বাংলাতেও সেইরূপ দেখিতে পাই। তন্মধ্যে আকারের ব্যবহার বিশেষ কয়েকটি মাত্র শব্দে বদ্ধ হইয়া আছে; তাহা সজীব ভাবে নাই, কিন্তু একারের ব্যবহার এখনো গতিবিশিষ্ট।

'পাগলে কি না বলে, ছাগলে কি না খায়' এই বাক্যে 'পাগলে' ও 'ছাগলে' শব্দে যে একার দেখিতেছি তাহা উক্ত প্রকার তির্যক্‌রূপের একার। বাংলা ভাষায় এই শ্রেণীর তির্যক্‌রূপ কোন্‌ কোন্‌ স্থলে ব্যবহৃত হয় আমরা তাহার আলোচনা করিব।

সামান্য বিশেষ্য : বাংলার নাম সংজ্ঞা (Proper names) ছাড়া অন্যান্য বিশেষ্যপদে যখন কোনো চিহ্ন থাকে না, তখন তাহাদিগকে সামান্য বিশেষ্য বলিয়া গণ্য করিতে হইবে। যেমন, বানর, টেবিল, কলম, ছুরি ইত্যাদি।

উল্লিখিত বিশেষ্যপদগুলির দ্বারা সাধারণভাবে সমস্ত বানর, টেবিল, চৌকি, ছুরি বুঝাইতেছে, কোনো বিশেষ এক বা একাধিক বানর, টেবিল, চৌকি, ছুরি বুঝাইতেছে না। বলিয়াই ইহাদিগকে

সামান্য বিশেষ্য পদ নাম দেওয়া হইয়াছে। বলা আবশ্যক ইংরেজি common names ও বাংলা সামান্য বিশেষ্যে প্রভেদ আছে। বাংলায় আমরা যেখানে বলি 'এইখানে ছাগল আছে' সেখানে ইংরেজিতে বলে 'There is a goat here' কিংবা 'There are goats here'। বাংলায় এ স্থলে সাধারণভাবে বলা হইতেছে ছাগলজাতীয় জীব আছে। তাহা কোনো একটি বিশেষ ছাগল বা বহু ছাগল তাহা নির্দেশ করিবার প্রয়োজন ঘটে নাই বলিয়া নির্দেশ করা হয় নাই, কিন্তু ইংরেজিতে এরূপ স্থলেও বিশেষ্যপদকে article-যোগে বা বহুবচনের চিহ্নযোগে বিশেষভাবে নির্দিষ্ট করা হয়। ইংরেজিতে যেখানে বলে 'There is a bird in the cage' বা 'There are birds in the cage' আমরা উভয় স্থলেই বলি 'খাঁচায় পাখি আছে'— কারণ এ স্থলে খাঁচার পাখি এক কিংবা বহু তাহা বক্তব্য নহে কিন্তু 'খাঁচার মধ্যে পাখি নামক পদার্থ আছে ইহাই বক্তব্য। এই কারণে, এ-সকল স্থলে বাংলায় সামান্য বিশেষ্যপদই ব্যবহৃত হয়।

এই সামান্য বিশেষ্যপদ যখন জীববাচক হয় প্রায় তখনই তাহা তির্যক্‌রূপ গ্রহণ করে। কখনো বলি না, 'গাছে নড়ে', বলি 'গাছ নড়ে'। কিন্তু 'বানরে লাফায়' বলিয়া থাকি। কেবল কর্তৃকারকেই এই শ্রেণীর তির্যক্‌রূপের প্রয়োগ দেখা যায়, কিন্তু তাহার বিশেষ নিয়ম আছে।

প্লেগে ধরে বা ম্যালেরিয়ায় ধরে— এরকম স্থলে প্লেগ ও ম্যালেরিয়া বস্তুত অচেতন পদার্থ। কিন্তু আমরা বলিবার সময় উহাতে চেতনতা আরোপ করিয়া উহাকে আক্রমণ ক্রিয়ার সচেষ্টক কর্তা বলিয়াই ধরি। তাই উহা রূপকভাবে চেতন বাচকের পর্যায় স্থান লাভ করিয়া তির্যক্‌রূপ প্রাপ্ত হয়।

মোটের উপর বলা যাইতে পারে সকর্মক ক্রিয়ার সহযোগেই জীববাচক সামান্য বিশেষ্যপদ কর্তৃকারকে তির্যক্‌রূপ ধারণ করে। 'এই ঘরে ছাগলে আছে' বলি না কিন্তু 'ছাগলে ঘাস খায়' বলা যায়। বলি 'পোকায় কেটেছে', কিন্তু অকর্মক 'লাগা' ক্রিয়ার বেলায় 'পোকা লেগেছে'। 'তাকে ভূতে পেয়েছে' বলি, 'ভূত পেয়েছে' নয়। পাওয়া ক্রিয়া সকর্মক।

কিন্তু এই সকর্মক ও অকর্মক শব্দটি এখানে সম্পূর্ণ খাটিবে না। ইহার পরিবর্তে বাংলায় নূতন শব্দ তৈরি করা আবশ্যক। আমরা এ স্থলে 'সচেষ্টক' ও 'অচেষ্টক' শব্দ ব্যবহার করিব। কারণ প্রচলিত ব্যাকরণ অনুসারে সকর্মক ক্রিয়ার সংস্রবে উহ্য বা ব্যক্তভাবে কর্ম থাকা চাই কিন্তু আমরা যে শ্রেণীর ক্রিয়ার কথা বলিতেছি তাহার কর্ম না থাকিতেও পারে। 'বানরে লাফায়' এই বাক্যে 'বানর' শব্দ তির্যক্‌রূপ গ্রহণ করিয়াছে, অথচ 'লাফায়' ক্রিয়ার কর্ম নাই। কিন্তু 'লাফানো' ক্রিয়াটি সচেষ্টক।

'আছে' এবং 'থাকে' এই দুইটি ক্রিয়ার পার্থক্য চিন্তা করিয়া দেখিলে দেখা যাইবে, 'আছে' ক্রিয়াটি অচেষ্টক কিন্তু 'থাকে' ক্রিয়া সচেষ্টক— সংস্কৃত 'অস্তি' এবং 'তিষ্ঠতি' ইহার প্রতিশব্দ। 'আছে' ক্রিয়ার কর্তৃকারকে তির্যক্‌রূপ স্থান পায় না— 'ঘরে মানুষে আছে' বলা চলে না কিন্তু 'এ ঘরে কি মানুষে থাকতে পারে' এরূপ প্রয়োগ সংগত।

'প্লেগে স্ত্রীলোকেই অধিক মরে' এ স্থলে মরা ক্রিয়া অচেষ্টক সন্দেহ নাই। 'বেশি আদর পেলে ভালো মানুষেও বিগড়ে যায়' 'অধ্যবসায়ের দ্বারা মূর্খেও পণ্ডিত হ'তে পারে', 'অকস্মাৎ মৃত্যুর আশঙ্কায় বীরপুরুষেও ভীত হয়' এ-সকল অচেষ্টক ক্রিয়ার দৃষ্টান্তে আমার নিয়ম খাটে না। বস্তুত এই নিয়মে ব্যতিক্রম যথেষ্ট আছে।

কিন্তু 'আছে' ক্রিয়ার স্থলে কর্তৃপদে একার বসে না, এ নিয়মের ব্যতিক্রম এখনো ভাবিয়া পাই নাই।

আসা এবং যাওয়া ক্রিয়াটি যদিও সাধারণত সচেষ্টক, তবু তাহাদের সম্বন্ধে পূর্বোক্ত নিয়মটি ভালোরূপে খাটে না। আমরা বলি 'সাপে কামড়ায়' বা 'কুকুরে আঁচড়ায়' কিন্তু 'সাপে আসে' বা 'কুকুরে যায়' বলি না। অথচ 'যাতায়াত করা' ক্রিয়ার অর্থ যদিচ যাওয়া আসা করা, সেখানে এ নিয়মের ব্যতিক্রম নাই। আমরা বলি এ পথ দিয়ে মানুষে যাতায়াত করে, বা 'যাওয়া আসা করে' বা 'আনাগোনা করে'। কারণ, 'করে' ক্রিয়াযোগে আসা যাওয়াটা নিশ্চিতভাবেই সচেষ্টক হইয়াছে। 'খেতে যায়' বা 'খেতে আসে' প্রভৃতি সংযুক্ত ক্রিয়াপদেও এ নিয়ম অব্যাহত থাকে— যেমন, 'এই পথ দিয়ে বাঘে জল খেতে যায়'।

'সকল' ও 'সব' শব্দ সচেষ্টক অচেষ্টক উভয় শ্রেণীর ক্রিয়া-সহযোগেই তির্যক্‌রূপ লাভ করে। যথা, এ ঘরে সকলেই আছেন বা সবাই আছে।

ইহার কারণ এই যে, 'সকল' ও 'সব' শব্দ দুটি বিশেষণপদ। ইহারা তির্যকরূপ ধারণ করিলে তবেই বিশেষ্যপদ হয়। 'সকল' ও 'সব' শব্দটি হয় বিশেষণ, নয় অন্য শব্দের যোগে বহুবচনের চিহ্ন— কিন্তু 'সকলে' বা 'সবে' বিশেষ্য। কথিত বাংলায় 'সব' শব্দটি বিশেষ্যরূপ গ্রহণকালে দ্বিগুণভাবে তির্যক্‌রূপ প্রাপ্ত হয়— প্রথমত 'সব' হইতে হয় 'সবা' তাহার পরে পুনশ্চ তাহাতে এ যোগ হইয়া হয় 'সবাএ'। এই 'সবাএ' শব্দকে আমরা 'সবাই' উচ্চারণ করিয়া থাকি।

'জন' শব্দ 'সব' শব্দের ন্যায়। বাংলায় সাধারণত 'জন' শব্দ বিশেষণরূপেই ব্যবহৃত হয়। একজন লোক, দুজন মানুষ ইত্যাদি। বস্তুত মানুষের পূর্বে সংখ্যা যোগ করিবার সময় আমরা তাহার সঙ্গে 'জন' শব্দ যোজনা করিয়া দিই। পাঁচ মানুষ কখনোই বলি না, পাঁচজন মানুষ বলি। কিন্তু এই 'জন' শব্দকে যদি বিশেষ্য করিতে হয় তবে ইহাকে তির্যক্‌রূপ দিয়া থাকি। দুজনে, পাঁচজনে ইত্যাদি। 'সবাএ' শব্দের ন্যায় 'জনাএ' শব্দ বাংলায় প্রচলিত আছে— এক্ষণে ইহা 'জনায়' রূপে লিখিত হয়।

বাংলায় 'অনেক' শব্দটি বিশেষণ। ইহাও বিশেষ্যরূপ গ্রহণকালে 'অনেকে' হয়। সর্বত্রই এ নিয়ম খাটে। 'কালোএ' (কালোয়) যার মন ভুলেছে 'শাদাএ' (শাদায়) তার কি করবে। এখানে কালো ও শাদা বিশেষণপদ তির্যক্‌রূপ ধরিয়া বিশেষ্য হইয়াছে। 'অপর' 'অন্য' শব্দ বিশেষণ কিন্তু 'অপরে' 'অন্যে' বিশেষ্য। 'দশ' শব্দ বিশেষণ, 'দশে' বিশেষ্য (দশে যা বলে)।

নামসংজ্ঞা সম্বন্ধে এ-প্রকার তির্যক্‌রূপ ব্যবহার হয় না— কখনো বলি না, 'যাদবে ভাত খাচ্ছে'। তাহার কারণ পূর্বেই নির্দেশ করা হইয়াছে, বিশেষ নাম কখনো সামান্য বিশেষ্যপদ হইতে পারে না। বাংলায় একটি প্রবাদবাক্য আছে 'রামে মারলেও মরব রাবণে মারলেও মরব।' বস্তুত এখানে 'রাম' ও 'রাবণ' সামান্য বিশেষ্যপদ— এখানে উক্ত দুই শব্দের দ্বারা দুই প্রতিপক্ষকে বুঝাইতেছে। কোনো বিশেষ রাম-রাবণকে বুঝাইতেছে না।

তির্যক্‌রূপের মধ্যে প্রায়ই একটি সমষ্টিবাচকতা থাকে। যথা 'আত্মীয়ে তাকে ভাত দেয় না।' এখানে আত্মীয় সমষ্টিই বুঝাইতেছে। এইরূপ 'লোকে বলে।' এখানে 'লোকে' অর্থ সর্বসাধারণে। 'লোক বলে' কোনোমতেই হয় না। সমষ্টি যখন বুঝায় তখন 'বানরে বাগান নষ্ট করিয়াছে' ইহাই ব্যবহার্য— 'বানর করিয়াছে' বলিলে বানর দল বুঝাইবে না।

সংখ্যা-সহযোগে বিশেষ্যপদ যদিচ সামান্যতা পরিহার করে তথাপি সকর্মক রূপে তাহাদের প্রতিও একার প্রয়োগ হয়, যেমন 'তিন শেয়ালে যুক্তি করে গর্তে ঢুকল', এমন-কি 'আমরা' 'তোমরা' 'তারা' ইত্যাদি সর্বনাম বিশেষণের দ্বারা বিশেষ্যপদ বিশেষভাবে নির্দিষ্ট হইলেও সংখ্যার

সংস্রবে তাহারা তির্যকরূপ গ্রহণ করে। যেমন, 'তোমরা দুই বন্ধুতে' 'সেই দুটো কুকুরে' ইত্যাদি।

অনেকের মধ্যে বিশেষ একাংশ যখন এমন কিছু করে অপরাংশ যাহা করে না তখন কর্তৃপদে তির্যকরূপ ব্যবহার হয়। যথা 'তাদের মধ্যে দুজনে গেল দক্ষিণে'— এরূপ বাক্যের মধ্যে একটি অসমাপ্তি আছে। অর্থাৎ আর কেহ আর কোনো দিকে গিয়াছে বা বাকি কেহ যায় নাই এরূপ বুঝাইতেছে। যখন বলি 'একজনে বললে হাঁ' আর 'আর-একজন বললে না' এমন আর-একটা কিছু শুনিবার অপেক্ষা থাকে। কিন্তু যদি বলা যায় 'একজন বললে, হাঁ' তবে সেই সংবাদই পর্যাপ্ত।

তির্যকরূপে হলন্ত শব্দে একার যোজনা সহজ, যেমন বানর বানরে। (বাংলায় বানর শব্দ হলন্ত)। অকারান্ত, আকারান্ত এবং ওকারান্ত শব্দের সঙ্গেও 'এ' যোজনায় বাধা নাই— 'ঘোড়াএ' (ঘোড়ায়) 'পেঁচোএ' (পেঁচোয়) ইত্যাদি। এতদ্‌ব্যতীত অন্য স্বরান্ত শব্দে 'এ' যোগ করিতে হইলে 'ত' ব্যঞ্জনবর্ণকে মধ্যস্থ করিতে হয়। যেমন 'গোরুতে', ইত্যাদি। কিন্তু শব্দের শেষে যখন ব্যঞ্জনকে আশ্রয় না করিয়া শুদ্ধ স্বর থাকে তখন 'ত'কে মধ্যস্থরূপে প্রয়োজন হয় না। যেমন উই, উইএ (উইয়ে), বউ, বউএ (বউয়ে) ইত্যাদি। এ কথা মনে রাখা আবশ্যক বাংলায় বিভক্তিরূপে যেখানে একার প্রয়োগ হয় সেখানে প্রায় সর্বত্রই বিকল্পে 'তে' প্রয়োগ হইতে পারে। এইজন্য 'ঘোড়ায় লাথি মেরেছে, এবং 'ঘোড়াতে লাথি মেরেছে' দুইই হয়। 'উইয়ে নষ্ট করেছে, এবং 'উইতে' বা 'উইয়েতে' নষ্ট করেছে।' হলন্ত শব্দে এই 'তে' বিভক্তি গ্রহণকালে তৎপূর্ববর্তী ব্যঞ্জনে পুনশ্চ একার যোগ করিতে হয়। যেমন 'বানরেতে', 'ছাগলেতে'।

আষাঢ় ১৩১৮

বাংলা ব্যাকরণে বিশেষ বিশেষ্য[১]

আমরা পূর্বে এক প্রবন্ধে দেখাইয়াছি, বাংলায় নামসংজ্ঞা ছাড়া বিশেষ্যপদবাচক শব্দ মাত্রই সহজ অবস্থায় সামান্য বিশেষ্য। অর্থাৎ তাহা জাতিবাচক। যেমন শুধু 'কাগজ' বলিলে বিশেষভাবে একটি বা অনেকগুলি কাগজ বোঝায় না, তাহার দ্বারা সমস্ত কাগজকেই বোঝায়।

এমন স্থলে যদি কোনো বিশেষ কাগজকে আমরা নির্দেশ করিতে চাই তবে সেজন্য বিশেষ চিহ্ন ব্যবহার করা আবশ্যক হয়।

---

[১] বাংলা ব্যাকরণে তির্যকরূপ নামক প্রবন্ধে, বাংলায় বিশেষ বিশেষ স্থলে কর্তৃকারকে একারযোগে যে রূপ হয় তাহাকে তির্যকরূপ নাম দিয়াছিলাম। তাহাতে কোনো পাঠক আপত্তি প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি বলেন ইহাকে বলা উচিত কর্তৃকারকে সপ্তমী বিভক্তি। নাম লইয়া তর্ক নিষ্ফল। নাহয় নাই বলিলাম 'তির্যকরূপ'— নাহয় আর-কোনো নাম দেওয়া গেল। আমার বক্তব্য এই ছিল যে, কোনো কোনো স্থলে বাংলা বিশেষ্যপদ তাহার সহজরূপ পরিত্যাগ করে। তাহার এই রূপের বিকারকেই অন্যান্য গৌড়ীয় ভাষার সহিত তুলনা করিয়া 'তির্যকরূপ' নাম দিয়াছিলাম। ঘোড়ে, কুত্তে প্রভৃতি হিন্দি শব্দই হিন্দি তির্যকরূপের দৃষ্টান্ত; ঘোড়ওয়া কাহারওয়া প্রভৃতি শব্দ নহে— অনন্ত তুলনামূলক ব্যাকরণবিদ্‌গণ শেষোক্তগুলিকে তির্যকরূপের দৃষ্টান্ত বলিয়া ব্যবহার করেন নাই। দ্বিতীয় কথা এই— বাংলা কর্তৃকারকের একার-সংযুক্ত রূপকে যদি সংস্কৃত কোনো বিভক্তির নাম দিতেই হয় তবে আমার মতে তাহা সপ্তমী নহে তৃতীয়া। বাংলা 'বাঘে খাইল' বাক্যটি সংস্কৃত 'ব্যাঘ্রেণ খাদিতঃ' বাক্য হইতে উৎপন্ন এমন অনুমান করা যাইতেও পারে। যাহাই হউক এ-সকল অনুমানের কথা। আমার সে প্রবন্ধে আসল কথাটা ব্যাকরণের নাম নহে, ব্যাকরণের নিয়ম।

ইংরেজি ব্যাকরণে এইরূপ নির্দেশক চিহ্নকে Article বলে। বাংলাতেও এই শ্রেণীর সংকেত আছে। সেই সংকেতের দ্বারা সামান্য বিশেষ্যপদ একবচন ও বহুবচন রূপ ধারণ করিয়া বিশেষ বিশেষ্যে পরিণত হয়। এই কথা মনে রাখা কর্তব্য, বিশেষ্যপদ, একবচন বা বহুবচনরূপ গ্রহণ করিলেই, সামান্যতা পরিহার করে। একটি ঘোড়া বা তিনটি ঘোড়া বলিলেই ঘোড়া শব্দের জাতিবাচক অর্থ সংকীর্ণ হইয়া আসে— তখন বিশেষ এক বা একাধিক ঘোড়া বোঝায়— সুতরাং তখন তাহাকে সামান্য বিশেষ্য না বলিয়া বিশেষ বিশেষ্য বলাই উচিত। এই কথা চিন্তা করিলেই পাঠক বুঝিতে পারিবেন আমাদের সামান্য বিশেষ্য এবং ইংরেজি Common name এক নহে।

বিশেষ বিশেষ্য একবচন

মোটামুটি বলা যাইতে পারে বাংলার নির্দেশক চিহ্নগুলির শব্দের পূর্বে না বসিয়া শব্দের পরেই যোজিত হয়। ইংরেজিতে "the room'— বাংলায় 'ঘরটি'। এখানে 'টি' নির্দেশক চিহ্ন।

টি ও টা

ইংরেজিতে the আর্টিক্‌ল্‌ একবচন এবং বহুবচন উভয়ত্রই বসে কিন্তু বাংলায় টি ও টা সংকেতের দ্বারা একটিমাত্র পদার্থকে বিশিষ্ট করা হয়। যখন বলা হয়, 'রাস্তা কোন্‌ দিকে' তখন সাধারণভাবে পথ সম্বন্ধে প্রশ্ন করা হয়— যখন বলি, 'রাস্তাটা কোন্‌ দিকে'— তখন বিশেষ একটা রাস্তা কোন্‌ দিকে সেই সম্বন্ধেই প্রশ্ন করা হয়।

ইংরেজিতে 'the' শব্দের প্রয়োগ যত ব্যাপক বাংলায় 'টি' তেমন নহে। আমাদের ভাষায় এই প্রয়োগ সম্বন্ধে মিতব্যয়িতা আছে। সেইজন্যে যখন সাধারণভাবে আমরা খবর দিতে চাই, মধু বাহিরে নাই, তখন আমরা শুধু বলি, মধু ঘরে আছে— ঘর শব্দের সঙ্গে কোনো নির্দেশক চিহ্ন যোজনা করি না। কারণ ঘরটাকেই বিশেষভাবে নির্দিষ্ট করিবার কোনোই প্রয়োজন নাই। ইংরেজিতে এ স্থলেও 'the room' বলা হইয়া থাকে। কিন্তু যখন কোনো একটি বিশেষ ঘরে মধু আছে এই সংবাদটি দিবার প্রয়োজন ঘটে তখন আমরা বলি, ঘরটাতে মধু আছে। এইরূপ, যে বাক্যে একাধিক বিশেষ্যপদ আছে তাহাদের মধ্যে বক্তা যেটিকে বিশেষভাবে নির্দেশ করিতে চান সেইটির সঙ্গেই নির্দেশক যোজনা করেন। যেমন, গোরুটা মাঠে চরছে, বা মাঠটাতে গোরু চরছে। জাজিমটা ঘরে পাতা, বা ঘরটাতে জাজিম পাতা। 'আমার মন খারাপ হয়ে গেছে' বা 'আমার মনটা খারাপ হয়ে গেছে'—দুইই আমরা বলি। প্রথম বাক্যে, মন খারাপ হওয়া ব্যাপারটাই বলা হইতেছে— দ্বিতীয় বাক্যে, আমার মনই যে খারাপ হইয়া গিয়াছে তাহার উপরেই ঝোঁক।

'টি' সংকেতটি ছোটো আয়তনের জিনিস ও আদরের জিনিস সম্বন্ধে এবং 'টা' বড়ো জিনিস সম্বন্ধে বা অবজ্ঞা কিংবা অপ্রিয়তা বুঝাইবার স্থলে বসে। যে পদার্থ সম্বন্ধে আদর বা অনাদর কিছুই বোঝায় না, তৎসম্বন্ধেও 'টা' প্রয়োগ হয়। 'ছাতাটি কোথায়' এই বাক্যে ছাতার প্রতি বক্তার একটু যত্ন প্রকাশ হয়, কিন্তু 'ছাতাটা কোথায়' বলিলে যত্ন বা অযত্ন কিছুই বোঝায় না।

সাধারণত নামসংজ্ঞার সহিত 'টা' 'টি' বসে না। কিন্তু বিশেষ কারণে ঝোঁক দিতে হইলে নামসংজ্ঞার সঙ্গেও নির্দেশক বসে। যেমন, হরিটা বাড়ি গেছে। সম্ভবত হরির বাড়ি যাওয়া বক্তার পক্ষে প্রীতিকর হয় নাই, টা তাহাই বুঝাইল। 'রামটি মারা গেছে', এখানে বিশেষভাবে করুণা প্রকাশের জন্য টি বসিল। এইরূপ শ্যামটা ভারি দু` শৈলটি ভারি ভালো মেয়ে। এইরূপে টি ও টা অনেক স্থলে বিশেষ পদের সঙ্গে বক্তার হৃদয়ের সুর মিশাইয়া দেয়। বলা আবশ্যক মান্য ব্যক্তির নাম সম্বন্ধেও টি বা টা ব্যবহার হয় না।

সামান্যতাবাচক বা সমষ্টিবাচক বিশেষ্যপদকে বিশেষভাবে নির্দেশ করিতে হইলে নির্দেশক প্রয়োগ করা যায়। যেমন, 'গিরিডির কয়লাটা ভালো', 'বেহারের মাটিটা উর্বরা', 'এখানে মশাটা বড়ো বেশি', 'ভীম নাগ সন্দেশটা করে ভালো'। কিন্তু শুদ্ধ অস্তিত্ব জ্ঞাপনের সময় এরূপ প্রয়োগ খাটে না; বলা যায় না, 'ভীমের দোকানে সন্দেশটা আছে।'

এখানে আর-একটি লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, যখন বলা যায় 'বেহারের মাটিটা উর্বরা' বা 'ভীমের দোকানের সন্দেশটা ভালো' তখন প্রশংসা সূচনা সত্ত্বেও 'টা' নির্দেশক ব্যবহার হয় তাহার কারণ এই যে, এই বিশেষ্যপদগুলিতে যে-সকল বস্তু বুঝাইতেছে তাহা পরিমাণে অল্প নহে।

যখন আমরা কর্তৃবাচক বিশেষ্যকে সাধারণভাবে উল্লেখ করিয়া পরিচয়বাচক বিশেষ্যকে বিশেষভাবে নির্দেশ করি, তখন শেষোক্ত বিশেষ্যের সহিত নির্দেশক যোগ হয়। যেমন, 'হরি মানুষটা ভালো', 'বাঘ জন্তুটা ভীষণ'।

সাধারণ গুণবাচক বিশেষ্যে নির্দেশক যোগ হয় না— বিশেষত শুদ্ধমাত্র অস্তিত্ব জ্ঞাপনকালে তো হয়ই না। যেমন, আমরা বলি, 'রামের সাহস আছে।' কিন্তু 'রামের সাহসটা কম নয়', 'উমার লজ্জাটা বেশি' বলিয়া উমার বিশেষ লজ্জা ও রামের বিশেষ সাহসের উল্লেখকালে টা প্রয়োগ করি।

ইংরেজিতে 'this' 'my' প্রভৃতি সর্বনামে বিশেষণপদ থাকিলে বিশেষ্যের পূর্বে আর্টিক্‌ল্ বসে না কিন্তু বাংলায় তাহার বিপরীত। এরূপ স্থলে বিশেষ করিয়াই নির্দেশক বসে। যেমন, 'এই বইটা', 'আমার কলমটি'।

বিশেষণপদের সঙ্গে 'টা' 'টি' যুক্ত হয় না। যদি যুক্ত হয় তবে তাহা বিশেষ্য হইয়া যায়। যেমন, 'অনেকটা নষ্ট হয়েছে', 'অর্ধেকটা রাখো', 'একটা দাও', 'আমারটা লও', 'তোমরা কেবল মন্দটাই দেখো' ইত্যাদি।

নির্দেশক-চিহ্ন-যুক্ত বিশেষ্যপদে কারকের চিহ্নগুলি নির্দেশকের সহিত যুক্ত হয়। যেমন, 'মেয়েটির', 'লোকটাকে', 'বাড়িটাতে' ইত্যাদি।

অচেতন পদার্থবাচক বিশেষ্যপদে কর্মকারকে 'কে' বিভক্তিচিহ্ন প্রায় বসে না। কিন্তু 'টি' 'টা'-র সহযোগে বসিতে পারে। যেমন, 'লোহাটাকে', 'টেবিলটিকে' ইত্যাদি।

ক্রোশটাক্ সেরটাক্ প্রভৃতি দূরত্ব ও পরিমাণ-বাচক শব্দের 'টাক্' প্রত্যয়টি টা ও এক শব্দের সন্ধিজাত। কিন্তু এই 'টাক্' প্রত্যয়যোগে উক্ত শব্দগুলি বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হয়। যেমন ক্রোশটাক্ পথ, সেরটাক্ দুধ ইত্যাদি। কেহ কেহ মনে করেন এগুলি বিশেষণ নহে। কারণ, বিশেষ্য ভাবেও উহাদের প্রয়োগ হয়। যেমন, 'ক্রোশটাক্ গিয়েই বসে পড়ল', 'পোয়াটাক্ হলেই চলবে'।

যদিচ সাধারণত টি টা প্রভৃতি নির্দেশক সংকেত বিশেষণের সহিত বসে না, তবু এক স্থলে তাহার ব্যতিক্রম আছে। সংখ্যাবাচক শব্দের সহিত নির্দেশক যুক্ত হইয়া বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হয়। যেমন, একটা গাছ, দুইটি মেয়ে ইত্যাদি।

বাংলায় ইংরেজি Indefinite article-এর অনুরূপ শব্দ, একটি, একটা। একটা মানুষ বলিলে অনির্দিষ্ট কোনো একজন মানুষ বুঝায়। 'একটা মানুষ ঘরে এল' এবং 'মানুষটা ঘরে এল' এই দুই বাক্যের মধ্যে অর্থভেদ এই— প্রথম বাক্যে যে হউক একজন মানুষ ঘরে আসিল এই তথ্য বলা হইতেছে, দ্বিতীয় বাক্যে বিশেষ কোনো একজন মানুষের কথা বলা হইতেছে।

কিন্তু 'একটা' বা 'একটি' যখন বিশেষভাবে এক সংখ্যাকে জ্ঞাপন করে তখন তাহাকে indefinite বলা চলে না। ইংরেজিতে তাহার প্রতিশব্দ one। সেখানে একটা লোক মানে এক-সংখ্যক লোক, কোনো একজন অনির্দিষ্ট লোক নহে।

যেখানে 'এক' শব্দটি অপর একটি বিশেষণের পরে যুক্ত হইয়া ব্যবহৃত হয় সেখানে সাধারণত 'টি' 'টা' প্রয়োগ চলে না, যেমন, লম্বা-এক ফর্দ, মস্ত-এক বাবু, সাতহাত-এক লাঠি।

বলা বাহুল্য, এক ভিন্ন অন্য সংখ্যা সহযোগে যেখানে টি, টা বসে সেখানে তাহাকে Indefinite article-এর সহিত তুলনীয় করা চলে না, সেখানে তাহা সংখ্যাবাচক বিশেষণ।

খানি, খানা প্রভৃতি আরো কয়েকটি নির্দেশক চিহ্ন আছে, তাহাদের কথা পরে হইবে।

বলা আবশ্যক সংস্কৃতের অনুকরণ করিতে গিয়া বাংলা লিখিত ভাষায় নির্দেশক সংকেতের ব্যবহার বিরল হইয়াছে। যাঁহারা সংস্কৃত রীতির পক্ষপাতী তাঁহাদের রচনায় ইহা প্রায় পরিত্যক্ত হইয়াছে। যেহেতু বাংলায় বক্তা ইচ্ছা করিলে কোনো একটি বিশেষ্যপদকে বিশেষভাবে নির্দেশ করিতেও পারেন নাও করিতে পারেন সেইজন্য ইহাকে বর্জন করা সম্ভব হইয়াছে। কিন্তু ভাষার স্বাভাবিক রীতিকে ত্যাগ করিলে নিশ্চয়ই তাহাকে দুর্বল করা হয়। আধুনিক কালের লেখকগণ মাতৃভাষার সমস্ত স্বকীয় সম্পদগুলিকে অকুণ্ঠিতচিত্তে ব্যবহার করিবার চেষ্টা করিয়া ক্রমশই ভাষাকে প্রাণপূর্ণ ও বেগবান করিয়া তুলিতেছেন তাহাতে সন্দেহ নাই।[১]

ভাদ্র ১৩১৮

বাংলা নির্দেশক

আমরা বাংলা ভাষার নির্দেশক চিহ্ন 'টি' ও 'টা' সম্বন্ধে পূর্বেই আলোচনা করিয়াছি। এই শ্রেণীর সংকেত আরো কয়েকটি আছে।

খানি ও খানা

বাংলা ভাষায় 'গোটা' শব্দের দ্বারা অখণ্ডতা বুঝায়। এই কারণে, এই 'গোটা' শব্দেরই অপভ্রংশ 'টা' চিহ্ন পদার্থের সমগ্রতা সূচনা করে। হরিণটা, টেবিলটা, মাঠটা, শব্দে একটা সমগ্র পদার্থ বুঝাইতেছে।

বাংলা ভাষার অপর একটি একত্ব নির্দেশক চিহ্ন খানা, খানি। 'খণ্ড' শব্দ হইতে উহার উৎপত্তি। এখনো বাংলায় 'খান্ খান্' শব্দের দ্বারা খণ্ড খণ্ড বুঝায়।

---

[১] এই প্রবন্ধে নির্দেশক নামক একটি নূতন পারিভাষিক ব্যবহার করিয়াছি। পাঠকদের প্রতি আমার নিবেদন, এইরূপ নামকরণ অভাবে ঠেকিয়া দায়ে পড়িয়া করিতে হয়। ইহাদের সম্বন্ধে আমার কোনো মমতা বা অভিমান নাই। এই-সকল নামকে উপলক্ষ করিয়া ভাষার মর্মগত সমস্ত নিয়মের আলোচনা করিতে চেষ্টা করিয়াছি, তাহার মধ্যে ভুল ও অসম্পূর্ণতা থাকাই সম্ভব। কারণ বাংলা ভাষাকে বাংলা ভাষা বলিয়া গণ্য করিয়া তাহার নিয়ম আলোচনার চেষ্টা তেমন করিয়া হয় নাই। পাঠকগণ আমার এই ব্যাকরণ-বিষয়ক প্রবন্ধের ভুল সংশোধন ও অভাব পূরণ করিয়া দিলে বিশেষ কৃতজ্ঞ হইব।

ইহা হইতে মনে হইতে পারে যে, এক-একটি সমগ্র বস্তুকে বুঝাইতে 'টা' চিহ্নের প্রয়োগ এবং এক-একটি খণ্ডকে বুঝাইতে 'খানা' চিহ্নের প্রয়োগ হইয়া থাকে।

গোড়ায় কী ছিল বলিতে পারি না, এখন কিন্তু এরূপ দেখা যায় না। আমরা বলি কাগজখানা, শ্লেটখানা। এই কাগজ ও শ্লেট সমগ্র পদার্থ হইলেও আসে যায় না।

কিন্তু দেখা যাইতেছে যে-সকল সামগ্রী দীর্ঘ প্রস্থ বেধে সম্পূর্ণ, সাধারণত তাহাদের সম্বন্ধে 'খানা' ব্যবহার হয় না। যে জিনিসকে প্রস্থের প্রসারের দিক হইতেই দেখি, লম্বের বা বেধের দিক হইতে নয় প্রধানত তাহারই সম্বন্ধে 'খানা' ও 'খানি'র যোগ। মাঠখানা, ক্ষেতখানা; কিন্তু পাহাড়খানা নদীখানা নয়। থালখানা, খাতাখানা; কিন্তু ঘটিখানা বাটিখানা নয়। লুচিখানা, কচুরিখানা; কিন্তু সন্দেশখানা মেঠাইখানা নয়। শালপাতাখানা, কলাপাতাখানা; কিন্তু আমখানা কাঁঠালখানা নয়।

এই যে নিয়মের উল্লেখ করা গেল ইহা সর্বত্র খাটে না। যে জিনিস পাতলা নহে তাহার সম্বন্ধেও 'খানা' ব্যবহার হইয়া থাকে। যেমন খাটখানা, চৌকিখানা, ঘরখানা, নৌকাখানা। ইহাও দেখা গিয়াছে, এই 'খানা' চিহ্নের ব্যবহার সম্বন্ধে সকলের অভ্যাস সমান নহে।

তবে 'খানা'র প্রয়োগ সম্বন্ধে কয়েকটা সাধারণ নিয়ম বলা যায়। জীব সম্বন্ধে কোথাও ইহার ব্যবহার নাই ; গোরুখানা ভেড়াখানা হয় না। দেহ ও দেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সম্বন্ধে ইহার ব্যবহারে বাধা নাই। দেহখানা, হাতখানা, পাখানা। বুকখানা সাত হাত হয়ে উঠল ; মায়ের কোলখানি ভরে আছে ; মাংসখানা ঝুলে পড়েছে ; ঠোঁটখানি রাঙা ; ভুরুখানি বাঁকা।

অরূপ পদার্থ সম্বন্ধে ইহার ব্যবহার নাই। বাতাসখানা বলা চলে না ; আলোখানাও সেইরূপ ; কারণ, তাহার অবয়ব নাই। যত্নখানা, আদরখানা, ভয়খানা, রাগখানা হয় না। কিন্তু ব্যতিক্রম আছে ; যথা, ভাবখানা, স্বভাবখানা, ধরনখানা চলনখানি।

যে-সকল বস্তু অবয়ব গ্রহণ না করিয়া তরল বা বিচ্ছিন্নভাবে থাকে তাহাদের সম্বন্ধে 'খানা' বসে না। যেমন, বালিখানা, ধুলোখানা, মাটিখানা, দুধখানা, জলখানা, তেলখানা হয় না।

ধুলা কাদা তেল জল প্রভৃতি শব্দের সহিত 'এক' শব্দটিকে বিশেষণরূপে যোগ করা যায় না। যেমন, একটা ধুলা বা একটা জল বলি না। কিন্তু 'অনেক' শব্দটির সহিত এরূপ কোনো বাধা নাই। যেমন, অনেকটা জল বা অনেকখানি জল বলা চলে। বলা বাহুল্য এখানে 'অনেক' শব্দ দ্বারা সংখ্যা বুঝাইতেছে না— পরিমাণ বুঝাইতেছে।

এখানে বিশেষরূপে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, এরূপ স্থলে আমরা 'খানি' ব্যবহার করি ; 'খানা' ব্যবহার করি না। 'অনেকখানি দুধ' বলি, 'অনেকখানা দুধ' বলি না। এ স্থলে দেখা যাইতেছে, পরিমাণ ও সংখ্যা সম্বন্ধে 'খানি' ব্যবহার হয়, 'খানা' কেবলমাত্র সংখ্যা সম্বন্ধেই খাটে।

বাংলায় হাসিখানি শব্দ প্রচলিত আছে। কিন্তু ইহা আদরের ভাষা। আদর করিয়া হাসিকে যেন স্বতন্ত্র একটি বস্তুর মতো করিয়া দেখা যাইতেছে। মনে পড়িতেছে বৈষ্ণব সাহিত্যে এমন ভাবের কথা কোথায় দেখিয়াছি যে, 'তাহার মুখের কথাখানির যদি লাগ পাইতাম'— এখানে আদর করিয়া মুখের কথাটিকে যেন মূর্তি দেওয়া হইতেছে। এইরূপ ভাবেই 'স্পর্শখানি' বলিয়া থাকি।

খানি ও খানা যেখানে বসে সেখানে ইচ্ছামতো সর্বত্রই টি ও টা বসিতে পারে— কিন্তু টি ও টা-র স্থলে সর্বত্র খানি ও খানার অধিকার নাই।

গাছা ও গাছি

'খানি খানা' যেমন মোটের উপরে চওড়া জিনিসের পক্ষে, 'গাছা' তেমনি সরু জিনিসের পক্ষে। যেমন, ছড়িগাছা, লাঠিগাছা, দড়িগাছা, সুতোগাছা, হারগাছা, মালাগাছা, চুড়িগাছা, মলগাছা, শিকলগাছা।

এই সংকেতের সঙ্গে যখন পুনশ্চ 'টি' ও 'টা' চিহ্ন যুক্ত হইয়া থাকে তখন 'গাছি' 'গাছা' শব্দের অন্তস্থিত ইকার আকার লুপ্ত হইয়া যায়। যথা, লাঠিগাছটা মালাগাছটা ইত্যাদি।

জীববাচক পদার্থ সম্বন্ধে ইহার ব্যবহার নাই। কেঁচোগাছি বলা চলে না।

সরু জিনিস লম্বায় ছোটো হইলে তাহার সম্বন্ধে ব্যবহার হয় না। দড়িগাছা, কিন্তু গোঁফগাছা নয়। শলাগাছটা, কিন্তু ছুঁচগাছটা নয়। চুলগাছি যখন বলা হয় তখন লম্বাচুলই বুঝায়।

যেখানে গাছি ও গাছা বসে সেখানে সর্বত্রই বিকল্পে টি ও টা বসিতে পারে— এবং কোনো কোনো স্থলে খানি ও খানা বসিতে পারে।

টুকু

টুকু শব্দ সংস্কৃত তনুক শব্দ হইতে উৎপন্ন। মৈথিলি সাহিত্যে তনুক শব্দ দেখিয়াছি। 'তনিক' এখনো হিন্দিতে ব্যবহৃত হয়। ইহার সগোত্র 'টুক্‌রা' শব্দ বাংলায় প্রচলিত আছে।

টুকু স্বল্পতাবাচক।

সজীব পদার্থ সম্বন্ধে ইহার ব্যবহার নাই। ভেড়াটুকু গাধাটুকু হয় না। পরিহাসচ্ছলে মানুষটুকু বলা চলে।

ক্ষুদ্রায়তন হইলেও এমন পদার্থ সম্বন্ধে ব্যবহৃত হয় না যাহার বিশেষ গঠন আছে। যেমন ইয়ারিংটুকু বলা যায় না, সোনাটুকু বলা যায়। পদ্মটুকু বলা যায় না— চুনটুকু বলা যায়। পাগড়িটুকু বলা যায় না, রেশমটুকু বলা যায়। অর্থাৎ যাহাকে টুকরা করিলে তাহার বিশেষত্ব যায় না তাহার সম্বন্ধেই 'টুকু' ব্যবহার করা চলে। কাগজকে টুকরা করিলেও তাহা কাগজ, কাপড়কে টুকরা করিলেও তাহা কাপড়, এক পুকুর জলও জল, এক ফোঁটা জলও জল, এইজন্য কাগজটুকু কাপড়টুকু জলটুকু বলা যায় কিন্তু চৌকিটুকু খাটটুকু বলা যায় না।

কিন্তু, এই ঐ সেই কত এত তত যত সর্বনামপদের সহিত যুক্ত করিয়া তাহাকে ক্ষুদ্রার্থক সকল বিশেষ্যপদের বিশেষণ রূপে ব্যবহার করা যায়। যেমন, এইটুকু মানুষ, ঐটুকু বাড়ি, ঐটুকু পাহাড়।

অরূপ পদার্থবাচক বিশেষ্যপদে ইহার ব্যবহার চলে। যেমন, হাওয়াটুকু, কৌশলটুকু, ভারটুকু, সন্ন্যাসী ঠাকুরের রাগটুকু।

অন্যান্য নির্দেশক চিহ্নের ন্যায় 'এক' বিশেষণ শব্দের সহিত যুক্ত হইয়া ইহা ব্যবহৃত হয়— কিন্তু দুই তিন প্রভৃতি অন্য সংখ্যার সহিত ইহার যোগ নাই। দুইটা, দুইখানি, দুইগাছি হয় কিন্তু দুইটুকু তিনটুকু হয় না। 'এক' শব্দের সহিত যোগ হইলে টুকু বিকল্পে টু হয়, যথা একটু। অন্যত্র কোথাও এরূপ হয় না। এই 'একটু' শব্দের সহিত 'খানি' যোজনা করা যায়— যথা, একটুখানি বা একটুক্‌খানি। এখানে 'খানা' চলে না। অন্যত্র, যেখানে টুকু বসিতে পারে সেখানে কোথাও বিকল্পে খানি খানা বসিতে পারে না, কিন্তু টি টা সর্বত্রই বসে।

আশ্বিন ১৩১৮

বাংলা বহুবচন

পূর্বে বলা হইয়াছে 'গোটা' শব্দের অর্থ সমগ্র। বাংলায় যেখানে বলে 'একটা', উড়িয়া ভাষায় সেখানে বলে গোটা। এবং এই গোটা শব্দের টা অংশই বাংলা বিশেষ বিশেষ্যে ব্যবহৃত হয়।

পূর্ববঙ্গে ইহার প্রথম অংশটুকু ব্যবহৃত হয়। পশ্চিমবঙ্গে 'চৌকিটা', পূর্ববঙ্গে 'চৌকি গুয়া'।

ভাষায় অন্যত্র ইহার নজির আছে। একদা 'কর' শব্দ সম্বন্ধকারকের চিহ্ন ছিল— যথা, তোমাকর, তাকর। এখন পশ্চিমভারতে ইহার 'ক' অংশ ও পূর্বভারতে 'র' অংশ সম্বন্ধ-চিহ্নরূপে ব্যবহৃত হইতেছে। হিন্দি হম্‌কা, বাংলা আমার।

একবচনে যেমন গোটা, বহুবচনে তেমনি গুলা। (মানুষগোটা), মানুষটা একবচন, মানুষগুলা বহুবচন। উড়িয়া ভাষায় এইরূপ বহুবচনার্থে 'গুড়িয়ে' শব্দের ব্যবহার আছে।

এই 'গোটা'রই বহুবচনরূপ গুলা, তাহার প্রমাণ এই যে, 'টা' সংযোগে যেমন বিশেষ্য শব্দ তাহার সামান্য অর্থ পরিত্যাগ করিয়া তাহার বিশেষ অর্থ গ্রহণ করে— গুলা ও গুলির দ্বারাও সেইরূপ ঘটে। যেমন, 'টেবিলগুলা বাঁকা'— অর্থাৎ বিশেষ কয়েকটি টেবিল বাঁকা, সামান্যত টেবিল বাঁকা নহে। কাক সাদা বলা চলে না, কিন্তু কাকগুলো সাদা বলা চলে, কারণ, বিশেষ কয়েকটা কাক সাদা হওয়া অসম্ভব নহে।

এই 'গুলা' শব্দযোগে বহুবচনরূপ নিষ্পন্ন করাই বাংলার সাধারণ নিয়ম। বিশেষ স্থলে বিকল্পে শব্দের সহিত 'রা' ও 'এরা' যোগ হয়। যেমন, মানুষেরা, কেরানীরা ইত্যাদি।

এই 'রা' ও 'এরা' জীববাচক বিশেষ্যপদ ছাড়া অন্যত্র ব্যবহৃত হয় না।

হলন্ত শব্দের সঙ্গে 'এরা' এবং অন্য স্বরান্ত শব্দের সঙ্গে 'রা' যুক্ত হয়। যেমন বালকেরা, বধূরা। বালকগুলি, বধূগুলি ইত্যাদিও হয়।

কথিতভাষায় এই 'এরা' চিহ্নের 'এ' প্রায়ই লুপ্ত হইয়া থাকে— আমরা বলি বালকরা, ছাত্ররা ইত্যাদি।

ব্যক্তিবাচক বিশেষ্যপদেরও বহুবচনরূপ হইয়া থাকে। যথা, রামেরা— অর্থাৎ রাম ও আনুষঙ্গিক অন্য সকলে। এরূপ স্থলে কদাপি গুলা গুলির প্রয়োগ হয় না। কারণ রামগুলি বলিলে প্রত্যেকটিরই রাম হওয়া আবশ্যক হয়।

ইহা হইতে বুঝা যাইতেছে এই 'এরা' সম্বন্ধকারকরূপ হইতে উৎপন্ন। অর্থাৎ রামের সহিত সম্বন্ধযুক্ত যাহারা তাহারাই 'রামেরা'। যেমন তির্যকরূপে 'জন' শব্দকে জোর দিয়া হইয়াছে 'জনা', সেইরূপ 'রামের' শব্দকে জোর দিয়া হইয়াছে রামেরা।

'সব', 'সকল' ও 'সমুদয়' শব্দ বিশেষ্য শব্দের পূর্বে বিশেষণরূপে প্রযুক্ত হইয়া বহুত্ব অর্থ প্রকাশ করে। কিন্তু বস্তুত এই বিশেষণগুলি সমষ্টিবাচক। 'সব লোক' এবং 'লোকগুলি'-র মধ্যে অর্থভেদ আছে। 'সব লোক' ইংরেজিতে all men এবং লোকগুলি the men।

লিখিত বাংলায়, 'সকল' ও 'সমুদয়' শব্দ বিশেষ্যপদের পরে বসে। কিন্তু কথিত বাংলায় কখনোই তা হয় না। সকল গোরু বলি, গোরু সকল বলি না। বাংলা ভাষায় প্রকৃতিবিরুদ্ধ এইরূপ প্রয়োগ সম্ভবত আধুনিককালে গদ্যরচনা সৃষ্টির সময়ে প্রবর্তিত হইয়াছে। লিখিত ভাষায় 'সকল' যখন কোনো শব্দের পরে বসে তখন তাহা তাহার মূল অর্থ ত্যাগ করিয়া শব্দটিকে বহুবচনের ভাব দান করে। লোকগুলি এবং লোকসকল একই অর্থে ব্যবহৃত হইতে পারে।

প্রাচীন লিখিত ভাষার 'সব' শব্দ বিশেষ্যপদের পরে যুক্ত হইত। এখন সে রীতি উঠিয়া গেছে, এখন কেবল পূর্বেই তাহার ব্যবহার আছে। কেবল বর্তমান কাব্যসাহিত্যে এখনো ইহার প্রয়োগ দেখা যায়— যথা, 'পাখি সব করে রব'। বর্তমানে বিশেষ্যপদের পরে 'সব' শব্দ বসাইতে হইলে বিশেষ্য বহুবচন রূপ গ্রহণ করে। যথা, পাখিরা সব, ছেলেরা সব অথবা ছেলেরা সবাই। বলা বাহুল্য, জীববাচক শব্দ ব্যতীত অন্যত্র বহুবচনে এই 'রা' ও 'এরা' চিহ্ন বসে না। বানরগুলা সব, ঘোড়াগুলা সব, টেবিলগুলা সব, দোয়াতগুলা সব— এইরূপ গুলাযোগে, সচেতন অচেতন সকল পদার্থ সম্বন্ধেই 'সব' শব্দ ব্যবহৃত হইতে পারে।

'অনেক' বিশেষণ শব্দ যখন বিশেষ্যপদের পূর্বে বসে তখন স্বভাবতই তদ্দ্বারা বিশেষ্যের বহুত্ব বুঝায়। কিন্তু এই 'অনেক' বিশেষণের সংস্রবে বিশেষ্যপদ পুনশ্চ বহুবচন রূপ গ্রহণ করে না। ইংরেজিতে many বিশেষণ সত্ত্বেও man শব্দ বহুবচন রূপ গ্রহণ করিয়া men হয়— সংস্কৃতে অনেকা লোকাঃ, কিন্তু বাংলায় অনেক লোকগুলি হয় না।

অথচ 'সকল' বিশেষণের যোগে বিশেষ্যপদ বিকল্পে বহুবচন রূপও গ্রহণ করে। আমরা বলিয়া থাকি, সকল সভ্যেরাই এসেছেন— সকল সভ্যই এসেছেন এরূপও বলা যায়। কিন্তু অনেক সভ্যেরা এসেছেন কোনোমতেই বলা চলে না। 'সব' শব্দও 'সকল' শব্দের ন্যায়। 'সব পালোয়ানরাই সমান' এবং 'সব' পালোয়ানই সমান' দুই চলে।

'বিস্তর' শব্দ 'অনেক' শব্দের ন্যায়। অর্থাৎ এই বিশেষণ পূর্বে থাকিলে বিশেষ্যপদ আর বহুবচন রূপ গ্রহণ করে না—'বিস্তর লোকেরা' বলা চলে না।

এইরূপ আর-একটি শব্দ আছে তাহা লিখিত বাংলায় প্রায়ই ব্যবহৃত হয় না— কিন্তু কথিত বাংলায় তাহারই ব্যবহার অধিক, সেটি 'ঢের'। ইহার নিয়ম 'বিস্তর' ও 'অনেক' শব্দের ন্যায়ই। 'গুচ্ছার' শব্দও প্রাকৃত বাংলায় প্রচলিত। ইহা প্রায়ই বিরক্তি-প্রকাশক। যখন বলি গুচ্ছার লোক জমেছে তখন বুঝিতে হইবে সেই লোকসমাগম প্রীতিকর নহে। ইহা সম্ভবত গোটাচার শব্দ হইতে উদ্‌ভূত।

সংখ্যাবাচক বিশেষ্য পূর্বে যুক্ত হইলে বিশেষ্যপদ বহুবচন রূপ গ্রহণ করে না। যেমন, চার দিন, তিন জন, দুটো আম।

গণ, দল, সমূহ, বৃন্দ, বর্গ, কুল, চয়, মালা, শ্রেণী, পঙ্‌ক্তি প্রভৃতি শব্দযোগে বিশেষ্যপদ বহুত্ব অর্থ গ্রহণ করে। কিন্তু ইহা সংস্কৃত রীতি। এইজন্য অবিকৃত সংস্কৃত শব্দ ছাড়া অন্যত্র ইহার ব্যবহার নাই। বস্তুত ইহাদিগকে বহুবচনের চিহ্ন বলাই চলে না। কারণ ইহাদের সম্বন্ধেও বহুবচনের প্রয়োগ হইতে পারে— যেমন সৈন্যগণেরা, পদাতিক দলেরা ইত্যাদি। ইহারা সমষ্টিবোধক।

ইহাদের মধ্যে 'গণ' শব্দ প্রাকৃত বাংলার অন্তর্গত হইয়াছে। এইজন্য 'পদাতিকগণ' এবং 'পাইকগণ' দুই বলা চলে। কিন্তু 'লাঠিয়ালবৃন্দ' 'কলুকুল' বা 'আটচালাচয়' বলা চলে না।

গণ, মালা, শ্রেণী ও পঙ্‌ক্তি শব্দ সর্বত্র ব্যবহৃত হইতে পারে না। গণ ও দল কেবল প্রাণীবাচক শব্দের সহিতই চলে। কখনো কখনো রূপকভাবে মেঘদল তরঙ্গদল বৃক্ষদল প্রভৃতি শব্দের ব্যবহার দেখা যায়। মালা, শ্রেণী ও পঙ্‌ক্তি শব্দের অর্থ অনুসারেই তাহার ব্যবহার, এ কথা বলা বাহুল্য।

প্রাকৃত বাংলায় এইরূপ অর্থবোধক শব্দ ঝাঁক, গোছা, আঁটি, গ্রাস। কিন্তু এগুলি সমাস-রূপে শব্দের সহিত সংযুক্ত হয় না। আমরা বলি পাখির ঝাঁক, চাবির গোছা, ধানের আঁটি, ভাতের গ্রাস, অথবা দুই ঝাঁক পাখি, এক গোছা চাবি, চার আঁটি ধান, দুই গ্রাস ভাত।

'পত্র' শব্দযোগে বাংলায় কতকগুলি শব্দ বহুত্ব অর্থ গ্রহণ করে। কিন্তু সেই বিশেষ কয়েকটি শব্দ ছাড়া অন্য শব্দের সহিত উহার ব্যবহার চলে না। গহনাপত্র, তৈজসপত্র, আসবাবপত্র, জিনিসপত্র, বিছানাপত্র, ঔষধপত্র, খরচপত্র, দেনাপত্র, চিঠিপত্র, খাতাপত্র, চোতাপত্র, হিসাবপত্র, নিকাশপত্র, দলিলপত্র, পুঁথিপত্র, বিষয়পত্র।

পরিমাণ-সম্বন্ধীয় বহুত্ব বোঝাইবার জন্য বাংলায় শব্দদ্বৈত ঘটিয়া থাকে; যেমন বস্তাবস্তা, ঝুড়িঝুড়ি, মুঠামুঠা, বাক্সবাক্স, কলসিকলসি, বাটিবাটি। এগুলি কেবলমাত্র আধারবাচক শব্দ সম্বন্ধেই খাটে; মাপ বা ওজন সম্বন্ধে খাটে না— গজ-গজ বা সের-সের বলা চলে না।

সময় সম্বন্ধেও বহুত্ব অর্থে শব্দদ্বৈত ঘটে— বার বার, দিন দিন, মাস মাস, ঘড়ি ঘড়ি। বহুত্ব বুঝাইবার জন্য সমার্থক দুই শব্দের যুগ্মতা ব্যবহৃত হয়, যেমন; লোকজন, কাজকর্ম, ছেলেপুলে, পাখিপাখালী জন্তুজানোয়ার, কাঙালগরিব, রাজারাজড়া, বাজনাবাদ্য। এই সকল যুগ্ম শব্দের দুই অংশের এক অর্থ নহে কিন্তু কাছাকাছি অর্থ এমন দৃষ্টান্তও আছে; দোকানহাট, শাকসবজি, বনজঙ্গল, মুটেমজুর, হাঁড়িকুঁড়ি। এরূপ স্থলে বহুত্বের সঙ্গে কতকটা বৈচিত্র্য বুঝায়। যুগ্ম শব্দের একাংশের কোনো অর্থ নাই এমনও আছে। যেমন, কাপড়চোপড়, বাসনকোসন, চাকরবাকর। এ স্থলেও কতকটা বৈচিত্র্য অর্থ দেখা যায়।

কথিত বাংলায় 'ট' অক্ষরের সাহায্যে একপ্রকার বিকৃত শব্দদ্বৈত আছে। যেমন, জিনিসটিনিস, ঘোড়াটোড়া। ইহাতে প্রভৃতি শব্দের ভাবটা বুঝায়।

কার্তিক ১৩১৮

স্ত্রীলিঙ্গ

ভারতবর্ষের অন্যান্য গৌড়ীয় ভাষায় শব্দগুলি অনেক স্থলে বিনা কারণেই স্ত্রী ও পুরুষ শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছে। হিন্দিতে ভোঁ (ভ্রূ), মৃত্যু, আগ (অগ্নি), ধূপ শব্দগুলি স্ত্রীলিঙ্গ। সোনা, রুপা, হীরা, প্রেম, লোভ পুংলিঙ্গ। বাংলা শব্দে এরূপ অকারণ, কাল্পনিক, বা উচ্চারণমূলক স্ত্রী পুরুষ ভেদ নাই। এমন-কি, অনেক সময় স্বাভাবিক স্ত্রীবাচক শব্দও স্ত্রীলিঙ্গসূচক কোনো প্রত্যয় গ্রহণ করে না। সেরূপ স্থলে বিশেষভাবে স্ত্রীজাতীয়ত্ব বুঝাইতে হইলে বিশেষণের প্রয়োজন হয়। কুকুর, বিড়াল, উট, মহিষ, প্রভৃতি শব্দগুলি সংস্কৃত শব্দের নিয়মে ব্যবহারকালে লিখিত ভাষায় কুক্কুরী, বিড়ালী, উষ্ট্রী, মহিষী হইয়া থাকে কিন্তু কথিত ভাষায় এরূপ ব্যবহার হাস্যকর।

সাধারণত ই এবং ঈ প্রত্যয় ও নি এবং নী প্রত্যয় যোগে বাংলায় স্ত্রীলিঙ্গপদ নিষ্পন্ন হয়। ই ও ঈ প্রত্যয়; ছোঁড়া ছুঁড়ি, ছোকরা ছুকরি, খুড়া খুড়ি, কাকা কাকি, মামা মামি, পাগলা পাগলি, জেঠা জেঠি জেঠাই, বেটা বেটি, দাদা দিদি, মেসো মাসি, পিসে পিসি, পাঁঠা পাঁঠি, ভেড়া ভেড়ি, ঘোড়া ঘুড়ি, বুড়া বুড়ি, বামন বাম্‌নি, খোকা খুকি, শ্যালা শ্যালি, অভাগা অভাগী, হতভাগা হতভাগী, বোষ্টম বোষ্টমী, নেড়া নেড়ি।

নি ও নী প্রত্যয়: কলু কলুনি, তেলি তেলিনি, গয়লা গয়লানি, বাঘ বাঘিনি, মালি মালিনী, ধোবা ধোবানি, নাপিত নাপ্‌তানি (নাপ্‌তিনি), কামার কামারনি, চামার চামারনি, পুরুত পুরুতনি, মেথর মেথরানি, তাঁতি তাঁতিনি, মজুর মজুরনি, ঠাকুর ঠাকুরানি (ঠাক্‌রুন), চাকর চাকরানি, হাড়ি

হাড়িনি, সাপ সাপিনি, পাগল পাগলিনি, উড়ে উড়েনি, কায়েত কায়েতনি, খোট্টা খোট্টানি, চৌধুরী চৌধুরানী, মোগল মোগলানি, মুসলমান মুসলমাননি, জেলে জেলেনি, রাজপুত রাজপুতনি, বেয়াই বেয়ান।

এই প্রত্যয়যোগের নিয়ম কী তাহা বলিবার কোনো প্রয়োজন নাই কারণ এ প্রত্যয়টি কেবলমাত্র কয়েকটি শব্দেই আবদ্ধ, তাহার বাহিরে প্রয়োজন হইলেও ব্যবহার হয় না। পাঞ্জাবি সম্বন্ধে পাঞ্জাবিনি, মারাঠা সম্বন্ধে মারাঠনি, গুজরাটি সম্বন্ধে গুজরাট্‌নি প্রয়োগ নাই। উড়েনি আছে কিন্তু শিখ্‌নি মগ্‌নি মাদ্রাজিনী নাই।

ময়ূর জাতির স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে দৃশ্যত বিশেষ পার্থক্য থাকাতে ভাষায় ময়ুর ময়ূরী ব্যবহৃত হয় কিন্তু চিল সম্বন্ধে এরূপ ব্যবহার নাই।

পুরুষ মেয়ে, অথবা পুরুষ মানুষ, মেয়ে মানুষ, স্বামী স্ত্রী, ভাই বোন, বাপ মা, ছেলে মেয়ে, মদ্দা মাদী, ষাঁড় গাই, বর কনে, জামাই বউ (বউ শব্দটি পুত্রবধূ ও স্ত্রী উভয় অর্থেই ব্যবহৃত হয়)। সাহেব বিবি বা মেম, কর্তা গিন্নি (গৃহিণী), ভূত পেত্নী প্রভৃতি কয়েকটি শব্দ আছে যাহার স্ত্রীলিঙ্গ-বাচক ও পুংলিঙ্গবাচক রূপ স্বতন্ত্র।

সংস্কৃত ভাষার মতো বাংলা ভাষায় স্ত্রীলিঙ্গ শব্দের বিশেষণ স্ত্রীলিঙ্গ হয় না। বাংলায় লিখিত বা কথিত ভাষায় সংস্কৃত শব্দ ব্যবহারকালে স্ত্রীলিঙ্গ শব্দের বিশেষণে কখনো কখনো স্ত্রীলিঙ্গ রূপ ব্যবহার হয়— কিন্তু ক্রমশ ভাষা যতই সহজ হইতেছে ততই ইহা কমিয়া আসিতেছে। বিষমা বিপদ, পরমা সম্পদ, বা মধুরা ভাষা পরম পণ্ডিতেও বাংলা ভাষায় ব্যবহার করেন না। বিশেষত বিশেষণ যখন বিশেষ্যের পরে ক্রিয়ার সহিত যুক্ত হয় তখন তাহা বর্তমান বাংলায় কখনোই স্ত্রীলিঙ্গ হয় না— অতিক্রান্তা রজনী বলা যাইতে পারে কিন্তু রজনী অতিক্রান্তা হইল, আজকালকার দিনে কেহই লিখে না।

সংস্কৃত ব্যাকরণের উচ্চারণমতে কতকগুলি শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ, সে স্থলে সংস্কৃত শব্দ ব্যবহারকালে আমরা সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়ম মানি কিন্তু আধুনিক ভাষায় দেশ সম্বন্ধে তাহা খাটে না। ভারতবর্ষ বা ভারত, সংস্কৃত ভাষায় কখনোই স্ত্রী শ্রেণীয় শব্দ হইতে পারে না, কিন্তু আধুনিক বঙ্গ সাহিত্যে তাহাকে ভারতমাতা বলিয়া অভিহিত করা হয়। বঙ্গও সেইরূপ বঙ্গমাতা। দেশকে মাতৃভাবে চিন্তা করাই প্রচলিত হওয়াতে দেশের নামকে সংস্কৃত ব্যাকরণ অনুসারে মানা হয় না।

কতকগুলি সংস্কৃত শব্দ বাংলায় স্ত্রী প্রত্যয় গ্রহণকালে সংস্কৃত নিয়ম রক্ষা করে না। যেমন, সিংহিনী (সিংহী), গৃধিনী (গৃধ্রী, গৃধ্র শব্দ সচরাচর ব্যবহৃত হয় না), অধীনী (অধীনা), হংসিনী (হংসী), সুকেশিনী (সুকেশী), মাতঙ্গিনী (মাতঙ্গী), কুরঙ্গিনী (কুরঙ্গী), বিহঙ্গিনী (বিহঙ্গী), ভুজঙ্গিনী (ভুজঙ্গী), হেমাঙ্গিনী (হেমাঙ্গী)।

বিশেষণ শব্দ বাংলায় স্ত্রী প্রত্যয় প্রাপ্ত হয় না কিন্তু বিশেষণপদ বিশেষ্য অর্থ গ্রহণ করিলে এ নিয়ম সর্বত্র খাটে না। খেঁদী, নেকী।

ইয়া প্রত্যয়ান্ত শব্দ স্ত্রীলিঙ্গে ইয়া প্রত্যয় ত্যাগ করিয়া ই প্রত্যয় গ্রহণ করে। ঘর-ভাঙানিয়া (ভাঙানে) ঘরভাঙানী, মনমাতানিয়া মনমাতানী, পাড়াকুঁদুলিয়া পাড়াকুঁদুলি, কীর্তনীয়া কীর্তনী।

হিন্দিতে ক্ষুদ্রতা ও সৌকুমার্য-বোধক ই প্রত্যয়যুক্ত শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ বলিয়া গণ্য হয়— পুং গাড়া, স্ত্রীং গাড়ি, পুং রস্‌সা, স্ত্রীং রস্‌সী।

বাংলায় বৃহত্ব অর্থে আ ও ক্ষুদ্রত্ব অর্থে ই প্রত্যয় প্রয়োগ হইয়া থাকে, অন্যান্য গৌড়ীয় ভাষার দৃষ্টান্ত অনুসারে ইহাদিগকে পুংলিঙ্গ ও স্ত্রীলিঙ্গ বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে।

রসা রসি, দড়া দড়ি, ঘড়া ঘটি, বড়া বড়ি, ঝোলা ঝুলি, নোড়া নুড়ি, গোলা গুলি, হাঁড়া হাঁড়ি, ছোরা ছুরি, ঘুষা ঘুষি, কুপা কুপি, কড়া কড়ি, ঝোড়া ঝুড়ি, কলস কল্‌সি, জোড়া জুড়ি, ছাতা ছাতি।

কোনো কোনো স্থলে এইপ্রকার রূপান্তরে কেবল ক্ষুদ্রত্ব বৃহত্ত্ব ভেদ বুঝায় না একেবারে দ্রব্যভেদ বুঝায়। যথা, কোঁড়া (বাঁশের) কুঁড়ি (ফুলের), জাঁতা জাঁতি, বাটা (পানের) বাটি।

কিন্তু এ কথা বলা আবশ্যক টা ও টি, গুলা ও গুলি স্ত্রীলিঙ্গ পুংলিঙ্গ উভয় প্রকার শব্দেই ব্যবহৃত হয়। মেয়েগুলো ছেলেগুলি, বউটা জামাইটি ইত্যাদি।

অগ্রহায়ণ ১৩১৮

প্রতিশব্দ

১

ইংরেজি ভাষার সঙ্গে বাংলা ভাষার একটা কারবার চলিয়াছে। সেই কারবার-সূত্রে বিশ্বের হাটে আমাদের ভাবের লেনা-দেনা ঘটিতেছে। এই লেনা-দেনায় সব চেয়ে বিঘ্ন ভাষায় শব্দের অভাব। একদিন আমাদের দেশের ইংরেজি পড়ুয়ারা এই দৈন্য দেখিয়া নিজের ভাষার প্রতি উদাসীন ছিলেন। তাঁহারা ইংরাজিতেই লেখাপড়া শুরু করিয়াছিলেন।

কিন্তু বাংলাদেশের বড়ো সৌভাগ্য এই যে, সেই বড়ো দৈন্যের অবস্থাতেও দেশে এমন সকল মানুষ উঠিয়াছিলেন যাঁহারা বুঝিয়াছিলেন বাংলা ভাষার ভিতর দিয়া ছাড়া দেশের মনকে বলবান করিবার কোনো উপায় নাই। তাঁহারা ভরসা করিয়া তখনকার দিনের বাংলা ভাষার গ্রাম্য হাটেই বিশ্বসম্পদের কারবার খুলিয়া বসিলেন। সেই কারবারের মূলধন তখন সামান্য ছিল কিন্তু আশা ছিল মস্ত। সেই আশা দিনে দিনেই সার্থক হইয়া উঠিতেছে। আজ মূলধন বাড়িয়া উঠিয়াছে— আজ শুধু কেবল আমাদের আমদানির হাট নয়— রফ্‌তানিও শুরু হইল।

ইহার ফল হইয়াছে এই যে বাংলাদেশ, ধনের বাণিজ্যে যথেষ্ট পিছাইয়া আছে বটে কিন্তু ভাবের বাণিজ্যে বাংলাদেশ ভারতের অন্যান্য প্রদেশকে ছাড়াইয়া গেল। মাদ্রাজে যখন গিয়াছিলাম তখন একটা প্রশ্ন বার বার অনেকের কাছেই শুনিয়াছি—"মৌলিন্যে[১] বাংলাদেশ আমাদের চেয়ে এত অগ্রসর হইল কেন?" তাহার সব কারণ স্পষ্ট করিয়া নির্দেশ করা সহজ নহে। কিন্তু অন্তত একটা কারণ এই যে, বাঙালির ছেলেমেয়ে শিশুকাল হইতেই বাংলা সাহিত্য হইতে তাহাদের মনের খোরাক পাইয়া আসিতেছে। অধিক বয়সে যে পর্যন্ত না ইংরেজি শেখে সে পর্যন্ত তাহার মন উপবাসী থাকে না।

আজ পর্যন্ত আমাদের ভাষা প্রধানত ধর্মসাহিত্য এবং রসসাহিত্য লইয়াই চলিয়া আসিতেছে। দর্শন বিজ্ঞান প্রভৃতির আলোচনায় যে-সকল শব্দের দরকার তাহা আমাদের ভাষায় জমে নাই। এইজন্য আমাদের ভাষায় শিক্ষার উচ্চ অঙ্গ কানা হইয়া আছে।

কিন্তু কেবল পরিভাষা নহে, সকলপ্রকার আলোচনাতেই আমরা এমন অনেক কথা পাই যাহা ইংরেজি ভাষায় সুপ্রচলিত, অথচ যাহার ঠিক প্রতিশব্দ বাংলায় নাই। ইহা লইয়া আমাদের পদে

---

[১] দ্রষ্টব্য : প্রতিশব্দ ২

পদেই বাধে। আজিকার দিনে সে-সকল কথার প্রয়োজন উপেক্ষা করিবার জো নাই। এইজন্য শান্তিনিকেতন পত্রে আমরা মাঝে মাঝে এ সম্বন্ধে আলোচনা করিব। আমরা প্রতিশব্দ বানাইবার চেষ্টা করিব— তাহা যে সাহিত্যে চলিবে এমন দাবি করিব না, কেবল তাহার যাচাই করিতে ইচ্ছা করি। আমি চাই আমাদের ছাত্র ও অধ্যাপকেরা এ সময়ে কিছু ভাবিবেন। কোনো শব্দ যদি পছন্দ না হয়, বা আর-একটা শব্দ যদি তাঁহাদের মাথায় আসে, তবে এই পত্রে তাহা জানাইবেন।

ইংরেজি Nation[1] কথাটার আমরা প্রতিশব্দরূপে 'জাতি' কথাটা ব্যবহার করি। নেশান শব্দের মূল ধাতুগত অর্থ জাতি শব্দের সঙ্গে মেলে। যাহাদের মধ্যে জন্মগত বন্ধনের ঐক্য আছে তাহারাই নেশন। তাহাদিগকেই আমরা জাতি বলিতে পারিতাম কিন্তু আমাদের ভাষায় জাতি শব্দ একদিকে অধিকতর ব্যাপক, অন্যদিকে অধিকতর সংকীর্ণ। আমরা বলি পুরুষজাতি, স্ত্রীজাতি, মনুষ্যজাতি, পশুজাতি ইত্যাদি। আবার ব্রাহ্মণ শূদ্রের ভেদও জাতিভেদ। এমন স্থলে নেশনের প্রতিশব্দরূপে জাতি শব্দ ব্যবহার করিলে সেটা ঠিক হয় না। আমি নেশন শব্দের প্রতিশব্দ ব্যবহার না করিয়া ইংরেজি শব্দটাই চালাইবার চেষ্টা করিয়াছি।

ইংরেজি Nation, race, tribe, caste, genus, species— এই ছয়টা শব্দকে আমরা জাতি শব্দ দিয়া তর্জমা করি। তাহাতে ভাষার শৈথিল্য ঘটে। আমি প্রতিশব্দের একটা খসড়া নিম্নে লিখিলাম— এ সম্বন্ধে বিচার প্রার্থনা করি।

Nation— অধিজাতি। National— আধিজাতিক। Nationalism— আধিজাত্য।

Race— প্রবংশ। Race preservation— প্রবংশ রক্ষা।

Tribe— জাতি সম্প্রদায়।

Caste— জাতি, বর্ণ।

Genus এবং speciesকে যথাক্রমে মহাজাতি ও উপজাতি নাম দেওয়া যাইতে পারে।

আষাঢ় ১৩২৬

২

প্রতিশব্দ সম্বন্ধে আষাঢ়ের শান্তিনিকেতনে যে প্রবন্ধ বাহির হইয়াছিল সে সম্বন্ধে পাঠকদের কাছ হইতে আলোচনা আশা করিয়াছিলাম। কিন্তু এখনো কাহারো কাছ হইতে কোনো সাড়া মেলে নাই। কিন্তু এ-সব কাজ একতরফা হইলে কাঁচা থাকিয়া যায়। যে-সকল শব্দকে ভাষায় তুলিয়া লইতে হইবে তাহাদের সম্বন্ধে বিচার ও সম্মতির প্রয়োজন।

আমি নিজেই বলিয়াছি নেশন কথাটাকে তর্জমা না করিয়া ব্যবহার করাই ভালো। ওটা নিতান্তই ইংরেজি, অর্থাৎ ঐ শব্দের দ্বারা যে অর্থ প্রকাশ করা হয়, সে অর্থ ইহার আগে আমরা ব্যবহার করি নাই। এমন-কি, ইংরেজিতেও নেশনের সংজ্ঞা নির্ণয় করা শক্ত।

সেইজন্যই বাংলায় প্রচলিত কোনো শব্দ নেশনের প্রতিশব্দরূপে ব্যবহার করিলে কিছুতেই খাপ খাইবে না। "জাতি" কথাটা ঐ অর্থে আজকাল আমরা ব্যবহার করি বটে কিন্তু তাহাতে ভাষার ঢিলামিকে প্রশ্রয় দেওয়া হইতেছে। বরঞ্চ সাহিত্য ইতিহাস সংগীত বিদ্যালয় প্রভৃতি শব্দ-সহযোগে যখন আমরা 'জাতীয়' বিশেষণ প্রয়োগ করিয়া থাকি তখন তাহাতে কাজ চলিয়া যায়—

---

[1] দ্রষ্টব্য : প্রতিশব্দ ১২

কারণ ঐ বিশেষণের অন্য কোনো কাজ নাই। সেইজন্যই 'জাতীয়' বিশেষণ শব্দটি ন্যাশনল শব্দের প্রতিশব্দরূপে এমনি শিকড় গাড়িয়া বসিয়াছে যে, উহাকে আর উৎপাটিত করিবার জো নাই। কিন্তু কোনো বৈজ্ঞানিক গ্রন্থে যদি nation, race, tribe, clan শব্দের বিশেষত্ব নির্দেশ করার প্রয়োজন ঘটে তবে বিপদে পড়িতে হইবে। সুতরাং নেশন ও ন্যাশনাল কথাটা বাংলায় জাতে তুলিয়া লওয়া কর্তব্য মনে করি। এমন বিস্তর বিদেশী কথা বাংলায় চলিয়া গেছে।

এই 'জাতি' শব্দের প্রসঙ্গে আর-একটি শব্দ মনে পড়িতেছে যাহার একটা কিনারা করা আশু আবশ্যক। কোনো বিশেষকালে-জাত সমস্ত প্রজাকে ইংরেজিতে generation বলে। বর্তমান অতীত বা ভাবী জেনেরেশন সম্বন্ধে যখন বাংলায় আলোচনার দরকার হয় তখন আমরা পাশ কাটাইয়া যাই। কিন্তু বিঘ্ন দূর না করিয়া বিঘ্ন এড়াইয়া চলিলে ভাষার দুর্বলতা ঘোচে না।

বস্তুত বাংলায় 'প্রজা' কথার অন্য অর্থ যদি চলিত না থাকিত তবে ঐ কথাটি ঠিক কাজে লাগিত। বর্তমানে যাহারা জাত তাহাদিগকে বর্তমানকালের প্রজা, অতীতকালে যাহারা জাত তাহাদিগকে অতীত কালের প্রজা বলিলে কোনো গোল হইত না। কিন্তু এখন আর উপায় নাই।

'জন' কথাটারও ঐ রকমেরই অর্থ। জন্ম শব্দের সঙ্গেই উহার যোগ। কিন্তু উহার প্রচলিত অর্থটি প্রবল, অন্য কোনো অর্থে উহাকে খাটানো চলিবে না।

অতএব প্রজা এবং জন এই কথার মাঝামাঝি একটা কথা যদি পাওয়া যায় তাহা হইলে সেটা ব্যবহারে লাগানো যায়। যথা প্রজন। মনুতে স্ত্রীলোকের বর্ণনাস্থলে আছে 'প্রজনার্থং মহাভাগাঃ পূজার্হা গৃহদীপ্তয়ঃ।' অর্থাৎ প্রজনের জন্য স্ত্রীজাতি পূজনীয়া। ইংরেজি ভাষায় generation শব্দের অন্য যে-অর্থ আছে অর্থাৎ জন্মদান করা, এই প্রজনের সেই অর্থ। কিন্তু পূর্বকথিত অর্থে এই শব্দকে ব্যবহার করিলে কানে খারাপ লাগিবে না। প্রজন শব্দটা প্রথমে বুঝিতে হয়তো গোল ঠেকিবে, উহার বদলে যদি 'প্রজাত' শব্দ ব্যবহার করা হয় তাহা হইলে অপেক্ষাকৃত সহজে বুঝা যাইবে। এ সম্বন্ধে পাঠকদের মত জানিতে চাই।

আমার 'প্রতিশব্দ' প্রবন্ধ উপলক্ষে একটিমাত্র বিতর্ক উঠিয়াছে। সেটা 'মৌলীন্য' কথা লইয়া। Originality শব্দের যে প্রতিশব্দ আজকাল চলিতেছে সেটা 'মৌলিকতা'। সেটা কিছুতেই আমার ভালো লাগে নাই। কারণ 'মৌলিক' বলিলে সাধারণত বুঝায় মূলসম্বন্ধীয়— ইংরেজিতে radical বলিতে যাহা বুঝায়। যথা, radical change— মৌলিক পরিবর্তন। আপনাতেই যাহার মূল, তাহাকে মৌলিক বলিলে কেমন বেখাপ শোনায়। বরং নিজমূলক বলিলে চলে। কখনো কখনো আমি 'স্বকীয়তা' শব্দ Originality অর্থে ব্যবহার করিয়াছি। কিন্তু সর্বত্র ইহা খাটে না। বিশেষ কাব্যকে স্বকীয় কাব্য বলা চলে না। মৌলিক কাব্য বলিলেও যে সুশ্রাব্য হয় তাহা নহে, তবু চোখ কান বুজিয়া সেটাকে কণ্ঠস্থ করা যায়।

এইজন্যই কুলীন শব্দে যেমন কুলগৌরব প্রকাশ করে তেমনি মূলীন শব্দে মূলগৌরব প্রকাশ করিবে এই মনে করিয়াই ঐ কথাটাকে আশ্রয় করিয়াছিলাম। কিন্তু শাস্ত্রীমহাশয় বলিয়াছেন কুলীন শব্দ ব্যাকরণের যে-বিশেষ নিয়মে উৎপন্ন মূলীন শব্দে সে নিয়ম খাটে না। শুনিয়া ভয় পাইয়াছি। ভুল পুরাতন হইয়া গেলে বৈধ হইয়া উঠে, নূতন ভুলের কৌলীন্য নাই বলিয়াই ভাষায় তাহা পঙ্‌ক্তি পায় না। বাংলায় সংস্কৃত ব্যাকরণের ব্যভিচার অনেক চলিয়াছে; কিন্তু আজকালকার দিনে পূর্বের চেয়ে পাহারা কড়াক্কড় হওয়ায় সে সম্ভাবনা আর নাই। অতএব জাতমাত্রই মৌলীন্য শব্দের অন্ত্যেষ্টি সৎকার করা গেল।

ভাদ্র ১৩২৬

৩

বাংলায় 'অপূর্ব' শব্দ বিশেষ অর্থে প্রচলিত হইয়াছে।[১] 'অপূর্ব সৌন্দর্য' বলিতে আমরা original beauty বুঝি না। যদি বলা যায় কবিতাটি অপূর্ব তাহা হইলে আমরা বুঝি তাহার বিশেষ একটি রমণীয়তা আছে, কিন্তু তাহা যে original এরূপ বুঝি না। ইংরেজিতে যাঁহাকে original man বলা যায় তিনি চিন্তায় কর্মে বা আচরণে অন্য কাহারো অনুসরণ করেন না। বাংলায় যদি তাঁহাকে বলি 'লোকটি অপূর্ব' তাহা হইলে সেটা ঠাট্টার মতো শোনায়। বোধ হয় এরূপ প্রসঙ্গে স্বানুবর্তী ও স্বানুবর্তিতা কথাটা চলিতে পারে। কিন্তু রচনা বা কর্ম সম্বন্ধে ও কথাটা খাটিবে না। 'আদিম' শব্দটি বাংলায় যদি 'primitive' অর্থে না ব্যবহৃত হইত তাহা হইলে ওই শব্দটির প্রয়োগ এরূপ স্থলে সংগত হইত। বিশেষ কবিতাটি আদিম বা তাহার মধ্যে আদিমতা আছে বলিলে ঠিক ভাবটি বোঝায়। বস্তুত, অপূর্ব = strange. আদিম = original। অপূর্ব সৌন্দর্য = strange beauty. আদিম সৌন্দর্য = original beauty, আদি গঙ্গা = the original Ganges। আদি বুদ্ধ = the original Buddha। আদি জ্যোতি = the original light। অপূর্ব জ্যোতি বলিলে বুঝাইবে, the strange light। আদি পুরুষ = the original ancestor, এরূপ স্থলে অপূর্ব পুরুষ বলাই চলে না।

ভাদ্র ১৩২৬

৪

ইংরেজি পারিভাষিক শব্দের বাংলা করিবার চেষ্টা মাঝে মাঝে হইয়াছে। কিন্তু ইংরেজিতে অনেক নিত্যপ্রচলিত সামান্য শব্দ আছে বাংলায় তাহার তর্জমা করিতে গেলে বাধিয়া যায়। ইংরেজি ক্লাসে বাংলায় ইংরেজি ব্যাখ্যা করিবার সময় পদে পদে ইহা অনুভব করি। ইহার একটা কারণ, তর্জমা করিবার সময় আমরা স্বভাবতই সাধু ভাষার সন্ধান করিয়া থাকি, চলিত ভাষায় যে-সকল কথা অত্যন্ত পরিচিত সেইগুলিই হঠাৎ আমাদের মনে আসে না। চলিত ভাষা লেখাপড়ার গণ্ডির মধ্যে একেবারেই চলিতে পারে না এই সংস্কারটি থাকাতেই আমাদের মনে এইরূপ বাধা ঘটিয়াছে। 'আমার' পরে তাহার sympathy নাই' ইহার সহজ বাংলা 'আমার 'পরে তাহার দরদ্ নাই', কিন্তু চলিত বাংলাকে অপাঙ্‌ক্তেয় ঠিক করিয়াছি বলিয়া ক্লাসে বা সাহিত্যে উহার গতিবিধি বন্ধ। এইজন্য 'সহানুভূতি' বলিয়া একটা বিকট শব্দ জোর করিয়া বানাইতে হইয়াছে; এই গুরুভার শব্দটা ভীমের গদার মতো, ইহাকে লইয়া সর্বদা সাধারণ কাজে ব্যবহার করিতে গেলে বড়োই অসংগত হয়।[২]

দরদ কথাটা ঘর-গড়া নয়, ইহা সজীব, এইজন্য ইহার ব্যবহারের বৈচিত্র্য আছে। 'লোকটা দরদী' বলিলেই কথাটার ভাব বুঝিতে বিলম্ব হয় না— কিন্তু 'লোকটা সহানুভব' বলিলে কী যে বলা হইল বোঝাই যায় না, যদিচ মহানুভব কথাটা চলিত আছে। আমরা বলি, ওস্তাদজি দরদ দিয়া

---

[১] বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয় প্রতিশব্দ প্রসঙ্গে শান্তিনিকেতন পত্রে (ভাদ্র ১৩২৬) আলোচনাপ্রসঙ্গে originality-র প্রতিশব্দরূপে 'অপূর্বতা' শব্দের ব্যবহার প্রস্তাব করেন।

[২] দ্রষ্টব্য : 'চিহ্নবিভ্রাট' এবং 'শব্দচয়ন' প্রবন্ধ।

গান করেন', ইংরেজিতে এ স্থলে sympathy শব্দের ব্যবহার আছে কিন্তু 'সহানুভূতি দিয়া গান করেন' বলিলে মনে হয় যেন ওস্তাদজি গানের প্রতি বিষম একটা অত্যাচার করেন।

আসল কথা, অনুভূতি শব্দটা বাংলায় নূতন আমদানি, এইজন্য উহার 'পরে আমাদের দরদ জন্মে নাই। এইজন্যই 'সহানুভূতি' শব্দটা শুনিলে আমাদের হৃদয় তখনি সাড়া দেয় না। এই কথাটা কাব্যে, এমন-কি, মেঘনাদবধের সমান ওজন কোনো মহাকাব্যেও, ব্যবহার করিতে পারেন এমন দুঃসাহসিক কেহ নাই। অনুভূতি কথাটা যেমন নূতন, বেদনা কথাটা তেমনি পুরাতন। এইজন্য সমবেদনা কথাটা কানে বাজে না। যেখানে দরদ শব্দটা খাপ খায় না সেখানে আমি 'সমবেদনা' শব্দ ব্যবহার করি, পারৎপক্ষে 'সহানুভূতি' ব্যবহার করি না।

তর্জমা করিবার সময় একটা জিনিস আমরা প্রায় ভুলিয়া যাই। প্রত্যেক ভাষায় এমন কোনো কোনো শব্দ থাকে যাহার নানা অর্থ আছে। আমাদের 'ভাব' কথাটা, কোথাও বা idea, কোথাও বা thought, কোথাও বা feeling, কোথাও বা suggestion, কোথাও বা gist। ভাব কথাটাকে ইংরেজিতে তর্জমা করিবার সময়ে সকল জায়গাতেই যদি idea শব্দ প্রয়োগ করি তবে তাহা অদ্ভুত হইবে। 'এই প্রস্তাবের সহিত আমাদের সহানুভূতি আছে' এরূপ বাক্য প্রয়োগ আমরা মাঝে মাঝে শুনিয়াছি। ইহা ইংরেজি ভাষা-ব্যবহারের নকল, কিন্তু বাংলায় ইহা অত্যন্ত অসংগত। এ স্থলে 'এই প্রস্তাবে আমাদের সম্মতি আছে' বলা যায়— কারণ, প্রস্তাবের অনুভূতি নাই, সুতরাং তাহার সহিত সহানুভূতি চলে না। অতএব একভাষায় যেখানে একশব্দের দ্বারা নানা অর্থ বোঝায় অন্য ভাষায় তাহার এক প্রতিশব্দ হইতেই পারে না।

গতবারের শান্তিনিকেতনে originality শব্দের আলোচনাস্থলে আমরা ইহার প্রমাণ পাইয়াছি। কোনো একজন মানুষের originality আছে এই ভাব ব্যক্ত করিবার সময়ে তাঁহার স্বানুবর্তিতা আছে বলা চলে না, সে স্থলে 'আদিমতা' আছে বলিলে ঠিক হয়; যে কবিতা হইতে আর-একটি কবিতা তর্জমা করা হইয়াছে সেই কবিতাকে মূল কবিতা বলিতে হইবে। যে কবিতায় বিশেষ অসামান্যতা আছে, তাহাকে অনন্যতন্ত্র কবিতা বলা চলে। ইহার উপযুক্ত সংস্কৃত কথাটি 'স্বতন্ত্র'— কিন্তু বাংলায় অন্য অর্থে তাহার ব্যবহার। বস্তুত আমার মনে হয়, কি মানুষ সম্বন্ধে, কি মানুষের রচনা সম্বন্ধে, উভয় স্থলেই অনন্যতন্ত্র শব্দের ব্যবহার চলিতে পারে।

একটি অত্যন্ত সহজ কথা লইয়া বাংলা ভাষায় আমাদিগকে প্রায় দুঃখ পাইতে হয়— সে কথাটি feeling। Feeling-এর একটা অর্থ বোধশক্তি— ইহাকে আমরা 'অনুভূতি' শব্দের দ্বারা প্রকাশ করিতেছি। আর-একটি অর্থ হৃদয়বৃত্তি। কিন্তু হৃদয়বৃত্তি শব্দটা পারিভাষিক। সর্বদা ব্যবহারে ইহা চলিতে পারে না। অনেক সময়ে কেবলমাত্র 'হৃদয়' শব্দের দ্বারা কাজ চালানো যায়; যেখানে ইংরেজিতে বলে 'feeling উত্তেজিত হইয়াছে' সেখানে বাংলায় বলা চলে, 'হৃদয়' উত্তেজিত হইয়াছে। যে মানুষের feeling আছে তাহাকে সহৃদয় বলি। 'কবি এই কবিতায় যে feeling প্রকাশ করিয়াছে' এরূপ স্থলে feeling-প্রতিশব্দ স্বরূপে হৃদয়ভাব বলা যায়। শুধু 'ভাব'ও অনেক সময়ে feeling-এর প্রতিশব্দরূপে চলে। Emotion শব্দটি বাংলায় তর্জমা করিবার সময় আমি বরাবর 'আবেগ' ও 'হৃদয়াবেগ' শব্দ ব্যবহার করিয়া আসিয়াছি। যাঁহারা সংস্কৃত জানেন তাঁহাদের কাছে আমার প্রশ্ন এই যে, সংস্কৃত ভাষায় পারিভাষিক ও সহজ অর্থে 'feeling' শব্দের কোন্ কোন্ প্রতিশব্দ ব্যবহৃত হয়?

ইংরেজি culture শব্দের বাংলা লইয়া অনেক সময় ঠেকিতে হয়।[১] 'learning' এবং 'culture' শব্দের মধ্যে যে পার্থক্য আছে তাহা সংস্কৃত কোন্‌ শব্দের দ্বারা বোঝায় আমি ঠিক জানি না। 'বৈদগ্ধ্য' শব্দের অর্থ ঠিক culture বলিয়া আমার বোধ হয় না। Culture শব্দে যে ভাব প্রকাশ হয় তাহা বাংলায় ব্যবহার না করিলে একেবারেই চলিবে না। একটি বিশেষ স্থলে আমি প্রথমে 'চিত্তোৎকর্ষ' শব্দ ব্যবহার করিয়াছিলাম; কারণ culture শব্দের মতোই 'উৎকর্ষ' শব্দের মধ্যে কর্ষণের ভাব আছে। পরে আমি 'চিত্তোৎকর্ষের' পরিবর্তে 'সমুৎকর্ষ' শব্দটি গ্রহণ করিয়াছিলাম। আমার জিজ্ঞাস্য এই যে, শুধু 'উৎকর্ষ' শব্দ এই বিশেষ অর্থে চালানো যায় কি না। cultured mind-এর বাংলা করা যাইতে পারে 'প্রাপ্তোৎকর্ষ-চিত্ত'। ভালো শোনায় যে তাহা নহে। 'উৎকর্ষিত' চিত্ত বলা যাইতে পারে; মানুষ সম্বন্ধে ব্যবহারের বেলায় 'উৎকর্ষ-বান' লোক বলিলে ক্ষতি হয় না। উৎকৃষ্ট বিশেষণ শব্দটি হাতছাড়া হইয়া গিয়াছে। যেমন 'learning' এবং 'culture' তেমনি 'knowledge' এবং 'wisdom'-এর প্রভেদ আছে। কোন্‌ কোন্‌ শব্দের দ্বারা সেই প্রভেদ নির্ণীত হইবে তাহার উত্তরের অপেক্ষা করিয়া রহিলাম।

কিছুদিন হইল আর-একটি ইংরেজি কথা লইয়া আমাকে ভাবিতে হইয়াছিল। সেটি 'degeneracy', আমি তাহার বাংলা করিয়াছিলাম আপজাত্য। যাহার আপজাত্য ঘটিয়াছে সে অপজাত (degenerate)। প্রথমে জননাপকর্ষ কথাটা মনে আসিয়াছিল, কিন্তু সুবিধামতো তাহাকে বিশেষণ করা যায় না বলিয়া ছাড়িয়া দিতে হইল। বিশেষত অপ উপসর্গই যখন অপকর্ষবাচক তখন কথাটাকে বড়ো করিয়া তোলা অনাবশ্যক।

এই প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করি genetics নামে যে নূতন বিজ্ঞানের উদ্‌ভব হইয়াছে তাহাকে কি প্রজনতত্ত্ব নাম দেওয়া যাইতে পারে? আমি eugenics শব্দের বাংলা করিয়াছি সৌজাত্যবিদ্যা।

এই প্রজনতত্ত্বের একটি প্রধান আলোচ্য বিষয় heredity। বাংলায় ইহাকে বংশানুগতি এবং inherited শব্দকে বংশানুগত বলা চলে। কিন্তু inheritance-কে কী বলা যাইবে? বংশাধিকার অথবা উত্তরাধিকার inheritable— বংশানুলোম্য।

Adaptation শব্দকে আমি অভিযোজন নাম দিয়াছি। নিজের surroundings-এর সহিত adaptation— নিজের পরিবেষ্টনের সহিত অভিযোজন। Adaptability— অভিযুজ্যতা। Adaptable— অভিযোজ্য। Adapted— অভিযোজিত।

আশ্বিন-কার্তিক ১৩২৬

৫

কয়েকটি ইংরেজি শব্দের প্রতিশব্দ স্থির করিয়া দিবার জন্য অনুরোধ করিয়া একজন পত্র লিখিয়াছেন।

১ প্রশ্ন। I envy you your interest in art। এখানে interest শব্দের অর্থ কী?

উত্তর। বলা বাহুল্য interest শব্দের অনেকগুলি ভিন্ন অর্থ আছে। বাংলায় তাহাদের জন্য পৃথক শব্দ ব্যবহার করিতে হইবে। এখানে উক্ত ইংরেজি শব্দের স্থলে বাংলায় 'অনুরক্তি' শব্দ ব্যবহার করা চলে।

---

[১] দ্রষ্টব্য : 'কাল্‌চার ও সংস্কৃতি' প্রসঙ্গ।

২ প্রশ্ন। Attention is either spontaneous or reflex। এখানে spontaneous ও reflex শব্দের প্রতিশব্দ কী হওয়া উচিত।

উত্তর। Spontaneous— স্বতঃসৃত। Reflex— প্রতিক্ষিপ্ত।

৩ প্রশ্ন। Forethought-প্রতিশব্দ কী?

উত্তর। প্রসমীক্ষা, প্রসমীক্ষণ, পূর্ব-বিচারণা।

৪ প্রশ্ন। 'By suggestion I can cure you'. 'The great power latent in this form of suggestiveness is wellknown'. Suggestion ও suggestiveness-এর প্রতিশব্দ কী?

উত্তর। সাধারণত বাংলায় suggestion ও suggestiveness-এর প্রতিশব্দ ব্যঞ্জনা ও ব্যঞ্জনাশক্তি চলিয়া গিয়াছে। কোনো বিশেষ বাক্যপ্রয়োগে শব্দার্থের অপেক্ষা ভাবার্থের প্রাধান্যকে ব্যঞ্জনা বলা হয়। কিন্তু এখানে 'suggestion' শব্দ দ্বারা বুঝাইতেছে, আভাসের দ্বারা একটা চিন্তা ধরাইয়া দেওয়া। এ স্থলে 'সূচনা' ও 'সূচনাশক্তি' শব্দ ব্যবহার করা যাইতে পারে।

৫ প্রশ্ন। 'Instinct similar to the action inspired by suggestion' ইহার অনুবাদ কী?

উত্তর। সূচনার দ্বারা প্রবর্তিত যে মানসিক ক্রিয়া তাহারই সমজাতীয় সহজ প্রবৃত্তি।

বলা বাহুল্য আমাদের পত্রে আমরা যে প্রতিশব্দের বিচার করি তাহা পাঠকদের নিকট হইতে তর্ক-উদ্দীপন করিবার জন্যই। সকল প্রতিশব্দের চূড়ান্ত নিষ্পত্তির ক্ষমতা আমাদের নাই।

অগ্রহায়ণ ১৩২৬

৬

কয়েকটি চিঠি পাইয়াছি তাহাতে পত্রলেখকগণ বিশেষ কতকগুলি ইংরেজি শব্দের প্রতিশব্দ জানিতে চাহিয়াছেন। নতুন একটা শব্দ যখন বানানো যায় তখন অধিকাংশ লোকের কানে খট্‌কা লাগে। এইজন্য অনেকে দেখি রাগ করিয়া উঠেন। সেইজন্য বার বার বলিতেছি আমাদের যেমন শক্তিও অল্প অভিমানও তেমনি অল্প। কেহ যদি কোনো শব্দ না পছন্দ করেন দুঃখিত হইব না। ভাষায় যে-সব ভাবপ্রকাশের দরকার আছে তাহাদের জন্য উপযুক্ত শব্দ ঠিক করিয়া দেওয়া একটা বড়ো কাজ। অনেকে চেষ্টা করিতে করিতে তবে ইহা সম্পন্ন হইবে। আমাদের চেষ্টা যদি এক দিকে ব্যর্থ হয় অন্য দিকে সার্থক হইবে। চেষ্টার দ্বারা চেষ্টাকে উত্তেজিত করা যায়, সেইটেই লাভ। এইজন্যই, কোনো ওস্তাদীর আড়ম্বর না করিয়া আমাদের সাধ্যমতো পত্রলেখকদের প্রেরিত ইংরেজি শব্দের প্রতিশব্দ ভাবিয়া বাহির করিবার চেষ্টা করিতেছি।

পূর্ববারে লিখিয়াছি হিপ্নটিজ্‌ম্ প্রক্রিয়ার অন্তর্গত suggestion শব্দের প্রতিশব্দ 'সূচনা'। আমরা ভাবিয়া দেখিলাম সূচনা শব্দের প্রচলিত ব্যবহারের সহিত ইহার ঠিক মিল হইবে না। তাই ইংরেজি suggestion-এর স্থলে 'অভিসংকেত' শব্দ পারিভাষিক অর্থে ব্যবহার করিতে ইচ্ছা করি। অভি উপসর্গ দ্বারা কোনো-কিছুর অভিমুখে শক্তি বা গতি বা ইচ্ছা প্রয়োগ করা বুঝায়; ইংরেজি towards-এর সহিত ইহার মিল। অভ্যর্থনা, অভিনন্দন, অভিযান, অভিপ্রায় প্রভৃতি শব্দ তাহার প্রমাণ। Auto-suggestion শব্দের প্রতিশব্দ স্বাভিসংকেত হইতে পারে। একজন জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, "আমরা কথায় বলি 'তোমায় কয়েকটি উপায় suggest করতে পারি' এ ক্ষেত্রে বাংলায় কী বলিব?" একটা কথা মনে রাখা দরকার, কোনো টাট্‌কা তৈরি কথা চলিত কথাবার্তায়

অদ্ভুত শোনায়। প্রথমে যখন সাহিত্যে খুব করিয়া চলিবে, তখন মুখের কথায় ধীরে ধীরে তাহার প্রবেশ ঘটিবে। 'অভিসংকেত' কথাটা যদি চলে তবে প্রথমে বইয়ে চলিবে। "কয়েকটি উপায় অভিসংকেত করা যাইতে পারে" লিখিলে বুঝিতে কষ্ট হইবে না।

উক্ত লেখকই প্রশ্ন করিয়াছেন, "Adaptability-র বাংলা কী হইতে পারে? আমরা পূর্বেই বলিয়াছি, 'অভিযুজ্যতা'। একজন সংস্কৃতজ্ঞ পাঠক তাঁহার পত্রে জানাইয়াছেন, "উপযোগিতাই ভালো।" উপযোগিতা বলিতে suitability বুঝায়। যাহা উপযুক্ত তাহা স্বভাবতই উপযুক্ত হইতে পারে কিন্তু adapt করা চেষ্টাসাপেক্ষ। 'অভিযোজিত' বলিলে সহজেই বুঝায় একটা-কিছুর অভিমুখে যাহাকে যোজনা করা হইয়াছে; যাহা সহজেই যুক্ত তাহার সহিত ইহার বিশেষ প্রভেদ আছে। আর-একজন পণ্ডিত লিখিয়াছেন—'যোজিত' অপেক্ষা 'যুক্ত'ই ব্যাকরণসম্মত। আমরা ব্যাকরণ সামান্যই জানি কিন্তু আমাদের নজির আছে—

পরমে ব্রহ্মণি যোজিত চিত্তঃ
নন্দতি নন্দতি নন্দত্যেব।

প্রশ্ন। Paradox শব্দের বাংলা আছে কি?

নাই বলিয়াই জানি। শব্দ বানাইতে হইবে, ব্যবহারের দ্বারাই তাহার অর্থ পাকা হইতে পারে। বিসংগত সত্য বা বিসংগত বাক্য এই অর্থে চালাইলে চলিতে পারে কি না জিজ্ঞাসা করি।

Parody— ব্যঙ্গানুকরণ।

Amateur শব্দের একটা চলিত বাংলা 'অব্যবসায়ী'। কিন্তু ইহার মধ্যে একটু যেন নিন্দার ভাব আছে। তাহা ছাড়া ইহাতে অভ্যস্ত দক্ষতার অভাবমাত্র বুঝায় কিন্তু অনুরাগ বুঝায় না। ইংরেজিতে কখনো কখনো সেইরূপ নিন্দার ভাবেও এই শব্দের ব্যবহার হয়, তখন অব্যবসায়ী কথা চলে। অন্য অর্থে শখ শব্দ বাংলায় চলে, যেমন শখের পাঁচালি, শখের যাত্রা। ব্যবহারের সময় আমরা বলি শৌখিন। যেমন শৌখিন গাইয়ে।

প্রশ্নকর্তা লিখিতেছেন, "Violet কথাটার বাংলা কী? নীলে সবুজে মিলিয়া বেগুনি, কিন্তু নীলে লালে মিলিয়া কী?"

আমার ধারণা ছিল নীলে লালে বেগুনি। ভুল হইতেও পারে। সংস্কৃতে violet শব্দের প্রতিশব্দ পাটল বলিয়া জানি।

পত্রলেখক romantic শব্দের বাংলা জানিতে চাহিয়াছেন। ইহার বাংলা নাই এবং হইতেও পারে না। ইংরেজিতে এই শব্দটি নানা সূক্ষ্মভাবে এমনি পাঁচরঙা যে ইহার প্রতিশব্দ বানাইবার চেষ্টা না করিয়া মূল শব্দটি গ্রহণ করা উচিত।

লেখক dilettante শব্দের বাংলা জানিতে চাহিয়াছেন। মোটামুটি পল্লবগ্রাহী বলা চলে। কিন্তু তাহার সঙ্গে সঙ্গে আরো যে-সব ভাবের আভাস আছে বাংলা শব্দে তাহা পাওয়া যাইবে না। প্রত্যেক ভাষাতেই এমন বিস্তর শব্দ আছে যাহা তাহার মোটা অর্থের চেয়ে বেশি কিছু প্রকাশ করে। সেইরূপ ফরাসি অনেক শব্দের ইংরেজি একেবারেই নাই। আমার মনে আছে—একদা ভগিনী নিবেদিতা আমার নিম্নলিখিত গানের পদটি দুই ঘণ্টা ধরিয়া তর্জমা করিবার চেষ্টা করিয়া ছাড়িয়া দিয়াছিলেন—

নিশিদিন ভরসা রাখিস,
ওরে মন, হবেই হবে।[১]

---

[১] দ্রষ্টব্য : চিহ্নবিভ্রাট, ভূমিকাংশ।

প্রথম বাধিল ‘ভরসা’ কথা লইয়া। ভরসা কথার সঙ্গে দুটো ভাব জড়ানো, confidence এবং courage। কিন্তু ইংরেজি কোনো এক শব্দে এই দুটো ভাব ঠিক এমন করিয়া মেলে না। Faith, trust, assurance কিছুতেই না। তার পরে ‘হবেই হবে’ কথাটাকে ঠিক অমন করিয়া একদিকে অস্পষ্ট রাখিয়া আর-এক দিকে খুব জোর দিয়া বলা ইংরেজিতে পারা যায় না। এ স্থলে ইংরেজিতে একটু ঘুরাইয়া বলা চলে—

> Keep thy courage of Faith, my heart,
> And thy dreams will surely come ture.

পৌষ ১৩২৬

৭

...Two mindednessকে দ্বৌমানসিকতা বললে কি রকম হয়। কিংবা Two minded = দ্বৈতমনা, ও Two mindedness = দ্বৈতমানস।...[1]

৯ জ্যৈষ্ঠ ১৩১৭

৮

মহান = Sublime
মহিমা = Sublimity

সৌন্দর্য ও মহিমা— এইটেই ভালো লাগ্‌চে। ভূমা শব্দের অসুবিধা অনেক। কারণ বিশেষ্য বিশেষণ একই হওয়া ব্যবহারের পক্ষে একেবারেই ভালো নয়।....[2]

১৩ জ্যৈষ্ঠ ১৩১৯

৯

আমার শরীর ও মনের অটুট কুঁড়েমি শেষ নৈষ্কর্ম্য রাত্রির পূর্বসন্ধ্যা বলে ধরে নিতে পারো। এই নৈঃশব্দ্যের যুগে আমার কাছে শব্দসৃষ্টির প্রত্যাশা নিয়ে এসেছ, কুণ্ঠিত করেছ আমার লেখনীকে। রচনার প্রসঙ্গে পরিভাষা যখন আপনি এসে পড়ে তখন সেটা মাপসই মানানসই হয়। পা রইল এ পাড়ায় আর জুতো তৈরি হচ্ছে ও পাড়ায়, ব্যবহারের পক্ষে এটা অনেক সময়েই পীড়াজনক ও ব্যর্থ হয়। অপর পক্ষে নতুন জুতো প্রথমটা পায়ে আঁট হলেও চলতে চলতে পা তাকে নিজের গরজে আপনার মাপের করে নেয়। পরিভাষা সম্বন্ধেও সেরকম প্রায়ই ঘটে।

Harmony— স্বরসংগম বা স্বরসংগতি।
Concord— স্বরৈক্য
Discord— বিস্বর

১-২ অজিতকুমার চক্রবর্তীকে লিখিত পত্র

Symphony— ধ্বনিমিলন
Symphonic— সংধ্বনিক

সংস্কৃত ধাতুপ্রত্যয় যেখানে সহজে সাড়া না দেয় সেখানে মূল শব্দের শরণ নিয়ো। ভাষায় ম্লেচ্ছ সংস্রবদোষ একদা গর্হিত ছিল। এখন সেদিন নেই— এখন ভাষার অম্নিবাসে ফিরিঙ্গিতে বাঙালিতে ঘেঁষাঘেঁষি বসে।...[১]

২৪ নভেম্বর ১৯২৭

১০

...আমার মতে "স্বপ্নাঞ্চিত" কথাটা অন্তত এখনো চলনসই হয়নি— রোমাঞ্চিত কথাটার মানে, রোম carved হয়ে ওঠা— আমি তৃণাঞ্চিত কথা ব্যবহার করেচি— সেটা যদিও অচলিত তবু অচলনীয় নয়। মঞ্জীরকে "তিক্ত" বল্‌লে ভাষায় ফিরিঙ্গি গন্ধ লাগে। ইংরেজিতে bitter কথাটা রসনাকে ছাড়িয়ে হৃদয় পর্যন্ত প্রবেশ করে— বাংলায় "তীব্র" কথাটা স্বাদে এবং ভাবে আনাগোনা করে কিন্তু তিক্ত কথাটাকে অন্তত নূপুরের বিশেষণরূপে চালাবার পূর্বে তোমার কবিযশকে এখনো অনেক দূর সুপ্রতিষ্ঠিত ও পরিব্যাপ্ত করতে হবে। "স্বীকৃতির" পরিবর্তে খ্যাতি বলাই ভালো। "সুগুপ্ত" কথাটা আমার কানে অত্যন্ত পীড়ন সঞ্চার করে। যেখানে গুপ্ত শব্দের সঙ্গে সু বিশেষণের সংগতি আছে সেখানে দোষ নেই। অনেকে খামকা সু-উচ্চ কথা ব্যবহার করে কিন্তু ওতে কেবল ছন্দোরক্ষার অনাচার প্রকাশ পায়।...[২]

৬ মে ১৯৩১

১১

The Voice কথাটার বাংলা প্রতিশব্দ চাও। বাণী ছাড়া আর কোনো শব্দ মনে পড়ে না। আমাদের ভাষায় আকাশবাণী দৈববাণী প্রভৃতি কথার ব্যবহার আছে। শুধু "বাণী" কথাটিকে যদি যথেষ্ট মনে না কর তবে "মহাবাণী" ব্যবহার ক'রতে পারো।...[৩]

২৭ শ্রাবণ ১৩৩৮

১২

আমার মনে হয় নেশান, ন্যাশন্যাল প্রভৃতি শব্দ ইংরেজিতেই রাখা ভালো। যেমন অক্সিজেন হাইড্রোজেন। ওর প্রতিশব্দ বাংলায় নেই। রাষ্ট্রজন কথাটা চালানো যেতে পারে। রাষ্ট্রজনিক এবং রাষ্ট্রজনিকতা শুন্‌তে খারাপ হয় না। আমার মনে হয় রাষ্ট্রজনের চেয়ে রাষ্ট্রজাতি সহজ হয়। কারণ

[১-২] দিলীপকুমার রায়কে লিখিত পত্র

[৩] ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত রায়কে লিখিত পত্র

নেশন অর্থে জাতি শব্দের ব্যবহার বহুল পরিমাণে চ'লে গেছে। সেই কারণেই রাষ্ট্রজাতি কথাটা কানে অত্যন্ত নতুন ঠেকবে না।

Caste— জাত Nation— রাষ্ট্রজাতি
Race— জাতি People— জনসমূহ
Population— প্রজন[১]

২২ জানুয়ারি ১৯৩২

১৩

দুরূহ আপনার ফরমাস। Broadcast-এর বাংলা চান। আমি কখনো কখনো ঠাট্টার সুরে বলি আকাশবাণী।[২] কিন্তু সেটা ঠাট্টার বাইরে চলবে না।...

সীরিয়াসভাবে যদি বলতে হয় তা হলে একটা নতুন শব্দ বানানো চলে। বলা বাহুল্য পারিভাষিক শব্দ পুরোনো জুতো বা পুরোনো ভৃত্যের মতো— ব্যবহার করতে করতে তার কাছ থেকে পুরো সেবা পাওয়া যায়।

"বাক্‌প্রসার" শব্দটা যদি পছন্দ হয় টুকে রাখবেন, পছন্দ যদি না হয় তা হলেও দুঃখিত হবো না। ওর চেয়ে ভালো কথা যদি পান তবে তার চেয়ে ভালো কিছু হতে পারে না।[৩]

১ বৈশাখ ১৩৪২

১৪

শরীর ভালো ছিল না, ব্যস্ত ছিলাম, তার উপরে তোমার প্রশ্ন অত্যন্ত কঠিন, যে চারটে শব্দ তর্জমা করতে অনুরোধ করেছ সেগুলি যদি সশ্রম কারাদণ্ডে ব্যবহার করতে দিতে তা হলে তিন-চার মাসের মেয়াদ ভর্তি হতে পারত।

Intellectual friendship শব্দের ভাষান্তরে তোমাদের প্রস্তাব 'আধিমানসিক মিত্রতাবোধ'। আপত্তি এই, মিত্রতা মানসিক হবে না তো আর কি হতে পারে? মানসিক শব্দের অর্থ intellectual-এর চেয়ে ব্যাপক— বস্তুত ওর ইংরেজি হচ্ছে mental। Intellect-কে বুদ্ধি বল্‌লে বোঝা সহজ হয় বুদ্ধিগত বা বুদ্ধিমূলক বা বুদ্ধিপ্রধান মৈত্রী অথবা মৈত্রীবোধ বল্‌লে কানে খটকা লাগবে না। ওর প্রতিকূল হচ্ছে emotional অর্থাৎ ভাবপ্রধান বা হৃদয়প্রধান।

Cultural self শব্দটাকে তর্জমা করা আরো দুঃসাধ্য। তোমাদের প্রস্তাব হচ্ছে 'আধি সাংস্কৃতিক'। এর ঠিক মানেটা আন্দাজ করা অসম্ভব বললেই হয়। প্রথমত culture শব্দের

---

[১] রেবতীমোহন বর্মনকে লিখিত পত্র

[২] 'ধরার আঙিনা হতে ঐ শোনো উঠিল আকাশবাণী' কবিতায় (৫ অগস্ট ১৯৩৮) রবীন্দ্রনাথ শব্দটি ব্যবহার করেন। নলিনীকান্ত সরকার-প্রণীত 'শ্রদ্ধাস্পদেষু' গ্রন্থে (১৮৭৯ শকাব্দ) "রবীন্দ্রনাথ" প্রবন্ধে কবিতাটি উদ্ধৃত ও রচনার প্রসঙ্গ আলোচিত।

[৩] চারুচন্দ্র ভট্টাচার্যকে লিখিত পত্র

বাংলা একটি করতে হবে। আমি বলি মনঃপ্রকর্ষ বা চিত্তপ্রকর্ষ বল্‌লে ভাবখানার একটা ইসারা পাওয়া যায়। Cultured লোককে বলা যেতে পারে প্রকৃষ্টচিত্ত বা প্রকৃষ্টমনা। যদি বলতে হয় অঙ্কশাস্ত্রে তিনি culured তা হলে বাংলায় বলবে অঙ্কশাস্ত্রে তিনি প্রকর্ষপ্রাপ্ত। অমুক পরিবারে culture-এর atmosphere আছে বলতে হলে বলা যেতে পারে, অমুক পরিবারে মনঃপ্রকর্ষ বা চিত্তপ্রকর্ষের আবহাওয়া আছে। কৃষ্টি কথাটা আমার কানে একটুও ভালো লাগে না। বরঞ্চ উৎকৃষ্টি[১] বল্‌লেও কোনোমতে চলত।

যা হোক আমার মতে cultural self-কে চিত্তপ্রকর্ষগত বা মনঃপ্রকর্ষগত সত্তা বা ব্যক্তিত্ব বলা যায়। আরো দুটো কথা দিয়েছ intellectual passion, intellecutal self। সংরাগ শব্দকে আমি passion অর্থে ব্যবহার করি। অতএব আমার মতে intellectual passion-কে বুদ্ধিগত সংরাগ ও intellectual self-কে বুদ্ধিগত ব্যক্তিত্ব বল্‌লে ভাবটা বুঝতে বাধবে না।

যাই হোক বহুল ব্যবহার ছাড়া এ-সব শব্দ ভাষায় প্রাণবান হয়ে ওঠে না।

বলা বাহুল্য physical culture-কে বলতে হবে দেহপ্রকর্ষ চর্চা।[২]

৪ আষাঢ় ১৩৩৯

১৫

ভূতত্ত্বের পরিভাষা আলোচনা আমার পক্ষে অসাধ্য। Fossil শব্দকে শিলক ও Fossilized-কে শিলীকৃত বলা চলে। Sub-man-কে অবমানব বললেই ভালো হয়। প্রাতর্‌ ও প্রত্যূষ শব্দের যোগে যে শব্দ বানিয়েছ কানে অসংগত ঠেকে। প্রাতর্‌ শব্দের পরিবর্তে প্রথম বা প্রাক্‌ ব্যবহার করলে চলে না কি, Eolith = প্রাক্‌প্রস্তর। Eoanthropus = প্রাক্‌মানব। Eocene = প্রাগাধুনিক।

Proterozoic = পরাজৈবিক।[৩]

৭ কার্তিক ১৩৩৯

১৬

পরিভাষা সংকলনের কাজ আপনি যে নিয়মে চালাচ্ছেন সে আমার অনুমোদিত। আপনার কাজ শেষ হতে দীর্ঘকাল লাগবে। কিন্তু বাংলা ভাষার বৈজ্ঞানিক পাঠ্যপুস্তক রচনার কাজে অধিক দেরি করা চলবে না। বই যাঁরা লিখ্‌বেন তাঁদের মধ্যে যোগ্যতম ব্যক্তিদের হাতেই পরিভাষার চরম নির্বাচন ও প্রচলন নির্ভর করে; উপস্থিত মতো যথাসম্ভব তাঁদের সাহায্য করবার কাজে আমরা প্রবৃত্ত হয়েছি। ভাষায় সব সময়ে যোগ্যতমের নির্বাচন নীতি খাটে না— অনেক সময়ে অনেক আকস্মিক কারণে অযোগ্য শব্দ টিকে যায়। সর্বপ্রধান কারণ হচ্ছে তাড়া— শেষ পর্যন্ত বিচার করবার সময় যখন পাওয়া যায় না তখন আপাতত কাজ সারার মতো শব্দগুলো চিরস্বত্ব দখল

---

[১] দ্রষ্টব্য : 'কালচার ও সংস্কৃতি'।

[২] সুধীরকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়কে লিখিত পত্র

[৩] সতীশরঞ্জন খাস্তগীরকে লিখিত পত্র

করে বসে। আমার মনে হয় যথাসম্ভব সত্বর কাজ করা উচিত— কাজ চলতে চলতে ভাষা গড়ে উঠবে— তখন পরিভাষিক শব্দগুলি অনেক স্থলে প্রথার জোরেই ব্যাকরণ ডিঙিয়ে আপন অর্থ স্থির করে নেবে।[১]

২১ আষাঢ় ১৩৪১

১৭

যখন কোনো ইংরেজি শব্দের নূতন প্রতিশব্দ রচনা করতে বসি তখন প্রায় ভুলে যাই যে অনেক সময়ে সে শব্দের ভিন্ন অর্থে প্রয়োগ হয়। Background, ছবি সম্বন্ধে এক মানে, বিষয় সম্বন্ধে অন্য মানে, আবার কোনো কোনো জায়গায় ওই শব্দে বোঝায় প্রচ্ছন্ন বা অনাদৃত স্থান। পটভূমিকা শব্দটা আমিই প্রথমে যে জায়গায় ব্যবহার করেছিলেম সেখানে তার সার্থকতা ছিল। পশ্চাদ্ভূমিকা বা পৃষ্ঠাশ্রয় হয়তো অধিকাংশ স্থলে চলতে পারে। "শিশিরবাবুর নাটকে গানের অনুভূমিকা বা পশ্চাদ্ভূমিকা" বললে অসংগত শোনায় না। বলা বাহুল্য নতুন তৈরি শব্দ নতুন জুতোর মতো ব্যবহার করতে করতে সহজ হয়ে আসে। "এই নভেলের ঐতিহাসিক পশ্চাদ্ভূমিকা" বললে অর্থবোধের বিঘ্ন হয় না। কিন্তু আমার প্রশ্ন এই যে এ-সকল স্থানে ইংরেজির অবিকল অনুবাদের প্রয়োজন কী? এ স্থলে যদি বলা যায়— ঐতিহাসিক ভূমিকা বা ভিত্তি তা হলে তাতে কি নালিশ চলে— কোনোমতে ঐ 'পশ্চাৎ' শব্দটা কি জুড়তেই হবে? আশ্রয় বা আশ্রয়বস্তু কথাটাও মন্দ নয়। ইংরেজিতেও অনেক সময়ে একই অর্থে foundation বললেও চলে, background বললেও চলে, support বললেও চলে।

"কায়াচিত্র"[২] Tableau-এর ভালো অনুবাদ সন্দেহ নেই।

Allusion এবং reference অধিকাংশ স্থলেই সমার্থক। বাংলা করতে হলে ভিন্ন ভিন্ন স্থলে ভিন্ন ভিন্ন শব্দ প্রয়োগ করতে হবে— যেমন সংকেত, লক্ষ্য, উদ্দেশ, উদাহরণ। বলা যেতে পারে, মল্লিনাথের টীকায় দিঙ্‌নাগাচার্যের সমুদ্দেশ পাওয়া যায়। Reference স্থলবিশেষে পরিচয় অর্থেও ব্যবহৃত হয়। যেমন certificate-এর সমর্থক reference।

"সুমেরিয় ইতিহাসে ইন্দ্র দেবতার allusion আছে," এখানে allusion যদি অস্পষ্ট হয় তবে সেটা ইঙ্গিত, যদি স্পষ্ট হয় তবে সেটা উদাহরণ। Alluding to his character— "তাঁর চরিত্রের প্রতি লক্ষ্য করে।" মোটের উপর অভিনির্দেশ অভিসংকেত শব্দ দ্বারা reference-এর allusion-এর অর্থ বোঝানো যেতে পারে। রক্তকরবীর নন্দিনীকে লক্ষ্য ক'রে যদি 'art' শব্দ ব্যবহার করতে হয় তা হলে বলা উচিত 'কলারূপিণী'। Technical term-এর প্রচলিত বাংলা— পারিভাষিক শব্দ।[৩]

৮ আষাঢ় ১৩৪৩

---

[১] জ্ঞানেন্দ্রলাল ভাদুড়ীকে লিখিত পত্র

[২] পত্রলেখক-কর্তৃক প্রস্তাবিত ও রাজশেখর বসু-কর্তৃক অনুমোদিত প্রতিশব্দ

[৩] ক্ষিতিভূষণ মুখোপাধ্যায়কে লিখিত পত্র

১৮

Relief শব্দের প্রচলিত বাংলা প্রতিশব্দ উৎকীর্ণ-চিত্র— যদি অক্ষর হয় তবে উৎকীর্ণ লিপি।[১]

১০।১।৩৭

১৯

Proximo ও Ultimo শব্দের সহজ প্রতিশব্দ গত মাসিক ও আগামী মাসিক।[২]

২৮ শ্রাবণ ১৩৪৪

২০

...Image কথাটার প্রতিশব্দ প্রতিমা— স্থান বিশেষে আর কিছুও হোতে পারে।[৩]

? ১. ৪০

প্রদোষ

১

আমার লেখায়[৪] "প্রদোষ" শব্দের প্রয়োগে অর্থের ভুল ঘটেচে, সেই নিন্দা[৫] ক্ষালনের জন্য তোমার পত্রিকায় কিছু প্রয়াস[৬] দেখা গেল। আমার প্রতি তোমাদের শ্রদ্ধা আছে জেনেই আমি বলচি এর কোনো প্রয়োজন ছিল না। অজ্ঞতা ও অনবধানতায় স্বকৃত ও অন্যকৃত দোষে অনেক ভুল আমার লেখায় থেকে গেছে। মেনে নিতে কখনো কুণ্ঠিত হই নে। পাণ্ডিত্যের অভাব এবং অন্য অনেক ত্রুটি সত্ত্বেও সমাদরের যোগ্য যদি কোনো গুণ আমার রচনায় উদ্‌বৃত্ত থাকে তবে সেইটের পরেই আমার একমাত্র ভরসা; নির্ভুলতার পরে নয়।

রাত্রির অল্পান্ধকার উপক্রমকেই বলে প্রদোষ, রাত্রির অল্পান্ধকার পরিশেষের বিশেষ কোনো শব্দ আমার জানা নেই। সেই কারণে প্রয়োজন উপস্থিত হলে ঐ শব্দটাকে উভয় অর্থেই ব্যবহার করবার ইচ্ছা হয়। এমনি করেই প্রয়োজনের তাগিদে শব্দের অর্থবিস্তৃতি ভাষায় ঘটে থাকে। সংস্কৃত অভিধানে যে শব্দের যে অর্থ, বাংলা ভাষায় সর্বত্র তা বজায় থাকে নি। সেই ওজর করেই আলোচিত লেখাটিকে যখন গ্রন্থ আকারে প্রকাশ করব তখন প্রদোষ কথাটার পরিবর্তন করব না এই রকম স্থির করেচি। সম্ভবত এই অর্থে এই শব্দটার প্রয়োগ আমার রচনায় অন্যত্রও আছে এবং ভাবীকালেও থাকবে। রাত্রির আরম্ভে ও শেষে যে আলো-অন্ধকারের সংগম, তার রূপটি একই,

---

[১] যোগেন্দ্রকিশোর রক্ষিত রায়কে লিখিত পত্র

[২] নিত্যানন্দ সেনগুপ্তকে লিখিত পত্র

[৩] ভবানীপ্রসাদ বাগচীকে লিখিত পত্র

[৪] "পারস্য যাত্রা", প্রবাসী, আষাঢ় ১৩৩৯ ; বর্তমানে 'পারস্য-যাত্রী' গ্রন্থ।

[৫] শনিবারের চিঠি, জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৯

[৬] বিচিত্রা, আষাঢ় ১৩৩৯

এবং একই নামে তাকে ডাকবার দরকার ঘটে। সংস্কৃত ভাষায় সন্ধ্যা শব্দের দুই অর্থই আছে কিন্তু বাংলায় তা চল্‌বে না।

আমার লেখায় এর চেয়ে গুরুতর ভুল, ইস্কুলের নীচের ক্লাসে পড়চে এমন ছেলে চিঠি লিখে একবার আমাকে জানিয়েছিল। আমি মিথ্যা তর্ক করি নি; তাকে সাধুবাদ দিয়ে স্বীকার করে নিয়েচি।— অপবাদের ভাষা ও ভঙ্গি অনুসারে কোনো স্থলে স্বীকার করা কষ্টসাধ্য, কিন্তু না করা ক্ষুদ্রতা। আমি পণ্ডিত নই, শোনা কথা বলচি; কালিদাসের মতো কবির কাব্যেও শাব্দিক ত্রুটি ধরা পড়েচে। কিন্তু ভাবিক ত্রুটি নয় বলেই তার সংশোধনও হয় নি, মার্জনাও হয়েচে। য়ুরোপীয় সাহিত্যে এবং চিত্রকলায় এরূপ দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। বৈষ্ণব পুরাণে কথিত আছে, রাধিকার ঘটে ছিদ্র ছিল কিন্তু নিন্দুকেরাও সেটা লক্ষ্য করলে না যখন দেখা গেল তৎসত্ত্বেও জল আনা হয়েছে। সাহিত্যে চিত্রকলায় এই গল্পটির প্রয়োগ খাটে।

বুদ্ধির দোষে, শিক্ষার অভাবে এবং মনোযোগের দুর্বলতায় এমন অনেক ভুল করে থাকি যার স্বপক্ষে কোনো কথাই বলা চলে না। তাতে এইমাত্র প্রমাণ হয় আমি অভ্রান্ত নই। ত্রুটি যাঁরা মার্জনা করেন ঔদার্য তাঁদেরই, যাঁরা না করেন তাদের দোষ দেওয়া যায় না। অনতিকাল পূর্বে আমার একটি প্রবন্ধে 'ব্যঞ্জনান্ত' শব্দের স্থলে 'হলন্ত' শব্দ ব্যবহার করেছিলুম। প্রবোধচন্দ্র তাঁর পত্রে আমার এই ভুল স্মরণ করিয়ে দিয়েচেন কিন্তু উল্লাস বা অবজ্ঞা প্রকাশ করেন নি। আমি সেজন্য কৃতজ্ঞ। সবুজপত্রে আমার লিখিত কোনো প্রবন্ধে ঠিক এই ভুলটিই দেখা যায় তার থেকে প্রমাণ হয় এটার কারণ অন্যমনস্কতা নয়, ব্যাকরণের পারিভাষিকে আমার অজ্ঞতা।[1]

২১ জুলাই ১৯৩২

২

... প্রত্যুষ শব্দটি কালবাঞ্জক— অর্থাৎ দিনরাত্রির বিশেষ একটি সময়াংশকে বলে প্রত্যুষ। বাংলা ভাষায় 'সন্ধ্যা' শব্দটিও তেমনি। আলো অন্ধকারের সমবায়ের যে একটি সাধারণ ভাবরূপ আছে, যেটা ইংরেজি twilight শব্দে পাওয়া যায় সাহিত্যে অনেক সময় সেইটেরই বিশেষ প্রয়োজন হয়। প্রদোষ শব্দকে আমি সেই অর্থেই ইচ্ছাপূর্বক ব্যবহার করি।[2]

২৩ অগস্ট ১৯৩২

৩

অমিয়র চিঠিতে তুমি লিখেচ, সকালবেলাকার আলো অন্ধকারের সময়কে প্রত্যুষ বলা হয়ে থাকে— সেই শব্দটাকে ব্যবহার করলে তার স্থলে প্রদোষ ব্যবহার করবার আভিধানিক দোষ কেটে যায়। প্রত্যুষ শব্দটা দিনরাত্রির একটি বিশেষ সময়কে নির্দেশ করে— অর্থাৎ যাকে বলে ভোরবেলা। ভোরে বা সন্ধ্যায় আলোকের অস্ফুটতায় যে একটি বিশেষ ভাব মনে আনে, প্রত্যুষ শব্দে সেটাকে প্রকাশ করা হয় না। প্রদোষ শব্দকে আমি সেই অর্থে ব্যবহার করি এবং করব। দোষ

---

[1] সুশীলচন্দ্র মিত্রকে লিখিত পত্র

[2] প্রবোধচন্দ্র সেনকে লিখিত পত্র। দ্রষ্টব্য : রবীন্দ্রনাথকে লিখিত প্রবোধচন্দ্র সেনের পত্র, বিচিত্রা, আশ্বিন ১৩৩৯।

শব্দের অর্থ রাত্রি— প্র উপসর্গটা সামনের দিকে তর্জনী তোলে— অতএব ঐ শব্দটাকে বিশ্লেষণ করে দুই অর্থই পাওয়া যেতে পারে— অর্থাৎ যে সময়টার সম্মুখে রাত্রি, অথবা রাত্রির সম্মুখে যে সময়। রাত্রির প্রবণতা যে দিকে। কিন্তু শব্দ বিশ্লেষণের দরকার নেই, দরকার আছে twilight শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ পাওয়ার। প্রদোষ শব্দটা সাধারণত বেকার বসে থাকে তার দ্বারা আমি সেই প্রয়োজন সিদ্ধ করব, যেহেতু অন্য কোনো শব্দ নেই।[১]

২৯ আশ্বিন ১৩৩৯

কালচার ও সংস্কৃতি

১

কাল্‌চার্ শব্দের একটা নতুন বাংলা কথা হঠাৎ দেখা দিয়েছে; চোখে পড়েছে কি? কৃষ্টি।[২] ইংরেজি শব্দটার আভিধানিক অর্থের বাধ্য অনুগত হয়ে ঐ কুশ্রী শব্দটাকে কি সহ্য করতেই হবে। এঁটেল পোকা পশুর গায়ে যেমন কাম্‌ড়ে ধরে ভাষার গায়ে ওটাও তেমনি কামড়ে ধরেছে। মাতৃভাষার প্রতি দয়া করবে না তোমরা?

অন্য প্রদেশে ভদ্রতা বোধ আছে। এই অর্থে সেখানে ব্যবহার 'সংস্কৃতি'। যে-মানুষের কালচার আছে তাকে বলা চলে সংস্কৃতিমান, শব্দটাকে বিশেষ্য করে যদি বলা যায় সংস্কৃতিমত্তা, ওজনে ভারি হয় বটে কিন্তু রোমহর্ষক হয় না। নিজের সম্বন্ধে অহংকার করা শাস্ত্রে নিষিদ্ধ, তবু আন্দাজে বলতে পারি, বন্ধুরা আমাকে কাল্‌চারড্ বলেই গণ্য করেন। কিন্তু যদি তাঁরা আমাকে সহসা কৃষ্টিমান উপাধি দেন বা আমার কৃষ্টিমত্তা সম্বন্ধে ভালোমন্দ কোনো কথার উত্থাপন করেন তবে বন্ধুবিচ্ছেদ হবে। অন্তত আমার মধ্যে কৃষ্টি আছে এ কথার প্রতিবাদ করাকে আমি আত্মলাঘব মনে করব না।

ইংরেজি ভাষায় চাষ এবং ভব্যতা একই শব্দে চলে গেছে ব'লে কি আমরাও বাংলা ভাষায় ফিরিঙ্গিয়ানা করব? ইংরেজিতে সুশিক্ষিত মানুষকে বলে কাল্‌টিভেটেড— আমরা কি সেইরকম উঁচুদরের মানুষকে চাষ করা মানুষ ব'লে সম্মান জানাব, অথবা বলব কেদারনাথ।

[সংস্কৃতভাষায় উৎকর্ষ প্রকর্ষ শব্দের ধাতুগত অর্থে চাষের ভাব আছে কিন্তু ব্যবহারে সে অর্থ কেটে গেছে। কৃষ্টিতে তা কাটে নি। সেইজন্যে তোমাদের সম্পাদকবর্গের কাছে আমার এই প্রশ্ন, চিৎপ্রকর্ষ বা চিত্তপ্রকর্ষ বা চিত্তোৎকর্ষ শব্দটাকে কালচার অর্থে চালালে দোষ কি? কাল্‌চারড্ মানুষকে প্রকৃষ্টচিত্ত লোক বলা যেতে পারে। কাল্‌চারড্ ফ্যামিলিকে প্রকর্ষবান পরিবার বললে সে-পরিবার গৌরব বোধ করবে। কিন্তু কৃষ্টিমান বললে চন্দনের সাবান মেখে স্নান করতে ইচ্ছা হবে।][৩]

৮ ডিসেম্বর ১৯৩২

---

[১] চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে লিখিত পত্র

[২] দ্রষ্টব্য : প্রতিশব্দ ১৪

[৩] ১৩৩৯ মাঘ সংখ্যা পরিচয় পত্রে চিহ্নবিভ্রাট নামে প্রকাশিত সুধীন্দ্রনাথ দত্তকে লিখিত পত্রের শেষাংশ। বাংলা শব্দতত্ত্বের ১৩৪২ সংস্করণ অনুযায়ী পত্রের অংশ দুই অংশে স্বতন্ত্রভাবে সন্নিবিষ্ট হইল। []-বন্ধনী-ভুক্ত অংশ ঐ সংস্করণে বর্জিত।

২

গত জ্যৈষ্ঠের (১৩৪২) 'প্রবাসীতে' একস্থানে ইংরেজি 'কাল্‌চার' শব্দের প্রতিশব্দ রূপে "কৃষ্টি" শব্দের ব্যবহার দেখে মনে খট্‌কা লাগল। বাংলা খবরের কাগজে একদিন হঠাৎ ব্রণের মতো ঐ শব্দটা চোখে পড়ল, তার পরে দেখলুম ওটা বেড়েই চলেছে। সংক্রামকতা খবরের কাগজের বস্তি ছাড়িয়ে উপর মহলেও ছড়িয়ে পড়ছে দেখে ভয় হয়। 'প্রবাসী' পত্রে ইংরেজি অভিধানের এই 'অবদান'টি সংস্কৃত ভাষার মুখোশ প'রে প্রবেশ করেছে, এটা নিঃসন্দেহ অনবধানতাবশত। প্রসঙ্গক্রমে বলে রাখি বর্তমান বাংলাসাহিত্যে 'অবদান' শব্দটির যে প্রয়োগ দেখতে দেখতে ব্যাপ্ত হল সংস্কৃত শব্দকোষে তা খুঁজে পাই নি।

এবারে সেই গোড়াকার কথাটায় ফেরা যাক। কৃষ্টি কথাটা হঠাৎ তীক্ষ্ণ কাঁটার মতো বাংলা ভাষার পায়ে বিঁধেছে। চিকিৎসা করা যদি সম্ভব না হয় অন্তত বেদনা জানাতে হবে। ঐ শব্দটা ইংরেজি শব্দের পায়ের মাপে বানানো। এতটা প্রণতি ভালো লাগে না।

ভাষায় কখনো কখনো দৈবক্রমে একই শব্দের দ্বারা দুই বিভিন্ন জাতীয় অর্থজ্ঞাপনের দৃষ্টান্ত দেখা যায়, ইংরেজিতে কাল্‌চার কথাটা সেই শ্রেণীর। কিন্তু অনুবাদের সময়েও যদি অনুরূপ কৃপণতা করি তবে সেটা নিতান্তই অনুকরণ-প্রবণতার পরিচায়ক।

সংস্কৃত ভাষায় কর্ষণ বলতে বিশেষভাবে চাষ করাই বোঝায় ভিন্ন ভিন্ন উপসর্গযোগে মূল ধাতুটাকে ভিন্ন ভিন্ন অর্থবাচক করা যেতে পারে, সংস্কৃত ভাষার নিয়মই তাই। উপসর্গভেদে এক কৃ ধাতুর নানা অর্থ হয়, যেমন উপকার বিকার আকার। কিন্তু উপসর্গ না দিয়ে কৃতি শব্দকে আকৃতি প্রকৃতি বা বিকৃতি অর্থে প্রয়োগ করা যায় না। উৎ বা প্র উপসর্গযোগে কৃষ্টি শব্দকে মাটির থেকে মনের দিকে তুলে নেওয়া যায়, যেমন উৎকৃষ্টি, প্রকৃষ্টি। ইংরেজি ভাষার কাছে আমরা এমনি কী দাসখৎ লিখে দিয়েছি যে তার অবিকল অনুবর্তন করে ভৌতিক ও মানসিক দুই অসবর্ণ অর্থকে একই শব্দের পরিণয়-গ্রন্থিতে আবদ্ধ করব?

বৈদিক সাহিত্যে সংস্কৃতি শব্দের ব্যবহার পাওয়া যায়, তাতে শিল্প সম্বন্ধেও সংস্কৃতি শব্দের প্রয়োগ আছে। 'আত্মসংস্কৃতির্বাব শিল্পানি।' এ'কে ইংরেজি করা যেতে পারে, Arts indeed are the culture of soul। 'ছন্দোময়ং বা এতৈর্যজমান আত্মানং সংস্কুরুতে'—এই-সকল শিল্পের দ্বারা যজমান আত্মার সংস্কৃতি সাধন করেন। সংস্কৃত ভাষা বলতে বোঝায় যে ভাষা বিশেষভাবে cultured, যে ভাষা cultured সম্প্রদায়ের। মারাঠি হিন্দি প্রভৃতি অন্যান্য প্রাদেশিক ভাষায় সংস্কৃতি শব্দটাই কাল্‌চার অর্থে স্বীকৃত হয়েছে। সাংস্কৃতিক ইতিহাস (cultural history) ক্রৈষ্টিক ইতিহাসের চেয়ে শোনায় ভালো। সংস্কৃত চিত্ত, সংস্কৃত বুদ্ধি cultured mind, cultured intelligence অর্থে কৃষ্টচিত্ত কৃষ্টবুদ্ধির চেয়ে উৎকৃষ্ট প্রয়োগ সন্দেহ নেই। যে মানুষ cultured তাকে কৃষ্টিমান বলার চেয়ে সংস্কৃতিমান বললে তার প্রতি সম্মান করা হবে।[১]

---

[১] প্রবাসী ভাদ্র ১৩৪২ সংখ্যায় এই প্রবন্ধ প্রকাশিত হইলে প্রবাসীর আশ্বিন সংখ্যায় যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি এই প্রসঙ্গে লেখেন—

"Culture of mind অর্থে কৃ-ষ্টি শব্দ প্রচলিত হয়েছে। গত ভাদ্রের প্রবাসীতে রবীন্দ্রনাথ আপত্তি তুলেছেন।

বোধ হয়, প্রথমে আমি কৃ-ষ্টি শব্দ প্রয়োগ করি। সে দশ-বার বৎসর পূর্বের কথা। আমি এখনো কৃ-ষ্টি লিখে থাকি। সং-স্কৃ-তি দেখেছি, কিন্তু আমার মনে লাগে নি। সং-স্কৃ-তি ও সং-স্কা-র অর্থে এক। সং-স্কা-র

৩

মনিয়র বিলিয়ম্‌সের অভিধানে কৃষ্টি ও সংস্কৃতি ও তার আনুষঙ্গিক শব্দের ইংরেজি কয়েকটি প্রতিশব্দ নিম্নে উদ্‌ধৃত করা গেল। বর্তমান আলোচ্য প্রসঙ্গে যেগুলি অনাবশ্যক সেগুলি বাদ দিয়েছি।

কৃষ্ট— ploughed or tilled, cultivated ground।

কৃষ্টি— men, races of men, learned man or pandit, ploughing or cultivating the soil।

সংস্কার— making perfect, accomplishment, embellishment।

সংস্কৃত— perfected, refined, adorned, polished, a learned man।

সংস্কৃতি— perfection।

কার্তিক ১৩৪২

প্রতিশব্দ-প্রসঙ্গ

১

"কেনেষিতং পততি প্রেষিতং মনঃ।
কেন প্রাণঃ প্রথমঃ প্রৈতিযুক্ত ॥...

'প্রৈতি' শব্দটির প্রতি আমরা পাঠকদের মনোযোগ আকর্ষণ করিতে ইচ্ছা করি। বাংলা ভাষায় এই শব্দটির অভাব আছে। যেখানে বেগপ্রাপ্তি বুঝাইতে ইংরেজিতে impulse শব্দের ব্যবহার হয় আমাদের বিবেচনায় বাংলায় সেই স্থলে প্রৈতি শব্দের প্রয়োগ হইতে পারে।" [1]

২

শ্রীযুক্ত সুবোধচন্দ্র মহলানবিশ জীবতত্ত্ব সম্বন্ধে কয়েকটি কথা লিখিয়াছেন... প্রবন্ধে যে দু-একটি পারিভাষিক শব্দ আছে, তৎসম্বন্ধে আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। বাংলায় এভোল্যুশন্

শব্দের নানা অর্থ আছে। মেদিনীকোষ তিনটি মূলার্থ দিয়েছেন— প্রতিযত্ন, অনুভব, মানসকর্ম। কৃ-ষ্টি শব্দের এত ব্যাপক অর্থ নাই।

অমরকোষে পণ্ডিত শব্দের বত্রিশটি সমার্থ শব্দ আছে। তন্মধ্যে কৃ-ষ্টি একটা। মেদিনীকোষ কৃ-ষ্টি শব্দের দুইটা অর্থই ধরেছেন, পুংলিঙ্গে 'বুধ', স্ত্রীলিঙ্গে 'আকর্ষ'। ভূমির কর্ষণ হয়, চিত্তভূমিরও কর্ষণ হ'তে পারে। রামপ্রসাদ তার সাক্ষী।

পশ্চিমদেশের সংস্পর্শে সে দেশের নানা সংস্কার আসছে, নূতন নূতন শব্দও রচিত হচ্ছে। ভাগ্যক্রমে কৃ-ষ্টি নব-রচিত নয় কিন্তু অর্থে অবিকল culture।"

বিদ্যানিধি মহাশয় মেদিনীকোষ ও অমরকোষের উল্লেখ করিয়াছিলেন, এইসূত্রে, মনিয়ার বিলিয়ম্‌সের অভিধান হইতে সংস্কৃতি, কৃষ্টি প্রভৃতি শব্দের যে-সকল প্রতিশব্দ রবীন্দ্রনাথ উদ্‌ধৃত করেন, এই আলোচনার তৃতীয় নিবন্ধরূপে তাহা মুদ্রিত হইল।

প্রবন্ধটি "কালচার" নামে প্রবাসী ১৩৪২ ভাদ্র সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। ইহার অংশবিশেষ বাংলা শব্দতত্ত্বের দ্বিতীয় পরিবর্ধিত সংস্করণে (অগ্রহায়ণ ১৩৪২) 'ভাষার খেয়াল' নামে এক স্বতন্ত্র প্রবন্ধাকারে সংকলিত।

[1] সাধনা, ৪র্থ বর্ষ ১ম ভাগ, পৃ ১৯০ পাদটীকা

থিওরি-র অনেকগুলি প্রতিশব্দ চলিয়াছে। লেখক মহাশয় তাহার মধ্যে হইতে ক্রমবিকাশতত্ত্ব বাছিয়া লইয়াছেন। পূজ্যপাদ দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় এরূপ স্থলে অভিব্যক্তিবাদ শব্দ ব্যবহার করেন। অভিব্যক্তি শব্দটি সংক্ষিপ্ত ; ক্রমে ব্যক্ত হইবার দিকে অভিমুখভাব অভি উপসর্গযোগে সুস্পষ্ট ; এবং শব্দটিকে অভিব্যক্ত বলিয়া বিশেষণে পরিণত করা সহজ। তা ছাড়া ব্যক্ত হওয়া শব্দটির মধ্যে ভালোমন্দ উন্নতি-অবনতির কোনো বিচার নাই ; বিকাশ শব্দের মধ্যে একটি উৎকর্ষ অর্থের আভাস আছে। লেখক মহাশয় natural selection-কে বাংলায় নৈসর্গিক মনোনয়ন বলিয়াছেন। এই সিলেক্‌শন্ শব্দের চলিত বাংলা 'বাছাই করা'। বাছাই কার্য যন্ত্রযোগেও হইতে পারে; বলিতে পারি চা-বাছাই করিবার যন্ত্র, কিন্তু চা মনোনীত করিবার যন্ত্র বলিতে পারি না। মন শব্দের সম্পর্কে মনোনয়ন কথাটার মধ্যে ইচ্ছা-অভিরুচির ভাব আসে। কিন্তু প্রাকৃতিক সিলেক্‌শন্ যন্ত্রবৎ নিয়মের কার্য, তাহার মধ্যে ইচ্ছার অভাবনীয় লীলা নাই। অতএব বাছাই শব্দ এখানে সংগত। বাংলায় বাছাই শব্দের সাধু প্রয়োগ নির্বাচন। 'নৈসর্গিক নির্বাচন শব্দে কোনো আপত্তির কারণ আছে কি না জানিতে ইচ্ছুক আছি। Fossil শব্দের সংক্ষেপে 'শিলাবিকার' বলিলে কিরূপ হয়?[1] Fossilized শব্দকে বাংলায় শিলাবিকৃত অথবা শিলীভূত বলা যাইতে পারে।[2]

১৩০৮

৩

'চরিত্র নীতি' প্রবন্ধটির লেখক শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র।... ইংরেজি ethics শব্দকে তিনি বাংলায় চরিত্রনীতি নাম দিয়াছেন। অনেকে ইহাকে নীতি ও নীতিশাস্ত্র বলেন— সেটাকে লেখক পরিত্যাগ করিয়া ভালোই করিয়াছেন ; কারণ নীতি শব্দের অর্থ সকল সময় ধর্মানুকূল নহে।

প্রহরিষ্যন্ প্রিয়ং ব্রুয়াৎ প্রহৃত্যাপি প্রিয়োত্তরম।
অপিচাস্য শিরশ্ছিত্ত্বা রুদ্যাৎ শোচেৎ তথাপি চ॥

মারিতে মারিতে কহিবে মিষ্ট,
মারিয়া কহিবে আরো।
মাথাটা কাটিয়া কাঁদিয়া উঠিবে
যতটা উচ্চে পারো।

ইহাও এক শ্রেণীর নীতি, কিন্তু এথিক্‌স্ নহে। সংস্কৃত ভাষায় ধর্ম বলিতে মুখ্যত এথিক্‌স্ বুঝায়, কিন্তু ধর্মের মধ্যে আরো অনেক গৌণ পদার্থ আছে। মৌনী হইয়া ভোজন করিবে, ইহা ব্রাহ্মণের ধর্ম হইতে পারে কিন্তু ইহা এথিক্‌স্ নহে। অতএব চরিত্রনীতি শব্দটি উপযুক্ত হইয়াছে, কিন্তু ইহাকে আর-একটু সংহত করিয়া 'চারিত্র' বলিলে ব্যবহারের পক্ষে সুবিধাজনক হয়। চরিত্রনীতিশিক্ষা, চরিত্রনীতিবোধ, চরিত্রনৈতিক উন্নতি অপেক্ষা 'চারিত্রশিক্ষা', 'চারিত্রবোধ', 'চারিত্রোন্নতি' আমাদের কাছে সংগত বোধ হয়।...আর-একটি কথা জিজ্ঞাস্য, metaphysics শব্দের বাংলা কি 'তত্ত্ববিদ্যা' নহে।[3]

---

[1] দ্রষ্টব্য : 'প্রতিশব্দ-প্রসঙ্গ' ৫

[2] মাসিক সাহিত্য সমালোচনা, বঙ্গদর্শন, বৈশাখ ১৩০৮, পৃ ৬২-৬৩

[3] সাহিত্যপ্রসঙ্গ, বঙ্গদর্শন, বৈশাখ ১৩০৮, পৃ ৬৩

৪

লেখক মহাশয় [উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী] সেন্‌ট্রিপীটাল ও সেন্‌ট্রিফ্যুগাল ফোর্স-কে কেন্দ্রাভিসারিণী ও কেন্দ্রাপগামিনী শক্তি বলিয়াছেন— কেন্দ্রানুগ এবং কেন্দ্রাতিগ শক্তি আমাদের মতে সংক্ষিপ্ত ও সংগত।[১]

১৩০৮

৫

লেখক মহাশয় ইংরেজি ফসিল্ শব্দের বাংলা করিয়াছেন 'প্রস্তরীভূত কঙ্কাল'। কিন্তু উদ্ভিদ্ পদার্থের ফসিল সম্বন্ধে কঙ্কাল শব্দের প্রয়োগ কেমন করিয়া হইবে। 'পাতার কঙ্কাল' ঠিক বাংলা হয় না।... ফসিলের প্রতিশব্দ শিলাবিকার হইতে পারে, এরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলাম। কিন্তু মহলানবিশ মহাশয়ের সহিত আলোচনা করিয়া দেখিয়াছি 'শিলাবিকার' metamorphosed rock-এর উপযুক্ত ভাষান্তর হয়, এবং জীবশিলা শব্দ ফসিলের প্রতিশব্দরূপে ব্যবহৃত হইতে পারে।[২]

১৩০৮

৬

বাংলার বৈজ্ঞানিক পরিভাষা স্থির হয় নাই, অতএব পরিভাষার প্রয়োগ লইয়া আলোচনা কর্তব্য, কিন্তু বিবাদ করা অসংগত। ইংরেজি মিটিয়রলজির বাংলা-প্রতিশব্দ এখনো প্রচলিত হয় নাই, সুতরাং জগদানন্দবাবু যদি আপ্তের সংস্কৃত অভিধানের দৃষ্টান্তে 'বায়ুনভোবিদ্যা' ব্যবহার করিয়া কাজ চালাইয়া থাকেন, তাঁহাকে দোষ দিতে পারি না। যোগেশবাবু 'আবহ' শব্দ কোনো প্রাচীন গ্রন্থ হইতে উদ্ধার করিয়াছেন, তাহার অর্থ ভূবায়ু। কিন্তু এই ভূবায়ু বলিতে প্রাচীনেরা কী বুঝিতেন, এবং তাহা আধুনিক অ্যাট্‌মস্‌ফিয়ার শব্দের প্রতিশব্দ কি না, তাহা বিশেষরূপে প্রমাণের অপেক্ষা রাখে— এক কথায় ইহার মীমাংসা হয় না। অগ্রে সেই প্রমাণ উপস্থিত না করিয়া জোর করিয়া কিছু বলা যায় না। শকুন্তলার সপ্তম অঙ্কে দুষ্যন্ত যখন স্বর্গলোক হইতে মর্ত্যে অবতরণ করিতেছেন, তখন মাতলিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখন আমরা কোন্ বায়ুর অধিকারে আসিয়াছি।" মাতলি উত্তর করিলেন, 'গগনবর্তিনী মন্দাকিনী যেখানে বহমানা, চক্রবিভক্তরশ্মি জ্যোতিষ্কলোক যেখানে বর্তমান, বামনবেশধারী হরির দ্বিতীয় চরণপাতে পবিত্র এই স্থান ধূলিশূন্য প্রবহবায়ুর মার্গ।" দেখা যাইতেছে, প্রাচীনকালে 'প্রবহ' প্রভৃতি বায়ুর নাম তৎকালীন একটি কাল্পনিক বিশ্বতত্ত্বের মধ্যে প্রচলিত ছিল— সেগুলি একটি বিশেষ শাস্ত্রের পারিভাষিক প্রয়োগ। দেবীপুরাণে দেখা যায় :

> প্রাবাহো নিবহশ্চৈব উদ্বহঃ সংবহস্তথা
> বিবহঃ প্রবহশ্চৈব পরিবাহস্তথৈব চ
> অন্তরীক্ষে চ বাহ্যে তে পৃথঙ্‌মার্গবিচারিণঃ।

---

[১] মাসিক সাহিত্য সমালোচনা, বঙ্গদর্শন, বৈশাখ ১৩০৮, পৃ ৬৫

[২] মাসিক সাহিত্য সমালোচনা, বঙ্গদর্শন, আষাঢ় ১৩০৮, পৃ ১৪৭

এই-সকল বায়ুর নাম কি আধুনিক মিটিয়রলজির পরিভাষার মধ্যে স্থান পাইতে পারে। বিশেষ শাস্ত্রের বিশেষ মত ও সংজ্ঞার দ্বারা তাহার পরিভাষাগুলির অর্থ সীমাবদ্ধ, তাহাদিগকে নির্বিচারে অন্যত্র প্রয়োগ করা যায় না। অপর পক্ষে নভঃ শব্দ পারিভাষিক নহে, তাহার অর্থ আকাশ, এবং সে-আকাশ বিশেষরূপে মেঘের সহিত সম্বন্ধযুক্ত— সেইজন্য নভঃ ও নভস্য শব্দে শ্রাবণ ও ভাদ্র মাস বুঝায়। কিন্তু নভঃ শব্দের সহিত পুনশ্চ বায়ু শব্দ যোগ করিবার প্রয়োজন নাই, এ কথা স্বীকার করি। আপ্তেও তাঁহার অভিধানে তাহা করেন নাই ; তাঁহার আভিধানিক সংকেত অনুসারে নভোবায়ু-বিদ্যা বলিতে নভোবিদ্যা বা বায়ুবিদ্যা বুঝাইতেছে। 'নভোবিদ্যা' মিটিয়রলজির প্রতিশব্দরূপে ব্যবহৃত হইলে সাধারণের সহজে বোধগম্য হইতে পারে।[১]

১৩০৮

৭

প্রতিষ্ঠান কথাটা আমাকে বানাইতে হইল। ইংরেজি কথাটা institution। ইহার কোনো বাংলা প্রচলিত প্রতিশব্দ পাইলাম না। যে প্রথা কোনো-একটা বিশেষ ব্যবস্থাকে অবলম্বন করিয়া দেশে প্রতিষ্ঠালাভ করা যায়, তাহাকে প্রতিষ্ঠান বলিতে দোষ দেখি না। Ceremony শব্দের বাংলা অনুষ্ঠান এবং institution শব্দের বাংলা প্রতিষ্ঠান করা যাইতে পারে।[২]

১৩১২

অনুবাদ-চর্চা

শান্তিনিকেতন পত্রের পাঠকদের নিকট হইতে একটি ইংরেজি অনুবাদের বাংলা তরজমা চাহিয়াছিলাম। কতকগুলির উত্তর পাইয়াছিলাম। সকল উত্তরের সমালোচনা করি এমন স্থান আমাদের নাই। ইহার মধ্যে যেটা হাতে ঠেকিল সেইটেরই বিচার করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। প্রথম বাক্যটি এই : At every stage of their growth our forest and orchard trees are subject to the attacks of hordes of insect enemies, which, if unchecked, would soon utterly destroy them। একজন তরজমা পাঠাইয়াছেন : "বৃদ্ধির প্রথম সোপানেই আমাদের আরণ্য ও উদ্দানস্থ ফল বৃক্ষ সমূহ কীটশত্রু সম্প্রদায় কর্তৃক আক্রমণের বিষয়ীভূত হয়, যাহারা প্রশমিত না হইলে অচিরেই তাহাদের সর্বতোভাবে বিনাশসাধন করিত।"

ইংরেজি বাক্য বাংলায় তরজমা করিবার সময় অনেকেই সংস্কৃত শব্দের ঘটা করিয়া থাকেন। বাংলা ভাষাকে ফাঁকি দিবার এই একটা উপায়। কারণ, এই শব্দগুলির পর্দার আড়ালে বাংলা ভাষারীতির বিরুদ্ধাচরণ অনেকটা ঢাকা পড়ে। বাংলা ভাষায় 'যাহারা' সর্বনামটি গণেশের মতো বাক্যের সর্বপ্রথম পূজা পাইয়া থাকে। 'দস্যুদল পুলিসের হাতে ধরা পড়িল যাহারা গ্রাম লুটিয়াছিল' বাংলায় এরূপ বলি না, আমরা বলি, 'যাহারা গ্রাম লুটিয়াছিল সেই দস্যুদল পুলিসের

---

[১] মাসিক সাহিত্য সমালোচনা, বঙ্গদর্শন, আষাঢ় ১৩০৮, পৃঃ ১৪৫-৪৬

[২] ভাণ্ডার, বৈশাখ ৩১২, পৃ ৫২

হাতে ধরা পড়িল।' The pilgrims took shelter in the temple, most of whom were starving— ইংরেজিতে এই 'whom' অসংগত নহে। কিন্তু বাংলায় ঐ বাক্যটি তরজমা করিবার বেলা যদি লিখি, 'যাত্রীরা মন্দিরে আশ্রয় লইল যাহাদের অধিকাংশ উপবাস করিতেছিল' তবে তাহা ঠিক শোনায় না। এরূপ স্থলে আমরা 'যাহারা' সর্বনামের বদলে 'তাহারা'-সর্বনাম ব্যবহার করি। আমরা বলি 'যাত্রীরা মন্দিরে আশ্রয় লইল, তাহারা অনেকেই উপবাসী ছিল'। অতএব আমাদের আলোচ্য ইংরেজি প্যারাগ্রাফে যেখানে 'which' আছে সেখানে 'যাহারা' না হইয়া 'তাহারা' হইবে।

'যে' সর্বনাম সম্বন্ধে যে নিয়মের আলোচনা করিলাম তাহার ব্যতিক্রম আছে এখানে তাহার উল্লেখ থাকা আবশ্যক। 'এমন' সর্বনাম শব্দানুগত বাক্যাংশ বিকল্পে 'যে' সর্বনামের পূর্বে বসে। যথা : 'এমন গরিব আছে যাহার ঘরে হাঁড়ি চড়ে না।' ইহাকে উল্‌টাইয়া বলা চলে 'যাহার ঘরে হাঁড়ি চড়ে না এমন গরিবও আছে।' 'এমন জলচর জীব আছে যাহারা স্তন্যপায়ী এবং ভাসিয়া উঠিয়া যাহাদিগকে শ্বাস গ্রহণ করিতে হয়।' এই 'এমন' শব্দ না থাকিলে বাক্যের শেষভাগে 'যাহাদিগকে' শব্দ ব্যবহার করা যায় না। যেমন, 'তিমি জাতীয় স্তন্যপায়ী জলে বাস করে, ভাসিয়া উঠিয়া যাহাদিগকে শ্বাস গ্রহণ করিতে হয়'— ইহা ইংরেজি রীতি ; বাংলা রীতিতে 'যাহাদিগকে' না বলিয়া 'তাহাদিগকে' বলিতে হইবে।

ইংরেজিতে subject শব্দের অনেকগুলি অর্থ আছে তাহার মধ্যে একটি অর্থ, আলোচ্য প্রসঙ্গ। ইহাকে আমরা বিষয় বলি। Subject of conversation, subject of discussion ইত্যাদির বাংলা— আলাপের বিষয়, তর্কের বিষয়। কিন্তু subject to cold 'সর্দির বিষয়' নহে। এরূপ স্থলে সংস্কৃত ভাষায় আস্পদ, পাত্র, ভাজন, অধীন, বশীভূত প্রভৃতির প্রয়োগ চলে। রোগাস্পদ, আক্রমণের পাত্র, মৃত্যুর বশীভূত ইত্যাদি প্রয়োগ চলিতে পারে।

আমাদের অনেক পত্রলেখকই subject কথাটাকে এড়াইয়া চলিয়াছেন। তাঁহারা লিখিয়াছেন কীটশত্রু 'গাছগুলিকে আক্রমণ করে'। ইহাতে আক্রমণ ব্যাপারকে নিত্য ঘটনা বলিয়া স্বীকার করা হয়। কিন্তু subject to attack বলিলে বুঝায় এখনো আক্রমণ না হইলেও গাছগুলি আক্রমণের লক্ষ্য বটে।

ইংরেজি বাক্যটিকে আমি এইরূপ তরজমা করিয়াছি : 'আমাদের বনের এবং ফলবাগানের গাছগুলি আপন বৃদ্ধিকালের প্রত্যেক পর্বে দলে দলে শত্রুকীটের আক্রমণভাজন হইয়া থাকে ; ইহারা বাধা না পাইলে শীঘ্রই গাছগুলিকে সম্পূর্ণ নষ্ট করিত।'

'What the loss our forest and shade trees would mean to us can better be imagined than described.' পত্রলেখকের তরজমা 'বন্য ও ছায়াপাদপের ক্ষতি বলিতে কতটা ক্ষতি আমাদের বোধগম্য হয় তাহা বর্ণনা করা অপেক্ষা আমাদের অধিক উপলব্ধির বিষয়।'

'বর্ণনা করা অপেক্ষা অধিক উপলব্ধির বিষয়' এরূপ প্রয়োগ চলে না। একটা কিছু 'করার' সঙ্গে আর-একটা কিছু 'করার' তুলনা চাই। 'বর্ণনা করা অপেক্ষা উপলব্ধি করা সহজ' বলিলে ভাষায় বাধিত না বটে কিন্তু উপলব্ধি করা এবং imagine করা এক নহে।

আমাদের তরজমা : 'আমাদের বন-বৃক্ষ এবং ছায়াতরুগুলির বিনাশ বলিতে যে কতটা বুঝায় তাহা বর্ণনা করা অপেক্ষা কল্পনা করা সহজ।'

'Wood enters into so many products, that it is difficult to think of civilised man without it, while the fruits of the orchards are of the greatest importance.'

পত্রলেখকের তরজমা : 'কাষ্ঠ হইতে এত দ্রব্য উৎপন্ন হয় যে, সভ্য মানবের পক্ষে উহাকে পরিহার করিবার চিন্তা অত্যন্ত কঠিন, এদিকে আমাদের উদ্যানজাত ফলসমূহও সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয়।'

কাষ্ঠ হইতে দ্রব্য নির্মিত হয়, উৎপন্ন হয় না। এখানে 'উহাকে' শব্দের 'কে' বিভক্তিচিহ্ন চলিতে পারে না। 'ফল সমূহ সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয়' বলিলে অত্যুক্তি করা হয়। ইংরেজিতে 'are of the greatest importance' বলিতে এই বুঝায় যে পৃথিবীতে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়তা যে-সকল জিনিসের আছে, ফলও তাহার মধ্যে একটি। 'সভ্য মানুষের পক্ষে উহাকে পরিহার করিবার চিন্তা অত্যন্ত কঠিন' ইহা মূলের অনুগত হয় নাই।

আমাদের তরজমা : 'কাঠ আমাদের এতপ্রকার সামগ্রীতে লাগে যে ইহাকে বাদ দিয়া সভ্য মানুষের অবস্থা চিন্তা করা কঠিন ; এদিকে ফলবাগানের ফলও আমাদের যার-পর-নাই প্রয়োজনীয়।'

বলা বাহুল্য 'যার-পর-নাই' কথাটা শুনিতে যত একান্ত বড়ো, ব্যবহারে ইহার অর্থ তত বড়ো নহে।

'Fortunately, the insect foes of trees are not without their own persistent enemies, and among them are many species of birds, whose equipment and habits specially fit them to deal with insects and whose entire lives are spent in pursuit of them.'

পত্রলেখকের তরজমা : 'সৌভাগ্যক্রমে বৃক্ষের কীট-অরিগণও নিজেরা তাহাদের স্থায়ী শত্রুহস্ত হইতে মুক্ত নয়, এবং তাহাদের মধ্যে নানাজাতীয় পক্ষী আছে, যাহাদিগকে তাহাদের অভ্যাস ও দৈহিক উপকরণগুলি বিশেষভাবে কীটদিগের সহিত সংগ্রামে উপযোগী করিয়াছে এবং যাহাদিগের সমস্ত জীবন তাহাদিগকে অনুধাবন করিতে ব্যয়িত হয়।'

'যে' সর্বনাম শব্দের প্রয়োগ সম্বন্ধে পূর্বেই আমাদের বক্তব্য জানাইয়াছি।

আমাদের তরজমা : 'ভাগ্যক্রমে বৃক্ষের শত্রু-কীট-সকলেরও নিজেদের নিত্যশত্রুর অভাব নাই ; এই শত্রুদের মধ্যে এমন অনেক জাতীয় পাখি আছে যাহাদের যুদ্ধোপকরণ এবং অভ্যাস সকল কীট-আক্রমণের পক্ষে বিশেষ উপযোগী এবং যাহারা কীট শিকারেই সমস্ত জীবন যাপন করে।'

ইংরেজিতে persistent কথাটি নিতান্ত সহজ। কথ্য বাংলায় আমরা বলি নাছোড়বান্দা। কিন্তু লেখায় সব জায়গায় ইহা চলে না। আমাদের একজন পত্রলেখক 'দৃঢ়াগ্রহ' শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। কিন্তু 'আগ্রহ' শব্দে, অন্তত বাংলায়, প্রধানত একটি মনোধর্ম বুঝায়। নিষ্ঠা শব্দেও সেইরূপ। Persistent শব্দের অর্থ, যাহা নিরন্তর লাগিয়াই আছে। 'নির্বন্ধ' শব্দটিতে সেই লাগিয়া থাকা অর্থ আছে ; 'দৃঢ়নির্বন্ধ' কথাটা বড়ো বেশি অপরিচিত। এখানে কেবল মাত্র 'নিত্য' বিশেষণ যোগে ইংরেজি শব্দের ভাব স্পষ্ট হইতে পারে।

আমাদের আলোচ্য ইংরেজি প্যারাগ্রাফে একটি বাক্য আছে 'among them are many species of birds' ; আমাদের একজন ছাত্র এই species শব্দকে 'উপজাতি' প্রতিশব্দ দ্বারা তরজমা করিয়াছে। গতবারে 'প্রতিশব্দ' প্রবন্ধে [১] আমরাই species-এর বাংলা 'উপজাতি' স্থির করিয়াছিলাম অথচ আমরাই এবারে কেন many 'species of birds' 'নানাজাতীয় পক্ষী' বলিলাম তাহার কৈফিয়ত আবশ্যক। মনে রাখিতে হইবে এখানে ইংরেজিতে species পারিভাষিক

---

[১] দ্রষ্টব্য : প্রতিশব্দ ১

অর্থে ব্যবহার করা হয় নাই। এখানে কোনো বিশেষ একটি মহাজাতীয় পক্ষীরই উপজাতিকে লক্ষ্য করিয়া species কথা বলা হয় নাই। বস্তুত কীটের যে-সব শত্রু আছে তাহারা নানা জাতিরই পক্ষী— কাকও হইতে পারে শালিকও হইতে পারে, শুধু কেবল কাক এবং দাঁড়কাক শালিক এবং গাঙশালিক নহে। বস্তুত সাধারণ ব্যবহারে অনেক শব্দ আপন মর্যাদা লঙ্ঘন করিয়া চলে, কেহ তাহাতে আপত্তি করে না, কিন্তু পারিভাষিক ব্যবহারে কঠোরভাবে নিয়ম মানিয়া চলিতে হয়। যেমন বন্ধুর নিমন্ত্রণক্ষেত্রে মানুষ নিয়মের দিকে দৃষ্টি রাখে না, সামাজিক নিমন্ত্রণে তাহাকে নিয়ম বাঁচাইয়া চলিতে হয়— এও সেইরূপ।

আমাদের তরজমায় আমরা অর্থ স্পষ্ট করিবার খাতিরে দুই-একটা বাড়তি শব্দ বসাইয়াছি। যেমন শেষ বাক্যে মূলে যেখানে আছে, 'and among them are many species of birds', আমরা লিখিয়াছি 'এই শত্রুদের মধ্যে নানাজাতীয় পক্ষী আছে'— অবিকল অনুবাদ করিলে লিখিতে হইত 'এবং তাহাদের মধ্যে ইত্যাদি'। ইংরেজিতে একটি সাধারণ নিয়ম এই যে, সর্বনাম শব্দ তাহার পূর্ববর্তী নিকটতম বিশেষ্য শব্দের সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট। এ স্থলে them সর্বনামের অনতিপূর্বেই আছে enemies, এইজন্য এখানে 'তাহাদের' বলিলেই শত্রুদের বুঝাইবে। বাংলায় এ নিয়ম পাকা নহে, এইজন্য, 'তাহাদের মধ্যে নানাজাতীয় পক্ষী আছে' বলিলে যদি কেহ হঠাৎ বুঝিয়া বসেন, 'গাছেদের মধ্যে নানাজাতীয় পক্ষী আছে, অর্থাৎ পক্ষী বাসা বাঁধিয়া থাকে' তবে তাঁহাকে খুব দোষী করা যাইবে না।

ইংরেজিতে 'and', আর বাংলায় এবং শব্দের প্রয়োগ-ভেদ আছে। সেটা এখানে বলিয়া লই। 'তাঁহার একদল নিন্দুক শত্রু আছে এবং তাহারা খবরের কাগজে তাঁহার নিন্দা করে' এই বাক্যটা ইংরেজি ছাঁচের হইল। এ স্থলে আমরা 'এবং' ব্যবহার করি না। 'তাঁহার একদল নিন্দুক শত্রু আছে এবং তাহারা সরকারের বেতনভোগী'। এখানেও 'এবং' বাংলায় চলে না। 'তাঁহার একদল নিন্দুক শত্রু আছে এবং তিনি তাহাদিগকে গ্রাহ্য করেন না' এরূপ স্থলে হয় 'এবং' বাদ দিই অথবা 'কিন্তু' বসাই। তাহার কারণ, 'আছে'র সঙ্গে 'আছে', 'করে'র সঙ্গে 'করে', 'হয়'-এর সঙ্গে 'হয়' মেলে, 'আছে'র সঙ্গে 'করে', 'করে'র সঙ্গে 'হয়' মেলে না। 'তাঁহার শত্রু আছে এবং তাঁহার তিনটে মোটর গাড়ি আছে'— এই দুটি অসংশ্লিষ্ট সংবাদের মাঝখানেও 'এবং' চলে কিন্তু তাঁহার শত্রু আছে এবং তিনি শৌখিন লোক' এরূপ স্থলে 'এবং' চলে না, কেননা 'তাঁর আছে' এবং 'তিনি হন' এ দুটো বাক্যের মধ্যে ভাষার গতি দুই দিকে। এগুলো যেন ভাষার অসবর্ণ বিবাহ, ইংরেজিতে চলে বাংলায় চলে না। ইংরেজির সঙ্গে বাংলার এই সূক্ষ্ম প্রভেদগুলি অনেক সময় অসতর্ক হইয়া আমরা ভুলিয়া যাই।

And শব্দযুক্ত ইংরেজি বাক্যে তরজমা করিতে গিয়া বার বার দেখিয়াছি তাহার অনেক স্থলেই বাংলায় 'এবং' শব্দ খাটে না। তখন আমার এই মনে হইয়াছে 'এবং' শব্দটা লিখিত বাংলায় পণ্ডিতদের কর্তৃক নূতন আমদানি, ইহার মানে 'এইরূপ'। 'আর' শব্দ 'অপর' শব্দ হইতে উৎপন্ন, তাহার মানে 'অন্যরূপ'। 'তাঁহার ধন আছে এবং মান আছে' বলিলে বুঝায় তাঁহার যেমন ধন আছে সেইরূপ মানও আছে। 'তিনি প'ড়ে গেলেন, আর, একটা গাড়ি তাঁর পায়ের উপর দিয়ে চলে গেল'— এখানে পড়িয়া যাওয়া একটা ঘটনা, অন্য ঘটনাটা অপর প্রকারের, সেইজন্য 'আর' শব্দটা খাটে। 'তিনি পড়িয়া গেলেন এবং আঘাত পাইলেন' এখানে দুইটি ঘটনার প্রকৃত যোগ আছে। 'তিনি পড়িয়া গেলেন এবং তাঁহার পায়ের উপর দিয়া গাড়ি চলিয়া গেল', এখানে 'এবং' শব্দটা বেখাপ। এরূপ বেখাপ প্রয়োগ কেহ করেন না বা আমি করি না এমন কথা বলি না কিন্তু ইহা

যে বেখাপ তাহার উদাহরণ গতবারের শান্তিনিকেতন পত্রে কিছু কিছু দিয়াছি। He has enemies and they are paid by the Government ইহার বাংলা, 'তাঁর শত্রু আছে; তারা সরকারের বেতন খায়'। এখানে 'এবং' কথাটা অচল। তাহার কারণ, এখানে দুই ঘটনা দুইরূপ। 'তাঁহার পুত্র আছে এবং কন্যা আছে।' 'তাঁহার গাড়ি আছে এবং ঘোড়া আছে।' এ-সব জায়গায় 'এবং' জোরে আপন আসন দখল করে।

আশ্বিন-কার্তিকের সংখ্যার শান্তিনিকেতনে বলিয়াছিলাম যে 'এবং' শব্দ দিয়া যোজিত দুই বাক্যাংশের মধ্যে ক্রিয়াপদের রূপের মিল থাকা চাই। যেমন 'সে দরিদ্র এবং সে মূর্খ' 'সে চরকা কাটে এবং ধান ভানে'— প্রথম বাক্যটির দুই অংশই অস্তিত্ববাচক, শেষের বাক্যটির দুই অংশই কর্তৃত্ববাচক। 'সে দরিদ্র এবং সে ধান ভানিয়া খায়' আমার মতে এটা খাঁটি নহে। আমরা এরূপ স্থলে 'এবং' ব্যবহারই করি না, বলি, 'সে দরিদ্র, ধান ভানিয়া খায়'। অথচ ইংরেজিতে অনায়াসে বলা চলে, She is poor and lives on husking rice।

'রাম ধনী এবং তার বাড়ি তিনতলা' এরূপ প্রয়োগ আমরা সহজে করি না। আমরা বলি, 'রাম ধনী, তার বাড়ি তিন তলা।'

'যার জমি আছে এবং সেই জমি যে চাষ করে এমন গৃহস্থ এই গ্রামে নেই'— এরূপ বাক্য বাংলায় চলে। বস্তুত এখানে 'এবং' উহ্য রাখিলে চলেই না। পূর্বোক্ত বাক্যে 'এমন' শব্দটি তৎপূর্ববর্তী সমস্ত শব্দগুলিকে জমাট করিয়া দিয়াছে। এমন, কেমন? না, 'যার-জমি-আছে-এবং-সেই-জমি-যে-নিজে-চাষ-করে' সমস্তটাই গৃহস্থ শব্দের এক বিশেষণ পদ। কিন্তু 'তিনি স্কুল মাস্টার এবং তাঁর একটি খোঁড়া কুকুর আছে' বাংলায় এখানে 'এবং' খাটে না, তার কারণ এখানে দুই বাক্যাংশ পৃথক, তাহাদের মধ্যে রূপের ও ভাবের ঘনিষ্ঠতা নাই। আমরা বলি, 'তিনি স্কুল মাস্টার, তাঁর একটি খোঁড়া কুকুর আছে।' কিন্তু ইংরেজিতে বলা চলে, He is a school master and he has a lame dog।

সংস্কৃত ভাষায় যে-সব জায়গায় দ্বন্দ্ব সমাস খাটে, চলিত বাংলায় আমরা সেখানে যোজক শব্দ ব্যবহার করি না। আমরা বলি, 'হাতি ঘোড়া লোক লশকর নিয়ে রাজা চলেছেন' 'চৌকি টেবিল আলনা আলমারিতে ঘরটি ভরা।' ইংরেজিতে উভয় স্থলেই একটা and না বসাইয়া চলে না। যথা 'The king marches with his elephants, horses and soldiers'. 'The room is full of chairs, tables, clothes, racks and almirahs।'

বাংলায় আর-একটি নূতন আমদানি যোজক শব্দ 'ও'। লিখিত বাংলায় পণ্ডিতেরা ইহাকে 'and' শব্দের প্রতিশব্দরূপে গায়ের জোরে চালাইয়া দিয়াছেন। কিন্তু মুখের ভাষায় কখনোই এরূপ ব্যবহার খাটে না। আমরা বলি 'রাজা চলেছেন, তাঁর সৈন্যও চলেছে'। 'রাজা চলিয়াছেন ও তাঁহার সৈন্যদল চলিয়াছে' ইহা ফোর্ট উইলিয়মের গোরাদের আদেশে পণ্ডিতদের বানানো বাংলা। এখন 'ও' শব্দের এইরূপ বিকৃত ব্যবহার বাংলা লিখিত ভাষায় এমনি শিকড় গাড়িয়াছে যে তাহাকে উৎপাটিত করা আর চলিবে না। মাঝে হইতে খাঁটি বাংলা যোজক 'আর' শব্দকে পণ্ডিতেরা বিনা অপরাধে লিখিত বাংলা হইতে নির্বাসিত করিয়াছেন। আমরা মুখে বলিবার বেলা বলি 'সে চলেছে, আর কুকুরটি পিছন পিছন চলেছে' অথবা 'সে চলেছে, তার কুকুরটিও পিছন পিছন চলেছে' কিন্তু লিখিবার বেলা লিখি 'সে চলিয়াছে ও (কিংবা এবং) তাহার কুকুরটি তাহাকে অনুসরণ করিতেছে।' 'আর' শব্দটিকে কি আর-একবার তার স্বস্থানে ফিরাইয়া আনিবার সময় হয়

নাই? একটা সুখের কথা এই যে, পণ্ডিতদের আশীর্বাদ সত্ত্বেও 'এবং' শব্দটা বাংলা কবিতার মধ্যে প্রবেশ করিবার পথ পায় নাই।

১৩২৬

বাংলা কথ্যভাষা

বাংলা শব্দতত্ত্ব আলোচনা করিতে হইলে বাংলাদেশের ভিন্ন ভিন্ন জেলায় প্রচলিত উচ্চারণগুলির তুলনা আবশ্যক। অনেক বাংলা শব্দের মূল অনুসন্ধান করিতে গিয়া কৃতকার্য হওয়া যায় না। বাংলার ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে উচ্চারিত শব্দগুলি মিলাইয়া দেখিলে সেই মূল ধরিতে পারা সহজ হইতে পারে। তাহা ছাড়া উচ্চারণতত্ত্বটি শব্দতত্ত্বের একটি প্রধান অঙ্গ। স্বর ও ব্যঞ্জনের ধ্বনিগুলির কী নিয়মে বিকার ঘটে তাহা ভাষাতত্ত্বের বিচার্য। এজন্যও ভিন্ন জেলার উচ্চারণের তুলনা আবশ্যক। বাংলাদেশের প্রায় সকল জেলা হইতেই আমাদের আশ্রমে ছাত্রসমাগম হইয়াছে। তাঁহাদের সাহায্যে বাংলা ধাতুরূপ ও শব্দরূপের তুলনা-তালিকা আমরা বাহির করিতে চাই। নীচে আমরা যে তালিকা দিতেছি তাহার অবলম্বন কলিকাতা বিভাগের বাংলা। পাঠকগণ ইহা অনুসরণ করিয়া নিজ নিজ প্রদেশের উচ্চারণ-অনুযায়ী শব্দতালিকা পাঠাইলে আমাদের উপকার হইবে।

কলিকাতা বিভাগের শব্দের উচ্চারণ সম্বন্ধে দুই-একটা কথা বলা আবশ্যক। যখন 'বালক' পত্র প্রকাশ করিতাম সে অনেক দিনের কথা। তখন সেই পত্রে বাংলা শব্দোচ্চারণের কতকগুলি নিয়ম লইয়া আলোচনা করিয়াছিলাম।[১] আমার সেই আলোচিত উচ্চারণপদ্ধতি কলিকাতা বিভাগের। স্থলবিশেষে বাংলায় অকারের উচ্চারণ ওকারঘেঁষা হইয়া যায় ইহা আমার বিচারের বিষয় ছিল। 'করা' শব্দের ক্-সংলগ্ন অকারের উচ্চারণ এবং 'করি' শব্দের ক্-সংলগ্ন অকারের উচ্চারণ তুলনা করিলে আমার কথা স্পষ্ট হইবে— এ উচ্চারণ কলিকাতা বিভাগের সে কথা পূর্বেই বলিয়াছি। কলিকাতার উচ্চারণে 'মসী' শব্দস্থিত অকার এবং 'দোষী' শব্দস্থিত ওকারের উচ্চারণ একই। 'বোল্‌তা' এবং 'বলব'ও সেইরূপ। বাংলা উচ্চারণে কোনো ওকার দীর্ঘ কোনো ওকার হ্রস্ব ; হসন্ত শব্দের পূর্ববর্তী ওকার দীর্ঘ এবং স্বরান্ত শব্দের পূর্ববর্তী ওকার হ্রস্ব। 'ঘোর' এবং 'ঘোড়া' শব্দের উচ্চারণ-পার্থক্য লক্ষ্য করিলেই ইহা ধরা পড়িবে। কিন্তু যেহেতু বাংলায় দীর্ঘ-ও হ্রস্ব-ও একই ওকার চিহ্নের দ্বারা ব্যক্ত হইয়া থাকে সেইজন্য নিম্নের তালিকায় এইসকল সূক্ষ্ম প্রভেদগুলি বিশেষ চিহ্ন দ্বারা নির্দেশ করিতে চেষ্টা করিলাম না।

আমরা প্রথমে ক্রিয়াপদের তালিকা দিতেছি। বাংলায় একবচনে ও বহুবচনে ক্রিয়ার প্রকৃতির কোনো পার্থক্য ঘটে না বলিয়াই জানি, এইজন্য নীচের তালিকায় বহুবচনের উল্লেখ নাই। যদি কোনো জেলায় বহুবচনের বিশেষ রূপ থাকে তবে তাহা নির্দেশ করা আবশ্যক।

এইখানে হসন্ত উচ্চারণ সম্বন্ধে একটা কথা বলা দরকার। বাংলায় সাধারণত শব্দের শেষবর্ণস্থিত অকারের উচ্চারণ হয় না। যেখানে উচ্চারণ হয় সেখানে তাহা ওকারের মতো হইয়া যায়। যেমন 'বন', 'মন', এ শব্দগুলি হসন্ত। 'ঘন' শব্দটি হসন্ত নহে। কিন্তু উচ্চারণ হিসাবে লিখিতে

---

[১] "বাংলা উচ্চারণ", বালক, আশ্বিন ১২৯২।

হইলে লেখা উচিত, ঘনো। 'কত'= কতো। 'বড়'= বড়ো। 'ছোট' = ছোটো। প্রসঙ্গক্রমে বলিয়া রাখি বাংলায় দুই অক্ষরের বিশেষণমাত্রই এইরূপ স্বরান্ত। বাংলায় হসন্তের আর-একটি নিয়ম আছে। বাংলায় যে অসংযুক্ত শব্দের পূর্বে স্বরবর্ণ ও পরে ব্যঞ্জনবর্ণ আছে সে শব্দ নিজের অকার বর্জন করে। 'পাগল্' শব্দের গ আপন অকার রক্ষা করে যেহেতু পরবর্তী ল-এ কোনো স্বর নাই। কিন্তু 'পাগ্‌লা' বা 'পাগ্‌লী' শব্দে গ অকার বর্জন করে। এইরূপ— আপন— আপ্‌নি, ঘটক— ঘট্‌কী, গরম— গর্‌মি ইত্যাদি। বলা বাহুল্য, অনতিপ্রচলিত সংস্কৃত শব্দে এ নিয়ম খাটে না, যেমন ঘোটক— ঘোটকী। এইপ্রকার হসন্ত সম্বন্ধে বাংলায় সাধারণ নিয়মের যখন প্রায় ব্যতিক্রম দেখা যায় না তখন আমরা এরূপ স্থলে বিশেষভাবে হসন্তচিহ্ন দিব না— যেমন 'করেন্' না লিখিয়া 'করেন' লিখিব, 'কোর্‌চেন' না লিখিয়া 'কোরচেন' লিখিব।

আমি কোরি	তুই কোরিস	আমি কোরচি	তুই কোরচিস
তুমি করো	সে করে	তুমি কোরচ	সে কোরচে
আপনি করেন	তিনি করেন	আপনি কোরচেন	তিনি কোরচেন
আমি কোরলুম (কোরলেম)		তুই করলি	
তুমি কোরলে		সে কোরল (কোরলে)	
আপনি কোরলেন		তিনি কোরলেন	
আমি কোরেচি	তুই কোরেচিস	আমি কোরেছিলুম (করেছিলেম)	
তুমি কোরেচ	সে কোরেচে	তুমি কোরেছিলে	
আপনি কোরেচেন	তিনি কোরেচেন	আপনি কোরেছিলেন	
আমি কোরছিলুম (কোরছিলেম)		তুই কোরছিলি	
তুমি কোরেছিলে		সে কোরেছিল	
আপনি কোরছিলেন		তিনি কোরেছিলেন	
আমি কোরতুম (কোরতেম)		তুই কোরতিস	
তুমি কোরতে		সে কোরত	
আপনি কোরতেন		তিনি কোরতেন	
করা যাক্	তুমি করো	তুই কর	তিনি কোরুন
করা হোক্	আপনি করুন	সে করুক	
	আমি কোরব	তুই কোরবি	
	তুমি কোরবে	সে কোরবে	
	আপনি কোরবেন	তিনি কোরবেন	

করা হয়, করা যায়, কোরে থাকে, কোরতে থাকে, করা চাই, কোরতে হবে, কোরলোই বা (কোরলেই বা), নাই কোরলো (নাই কোরলে), কোরলেও হয়, কোরলেই হয়, কোরলেই হোলো, করানো, কোরে কোরে, কোরতে কোরতে।

হোয়ে পড়া, হোয়ে ওঠা, হোয়ে যাওয়া, কোরে ফেলা, কোরে ওঠা, কোরে তোলা, কোরে বসা, কোরে দেওয়া, কোরে নেওয়া, কোরে যাওয়া, করানো।

কেঁদে ওঠা, হেসে ওঠা, বোলে ওঠা, চেঁচিয়ে ওঠা, আঁৎকে ওঠা, ফস্‌কে যাওয়া, এড়িয়ে যাওয়া, চম্‌কে যাওয়া, হারিয়ে যাওয়া, সেরে যাওয়া, সোরে যাওয়া, মোরে যাওয়া।

কর্তৃকারক

একবচন— রাম হাসে, বাঘে মানুষ খায়, ঘোড়ায় লাথি মারে, গোরুতে ধান খায়।

এইখানে একটা কথা পরিষ্কার করা দরকার। 'রাম হাসে' এই বাক্যে 'রাম' শব্দ কর্তৃকারক সন্দেহ নাই। কিন্তু 'বাঘে মানুষ খায়', 'ঘোড়ায় লাথি মারে', 'গোরুতে ধান খায়', বাক্যে 'বাঘে' 'ঘোড়ায়' 'গোরুতে' শব্দগুলি কর্তৃকারক এবং করণকারকের খিচুড়ি। 'বাছুরে জন্মায় বা বাছুরে মরে' এমন বাক্য বৈধ নহে, 'বাছুরে তাকে চেটেচে', চলে— অর্থাৎ এরূপ স্থলে কর্তার সঙ্গে কর্ম চাই। 'ঘোড়ায় লাথি মারে' বলি কিন্তু 'ঘোড়ায় দাঁড়িয়ে আছে' বলি না। 'লোকে নিন্দে করে' বলি, কিন্তু 'লোকে জমেচে' না বলিয়া 'লোক জমেচে' বলি। আরো একটি কথা বিবেচ্য, বাংলায় কর্তৃকারকের এই প্রকার করণঘেঁষা রূপ কেবল একবচনেই চলে, আমরা বলি না 'লোকগুলোতে নিন্দে করে'। তার কারণ, লোকে, বাঘে, ঘোড়ায় প্রভৃতি প্রয়োগ একবচনও নহে বহুবচনও নহে, ইহাকে সামান্যবচন বলা যাইতে পারে। ইহার প্রকৃত অর্থ, লোকসাধারণ, ব্যাঘ্রসাধারণ, ঘোটকসাধারণ। যখন বলা হয় 'রামে মারলেও মরব, রাবণে মারলেও মরব', তখন 'রাম ও রাবণ' ব্যক্তিবিশেষের অর্থত্যাগ করিয়া জাতিবিশেষের অর্থ ধারণ করে।

কর্তৃকারক বহুবচন = রাখালেরা চরাচ্চে, গাছগুলি নড়চে, লোকসব চলেচে।

কর্ম— ভাত খাই, গাছ কাটি, ছেলেটাকে মারি।

এইখানে একটু বক্তব্য আছে। কর্মকারকে সাধারণত প্রাণীপদার্থ সম্বন্ধেই 'কে' বিভক্তি প্রয়োগ হয়। কিন্তু তাহার ব্যতিক্রম আছে। যেমন, 'এই টেবিলটাকে নড়াতে পারচি নে' 'সন্ন্যাসী লোহাকে সোনা করতে পারে' 'জিয়োমেট্রির এই প্রব্লেমটাকে কায়দা করতে হবে' ইত্যাদি। অথচ 'এই প্রব্লেম কষো, এই লোহাকে আনো, টেবিলকে তৈরি করো' এরূপ চলে না। অতএব দেখিতেছি, অপ্রাণীবাচক শব্দের উত্তরে 'টা' বা 'টি' যোগ করিলে কর্মকারক তদুত্তরে 'কে' বিভক্তি হয়, যেমন 'চৌকিটাকে সোরিয়ে দাও' ('চৌকিকে সোরিয়ে দাও' হয় না) 'গাছটাকে কাটো' ('গাছকে কাটো' হয় না)। ইহাতে বুঝা যাইতেছে 'টি' বা 'টা' যোগ করিলে শব্দবিশেষের অর্থ এমন একটা সুনির্দিষ্টতার জোর পায় যে তাহা যেন কতকটা প্রাণের গৌরব লাভ করে। 'লোহাকে সোনা করা যায়', বাক্যে 'লোহা' সেইরূপ যেন ব্যক্তিবিশেষের ভাব ধারণ করিয়াছে।

করণ— ছড়ি দিয়ে মারে, মাঠ দিয়ে যায়, হাত দিয়ে খায়, ঘোলে দুধের সাধ মেটে না, কথায় চিঁড়ে ভেজে না, কানে শোনে না।

অপাদান— রামের চেয়ে (চাইতে) শ্যাম বড়ো, এ গাছের থেকে ও গাছটা বড়ো, তোমা হোতেই এটা ঘট্‌ল, ঘর থেকে বেরোও।

সম্বন্ধ— গাছের পাতা, আজকের কথা, সেদিনকার ছেলে।

অধিকরণ— নদীতে জল, লতায় ফুল, পকেটে টাকা।

বাংলায় কর্তৃকারক ছাড়া অপর কারকে বহুবচনসূচক কোনো চিহ্ন নাই।

সর্বনাম

কর্তা— আমি আমরা, তুমি তোমরা, আপনি আপনারা, সে তারা, তিনি তাঁরা, এ এরা, ইনি এঁরা, ও ওরা, উঁনি, ওঁরা, কে কারা, যে যারা, কি কিসব কোন্‌গুলো, যা যা'সব যেগুলো, তা সেইসব সেইগুলো।

কর্ম— আমাকে আমাদের, তোমাকে তোমাদের (দিগকে), আপনাকে আপনাদের, তাকে তাদের, তাঁকে তাঁদের, একে এদের, এঁকে এঁদের, ওঁকে ওঁদের, কাকে কাদের, কোন্‌টাকে কোন্‌গুলোকে, যাকে যাদের, যেটাকে যেগুলোকে, সেটাকে সেগুলোকে।

করণ— আমাকে দিয়ে, তাকে দিয়ে, কোন্‌টাকে দিয়ে, ইত্যাদি। কেন, কিসে, কিসে কোরে, কি দিয়ে; যাতে, যাতে কোরে, যা দিয়ে ; তাতে, তাতে কোরে, তা দিয়ে ইত্যাদি।

অপাদান— আমার চেয়ে এটা ভালো, আমা হতে এ হবে না, আমার থেকে ও বড়ো, এটার চেয়ে, ওটা থেকে ইত্যাদি।

সম্বন্ধ— আমার তোমার তার এগুলোর ওগুলোর ইত্যাদি।

অধিকরণ— আমাতে তোমাতে, এটাতে ওটাতে, আমায় তোমায়, আমাদের মধ্যে, এগুলোতে ইত্যাদি। এখন তখন যখন কখন, এমন তেমন কেমন যেমন অমন, অত তত যত, এখানে যেখানে সেখানে।

আশ্বিন-কার্তিক ১৩২৬

২

বাংলায় কথার ভাষা আর লেখার ভাষা নিয়ে যে তর্ক কিছুকাল চলছে আপনি আমাকে সেই তর্কে যোগ দিতে ডেকেছেন। আমার শরীর অত্যন্ত ক্লান্ত বলে এ কাজে আমি উৎসাহ বোধ করছি নে। সংক্ষেপে দুই-একটা কথা বলব।

কর্ণ অর্জুন উভয়ে সহোদর ভাই হওয়া সত্ত্বেও তাদের মধ্যে যখন জাতিভেদ ঘটেছিল, একজন রইল ক্ষত্রিয় আর-একজন হ'ল সূত, তখনি দুই পক্ষে ঘোর বিরোধ বেধে গেল। বাংলা লেখায় আর কথায় আজ সেই দ্বন্দ্ব বেধে গেছে। এরা সহোদর অথচ এদের মধ্যে ঘটেছে শ্রেণীভেদ; একটি হলেন সাধু, আর-একটি হলেন অসাধু। এই শ্রেণীভেদের কারণ ছিলেন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত। সে কথাটা খুলে বলি।

এক সময়ে বাংলায় পদ্য সাহিত্যই একা ছিল ; গদ্য ছিল মুখে ; লেখায় স্থান পায় নি। পদ্যের ভাষা কোনো এক সময়কার মুখের ভাষার কাছ-ঘেঁষা ছিল সন্দেহ নেই— তার মধ্যে 'করিতেছিলাম' বা 'আমারদিগের' 'এবং' 'কিম্বা' 'অথবা' 'অথচ' 'পরন্তু'র ভিড় ছিল না। এমন-কি, 'মুই' 'করলুঁ' 'হৈনু' 'মোসবার' প্রভৃতি শব্দ পদ্য ভাষায় অপভাষা বলে গণ্য হয় নি। বলা বাহুল্য, এ-সকল কথা কোনো এক সময়ের চলিত কথা ছিল। হিন্দি সাহিত্যেও দেখি কবীর প্রভৃতি কবিদের ভাষা মুখের কথায় গাঁথা। হিন্দিতে আর-একদল কবি আছেন, যাঁরা ছন্দে ভাষায় অলংকারে সংস্কৃত ছাঁদকেই আশ্রয় করেচেন। পণ্ডিতদের কাছে এঁরাই বেশি বাহবা পান। ইংরেজিতে যাকে snobbishness বলে এ জিনিসটা তাই। হিন্দি প্রাকৃত যথাসম্ভব সংস্কৃত ছদ্মবেশে আপন প্রাকৃতরূপ ঢাকা দিয়ে সাধুত্বের বড়াই করতে গিয়েচে। তাতে তার যতই মান বাড়ুক-না কেন, মথুরার রাজদণ্ডের ভিতর ফুঁ দিয়ে সে বৃন্দাবনের বাঁশি বাজাতে পারে নি।

যা হোক, যখন বাংলা ভাষায় গদ্যসাহিত্যের অবতারণা হল তার ভার নিলেন সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত। দেশের ছেলেমেয়েদের মুখে মুখে প্রতিদিন যে গদ্য বাণী প্রবাহিত হচ্চে তাকে বহুদূরে রেখে সংস্কৃত সরোবর থেকে তাঁরা নালা কেটে যে ভাষার ধারা আনলেন তাকেই নাম দিলেন

সাধুভাষা। বাংলা গদ্য সাহিত্যিক ভাষাটা বাঙালির প্রাণের ভিতর থেকে স্বভাবের নিয়মে গড়ে ওঠে নি, এটা ফরমাসে গড়া। বাঙালির রসময় রসনাকে ধিক্কার দিয়ে পণ্ডিতের লেখনী বলে উঠল গদ্য আমি সৃষ্টি করব। তলব দিলে অমরকোষকে মুগ্ধবোধকে। সে হল একটা অনাসৃষ্টি। তার পর থেকে ক্রমাগতই চেষ্টা চলচে কি ক'রে ভাষার ভিতরকার এই একটা বিদ্‌ঘুটে অসামঞ্জস্যটাকে মিলিয়ে দেওয়া যেতে পারে। বিদ্যাসাগর তাকে কিছু পরিমাণে মোলায়েম ক'রে আনলেন— কিন্তু বঙ্গবাণী তবু বললেন "এহ বাহ্য।" তার পরে এলেন বঙ্কিম। তিনি ভাষার সাধুতার চেয়ে সত্যতার প্রতি বেশি ঝোঁক দেওয়াতে তখনকার কালের পণ্ডিতেরা দুই হাত তুলে বোপদেব অমরের দোহাই পেড়েছিলেন। সেই বঙ্কিমের দুর্গেশনন্দিনীর ভাষাও আজ প্রায় মরা গাঙের ভাষা হয়ে এসেচে— এখনকার সাহিত্যে ঠিক সে ভাষার স্রোত চলচে না। অর্থাৎ বাংলা গদ্যসাহিত্যের গোড়ায় যে একটা original sin ঘটেছে কেবলই সেটাকে ক্ষালন করতে হচ্চে। কৌলীন্যের অভিমানে যে একটা হঠাৎ সাধুভাষা সর্বসাধারণের ভাষার সঙ্গে জল-চল বন্ধ ক'রে কোণ-ঘেঁষা হয়ে বসেছিল, অল্প অল্প ক'রে তার পঙ্‌ক্তিভেদ ভেঙে দেওয়া হচ্চে। তার জাত যায়-যায়। উভয় ভাষায় কখনো গোপনে কখনো প্রকাশ্যে অসবর্ণ বিবাহ হতে শুরু হয়েচে। এখন আমরা চলিত কথায় অনায়াসে বলতে পারি 'ম্যালেরিয়ায় কুইনীন ব্যবহার করলে সদ্য ফল পাওয়া যায়।' পঞ্চাশ বছর আগে লোকের সঙ্গে ব্যাভার ছাড়া ব্যবহার কথাটা অন্য কোনো প্রসঙ্গেই ব্যবহার করতুম না। তখন বলতুম, 'ম্যালেরিয়ায় কুইনীনটা খুব খাটে।' আমার মনে আছে, আমার বাল্যকালে আমাদের একজন চাকরের মুখে 'অপেক্ষা' কথাটা শুনে আমাদের গুরুজনরা খুব হেসেছিলেন। কেননা, কেউ অপেক্ষা করচেন, এ কথাটা তাঁরাও বলতেন না— তাঁরা বলতেন 'অমুক লোক তোমার জন্যে বসে আছেন।' আবার এখানকার লেখার ভাষাতেও এমনি করেই মুখের ভাষার ছাঁদ কেবলই এগিয়ে চলছে। এক ভাষার দুই অঙ্গের মধ্যে অতি বেশি প্রভেদ থাকলে সেই অস্বাভাবিক পার্থক্য মিটিয়ে দেবার জন্যে পরস্পরের মধ্যে কেবলই রফা চলতে থাকে।

এ কথা সত্য ইংরেজিতেও মুখের ভাষায় এবং লেখার ভাষায় একেবারে ষোলো-আনা মিল নেই। কিন্তু মিলটা এতই কাছাকাছি যে পরস্পরের জায়গা অদলবদল করতে হলে মস্ত একটা লাফ দিতে হয় না। কিন্তু বাংলায় চলতি ভাষা আর কেতাবী ভাষা একেবারে এপার ওপার— ইংরেজিতে সেটা ডান হাত বাঁ হাত মাত্র— একটাতে দক্ষতা বেশি আর-একটাতে কিছু কম— উভয়ে একত্র মিলে কাজ করলে বেমানান হয় না। আমি কোনো কোনো বিখ্যাত ইংরেজ লেখকের ডিনার-টেবিলের আলাপ শুনেছি, লিখে নিলে ঠিক তাঁদের বইয়ের ভাষাটাকেই পাওয়া যেত, অতি সামান্যই বদল করতে হত। এই জাতিভেদের অভাবে ভাষার শক্তিবৃদ্ধি হয় আমার তো এই মত। অবশ্য মুখের ব্যবহারে ভাষার যে ভাঙচুর অপরিচ্ছন্নতা ঘটা অনিবার্য সেটাও যে লেখার ভাষায় গ্রহণ করতে হবে আমি তা মানি না। ঘরে যে ধুতি পরি সেই ধুতিই সভায় পরা চলে কিন্তু কুঁচিয়ে নিতে একটু যত্নের প্রয়োজন হয়, আর সেটা ময়লা হলে সৌজন্য রক্ষা হয় না। ভাষা সম্বন্ধেও সেই কথা।[1]

বৈশাখ ১৩৫০

---

[1] বিজয়চন্দ্র মজুমদারকে লিখিত পত্র।

প্রবাসী ১৩৫০ বৈশাখ সংখ্যায় কালিদাস নাগের নিম্নলিখিত মন্তব্যসহ প্রকাশিত হয় : "...চিঠি যে 'সবুজ-পত্র' যুগে লেখা সে বিষয়ে সন্দেহ নেই, যদিও এই মূল্যবান চিঠিখানি তারিখ বর্জিত।"

বাদানুবাদ

১

গতবারকার শান্তিনিকেতন পত্রের "বাংলা কথ্যভাষা" ও "অনুবাদ-চর্চা"র দুইটি অংশের প্রতিবাদ করিয়া শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় নিম্নলিখিত পত্রটি পাঠাইয়াছেন।

"আশ্বিনের শান্তিনিকেতনে 'বাংলা কথ্য-ভাষা' নামক প্রবন্ধে লেখক বলিয়াছেন 'বাংলায় দুই অক্ষরের বিশেষণমাত্রই স্বরান্ত।' কিন্তু ইহার ব্যত্যয় আছে যথা— বদ, সব, লাল, নীল, পীত, টক, বেশ, শেষ, মূল, ভুল, খুব ইত্যাদি।

"হসন্ত সম্বন্ধে পাগল্‌-পাগলা, আপন-আপ্‌নি ইত্যাদি নিয়মেরও ব্যতিক্রম আছে; যথা দরদ্‌-দরদী, এ কথাটা পারসী কিন্তু হজম্‌-হজ্‌মিও পারসী। তার পর "দরদী" কথাটা ত আর পারসী নয়— ওরা যখন বাংলা তখন বাংলার নিয়মে এর উচ্চারণ হওয়া উচিত ছিল।

" 'অনুবাদচর্চা' প্রবন্ধের 'এবং' শব্দের ব্যবহারনির্দেশক নিয়ম সম্বন্ধে সন্দেহ হইতেছে। 'তাঁর অনেক শত্রু আছে এবং তারা সকলেই শক্তিশালী' আমার ত মনে হয় এরূপ প্রয়োগ বাংলায় বেমানান হয় না। তার একটি প্রকৃষ্ট প্রমাণ এই যে, যে-বাক্যটির অনুবাদ আলোচনা করিতে গিয়া লেখক 'এবং'-এর নিয়ম নির্দেশ করিয়াছেন তার লেখককৃত তর্জমাতেই ইহার ব্যতিক্রম আছে— যথা 'এমন অনেক জাতীয় পাখি আছে যাহাদের যুদ্ধোপকরণ এবং অভ্যাস সকল কীট আক্রমণের পক্ষে বিশেষ উপযোগী এবং যাহারা কীট শিকারেই সমস্ত জীবন যাপন করে', এখানে শেষের এবংটি 'হয়' ও 'করে' এই দুই ভিন্ন ক্রিয়াকে যোগ করিতেছে।"

এই প্রতিবাদ সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য নিম্নে লিখিলাম।

দুই অক্ষরের বিশেষণ শব্দ কোনো কোনো স্থলে স্বরান্ত হয় না তাহা আমি মানি— কিন্তু আমাদের ভাষায় তাহার সংখ্যা অতি অল্প। লেখক তাহার উদাহরণে 'পীত' শব্দ ধরিয়া দিয়াছেন। প্রথমত, ঐ শব্দ চলিত ভাষায় ব্যবহৃত হয় না। দ্বিতীয়ত যেখানে হইয়াছে সেখানে উহা হসন্ত নহে। যেমন 'পীত ধড়া'। কখনোই 'পীৎ-ধড়া' বলা হয় না। 'পীৎ-বর্ণ', কেহ কেহ বলেন, কিন্তু 'পীত-বর্ণ'ই বেশির ভাগ লোকে বলিয়া থাকেন। লেখক যে-কয়টি শব্দের তালিকা দিয়াছেন তাহা ছাড়া, বোধ করি কেবল নিম্নলিখিত শব্দগুলিই নিয়মের বাহিরে পড়ে: বীর, ধীর, স্থির, সৎ, ঠিক, গোল, কাৎ, চিৎ, আড়। সংখ্যাবাচক এক, তিন, চার প্রভৃতি শব্দকে যদি বিশেষণ বলিয়া গণ্য করিতে হয় তবে এগুলি অনিয়মের ফর্দটাকে খুব মোটা করিয়া তুলিবে। এই প্রসঙ্গে এ কথা মনে রাখা দরকার 'এক' যেখানে বিশেষভাবে বিশেষণরূপ ধারণ করিয়াছে সেখানে তাহা 'একা' হইয়াছে।

"তিন অক্ষরের বাংলা শব্দ স্বরান্ত হইলে মাঝের অক্ষর আপন অকার বর্জন করে," লেখক এই নিয়মের একটিমাত্র ব্যতিক্রমের উদাহরণ সংগ্রহ করিয়াছেন, 'দরদী'। শব্দটির উচ্চারণ সম্বন্ধে সন্দেহ আছে। 'হম্‌-দর্দী' কথায় 'র'য়ের অকার লুপ্ত। যাহাই হউক এই নিয়মের ব্যতিক্রম আছে বৈকি। যথা, সজনি, বচসা, গরবী, করলা (ফল)। উপসর্গ-বিশিষ্ট শব্দেও এ নিয়ম খাটে না। যেমন, বে-তরো, দো-মনা, অ-ফলা। বলা বাহুল্য খাঁটি সংস্কৃত বাংলায় চলিত থাকিলেও এ নিয়ম মানে না; যেমন, মালতী, রমণী, চপলা ইত্যাদি। এই প্রসঙ্গে বাংলার উচ্চারণ-বিকারের একটা নিয়ম উল্লেখ করা যাইতেছে। অনেক স্থলে তিন অক্ষরের স্বরান্ত শব্দের মধ্য অক্ষরের অকার লুপ্ত

না হইয়া উকার হইয়া যায়। কাঁদন কাঁদুনে, আট-পহর আটপহুরে (আটপৌরে), শহর শহুরে, পাথর পাথুরে, কোঁদল কুঁদুলে ইত্যাদি।

অগ্রহায়ণ ১৩২৬

২

অনধিকারচর্চায় অব্যবসায়ীর যে বিপদ ঘটে আমারও তাই ঘটিয়াছে। গত আশ্বিন-কার্তিকের শান্তিনিকেতন পত্রে 'বাংলা কথ্যভাষা' 'অনুবাদ-চর্চা' প্রভৃতি কয়েকটা প্রবন্ধে নিতান্তই প্রসঙ্গক্রমে বাংলা ভাষাতত্ত্ব সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু আলোচনা করিয়াছিলাম। প্রবাসী তাহা উদ্‌ধৃত করিয়া দেওয়াতে আমার অজ্ঞানকৃত ও অসাবধানকৃত কতকগুলি ভুল বাহির হইয়া পড়িয়াছে, এই উপলক্ষে সেগুলি সংশোধন হইবার সুযোগ হইল বলিয়া আমি কৃতজ্ঞ আছি। শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদার মহাশয় বাংলা ভাষার ব্যবহারে সাহিত্যরসিক। আবার তাহার নাড়ী-পরিচয়ে বৈজ্ঞানিক ; এইজন্য, তিনি আমার যে ত্রুটি ধরিয়াছেন সাধারণের কাছে তাহা প্রকাশ করা উচিত।

বিজয়বাবু বলেন, 'কর্তৃকারকের' 'এ' কর্তা ও করণের খিচুড়ি হইতে উৎপন্ন বলিয়া মনে হয় না। এক সময়ে প্রাকৃত ভাষার গ্রন্থে সকল কর্তৃকারকের পদ-ই 'এ' দিয়া চিহ্নিত পাই ; 'মহাবীর বলিলেন' এইরূপ কথাতে 'মহাবীরে' পাই। এই প্রাকৃতের পূর্ববর্তী প্রাকৃতে দেখিতে পাই যে একবচনে বেশির ভাগ ওকার চলিয়াছে ; ও অল্প পরেই আবার ওকার ও আকার এই উভয় স্থলেই এক একার পাই, ও এই একারটি শেষে কেবল একবচনেই ব্যবহৃত হইয়াছে। উন্নতিশীল বা পরিবর্তনশীল মধ্যবাংলায় ভাষার যত পরিবর্তন ঘটিয়াছে, দূরপ্রদেশে ততটা ঘটে নাই ; এখনো রংপুরের প্রাদেশিক ভাষায় কর্তৃকারকে সর্বত্রই একার ব্যবহৃত হয়, আসামের ভাষাতেও উহা রহিয়াছে। একটা প্রাচীন প্রাকৃত হইতেই বাংলা ও ওড়িয়্যার জন্ম ; ওড়িয়া ভাষায় এখনো সুনির্দিষ্ট একজন লোকের নাম কর্তৃকারকে একার আছে ; একজন নির্দিষ্ট পণ্ডিত বলিলেন যে তিনি আসিতে পারিবেন না, এ কথায় ওড়িয়াতে 'পণ্ডিতে কহিলে' ইত্যাদি চলিয়া থাকে। একজন নির্দিষ্ট গোয়ালাকে লক্ষ্মণ আংটির বিনিময়ে দুধ চাহিয়াছিলেন, সেই গোয়ালা যেভাবে তাহার অসম্মতি জানাইয়াছিল, তাহা পুঁথিতে এইরূপে লিখিত আছে—"গউড়ে বইলে গছে মুদি ফলি থাএ।"

বিজয়বাবু কর্তৃকারকের এ চিহ্ন সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন তাহা আমি স্বীকার করিয়া লইলাম। আমার পূর্ব মন্তব্যের বিরুদ্ধ কয়েকটা দৃষ্টান্ত আমার মনে পড়িতেছে। যথা "তার অদ্ভুত ব্যবহারে লোকে হাসে" এখানে হাসে ক্রিয়া অকর্মক। "সবায় (সবাই) কোমর বেঁধে দাঁড়াল" ইহাও অকর্মক। এই সবায় বা সবাই শব্দ প্রাচীন পুঁথিতে 'সভাএ' লিখিত হয়, বস্তুত ইহা এ-যুক্ত কর্তৃকারকেরই দৃষ্টান্ত।

হর্নলি প্রভৃতি ভাষাতত্ত্ববিৎ কর্তৃকারকের একার-যুক্ত রূপকে তির্যক্‌রূপ (oblique form) বলেন। অর্থাৎ ইহাতে শব্দটিকে কেমন যেন আড় করিয়া ধরা হয়। বাংলায় সম্বন্ধ কারকের 'র' চিহ্ন অনেক স্থলেই বিশেষ্য পদের এই তির্যক্‌রূপের সহিত যুক্ত হয়, যথা, রামের, কানাই-এর ; বহুবচনের 'রা' চিহ্ন সম্বন্ধেও সেই নিয়ম, যথা, রামেরা, ভাইএরা ইত্যাদি।

আমি লিখিয়াছিলাম, কর্মকারকে অপ্রাণীবাচক শব্দের উত্তর টা টি যোগ না করিলে তাহার সঙ্গে 'কে'-চিহ্ন বসে না। বিজয়বাবু তাহার ব্যতিক্রমের দৃষ্টান্ত দিয়াছেন— "গাছকে ওড়িশায় গছ বলে" ; "অনেক লোকে আকাশকে চাঁদোয়ার মতো পদার্থ মনে করে।"

প্রবাসীর একজন কবিরাজ পাঠক 'বাংলা কথ্যভাষা' প্রবন্ধে আমার একটি বাক্য-ত্রুটি নির্দেশ করিয়াছেন। আমি লিখিয়াছিলাম "বাংলায় যে অসংযুক্ত শব্দের পূর্বে স্বরবর্ণ ও পরে ব্যঞ্জনবর্ণ আছে সে শব্দ নিজের অকার বর্জন করে।" এই বাক্যে অনেকগুলি অদ্ভুত ভুল রহিয়া গিয়াছে। কবিরাজ মহাশয়ের নির্দেশমতো আমি তাহা সংশোধন করিলাম— "বাংলায় তিন অক্ষরের শব্দের অন্ত অক্ষরের সহিত যদি স্বর থাকে তবে মধ্যবর্তী বর্ণের অকার বর্জিত হয়, যেমন, পাগ্‌লা গর্‌মি ইত্যাদি। কবিরাজ মহাশয় "বচসা, জটলা, দরজা, খামকা, ঝরকা" ইত্যাদি কয়েকটি ব্যাভিচারের দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন। অগ্রহায়ণের শান্তিনিকেতন পত্রে আমরাও এরূপ দৃষ্টান্ত কয়েকটি দিয়াছি।

কবিরাজ মহাশয় বলেন যে, যদিচ আমরা বলি না, "লোকগুলাতে নিন্দা করে" কিন্তু "সব লোকে নিন্দা করে" বলা চলে। অতএব কর্তৃকারকে একার প্রয়োগ কেবল এক-বচনেই চলে এমন কথা জোর দিয়া বলা ঠিক নয়।

কর্মকারকে অপ্রাণীবাচক শব্দের উত্তর সাধারণত "কে" চিহ্ন বসে না, কিন্তু পরে 'টা' বা 'টি' থাকিলে বসে, আমি এই নিয়মের উল্লেখ করিয়াছিলাম। কিন্তু আমার ভাষাপ্রয়োগের দোষে কবিরাজ মহাশয় মনে করিয়াছেন যে আমার মতে 'টা' 'টি' বিশিষ্ট শব্দ কর্মকারকে নির্বিশেষে 'কে' চিহ্ন গ্রহণ করে। এইজন্য তিনি কয়েকটি বিরুদ্ধ দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন যথা, "আগুনের তেজটা দেখ" "তরকারিটা খাওয়া গেল না" ইত্যাদি।

কবিরাজ মহাশয় আমার বাক্যরচনায় যে শৈথিল্য নির্দেশ করিয়াছেন আমি কৃতজ্ঞতার সহিত সেই ত্রুটি স্বীকার করিতেছি।

কয়েকটি প্রতিশব্দ সম্বন্ধে তিনি যাহা বলেন তাহা চিন্তার যোগ্য। "যে রোগ পিতামাতা হইতে পুত্রপৌত্রে যায়" তাহাকে আয়ুর্বেদে 'সঞ্চারিরোগ' বলে। Heredity কুলসঞ্চারিতা, inherited কুলসঞ্চারী বলিলে হয় না? আয়ুর্বেদে নাছোড়বান্দার একটি ঠিক সংস্কৃত প্রতিশব্দ আছে— 'অনুষঙ্গী'।

পৌষ ১৩২৬

চলতি ভাষার রূপ

নানা জেলায় ভাষার নানা রূপ। এক জেলার ভিন্ন অংশেও ভাষার বৈচিত্র্য আছে। এমন অবস্থায় কোথাকার ভাষা সাহিত্যে প্রবেশ লাভ করবে তা কোনো কৃত্রিম শাসনে স্থির হয় না, স্বতই সে আপনার স্থান আপনি করে। কলকাতা সমগ্র বাংলার রাজধানী। এখানে নানা উপলক্ষে সকল জেলার লোকের সমাবেশ ঘটে আসচে। তাই কলকাতার ভাষা কোনো বিশেষ জেলার নয়। স্বভাবতই এই অঞ্চলের ভাষাই সাহিত্য দখল করে বসেচে। যেটাকে লেখ্য ভাষা বলি সেটা কৃত্রিম, তাতে প্রাণপদার্থের অভাব, তার চলৎশক্তি আড়ষ্ট, সে বদ্ধ জলের মতো, সে ধারা জল নয়। তাতে কাজ চলে বটে কিন্তু সাহিত্য শুধু কাজ চলবার জন্যে নয়, তাতে মন আপনার বিচিত্র লীলার বাহন চায়। এই লীলাবৈচিত্র্য বাঁধা ভাষায় সম্ভব হয় না। এইজন্যেই কলকাতা অঞ্চলের চলতি ভাষাই সাহিত্যের আশ্রয় হয়ে উঠেচে। একদা যখন সাধু ভাষার একাধিপত্য ছিল তখনো যে-কোনো জেলার লেখক নাটক প্রভৃতিতে কলকাতার কথাবার্তা ব্যবহার করেচেন, কখনোই পূর্ব

বা উত্তর বঙ্গের উপভাষা ব্যবহার করেন নি— স্বভাবতই কলকাতার চলতি ভাষা তাঁরা গ্রহণ করেচেন। এর থেকে বুঝবে সাহিত্য স্বভাবতই কোন্ প্রণালী অবলম্বন করেচে।[১]

৬ কার্তিক ১৩৩৮

বিবিধ

১

এ কথা আর অস্বীকার করা চলে না যে বাংলা সাহিত্যের ভাষা কলকাতার চলিত ভাষাকে আশ্রয় করেছে। শিশুকাল হতে বাংলার সকল প্রদেশের লোকেরই এই ভাষা শিক্ষা করা আবশ্যক। নইলে সাহিত্যে ব্যবহারের সময় বাধা পেতে হবে।

য়ুরোপের সকল দেশেই প্রদেশভেদে উপভাষা প্রচলিত আছে কিন্তু তৎসত্ত্বেও সে-সকল দেশে ভদ্রসাধারণের কথিত ভাষায় প্রভেদ নেই। এবং সেই ভদ্রসমাজের কথিত ভাষার সঙ্গে সে-সকল দেশের সাহিত্যের ভাষা মোটের উপর অভিন্ন। আমাদের দেশেও ভাষার মধ্যে যথাসম্ভব এইরকম মিল প্রার্থনীয়। বাংলা ভাষা স্বভাবতই দ্রুতবেগে এই মিলের দিকে চলেচে।

কলকাতার কথিত ভাষার মধ্যেও সম্পূর্ণ ঐক্য নেই। লন্ডনেও ভাষার একটা নিম্নস্বর আছে তাকে বলে কক্‌নি। সেটা সাহিত্যভাষা থেকে দূরবর্তী।

আমাদের চলিত ভাষামূলক আধুনিক সাহিত্য ভাষার আদর্শ এখনো পাকা হয় নি বলে লেখকদের রুচি ও অভ্যাস-ভেদবশত শব্দব্যবহার সম্বন্ধে যথেচ্ছাচার আছে। আরো কিছুকাল পরে তবে এর নির্মাণকার্য সমাধা হবে।

তবু আপাতত আমি নিজের মনে একটা নিয়ম অনুসরণ করি। আমার কানে যেটা অপভাষা বলে ঠেকে সেটাকে আমি বর্জন করি। "ভিতর" এবং "ভেতর" "উপর" এবং "ওপর" "ঘুমোতে" এবং "ঘুমুতে" এই দুইরকমেরই ব্যবহার কলকাতায় আছে কিন্তু শেষোক্তগুলিকে আমি অপভাষা বলি। "দুয়োর" কথার জায়গায় "দোর" কথা ব্যবহার করতে আমার কলমে ঠেকে। কলকাতার "ভাইয়ের বিয়ে" না বলে কেউ কেউ "ভেয়ের বে" কিংবা "করলুম"-এর জায়গায় "কন্নু" বলে, কিন্তু এগুলিকে সাহিত্যে স্বীকার করতে পারি নে। গুছুতে, রেতের বেলা প্রভৃতি ব্যবহার আজকাল দেখি, কিন্তু এগুলিকে স্বীকার করে নিতে পারি নে।[২]

২

প্রণামের শ্রেণীভেদ আছে। ১ নম্বর সহজ প্রণাম হচ্ছে গ্রীবা বাঁকিয়ে জোড় হাত কপালে ঠেকানো। যখন বলি গড় করি তোমার পায়ে তখন বোঝায় এমন কোনো ভঙ্গি করা যেটা বিনম্রতার চূড়ান্ত। গড় শব্দে একটা বিশেষ নম্রতার ভঙ্গি বোঝায় তার প্রমাণ তার সঙ্গে 'করা'

---

[১] শ্রীচিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়কে লিখিত পত্র।

[২] রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত পাণ্ডুলিপির একটি পৃষ্ঠা।

দ্রষ্টব্য : অনুরূপ আলোচনা 'বাংলাভাষা পরিচয়', অধ্যায় ১০ ও ১২।

ক্রিয়াপদের যোগ। সেইরকম ভঙ্গি করে প্রণাম করাই গড় করে প্রণাম করা। নমস্কার হই বলি নে, নমস্কার করি বলি— গড় করি সেই পর্যায়ের শব্দ। গড়াই গড়াগড়ি দিই শব্দে বুঝতে হবে শরীরকে একটা বিশেষ অবস্থাপন্ন করি, এর সংসর্গে 'হই' ক্রিয়াপদ আসতেই পারে না। বস্তুত গড় করে প্রণাম করা হচ্চে পায়ের কাছে গড়িয়ে প্রণাম করা। এই প্রণামে সেই ভঙ্গিটা কৃত হয়।[১]

জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৭

অভিভাষণ

একদিন ছিল যখন পাণ্ডিত্যের সঙ্গে বাংলা ভাষা ও বাংলা সাহিত্যের বিরোধ ছিল। এর প্রতি কিছু অবজ্ঞাও তখন করা হয়েছে। প্রাচীন সংস্কৃতের আলয় থেকে বাংলা তখন যথোচিত সম্মান পায় নি তার কারণও হয়তো ছিল। তখন বাংলা ছিল অপরিণত, সাহিত্যের অনুপযোগী। এর দৈন্যকে উপেক্ষা করা সহজ ছিল। কিন্তু যে শক্তি তখন এর মধ্যে প্রচ্ছন্ন ছিল, সে শক্তি এ কোথা থেকে পেয়েছে? সংস্কৃত ভাষারই অমৃত উৎস থেকে। সেই কারণেই তার পরিণতিও চলেছে, কোথাও বাধা পায় নি। বাইরে থেকে যে-সকল বিদ্যা আমরা লাভ করেছি, তা আমাদের ভাষায় রক্ষা করা সম্ভব হল, কারণ বাংলার দৈন্য ও অভাব আজ আর বেশি নেই। পারিভাষিকের কিছু দারিদ্র্য আছে বটে, কিন্তু সে দারিদ্র্য পূর্ণ করবার উপায় আছে সংস্কৃতের মধ্যে।

একদিন ছিল ভারতবর্ষে ভাষা-বোধের একটা প্রতিভা। ভারতবর্ষ পাণিনির জন্মভূমি। তখনকার দিনে প্রাকৃতকে যাঁরা বিধিবদ্ধ করেছিলেন, তাঁরা ছিলেন পরম পণ্ডিত। অথচ প্রাকৃতের প্রতি তাঁদের অবজ্ঞা ছিল না। সংস্কৃত ব্যাকরণের চাপে তাঁরা প্রাকৃতকে লুপ্তপ্রায় করেন নি। তার কারণ ভাষা সম্বন্ধে তাঁদের ছিল সহজ বোধশক্তি। আমরা আজকাল সংস্কৃত শিখে ভুলে যাই যে বাংলার একটি স্বকীয়তা আছে। অবশ্য সংস্কৃত থেকেই সে শব্দ-সম্পদ পাবে, কিন্তু তার নিজের দৈহিক প্রকৃতি সংস্কৃত দ্বারা আচ্ছন্ন করবার চেষ্টা অসংগত। আমাদের প্রাচীন পণ্ডিতেরা কখনো সে চেষ্টা করেন নি। আমি সেকালের পণ্ডিতদের বাংলায় লেখা অনেক পুরানো পুঁথি দেখেছি। তার বানান তাঁরা বাংলা ভাষাকে প্রাকৃত জেনেই করেছিলেন। তাঁদের ষত্ব ণত্ব জ্ঞান ছিল না, এ কথা বলা চলে না। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের আমলেও এখনকার নব পণ্ডিতদের মতো ষত্ব ণত্ব নিয়ে মাতামাতি করা হয় নি। তা করলে "শ্রবণ" থেকে উদ্ভূত "শোনা" কখনোই মূর্ধন্য ণ-এর অত্যাচার ঠেকাতে পারত না। যাঁরা মনে করেছেন বাইরে থেকে বাংলাকে সংস্কৃতের অনুগামী করে শুদ্ধিদান করবেন, তাঁরা সেই দোষ করছেন যা ভারতে ছিল না। এ দোষ পশ্চিমের। ইংরেজিতে শব্দ ধ্বনির অনুযায়ী নয়। ল্যাটিন ও গ্রীক থেকে উদ্ভূত শব্দে বানানের সঙ্গে ধ্বনির বিরোধ হলেও তাঁরা মূল বানান রক্ষা করেন। এই প্রণালীতে তাঁরা ইতিহাসের স্মৃতি বেঁধে রাখতে চান। কিন্তু ইতিহাসকে রক্ষা করা যদি অবশ্যকর্তব্য হয় তবে ডারউইন-কথিত আমাদের পূর্বপুরুষদের যে অঙ্গটি খসে গেছে সেটিকে আবার সংযোজিত করা উচিত হবে। প্রসঙ্গক্রমে আধুনিক পণ্ডিতদের একটা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করি, তাঁদের মতে, 'বানান' শব্দে কোন্ ন লাগবে?

---

[১] গিরিজাকুমার বসুকে লিখিত পত্র

এই পত্রের উপরে ডান দিকে লেখা আছে 'গড়ীকরণ' 'নমস্করণ' 'নতীকরণ'।

বাংলাকে বাংলা বলে স্বীকার করেও এ কথা মানতে হবে যে সংস্কৃতের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ যোগ আছে। সংস্কৃত ভাষায় ভারতীয় চিত্তের যে আভিজাত্য, যে তপস্যা আছে বাংলা ভাষায় তাকে যদি গ্রহণ না করি তবে আমাদের সাহিত্য ক্ষীণপ্রাণ ও ঐশ্বর্যভ্রষ্ট হবে।

এ কথা স্বীকার করতেই হবে যে য়ুরোপীয় বিদ্যার যোগে নতুন বাংলা সাহিত্য, এমন-কি, কিয়ৎ পরিমাণে ভাষাও তৈরি হয়ে উঠেছে, বর্তমান কালের ভাব ও মনন-ধারা বহন করে এই যোগ যেমন আমাদের উদ্‌বোধনের সহায় হয়েছে, সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের নিরন্তর সম্বন্ধও আমাদের তেমনি সহায়। য়ুরোপীয় চিত্তের সঙ্গে আমাদের সাহিত্যের যদি বিচ্ছেদ ঘটে, তবে তাতে করে আমাদের যে দৈন্য ঘটবে সে আমাদের পক্ষে শোচনীয়, তেমনি সংস্কৃতের ভিতর দিয়ে প্রাচীন ভারতীয় চিত্তের যোগপ্রবাহ যদি ক্ষীণ বা অবরুদ্ধ হয়, তবে তাতেও বাংলা ভাষার স্রোতস্বিনী বিশুদ্ধতা ও গভীরতা হারাবে। ভাবের দিকের কথা ছেড়েই দেওয়া যাক, শব্দের দিক থেকে বাংলা ভাষা সংস্কৃতের কাছে নিরন্তর আনুকূল্যের অপেক্ষা না করে থাকতে পারে না।

বাংলায় লিখতে গিয়ে আমাকে প্রতি পদে নতুন কথা উদ্‌ভাবন করতে হয়েছে। তার কারণ বাংলা ভাষা একদিন শুদ্ধমাত্র ঘরের ভাষা ছিল। সেজন্য এর দৈন্য বা অভাব যথেষ্ট রয়ে গেছে। সে দৈন্য পূরণের সুযোগ আমাদের দেশেই আছে। জাপানি ভাষার মধ্যে অনুরূপ একটি দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। জাপানি ভাষায় তত্ত্বঘটিত শব্দরচনা সহজ নয়। জাপানির সঙ্গে সেজন্যে চীনে ভাষার যোগ রয়ে গেছে। যুদ্ধের দ্বারা সেদিনও জাপান চীনকে অসম্মান করেছে, অপমান করেছে। কিন্তু ভাষার মধ্যে সে চীনকে সম্মান করতে বাধ্য। তাই জাপানি অক্ষরের মধ্যে চৈনিক অক্ষর অপরিহার্য। ঘরের কথা জাপানি ভাষায় চলে হয়তো, কিন্তু চীনে ভাষা সঙ্গে না থাকলে বড়ো কোনো জ্ঞান বা উপলব্ধির প্রকাশ অসম্ভব হয়। অনুরূপ কারণেই বাংলাকে সংস্কৃত ভাষার দানসত্র ও অন্নসত্র থেকে দূরে নিয়ে এলে তাতে গুরুতর ক্ষতি ঘটবে।

আমাকে যে উপাধিতে আপনারা ভূষিত করলেন, তার জন্যে আবার আপনাদের প্রতি আমার অন্তরের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। কিন্তু এও বলি যে, অযোগ্য পাত্রে যদি সম্মান অর্পিত হয়ে থাকে সে দায়িত্ব আপনাদের। আমার কিছুই গোপন নেই। সংস্কৃত ভাষায় আমার অধিকার সংকীর্ণ। তথাপি যখন আপনারা আমাকে এই পুরস্কার দিলেন এর জন্যে কাউকে যদি নিন্দাভাগী হতে হয় তো সে আপনাদের।[১]

কার্তিক ১৩৩৮

ভাষার খেয়াল

ভাষা যে সব সময়ে যোগ্যতম শব্দের বাছাই করে কিংবা যোগ্যতম শব্দকে বাঁচিয়ে রাখে তার প্রমাণ পাই নে। ভাষায় চলিত একটা শব্দ মনে পড়ছে "জিজ্ঞাসা করা'। এ রকম বিশেষ্য-জোড়া ওজনে ভারী ক্রিয়াপদে ভাষার অপটুত্ব জানায়। প্রশ্ন করা ব্যাপারটা আপামর সাধারণের নিত্যব্যবহার্য অথচ ওটা প্রকাশ করবার কোনো সহজ ধাতুপদ বাংলায় দুর্লভ এ কথা মানতে সংকোচ লাগে। বিশেষ্য বা বিশেষণ রূপকে ক্রিয়ার রূপে বানিয়ে তোলা বাংলায় নেই যে তা নয়। তার উদাহরণ যথা— ঠ্যাঙানো, কিলোনো, ঘুষোনো, গুঁতোনো, চড়ানো, লাথানো, জুতোনো।

---

[১] সংস্কৃত কলেজ কর্তৃক "কবি সার্বভৌম" উপাধিদান ও অভিনন্দনের উত্তরে কথিত।

এগুলো মারাত্মক শব্দ সন্দেহ নেই, এর থেকে দেখা যাচ্ছে যথেষ্ট উত্তেজিত হয়ে বাংলায় 'আনো' প্রত্যয় সময়ে সময়ে এই পথে আপন কর্তব্য স্মরণ করে। অপেক্ষাকৃত নিরীহ শব্দও আছে, যেমন আগল থেকে আগলানো ; ফল থেকে ফলানো, হাত থেকে হাতানো, চমক থেকে চম্‌কানো। বিশেষণ শব্দ থেকে, যেমন উলটা থেকে উলটানো, খোঁড়া থেকে খোঁড়ানো, বাঁকা থেকে বাঁকানো, রাঙা থেকে রাঙানো।

বিদ্যাপতির পদে আছে 'সখি, কি পুছসি অনুভব মোয়'। যদি তার বদলে— 'কি জিজ্ঞাসা করই অনুভব মোয়' ব্যবহারটাই 'বাধ্যতামূলক' হত কবি তা হলে ওর উল্লেখই বন্ধ করে দিতেন।[1] অথচ প্রশ্ন করা অর্থে শুধানো শব্দটা শুধু যে কবিতায় দেখি তা নয় অনেক জায়গায় গ্রামের লোকের মুখেও ঐ কথার চল আছে। বাংলা ভাষার ইতিহাসে যাঁরা প্রবীণ তাঁদের আমি শুধাই, জিজ্ঞাসা করা শব্দটি বাংলা প্রাচীন সাহিত্যে বা লোকসাহিত্যে তাঁরা কোথাও পেয়েছেন কিনা।

ভাবপ্রকাশের কাজে শব্দের ব্যবহার সম্বন্ধে কাব্যের বোধশক্তি গদ্যের চেয়ে সূক্ষ্মতর এ কথা মানতে হবে। লক্ষিয়া, সন্ধিয়া, বন্দিনু, স্পর্শিল, হর্ষিল শব্দগুলো বাংলা কবিতায় অসংকোচে চালানো হয়েছে। এ সম্বন্ধে এমন নালিশ চলবে না যে ওগুলো কৃত্রিম, যেহেতু চলতি ভাষায় ওদের ব্যবহার নেই। আসল কথা, ওদের ব্যবহার থাকাই উচিত ছিল ; বাংলা কাব্যের মুখ দিয়ে বাংলা ভাষা এই ত্রুটি কবুল করেছে। ('কবুলেছে' প্রয়োগ বাংলায় চলে কিন্তু অনভ্যস্ত কলমে বেধে গেল!) 'দর্শন লাগি ক্ষুধিল আমার আঁখি' বা 'তিয়াষিল মোর প্রাণ'— কাব্যে শুনলে রসজ্ঞ পাঠক বাহবা দিতে পারে, কেননা, ক্ষুধাতৃষ্ণাবাচক ক্রিয়াপদ বাংলায় থাকা অত্যন্তই উচিত ছিল, তারই অভাব মোচনের সুখ পাওয়া গেল। কিন্তু গদ্য ব্যবহারে যদি বলি 'যতই বেলা যাচ্চে ততই ক্ষুধোচ্চি অথবা তেষ্টাচ্চি' তা হলে শ্রোতা কোনো অনিষ্ট যদি না করে অন্তত এটাকে প্রশংসনীয় বলবে না।

বিশেষ্য-জোড়া ক্রিয়াপদের জোড় মিলিয়ে এক করার কাজে মাইকেল ছিলেন দুঃসাহসিক। কবির অধিকারকে তিনি প্রশস্ত রেখেছেন, ভাষার সংকীর্ণ দেউড়ির পাহারা তিনি কেয়ার করেন নি। এ নিয়ে তখনকার ব্যঙ্গ রসিকেরা বিস্তর হেসেছিল। কিন্তু ঠেলা মেরে দরজা তিনি অনেকখানি ফাঁক ক'রে দিয়েছেন। 'অপেক্ষা করিতেছে' না ব'লে 'অপেক্ষিছে', 'প্রকাশ করিলাম' না ব'লে প্রকাশিলাম' বা 'উদ্‌ঘাটন করিল'-র জায়গায় 'উদ্‌ঘাটিল' বলতে কোনো কবি আজ প্রমাদ গণে না। কিন্তু গদ্যটা যেহেতু চলতি কথার বাহন ওর ডিমক্রাটিক বেড়া অল্প একটু ফাঁক করাও কঠিন। 'ত্রাস' শব্দটাকে 'ত্রাসিল' ক্রিয়ার রূপ দিতে কোনো কবির দ্বিধা নেই কিন্তু 'ভয়' শব্দটাকে 'ভয়িল' করতে ভয় পায় না এমন কবি আজও দেখি নি। তার কারণ ত্রাস শব্দটা চলতি ভাষার সামগ্রী নয়, এইজন্যে ওর সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ অসামাজিকতা ডিমক্রাসিও খাতির করে। কিন্তু 'ভয়' কথাটা সংস্কৃত হলেও প্রাকৃত বাংলা ওকে দখল করে বসেচে। এইজন্যে ভয় সম্বন্ধে যে প্রত্যয়টার ব্যবহার বাংলায় নেই তার দরজা বন্ধ। কোন্ এক সময়ে 'জিতিল' 'হাঁকিল' 'বাঁকিল' শব্দ চলে গেছে, 'ভয়িল' চলে নি— এ ছাড়া আর-কোনো কৈফিয়ত নেই।

---

[1] 'বাধ্যতামূলক' নামে যে একটা বর্বর শব্দ বাংলাভাষাকে অধিকার করতে উদ্যত, তার সম্বন্ধে কি সাবধান হওয়া উচিত হয় না ? কম্পল্‌সরি এডুকেশনে বাধ্যতা ব'লে বালাই যদি কোথাও থাকে সে তার মূলে নয় সে তার পিঠের দিকে বা কাঁধের উপর, অর্থাৎ ঐ এডুকেশনটা বাধ্যতাগ্রস্ত বা বাধ্যতাচালিত। যদি বলতে হয় 'পরীক্ষায় সংস্কৃত ভাষা কম্পল্‌সরি নয়, তা হলে কি বলা চলবে 'পরীক্ষায় সংস্কৃত ভাষা বাধ্যতামূলক নয়।' সৌভাগ্যক্রমে 'আবশ্যিক' শব্দটা উক্ত অর্থে কোথাও কোথাও চলতে আরম্ভ করেছে।

বাংলা ভাষা একান্ত আচারনিষ্ঠ। সংস্কৃত বা ইংরেজি ভাষায় প্রত্যয়গুলিতে নিয়মই প্রধান, ব্যতিক্রম অল্প। বাংলা ভাষার প্রত্যয়ে আচারই প্রধান ; নিয়ম ক্ষীণ।— ইংরেজিতে 'ঘামছি' বলতে am perspiring বলে থাকি, 'লিখছি' বলতে am penning বলা দোষের হয় না। বাংলায় ঘামছি বললে লোকে কর্ণপাত করে কিন্তু কল্‌মাচ্ছি বললে সইতে পারে না। প্রত্যয়ের দোহাই পাড়লে আচারের দোহাই পাড়বে। এই কারণেই নূতন ক্রিয়াপদ বাংলায় বানানো দুঃসাধ্য, ইংরেজিতে সহজ। ওই ভাষায় টেলিফোন কথাটার নূতন আমদানি, তবু হাতে হাতে ওটাকে ক্রিয়াপদে ফলিয়ে তুলতে কোনো মুশকিল ঘটে নি। ডানপিটে বাঙালি ছেলের মুখ দিয়েও বের হবে না 'টেলিফোনিয়েছি' বা 'সাইক্লিয়েছি'। বাংলা গদ্যের অটুট শাসন কালক্রমে কিছু কিছু হয়তো বা বেড়ি আল্‌গা করে আচার ডিঙোতে দেবে। বাংলায় কাব্য-সাহিত্যই পুরাতন, এইজন্যেই প্রকাশের তাগিদে কবিতায় ভাষার পথ অনেক বেশি প্রশস্ত হয়েছে। গদ্য-সাহিত্য নূতন, এইজন্যে শব্দসৃষ্টির কাজে তার আড়ষ্টতা যায় নি। তবু ক্রমশ তার নমনীয়তা বাড়বে আশা করি। এমন-কি, আজই যদি কোনো তরুণ লেখক লেখেন 'মাইকেল বাংলা-সাহিত্যে নূতন সম্পদের ভাণ্ডার উদ্‌ঘাটিলেন' তা নিয়ে প্রবীণরা খুব বেশি উত্তেজিত না হতে পারেন। ভাবীকালে আধুনিকেরা কতদূর পর্যন্ত স্পর্ধিয়ে উঠবেন বলতে পারি নে কিন্তু অন্তত এখনি তাঁরা 'জিজ্ঞাসা করলেন'-এর জায়গায় যদি 'জিজ্ঞাসিলেন' চালিয়ে দেন তা হলে বাংলা ভাষা কৃতজ্ঞ হবে।

'লজ্জা করবার কারণ নেই' এটা আমরা লিখে থাকি। 'লজ্জাবার কারণ নেই' লেখাটা নির্লজ্জতা। এমন স্থলে ওই জোড়া ক্রিয়াপদটা বর্জন করাই শ্রেয় মনে করি। লিখলেই হয় 'লজ্জার কারণ নেই'। 'প্রুফ সংশোধন করবার বেলায়' কথাটা সংশোধনীয়, বলা ভালো 'সংশোধনের বেলায়'। সহজ ব'লেই গদ্যে আমরা পুরো মন দিই নে, বাহুল্য শব্দ বিনা বাধায় যেখানে সেখানে ঢুকে পড়ে। আমার রচনায় তার ব্যতিক্রম আছে এমন অহংকার আমার পক্ষে অত্যুক্তি হবে।

ভাষার খেয়াল সম্বন্ধে একটা দৃষ্টান্ত আমার প্রায় মনে পড়ে। ভালো বিশেষণ ও বাসা ক্রিয়াপদ জুড়ে ভালোবাসা শব্দটার উৎপত্তি। কিন্তু ও-দুটো শব্দ একটা অখণ্ড ক্রিয়াপদরূপে দাঁড়িয়ে গেছে। পূর্বকালে ঐ 'বাসা' শব্দটা হৃদয়াবেগসূচক বিশেষ্যপদকে ক্রিয়াপদে মিলিয়ে নিত। যেমন ভয় বাসা, লাজ বাসা। এখন হওয়া করা পাওয়া ক্রিয়াপদ জুড়ে ঐ কাজ চালাই। 'বাসা' শব্দটা একমাত্র হৃদয়বোধসূচক ; হওয়া পাওয়া করা তা নয়। এই কারণে 'বাসা' কথাটা যদি ছুটি না নিয়ে আপন পূর্ব কাজে বহাল থাকত তা হলে ভাবপ্রকাশে জোর লাগাত। 'এ কথায় তার মন ধিক্কার বাস্‌ল' প্রয়োগটা আমার মতে 'ধিক্কার পেল'র চেয়ে জোরালো।

ভাদ্র ১৩৪২

শব্দতত্ত্বের একটি তর্ক

শ্রীযুক্ত বিজনবিহারী ভট্টাচার্য শব্দতত্ত্বঘটিত তাঁর এক প্রবন্ধে 'গান গা'ব' বাক্যের 'গা'ব' শব্দটিকে অশুদ্ধ প্রয়োগের দৃষ্টান্তস্বরূপে উল্লেখ করেছেন। এই দৃষ্টান্তটি আমারই কোনো রচনা থেকে উদ্‌ধৃত।

স্বীকার করি, এরূপ প্রয়োগ আমি করে থাকি। এটা আমার ব্যক্তিগত বিশেষত্ব কি না তারই সন্ধান করতে গিয়ে আমি মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত বিধুশেখরকে জিজ্ঞাসা করলেম যে যদি বলি, 'আজ সভায় আমি গান গা'ব না গা'বেন বসন্তবাবু, এখানে গান গা'বার আরো অনেক লোক আছে' তাতে কোনো দোষ হবে কি না— প্রশ্ন শুনে তিনি বিস্মিত হলেন, বললেন তাঁর কানে কোথাও ত্রুটি ঠেকছে না। বাংলা শব্দকোষকার পণ্ডিত হরিচরণকেও অনুরূপ প্রশ্ন করাতে তিনি বললেন তিনি স্বয়ং এই রকমই প্রয়োগ ক'রে থাকেন।

বিজনবিহারীর সঙ্গেও আলোচনা করেছি। তিনি বাংলা শব্দতত্ত্বের একটি নিয়মের উল্লেখ করে বললেন, বাংলা গাওয়া শব্দটার মূলধাতু 'গাহ্'— যে ইকার এই হ্ ধ্বনির সঙ্গে মিলিত, তার বৈধব্য ঘটলেও বিনাশ হয় না, হ্ লোপ হলেও ই টিকে থাকে। অতএব গাওয়া থেকে গাইব হয়, গা'ব হ'তে পারে না, সহমরণের প্রথা এ স্থলে প্রচলিত নেই।

আমাকে চিন্তা করতে হল। শব্দের ব্যবহারটা কী, আগে স্থির হলে তবে তার নিয়ম পরে স্থির হতে পারে। বলা বাহুল্য, বাংলার যে ভূভাগের ভাষা প্রাকৃত বাংলা বলে আজকালকার সাহিত্যে চলেছে সেইখানেই অনুসন্ধান করতে হবে।

এখানে হ্ ধ্বনিযুক্ত ক্রিয়াপদের তালিকা দেওয়া যাক।—

কহ্, গাহ্, চাহ্, নাহ্, সহ্, বহ্, বাহ্, রহ্, দোহ্।

দেখা যায় অধিকাংশ স্থলেই এই-সকল ক্রিয়াপদে ভবিষ্যৎ কারকে বিকল্পে ই থাকে এবং লোপ পায়।

'কথা কইবে'ও হয় 'কথা ক'বে'ও, যথা, 'গেলে কথা ক'বে না সে নব ভূপতি।'

ভিক্ষে চা'ব না বললেও হয়, ভিক্ষে চাইব বললেও হয়। 'তোমার কাছে শান্তি চা'ব না' গানের পদটি আমারই রচনা বটে, কিন্তু কারো কানে এ পর্যন্ত খটকা লাগে নি।

'এ অপমান স'বে না' কিংবা 'দুঃখের দিন র'বে না' বললে কেউ বিদেশী বলে সন্দেহ করে না।

যদি বলি 'গঙ্গায় না'বে, না তোলা জলে' তা হলে ভাষার দোষ ধরে শ্রোতা আপত্তি করবে না।

কেবল বহা ও বাহা ক্রিয়াপদে 'ব'বে' 'বা'বে' ব্যবহার শোনা যায় না তার কারণ পাশাপাশি দুটো 'ব'-কে ওষ্ঠ পরিত্যাগ করতে চায়।

হ্ ধ্বনি বর্জিত এই জাতীয় ক্রিয়াপদে প্রাকৃত প্রয়োগে নিঃসংশয়ে ই স্বর লুপ্ত হয়। কথ্য ভাষায় কখনোই বলি নে খাইব, যাইব, পাইব।

'দোহা' ক্রিয়াপদের আরম্ভে ওকার আছে, তারই জোরে ই থেকে যায়— বলি 'গোরু দুইবে'। কিন্তু একেবারেই ই লোপ হ'তে পারে না ব'লে আশঙ্কা করি নে। 'রুগ্‌ণ গোরু কখনোই দোবে না' বাক্যটা অকথ্য নয়।

'পোহা' অর্থাৎ প্রভাত হওয়া ক্রিয়াপদের ধাতুরূপ 'পোহা'— পোহাইবে বা পোহাইল শব্দে লিখিত ভাষায় ই চলে কিন্তু কথিত ভাষায় চলে না। সন্দেহ হচ্ছে 'কখন রাত পুইবে' বলা হয়ে থাকে। অর্থাৎ 'পোয়াবে' এবং 'পুইবে' দুইই হয়।

শ্রাবণ ১৩৪৩

বিবিধ

১

শ্রীযুক্ত বীরেশ্বর পাঁড়ে 'জাতীয় সাহিত্য' প্রবন্ধে আধুনিক ভারতবর্ষীয় ভাষাগুলিকে সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়মমতো চলিতে উত্তেজনা করিয়াছেন! তিনি বলেন, নচেৎ আদর্শের ঐক্য থাকে না। তিনি বলেন, "কেন চট্টগ্রামবাসী নবদ্বীপবাসীর ব্যবহৃত অসংস্কৃত শব্দ ব্যবহার করিতে বাধ্য হইবে।" আমরা বলি, কেহ তো জবরদস্তি করিয়া বাধ্য করিতেছে না, স্বভাবের নিয়মে চট্টগ্রামবাসী আপনি বাধ্য হইতেছে। নবীনচন্দ্র সেন মহাশয় তাঁহার কাব্যে চট্টগ্রামের প্রাদেশিক প্রয়োগ ব্যবহার না করিয়া নবদ্বীপের প্রাদেশিক প্রয়োগ ব্যবহার করিয়াছেন। তাহার বিপরীত করিবার স্বাধীনতা তাঁহার ছিল। কিন্তু নিশ্চয় কাব্যের ক্ষতি আশঙ্কা করিয়া সেই স্বাধীনতাসুখ ভোগ করিতে ইচ্ছা করেন নাই। সকল দেশেই প্রাদেশিক প্রয়োগের বৈচিত্র্য আছে, তথাপি এক-একটি বিশেষ প্রদেশ ভাষাসম্বন্ধে অন্যান্য প্রদেশের উপর কর্তৃত্ব করিয়া থাকে। ইংরেজি ভাষা লাটিন নিয়মে আপনার বিশুদ্ধি রক্ষা করে না। যদি করিত, তবে এ ভাষা এত প্রবল, এত বিচিত্র, এত মহৎ হইত না। ভাষা সোনা-রুপার মতো জড়পদার্থ নহে যে, তাহাকে ছাঁচে ঢালিব। তাহা সজীব— তাহা, নিজের অনির্বচনীয় জীবনীশক্তির নিয়মে গ্রহণ ও বর্জন করিতে থাকে। সমাজে শাস্ত্র অপেক্ষা লোকাচারকে প্রাধান্য দেয়। লোকাচারের অসুবিধা অনেক, তাহাতে এক দেশের আচারকে অন্য দেশের আচার হইতে তফাত করিয়া দেয় ; তা হউক, তবু লোকাচারকে ঠেকাইবে কে। লোককে না মারিয়া ফেলিলে লোকাচারের নিত্য পরিবর্তন ও বৈচিত্র্য কেহ দূর করিতে পারে না। কৃত্রিম গাছের সব শাখাই এক মাপের করা যায়, সজীব গাছের করা যায় না। ভাষারও লোকাচার শাস্ত্রের অপেক্ষা বড়ো। সেইজন্যই আমরা 'ক্ষান্ত' দেওয়া বলিতে লজ্জা পাই না। সেইজন্যই ব্যাকরণ যেখানে 'আবশ্যকতা' ব্যবহার করিতে বলে, আমরা সেখানে 'আবশ্যক' ব্যবহার করি। ইহাতে সংস্কৃত ব্যাকরণ যদি চোখ রাঙাইয়া আসে, লোকাচারের হুকুম দেখাইয়া আমরা তাহাকে উপেক্ষা করিতে পারি।[১]

বৈশাখ ১৩০৮

২

একটা ছোটো কথা বলিয়া লই। 'অনুবাদিত' কথাটা বাংলায় চলিয়া গেছে— আজকাল পণ্ডিতেরা অনূদিত লিখিতে শুরু করিয়াছেন। ভয় হয় পাছে তাঁহারা সৃজন কথার জায়গায় 'সর্জন' চালাইয়া বসেন।[২]

বৈশাখ ১৩০৮

---

[১] মাসিক সাহিত্য সমালোচনা, বঙ্গদর্শন, বৈশাখ ১৩০৮, পৃ ৬৫

[২] মাসিক সাহিত্য সমালোচনা, বঙ্গদর্শন, বৈশাখ ১৩০৮, পৃ ৬১

৩

আপনার গ্রন্থের নামটি[১] যত ভয়ানক বস্তুটি তত ভয়ংকর নয়। কিন্তু তবুও বোপদেব লোহারাম যখন ভ্রূকুটি করেন তখন হৃৎকম্প হয় না বাংলালেখকদের মধ্যে এমন কয়জন আছে, তবে কি না প্রবাদ আছে দুই কানকাটা গ্রামের মাঝখান দিয়াই অসংকোচে চলে। অনেক লিখিয়াছি সুতরাং আমার অপরাধের অন্ত নাই এখন আর লজ্জা করিয়া কী হইবে।

বাংলা ভাষার মুশকিল হইয়াছে এই যে ইহাকে একভাষা বলিয়া গণ্য করিলে চলে না। বাংলা শিখিতে হইলে সংস্কৃতও শিখিতে হইবে। সেও সকলে পারিয়া উঠে না— মাতৃভাষা বলিয়া নির্ভয়ে আবদার করিতে যায়, শেষকালে মাতামহীর কোপে পড়িয়া বিপন্ন হয়। মাতা ও মাতামহীর চাল স্বতন্ত্র, এক ব্যাকরণে তাঁহাদের কুলায় না। এ অবস্থায় হতভাগ্য বাঙালির চলে কি করিয়া, পরম পণ্ডিত না হইলে সে কি নিজের ভাষা ব্যবহার করিতেও পারিবে না।

আর-একদিকে দেখুন। বাঙালির ছেলেকে ছেলেবেলা হইতে ইংরেজি শিখিতেই হইবে। অল্প বয়স হইতে যে পরিমাণ বাংলার চর্চা করিলে সে অনায়াসে বাংলায় আপনার ভাব প্রকাশ করিতে পারিত সে তাহার ঘটিয়া উঠে না। ইহাদের যদি বলা যায় তোমরা বাংলা লিখিতে পারিবে না তবে কয়জন লোকে বাংলা লিখিবে।

কারণ, ইহাও সত্য, এখন আমাদের দেশে ইংরেজি শিক্ষা ছাড়া অন্য শিক্ষা নাই। সেই শিক্ষিত ব্যক্তির পনেরো-আনা যদি বাংলা লিখিতে না পায় তবে সম্ভবত ভাষা অত্যন্ত বিশুদ্ধ হইবে কিন্তু সে ভাষার প্রয়োজন থাকিবে না।

আধুনিক বাংলা সাহিত্যটাকে গড়িয়া তুলিতেছেন যাঁহারা, তাঁহারা ইংরেজিনবিশ। তাঁহাদের পেটে কথা জমিয়াছে বলিয়াই তাঁহারা লিখিয়াছেন। যাঁহারা সংস্কৃত ব্যাকরণে পণ্ডিত তাঁহারা বাংলা ভাষার প্রতি মন দেন নাই সে তো জানা কথা। এখনো বাংলা যাঁহারা লেখেন তাঁহাদের অতি অল্প সংখ্যাই সংস্কৃত ভালো করিয়া জানেন। যাহারা ইংরাজি জানেন না কেবল মাত্র সংস্কৃত জানেন তাঁহারা কেহ কেহ বাংলা লেখেন, তাহার ভাষা বিশুদ্ধ কিন্তু বাজারে তাহা চলে না। অনেক লেখক লিখিতে লিখিতে ক্রমে সংস্কৃত শিখিতে থাকেন— কালীপ্রসন্ন ঘোষ মহাশয় যখন প্রথম লিখিতে আরম্ভ করেন তখন তিনি সংস্কৃতে পাকা ছিলেন না, তাঁহার লেখায় তাহার প্রমাণ আছে কাজেই সাহিত্যে এমন অনেক জিনিস জমিয়া উঠিতে থাকে— ব্যাকরণের সূত্র যাহার মধ্যে প্রবেশ করিবার পথ পায় না।

বাংলা লেখকের পুরস্কার যে খুব বেশি তাহা নয়, ইহার উপরে তাহার লেখনী চালনার পথ যদি অত্যন্ত দুর্গম করা হয় তবে সীতা পাইবার আসা পরিত্যাগ করিয়াও লোককে ধনুক ভাঙিতে ডাকা হয়। তাই বলিয়াই যে ভাষার উপরে যে যেমন খুশি দৌরাত্ম্য করিবে তাহাও সহ্য করা যায় না। অতএব একটা রফা নিষ্পত্তির পথ ধরিতেই হয়। কিন্তু সে পথটা কেহ বাঁধিয়া দিতে পারে না— নদীর মতো ভাষা আপনিই স্বল্পতম বাধার পথ হাতড়াইয়া চলে। আপনি সে কথাও বলিয়াছেন। আপনার বই পড়িয়াই আমার মনে বিশেষ করিয়া এই চিন্তার উদয় হইল— বাংলা সাহিত্যের খেয়া পার হইতে হইলে তিন ঘাটে তাহার মাশুল দিতে হয়, বাংলা ইংরেজি এবং সংস্কৃত। বাংলা ও ইংরেজির পারানির কড়ি কোনো প্রকারে সংগ্রহ হয়, সংস্কৃতের বেলায় ঠেকে, কেননা তাহার জন্য দূরে ঘোরাঘুরি করিতে হয়— সকলের সামর্থ্যে ও সময়ে কুলায় না—

---

[১] ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত 'ব্যাকরণ বিভীষিকা' গ্রন্থ

এইজন্য সংস্কৃতের কৃতঘাটায় যাহারা ফাঁকি দেয় তাহাদের প্রতি দণ্ডবিধি কঠোর করিলে খেয়া একেবারে বন্ধ করিতে হয়। এটা আমি নিজের প্রাণের ভয়ে বলিলাম বটে কিন্তু সাহিত্যের প্রতি মমতা রাখি বলিয়াও বলিতে হইল। চিঠিখানা বড়ো হইয়া গেল সুতরাং ইহার মধ্যে পাণিনি-পীড়ন নিশ্চয়ই ঘটিয়াছে— আর অপরাধ বাড়াইবার স্থান নাই অতএব যদি ক্ষমা করেন, তবে বিলাতি কায়দায় আপনার পাণি-নিপীড়ন করিয়া বিদায় গ্রহণ করি।[1]

২০ শ্রাবণ ১৩১৮

৪

...আমার চিঠিতে ইংরেজিটাকেও যে বাংলার সঙ্গে জড়াইয়াছি তাহা ভাষা বা ব্যাকরণের দিক হইতে নহে। আমাদের ভাষায় গদ্য সাহিত্যের কোনো একটা পুরাতন আদর্শ নাই। কাদম্বরী বাসবদত্তার আদর্শ আমাদের কাজে লাগে না। রামমোহন রায় হইতে আরম্ভ করিয়া আজ পর্যন্ত যে-কেহ বাংলা গদ্য সাহিত্য গড়িয়া তুলিবার কাজে লাগিয়াছেন সকলেই ইংরেজিশিক্ষিত। ইংরেজি যাঁহারা একেবারেই জানেন না তাঁহারা কেহ কেহ বাংলা ভাষায় সংস্কৃত দর্শন পুরাণ প্রভৃতি আলোচনা করিয়াছেন অন্য দিকে তাঁহাদের কলম খেলে নাই। নৈনিতাল আলু বাংলাদেশের ক্ষেতেও প্রচুর উৎপন্ন হয় কিন্তু প্রতি বৎসরে তাহার বীজ নৈনিতাল হইতে আনাইতে হয়— হয়তো ক্রমে একদিন এখানকার ক্ষেত্র হইতে উৎপন্ন বীজে কাজ চলিবে। দেখা যাইতেছে ইংরেজির সম্বন্ধেও আমাদের সেই দশা। ইংরেজি সাহিত্যের বীজ বাংলা সাহিত্যে বেশ প্রচুর পরিমাণে ফলিতেছে— তাহাতে আমাদের এ দেশী মাছের ঝোল প্রভৃতিও দিব্য রাঁধা চলিতেছে কিন্তু বীজের আমদানি আজও সেইখান হইতেই হয়। ক্রমে তাহার তেমন প্রয়োজন হইবে না বলিয়া মনে হয়। কিন্তু আজ পর্যন্ত দেখা যাইতেছে যাঁহারা বাংলায় ভালো লেখেন তাঁহারা ইংরেজি জানেন। এই ইংরেজি জানার সঙ্গে বাংলা লেখার যে সম্বন্ধ দেখা যাইতেছে সেটাকে কাকতালীয় ন্যায়ের দৃষ্টান্ত বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া যায় না। বরঞ্চ দেখা গিয়াছে সংস্কৃত জানা নাই বা অল্পই জানা আছে এমন লোক বাংলা সাহিত্যে নাম করিয়াছেন কিন্তু ইংরেজি জানা নাই এমন লোকের নাম তো মনে পড়ে না। সেইজন্য বলিতেছি বাংলা সাহিত্যে যিনি প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে ইচ্ছা করেন ইংরেজি শিক্ষার পাথেয় সংগ্রহ করিতে না পারিলে তিনি অধিকদূর অগ্রসর হইতে পারিবেন না— ঘাটতলা ছাড়াইয়া আরো কিছুদিন যাইতে পারেন কিন্তু খুব বেশি দূর নহে। আমার এই কথাটা শুনিতে কটু এবং বলিতেও যে রসনা রসসিক্ত হইয়া উঠে তাহা নহে কিন্তু তবু সত্য।

ভাব এবং ছাঁদ এ দুটো আমরা অনেকটা ইংরেজি সাহিত্য হইতে সংগ্রহ করি— সকল ক্ষেত্রে চুরি করি বা নকল করি তাহা নহে— ইংরেজি শিক্ষার সাহায্য না পাইলে সে ভাব সে ছাঁদ আমাদের সাহিত্যের মন হইতে উৎপন্ন হইত না— আমাদের সাহিত্যের ধরন ধারণ ভাবগতিক অন্য প্রকার হইত। কিন্তু যে কারণেই হউক, যে উপায়েই হউক এখন যে ছাঁদটা দাঁড়াইয়া গিয়াছে তাহাকে একেবারে ঠেলিয়া দেওয়া চলিবে না। ইচ্ছা করিলেও কেহ পারিবে না। মৃত্যুঞ্জয় শর্মা

---

[1] ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়কে লিখিত পত্র

প্রভৃতিরা একদিন বাংলা গদ্য সাহিত্যকে সংস্কৃত ভিতের উপর গড়িতে শুরু করিয়াছিলেন। আজ তাহার ধ্বংসাবশেষও খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। তাহার পরে ইংরেজিনবিশ বঙ্কিমচন্দ্রের দল যখন কোমর বাঁধিয়া লাগিলেন তখন তাঁহাদের ষত্ব ণত্ব লইয়া সংস্কৃত কেল্লা হইতে অনেক গোলাগুলি চলিয়াছিল কিন্তু তাঁহাদের কীর্তি আজও দুষ্ট ব্যাকরণের কলঙ্ক গায়ে মাখিয়াও উজ্জ্বল হইয়া বিরাজ করিতেছে। আজ কলঙ্ক-ভঞ্জনের চেষ্টা হইতেছে। ঘটে যে ছিদ্র আছে সে কথা কেহ অস্বীকার করিতেছে না কিন্তু তবু সে ঘট পূর্ণ হইয়া আছে। কলঙ্ক সত্ত্বেও গৌরবহানি হইতেছে না। জল তোলা চলিতেছে বটে কিন্তু কোডাক্ ক্যামেরার দ্বারা ধরা পড়িয়াছে ছিদ্র আছে ; সেটা একেবারে সপ্রমাণ হইয়া গেছে, জল পড়ুক না পড়ুক মাথা হেঁট করিতেই হইবে— কিন্তু আমি বলিতেছি ছিদ্র সারিবে না, তবু কলঙ্ক মোচন হইবে। সাহিত্য লীলার ভিতরে যিনি আছেন তিনি সমস্তই আপনার গূঢ় শক্তিতে সারিয়া লইবেন— ব্যাকরণের সূত্র ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইলে আমরা যতই ভয় করি তিনি ততই হাসিতে থাকেন। সকল দেশেই তিনি এইরূপ ফুটাফাটা লইয়াই চালাইয়া আসিয়াছেন— ক্ষুদ্র যাহারা তাহারাই নিখুঁতের কারবার করে, তিনি খুঁতকে ভয় করেন না ভাষায় ভাষায় সাহিত্যে সাহিত্যে তাহার প্রমাণ আছে।[১]

২৫ শ্রাবণ ১৩১৮

৫

ব্যাকরণিকা বাংলা শেখানোর পক্ষে উপযোগী হয়েছে। খাঁটি বাংলা ব্যাকরণের প্রয়োজন আছে।

এককালে সমাসদর্পণ ও লোহারামের ব্যাকরণ আমাদের পড়তে হয়েছে, সেটাতে সংস্কৃত শিক্ষার ভূমিকা হয়েছিল। তাতে খাঁটি বাংলা ভাষাকে যথোচিত স্বীকার করা হয় নি। আমার নিজের মত এই যে, পারিভাষিক ব্যাকরণের অনেক অংশই, বাংলা সাহিত্য পরিচয় অগ্রসর হলে, তার পরে আলোচ্য। ভাষাটা মোটামুটি আয়ত্ত হলে তার পরে বিশ্লেষণের দ্বারা পরিচয় পাকা করবার সময়। বস্তুত বাংলার যে অংশটা সংস্কৃতের অনুবর্তী, যেমন সন্ধি তদ্ধিতপ্রত্যয় সমাস, সেইগুলোই গোড়া থেকে জানা চাই। বাংলায় তৎসম শব্দের উপযুক্ত ব্যবহার কিছুপরিমাণ সংস্কৃত ব্যাকরণের সাহায্যে সম্ভবপর হয়। যে বাংলা শিশুকাল থেকে আমাদের অভ্যস্ত তার ব্যাকরণ, ভাষা-পরিচয়ের জন্য, আবশ্যক নয়, ভাষাতত্ত্ব জানবার জন্যেই সে উপযোগী। কিন্তু শিশুদের জন্যে, বাংলা ক্লাসে বাংলা ব্যাকরণ পড়ানোর বিধি যদি প্রবর্তিত হয়ে থাকে তা হলে এই ব্যাকরণ যথোপযুক্ত হয়েছে বলে বিশ্বাস করি।

সংস্কৃত ভাষার পরিভাষা বাংলায় সর্বত্র খাটে কি না সন্দেহ করি।[২]

২১ নভেম্বর ১৯৩৩

---

[১] ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়কে লিখিত পত্র

[২] জগৎমোহন সেনকে লিখিত পত্র

বাংলা বানান

আমাদের এই যে দেশকে মুসলমানেরা বাঙ্গালা বলিতেন তাহার নামটি বর্তমানে আমরা কিরূপ বানান করিয়া লিখিব শ্রীযুক্ত বীরেশ্বর সেন মহাশয় [১৩২২] চৈত্রের প্রবাসীতে তার আলোচনা করিয়াছেন।

আমি মনে করি এর জবাবদিহি আমার। কেননা, আমিই প্রথমে বাংলা এই বানান ব্যবহার করিয়াছিলাম।

আমার কোনো কোনো পদ্যরচনার যুক্ত অক্ষরকে যখন দুই মাত্রা হিসাবে গণনা করিতে আরম্ভ করিয়াছিলাম তখনই প্রথম বানান সম্বন্ধে আমাকে সতর্ক হইতে হইয়াছিল। 'ঙ্গ' অক্ষরটি যুক্ত অক্ষর—উহার পুরা আওয়াজটি আদায় করিতে হইলে এক মাত্রা ছড়াইয়া যায়। সেটা আমার ছন্দের পক্ষে যদি আবশ্যক হয় তো ভালোই, যদি না হয় তবে তাকে প্রশ্রয় দেওয়া চলে না।

এক-একটি অক্ষর প্রধানত এক-একটি আওয়াজের পরিচয়, শব্দতত্ত্বের নহে। সেটা বিশেষ করিয়া অনুভব করা যায় ছন্দরচনায়। শব্দতত্ত্ব অনুসারে লিখিব এক, আর ব্যবহার অনুসারে উচ্চারণ করিব আর, এটা ছন্দ পড়িবার পক্ষে বড়ো অসুবিধা। যেখানে যুক্ত অক্ষরেই ছন্দের আকাঙ্ক্ষা সেখানে যুক্ত অক্ষর লিখিলে পড়িবার সময় পাঠকের কোনো সংশয় থাকে না। যদি লেখা যায়—

বাঙ্গলা দেশে জন্মেছ বলে
বাঙ্গালী নহ তুমি ;
সন্তান হইতে সাধনা করিলে
লভিবে জন্মভূমি—

তবে আমি পাঠকের নিকট 'ঙ্গ' যুক্ত-অক্ষরের পুরা আওয়াজ দাবি করিব। অর্থাৎ এখানে মাত্রাগণনায় বাঙ্গলা শব্দ হইতে চার মাত্রার হিসাব চাই। কিন্তু যখন লিখিব, 'বাংলার মাটি বাংলার জল' তখন উক্ত বানানের দ্বারা কবির এই প্রার্থনা প্রকাশ পায় যে 'বাংলা' শব্দের উপর পাঠক যেন তিন মাত্রার অতিরিক্ত নিশ্বাস খরচ না করেন। 'বাঙ্গলার মাটি' যথারীতি পড়িলে এইখানে ছন্দ মাটি হয়।

ঝিঙা না ভাজিয়া ভাজিলে ঝিঙ্গা
ছন্দ তখনি ফুঁকিবে শিঙ্গা।

এই গেল ছন্দব্যবসায়ী কবির কৈফিয়ত।

কিন্তু শুধু কেবল কাব্যক্ষেত্রে ডিক্রি পাইয়াই আমি সন্তুষ্ট থাকিব না, আমার আরো কিছু বলিবার আছে। বীরেশ্বরবাবুর মতে মূল শব্দের সহিত তদ্ভব শব্দের বানানের সাদৃশ্য থাকা উচিত। যদি তাঁর কথা মানিতে হয় তবে বাংলার বানান-মহালে হুলস্থূল পড়িয়া যায়। এই আইন অনুসারে কিরূপ পরিবর্তন হয় তার গোটাকতক নমুনা দেখা যাক। শাঁখ—শাঙ্খ্। আঁক—আঙ্ক্। চাঁদ—চান্দ্। রাখ—রাক্ষ। আমি—আহ্মি।

হয়তো বীরেশ্বরবাবু বলিলেন, হাঁ এইরূপ হওয়াই উচিত। তাঁর পক্ষে ভালো নজিরও আছে। ইংরেজিতে বানানে-উচ্চারণে ভাসুর-ভাদ্রবৌ সম্পর্ক, পরস্পরের মাঝখানে প্রাচীন শব্দতত্ত্বের লম্বা ঘোমটা। ইংরেজিতে লিখি ট্রেআসূরে (treasure) পড়ি ট্রেজার ; লিখি ক্নৌলেডগে (knowledge) পড়ি নলেজ্ ; লিখি রিঘ্টেওউস (righteous) পড়ি রাইটিয়স। অতএব যদি লিখি

পক্ষী অথচ পড়ি পাখি, লিখি বিদ্যুল্লি পড়ি বিজুলি, লিখি শ্রবণিয়াছিলাম পড়ি শুনিয়াছিলাম, বিলাতিমতে তাহাতে দোষ হয় না।

কিন্তু আমাদের দেশের নজির উল্‌টা। প্রাকৃত ও পালি, বানানের দ্বারা নির্ভয়ে নিজের শব্দেরই পরিচয় দিয়াছে, পূর্বপুরুষের শব্দতত্ত্বের নহে। কেননা, বানানটা ব্যবহারের জিনিস, শব্দতত্ত্বের নয়। পুরাতত্ত্বের বোঝা মিউজিয়ম বহন করিতে পারে, হাটে বাজারে তাহাকে যথাসাধ্য বর্জন করিতে হয়। এইজন্যই লিখিবার বেলায় আমরা 'নুন' লিখি, পণ্ডিতই জানেন উহার মূল শব্দে একটা মূর্ধন্য ণ ছিল। এইজন্যই লিখিবার বেলা গাম্ভলা না লিখিয়া আমরা গাম্‌লা লিখি, পণ্ডিতই অনুমান করেন উহার মূল শব্দ ছিল কুম্ভ। আমরা লিখিয়া থাকি আঁতুর ঘর, তাহাতে আমাদের কাজের কোনো ক্ষতি হয় না— পাণ্ডিত্যের দোহাই মানিয়া যদি অন্ত্র-ক্রট্ ঘর বানান করিয়া আঁতুর ঘর পড়িতে হইত তবে যে-শব্দ প্রাচীনের গর্ভ হইতে বাহির হইয়াছে তাহাকে পুনশ্চ গর্ভবেদনা সহিতে হইত।

প্রাচীন বাঙালি, বানান সম্বন্ধে নির্ভীক ছিলেন, পুরানো বাংলা পুঁথি দেখিলেই তাহা বুঝা যায়। আমরা হঠাৎ ভাষার উপর পুরাতত্ত্বের শাসন চালাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছি। এই শাসন ম্যালেরিয়া প্রভৃতি অন্যান্য নানা উপসর্গের মতো চিরদিনের মতো বাঙালির ছেলের আয়ুক্ষয় করিতে থাকিবে। কোনো অভ্যাসকে একবার পুরানো হইতে দিলেই তাহা স্বভাবের চেয়েও প্রবল হইয়া ওঠে। অতএব এখনো সময় থাকিতে সাবধান হওয়া উচিত। সংস্কৃত শব্দ বাংলায় অনেক আছে। এবং চিরদিন থাকিবেই— সেখানে সংস্কৃতের রূপ ও প্রকৃতি আমাদের মানিতেই হইবে— কিন্তু যেখানে বাংলা শব্দ বাংলাই সেখানেও সংস্কৃতের শাসন যদি টানিয়া আনি, তবে রাস্তায় যে পুলিস আছে ঘরের ব্যবস্থার জন্যও তাহার গুঁতা ডাকিয়া আনার মতো হয়। সংস্কৃতে কর্ণ লিখিবার বেলা মূর্ধন্য ণ ব্যবহার করিতে আমরা বাধ্য, কিন্তু কান লিখিবার বেলাও যদি সংস্কৃত অভিধানের কানমলা খাইতে হয় তবে এ পীড়ন সহিবে কেন?

যে সময়ে ফোর্ট উইলিয়াম হইতে বাংলা দেশ শাসন শুরু হইয়াছিল সেই সময়ে বাংলা ভাষার শাসন সেই কেল্লা হইতেই আরম্ভ হয়। তখন পণ্ডিতে-ফৌজে মিলিয়া বাংলার বানান বাঁধিয়া দিয়াছিল। আমাদের ভাষায় সেই ফোর্ট উইলিয়ামের বিভীষিকা এখনো তাই গৌড়সন্তানের চোখের জলকে অক্ষয় করিয়া রাখিয়াছে। সেইজন্য যেখানে আমাদের পিতামহেরা 'সোনা' লিখিয়া সুখী ছিলেন সেখানে আমরা সোণা লেখাইবার জন্য বেত ধরিয়া বসিয়া আছি।

কিন্তু ফোর্ট উইলিয়ামের বর্তমান দণ্ডধারীদের জিজ্ঞাসা করি— সংস্কৃত নিয়মমতেও কি সোণা কাণ বিশুদ্ধ বানান? বর্ণন হইতে যদি বানান হয়, তবে কর্ণ হইতে কি কাণ হইবে? রেফ লোপ হইলেও কি মূর্ধন্য ণ তার সঙিন খাড়া করিয়া থাকিতে পারে?

বৈশাখ ১৩২৩

বাংলার বানান-সমস্যা

বিদেশী রাজার হুকুমে পণ্ডিতেরা মিলে পুঁথিতে আধুনিক গদ্য-বাংলা পাকা করে গড়েছে। অথচ গদ্যভাষা যে-সর্বসাধারণের ভাষা, তার মধ্যে অপণ্ডিতের ভাগই বেশি। পণ্ডিতেরা বাংলা ভাষাকে সংস্কৃত ভাষার ছাঁচে ঢালাই করলেন সেটা হল অত্যন্ত আড়ষ্ট। বিশুদ্ধভাবে সমস্ত তার বাঁধাবাঁধি— সেই বাঁধন তার নিজের নিয়মসংগত নয়— তার ষত্ব ণত্ব সমস্তই সংস্কৃত ভাষার

ফরমাসে। সে হঠাৎ বাবুর মতো প্রাণপণে চেষ্টা করে নিজেকে বনেদী বংশের বলে প্রমাণ করতে। যারা এই কাজ করে তারা অনেক সময়েই প্রহসন অভিনয় করতে বাধ্য হয়। কর্নেলে গবর্নরে পণ্ডিতি করে মূর্ধন্য ণ লাগায়, সোনা পান চুনে তো কথাই নেই।

এমন সময়ে সাহিত্যে সর্বসাধারণের অকৃত্রিম গদ্য দেখা দিল। তার শব্দ প্রভৃতির মধ্যে যে অংশ সংস্কৃত সে অংশে সংস্কৃত অভিধান-ব্যাকরণের প্রভুত্ব মেনে নিতে হয়েছে— বাকি সমস্তটা তার প্রাকৃত, সেখানে বানান প্রভৃতি সম্বন্ধে পাকা নিয়ম গড়ে ওঠে নি। হতে হতে ক্রমে সেটা গড়ে উঠবে সন্দেহ নেই। হিন্দি ভাষায় গড়ে উঠেছে— কেননা, এখানে পণ্ডিতির উৎপাত ঘটে নি, সেইজন্যেই হিন্দি পুঁথিতে 'শুনি' অনায়াসেই 'সুনি' মূর্তি ধরে লজ্জিত হয় নি। কিন্তু শুনছি বাংলার দেখাদেখি সম্প্রতি সেখানেও লজ্জা দেখা দিতে আরম্ভ করেছে, ওরাও জ্ঞানবৃক্ষের ফল খেয়ে বসেছে আর কি! প্রাচীনকালে যে পণ্ডিতেরা প্রাকৃত ভাষা লিপিবদ্ধ করেছিলেন ভাষার প্রাকৃতত্ব সম্বন্ধে বাঙালিদের মতো তাঁদের এমন লজ্জাবোধ ছিল না।

এখন এ সম্বন্ধে বাংলায় প্রাকৃতিক নির্বাচনের নিয়ম চলছে— নানা লেখকে মিলে ঠেলাঠেলি করতে করতে একটা কিছু দাঁড়িয়ে যাবে, আশা করা যায়। অন্তত এ কাজটা আমাদের নয়, এ সুনীতিকুমারের দলের। বাংলা ভাষাকে বাংলা ভাষা বলে স্বীকার করে তার স্বভাবসংগত নিয়মগুলি তাঁরাই উদ্‌ভাবন করে দিন। যেহেতু সম্প্রতি বাংলার বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা ভাষাকে যথোচিত সম্মানের সঙ্গে স্বীকার করে নেবার প্রস্তাব হয়েছে সেই কারণে টেক্‌স্টবুক প্রভৃতির যোগে বাংলার বানান ও শব্দ প্রয়োগরীতির সংগত নিয়ম স্থির করে দেবার সময় হয়েছে। এখন স্থির করে দিলে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রভাবে সাধারণের মধ্যে সেটা চলে যাবে। নইলে কেন্দ্রস্থলে কোনো শাসন না থাকলে ব্যক্তিবিশেষের যথেচ্ছাচারকে কেউ সংযত করতে পারবে না। আজকাল অনেকেই লেখেন 'ভেতর' 'ওপর' 'চিবুতে' 'ঘুমুতে', আমি লিখি নে, কিন্তু কার বিধানমতে চলতে হবে। কেউ কেউ বলেন প্রাকৃত বাংলা ব্যবহারে যখন এত উচ্ছৃঙ্খলতা তখন ওটাকে সম্পূর্ণ বাদ দিয়ে পণ্ডিতি বাংলার শরণ নেওয়াই নিরাপদ। তার অর্থ এই যে, মানুষের সঙ্গে ব্যবহার করার চেয়ে কাঠের পুতুলের সঙ্গে ব্যবহারে আপদ কম। কিন্তু এমন ভীরু তর্কে সাহিত্য থেকে আজ প্রাকৃতবাংলার ধারাকে নিবৃত্ত করার সাধ্য কারো নেই। সোনার সীতাকে নিয়ে রামচন্দ্রের সংসার চলে নি। নিকষ এবং তৌলদণ্ডের যোগে সেই সীতার মূল্য পাকা করে বেঁধে দেওয়া সহজ, কিন্তু সজীব সীতার মূল্য সজীব রামচন্দ্রই বুঝতেন, তাঁর রাজসভার প্রধান স্বর্ণকার বুঝতেন না, কোষাধ্যক্ষও নয়। আমাদের প্রাকৃত বাংলার যে মূল্য, সে সজীব প্রাণের মূল্য, তার মর্মগত তত্ত্বগুলি বাঁধা নিয়ম আকারে ভালো করে আজও ধরা দেয় নি বলেই তাকে দুয়োরানীর মতো প্রাসাদ ছেড়ে গোয়ালঘরে পাঠাতে হবে, আর তার ছেলেগুলোকে পুঁতে ফেলতে হবে মাটির তলায়, এমন দণ্ড প্রবর্তন করার শক্তি কারো নেই। অবশ্য যথেচ্ছাচার না ঘটে, সেটা চিন্তা করবার সময় হয়েছে সে কথা স্বীকার করি। আমি একসময় সুনীতিকুমারকে প্রাকৃত বাংলার অভিধান বানাতে অনুরোধ করেছিলুম, সেই উপলক্ষে শব্দবিজ্ঞানের নিয়ম অনুসরণ করে বানান যদি বেঁধে দেন তবে বিষয়টাকে মীমাংসার পথে আনা যেতে পারে। এ কাজে হাত লাগাবার সময় হয়েছে সন্দেহ নেই।[১]

৬ শ্রাবণ ১৩৩৯

---

[১] বিমলনারায়ণ চৌধুরীর পত্রের উত্তর

বাংলা বানান : ২

বিশ্ববিদ্যালয়-কর্তৃক বাংলা বানানের যে নিয়ম প্রবর্তিত হয়েছে তার একটা অংশ সম্বন্ধে আমার কিছু বলবার আছে— এইখানে সেটা উত্থাপিত করি। যথোচিত আলোচনা দ্বারা তার চরম মীমাংসা প্রার্থনীয়।

হ-ধাতু খা-ধাতু দি-ধাতু ও শু-ধাতুর অনুজ্ঞায় তাঁরা নিম্নলিখিত ধাতুরূপের নির্দেশ করেছেন— হও, হয়ো। খাও, খেও। দাও, দিও। শোও, শুয়ো।

দেখা যাচ্ছে, কেবলমাত্র আকারযুক্ত খা- এবং ইকারযুক্ত দি- ধাতুতে ভবিষ্যৎবাচক অনুজ্ঞায় তাঁরা প্রচলিত খেয়ো এবং দিয়ো বানানের পরিবর্তে খেও এবং দিও বানান আদেশ করেছেন। অথচ হয়ো এবং শুয়ো-র বেলায় তাঁদের অন্যমত।

একদা হয় খায় প্রভৃতি ক্রিয়াপদের বানান ছিল হএ, খাএ। 'করে' 'চলে' যে নিয়মে একারান্ত সেই নিয়মে হয় খায়ও একারান্ত হবার কথা— পূর্বে তাই ছিল। তখন খা, গা, চা, দি, ধা প্রভৃতি একাক্ষরের ধাতুপদের পরে য়-র প্রচলন ছিল না। তদনুসারে ভবিষ্যৎবাচক অনুজ্ঞায় য়-বিযুক্ত 'ও' ব্যবহৃত হত।

এ নিয়মের পরিবর্তন হবার উচ্চারণগত কারণ আছে। বাংলায় স্বরবর্ণের উচ্চারণ সাধারণত হ্রস্ব, যথা খাএ, খাও। কিন্তু অসমাপিকায় যখন বলি খেএ (খেয়ে) বা ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞায় যখন বলি খেও (খেয়ো) তখন এই স্বরবর্ণের উচ্চারণ কিঞ্চিৎ দীর্ঘ হয়। খাও এবং খেও শব্দে ওকারের উচ্চারণে প্রভেদ আছে। সন্দেহ নেই এ-সকল স্থলে শব্দের অন্তস্বর আপন দীর্ঘত্ব রক্ষার জন্য য়-কে আশ্রয় করে।

একদা করিয়া খাইয়া শব্দের বানান ছিল, করিআ, খাইআ। কিন্তু পূর্ব স্বরের অনুবর্তী দীর্ঘ স্বর য়-যোজকের অপেক্ষা রাখে। তাই স্বভাবতই আধুনিক বানান উচ্চারণের অনুসরণ করেছে। বিশ্ববিদ্যালয় শুয়ো হয়ো শব্দে এ কথা স্বীকার করেছেন, অন্যত্র করেন নি। আমার বিশ্বাস এ নিয়মের ব্যতিক্রম নেই।

আমরা যাকে সাধু ভাষা বলে থাকি বিশ্ববিদ্যালয় বোধ করি তার প্রচলিত বানানের রীতিতে অত্যন্ত বেশি হস্তক্ষেপ করতে ইচ্ছুক নন। নতুবা খাইয়া যাইয়া প্রভৃতি শব্দেও তাঁরা প্রাচীন বিধি অনুসারে পরিবর্তন আদেশ করতেন। আমার বক্তব্য এই যে, যে-কারণে সাধুভাষায় করিয়া হইয়া বলিয়ো খাইয়ো চাহিয়ো বানান স্বীকৃত হয়েছে সেই কারণ চলিত ভাষাতেও আছে। দিয়েছে শব্দে তাঁরা যদি 'এ' স্বরের বাহনরূপে য়-কে স্বীকার করেন তবে দিয়ো শব্দে কেন য়-কে উপেক্ষা করবেন? কেবলমাত্র দি- এবং খা- ধাতুর য় অপহরণ আমার মতে তাদের প্রতি অবিচার করা।

কার্তিক ১৩৪৩

বাংলা বানান : ৩

ধ্বনিসংগত বানান এক আছে সংস্কৃত ভাষায় এবং প্রাচীন প্রাকৃত ভাষায়। আর কোনো ভাষায় আছে কিংবা ছিল কি না জানি নে। ইংরেজি ভাষায় যে নেই অনেক দুঃখে তার আমরা পরিচয় পেয়েছি। আজও তার এলেকায় ক্ষণে ক্ষণে কলম হুঁচট খেয়ে থমকে যায়। বাংলা ভাষা শব্দ সংগ্রহ করে সংস্কৃত ভাণ্ডার থেকে, কিন্তু ধ্বনিটা তার স্বকীয়। ধ্বনিবিকারেই অপভ্রংশের উৎপত্তি।

বানানের জোরেই বাংলা আপন অপভ্রংশত্ব চাপা দিতে চায়। এই কারণে বাংলা ভাষার অধিকাংশ বানানই নিজের ধ্বনিবিদ্রোহী ভুল বানান। আভিজাত্যের ভান করে বানান আপন স্বধর্ম লঙ্ঘনের চেষ্টা করাতে শিক্ষার্থীদের পক্ষে সেটা পরম দুঃখকর হয়েছে। যে রাস্তা রেল-পাতা রাস্তা, তার উপর দিয়ে যাতায়াত করার সময় যদি বুক ফুলিয়ে জেদ করে বলি আমার গোরুর গাড়িটা রেলগাড়িই, তা হলে পথ-যাত্রাটা অচল না হতে পারে, কিন্তু সুবিধাজনক হয় না। শিশুদের পড়ানোয় যাঁদের অভিজ্ঞতা আছে তাঁরা জানেন বাংলা পাঠশিক্ষার প্রবেশ-পথ কি রকম দুর্গম। এক যানের রাস্তায় আর-এক যানকে চালাবার দুশ্চেষ্টাবশত সেটা ঘটেছে। বাঙালি শিশুপালের দুঃখ নিবৃত্তি চিন্তায় অনেকবার কোনো-এক জন বানান-সংস্কারক কেমাল পাশার অভ্যুদয় কামনা করেছি। দূরে যাবারই বা দরকার কী, সেকালের প্রাকৃত ভাষার কাত্যায়নকে পেলেও চলে যেত।

একদা সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতেরা প্রাকৃতজনের বাংলা ভাষাকে অবজ্ঞার চোখেই দেখেছিলেন। সেই অবজ্ঞার অপমান দুঃখ আজও দেশের লোকের মনের মধ্যে রয়ে গেছে। আমাদের সাহিত্যভাষার বানানে তার পরিচয় পাই। বাংলা ভাষাকে যে হরিজন পঙ্‌ক্তিতে বসানো চলে না তার প্রমাণ কেবল ভাষাতাত্ত্বিক কুলজির থেকেই আহরণ করা যথেষ্ট হয় নি। বর্ণপ্রলেপের যোগে সবর্ণত্ব প্রমাণ করে দেবার চেষ্টা ক্রমাগতই চলছে। ইংরেজ ও বাঙালি মূলত একই আর্যবংশোদ্ভব বলে যাঁরা যথেষ্ট সান্ত্বনা পান নি তাঁরা হ্যাটকোট প'রে যথাসম্ভব চাক্ষুষ বৈষম্য ঘোচাবার চেষ্টা করেছেন এমন উদাহরণ আমাদের দেশে দুর্লভ নয়। বাংলা সাহিত্যের বানানে সেই চাক্ষুষ ভেদ ঘোচাবার চেষ্টা যে প্রবল তার হাস্যকর দৃষ্টান্ত দেখা যায় সম্প্রতি কানপুর শব্দে মূর্ধন্য ণয়ের আরোপ থেকে। ভয় হচ্ছে কখন কানাইয়ের মাথায় মূর্ধন্য ণ সঙিনের খোঁচা মারে।

বাংলা ভাষা উচ্চারণকালে সংস্কৃতের সঙ্গে তার ধ্বনির ভেদ ঘোচানো অসম্ভব কিন্তু লেখবার সময় অক্ষরের মধ্যে চোখের ভেদ ঘোচানো সহজ। অর্থাৎ লিখব এক পড়ব আর, বাল্যকাল থেকে দণ্ডপ্রয়োগের জোরে এই কৃচ্ছ্রসাধন সাহিত্যিক সমাজপতিরা অনায়াসেই চালাতে পেরেছেন। সেকালে পণ্ডিতেরা সংস্কৃত জানতেন এই সংবাদটা ঘোষণা করবার জন্যে তাঁদের চিঠিপত্র প্রভৃতিতে বাংলা শব্দে বানানের বিপর্যয় ঘটানো আবশ্যক বোধ করেন নি। কেবল ষত্ব ণত্ব নয়, হ্রস্ব ও দীর্ঘ ইকার ব্যবহার সম্বন্ধেও তাঁরা মাতৃভাষার কৌলীন্য লক্ষণ সাবধানে বজায় রাখতেন না। আমরা বাংলা ভাষায় তৎসম শব্দের দাবি করে থাকি কৃত্রিম দলিলের জোরে। বাংলায় সংস্কৃত শব্দের উচ্চারণবিকার ঘটে নি এমন দৃষ্টান্ত অত্যন্ত দুর্লভ। 'জল' বা 'ফল', 'সৌন্দর্য' বা 'অরুগ্‌ণ' যে তৎসম শব্দ সেটা কেবল অক্ষর সাজানো থেকেই চোখে ঠেকে, ওটা কিন্তু বাঙালির হ্যাটকোটপরা সাহেবিরই সমতুল্য।

উচ্চারণের বৈষম্য সত্ত্বেও শব্দের পুরাতত্ত্বঘটিত প্রমাণ রক্ষা করা বানানের একটি প্রধান উদ্দেশ্য এমন কথা অনেকে বলেন। আধুনিক ক্ষাত্রবংশীয়রা ক্ষাত্রধর্ম ত্যাগ করেছে তবু দেহাবরণে ক্ষাত্র-ইতিহাস রক্ষার জন্যে বর্ম প'রে বেড়ানো তাদের কর্তব্য এ উপদেশ নিশ্চয়ই পালনীয় নয়। দেহাবরণে বর্তমান ইতিহাসকে উপেক্ষা করে প্রাচীন ইতিহাসকেই বহন করতে চেষ্টা করার দ্বারা অনুপযোগিতাকে সর্বাঙ্গে প্রশ্রয় দেওয়া হয়। কিন্তু এ-সকল তর্ক সংগত হোক অসংগত হোক কোনো কাজে লাগবে না। কৃত্রিম বানান একবার চলে গেলে তার পরে আচারের দোহাই অলঙ্ঘনীয় হয়ে ওঠে। যাকে আমরা সাধু ভাষা বলে থাকি সেই ভাষার বানান একেবারে পাকা হয়ে গেছে। কেবল দন্ত্য-ন-য়ের স্থলে মূর্ধন্য ণ-য়ের প্রভাব একটা আকস্মিক ও আধুনিক

সংক্রামকতারূপে দেখা দিয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় সেটারও মীমাংসা করে দিয়েছেন, এখন থেকে কর্নওয়ালিসের কর্ণে মূর্ধন্য ণ-য়ের খোঁচা নিষিদ্ধ।

প্রাকৃত বাংলা আমাদের সাহিত্যে অল্প দিন হল অধিকার বিস্তার করতে আরম্ভ করেছে। তার বানান এখনো আছে কাঁচা। এখনি ঠিক করবার সময়, এর বানান উচ্চারণ-ঘেঁষা হবে, অথবা হবে সংস্কৃত অভিধান ঘেঁষা।

যেমনি হোক, কোনো কর্তৃপক্ষের দ্বারা একটা কোনো আদর্শ স্থির করে দেওয়া দরকার। তার পরে বিনা বিতর্কে সেটাকে গ্রহণ করে স্বেচ্ছাচারিতার হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া যেতে পারবে। সম্প্রতি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সে কাজ করে দিয়েছেন— ব্যক্তিগত মতামতের আলোচনায় ব্যাপারটাকে অনিশ্চিত করে রাখা অনাবশ্যক।

বাংলা ক্রিয়াপদে য়-র যোগে স্বরবর্ণ প্রয়োগ প্রচলিত হয়ে গেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের বানানবিধিসভা কোথাও বা য়-রক্ষা করেছেন কোথাও বা করেন নি। সে স্থলে সর্বত্রই য়-রক্ষার আমি পক্ষপাতী এই কথা আমি জানিয়েছিলেম। আমার মতে এ ক্ষেত্রে বানানভেদের প্রয়োজন নেই বলেছি বটে, কিন্তু বিদ্রোহ করতে চাই নে। যেটা স্থির হয়েছে সেটাকে গ্রহণ করতে প্রস্তুত আছি তবু চিরাভ্যাসকে বর্জন করবার পূর্বে তার তরফের আবেদন জানাবার ঝোঁক সামলাতে পারি নি। এইবার কথাটাকে শেষ করে দেব।

ই-কারের পরে যখন কোনো স্বরবর্ণের আগম হয়, তখন উভয়ে মিলে য় ধ্বনির উদ্ভব হয় এটা জানা কথা। সেই নিয়ম অনুসারে একদা খায়্যা পায়্যা প্রভৃতি বানান প্রচলিত হয়েছিল এবং সেই কারণেই কেতাবী সাধু-বাংলায় হইয়া করিয়া প্রভৃতি বানানের উৎপত্তি। ওটা অনবধানবশত হয় নি এইটে আমার বক্তব্য।

হয় ক্রিয়াপদে হঅ বানান চলে নি। এখানে হয়-এর 'য়' একটি লুপ্ত এ-কার বহন করছে। ব্যাকরণ-বিধি অনুসারে হএ বানান চলতে পারত। চলে নি যে, তার কারণ বাংলা ধ্বনিতত্ত্বের নিয়ম অনুসারে শব্দের শেষবর্ণ যদি স্বরবর্ণ হয় তবে দীর্ঘস্বর হলেও তার উচ্চারণ হ্রস্ব হয়। হ্রস্ব এ এবং য়-র উচ্চারণে ভেদ নেই। এই অন্ত্য এ স্বরবর্ণের উচ্চারণকে যদি দীর্ঘ করতে হত তা হলে য় যোগ করা অনিবার্য হত। তা হলে লিখতে হত হয়ে, হএ লিখে হয়ে উচ্চারণ চলে না।

তেমনি খাও শব্দের ও হ্রস্বস্বর, কিন্তু খেও শব্দের ও হ্রস্ব নয়— সেইজন্যে দীর্ঘ ওকারের আশ্রয় স্বরূপে য়-র প্রয়োজন হয়।

কিন্তু এ তর্কও অবান্তর। আসল কথাটা এই যে ই-কারের পরবর্তী স্বরবর্ণের যোগে য়-র উদ্ভব স্বরসন্ধির নিয়মানুযায়ী। বেআইন বেআড়া বেআক্কেল বানান সুসংগত কারণ এ-কারের সঙ্গে অন্য স্বরবর্ণে মিলনে ঘটক দরকার করে না। বানান অনুসারে খেও এবং খেয়ো উচ্চারণের ভেদ নেই এ কথা মানা শক্ত। এখানে মনে রাখা দরকার খেয়ো (খাইয়ো) শব্দের মাঝখানে একটা লুপ্ত ই-কার আছে। কিন্তু উচ্চারণে তার প্রভাব লুপ্ত হয় নি। লুপ্ত ই-কার অন্যত্রও উচ্চারণ-মহলে আপন প্রভাব রক্ষা করে থাকে সে কথার আলোচনা আমার বাংলা শব্দতত্ত্ব গ্রন্থে [১] পূর্বেই করেছি।

পৌষ ১৩৪৩

---

[১] 'বাংলা উচ্চারণ' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য

বানান-বিধি

কিছুদিন পূর্বে ইংরেজি বানান সংস্কার সম্বন্ধে গিলবর্ট মারের একটি পত্র কাগজে প্রকাশিত হয়েছিল। তিনি বলেছেন, ইংরেজি ভাষার যেমন ক্রমশ পরিবর্তন হয়েছে, তেমনি মাঝে মাঝে তার বানান সংস্কার ঘটেছে। সচল ভাষার অচল বানান অস্বাভাবিক। আধুনিক ইংরেজিতে আর-একবার বানান শোধনের প্রয়োজন হয়েছে এই তাঁর মত। এই উদ্দেশ্য নিয়ে তাঁরা একটি সভাও স্থাপন করেন।

ঠিক যে সময়ে বাংলা ভাষায় এই রকম চেষ্টার প্রবর্তন সেই সময়েই গিলবর্ট মারের এই চিঠিখানি পড়ে আমাকে ভাবিয়ে দিয়েছে। বস্তুত ভাবনা অনেক দিন থেকেই আমাকে পেয়ে বসেছিল, এই চিঠিতে আরো যেন একটু ধাক্কা দিল।

সুদীর্ঘকালের সাহিত্যিক ব্যবহারে ইংরেজি ভাষা পাকা হয়ে উঠেছে। এই ভাষায় বহুলক্ষ বই ছাপার অক্ষরে আত্মপ্রকাশ করেছে, তা ছাড়া ইস্কুলে যুনিভর্সিটিতে বক্তৃতামঞ্চে এই ভাষা ও সাহিত্য সম্বন্ধে আলোচনার অন্ত নেই। উচ্চারণের অবস্থা যাই হোক সর্বত্রই এর বানানের সাম্য সুপ্রতিষ্ঠিত। যে ভাষার লিখিত মূর্তি দেশে কালে এমন পরিব্যাপ্ত তাকে অল্পমাত্র নাড়া দেওয়াও সহজ নয়, ghost শব্দের gost বানানের প্রস্তাবে নানা সমুদ্রের নানা তীর বাদে প্রতিবাদে কী রকম ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠতে পারে সে কথা কল্পনা করলে দুঃসাহসিকের মন স্তম্ভিত হয়। কিন্তু ও দেশে বাধা যেমন দূরব্যাপী, সাহসও তেমনি প্রবল। বস্তুত আমেরিকায় ইংরেজি ভাষার বানানে যে পরিবর্তন ঘটানো হয়েছে তাতে কম স্পর্ধা প্রকাশ পায় নি।

মার্কিন দেশীয় বানানে through শব্দ থেকে তিনটে বেকার অক্ষর বর্জন করে বর্ণবিন্যাসে যে পাগলামির উপশম করা হল আমাদের রাজত্বে সেটা গ্রহণ করবার যদি বাধা না থাকত তা হলে সেইসঙ্গে বাঙালির ছেলের অজীর্ণ রোগের সেই পরিমাণ উপশম হতে পারত। কিন্তু ইংরেজ আচারনিষ্ঠ, বাঙালির কথা বলাই বাহুল্য। নইলে মাপ ও ওজন সম্বন্ধে যে দাশমিক মাত্রা য়ুরোপের অন্যত্র স্বীকৃত হওয়াতে ভূরি পরিমাণ পরিশ্রম ও হিসাবের জটিলতা কমে গিয়েছে ইংলণ্ডেই তা গ্রাহ্য হয় নি, কেবলমাত্র সেখানেই তাপ পরিমাপে সেন্টিগ্রেডের স্থলে ফারেনহাইট অচল হয়ে আছে। কাজ সহজ করবার অভিপ্রায়ে আচারের পরিবর্তন ঘটাতে গেলে অভ্যাসে আসক্ত মনের আরামে যেটুকু হস্তক্ষেপ করা হয় সেটুকু ওরা সহ্য করতে পারে না। এই সম্বন্ধে রাজায় প্রজায় মনোভাবের সামঞ্জস্য দেখা যায়।

যা হোক, তবুও ও দেশে অযথার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী বুদ্ধির উৎসাহ দেখতে পাওয়া যায়। গিলবর্ট মারের মতো মনস্বীর প্রচেষ্টা তারই লক্ষণ।

সংস্কৃত বাংলা অর্থাৎ যাকে আমরা সাধুভাষা বলে থাকি তার মধ্যে তৎসম শব্দের চলন খুবই বেশি। তা ছাড়া সেই-সব শব্দের সঙ্গে ভঙ্গির মিল করে অল্প কিছুকাল মাত্র পূর্বে গড়-উইলিয়মের গোরাদের উৎসাহে পণ্ডিতেরা যে কৃত্রিম গদ্য বানিয়ে তুলেছেন তাতে বাংলার ক্রিয়াপদগুলিকে আড়ষ্ট করে দিয়ে তাকে যেন একটা ক্লাসিকাল মুখোশ পরিয়ে সান্ত্বনা পেয়েছেন; বলতে পেরেছেন, এটা সংস্কৃত নয় বটে, কিন্তু তেমনি প্রাকৃতও নয়। যা হোক, ঐ ভাষা নিতান্ত অল্পবয়স্ক হলেও হঠাৎ সাধু উপাধি নিয়ে প্রবীণের গদিতে অচল হয়ে বসেছেন। অন্ধভক্তির দেশে উপাধির মূল্য আছে।

সৌভাগ্যক্রমে কিছুকাল থেকে প্রাকৃত বাংলা আচারনিষ্ঠদের পাহারা পার হয়ে গিয়ে সাহিত্যের সভায় নিজের স্বাভাবিক আসন নিতে পেরেছে। সেই আসনের পরিসর প্রতিদিন

বাড়ছে, অবশেষে—থাক্, যা অনিবার্য তা তো ঘটবেই, সকল দেশেই ঘটেছে, আগেভাগে সনাতনপন্থীদের বিচলিত করে লাভ নেই।

এই হচ্ছে সময় যখন উচ্চারণের সঙ্গে মিল করে প্রাকৃত বাংলার বানান অপেক্ষাকৃত নিরাপদে নির্দিষ্ট করা যেতে পারে। আমাদের দেশের পূর্বতন আদর্শ খুব বিশুদ্ধ। বানানের এমন খাঁটি নিয়ম পৃথিবীর অন্য কোনো ভাষায় আছে বলে জানি নে। সংস্কৃত ভাষা খুব সূক্ষ্ম বিচার করে উচ্চারণের প্রতি বানানের সদ্ব্যবহার রক্ষা করেছেন। একেই বলা যায় honesty, যথার্থ সাধুতা। বাংলা সাধুভাষাকে honest ভাষা বলা চলে না। মাতৃভাষাকে সে প্রবঞ্চনা করেছে।

প্রাচীন প্রাকৃত ভাষা যখন লিপিবদ্ধ হয়েছে তখন সে যে ছদ্মবেশে সংস্কৃত ভাষা, পণ্ডিতেরা এমন অভিমান রাখেন নি ; তাঁদের যথার্থ পাণ্ডিত্য প্রমাণ হয়েছে বানানের যাথার্থ্যে।

সেই সনাতন সদ্দৃষ্টান্ত গ্রহণ করবার উপযুক্ত সময় এসেছে। এখনো প্রাকৃত বাংলায় বানানের পাকা দলিল তৈরি হয় নি। এই সময়ে যদি উচ্চারণের প্রতি সম্পূর্ণ সম্মান রক্ষা করে বানানের ব্যবস্থা হতে পারত তা হলেও কোনো পক্ষ থেকেই নালিশ-ফরিয়াদের যে কোনো আশঙ্কা থাকত না তা বলি নে, কিন্তু তার ধাক্কা হত অনেক কম।

চিঠিপত্রে প্রাকৃত বাংলার ব্যবহার কিছুকাল পূর্বেও ছিল না, কিন্তু আমি যতটা প্রমাণ পেয়েছি তাতে বলতে পারি যে আজকাল এই ভাষা ব্যবহারের ব্যতিক্রম প্রায় নেই বললেই হয়। মেয়েদের চিঠি যা পেয়ে থাকি তাতে দেখতে পাই যে, উচ্চারণ রক্ষা করে বানান করাকে অপরাধের কোঠায় গণ্য করা হয়েছে, সে সম্বন্ধে তাঁদের হুঁশ নেই। আমি সাধারণ মেয়েদের কথাই বলছি, বাংলায় যাঁরা এম. এ. পরীক্ষার্থিনী তাঁদের চিঠি আমি খুব বেশি পাই নি। একটি মেয়ের চিঠিতে যখন কোলকাতা বানান দেখলুম তখন মনে ভারি আনন্দ হল। এই রকম মেয়েদের কাউকে বানান সংস্কার সমিতিকে রাখা উচিত ছিল। কেননা প্রাকৃত বাংলা বানান বিচারে পুরুষদেরই প্রাধান্য এ কথা আমি স্বীকার করি নে। এ পর্যন্ত অলিখিত প্রাকৃত বাংলা ভাষায় রস জুগিয়ে এসেছে মেয়েরাই, ছেলেবেলায় যখন রূপকথা শুনেছি তখন তার প্রমাণ পেয়েছি প্রতি সন্ধ্যাবেলায়। ব্রতকথার বাংলা ভাষার প্রতি লক্ষ করলেও আমার কথা স্পষ্ট হবে। এটা জানা যাবে প্রাকৃত বাংলা যেটুকু সাহিত্যরূপ নিয়েছে সে অনেকটাই মেয়েদের মুখে। অবশেষে সত্যের অনুরোধে ময়মনসিংহগীতিকা উপলক্ষে পুরুষের জয় ঘোষণা করতে হবে। এমন অকৃত্রিম ভাবরসে ভরা কাব্য বাংলা ভাষায় বিরল।

যে প্রাকৃত বাংলা ভাষা সম্প্রতি সাহিত্যে হরিজন-বর্গ থেকে উপরের পঙ্‌ক্তিতে উঠেছে, তার উচ্চারণ ওকার-বহুল এ কথা মানতে হবে। অনেক মেয়েদের চিঠিতে দেখেছি তাঁদের ওকার-ভীতি একেবারেই নেই। তাঁরা মুখে বলেন 'হোলো', লেখাতেও লেখেন তাই। কোরচি, কোরবো, লিখতে তাঁদের কলম কাঁপে না। ওকারের স্থলে অর্ধকুণ্ডলী ইলেকচিহ্ন ব্যবহার করে তাঁরা ঐ নিরপরাধ স্বরবর্ণটার চেহারা চাপা দিতে চান না। বাংলা প্রাকৃতের বিশেষত্ব ঘোষণার প্রধান নকিব হল ঐ ওকার, ইলেকচিহ্নে বা অচিহ্নে ওর মুখ চাপা দেবার ষড়যন্ত্র আমার কাছে সংগত বোধ হয় না। বাঙালির ওকার-ভীতির একটা প্রমাণ পাই ভৌগলিক ও পৌরহিত্য শব্দ ব্যবহারে।

সেদিন নতুন বানান-বিধি অনুসারে লিখিত কোনো বইয়ে যখন 'কাল' শব্দ চোখে পড়ল তখন অতি স্বল্প একটু সময়ের জন্য আমার খট্‌কা লাগল। পরক্ষণেই বুঝতে পারলুম লেখক বলতে চান কালো। লিখতে চান কাল। কর্তৃপক্ষের অনুশাসন আমি নম্রভাবে মেনে নিতে পারতুম কিন্তু কালো উচ্চারণের ওকার প্রাকৃত বাংলার একটি মূল তত্ত্বের সঙ্গে জড়িত। তত্ত্বটি এই যে দুই অক্ষরবিশিষ্ট

বিশেষণ পদ এই ভাষায় প্রায়ই স্বরান্ত হয়ে থাকে। তার কোনো ব্যতিক্রম নেই তা নয়, কিন্তু সেগুলি সংখ্যায় অতি অল্প। সেই ব্যতিক্রমের দৃষ্টান্ত যতগুলি আমার মনে পড়ল আগে তার তালিকা লিখে দিচ্ছি। রঙ বোঝায় এমন বিশেষণ, যেমন 'লাল' ('নীল' তৎসম শব্দ)। স্বাদ বোঝায় যে শব্দে, যেমন টক, ঝাল। তার পরে সংখ্যাবাচক শব্দ, এক থেকে দশ, ও তার পরে বিশ, ত্রিশ ও ষাট। এইখানে একটি কথা বলা আবশ্যক। আমাদের ভাষায় এই সংখ্যাবাচক শব্দ কেবলমাত্র সমাসে চলে, যেমন একজন, দশঘর, দুইমুখো, তিনহপ্তা। কিন্তু বিশেষ্য শব্দের সঙ্গে জোড়া না লাগিয়ে ব্যবহার করতে হলেই আমরা সংখ্যাবাচক শব্দের সঙ্গে টি বা টা, খানা বা খানি যোগ করি, এর অন্যথা হয় না। কখনো কখনো ই স্বর যোগ করতে হয়, যেমন একই লোক, দুইই বোকা। কখনো কখনো সংখ্যাবাচক শব্দে বাক্যের শেষে স্বতন্ত্র্য দেওয়া হয়, যেমন হরি ও হর এক। এখানে 'এক' বিশেষ্যপদ, তার অর্থ, এক সত্তা, এক হরিহর নয়। আরো দুটো সংখ্যাসূচক শব্দ আছে যেমন, আধ এবং দেড়। কিন্তু এরাও সমাসের সঙ্গী, যেমন, আধখানা, দেড়খানা, ঐ দুটো শব্দ যখন স্বাতন্ত্র্য পায় তখন ওরা হয় আধা, দেড়া। আর-একটা সমাসসংশ্লিষ্ট শব্দের দৃষ্টান্ত দেখাই, যেমন জোড়, সমাসে ব্যবহার করি জোড়হাত ; সমাসবন্ধন ছুটিয়ে দিলে ওটা হয় জোড়া হাত। 'হেঁট' বিশেষণ শব্দটির ব্যবহার খুব সংকীর্ণ। এক হল হেঁটমুণ্ড, সেখানে ওটা সমাসের অঙ্গ। তা ছাড়া, হেঁট হওয়া হেঁট করা। কিন্তু সাধারণ বিশেষণরূপে ওকে আমরা ব্যবহার করি নে, যেমন আমরা বলি নে, হেঁট মানুষ। বস্তুত হেঁট হওয়া, হেঁট করা জোড়া ক্রিয়াপদ, জুড়ে লেখাই উচিত। 'মাঝ' শব্দটাও এই জাতের, বলি মাঝখানে, মাঝদরিয়া, এ হল সমাস, আর বলি মাঝ থেকে, সেটা হল প্রত্যয়যুক্ত, 'থেকে' প্রত্যয়টি ছাড়িয়ে নিয়ে কাজে লাগাতে পারি নে ; বলা যায় না, মাঝ গোরু বা মাঝ ঘর। আর-একটা ফার্সি শব্দ মনে পড়ছে 'সাফ্'। অধিকাংশ স্থলে বিশেষণ মাত্রই সমাসের অন্তর্গত, যেমন সাফ কাপড়, কিন্তু ওটা যে স্বাতন্ত্র্যবান বিশেষণ শব্দ তার প্রমাণ হয়, যখন বলা যায় কাপড়টা সাফ। কিন্তু বলা যায় না 'কথা এক', বলতে হয়, 'কথা একটা', কিংবা, 'কথা একই'। বলি, 'মোট কথা এই', কিন্তু বলি নে 'এই কথাটাই মোট'। যাই হোক, দুই অক্ষরের হসন্ত বাংলা বিশেষণ হয়তো ভেবে ভেবে আরো মনে আনা যেতে পারে, কিন্তু যথেষ্টই ভাবতে হয়।

অপর পক্ষে বেশি খুঁজতে হয় না যথা, বড়ো, ছোটো, মেঝো, সেজো, ভালো, কালো, ধলো, রাঙা, সাদা, ফিকে, খাটো, রোগা, মোটা, বেঁটে, কুঁজো, ত্যাড়া, বাঁকা, সিধে, কানা, খোঁড়া, বোঁচা, নুলো, ন্যাকা, হাঁদা, খাঁদা, টেরা, কটা, গ্যাটা, গোটা, ভোঁদা, ন্যাড়া, ক্ষ্যাপা, মিঠে, ডাঁসা, কষা, খাসা, তোফা, কাঁচা, পাকা, সোঁদা, বোদা, খাঁটি, মেকি, কড়া, মিঠে, চোখা, রোখা, আঁটা, ফাটা, পোড়া, ভিজে, হাজা, শুকো, গুঁড়ো, বুড়ো, ছোঁড়া, গোঁড়া, ওঁচা, খেলো, ছ্যাদা, ঝুঁটো, ভীতু, আগা, গোড়া, উঁচু, নিচু ইত্যাদি। মত শব্দটা বিশেষ্য, ঐটে থেকে বিশেষণ জন্ম নিতেই সে হল মতো।

কেন আমি বাংলা দুই অক্ষরের বিশেষণ পদ থেকে তার অন্তস্বর লোপ করতে পারব না তার কৈফিয়ত আমার এইখানেই রইল।

বাংলা শব্দে কতকগুলি মুদ্রাভঙ্গি আছে। ভঙ্গিসংকেত যেমন অঙ্গের সঙ্গে অবিচ্ছেদে যুক্ত এগুলিও তেমনি। যে মানুষ রেগেছে তার হাত থেকে ছুরিটা নেওয়া চলে, কিন্তু ভ্রূর থেকে ভ্রূকুটি নেওয়া যায় না। যেমনি, তখনি, আমারো, কারো, কোনো, কখনো শব্দে ইকার এবং ওকার কেবলমাত্র ঝোঁক দেবার জন্যে; ওরা শব্দের অনুবর্তী না হয়ে, যথাসম্ভব তার অঙ্গীভূত থাকাই

ভালো। যথাসম্ভব বলতে হল এইজন্যে যে স্বরান্ত শব্দে সংকেত স্বরগুলি অগত্যা সঙ্গে থাকে, মিলে থাকে না, যেমন তোমরাও, আমরাই। কিন্তু যেখানে উচ্চারণের মধ্যে মিলনের বাধা নেই, সেখানে আমি ওদের মিলিয়ে রাখব। কেন আমি বিশেষভাবে মিলনের পক্ষপাতী একটা ছড়া দিয়ে বুঝিয়ে দেব।

যেমনি যখনি দেখা দিই তার ঘরে
অমনি তখনি মিথ্যা কলহ করে।
কোনো কোনো দিন কহে সে নোলক নাড়ি
কারো কারো সাথে জন্মের মতো আড়ি ॥

যদি বানান করি যেমনই, যখনই, অমনই, তখনই, কোনও, কারও, দৃষ্টিকটুত্বের নালিশ হয়তো গ্রাহ্য না হতে পারে। কিন্তু 'যখনই' বানানের স্বাভাবিক যে উচ্চারণ, ছন্দের অনুরোধে সেটা রক্ষা করতে চায় এমন কবি হয়তো জন্মাতেও পারে, কেননা কাল নিরবধি এবং বিপুলা চ পৃথ্বী। যথা :

যখনই দেখা হয় তখনই হাসে,
হয়তো সে হাসি তার খুশি পরকাশে।
কখনও ভাবি, ওগো শ্রীমতী নবীনা,
কোনও কারণে এটা বিদ্রূপ কিনা ॥

আপাতত জানিয়ে রাখছি কেবল পদ্যে নয়, গদ্যেও আমি উচ্চারণ অনুগত করে কোনো, কখনো, যখনি. তখনি লিখব। এইখানে একটা প্রশ্ন তোলা যেতে পারে যে, 'কখনই আমি যাব না' এবং তখনি আমি গিয়েছিলেম এ দুই জায়গায় কি একই বানান থাকা সংগত?

উপসংহারে এই কথাটি বলতে চাই বানানের বিধিপালনে আপাতত হয়তো মোটের উপরে আমরা 'বাধ্যতামূলক' নীতি অনুসরণ করে একান্ত উচ্ছৃঙ্খলতা দমনে যোগ দেব। কিন্তু এই দ্বিধাগ্রস্ত মধ্যপথে ব্যাপারটা থামবে না। অচিরে এমন সাহসিকের সমাগম হবে যাঁরা নিঃসংকোচে বানানকে দিয়ে সম্পূর্ণভাবেই উচ্চারণের সত্য রক্ষা করবেন।

বানান সংস্কার ব্যাপারে বিশেষভাবে একটা বিষয়ে কর্তৃপক্ষেরা যে সাহস দেখিয়েছেন সেজন্যে আমি তাঁদের ভূরি ভূরি সাধুবাদ দিই। কী কারণে জানি নে, হয়তো উড়িষ্যার হাওয়া লেগে আধুনিক বাঙালি অকস্মাৎ মূর্ধন্য ণয়ের প্রতি অহৈতুক অনুরাগ প্রকাশ করছেন। আমি এমন চিঠি পাই যাতে লেখক শনিবার এবং শূন্য শব্দ মূর্ধন্য ণ দিয়ে লেখেন। এটাতে ব্যাধির সংক্রামকতার লক্ষণ প্রকাশ পায়। কর্নেল, গবর্নর, জর্নাল প্রভৃতি বিদেশী শব্দে তাঁরা দেবভাষার ণত্ববিধি প্রয়োগ করে তার শুদ্ধিতা সাধন করেন। তাতে বোপদেবের সম্মতি থাকতেও পারে। কিন্তু আজকাল যখন খবরের কাগজে দেখতে পাই কানপুরে মূর্ধন্য ণ চড়েছে তখন বোপদেবের মতো বৈয়াকরণিককে তো দায়ী করতে পারি নে। কানপুরের কান শব্দের দুটো ব্যুৎপত্তি থাকতে পারে, এক কর্ণ শব্দ থেকে। ব্যাকরণের নিয়ম অনুসারে রেফের সংসর্গে নয়ের মূর্ধন্যতা ঘটে। কর্ণ শব্দের 'র' গেলেই মূর্ধন্যতার অস্তিত্বের কৈফিয়ত যায় চলে। কানপুরের কান শব্দ হয়তো কানাই শব্দের অপভ্রংশ। কৃষ্ণ থেকে কান ও কানাই শব্দের আগমন। কৃষ্ণ শব্দে ঋফলার পরে মূর্ধন্য ষ, ও উভয়ের প্রভাবে শেষের ন মূর্ধন্য হয়েছে। আধুনিক প্রাকৃত থেকে সেই ঋফলা হয়েছে উৎপাটিত। তখন থেকে বোধ করি ভারতের সকল ভাষা হতেই কানাই শব্দে মূর্ধন্যের আক্রমণের আশঙ্কা চলে গেছে। কিন্তু নতুন উপক্রমণিকা-পড়া বাঙালি হয়তো কোন্ দিন কানাই শব্দে মূর্ধন্য ণ চালিয়ে তৃপ্তিবোধ করবেন। এই রকম দুটো-একটা শব্দ তাঁদের চোখ এড়িয়ে গেছে। স্বর্ণের

রেফহীন অপভ্রংশ সোনায় তাঁরা মূর্ধন্য ণ আঁকড়িয়ে আছেন, অথচ শ্রবণের অপভ্রংশ শোনা তাঁদের মূর্ধন্যপক্ষপাতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে। ব্যাকরণের তর্ক থাক্, ওটাতে চিরদিন আমার দুর্বল অধিকার। কৃষ্ণ শব্দের অপভ্রংশে কোনো প্রাকৃতে কাণ্‌হ বা কাণ থাকতেও পারে, যদি থাকে সেখানে সেটা উচ্চারণের অনুগত। সেখানে কেবল লেখবার বেলা কাণ্‌হ এবং বলবার বেলা কান্‌হ কখনোই আদিষ্ট হয় নি। কিন্তু প্রাকৃত বাংলায় তো মূর্ধন্য ণয়ের সাড়া নেই কোথাও। মুদ্রাযন্ত্রকে দিয়ে সবই ছাপানো যায় কিন্তু রসনাকে দিয়ে তো সবই বলানো যায় না। কিন্তু যে মূর্ধন্য ণয়ের উচ্চারণ প্রাকৃত বাংলায় একেবারেই নেই, গায়ে পড়ে তার আনুগত্য স্বীকার করতে যাব কেন? এই পাণ্ডিত্যের অভিমানে শিশুপালদের প্রতি যে অত্যাচার করা যায় সেটা মার্জনীয় নয়। প্রাকৃত বাংলায় মূর্ধন্য ণয়ের স্থান কোনোখানেই নেই এমন কথা যে-সাহসে কর্তৃপক্ষ ঘোষণা করতে পেরেছেন সেই সাহস এখনো আরো কতক দূর তাঁদের ব্যবহার করতে হবে। এখনো শেষ হয় নি কাজ।[1]

আষাঢ় ১৩৪৪

বানান-বিধি

১

...বাংলা বানানের নিয়ম বিধিবদ্ধ করবার জন্য আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন করেছিলুম। তার কারণ এই যে, প্রাকৃত বাংলার ব্যবহার সাহিত্যে অবাধে প্রচলিত হয়ে চলেছে কিন্তু এর বানান সম্বন্ধে স্বেচ্ছাচার ক্রমশই প্রবল হয়ে উঠছে দেখে চিন্তিত হয়েছিলুম। এ সম্বন্ধে আমার আচরণেও উচ্ছৃঙ্খলতা প্রকাশ পায় সে আমি জানি, এবং তার জন্য আমি প্রশ্রয় দাবি করি নে। এ রকম অব্যবস্থা দূর করবার একমাত্র উপায় শিক্ষা-বিভাগের প্রধান নিয়ন্তাদের হাতে বানান সম্বন্ধে চরম শাসনের ভার সমর্পণ করা।

বাংলা ভাষার উচ্চারণে তৎসম শব্দের মর্যাদা রক্ষা হয় বলে আমি জানি নে। কেবলমাত্র অক্ষর বিন্যাসেই তৎসমতার ভান করা হয় মাত্র, সেটা সহজ কাজ। বাংলা লেখায় অক্ষর বানানের নির্জীব বাহন— কিন্তু রসনা নির্জীব নয়— অক্ষর যাই লিখুক, রসনা আপন সংস্কারমতোই উচ্চারণ করে চলে। সে দিকে লক্ষ করে দেখলে বলতেই হবে যে, অক্ষরের দোহাই দিয়ে যাদের তৎসম খেতাব দিয়ে থাকি, সেই সকল শব্দের প্রায় ষোলো আনাই অপভ্রংশ। যদি প্রাচীন ব্যাকরণকর্তাদের সাহস ও অধিকার আমার থাকত, এই ছদ্মবেশীদের উপাধি লোপ করে দিয়ে সত্য বানানে এদের স্বরূপ প্রকাশ করবার চেষ্টা করতে পারতুম। প্রাকৃত বাংলা ব্যাকরণের কেমাল পাশা হবার দুরাশা আমার নেই কিন্তু কালোহ্যয়ং নিরবধিঃ। উক্ত পাশা এ দেশেও দেহান্তর গ্রহণ করতে পারেন।

এমন-কি, যে-সকল অবিসংবাদিত তদ্‌ভব শব্দ অনেকখানি তৎসম-ঘেঁষা, তাদের প্রতি

---

[1] আমি "প্রাকৃত বাংলা" শব্দটি ব্যবহার করে আসছি। সেদিন এর একটা পুরাতন নজির পেয়ে আশ্বস্ত হয়েছি বুলবুল নামক পত্রে। যথা—"দেসি ভাসে পদবন্ধে গাহি পরকৃতে।"

প্রবন্ধটির রবীন্দ্রনাথ-কৃত একটি সংশোধিত প্রুফ রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত আছে। বর্তমান সংস্করণে ওই সংশোধন অনুযায়ী পাঠ গৃহীত।

হস্তক্ষেপ করতে গেলেও পদে পদে গৃহবিচ্ছেদের আশঙ্কা আছে। এরা উচ্চরণে প্রাকৃত কিন্তু লেখনে সংস্কৃত আইনের দাবি করে। এ সম্বন্ধে বিশ্ববিদ্যালয়ের বানান-সমিতি কতকটা পরিমাণে সাহস দেখিয়েছেন, সেজন্যে আমি কৃতজ্ঞ। কিন্তু তাঁদের মনেও ভয় ডর আছে, তার প্রমাণ পাওয়া যায়।

প্রাকৃত বাংলায় তদ্‌ভব শব্দ বিভাগে উচ্চারণের সম্পূর্ণ আনুগত্য যেন চলে এই আমার একান্ত ইচ্ছা ছিল। কিন্তু যদি নিতান্তই সম্পূর্ণ সেই ভিত্তিতে বানানের প্রতিষ্ঠা নাও হয় তবু এমন একটা অনুশাসনের দরকার যাতে প্রাকৃত বাংলার লিখনে বানানের সাম্য সর্বত্র রক্ষিত হতে পারে। সংস্কৃত এবং প্রাচীন প্রাকৃত ভাষা ছাড়া সভ্য জগতের অন্য কোনো ভাষারই লিখনব্যবহারে বোধ করি উচ্চারণ ও বানানের সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য নেই কিন্তু নানা অসংগতিদোষ থাকা সত্ত্বেও এ সম্বন্ধে একটা অমোঘ শাসন দাঁড়িয়ে গেছে। কাজ চলবার পক্ষে সেটার দরকার আছে। বাংলা লেখনেও সেই কাজ চালাবার উপযুক্ত নির্দিষ্ট বিধির প্রয়োজন মানি, আমরা প্রত্যেকেই বিধানকর্তা হয়ে উঠলে ব্যাপারটা প্রত্যেক ব্যক্তির ঘড়িকে তার স্বনিয়মিত-সময় রাখবার ব্যক্তিগত স্বাধীনতা দেবার মতো হয়। বিশ্ববিদ্যালয়-সমিতির বিধানকর্তা হবার মতো জোর আছে— এই ক্ষেত্রে যুক্তির জোরের চেয়ে সেই জোরেরই জোর বেশি এ কথা আমরা মানতে বাধ্য।

রেফের পর ব্যঞ্জনের দ্বিত্ব বর্জন সম্বন্ধে বিশ্ববিদ্যালয় যে নিয়ম নির্ধারণ করে দিয়েছেন তা নিয়ে বেশি তর্ক করবার দরকার আছে বলে মনে করি নে। যাঁরা নিয়মে স্বাক্ষর দিয়েছেন তাঁদের মধ্যে অনেক বড়ো বড়ো পণ্ডিতের নাম দেখেছি। আপনি যদি মনে করেন তাঁরা অন্যায় করেছেন তবুও তাঁদের পক্ষভুক্ত হওয়াই আমি নিরাপদ মনে করি। অন্তত তৎসম শব্দের ব্যবহারে তাঁদের নেতৃত্ব স্বীকার করতে কোনো ভয় নেই, লজ্জাও নেই। শুনেছি 'সৃজন' শব্দটা ব্যাকরণের বিধি অতিক্রম করেছে, কিন্তু যখন বিদ্যাসাগরের মতো পণ্ডিত কথাটা চালিয়েছেন তখন দায় তাঁরই, আমার কোনো ভাবনা নেই। অনেক পণ্ডিত 'ইতিমধ্যে' কথাটা চালিয়ে এসেছেন, 'ইতোমধ্যে' কথাটার ওকালতি উপলক্ষে আইনের বই ঘাঁটবার প্রয়োজন দেখি নে— অর্থাৎ এখন ঐ 'ইতিমধ্যে' শব্দটার ব্যবহার সম্বন্ধে দায়িত্ব-বিচারের দিন আমাদের হাত থেকে চলে গেছে। বিশ্ববিদ্যালয়-বানান-সমিতিতে তৎসম শব্দ সম্বন্ধে যাঁরা বিধান দেবার দায়িত্ব নিয়েছেন, এ নিয়ে দ্বিধা করবার দায়িত্বভার থেকে তাঁরা আমাদের মুক্তি দিয়েছেন। এখন থেকে কার্ত্তিক কর্ত্তা প্রভৃতি দুই ত-ওয়ালা শব্দ থেকে এক ত আমরা নিশ্চিন্ত মনে ছেদন করে নিতে পারি, সেটা সাংঘাতিক হবে না। হাতের লেখায় অভ্যাস ছাড়তে পারব বলে প্রতিশ্রুতি দিতে পারব না, কিন্তু ছাপার অক্ষরে পারব। এখন থেকে ভট্টাচার্য্য শব্দের থেকে য-ফলা লোপ করতে নির্বিকার চিত্তে নির্মম হতে পারব, কারণ নব্য বানান-বিধাতাদের মধ্যে তিন জন বড়ো বড়ো ভট্টাচার্য্যবংশীয় তাঁদের উপাধিকে য-ফলা বঞ্চিত করতে সম্মতি দিয়েছেন। এখন থেকে আর্য্য এবং অনার্য্য উভয়েই অপক্ষপাতে য-ফলা মোচন করতে পারবেন, যেমন আধুনিক মাঞ্চু ও চীনা উভয়েরই বেণী গেছে কাটা।

তৎসম শব্দ সম্বন্ধে আমি নমস্যদের নমস্কার জানাব। কিন্তু তদ্‌ভব শব্দে অপণ্ডিতের অধিকারই প্রবল, অতএব এখানে আমার মতো মানুষেরও কথা চলবে— কিছু কিছু চালাচ্ছিও। যেখানে মতে মিলছি নে সেখানে আমি নিরক্ষরদের সাক্ষ্য মানছি। কেননা, অক্ষরকৃত অসত্যভাষণের দ্বারা তাদের মন মোহগ্রস্ত হয় নি। বিশ্ববিদ্যালয়ের বানান-সমিতির চেয়েও তাদের কথার প্রামাণিকতা যে কম তা আমি বলব না— এমন-কি, হয়তো— থাক্ আর কাজ নেই।

তা হোক, উপায় নেই। আমি হয়তো একগুঁয়েমি করে কোনো কোনো বানানে নিজের মত চালাব। অবশেষে হার মানতে হবে তাও জানি। কেননা, শুধু যে তাঁরা আইন সৃষ্টি করেন তা নয়, আইন মানাবার উপায়ও তাঁদের হাতে আছে। সেটা থাকাই ভালো, নইলে কথা বেড়ে যায়, কাজ বন্ধ থাকে। অতএব তাঁদেরই জয় হোক, আমি তো কেবল তর্কই করতে পারব, তাঁরা পারবেন ব্যবস্থা করতে। মুদ্রাযন্ত্র-বিভাগে ও শিক্ষা-বিভাগে শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার পক্ষে সেই ব্যবস্থার দৃঢ়তা নিতান্ত আবশ্যক।

আমি এখানে স্বপ্নদেশ থেকে দূরে এসে বিশ্রামচর্চার জন্য অত্যন্ত ব্যস্ত আছি। কিন্তু প্রারব্ধ কর্মের ফল সর্বত্রই অনুসরণ করে। আমার যেটুকু কৈফিয়ত দেবার সেটা না দিয়ে নিষ্কৃতি নেই। কিন্তু এই যে দুঃখ স্বীকার করলুম এর ফল কেবল একলা আপনাকে নিবেদন করলে বিশ্রামের অপব্যয়টা অনেক পরিমাণেই অনর্থক হবে। অতএব এই পত্রখানি আমি প্রকাশ করতে পাঠালুম। কেননা, এই বানান-বিধি ব্যাপারে যাঁরা অসন্তুষ্ট তাঁরা আমাকে কতটা পরিমাণে দায়ী করতে পারেন সে তাঁদের জানা আবশ্যক। আমি পণ্ডিত নই, অতএব বিধানে যেখানে পাণ্ডিত্য আছে সেখানে নম্রভাবেই অনুসরণের পথ গ্রহণ করব, যে অংশটা পাণ্ডিত্যবর্জিত দেশে পড়ে সে অংশে যতটা শক্তি বাচালতা করব কিন্তু নিশ্চিত জানব, যে একদা "অন্যে বাক্য কবে কিন্তু তুমি রবে নিরুত্তর।"

আলমোড়া
১২.৬.৩৭

২

...আমি পূর্বেই কবুল করেছি যে, কী সংস্কৃত ভাষায় কী ইংরেজিতে আমি ব্যাকরণে কাঁচা। অতএব প্রাকৃত বাংলায় তৎসম শব্দের বানান নিয়ে তর্ক করবার অধিকার আমার নেই। সৌভাগ্যের বিষয় এই যে, এই বানানের বিচার আমার মতের অপেক্ষা করে না। কেবল আমার মতো অনভিজ্ঞ ও নতুন পোড়োদের পক্ষ থেকে পণ্ডিতদের কাছে আমি এই আবেদন করে থাকি যে, ব্যাকরণ বাঁচিয়ে যেখানেই বানান সরল করা সম্ভব হয় সেখানে সেটা করাই কর্তব্য তাতে জীবে দয়ার প্রমাণ হয়। এ ক্ষেত্রে প্রবীণদের অভ্যাস ও আচারনিষ্ঠতার প্রতি সম্মান করতে যাওয়া দুর্বলতা। যেখানে তাঁদের অবিসংবাদিত অধিকার সেখানে তাঁদের অধিনায়কত্ব স্বীকার করতেই হবে। অন্যত্র নয়। বানান-সংস্কার-সমিতি বোপদেবের তিরস্কার বাঁচিয়েও রেফের পর দ্বিত্ব বর্জনের যে বিধান দিয়েছেন সেজন্য নবজাত ও অজাত প্রজাবর্গের হয়ে তাঁদের কাছে আমার নমস্কার নিবেদন করি।

বিশেষজ্ঞতা সকল ক্ষেত্রেই দুর্লভ। ব্যাকরণে বিশেষজ্ঞের সংখ্যা খুবই কম এ কথা মানতেই হবে। অথচ তাঁদের অনেকেরই অন্য এমন গুণ থাকতে পারে যাতে একোহি দোষো গুণসন্নিপাতের জন্য সাহিত্যব্যবহার থেকে তাঁদের নির্বাসন দেওয়া চলবে না। এঁদের জন্যেই কোনো একটি প্রামাণ্য শাসনকেন্দ্র থেকে সাহিত্যে বানান প্রভৃতি সম্বন্ধে কার্যবিধি প্রবর্তনের ব্যবস্থা থাকা একান্ত দরকার। আইন বানাবার অধিকার তাঁদেরই আছে আইন মানাবার ক্ষমতা আছে যাঁদের হাতে। আইনবিদ্যায় যাঁদের জুড়ি কেউ নেই ঘরে বসে তাঁরা আইনকর্তাদের 'পরে কটাক্ষপাত করতে পারেন কিন্তু কর্তাদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে আইন তাঁরা চালাতে পারবেন না। এই কথাটা চিন্তা করেই

বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষদের কাছে বানানবিধি পাকা করে দেবার জন্যে দরখাস্ত জানিয়েছিলেম। অনেক দিন ধরে বানান সম্বন্ধে যথেচ্ছাচার নিজেও করেছি অন্যকেও করতে দেখেছি। কিন্তু অপরাধ করবার অবাধ স্বাধীনতাকে অপরাধীও মনে মনে নিন্দা করে, আমিও করে এসেছি। সর্বসাধারণের হয়ে এর প্রতিবিধানভার ব্যক্তিবিশেষের উপর দেওয়া চলে না— সেইজন্যেই পীড়িত চিত্তে মহতের শরণাপন্ন হতে হল। আপনার চিঠির ভাষার ইঙ্গিত থেকে বোঝা গেল যে বানান-সংস্কার-সমিতির 'হোমরাচোমরা' 'পণ্ডিত'দের প্রতি আপনার যথেষ্ট শ্রদ্ধা নেই। এই অশ্রদ্ধা আপনাকেই সাজে কিন্তু আমাকে তো সাজে না, আর আমার মতো বিপুলসংখ্যক অভাজনদেরও সাজে না। নিজে হাল ধরতে শিখি নি, কর্ণধারকে খুঁজি— যে-সে এসে নিজেকে কর্ণধার বলে ঘোষণা করলেও তাদের হাতে হাল ছেড়ে দিতে সাহস হয় না, কেননা, এতে প্রাণের দায় আছে।

এমন সন্দেহ আপনার মনে হতেও পারে যে সমিতির সকল সদস্যই সকল বিধিরই যে অনুমোদন করেন তা সত্য নয়। না হওয়াই সম্ভব। কিন্তু আপসে নিষ্পত্তি করেছেন। তাঁদের সম্মিলিত স্বাক্ষরের দ্বারা এই কথারই প্রমাণ হয় যে এতে তাঁদের সম্মিলিত সমর্থন আছে। যৌথ কারবারের অধিনেতারা সকলেই সকল বিষয়েই একমত কি না, এবং তাঁরা কেউ কেউ কর্তব্যে ঔদাস্য করেছেন কি না সে খুঁটিনাটি সাধারণে জানেও না জানতে পারেও না। তারা এইটুকুই জানে যে স্বাক্ষরদাতা ডিরেক্টরদের প্রত্যেকেরই সম্মিলিত দায়িত্ব আছে। (বশিত্ব কৃতিত্ব প্রভৃতি ইন্‌ভাগান্ত শব্দে যদি হ্রস্ব ইকার প্রয়োগই বিধিসম্মত হয় তবে দায়িত্ব শব্দেও ইকার খাটতে পারে বলে আমি অনুমান করি)। আমরাও বানান-সমিতিকে এক বলে গণ্য করছি এবং তাঁদের বিধান মেনে নিতে প্রস্তুত হচ্ছি। যেখানে স্বস্বপ্রধান দেবতা অনেক আছে সেখানে কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম। অতএব বাংলা তৎসম শব্দের বানানে রেফের পরে দ্বিত্ববর্জনের যে বিধান বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বীকৃত হয়েছে সেটা সবিনয়ে আমিও স্বীকার করে নেব।

কিন্তু যে-প্রস্তাবটি ছিল বানান-সমিতি স্থাপনের মূলে, সেটা প্রধানত তৎসম শব্দসম্পর্কীয় নয়। প্রাকৃত বাংলা যখন থেকেই সাহিত্যে প্রবেশ ও বিস্তার লাভ করল তখন থেকেই তার বানানসাম্য নির্দিষ্ট করে দেবার সমস্যা প্রবল হয়ে উঠেছে। প্রাকৃত বাংলার সংস্কৃত অংশের বানান সম্বন্ধে বেশি দুশ্চিন্তার কারণ নেই— যাঁরা সতর্ক হতে চান হাতের কাছে একটা নির্ভরযোগ্য অভিধান রাখলেই তাঁরা বিপদ এড়িয়ে চলতে পারেন। কিন্তু প্রাকৃত বাংলার প্রামাণ্য অভিধান এখনো হয় নি, কেননা, আজও তার প্রামাণিকতার প্রতিষ্ঠাই হতে পারে নি। কিন্তু এই বানানের ভিত পাকা করার কাজ শুরু করবার সময় এসেছে। এত দিন এই নিয়ে আমি দ্বিধাগ্রস্ত ভাবেই কাটিয়েছি। তখনো কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা ভাষা প্রাধান্য লাভ করে নি। এই কারণে সুনীতিকেই এই ভার নেবার জন্যে অনুরোধ করেছিলেম। তিনি মোটামুটি একটা আইনের খসড়া তৈরি করে দিয়েছিলেন। কিন্তু আইনের জোর কেবল যুক্তির জোর নয় পুলিসেরও জোর। সেইজন্যে তিনি দ্বিধা ঘোচাতে পারলেন না। এমন-কি, আমার নিজের ব্যবহারে শৈথিল্য পূর্বের মতোই চলল। আমার সংস্কার, প্রুফশোধকের সংস্কার, কপিকারকের সংস্কার, কম্পোজিটরের সংস্কার, এবং যে-সব পত্রিকায় লেখা পাঠানো যেত তার সম্পাদকদের সংস্কার এই-সব মিলে পাঁচ ভূতের কীর্তন চলত। উপরওয়ালা যদি কেউ থাকেন এবং তিনিই যদি নিয়ামক হন, এবং দণ্ডপুরস্কারের দ্বারা তাঁর নিয়ন্তৃত্ব যদি বল পায় তা হলেই বানানের রাজ্যে একটা শৃঙ্খলা হতে পারে। নইলে ব্যক্তিগত ভাবে আপনাদের মতো বিচক্ষণ লোকের দ্বারে দ্বারে মত সংগ্রহ করে বেড়ানো শিক্ষার পক্ষে যতই উপযোগী হোক কাজের পক্ষে হয় না।

কেন যে মুশকিল হয় তার একটা দৃষ্টান্ত দিই। বর্ণন শব্দে আপনি যখন মূর্ধন্য ণ লাগান তখন সেটাকে যে মেনে নিই সে আপনার খাতিরে নয়, সংস্কৃত শব্দের বানান প্রতিষ্ঠিত স্বে মহিম্নি —নিজের মহিমায়। কিন্তু আপনি যখন বানান শব্দের মাঝখানটাতে মূর্ধন্য ণ চড়িয়ে দেন তখন ওটাকে আমি মানতে বাধ্য নই। প্রথমত এই বানানে আপনার বিধানকর্তা আপনি নিজেই। দ্বিতীয়ত আপনি কখনো বলেন প্রচলিত বানান মেনে নেওয়াই ভালো, আবার যখন দেখি মূর্ধন্য ণ-লোলুপ 'নয়া' বাংলা বানান-বিধিতে আপনার ব্যক্তিগত আসক্তিকে সমর্থনের বেলায় আপনি দীর্ঘকাল-প্রচলিত বানানকে উপেক্ষা করে উক্ত শব্দের বুকের উপর নবাগত মূর্ধন্য ণয়ের জয়ধ্বজা তুলে দিয়েছেন তখন বুঝতে পারি নে আপনি কোন্ মতে চলেন। জানি নে 'কানপুর' শব্দের কানের উপর আপনার ব্যবহার নব্য মতে বা পুরাতন মতে। আমি এই সহজ কথাটা বুঝি যে প্রাকৃত বাংলায় মূর্ধন্য ণয়ের স্থান কোথাও নেই, নির্জীব ও নিরর্থক অক্ষরের সাহায্যে ঐ অক্ষরের বহুল আমদানি করে আপনাদের পাণ্ডিত্য কাকে সন্তুষ্ট করছে, বোপদেবকে না কাত্যায়নকে? দুর্ভাগ্যক্রমে বানান-সমিতিরও যদি ণ-এর প্রতি অহৈতুক অনুরাগ থাকত তা হলে দণ্ডবিধির জোরে সেই বানানবিধি আমিও মেনে নিতুম। কেননা, আমি জানি আমি চিরকাল বাঁচব না কিন্তু পাঠ্য-পুস্তকের ভিতর দিয়ে যারা বিশ্ববিদ্যালয়ের বানানে শিক্ষালাভ করবে তাদের আয়ু আমার জীবনের মেয়াদকে ছাড়িয়ে যাবে।

মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের সঙ্গে প্রাকৃত বাংলা ভাষা সম্বন্ধে আমার আলোচনা হয়েছিল। তিনি প্রাকৃত বাংলা ভাষার স্বতন্ত্র রূপ স্বীকার করবার পক্ষপাতী ছিলেন এ কথা বোধ হয় সকলের জানা আছে। সেকালকার যে-সকল ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের সংস্কৃত ভাষায় বিশুদ্ধ পাণ্ডিত্য ছিল, তাঁদের কারো কারো হাতের লেখা বাংলা বানান আমার দেখা আছে। বানান-সমিতির কাজ সহজ হত তাঁরা যদি উপস্থিত থাকতেন। সংস্কৃত ভাষা ভালো করে জানা না থাকলে বাংলা ভাষা ব্যবহারের যোগ্যতা থাকবেই না, ভাষাকে এই অস্বাভাবিক অত্যাচারে বাধ্য করা পাণ্ডিত্যাভিমানী বাঙালির এক নূতন কীর্তি। যত শীঘ্র পারা যায় এই কঠোর বন্ধন শিথিল করে দেওয়া উচিত। বস্তুত একেই বলে ভূতের বোঝা বওয়া। এত কাল ধরে সংস্কৃত ব্যাকরণের সাহায্য না নিয়ে যে বহুকোটি বাঙালি প্রতিদিন মাতৃভাষা ব্যবহার করে এসেছে এতকাল পরে আজ তাদের সেই ভাষাই বাংলা সাহিত্যে প্রবেশের অধিকার পেয়েছে। এইজন্য তাদের সেই খাঁটি বাংলার প্রকৃত বানান নির্ণয়ের সময় উপস্থিত হয়েছে। এক কালে প্রাচীন ভারতের কোনো কোনো ধর্মসম্প্রদায় যখন প্রাকৃত ভাষায় পালি ভাষায় আপন আপন শাস্ত্রগ্রন্থ প্রচার করতে প্রবৃত্ত হয়েছিল তখন ঠিক এই সমস্যাই উঠেছিল। যাঁরা সমাধান করেছিলেন তাঁরা অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন; তাঁদের পাণ্ডিত্য তাঁরা বোঝার মতো চাপিয়ে যান নি জনসাধারণের 'পরে। যে অসংখ্য পাঠক ও লেখক পণ্ডিত নয় তাদের পথ তাঁরা অকৃত্রিম সত্যপন্থায় সরল করেই দিয়েছিলেন। নিজের পাণ্ডিত্য তাঁরা নিজের মধ্যে সম্পূর্ণ পরিপাক করেছিলেন বলেই এমনটি ঘটা সম্ভব হয়েছিল।

আপনার চিঠিতে ইংরেজি ফরাসি প্রভৃতি ভাষার নজির দেখিয়ে আপনি বলেন ঐ-সকল ভাষায় উচ্চারণে বানানে সামঞ্জস্য নেই। কিন্তু এই নজিরের সার্থকতা আছে বলে আমি মনে করি নে। ঐ-সকল ভাষার লিখিত রূপ অতি দীর্ঘকাল ধরে চলে আসছে, এই পরিণতির মুখে কালে কালে যে-সকল অসংগতি ঘটেছে হঠাৎ তার সংশোধন দুঃসাধ্য। প্রাকৃত বাংলা ছাপার অক্ষরের এলেকায় এই সম্প্রতি পাসপোর্ট পেয়েছে। এখন ওর বানান নির্ধারণে একটা কোনো নীতি অবলম্বন করতে হবে তো। কালে কালে পুরোনো বাড়ির মতো বৃষ্টিতে রৌদ্রে তাতে নানা রকম

দাগ ধরবে, সেই দাগগুলি সনাতনত্বের কৌলীন্য দাবি করতেও পারে। কিন্তু রাজমিস্ত্রি কি গোড়াতেই নানা লোকের নানা অভিমত ও অভিরুচি অনুসরণ করে ইমারতে পুরাতন দাগের নকল করতে থাকবে। য়ুরোপীয় ভাষাগুলি যখন প্রথম লিখিত হচ্ছিল তখন কাজটা কী রকম করে আরম্ভ হয়েছিল তার ইতিহাস আমি জানি নে। আন্দাজ করছি কতকগুলি খামখেয়ালি লোকে মিলে এ কাজ করেন নি, যথাসম্ভব কানের সঙ্গে কলমের যোগ রক্ষা করেই শুরু করেছিলেন। তাও খুব সহজ নয়, এর মধ্যেও কারো কারো স্বেচ্ছাচার যে চলে নি তা বলতে পারি নে। কিন্তু স্বেচ্ছাচারকে তো আদর্শ বলে ধরে নেওয়া যায় না— অতএব ব্যক্তিগত অভিরুচির অতীত কোনো নীতিকে যদি স্বীকার করা কর্তব্য মনে করি তবে উচ্চারণকেই সামনে রেখে বানানকে গড়ে তোলা ভালো। প্রাচীন ব্যাকরণকর্তারা সেই কাজ করেছেন, তাঁরা অন্য কোনো ভাষার নজির মিলিয়ে কর্তব্য সহজ করেন নি।

এ প্রশ্ন করতে পারেন বানান-বিধিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিচারকে মেনে নেওয়াকেই যদি আমি শ্রেয় মনে করি তা হলে মাঝে প্রতিবাদ করি কেন? প্রতিবাদ করি বিচারকদের সহায়তা করবার জন্যেই, বিদ্রোহ করবার জন্যে নয়। এখনো সংস্কার-কাজের গাঁথনি কাঁচা রয়েছে, এখনো পরিবর্তন চলবে, কিন্তু পরিবর্তন তাঁরাই করবেন আমি করব না। তাঁরা আমার কথা যদি কিছু মেনে নেবার যোগ্য মনে করেন সে ভালোই, যদি না মনে করেন তবে তাঁদের বিচারই আমি মেনে নেব। আমি সাধারণভাবে তাঁদের কাছে কেবল এই কথাটি জানিয়ে রাখব যে প্রাকৃত ভাষার স্বভাবকে পীড়িত করে তার উপরে সংস্কৃত ব্যাকরণের মোচড় দেওয়াকে যথার্থ পাণ্ডিত্য বলে না। একটা তুচ্ছ দৃষ্টান্ত দেব। প্রচলিত উচ্চারণে আমরা বলি কোলকাতা, কলিকাতাও যদি কেউ বলতে ইচ্ছা করেন বলতে পারেন, যদিও তাতে কিঞ্চিৎ হাসির উদ্রেক করবে। কিন্তু ইংরেজ এই শহরটাকে উচ্চারণ করে ক্যালক্যাটা এবং লেখেও সেই অনুসারে। আপনিও বোধ হয় ইংরেজিতে এই শহরের ঠিকানা লেখবার সময় ক্যালক্যাটাই লেখেন, অথবা ক্যালক্যাটা লিখে কলিকাতা উচ্চারণ করেন না— অর্থাৎ যে জোরে প্রাকৃত বাংলায় আপনারা যত্ব ণত্ব মেশিনগান চালাতে চেষ্টা করেন, সে জোর এখানে প্রয়োগ করেন না। আপনি বোধ করি ইংরেজিতে চিটাগংকে চট্টগ্রাম সিলোনকে সিংহল বানান করে বানান ও উচ্চারণে গঙ্গাজলের ছিটে দেন না। ইংরেজি ভাষা ব্যবহার করবামাত্রই যশোরকে আপনারা জেসোর বলেন, এমন-কি, মিত্রকে মিটার লেখার মধ্যে অশুচিতা অনুভব করেন না। অতএব চোখে অঞ্জন দিলে কেউ নিন্দে করবে না, মুখে দিলে করবে। প্রাকৃত বাংলায় যা শুচি, সংস্কৃত ভাষায় তাই অশুচি।

আপনি আমার একটি কথা নিয়ে কিছু হাস্য করেছেন কিন্তু হাসি তো যুক্তি নয়। আমি বলেছিলেম বর্তমান সাধু বাংলা গদ্য ভাষার ক্রিয়াপদগুলি গড় উইলিয়মের পণ্ডিতদের হাতে ক্ল্যাসিক ভঙ্গির কাঠিন্য নিয়েছে। আপনি বলতে চান তা সত্য নয়। কিন্তু আপনার এই উক্তি তো সংস্কৃত ব্যাকরণের অন্তর্গত নয় অতএব আপনার কথায় আমি যদি সংশয় প্রকাশ করি রাগ করবেন না। বিষয়টা আলোচনার যোগ্য। এক কালে প্রাচীন বাংলা আমি মন দিয়ে এবং আনন্দের সঙ্গেই পড়েছিলুম। সেই সাহিত্যে সাধু বাংলায় প্রচলিত ক্রিয়াপদের অভাব লক্ষ্য করেছিলুম। হয়তো ভুল করেছিলুম। দয়া করে দৃষ্টান্ত দেখাবেন। একটা কথা মনে রাখবেন ছাপাখানা চলন হবার পরে প্রাচীন গ্রন্থের উপর দিয়ে যে শুদ্ধির প্রক্রিয়া চলে এসেছে সেটা বাঁচিয়ে দৃষ্টান্ত সংগ্রহ করবেন।

আর-একটি কথা। ইলেক। আপনি বলেন লুপ্ত স্বরের চিহ্ন বলে ওটা স্বীকার্য কেননা ইংরেজিতে তার নজির আছে। 'করিয়া' শব্দ থেকে ইকার বিদায় নিয়েছে অতএব তার স্মৃতিচিহ্ন

স্বরূপে ইলেকের স্থাপনা। ইকারে আকারে মিলে একার হয়— সেই নিয়মে ইকার আকারের যোগে 'করিয়া' থেকে 'কোরে' হয়েছে। প্রথম বর্ণের ওকারটিও পরবর্তী ইকারের দ্বারা প্রভাবিত। যেখানে যথার্থই কোনো স্বর লুপ্ত হয়েছে অথচ অন্য স্বরের রূপান্তর ঘটায় নি এমন দৃষ্টান্তও আছে, যেমন ডাহিন দিক থেকে ডান দিক, বহিন থেকে বোন, বৈশাখ থেকে বোশেখ। এখনো এই-সব লুপ্ত স্বরের স্মরণচিহ্ন ব্যবহার ঘটে নি। গোধূম থেকে গম হয়েছে এখানেও লুপ্ত উকারের শোকচিহ্ন দেখি নে। যে-সকল শব্দে, স্বরবর্ণ কেন, গোটা ব্যঞ্জনবর্ণ অন্তর্ধান করেছে সেখানেও চিহ্নের উপদ্রব নেই। মুখোপাধ্যায়ের পা-শব্দটি দৌড় দিয়ে নিজের অর্থরক্ষা করেছে, পদচিহ্নমাত্র পিছনে ফেলে রাখে নি— এই-সমস্ত তিরোভাবকে চিহ্নিত করবার জন্যে সমুদ্রপার থেকে চিহ্নের আমদানি করার প্রয়োজন আছে কি। ইলেক না দিলে ওকার ব্যবহার করতে হয়, নইলে অসমাপিকার সূচনা হয় না। তাতে দোষ কী আছে।

পুনর্বার বলি আমি উকিল মাত্র, জজ নই। যুক্তি দেবার কাজ আমি করব, রায় দেবার পদ আমি পাই নি। রায় দেবার ভার যাঁরা পেয়েছেন আমার মতে তাঁরা শ্রদ্ধেয়।

বোধ হচ্ছে আর একটিমাত্র কথা বাকি আছে। এখনি তখনি আমারো তোমারো শব্দের ইকার ওকারকে ঝোঁক দেবার কাজে একটা ইঙ্গিতের মধ্যে গণ্য করে ও দুটোকে শব্দের অন্তর্ভুক্ত করবার প্রস্তাব করেছিলেম। তার প্রতিবাদে আপনি পরিহাসের সুরে বলেছেন, তবে কি বলতে হবে, আমরা ভাতি খাই রুটি খাই নে। দুটো প্রয়োগের মধ্যে যে প্রভেদ আছে সেটা আপনি ধরতে পারেন নি। শব্দের উপরে ঝোঁক দেবার ভার কোনো-না-কোনো স্বরবর্ণ গ্রহণ করে। যখন আমরা বলতে চাই বাঙালি ভাতই খায় তখন ঝোঁকটা পড়ে আকারের পরে, ইকারের পরে নয়। সেই ঝোঁকবিশিষ্ট আকারটা শব্দের ভিতরেই আছে স্বতন্ত্র নেই। এমন নিয়ম করা যেতে পারত যাতে ভাত শব্দের ভা-এর পরে একটা হাইফেন স্বতন্ত্র চিহ্নরূপে ব্যবহৃত হত— যথা বাঙালি ভা-তই খায়। ইকার এখানে হয়তো অন্য কাজ করছে, কিন্তু ঝোঁক দেবার কাজ তার নয়। তেমনি 'খুবই' শব্দ, এর ঝোঁকটা উকারের উপর। যদি 'তীর' শব্দের উপর ঝোঁক দিতে হয়, যদি বলতে চাই বুকে তীরই বিঁধেছে, তা হলে ঐ দীর্ঘ ঈকারটাই হবে ঝোঁকের বাহন। দুধটাই ভালো কিংবা তেলটাই খারাপ এর ঝোঁকগুলো শব্দের প্রথম স্বরবর্ণেই। সুতরাং ঝোঁকের চিহ্ন অন্য স্বরবর্ণে দিলে বেখাপ হবে। অতএব ভাতি খাব বানান লিখে আমার প্রতি লক্ষ করে যে-হাসিটা হেসেছেন সেটা প্রত্যাহরণ করবেন। ওটা ভুল বানান, এবং আমার বানান নয়। বলা বাহুল্য 'এখনি' শব্দের ঝোঁক ইকারেরি পরে, খ-এর অকারের উপরে নয়।

এখনি তখনি শব্দের বানান সম্বন্ধে আরো একটি কথা বলবার আছে। যখন বলি কখনোই যাব না, আর যখন বলি এখনি যাব দুইয়ের মধ্যে যে প্রভেদ আছে তা ভিন্ন বানানে নির্দেশ করা উচিত। কারো শব্দের বানান সম্বন্ধেও ভাববার বিষয় আছে। 'কারো কারো মতে শুক্রবারে শুভকর্ম প্রশস্ত' অথবা 'শুক্রবারে বিবাহে কারোই মত নেই' এই দুইটি বাক্যে ওকারকে কোথায় স্থাপন করা উচিত? এখানে কি বানান করতে হবে, কারও কারও, এবং কারওই?

আপনার চিঠির একটা জায়গায় ভাষার ভঙ্গিতে মনে হল ক-এ দীর্ঘ ঈকার যোগে যে কী আমি ব্যবহার করে থাকি সে আপনার অনুমোদিত নয়। আমার বক্তব্য এই যে, অব্যয় শব্দ 'কি' এবং সর্বনাম শব্দ 'কী' এই দুইটি শব্দের সার্থকতা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। তাদের ভিন্ন বানান না থাকলে অনেক স্থলেই অর্থ বুঝতে বাধা ঘটে। এমন-কি, প্রসঙ্গ বিচার করেও বাধা দুর হয় না। 'তুমি কি

জানো সে আমার কত প্রিয়' আর 'তুমি কী জানো সে আমার কত প্রিয়', এই দুই বাক্যের একটাতে জানা সম্বন্ধে প্রশ্ন করা হচ্ছে আর একটাতে সন্দেহ প্রকাশ করা হচ্ছে জানার প্রকৃতি বা পরিমাণ সম্বন্ধে, এখানে বানানের তফাত না থাকলে ভাবের তফাত নিশ্চিতরূপে আন্দাজ করা যায় না।[১]

শ্রাবণ ১৩৪৪

চিহ্নবিভ্রাট

'সঞ্চয়িতা'র মুদ্রণভার ছিল যাঁর 'পরে[২], প্রুফ দেখার কালে চিহ্ন ব্যবহার নিয়ে তাঁর খটকা বাধে। সেই উপলক্ষে তাঁর সঙ্গে আমার যে-চিঠি চলেছিল সেটা প্রকাশ করবার যোগ্য বলে মনে করি। আমার মতই যে সকলে গ্রহণ করবেন এমন স্পর্ধা মনে রাখি নে। আমিও যে-সব জায়গায় সম্পূর্ণ নিজের মতে চলব এত বড়ো সাহস আমার নেই। আমি সাধারণত যে-সাহিত্য নিয়ে কারবার করি পাঠকের মনোরঞ্জনের উপর তার সফলতা নির্ভর করে। পাঠকের অভ্যাসকে পীড়ন করলে তার মন বিগড়ে দেওয়া হয়, সেটা রসগ্রহণের পক্ষে অনুকূল অবস্থা নয়। তাই চলতি রীতিকে বাঁচিয়ে চলাই মোটের উপর নিরাপদ। তবুও 'সঞ্চয়িতা'র প্রুফে যতটা আমার প্রভাব খাটাতে পেরেছি ততটা চিহ্ন ব্যবহার সম্বন্ধে আমার মত বজায় রাখবার চেষ্টা প্রকাশ পেয়েছে। মতটা কী, দুখানা পত্রেই তা বোঝা যাবে। এই মত সাধারণের ব্যবহারে লাগবে এমন আশা করি নে কিন্তু এই নিয়ে উক্তি প্রত্যুক্তি হয়তো উপাদেয় হতে পারে। এখানে 'উপাদেয়' শব্দটা ব্যবহার করলুম ইন্টারেস্টিং শব্দের পরিবর্তে। এই জায়গাটাতে খাটল কিন্তু সর্বত্রই-যে খাটবে এমন আশা করা অন্যায়। 'মানুষটি উপাদেয়' বললে ব্যাঘ্রজাতির সম্পর্কে এ-বাক্যের সার্থকতা মনে আসতে পারে। এ স্থলে ভাষায় বলি, লোকটি মজার, কিংবা চমৎকার, কিংবা দিব্যি। তাতেও অনেক সময়ে কুলোয় না, তখন নতুন শব্দ বানাবার দরকার হয়। বলি, বিষয়টি আকর্ষক, কিংবা লোকটি আকর্ষক। 'আগ্রহক' শব্দও চালানো যেতে পারে। বলা বাহুল্য, নতুন তৈরি শব্দ নতুন নাগরা জুতোর মতোই কিছুদিন অস্বস্তি ঘটায়। মনোগ্রাহী শব্দও যথাযোগ্য স্থানে চলে— কিন্তু সাধারণত ইন্টারেস্টিং বিশেষণের চেয়ে এ বিশেষণের মূল্য কিছু বেশি। কেননা, অনেক সময়ে ইন্টারেস্টিং শব্দ দিয়ে দাম চোকানো, পারা-মাখানো আধলা পয়সা দিয়ে বিদায় করার মতো। বাঙালির গান শুনে ইংরেজ যখন বলে 'হাউ ইন্টারেস্টিং' তখন উৎফুল্ল হয়ে ওঠা মূঢ়তা। যে-শব্দের এত ভিন্নরকমের দাম অন্য ভাষার ট্যাকশালে তার প্রতিশব্দ দাবি করা চলে না। সকল ভাষার মধ্যেই গৃহিণীপনা আছে। সব সময়ে প্রত্যেক শব্দ সুনির্দিষ্ট একটিমাত্র অর্থই যে বহন করে তা নয়। সুতরাং অন্য ভাষায় তার একটিমাত্র প্রতিশব্দ খাড়া করবার চেষ্টা বিপত্তিজনক। 'ভরসা' শব্দের একটা ইংরেজি প্রতিশব্দ courage, আর-একটা expectation। আবার কোনো কোনো জায়গায় দুটো অর্থই একত্রে মেলে, যেমন—

নিশিদিন ভরসা রাখিস
ওরে মন হবেই হবে।

---

[১] এই পত্র দুইখানি দেবপ্রসাদ ঘোষকে লিখিত

[২] জীবনময় রায়। পরিচয় ১৩৩৯ মাঘ সংখ্যায় প্রকাশিত এই প্রবন্ধের পাঠ দ্রষ্টব্য।

এখানে courage বটে hopeও বটে। সুতরাং এটাকে ইংরেজিতে তরজমা করতে হলে ও দুটোর একটাও চলবে না। তখন বলতে হবে—

Keep firm the faith, my heart,
it must come to happen.

উল্‌টে বাংলায় তরজমা করতে হলে 'বিশ্বাস' শব্দের ব্যবহারে কাজ চলে বটে কিন্তু 'ভরসা' শব্দের মধ্যে যে একটা তাল ঠোকার আওয়াজ পাওয়া যায় সেটা থেমে যায়।

ইংরেজি শব্দের তরজমায় আমাদের দাসভাব প্রকাশ পায়, যখন একই শব্দের একই প্রতিশব্দ খাড়া করি। যথা 'সিম্প্যাথির' প্রতিশব্দে সহানুভূতি ব্যবহার। ইংরেজিতে সিম্প্যাথি কোথাও বা হৃদয়গত কোথাও বা বুদ্ধিগত। কিন্তু সহানুভূতি দিয়েই দুই কাজ চালিয়ে নেওয়া কৃপণতাও বটে হাস্যকরতাও বটে। 'এই প্রস্তাবের সঙ্গে আমার সহানুভূতি আছে' বললে মানতে হয় যে প্রস্তাবের অনুভূতি আছে। ইংরেজি শব্দটাকে সেলাম করব কিন্তু অতটা দূর পর্যন্ত তার তাঁবেদারি করতে পারব না। আমি বলব 'তোমার প্রস্তাবের সমর্থন করি'।

এক কথা থেকে আর-এক কথা উঠে পড়ল। তাতে কী ক্ষতি আছে। যাকে ইংরেজিতে বলে essay, আমরা বলি প্রবন্ধ, তাকে এমনতরো অবন্ধ করলে সেটা আরামের হয় বলে আমার ধারণা। নিরামিষ-ভোজীকে গৃহস্থ পরিবেশন করবার সময় ঝোল আর কাঁচকলা দিয়ে মাছটা গোপন করতে চেয়েছিল, হঠাৎ সেটা গড়িয়ে আসবার উপক্রম করতেই তাড়াতাড়ি সেরে নিতে গেল, নিরামিষ পঙ্‌ক্তি-বাসী ব্যাকুল হয়ে বলে উঠল 'যো আপসে আতা উসকো আনে দেও।'

তোমাদের কোনো কোনো লেখায় এই রকম আপ্‌সে আনেওয়ালাদের নির্বিচারে পাতে পড়তে দিয়ো, নিশ্চিত হবে উপাদেয়, অর্থাৎ ইন্টারেস্টিং। এবার পত্র দুটোর প্রতি মন দেও। এইখানে বলে রাখি, ইংরেজিতে, যে-চিহ্নকে অ্যাপসট্রফির চিহ্ন বলে কেউ কেউ বাংলা পারিভাষিকে তাকে বলে 'ইলেক', এ আমার নতুন শিক্ষা। এর যাথার্থ্য সম্বন্ধে আমি দায়িক নই : এই পত্রে উক্ত শব্দের ব্যবহার আছে।[১]

৮ ডিসেম্বর ১৯৩২

১

একদা আমার মনে তর্ক উঠেছিল যে, চিহ্নগুলো ভাষার বাইরের জিনিস, সেগুলোকে অগত্যার বাইরে ব্যবহার করলে ভাষার অভ্যাস খারাপ হয়ে যায়। যেমন, লাঠিতে ভর ক'রে চললে পায়ের 'পরে নির্ভর কমে। প্রাচীন পুঁথিতে দাঁড়ি ছাড়া আর-কোনো উপসর্গ ছিল না, ভাষা নিজেরই বাক্যগত ভঙ্গিদ্বারাই নিজের সমস্ত প্রয়োজনসিদ্ধি করত। এখন তার এত বেশি নোকর চাকর কেন। ইংরেজের ছেলে যখন দেশে থাকে তখন একটিমাত্র দাসীতেই তার সব কাজ চলে যায়, ভারতবর্ষে এলেই তার চাপরাসী হরকরা বেহারা বাটলার চোপদার জমাদার মালী মেথর ইত্যাদি কত কী। আমাদের লিখিত ভাষাকেও এইরকম হাকিমী সাহিবিয়ানায় পেয়ে বসেছে। 'কে হে তুমি' বাক্যটাই নিজের প্রশ্নত্ব হাঁকিয়ে চলেছে তবে কেন ওর পিছনে আবার একটা কুঁজওয়ালা সহিস। সব চেয়ে আমার খারাপ লাগে বিস্ময়ের চিহ্ন। কেননা বিস্ময় হচ্ছে একটা হৃদয়ভাব—

---

[১] সুধীন্দ্রনাথ দত্তকে লিখিত পত্র

লেখকের ভাষায় যদি সেটা স্বতই প্রকাশিত না হয়ে থাকে তা হলে একটা চিহ্ন ভাড়া করে এনে দৈন্য ঢাকবে না। ও যেন আত্মীয়ের মৃত্যুতে পেশাদার শোকওয়ালির বুক-চাপড়ানি। 'অহো, হিমালয়ের কী অপূর্ব গাম্ভীর্য'। এর পরে কি ঐ ফোঁটা-সওয়ারি দাঁড়িটার আকাশে তর্জনী-নির্দেশের দরকার আছে— (রোসো, প্রশ্নচিহ্নটা এখানে না দিলে কি তোমার ধাঁধা লাগবে?)। কে, কি, কেন, কার, কিসে, কিসের, কত প্রভৃতি এক ঝাঁক অব্যয় শব্দ তো আছেই তবে চিহ্নের খোশামুদি করা কেন। 'তুমি তো আচ্ছা লোক' এখানে 'তো'— ইঙ্গিতের পিছনে আরো-একটা চিহ্নের ধাক্কা দিয়ে পাঠককে ডবল্ চমক খাওয়ানোর দরকার আছে কি। পাঠক কি আফিমখোর। 'রোজ রোজ যে দেরি করে আসো' এই বাক্যবিন্যাসেই কি নালিশের যথেষ্ট জোর পৌঁছল না। যদি মনে কর অর্থটা স্পষ্ট হল না তা হলে শব্দযোগে অভাব পূরণ করলে ভাষাকে বৃথা ঋণী করা হয় না— যথা, 'রোজ রোজ বড়ো-যে দেরি করে আস'। মুশকিল এই যে, পাঠককে এমনি চিহ্ন-মৌতাতে পেয়ে বসেছে, ওগুলো না দেখলে তার চোখের তার থাকে না। লঙ্কাবাটা দিয়ে তরকারি তো তৈরি হয়েছেই কিন্তু সেইসঙ্গে একটা আস্ত লঙ্কা দৃশ্যমান না হলে চোখের ঝাল জিভের ঝালে মিলনাভাবে ঝাঁঝটা ফিকে বোধ হয়।

ছেদ চিহ্নগুলো আর-এক জাতের। অর্থাৎ যতি-সংকেতে পূর্বে ছিল দণ্ডহাতে একাধিপত্য-গর্বিত সিধে দাঁড়ি— কখনো-বা একলা কখনো দোকলা। যেন শিবের তপোবনদ্বারে নন্দীর তর্জনী। এখন তার সঙ্গে জুটে গেছে বাঁকা বাঁকা ক্ষুদে ক্ষুদে অনুচর। কুকুরবিহীন সংকুচিত লেজের মতো। যখন ছিল না তখন পাঠকের আন্দাজ ছিল পাকা, বাক্যপথে কোথায় কোথায় বাঁক তা সহজেই বুঝে নিত। এখন কুঁড়েমির তাগিদে বুঝেও বোঝে না। সংস্কৃত নাটকে দেখেছ রাজার আগে আগে প্রতিহারী চলে— চিরাভ্যস্ত অন্তঃপুরের পথেও ক্ষণে ক্ষণে হেঁকে ওঠে, 'এই দিকে' 'এই দিকে'। কমা সেমিকোলনগুলো অনেকটা তাই।

একদিন চিহ্নপ্রয়োগে মিতব্যয়ের বুদ্ধি যখন আমাকে পেয়ে বসেছিল তখনই আমার কাব্যের পুনঃসংস্করণকালে বিস্ময়সংকেত ও প্রশ্নসংকেত লোপ করতে বসেছিলুম। প্রৌঢ় যতিচিহ্ন সেমিকোলনকে জবাব দিতে কুণ্ঠিত হই নি। কিশোর কমা-কে ক্ষমা করেছিলুম, কারণ, নেহাত খিড়কির দরজায় দাঁড়ির জমাদারী মানানসই হয় না। লেখায় দুই জাতের যতিই যথেষ্ট, একটা বড়ো একটা ছোটো। সূক্ষ্ম বিচার করে আরো-একটা যদি আনো তা হলে অতি সূক্ষ্ম বিচার করে ভাগ আরো অনেক বাড়বে না কেন।

চিহ্নের উপর বেশি নির্ভর যদি না করি তবে ভাষা সম্বন্ধে অনেকটা সতর্ক হতে হয়। মনে করো কথাটা এই; 'তুমি যে বাবুয়ানা শুরু করেছ।' এখানে বাবুয়ানার উপর ঠেস দিলে কথাটা প্রশ্নসূচক হয়— ওটা একটা ভাঙা প্রশ্ন— পুরিয়ে দিলে দাঁড়ায় এই, 'তুমি যে বাবুয়ানা শুরু করেছ তার মানেটা কী বলো দেখি।' 'যে' অব্যয় পদের পরে ঠেস দিলে বিস্ময় প্রকাশ পায়। 'তুমি যে বাবুয়ানা শুরু করেছ'। প্রথমটাতে প্রশ্ন এবং দ্বিতীয়টাতে বিস্ময়চিহ্ন দিয়ে কাজ সারা যায়। কিন্তু যদি চিহ্ন দুটো না থাকে তা হলে ভাষাটাকে নিঃসন্দিগ্ধ করে তুলতে হয়। তা হলে বিস্ময়সূচক বাক্যটাকে শুধরিয়ে বলতে হয়— 'যে বাবুয়ানা তুমি শুরু করেছ'।

এইখানে আর-একটা আলোচ্য কথা আছে। প্রশ্নসূচক অব্যয় 'কি' এবং প্রশ্নবাচক সর্বনাম 'কি' উভয়ের কি এক বানান থাকা উচিত। আমার মতে বানানের ভেদ থাকা আবশ্যক। একটাতে হ্রস্ব ই ও অন্যটাতে দীর্ঘ ঈ দিলে উভয়ের ভিন্ন জাতি এবং ভিন্ন অর্থ বোঝবার সুবিধা হয়। 'তুমি কি রাঁধছ' 'তুমি কী রাঁধছ'— বলা বাহুল্য এ দুটো বাক্যের ব্যঞ্জনা স্বতন্ত্র। তুমি রাঁধছ কিনা, এবং

তুমি কোন্ জিনিস রাঁধছ, এ দুটো প্রশ্ন একই নয়, অথচ এক বানানে দুই প্রয়োজন সারতে গেলে বানানের খরচ বাঁচিয়ে প্রয়োজনের বিঘ্ন ঘটানো হবে। যদি দুই 'কি'-এর জন্যে দুই ইকারের বরাদ্দ করতে নিতান্তই নারাজ থাক তা হলে হাইফেন ছাড়া উপায় নেই। দৃষ্টান্ত : 'তুমি কি রাঁধ্‌ছ' এবং 'তুমি কি-রাঁধ্‌ছ'।* এই পর্যন্ত থাক্।[১]

৫ নভেম্বর ১৯৩১

২

আমার প্রুফ-সংশোধনপ্রণালী দেখলেই বুঝতে পারবে আমি নিরঞ্জনের উপাসক— চিহ্নের অকারণ উৎপাত সইতে পারি নে। কেউ কেউ যাকে ইলেক বলে (কোন্ ভাষা থেকে পেলে জানি নে) তার ঔদ্ধত্য হাস্যকর অথচ দুঃসহ। অসমাপিকা ক'রে ব'লে প্রভৃতিতে দরকার হ'তে পারে কিন্তু 'হেসে' 'কেঁদে'-তে একেবারেই দরকার নেই। 'করেছে বলেছে'-তে ইলেক চড়িয়ে পাঠকের চোখে খোঁচা দিয়ে কী পুণ্য অর্জন করবে জানি নে। করবে চলবে প্রভৃতি স্বতঃসম্পূর্ণ শব্দগুলো কী অপরাধ করেছে যে, ইলেককে শিরোধার্য করতে তারা বাধ্য হবে। 'যার'-'তার' উপর ইলেক চড়াও নি ব'লে তোমার কাছে আমি কৃতজ্ঞ। পাছে হল (লাঙল) এবং হল (হইল) শব্দে অর্থ নিয়ে ফৌজদারি হয় সেজন্যে ইলেকের বাঁকা বুড়ো আঙুল না দেখিয়ে অকপটচিত্তে হোলো লিখতে দোষ কী। এ ক্ষেত্রে ঐ ইলেকের ইশারাটার কী মানে তা সকলের তো জানা নেই। হোলো শব্দে দুটো ওকার ধ্বনি আছে— এক ইলেক কি ঐ দুটো অবলাকেই অন্তঃপুরে অবগুণ্ঠিত করেছেন। হতে ক্রিয়াপদ যে-অর্থ স্বভাবতই বহন করে তা ছাড়া আর কোনো অর্থ তার পরে আরোপ করা বঙ্গভাষায় সম্ভব কি না জানি নে অথচ ঐ ভালোমানুষ দাগীরূপে চিহ্নিত করা ওর কোন্ নিয়তির নির্দেশে। স্তম্ভপরে পালঙ্কপরে প্রভৃতি শব্দ কানে শোনবার সময় কোনো বাঙালির ছেলে ইলেকের অভাবে বিপন্ন হয় না, পড়বার সময়েও স্তম্ভ পালঙ্ক প্রভৃতি শব্দকে দিন মুহূর্ত প্রভৃতি কালার্থক শব্দ বলে কোনো প্রকৃতিস্থ লোকের ভুল করবার আশঙ্কা নেই। 'চলবার' 'বলবার' 'মরবার' 'ধরবার' শব্দগুলি বিকল্পে দ্বিতীয় কোনো অর্থ নিয়ে কারবার করে না তবু তাদের সাধুত্ব রক্ষার জন্যে লেজগুটোনো ফোঁটার ছাপ কেন। তোমার প্রুফে দেখলুম 'হয়ে' শব্দটা বিনা চিহ্নে সমাজে চলে গেল অথচ 'ল'য়ে' কথাটাকে ইলেক দিয়ে লজ্জিত করেছ। পাছে সংগীতের লয় শব্দটার অধিকারভেদ নিয়ে মামলা বাধে এইজন্যে। কিন্তু সে রকম সুদূর সম্ভাবনা আছে কি। লাখে যদি একটা সম্ভাবনা থাকে তারি জন্যে কি হাজার হাজার নিরপরাধকে দাগা দেবে। কোন্ জায়গায় এরকম বিপদ ঘটতে পারে তার নমুনা আমাকে পাঠিয়ে দিয়ো। যেখানে যুক্ত ক্রিয়াপদে অসমাপিকা থাকে সেখানে তার অসমাপ্তি সম্বন্ধে কোনো দ্বিধা থাকতে পারে না। যেমন, বলে ফেলো, করে দাও ইত্যাদি। অবশ্য করে দাও মানে হাতে দাও হতেও পারে কিন্তু সমগ্র বাক্যের যোগে সে রকম অর্থবিকল্প হয় না— যেমন কাজ করে দাও। 'বলে ফেলো' কথাটাকে খণ্ডিত করে দেখলে আর-একটা মানে কল্পনা করা যায়, কেউ-একজন বলে 'ফেলো'। কিন্তু আমরা তো সব প্রথমভাগ বর্ণপরিচয়ের টুকরো কথার ব্যবসায়ী নই। 'তুমি বলে যাও' কথাটা স্বতই স্পষ্ট, কেবল

---

* পরে দেখা গেছে, কি এবং কী-এর বিশেষ প্রয়োগ পুরোনো বাংলা পুঁথিতেও প্রচলিত আছে।

[১] জীবনময় রায়কে লিখিত পত্রের পরিমার্জিত রূপ।

দুর্দৈবক্রমে, তুমি বল্ নাচে যাও এমন মানে হতেও পারে— সেই ক্বচিৎ দুর্যোগ এড়াবার জন্যে eternal punishment কি দয়া কিংবা ন্যায়ের পরিচায়ক। 'দেবতা নিশ্বাস ছাড়ি কহিলেন—' সমস্ত বাংলাদেশে যত পাঠশালায় যত ছেলে আছে পরীক্ষা করে দেখো একজনেরও ইলেকের দরকার হয় কি না, তবে কেন তুমি না-হক মুদ্রাকরকে পীড়িত করলে। তোমার প্রুফে তুমি ক্ষুদে ক্ষুদে চিহ্নের ঝাঁকে আমার কাব্যকে এমনি আচ্ছন্ন করেছ যে তাদের জন্য মশারি ফেলতে ইচ্ছে হয়। আমার প্রুফে আমি এর একটাও ব্যবহার করি নি— কেননা, জানি বুঝতে কানাকড়ি পরিমাণেও বাধে না। জানি আমার বইয়ে নানা বানানে চিহ্নপ্রয়োগের নানা বৈচিত্র্য ঘটেছে— তা নিয়েও আমি মাথা বকাই নে— যেখানে দেখি অর্থবোধে বিপত্তি ঘটে সেখানে ছাড়া এইদিকে আমি দৃক্‌পাতও করি নে। প্রুফে যত অনাবশ্যক সংশোধন বাড়াবে ভুলের সম্ভাবনা ততই বাড়বে— সময় নষ্ট হবে, তার বদলে লাভ কিছুই হবে না। ততো যতো শব্দে ওকার নিতান্ত অসংগত। মতো সম্বন্ধে অন্য ব্যবস্থা। মোটের উপর আমার বক্তব্য এই— পাঠককে গোড়াতে পাগল নির্বোধ কিংবা আহেলাবেলাতি বলে ধরে নিয়ো না— যেখানে তাদের ভুল করবার কোনো সম্ভাবনা নেই সেখানে কেবলই তাদের চোখে আঙুল দিয়ো না— চাণক্যের মতো চিহ্নের কুশাঙ্কুরগুলো উৎপাটিত কোরো তা হলে বানানভীরু শিশুদের যিনি বিধাতা তাঁর আশীর্বাদ লাভ করবে।

আমি যে নির্বিচারে চিহ্নসূয়যজ্ঞের জনমেজয়গিরি করতে বসেছি তা মনে কোরো না। কোনো কোনো স্থলে হাইফেন চিহ্নটার প্রয়োজন স্বীকার করি। অব্যয় 'যে' এবং সর্বনাম 'যে' শব্দের প্রয়োগভেদ বোঝাবার জন্যে আমি হাইফেনের শরণাপন্ন হই। 'তুমি যে কাজে লেগেছ' বলতে বোঝায় তুমি অকর্মণ্য নও, এখানে 'যে' অব্যয়। 'তুমি যে কাজে লেগেছ' এখানে কাজকে নির্দিষ্ট করবার জন্য 'যে' সর্বনাম বিশেষণ। প্রথম 'যে' শব্দে হাইফেন দিয়ে 'তুমি'-র সঙ্গে ও দ্বিতীয় 'যে'-কে 'কাজ' শব্দের সঙ্গে যুক্ত করলে অর্থ স্পষ্ট হয়। অন্যত্র দেখো— 'তিনি বললেন যে আপিসে যাও, সেখানে ডাক পড়েছে'। এখানে 'যে' অব্যয়। অথবা তিনি বললেন 'যে আপিসে যাও সেখানে ডাক পড়েছে।' এখানে 'যে' সর্বনাম, আপিসের বিশেষণ। হাইফেন চিহ্নে অর্থভেদ স্পষ্ট করা যায়। যথা, 'তিনি বললেন-যে আপিসে যাও, সেখানে ডাক পড়েছে।' এবং 'তিনি বললেন যে-আপিসে যাও সেখানে ডাক পড়েছে।'

১৯৩১

বানান-প্রসঙ্গ

১

পত্রিকায়[২] চণ্ডিদাসের যে নূতন পদাবলী প্রকাশিত হইতেছে তাহা বহুমূল্যবান।... সম্পাদক মহাশয় আদর্শ পুঁথির বানান সংশোধন করিয়া দেন নাই সেজন্য তিনি আমাদের ধন্যবাদভাজন। প্রাচীন গ্রন্থসকলের যে-সমস্ত মুদ্রিত সংস্করণ আজকাল বাহির হয় তাহাতে বানান-সংশোধকগণ

---

১. জীবনময় রায়কে লিখিত পত্রের পরিমার্জিত রূপ।

২. সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা, ১৩০৫, তৃতীয় সংখ্যা

কালাপাহাড়ের বৃত্তি অবলম্বন করিয়াছেন। তাঁহারা সংস্কৃত বানানকে বাংলা বানানের আদর্শ কল্পনা করিয়া যথার্থ বাংলা বানান নির্বিচারে নষ্ট করিয়াছেন ; ইহাতে ভাষাতত্ত্বজিজ্ঞাসুদিগের বিশেষ অসুবিধা ঘটিয়াছে। বর্তমান সাহিত্যের বাংলা বহুলপরিমাণে সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতদিগের উদ্‌ভাবিত বলিয়া বাংলা বানান, এমন-কি, বাংলাপদবিন্যাস প্রণালী তাহার স্বাভাবিক পথভ্রষ্ট হইয়া গিয়াছে, এখন তাহাকে স্বপথে ফিরাইয়া লইয়া যাওয়া সম্ভবপর নহে। কিন্তু আধুনিক বাংলার আদর্শে যাঁহারা প্রাচীন পুঁথি সংশোধন করিতে থাকেন তাঁহারা পরম অনিষ্ট করেন।[1]

১৩০৫

২

বানান লইয়া কয়েকটি কথা বলিতে ইচ্ছা করি। রাঙা ভাঙা ডাঙা আঙুল প্রভৃতি শব্দ ঙ-অক্ষরযোগে লেখা নিতান্তই ধ্বনিসংগতিবিরুদ্ধ। গঙ্গা শব্দের সহিত রাঙা, তুঙ্গ শব্দের সহিত ঢাঙা তুলনা করিলে এ কথা স্পষ্ট হইবে। মূল শব্দটিকে স্মরণ করাইবার জন্য ধ্বনির সহিত বানানের বিরোধ ঘটানো কর্তব্য নহে। সে নিয়ম মানিতে হইলে চাঁদকে চান্দ, পাঁককে পঙ্ক, কুমারকে কুম্ভার লিখিতে হয়। অনেকে মূলশব্দের সাদৃশ্যরক্ষার জন্য সোনাকে সোণা, কানকে কাণ বানান করেন, অথচ শ্রবণশব্দজ শোনাকে শোণা লেখেন না। যে-সকল সংস্কৃত শব্দ অপভ্রংশের নিয়মে পুরা বাংলা হইয়া গেছে সেগুলির ধ্বনি অনুযায়িক বানান হওয়া উচিত। প্রাকৃতভাষার বানান ইহার উদাহরণস্থল। জোড়া, জোয়ান, জাঁতা, কাজ প্রভৃতি শব্দে আমরা স্বাভাবিক বানান গ্রহণ করিয়াছি, অথচ অন্য অনেক স্থলে করি নাই। [সাহিত্য-পরিষৎ] পত্রিকা-সম্পাদকমহাশয় বাংলা বানানের নিয়ম সম্বন্ধে আলোচনা উত্থাপন করিলে আমরা কৃতজ্ঞ হইব।[2]

১৩০৮

৩

টেক্‌সট্‌বুক্‌ কমিটি ক্ষকারকে বাংলা বর্ণমালা হইতে নির্বাসন দিয়াছেন। শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ অনেক পুরাতন নজির দেখাইয়া ক্ষকারের পক্ষে ওকালতি করিয়াছেন। অসংযুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণের দলে ক্ষ কেমন করিয়া প্রথমে প্রবেশ করিয়াছিল জানি না। কিন্তু সে সময়ে দ্বাররক্ষক যে সতর্ক ছিল, তাহা বলিতে পারি না। আধুনিক ভারতবর্ষীয় আর্যভাষায় মূর্ধন্য ষ-এর উচ্চারণ খ হইয়া গিয়াছিল, সুতরাং ক্ষকারে মূর্ধন্য ষ-এর বিশুদ্ধ উচ্চারণ ছিল না। না থাকিলেও উহা যুক্ত অক্ষর এবং উহার উচ্চারণ ক্‌খ। শব্দের আরম্ভে অনেক যুক্ত অক্ষরের যুক্ত উচ্চারণ থাকে না, যেমন জ্ঞান শব্দের জ্ঞ ; কিন্তু অজ্ঞ শব্দে উহার যুক্ত উচ্চারণ সম্বন্ধে সন্দেহ থাকে না। ক্ষকারও সেইরূপ— ক্ষয় এবং অক্ষয় শব্দের উচ্চারণে তাহা প্রমাণ হইবে। অতএব অসংযুক্ত বর্ণমালায় ক্ষকার দলভ্রষ্ট একঘরে ; তাহাতে সন্দেহ নাই। সেই ব্যঞ্জনপঙ্‌ক্তির মধ্যে উহার অনুরূপ

---

[1] 'সাময়িক সাহিত্য', ভারতী, অগ্রহায়ণ ১৩০৫, পৃ ৭৬২

[2] মাসিক-সাহিত্য-সমালোচনা, বঙ্গদর্শন, বৈশাখ ১৩০৮, পৃ ৬৪

সংকরবর্ণ আর একটিও নাই। দীর্ঘকালের দখল প্রমাণ হইলেও তাহাকে আরো দীর্ঘকাল অন্যায় অধিকার রক্ষা করিতে দেওয়া উচিত কি।[১]

১৩০৮

৪

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বৈজ্ঞানিক পরিভাষা সংকলনে আপনারা বানানের যে রীতি বেঁধে দিয়েছেন আমি তাহার সমর্থন করি। ব্যবহারকালে নিয়মের কিছু কিছু পরিবর্তন অনিবার্য হতে পারে। এইজন্যে বছর দুয়েক পরে পুনঃসংশোধন প্রয়োজন হবে বলে মনে করি।

য়ুরোপীয় লিখিত ভাষা থেকে লিপ্যন্তরকালে অকারবর্গীয় স্বরবর্ণের বাংলারূপ নিয়ে আপনারা আলোচনা করেছেন। বিশেষ চিহ্নযোগ না করে সকল স্থানে এই উচ্চারণ বিশুদ্ধ রাখা সম্ভব নয়। বক্র আ বোঝাবার জন্যে আপনারা বিশেষ চিহ্ন স্বীকার করেছেন কিন্তু বাংলায় অপ্রচলিত বিকৃত অকারের কোনো চিহ্ন স্বীকার করেন নি। Love শব্দকে লভ্ লিখলে হাস্যোদ্রেক করবে, লাভ লিখলেও যথাযথ হবে না। apathy, recur, such প্রভৃতি শব্দের চিহ্নিত ধ্বনিগুলিকে কি বাংলা অকার দিয়ে ব্যবহার করা চলবে। অপথি এবং অপথিকরি কি একই বানানে চালানো যাবে এবং অক্ষরের কোন্ প্রতিলিপি আপনারা স্থির করেছেন জানি নে। আমার মতে অন্ত্যস্থ ব, এবং অন্ত্যস্থ ভ। award এবং averse বানানে দুই পৃথক অক্ষরের প্রয়োজন। সম্ভবত আপনারা এ সমস্তই আলোচনা করে স্থির করে দিয়েছেন।

কিন্তু প্রবাসী পত্রিকায় আপনি যে প্রবন্ধ পাঠিয়েছেন তার মধ্যে আমি একটি গুরুতর অভাব দেখলেম। বর্তমান বাংলাসাহিত্যে প্রাকৃত বাংলার ব্যবহার ব্যাপকভাবেই চলেছে আমার এই চিঠিখানি তার একটি প্রমাণ। অন্তত চিঠিলেখায় সংস্কৃত বাংলা প্রায় উঠে গেছে বলেই আমার বিশ্বাস। বাংলা গদ্যসাহিত্যে এই প্রাকৃত ভাষার ব্যাপ্তি অনেকের কাছে রুচিকর না হতে পারে কিন্তু একে উপেক্ষা করা চলবে না। এর বানানরীতি নির্দিষ্ট করে দেবার জন্যে বিশ্ববিদ্যালয়কে অনেকদিন আমি অনুরোধ করেছি। প্রাচীনকালে যখন প্রাকৃত ভাষা সাহিত্যে গৃহীত হল তখন তার বানানে বা ব্যাকরণে যথেচ্ছাচার অনুমোদিত হয় নি, হলে এ ভাষার সাহিত্য গড়তে পারত না। সিটি কলেজের বাংলা অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিজনবিহারী ভট্টাচার্য কিছুকালের জন্যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আদেশক্রমে বাংলাভাষাসংক্রান্ত গবেষণা নিয়ে আমার এখানে কাজ করতেন। ভিন্ন ভিন্ন বাংলা গ্রন্থে ভিন্ন ভিন্ন লেখক প্রাকৃত বাংলারচনায় বানানের যেরকম নানা বিচিত্র বিসদৃশ ব্যবহার করেছেন তার তালিকা প্রস্তুত করতে তাঁকে নিযুক্ত করেছিলেম। আমার ইচ্ছা ছিল এই তালিকা অবলম্বন করে বিশ্ববিদ্যালয় প্রাকৃত বাংলা বানানের নিয়ম বেঁধে দেবেন। সকলেই জানেন প্রাকৃত বাংলায় সমাপিকা ও অসমাপিকা ক্রিয়ার বানান আজকাল উচ্ছৃঙ্খলভাবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে— আমিও এ সম্বন্ধে অপরাধী। অপেক্ষা করে আছি প্রাকৃত বাংলার এই বানান ব্যাপারে আমার মতো পথহারাদের জন্যে বিদ্যাবিধানের কর্তৃপক্ষ পাকা রাস্তা বেঁধে দেবেন। এ সম্বন্ধে আর তাঁরা উদাসীন থাকতে পারেন না যেহেতু বিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তকে প্রাকৃত বাংলার প্রবেশ তাঁরা নিষেধ করতে পারবেন না। প্রশ্নপত্রের উত্তরে পরীক্ষার্থীরা প্রাকৃত বাংলা অবলম্বন করতে পারে

---

[১] মাসিক-সাহিত্য-সমালোচনা, বঙ্গদর্শন, আষাঢ় ১৩০৮, পৃ ১৪৩

এমন অধিকার তাঁরা দিয়েছেন। ভিন্ন ভিন্ন পরীক্ষক নিজেদের বিশেষ রুচি ও অভ্যাস-অনুসারে ছাত্রদের বানান প্রভৃতির যদি বিচার করেন তবে পরীক্ষার্থীদের প্রতি গুরুতর অবিচারের আশঙ্কা আছে— নির্বিচারে যথেচ্ছাচারের প্রশ্রয় দেওয়াও চলবে না।

এই গুরুতর বিষয় প্রসঙ্গে বিস্তারিত আলোচনার উপযোগী আমার শরীরের অবস্থা নয়। সংক্ষেপে আমার বক্তব্যের আভাসমাত্র দিলেম।[১]

২৯ সেপ্টেম্বর ১৯৩৫

৫

প্রাকৃত বাংলার বানান সম্বন্ধে আজ পর্যন্ত কোনো চরম অভ্যাসে আসতে পারি নি। তাড়াতাড়িতে অমনোযোগ তার একটি কারণ। তা ছাড়া বই ছাপাবার সময় প্রুফ দেখার সম্যক ভার নিজে নেবার মতো ধৈর্য বা শক্তি বা সময় নেই— কাজেই আমার ছাপা বইগুলিতে বানান সম্বন্ধে সুনির্দিষ্টতার পরিচয় পাওয়া যায় না। এই কারণেই বিশ্ববিদ্যালয়ের সাহায্য দাবি করেছিলুম। তাঁরা দশে মিলে যেটা স্থির করে দেবেন সেটা নিয়ে আর দ্বিধা করব না।[২]

১ ফেব্রুয়ারি ১৯৩৬

৬

আমাদের সাহিত্যে প্রাকৃত বাংলার প্রচলন প্রতিদিন বেড়ে উঠেছে। সেই বাংলায় বানান সম্বন্ধে কোনো আইন নেই, তাই স্বেচ্ছাচারের অরাজকতা চলেছে। যারা হবেন প্রথম আইনকর্তা তাঁদের বিধান অনিন্দনীয় হতেই পারে না, তবু উচ্ছৃঙ্খলতার বাঁধ বেঁধে দেবার কাজ তো শুরু করতেই হবে। সেইজন্যে বিশ্ববিদ্যালয়েরই শরণ নিতে হল। কালক্রমে তাঁদের নিয়মের অনেক পরিবর্তন ঘটবে সন্দেহ নেই, কিন্তু সেই পরিবর্তনের গতি একটা সুচিন্তিত পথ অনুসরণ যদি না করে তা হলে অব্যবস্থার অন্ত থাকবে না। নদীর তট বাঁধা আছে তবু তার বাঁক পরিবর্তন হয়, কিন্তু তট না থাকলে তার নদীত্বই ঘুচবে, সে হবে জলা।

আমার প্রদেশের নাম আমি লিখি বাংলা। হসন্ত ঙ-র চিহ্ন ং। যেমন হসন্ত ত-য়ের চিহ্ন ৎ। "বাঙ্গলা" মুখে বলি নে লিখতেও চাই নে। যুক্তবর্ণ ঙ্গ-এ হসন্ত চিহ্ন নিরর্থক। ঙ-র সঙ্গে হসন্ত চিহ্ন দেওয়া চলে, কিন্তু দরকার কী, হসন্ত চিহ্ন যুক্ত ঙ-র স্বকীয়রূপ তো বর্ণমালায় আছে— সেই অনুস্বরকে আমি মেনে নিয়ে থাকি।[৩]

৬ জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৩

৭

শব্দতত্ত্ব গ্রন্থে লেখায় চিহ্ন বর্জন সম্বন্ধে আমার মত প্রকাশ করেছি। নিত্য-ব্যবহারে আমার এ মত চলবে না তা জানি। এটা একটা আলোচনার বিষয় মাত্র। চিহ্নগুলোর প্রতি অতিমাত্র নির্ভরপরতা

---

১. চারুচন্দ্র ভট্টাচার্যকে লিখিত পত্র

২. দিলীপকুমার রায়কে লিখিত পত্র

৩. কানাইলাল গঙ্গোপাধ্যায়কে লিখিত পত্র

অভ্যস্ত হলে ভাষায় আলস্যজনিত দুর্বলতা প্রবেশ করে এই আমার বিশ্বাস। চিহ্নসংকেতের সহায়তা পাওয়া যাবে না এ কথা যদি জানি তবে ভাষার আপন সংকেতের দ্বারাতেই তাকে প্রকাশবান করতে সতর্ক হতে পারি ; অন্তত আজকাল ইংরেজির অনুকরণে, লিখিত ভাষাগত ইঙ্গিতের জন্যে চিহ্নসংকেতের অকারণ বাড়াবাড়ি সংযত হতে পারে। এই চিহ্নের প্রশ্রয় পেয়ে পাঠসম্বন্ধে পাঠকদেরও মন পঙ্গু হয় প্রকাশসম্বন্ধে লেখকদেরও তদ্রূপ। কোনো কোনো মানুষ আছে কথাবার্তায় যাদের অঙ্গভঙ্গি অত্যন্ত বেশি। সেটাকে মুদ্রাদোষ বলা যায়। বোঝা যায় লোকটার মধ্যে সহজ ভাবপ্রকাশের ভাষাদৈন্য আছে। কিন্তু কথার সঙ্গে ভঙ্গি একেবারে চলবে না এ কথা বলা অসংগত তেমনি লেখার সঙ্গে চিহ্ন সর্বত্রই বর্জনীয় এমন অনুশাসনও লোকে মানবে না।[১]

৩।৩।৩৭

৮

প্রাকৃত বাংলার বানান সম্বন্ধে আমার একটা বক্তব্য আছে। ইংরেজি ভাষার লিখিত শব্দগুলি তাদের ইতিহাসের খোলস ছাড়তে চায় না— তাতে করে তাদের ধ্বনিরূপ আচ্ছন্ন। কিন্তু ভারতবর্ষে প্রাকৃত এ পথের অনুসরণ করে নি। তার বানানের মধ্যে অবঞ্চনা আছে, সে যে প্রাকৃত, এ পরিচয় সে গোপন করে নি। বাংলা ভাষার ষত্বণত্বের বৈচিত্র্য ধ্বনির মধ্যে নেই বললেই হয়। সেই কারণে প্রাচীন পণ্ডিতেরাও পুঁথিতে লোকভাষা লেখবার সময় দীর্ঘহ্রস্ব ও ষত্বণত্বকে সরল করে এনেছিলেন। তাঁদের ভয় ছিল না পাছে সেজন্য তাঁদের কেউ মূর্খ অপবাদ দেয়। আজ আমরা ভারতের রীতি ত্যাগ করে বিদেশীর অনুকরণে বানানের বিড়ম্বনায় শিশুদের চিত্তকে অনাবশ্যক ভারগ্রস্ত করতে বসেছি।

ভেবে দেখলে বাংলা ভাষায় সংস্কৃত শব্দ একেবারেই নেই। যাকে তৎসম শব্দ বলি উচ্চারণের বিকারে তাও অপভ্রংশ পদবীতে পড়ে। সংস্কৃত নিয়মে লিখি সত্য কিন্তু বলি শোত্তো। মন শব্দ যে কেবল বিসর্গ বিসর্জন করেছে তা নয় তার ধ্বনিরূপ বদলে সে হয়েছে মোন্। এই যুক্তি অনুসারে বাংলা বানানকে আগাগোড়া ধ্বনি-অনুসারী করব এমন সাহস আমার নেই— যদি বাংলায় কেমাল পাশার পদ পেতুম তা হলে হয়তো এই কীর্তি করতুম— এবং সেই পুণ্যে ভাবীকালের অগণ্য শিশুদের কৃতজ্ঞতাভাজন হতুম। অন্তত তদ্ভব শব্দে যিনি সাহস দেখিয়ে ষত্বণত্ব ও দীর্ঘহ্রস্বের পণ্ডপাণ্ডিত্য ঘুচিয়ে শব্দের ধ্বনিস্বরূপকে শ্রদ্ধা করতে প্রবৃত্ত হবেন তাঁর আমি জয়জয়কার করব। যে পণ্ডিতমূর্খরা "গভর্ণমেন্ট" বানান প্রচার করতে লজ্জা পান নি তাঁদেরই প্রেতাত্মার দল আজও বাংলা বানানকে শাসন করছেন— এই প্রেতের বিভীষিকা ঘুচবে কবে? কান হোলো সজীব বানান, আর কাণ হোলো প্রেতের বানান এ কথা মানবেন তো? বানান সম্বন্ধে আমিও অপরাধ করি অতএব আমার নজীর কোনো হিসাবে প্রামাণ্য নয়।[২]

১১ ফেব্রুয়ারি ১৯৩১

---

[১] শ্যামাদাস লাহিড়ীকে লিখিত পত্র

[২] রাজশেখর বসুকে লিখিত পত্র

৯

নীচ শব্দ সংস্কৃত, তাহার অর্থ Mean। বাংলায় যে "নিচে" কথা আছে তাহা ক্রিয়ার বিশেষণ। সংস্কৃত ভাষায় নীচ শব্দের ক্রিয়ার বিশেষণ রূপ নাই। সংস্কৃতে নিম্নতা বুঝাইবার জন্য নীচ কথার প্রয়োগ আছে কিনা জানি না। হয়তো উচ্চ নীচ যুগ্মশব্দে এরূপ অর্থ চলিতে পারে— কিন্তু সে স্থলেও যথার্থত নীচ শব্দের তাৎপর্য Moral তাহা Physical নহে। অন্তত আমার সেই ধারণা। সংস্কৃতে নীচ ও নিম্ন দুই ভিন্নবর্গের শব্দ— উহাদিগকে একার্থক করা যায় না। এইজন্য বাংলায় নীচে বানান করিলে below না বুঝাইয়া to the mean বুঝানোই সংগত হয়। আমি সেইজন্য "নিচে" শব্দটিকে সম্পূর্ণ প্রাকৃত বাংলা বলিয়াই স্বীকার করিয়া থাকি। প্রাচীন প্রাকৃতে বানানে যে রীতি আছে আমার মতে তাহাই শুদ্ধরীতি ; ছদ্মবেশে মর্যাদাভিক্ষা অশ্রদ্ধেয়। প্রাচীন বাংলার পণ্ডিতেরাও সেই নীতি রক্ষা করিতেন, নব্য পণ্ডিতদের হাতে বাংলা আত্মবিস্মৃত হইয়াছে।

"পুঁথি" শব্দের চন্দ্রবিন্দুর লোপে পূর্ববঙ্গের প্রভাব দেখিতেছি, উহাতে আমার সম্মতি নাই। "লুকাচুরি" শব্দের বানান "লুকোচুরি" হওয়াই সংগত ; উহার স্বভাব নষ্ট করিয়া উহার মধ্যে কৃত্রিম ভদ্রভাব চালাইবার চেষ্টা সাধু নহে।[১]

৯ অক্টোবর ১৯৩৪

১০

বিশ্ববিদ্যালয়ের বানান-বিধির সম্বন্ধে দুটিমাত্র আপত্তি। কখনো কোনো আমারি তোমারি আজো প্রভৃতি শব্দে অন্তস্বর যুক্ত থাকিবে। দ্বিতীয়, ছোটো বড়ো কালো ভালো প্রভৃতি বিশেষণ পদের অন্তস্বর লোপ করা অবৈধ হবে বলে মনে করি।[২]

৪।৬।৩৭

১১

হইয়ো, করিয়োতে 'য়' লাগিয়ো। রানীতে ঈ। গয়লানী প্রভৃতি শব্দে আমি দীর্ঘ ঈ দিই নে তার কারণ এ প্রত্যয় সংস্কৃত প্রত্যয় নয়। এক হিসাবে প্রাকৃত বাংলায় স্ত্রীলিঙ্গের প্রত্যয় নেই। আমরা বিড়ালীও বলি নে বেড়ালিনীও বলি নে, কুকুরীও বাংলা নয়, কুকুরনীও নয়। বাঘিনী বলি, উটনী বলি নে। বাঘিনী সংস্কৃত ব্যাকরণ মতে শুদ্ধ নয়। বামনী বলি কিন্তু বদ্যিনী বলি নে, কায়েৎনী বলি। বস্তুত বাঘিনী ছাড়া কোনো জন্তু-শব্দের স্ত্রীলিঙ্গ বাংলায় দুর্লভ। পাঁঠী আছে, ভেড়ী বলে কিনা জানি নে ; হাঁস, কাক, পায়রা (মুরগী আছে) কোকিল দোয়েলে স্ত্রীলিঙ্গ প্রত্যয় বর্জিত। বাংলায় যদি সাধারণ কোনো প্রত্যয় থাকত তা হলে সর্বত্রই খাটত। এইজন্যে আমি বাংলা স্ত্রীজাতিসূচক কথাগুলিকে খাস বাংলা নিয়মেই ব্যবহার করতে চাই— খাস বাংলা হচ্ছে হ্রস্ব ই। সংস্কৃত ইন্‌প্রত্যয়ের যেখানে নকল করি সেখানেও আমার মন সায় দেয় না ; যেমন ইংরেজি,

---

[১] সুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য বেদান্তশাস্ত্রীকে লিখিত পত্র

[২] কিশোরীমোহন সাঁতরাকে লিখিত পত্র

ফারসি ইত্যাদি। তৎসম শব্দে দীর্ঘ ঈ দিতে আমরা বাধ্য— কিন্তু তদ্ভব শব্দে আমাদের স্বরাজ খাটবে না কেন?[১]

১৩।৬।৩৭

মক্তব-মাদ্রাসার বাংলা ভাষা

বৈশাখের [১৩৩৯] প্রবাসীতে মক্তব-মাদ্রাসার বাংলা ভাষা প্রবন্ধটি পড়ে দেখলুম। আমি মূল পুস্তক পড়ি নি, ধরে নিচ্ছি প্রবন্ধ-লেখক যথোচিত প্রমাণের উপর নির্ভর করেই লিখেছেন। সাম্প্রদায়িক বিবাদে মানুষ যে কতদূর ভয়ংকর হয়ে উঠতে পারে ভারতবর্ষে আজকাল প্রতিদিনই তার দৃষ্টান্ত দেখতে পাই, কিন্তু হাস্যকর হওয়াও যে অসম্ভব নয় তার দৃষ্টান্ত এই দেখা গেল। এটাও ভাবনার কথা হতে পারত, কিন্তু সুবিধা এই যে এরকম প্রহসন নিজেকেই নিজে বিদ্রূপ করে মারে।

ভাষা মাত্রের মধ্যে একটা প্রাণধর্ম আছে। তার সেই প্রাণের নিয়ম রক্ষা করে তবেই লেখকেরা তাকে নূতন নূতন পথে চালিত করতে পারে। এ কথা মনে করলে চলবে না যে, যেমন করে হোক জোড়াতাড়া দিয়ে তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বদল করা চলে। মনে করা যাক, বাংলাদেশটা মগের মুল্লুক এবং মগ রাজারা বাঙালি হিন্দু-মুসলমানের নাক-চোখের চেহারা কোনোমতে সহ্য করতে পারছে না, মনে করছে ওটাতে তাদের অমর্যাদা, তা হলে তাদের বাদশাহী বুদ্ধির কাছে একটিমাত্র অপেক্ষাকৃত সম্ভবপর পন্থা থাকতে পারে সে হচ্ছে মগ ছাড়া আর-সব জাতকে একেবারে লোপ করে দেওয়া। নতুবা বাঙালিকে বাঙালি রেখে তার নাক মুখ চোখে ছুঁচ সুতো ও শিরীষ আঠার যোগে মগের চেহারা আরোপ করবার চেষ্টা ঘোরতর দুর্দাম মগের বিচারেও সম্ভবপর বলে ঠেকতে পারে না।

এমন কোনো সভ্য ভাষা নেই যে নানা জাতির সঙ্গে নানা ব্যবহারের ফলে বিদেশী শব্দ কিছু-না-কিছু আত্মসাৎ করে নি। বহুকাল মুসলমানের সংস্রবে থাকাতে বাংলা ভাষাও অনেক পারসী শব্দ এবং কিছু কিছু আরবীও স্বভাবতই গ্রহণ করেছে। বস্তুত বাংলা ভাষা যে বাঙালি হিন্দু-মুসলমান উভয়েরই আপন তার স্বাভাবিক প্রমাণ ভাষার মধ্যে প্রচুর রয়েছে। যত বড়ো নিষ্ঠাবান হিন্দুই হোক-না কেন ঘোরতর রাগারাগির দিনেও প্রতিদিনের ব্যবহারে রাশি রাশি তৎসম ও তদ্ভব মুসলমানী শব্দ উচ্চারণ করতে তাদের কোনো সংকোচ বোধ হয় না। এমন-কি, সে-সকল শব্দের জায়গায় যদি সংস্কৃত প্রতিশব্দ চালানো যায় তা হলে পণ্ডিতী করা হচ্ছে বলে লোকে হাসবে। বাজারে এসে সহস্র টাকার নোট ভাঙানোর চেয়ে হাজার টাকার নোট ভাঙানো সহজ। সমনজারি শব্দের আর্ধেক অংশ ইংরেজি, অর্ধেক পারসী, এর জায়গায় 'আহ্বান প্রচার' শব্দ সাধু সাহিত্যে ব্যবহার করবার মতো সাহস কোনো বিদ্যাভূষণেরও হবে না। কেননা, নেহাত বেয়াড়া স্বভাবের না হলে মানুষ মার খেতে তত ভয় করে না যেমন ভয় করে লোক হাসাতে। 'মেজাজটা খারাপ হয়ে আছে', এ কথা সহজেই মুখ দিয়ে বেরোয় কিন্তু যাবনিক সংসর্গ বাঁচিয়ে যদি বলতে চাই মনের গতিকটা বিকল কিংবা বিমর্ষ বা অবসাদগ্রস্ত হয়ে আছে তবে আত্মীয়দের মনে নিশ্চিত খটকা লাগবে। যদি দেখা যায় অত্যন্ত নির্জলা খাঁটি পণ্ডিতমশায় ছেলেটার ষত্ব-ণত্ব শুদ্ধ করবার

---

[১] কিশোরীমোহন সাঁতরাকে লিখিত পত্র

উর্দু ভাষায় পারসী ও আরবী শব্দের সঙ্গে হিন্দি ও সংস্কৃত শব্দের মিশল চলেছে— কিন্তু স্বভাবতই তার একটা সীমা আছে। ঘোরতর পণ্ডিতও উর্দু লেখার কালে উর্দুই লেখেন, তার মধ্যে যদি তিনি 'অপ্রতিহত প্রভাবে' শব্দ চালাতে চান তা হলে সেটা হাস্যকর বা শোকাবহ হবেই।

আমাদের গণশ্রেণীর মধ্যে য়ুরেশীয়েরাও গণ্য। তাঁদের মধ্যে বাংলা লেখায় যদি কেউ প্রবৃত্ত হন এবং বাবা মা শব্দের বদলে পাপা মামা ব্যবহার করতে চান এবং তর্ক করেন ঘরে আমরা ঐ কথাই ব্যবহার করে থাকি তবে সে তর্ককে কি যুক্তিসংগত বলব? অথচ তাঁদেরকেও অর্থাৎ বাঙালি য়ুরেশীয়কে আমরা দূরে রাখা অন্যায় বোধ করি। খুশি হব তাঁরা বাংলা ব্যবহার করলে কিন্তু সেটা যদি য়ুরেশীয় বাংলা হয়ে ওঠে তা হলে ধিক্‌কার দেব নিজের ভাগ্যকে। আমাদের ঝগড়া আজ যদি ভাষার মধ্যে প্রবেশ করে সাহিত্যে উচ্ছৃঙ্খলতার কারণ হয়ে ওঠে তবে এর অভিসম্পাত আমাদের সভ্যতার মূলে আঘাত করবে।[১]

১১ চৈত্র ১৩৬০

২

আজকাল সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধিকে আশ্রয় করে ভাষা ও সাহিত্যকে বিকৃত করবার যে চেষ্টা চলছে তার মতো বর্বরতা আর হতে পারে না। এ যেন ভাইয়ের উপর রাগ করে পারিবারিক বাস্তুঘরে আগুন লাগানো। সমাজের ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে নিষ্ঠুর বিরুদ্ধতা অন্যান্য দেশের ইতিহাসে দেখেছি কিন্তু আজ পর্যন্ত নিজের দেশ-ভাষাকে পীড়িত করবার উদ্যোগ কোনো সভ্য দেশে দেখা যায় নি। এমনতর নির্মম অন্ধতা বাংলা প্রদেশেই এত বড়ো স্পর্ধার সঙ্গে আজ দেখা দিয়েছে বলে আমি লজ্জা বোধ করি। বাংলাদেশের মুসলমানকে যদি বাঙালি বলে গণ্য না করতুম তবে সাহিত্যিক এই অদ্ভুত কদাচার সম্বন্ধে তাঁদের কঠিন নিন্দা ঘোষণা করে সান্ত্বনা পেতে পারতুম। কিন্তু জগতের মধ্যে একমাত্র বাংলাদেশ-প্রসূত এই মূঢ়তার গ্লানি নিজে স্বীকার না ক'রে উপায় কী? বেলজিয়মে জনসাধারণের মধ্য এক দল বলে ফ্লেমিশ, অন্য দল ফরাসি ; কিন্তু ফ্লেমিশভাষী লেখক সাহিত্যে যখন ফরাসি ভাষা ব্যবহার করে, তখন ফ্লেমিশ শব্দ মিশিয়ে ফরাসি ভাষাকে আবিল করে তোলবার কথা কল্পনাও করে না। অথচ সেখানকার দুই সমাজের মধ্যে বিপক্ষতা যথেষ্ট আছে। উত্তর-পশ্চিমে, সিন্ধু ও পঞ্জাব প্রদেশের হিন্দু-মুসলমানে সদ্ভাব নেই। সে-সকল প্রদেশে অনেক হিন্দু উর্দু ব্যবহার করে থাকেন, তাঁরা আড়াআড়ি করে উর্দুভাষায় সংস্কৃত শব্দ অসংগতভাবে মিশল করতে থাকবেন, তাঁদের কাছ থেকে এমনতর প্রমত্ততা প্রত্যাশা করতে পারি নে। এ রকম অদ্ভুত আচরণ কেবলই কি ঘটতে পারবে বিশ্বজগতের মধ্যে একমাত্র বাংলা দেশে? আমাদের রক্তে এই মোহ মিশ্রিত হতে পারল কোথা থেকে? হতভাগ্য এই দেশ, যেখানে ভ্রাতৃবিদ্রোহ দেশবিদ্রোহে পরিণত হয়ে সর্বসাধারণের সম্পদকে নষ্ট করতে কুণ্ঠিত হয় না। নিজের সুবুদ্ধিকে কলঙ্কিত করার মধ্যে যে আত্মাবমাননা আছে দুর্দিনে সে কথাও মানুষ যখন ভোলে তখন সাংঘাতিক দুর্গতি থেকে কে বাঁচাবে?[২]

১৭ বৈশাখ ১৩৪১

---

[১] এম. এ. আজমকে লিখিত পত্র

[২] আলতাফ চৌধুরীকে লিখিত পত্র

৩

ভাষাব্যবহার সম্বন্ধে আপনি ঠিক কথাই বলেছেন। আচারের পার্থক্য ও মনস্তত্ত্বের বিশেষত্ব অনুবর্তন না করলে ভাষার সার্থকতাই থাকে না। তথাপি ভাষার নমনীয়তার একটা সীমা আছে। ভাষার যেটা মূল স্বভাব তার অত্যন্ত প্রতিকূলতা করলে ভাব প্রকাশের বাহনকে অকর্মণ্য করে ফেলা হয়। প্রয়োজনের তাগিদে ভাষা বহুকাল থেকে বিস্তর নতুন কথার আমদানি করে এসেছে। বাংলা ভাষায় পারসী আরবী শব্দের সংখ্যা কম নয় কিন্তু তারা সহজেই স্থান পেয়েছে। প্রতিদিন একটা দুটো করে ইংরেজি শব্দও আমাদের ব্যবহারের মধ্যে প্রবেশ করছে। ভাষার মূল প্রকৃতির মধ্যে একটা বিধান আছে যার দ্বারা নূতন শব্দের যাচাই হতে থাকে, গায়ের জোরে এই বিধান না মানলে জারজ শব্দ কিছুতেই জাতে ওঠে না। ইংরেজি ভাষার দিকে তাকিয়ে দেখলে আমার কথার সত্যতা বুঝতে পারবেন। ওয়েল্‌স আইরিশ স্কচ ভাষা ইংরেজি ভাষার ঘনিষ্ঠ প্রতিবেশী, ব্রিটেনের ঐ-সকল উপজাতিরা আপন আত্মীয়মহলে ঐ-সকল উপভাষা থেকে শব্দ গ্রহণ করে স্বভাবতই ব্যবহার করে থাকেন কিন্তু যে সাধারণ ইংরেজি ভাষা তাঁদের সাহিত্যের ভাষা ঐ শব্দগুলি তার আসরে জবরদস্তি করতে পারে না। এইজন্যেই ঐ সাধারণ ভাষা আপনি নিত্য আদর্শ রক্ষা করে চলতে পেরেছে। নইলে ব্যক্তিগত খেয়াল অনুসারে নিয়ত তার বিকার ঘটত। খুনখারাবি শব্দটা ভাষা সহজেই মেনে নিয়েছে, আমরা তাকে যদি না মানি তবে তাকে বলব গোঁড়ামি। কিন্তু রক্ত অর্থে খুন শব্দকে ভাষা স্বীকার করে নি, কোনো বিশেষ পরিবারে বা সম্প্রদায়ে ঐ অর্থই অভ্যস্ত হতে পারে তবু সাধারণ বাংলা ভাষায় ঐ অর্থ চালাতে গেলে ভাষা বিমুখ হবে। শক্তিমান মুসলমান লেখকেরা বাংলা সাহিত্যে মুসলমান জীবনযাত্রার বর্ণনা যথেষ্ট পরিমাণে করেন নি, এ অভাব সম্প্রদায়-নির্বিশেষে সমস্ত সাহিত্যের অভাব। এই জীবনযাত্রার যথোচিত পরিচয় আমাদের পক্ষে অত্যাবশ্যক। এই পরিচয় দেবার উপলক্ষে মুসলমান সমাজের নিত্যব্যবহৃত শব্দ যদি ভাষায় স্বতই প্রবেশলাভ করে তবে তাতে সাহিত্যের ক্ষতি হবে না, বরং বলবৃদ্ধি হবে, বাংলা ভাষার অভিব্যক্তির ইতিহাসে তার দৃষ্টান্ত আছে...।[১]

৮।৯।৪০

---

[১] আবুল ফজলকে লিখিত পত্র

সংযোজন

বাংলাভাষা ও বাঙালি চরিত্র : ১

অনেক সময় দেখা যায় সংস্কৃত শব্দ বাংলায় রূপান্তরিত হয়ে এক প্রকার বিকৃত ভাব প্রকাশ করে। কেমন একরকম ইতর বর্বর আকার ধারণ করে। 'ঘৃণা' শব্দের মধ্যে একটা মানসিক ভাব আছে। Aversion, indignation, contempt প্রভৃতি ইংরাজি শব্দ বিভিন্ন স্থল অনুসারে 'ঘৃণা'র প্রতিশব্দ স্বরূপে ব্যবহৃত হইতে পারে। কিন্তু 'ঘেন্না' বললেই নাকের কাছে একটা দুর্গন্ধ, চোখের সামনে একটা বীভৎস দৃশ্য, গায়ের কাছাকাছি একটা মলিন অস্পৃশ্য বস্তু কল্পনায় উদিত হয়। সংস্কৃত 'প্রীতি' শব্দের মধ্যে একটা বিমল উদার মানসিক ভাব নিহিত আছে। কিন্তু বাংলা 'পিরিতি' শব্দের মধ্যে সেই বিশুদ্ধ ভাবটুকু নাই। বাংলায় 'স্বামী' 'স্ত্রী'র সাধারণ প্রচলিত প্রতিশব্দ ভদ্রসমাজে উচ্চারণ করিতে লজ্জা বোধ হয়। 'ভর্তা' এবং তাহার বাংলা রূপান্তর তুলনা করিয়া দেখিলেই এ কথা স্পষ্ট হইবে। আমার বোধ হয় সংস্কৃত ভাষায় 'লজ্জা' বলিলে যতটা ভাব প্রকাশ করে, বাংলায় 'লজ্জা' ততটা করে না। বাংলায় 'লজ্জা' এক প্রকার প্রথাগত বাহ্য লজ্জা, তাহা modesty নহে। তাহা শ্রী নহে। লজ্জার সহিত শ্রীর সহিত একটা যোগ আছে, বাংলা ভাষায় তাহা নাই। সৌন্দর্যের প্রতি স্বাভাবিক লক্ষ্য থাকিলে আচারে ব্যবহারে, ভাবভঙ্গিতে ভাষায় কণ্ঠস্বরে সাজসজ্জায় একটি সামঞ্জস্যপূর্ণ সংযম আসিয়া পড়ে। বাংলায় লজ্জা বলিতে যাহা বুঝায় তাহা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, তাহাতে বরঞ্চ আচার-ব্যবহারের সামঞ্জস্য নষ্ট করে, একটা বাড়াবাড়ি আসিয়া সৌন্দর্যের ব্যাঘাত করে। তাহা শরীর-মনের সুশোভন সংযম নহে, তাহার অনেকটা কেবলমাত্র শারীরিক অভিভূতি।

গল্প আছে— বিদ্যাসাগর মহাশয় বলেন উলোয় শিব গড়িতে বাঁদর হইয়া দাঁড়ায়, তেমনি বাংলার মাটির বাঁদর গড়িবার দিকে একটু বিশেষ প্রবণতা আছে। লক্ষ্য শিব এবং পরিণাম বাঁদর ইহা অনেক স্থলেই দেখা যায়। উদার প্রেমের ধর্ম বৈষ্ণব ধর্ম বাংলা দেশে দেখিতে দেখিতে কেমন হইয়া দাঁড়াইল। একটা বৃহৎ ভাবকে জন্ম দিতে যেমন প্রবল মানসিক বীর্যের আবশ্যক, তাহাকে পোষণ করিয়া রাখিতেও সেইরূপ বীর্যের আবশ্যক। আলস্য এবং জড়তা যেখানে জাতীয় স্বভাব, সেখানে বৃহৎ ভাব দেখিতে দেখিতে বিকৃত হইয়া যায়। তাহাকে বুঝিবার, তাহাকে রক্ষা করিবার এবং তাহার মধ্যে প্রাণসঞ্চার করিয়া দিবার উদ্যম নাই।

আমাদের দেশে সকল জিনিসই যেমন এক প্রকার slang হইয়া আসে। আমার তাই এক-একবার ভয় হয় পাছে ইংরাজদের বড়ো ভাব বড়ো কথা আমাদের দেশে ক্রমে সেইরূপ অনার্য ভাব ধারণ করে। দেখিয়াছি বাংলায় অনেকগুলি গানের সুর কেমন দেখিতে দেখিতে ইতর হইয়া যায়। আমার বোধ হয় সভ্যদেশে যে যে সুর সর্বসাধারণের মধ্যে প্রচলিত, তাহার মধ্যে একটা গভীরতা আছে, তাহা তাহাদের national air, তাহাতে তাহাদের জাতীয় আবেগ পরিপূর্ণভাবে ব্যক্ত হয়। যথা Home Sweet Home, Auld lang Syne—বাংলা দেশে সেরূপ সুর কোথায়? এখানকার সাধারণ-প্রচলিত সুরের মধ্যে গাম্ভীর্য নাই, স্থায়িত্ব নাই, ব্যাপকতা নাই। সেইজন্য তাহার কোনোটাকেই national air বলা যায় না। হিন্দুস্থানীতে যে-সকল খাম্বাজ ঝিঁঝিট কাফি প্রভৃতি রাগিণীতে শোভন ভদ্রভাব লক্ষিত হয়, বাংলায় সেই রাগিণীই কেমন কুৎসিত আকার ধারণ করিয়া 'বড় লজ্জা করে পাড়ায় যেতে' 'কেন বল সখি বিধুমুখী' 'একে অবলা সরলা' প্রভৃতি গানে পরিণত হইয়াছে।

কেবল তাহাই নহে, আমাদের এক-একবার মনে হয় হিন্দুস্থানী এবং বাংলার উচ্চারণের মধ্যে এই ভদ্র এবং বর্বর ভাবের প্রভেদ লক্ষিত হয়। হিন্দুস্থানী গান বাংলায় ভাজিতে গেলেই তাহা

ধরা পড়ে। সুর তাল অবিকল রক্ষিত হইয়াও অনেক সময় বাংলা গান কেমন 'রোথো' রকম শুনিতে হয়। হিন্দুস্থানীর polite 'আ' উচ্চারণ বাংলায় vulgar 'অ' উচ্চারণে পরিণত হইয়া এই ভাবান্তর সংঘটন করে। 'আ' উচ্চারণের মধ্যে একটি বেশ নির্লিপ্ত ভদ্র suggestive ভাব আছে, আর 'অ' উচ্চারণ নিতান্ত গায়েঁযা সংকীর্ণ এবং দরিদ্র। কাশীর সংস্কৃত উচ্চারণ শুনিলে এই প্রভেদ সহজেই উপলব্ধি হয়।

উপরের প্যারাগ্রাফে এক স্থলে commonplace শব্দ বাংলায় ব্যক্ত করিতে গিয়া 'রোথো' শব্দ ব্যবহার করিয়াছি। কিন্তু উক্ত শব্দ ব্যবহার করিতে কেমন কুণ্ঠিত বোধ করিতেছিলাম। সকল ভাষাতেই গ্রাম্য ইতর শব্দ আছে। কিন্তু দেখিয়াছি বাংলায় বিশেষ ভাবপ্রকাশক শব্দমাত্রই গ্রাম্য। তাহাতে ভাব ছবির মতো ব্যক্ত করে বটে কিন্তু সেইসঙ্গে আরো একটা কী করে যাহা সংকোচজনক। Smile শব্দ বাংলায় ব্যক্ত করিতে হইলে হয় 'মুচ্‌কে হাসি' নয় 'ঈষদ্ধাস্য' বলিতে হইবে। কিন্তু 'মুচ্‌কে হাসি' সাধারণত মনের মধ্যে যে ছবি আনয়ন করে তাহা বিশুদ্ধ smile নহে, ঈষদ্ধাস্য কোনো ছবি আনয়ন করে কি না সন্দেহ। Peep শব্দকে বাংলায় 'উঁকিমারা' বলিতে হয়। Creep শব্দকে 'গুঁড়িমারা' বলিতে হয়। কিন্তু 'উঁকিমারা' 'গুঁড়িমারা' শব্দ ভাবপ্রকাশক হইলেও সর্বত্র ব্যবহারযোগ্য নহে। কারণ উক্ত শব্দগুলিতে আমাদের মনে এমন-সকল ছবি আনয়ন করে যাহার সহিত কোনো মহৎ বর্ণনার যোগসাধন করিতে পারা যায় না।

হিন্দুস্থানী বা মুসলমানদের মধ্যে একটা আদব-কায়দা আছে। একজন হিন্দুস্থানী বা মুসলমান ভৃত্য দিনের মধ্যে প্রভুর সহিত প্রথম সাক্ষাৎ হইবা মাত্রই যে সেলাম অথবা নমস্কার করে তাহার কারণ এমন নহে যে, তাহাদের মনে বাঙালি ভৃত্যের অপেক্ষা অধিক দাস্যভাব আছে, কিন্তু তাহার কারণ এই যে, সভ্যসমাজের সহস্রবিধ সম্বন্ধের ইতিকর্তব্যতা বিষয়ে তাহারা নিরলস ও সতর্ক। প্রভুর নিকটে তাহারা পরিচ্ছন্ন পরিপাটি থাকিবে, মাথায় পাগ্‌ড়ি পরিবে, বিনীত ভাব রক্ষা করিবে। স্বাভাবিক ভাবে থাকা অপেক্ষা ইহাতে অনেক আয়াস ও শিক্ষা আবশ্যক। আমরা অনেক সময়ে যাহাকে স্বাধীন ভাব মনে করি তাহা অশিক্ষিত অসভ্য ভাব। অনেক সময়ে আমাদের এই অশিক্ষিত ও বর্বর ভাব দেখিয়াই ইংরাজেরা আমাদের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়, অথচ আমরা মনে মনে গর্ব করি যেন প্রভুকে যথাযোগ্য সম্মান না দেখাইয়া আমরা ভারি একটা কেল্লা ফতে করিয়া আসিলাম। এই অশিক্ষা ও অনাচারবশত আমাদের দৈনিক ভাষা ও কাজের মধ্যে একটি সুমার্জিত সুষমা একটি শ্রী লক্ষিত হয় না। আমরা কেমন যেন 'আট-পৌরে' 'গায়েপড়া' 'ফেলাছড়া' 'ঢিলেঢালা' 'নড়বোড়ে' রকমের জাত, পৃথিবীর কাজেও লাগি না, পৃথিবীর শোভাও সাধন করি না।

২২ কার্তিক ১৮৮৮

২

বাংলা ভাষায় কবিতা রচনা করিতে গিয়া একটি প্রধান ব্যাঘাত এই দেখিতে পাই, বাংলা ভাষায় ছবি আঁকা শব্দ অতি অল্প। কেবল উপ্‌রি-উপ্‌রি মোটামুটি একটা বর্ণনা করা যায় মাত্র, কিন্তু একটা জাজ্বল্যমান মূর্তি ফুটাইয়া তুলা যায় না। লেখকের ক্ষমতার অভাব তাহার একমাত্র কারণ নহে। দৃষ্টান্ত— এক 'চলা' শব্দ ইংরাজিতে কত রকমে ব্যক্ত করা যায়— walk, step, move, creep, sweep, totter, waddle, এমন আরো অনেক শব্দ আছে। উহারা প্রত্যেকে বিভিন্ন ছবি রচনা করে, কেবলমাত্র ঘটনার উল্লেখ করে না। ইহা ছাড়া গঠন-বৈচিত্র্য, বর্ণ-বৈচিত্র্য সম্বন্ধে ইংরাজিতে বিচিত্র শব্দ আছে। আমরা কখনো প্রকৃতিকে স্পষ্ট করিয়া লক্ষ্য করি নাই। আমাদের চিত্রশিল্প নাই ; আমাদের চিত্রে এবং কবিতায় প্রকৃতির অতি-বর্ণনাই অধিক। আমরা যেন চক্ষে কিছুই দেখি না— অলস কল্পনার মধ্যে প্রকৃতি বিকৃতাকার ধারণ করিয়া উদিত হয়। আমাদের শরীর-বর্ণনা তাহার দৃষ্টান্তস্থল। মানবদেহের এরূপ সামঞ্জস্যহীন অনৈসর্গিক বর্ণনা আর কোথাও দৃষ্ট হয় না। আমরা মোটমুটি একটা তুলনার দ্রব্য পাইলেই অমনি তাহার সাহায্যে বর্ণনা করিতে চেষ্টা করি। পরিষ্কার ছবি ব্যক্ত করিবার ঔদাসীন্য থাকাতে আমাদের ছবির ভাষা নাই। বিরহিনীর বিরহাবস্থা বর্ণনায় আমাদের অতি-কল্পনা ও স্বভাবের প্রতি মনোযোগহীনতা প্রকাশ পায়। আমরা আলস্যবশত চোখে যেটুকু কম দেখি, কোণে বসিয়া মনে মনে একটা চার্ট গড়িয়া সেটুকু পূরণ করিয়া লই। আমরা অল্পস্বল্প দেখি অথচ খুব বিস্তৃত করিয়া generalize করি। তাড়াতাড়ি একটা প্রকাণ্ড system বাঁধিয়া লই, কিন্তু অগাধ কল্পনার ভাণ্ডার হইতে তাহার সরঞ্জাম সঞ্চয় করি। আমাদের অপরিমিত কল্পনা আমাদের নিরীক্ষণ-শক্তির আগে আগে ছুটিয়া চলে, একটু দেখিবামাত্র তাহার কল্পনা মস্ত হইয়া উঠে। এইজন্য জগৎ স্পষ্ট দেখা হইল না— অথচ সকল বিষয়ে মস্ত মস্ত তন্ত্র বাঁধা হইল। পৃথিবীর একটুখানি দেখিয়াই অমনি সমস্ত পৃথিবীর একটি বিস্তৃত ভূগোল বিবরণ রচনা করা হইয়াছে, এমন আরো দৃষ্টান্ত আছে।

৬। ১১। ৮৮

জাতীয় সাহিত্য

আমরা 'বাংলা জাতীয় সাহিত্য' প্রবন্ধের নামকরণে ইংরাজি 'ন্যাশনাল' শব্দের স্থলে 'জাতীয়' শব্দ ব্যবহার করিয়াছি বলিয়া 'সাহিত্য'-সম্পাদক মহাশয় আমাদের প্রতি কিঞ্চিৎ শ্লেষকটাক্ষপাত করিয়াছেন।

প্রথমত, অনুবাদটি আমাদের কৃত নহে; এই শব্দ বহুকাল হইতে বাংলা সাহিত্যে ন্যাশনাল-শব্দের প্রতিশব্দরূপে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। দ্বিতীয়ত, ভাষার পরিণতি সহকারে স্বাভাবিক নিয়মে অনেকগুলি শব্দের অর্থ বিস্তৃতি লাভ করে। 'সাহিত্য' শব্দটি তাহার উদাহরণস্থল। সাহিত্য-সম্পাদক মহাশয়ও 'সাহিত্য' শব্দটিকে ইংরাজি 'লিটারেচর' অর্থে প্রয়োগ করিয়া থাকেন। সম্পাদক মহাশয় সংস্কৃতজ্ঞ, ইহা তাঁহার অবিদিত নাই যে. 'লিটারেচর' শব্দের অর্থ যতদূর ব্যাপক, সাহিত্য শব্দের অর্থ ততদূর পৌঁছে না। শব্দকল্পদ্রুম অভিধানে 'সাহিত্য' শব্দের অর্থ এইরূপ নির্দিষ্ট হইয়াছে 'মনুষ্যকৃতশ্লোকময়গ্রন্থবিশেষঃ। স তু ভট্টিরঘুকুমারসম্ভবমাঘভারবিমেঘদূতবিদগ্ধমুখমণ্ডনশান্তিশতকপ্রভৃতয়ঃ।' এমন-কি, রামায়ণ মহাভারতও সাহিত্যের মধ্যে গণ্য হয় নাই, তাহা ইতিহাসরূপে খ্যাত ছিল। এইজন্য মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় 'সাহিত্য' শব্দের পরিবর্তে 'বাঙ্ময়' শব্দ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। রঘুবংশের তৃতীয় সর্গে ২৭শ শ্লোকে আছে—

লিপের্যথাবদ্‌গ্রহণেন বাঙ্ময়ং
নদীমুখেনেব সমুদ্রমাবিশৎ।

অর্থাৎ রঘু লিপিরূপ নদীপথ দিয়া বাঙ্ময়রূপ সমুদ্রে প্রবেশ করিলেন।

'জাতি' শব্দ এবং 'নেশন্' শব্দ উভয়েরই মূল ধাতুগত অর্থ এক। জন্মগত ঐক্য নির্দেশ করিবার জন্য উভয় শব্দের উৎপত্তি। আমরা ব্রাহ্মণ প্রভৃতি বর্ণকে জন্মগত ঐক্যবশত জাতি বলি, আবার বাঙালি প্রভৃতি প্রজাবর্গকেও সেই কারণেই জাতি বলিয়া থাকি। জাতি শব্দের শেষোক্ত প্রয়োগের স্থলে ইংরাজিতে 'নেশন্' শব্দ ব্যবহৃত হয়। যথা, বাঙালি জাতি = বেঙ্গলি নেশন্। এরূপ স্থলে 'ন্যাশনাল' শব্দের প্রতিশব্দরূপে 'জাতীয়' শব্দ ব্যবহার করাতে বিশেষ দোষের কারণ দেখা যায় না। আমরাও তাহাই করিয়াছি। কিন্তু সম্পাদক মহাশয় অকস্মাৎ অকারণে অনুমান করিয়া লইয়াছেন যে আমরা 'জাতীয় সাহিত্য' শব্দে 'ভর্ন্যাক্যুলর লিট্‌রেচর' শব্দের অপূর্ব তর্জমা করিয়াছি! বিনীতভাবে জানাইতেছি আমরা এমন কাজ করি নাই। সাহিত্য যে কেবলমাত্র ব্যক্তিগত আমোদ বা শিক্ষাসাধক নহে, তাহা যে সমস্ত জাতির 'জাতীয়' বন্ধন দৃঢ়তর করে, বাংলা সাহিত্য, যে, বাঙালি জাতির ভূত ভবিষ্যৎকে এক সজীব সচেতন নাড়ি-বন্ধনে বাঁধিয়ে দিয়া তাহাকে বৃহত্তর এবং ঘনিষ্ঠতর করিয়া তুলিবে— আমাদের প্রবন্ধে এই প্রসঙ্গের বিশেষরূপ অবতারণা ছিল বলিয়া, আমরা বাংলা সাহিত্যকে, ব্যক্তিগত রসসম্ভোগের হিসাবে নহে, পরন্তু জাতীয় উপযোগিতার হিসাবে আলোচনা করিয়াছিলাম বলিয়াই তাহাকে বিশেষ করিয়া জাতীয় সাহিত্য আখ্যা দিয়াছিলাম। সভাস্থলে বক্তৃতা পাঠ করিতে হইলে শ্রোতৃসাধারণের দ্রুত অবগতির জন্য বিষয়টিকে কিঞ্চিৎ বিস্তারিত করিয়া বলা আবশ্যক হইয়া পড়ে— আমরাও বক্তৃতার বিষয় যথোচিত বিস্তৃত করিয়া বলিয়া কেবল সম্পাদক মহাশয়ের নিন্দাভাজন হইলাম কিন্তু তথাপিও তিনি আমাদের বক্তব্য-বিষয়টিকে সম্যক্ গ্রহণ করিতে পারিলেন না ইহাতে আমাদের দ্বিগুণ দুঃখ রহিয়া গেল।

আষাঢ় ১৩০২

নামের পদবী

শ্রীযুক্ত সত্যভূষণ সেন বাঙালি মেয়ের পদবী প্রসঙ্গে আমাকে যে চিঠিখানি লিখেছেন[১] তার উত্তরে আমার যা বলবার আছে বলে নিই, যদিও ফলের আশা রাখি নে।

বাংলা দেশে সামাজিক ব্যবহারে পরস্পরের সম্মানের তারতম্য জাতের সঙ্গে বাঁধা ছিল। দেখাসাক্ষাৎ হলে জাতের খবরটা আগে না জানতে পারলে অভিবাদন অভ্যর্থনা দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে থাকত। পাকা পরিচয় পেলে তবে একপক্ষ পায়ের ধুলো দেবে, আর-একপক্ষ নেবে, আর বাকি যারা তারা পরস্পরকে নমস্কার করবে কিংবা কিছুই করবে না এই ছিল বিধান। সামাজিক ব্যবহারের বাইরে লৌকিক ব্যবহারে যে-একটা সাধারণ শিষ্টতার নিয়ম প্রায় সকল দেশেই আছে— আমাদের দেশে অনতিকালপূর্বেও তা ছিল না। যেখানে স্বার্থের গরজ ছিল এমন কোনো কোনো স্থলে এ নিয়ে মুশকিল ঘটত। উচ্চপদস্থ বা ধনশালী লোকের কাছে উমেদারি করবার বেলা নতিস্বীকার করে তুষ্ট করা প্রার্থীর পক্ষে অত্যাবশ্যক কিন্তু জাতে-বাঁধা রীতি ছাড়া আর কোনো রীতি না থাকাতে কিছুদিন পূর্বে এই রকম সংকটের স্থলে সম্মানের একটা কৃপণ প্রথা দায়ে পড়ে উদ্‌ভাবিত হয়েছিল। সে হচ্ছে ডান হাতের মুঠো বেঁধে দ্রুতবেগে নিজের নাসাগ্র

---

[১] দ্রষ্টব্য, 'বিচিত্রা', শ্রাবণ ১৩৩৮

আঘাত করা, সেটা দেখতে হত নিজেকে ধিক্‌কার দেওয়ার মতো। এই রকম সংশয়কুণ্ঠিত অনিচ্ছুক অশোভন বিনয়াচার এখন তার দেখতে পাই নে।

তার প্রধান কারণ, বাঙালিসমাজে পূর্বকালের গ্রাম্যতা এখন নেই বললেই হয়, জাতের গণ্ডি পেরিয়ে লোকব্যবহারে পরস্পরের প্রতি একটা সাধারণ শিষ্টতার দাবি স্বীকার করবার দিন এসেছে। তা ছাড়া কাউকে বিশেষ সম্মান দেবার বেলায় আজ আমরা বিশেষ করে মানুষের জাত খুঁজি নে। মেয়ের বিবাহ-সম্বন্ধ-বেলায় কোনো কোনো পরিবারে আজও কৌলীন্যের আদর থাকতে পারে— কিন্তু বৈঠকমজলিসে সভা-সমিতিতে ইস্কুলেকলেজে আপিসেআদালতে তার কোনো চিহ্ন নেই ; সে-সব জায়গায় ব্রাহ্মণের চেয়ে কুলীনের চেয়ে অনেক বড়ো মান সর্বদাই অন্য জাতের লোক পেয়ে থাকে। অতএব আজকের দিনে জনসমাজে কার কোন্ আসন সেটা জাতের দ্বারা ঘের দিয়ে সুরক্ষিত নেই, ভোজের স্থানেও পঙ্‌ক্তি-বিভাগের দাগটা কোথাও-বা লুপ্ত, কোথাও-বা অত্যন্ত ফিকে। মানুষের পরিচয়ে জাত-পরিচয়ের দাম এক সময়ে যত বড়ো ছিল এখন তা প্রায় নেই বলা যেতে পারে।

দাম যখন বেশি ছিল, এমন-কি, সম্মানের বাজারে সেইটেই যখন প্রায় একান্ত ছিল তখন নামের সঙ্গে পদবী বহন করাটা বাহুল্য ছিল না। কেননা আমাদের পদবী জাতের পদবী। ইংরেজিতে স্মিথ পদবী পারিবারিক, যদিও ছড়িয়ে গিয়ে এর পারিবারিক বিশেষত্ব অনেক পরিমাণে হারিয়ে গেছে। কিন্তু ঘোষ বোস চাটুজ্যে বাঁড়ুজ্যে মূলত কোনো পরিবারকে নির্দেশ করে না, জাতবিশেষের বিভাগকে নির্দেশ করে। পরিবারের চেয়ে এই বিভাগটা অনেক ব্যাপক। এমনতর ব্যাপক সংজ্ঞার যখন বিশেষ মূল্য ছিল তখনি নামের সঙ্গে ব্যবহারে সেটার বিশেষ সার্থকতা ছিল, এখন মূল্য যতই কমে আসছে ততই পারিবারিক পরিচয় হিসাবে ওর বিশিষ্টতা থাকছে না, অন্য হিসাবেও নয়।

ভারতবর্ষে বাংলা দেশ ছাড়া প্রায় সকল প্রদেশেই পদবীহীন নাম বিনা উপদ্রবেই চলে আসছে। এতদিন তো তা নিয়ে কারো মনে কোনো খট্‌কা লাগে নি। বারাণসীর স্বনামখ্যাত ভগবানদাস তাঁর ব্যক্তিগত নামটুকু নিয়েই আছেন। তাঁর ছেলের নাম শুদ্ধমাত্র শ্রীপ্রকাশ, নামের সঙ্গে কুলপরিচয় নেই। রাষ্ট্রিক উদ্যোগে খ্যাতিলাভের দ্বারা তিনি আপন নিষ্পদবিক নামটিকেই জনাদৃত করে তুলছেন।

প্রাচীনকালের দিকে তাকালে নল-দময়ন্তী বা সাবিত্রী-সত্যবানের কোনো পদবী দেখা যায় না। একান্ত আশা করি, নলকে নলদেববর্মা বলে ডাকা হত না। কুলপদবীর সমাসযোগে যুধিষ্ঠির-পাণ্ডব বা দ্রৌপদী-পাণ্ডব নাম পুরাণ-ইতিহাসে চলে নি, সমাজে চলতি ছিল এমন প্রমাণ নেই। বিশেষ প্রয়োজন হলে ব্যক্তিগত নামের সঙ্গে আরো কিছু বিশেষণ যোগ করা চলত। যেমন সাধারণত ভগবান মনুকে শুদ্ধ মনু নামেই আখ্যাত করা হয়েছে, তাতে অসুবিধা ঘটে নি— তবু বিশেষ প্রয়োজনস্থলেই তাঁকে বৈবস্বত মনু বলা হয়ে থাকে, সর্বদা নয়।

কিন্তু এ ক্ষেত্রে মহাভারতের দৃষ্টান্ত পুরোপুরি ব্যবহার করতে সাহস করি নে। নামের ভার যথাসম্ভব লাঘব করারই আমি সমর্থন করি, এক মানুষের বহুসংখ্যক নামকরণ দ্বাপর-ত্রেতাযুগে শোভা পেত এখন পায় না। বাপের পরিচয়ে কৃষ্ণার নাম ছিল দ্রৌপদী, জন্মস্থানের পরিচয়ে পাঞ্চালী, জন্ম-ইতিহাসের পরিচয়ে যাজ্ঞসেনী। এই প্রসঙ্গে একটা কথা বলে রাখি, শ্বশুরকুলের পরিচয়ে তাঁকে পাণ্ডবী বলা হয় নি। প্রাচীনকালে কোনো স্ত্রীর নামের সঙ্গে স্বামীর পরিচয় যুক্ত আছে এমন তো মনে পড়ে না।

আমার প্রস্তাব হচ্ছে, ব্যক্তিগত নামটাকে বজায় রেখে আর-সমস্ত বাদ দেওয়া, বিশেষ দরকার পড়লে তখন সংবাদ নিয়ে পরিচয় পূর্ণ করা। নামটাকে অত্যন্ত মোটা না করলে নামের সাহায্যেই সম্পূর্ণ ও নিঃসংশয় পরিচয় সম্ভব হয় না। আমাদের বিখ্যাত ঔপন্যাসিককে আমি বলি শরৎচন্দ্র। তাঁর কথা আলোচনা করতে গিয়ে দেখি শরৎচন্দ্র সান্যালও লেখেন উপন্যাস। তখন গ্রন্থি ছাড়াবার জন্যে বলা গেল শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। কিন্তু শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় নামে আরো একজন গল্প-লিখিয়ে থাকা বিপুলা পৃথ্বীতে অসম্ভব নয় তার প্রমাণ খুঁজলে পাওয়া যায়। এই দ্বন্দ্বের মীমাংসা করা যেখানে দরকার হয় সেখানে আরো একটা বিশেষণ যোগ করতে বাধ্য হই, যেমন শ্রীকান্ত-লেখক শরৎচন্দ্র। ফুলের বৃন্ত যেমন, মানুষের ব্যক্তিগত নামটি তেমনি। এই বৃন্ত থেকে প্রশাখায়, প্রশাখা থেকে শাখায়, শাখা থেকে গাছে, গাছ হয়তো আছে টবে। কিন্তু যখন ফুলটির সঙ্গেই বিশেষ ব্যবহার করতে হয়, যেমন মালা গাঁথতে, বোতামের গর্তে গুঁজতে, হাতে নিয়ে তার শোভা দেখতে, গন্ধ শুঁকতে, বা দেবতাকে নিবেদন করতে, তখন গাছসুদ্ধ টবসুদ্ধ যদি টানি তবে বৈশল্যকরণীর প্রয়োজনে গন্ধমাদন নাড়ানোর দ্বিতীয় সংস্করণ হয়। অবশ্য বিশেষ দরকার হলে তখন টবসুদ্ধ নাড়াতে দেখলে সেটাকে শক্তির অপব্যয় বলব না।

পত্রলেখক বাঙালি মেয়ের পদবী সম্বন্ধে আমাকে প্রশ্ন করেছেন। মেয়েরই হোক পুরুষেরই হোক পদবী মাত্রই বর্জন করবার আমি পক্ষপাতী। ভারতবর্ষের অন্য প্রদেশে তার নজীর আছে এই আমার ভরসা, কিন্তু বিলিতি নজীর আমার বিপক্ষ বলেই হতাশ হতে হয়।

আমার বয়স যখন ছিল অল্প, বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন বঙ্গসাহিত্যের রাজাসনে, তখন প্রসঙ্গক্রমে তাঁর নাম করতে হলে আমরা বলতুম বঙ্কিমবাবু, শুধু বঙ্কিমও কারো কারো কাছে শুনেছি, কিন্তু কখনো কাউকে বঙ্কিম চাটুজ্জে বলতে শুনি নি। সম্প্রতি রুচির পরিবর্তন হয়েছে কি? এখন শরৎচন্দ্রের পাঠকদের মুখে প্রায় শুনতে পাই শরৎ চাটুজ্জে। পরোক্ষে শুনেছি আমি রবি ঠাকুর নামে আখ্যাত। রুচি নিয়ে তর্কের সীমা নেই কিন্তু শরৎচন্দ্রই আমার কানে ভদ্র শোনায়, শরৎবাবুতেও দোষ নেই, কিন্তু শরৎ চাটুজ্জে কেমন যেন খেলো ঠেকে। যাই হোক, এরকম প্রসঙ্গে বাদ-প্রতিবাদ নিরর্থক, মোট কথা হচ্ছে এই, ব্যাঙাচি পরিণত বয়সে যেমন ল্যাজ খসিয়ে দেয় বাঙালির নামও যদি তেমনি পদবী বর্জন করে আমার মতে তাতে নামের গাম্ভীর্য বাড়ে বৈ কমে না। বস্তুত নামটা পরিচয়ের জন্যে নয় ব্যক্তিনির্দেশের জন্যে। পদ্মলোচন নাম নিয়ে আমরা কারো লোচন-সম্পর্কীয় পরিচয় খুঁজি নে একজন বিশেষ ব্যক্তিকেই খুঁজি। বস্তুত নামের মধ্যে পরিচয়কে অতিনির্দিষ্ট করার দ্বারা যদি নামমাহাত্ম্য বাড়ে তবে নিম্নলিখিত নামটাকে সেরা দাম দেওয়া যায় : রাজেন্দ্রসুনু-শশিশেখর মৈমনসৈংহিক বৈষ্ণবনিস্তারিণীপতি চাকলাদার।

সম্মানরক্ষার জন্যে পুরুষের নামের গোড়ায় বা শেষে আমরা বাবু যোগ করি। প্রশ্ন এই যে, মেয়েদের বেলা কী করা যায়। নিরলংকৃত সম্ভাষণ অশিষ্ট শোনায়। মা মাসি দিদি বউঠাকরুন ঠানদিদি প্রভৃতি পারিবারিক সম্বোধনই আমাদের দেশে মেয়েদের সম্বন্ধে চলে এসেছে। সমাজ-ব্যবহারের যে-গণ্ডির মধ্যে এটা সুসংগত ছিল তার সীমা এখন আমরা ছাড়িয়ে গেছি। আজকাল অনেকে মেয়েদের নামের সঙ্গে দেবী যোগ করাটাই ভদ্র সম্বোধন বলে গণ্য করেন। এটা নেহাত বাড়াবাড়ি। মা অথবা ভগিনীসূচক সম্বোধন গুজরাটে প্রচলিত, যেমন অনসূয়া বেন, কস্তুরী বাই। আমাদের পক্ষে আর্যা শব্দটা দেবীর চেয়ে ভালো, কিন্তু ওটা অনভ্যস্ত, অতএব প্রহসনের বাইরে চলবে না। দেবী শব্দটা যদি প্রথামত উচ্চবর্ণেই প্রযোজ্য তবু নামের সহযোগে ওর ব্যবহার আমাদের কানে সয়ে গেছে। তাই মনে হয় তেমনি অভ্যস্ত শ্রীমতী শব্দটা নামের সঙ্গে জড়িয়ে ব্যবহার করলে কানে অদ্ভুত শোনাবে না, যেমন শ্রীমতী সুনন্দা, শ্রীমতী শোভনা।

বিবাহিতা স্ত্রীর নামকে স্বামীর পরিচয়যুক্ত করা ভারতবর্ষে কোনো কালেই প্রচলিত ছিল না। আমাদের মেয়েদের নামের সঙ্গে তার পিতার বা স্বামীর পদবী জুড়লে প্রায়ই সেটা শ্রুতিকটু এবং অনেক স্থলেই হাস্যকর হয়। ইংরেজি নিয়মে মিসেস ভট্টাচার্য বললে তত দুঃখবোধ হয় না। কিন্তু মণিমালিনী সর্বাধিকারী কানে সইয়ে নিতে অনেকদিন কঠোর সাধনার প্রয়োজন হয়। যে-রকম আবহাওয়া পড়েছে তাতে য়ুরোপে বিবাহিত নারীর পদবী পরিবর্তন বেশিদিন টিকবে বলে বোধ হয় না, তখন আবার তাড়াতাড়ি আমাদেরও সহধর্মিণীদের নামের ছাঁট-কাট করতে যদি বসি তবে নিতান্ত নির্লজ্জ না হলে অন্তত কর্ণমূল লাল হয়ে উঠবে। একদা পাশ্চাত্য মহাদেশে মেয়েরা যখন নিজের নাম-স্বাতন্ত্র্য অবিকৃত রাখা নিয়ে আস্ফালন করবে সেদিন যাতে আমাদের মেয়েরা গৌরব করতে পারে সেই সুযোগটুকু গায়ে পড়ে নষ্ট করা কেন?

এ-সব আলোচনায় বিশেষ কিছু লাভ আছে বলে মনে হয় না। রুচির তর্কে প্রথাকে নিয়ন্ত্রিত করা যায় না। যে কারণে 'বাধ্যতামূলক' 'গঠনমূলক' প্রভৃতি বর্বর শব্দ বাংলা অভিধানকে অধিকার করছে সেই কারণেই বাঙালির বৈঠকে মধুমালতী মজুমদার বা বনজ্যোৎস্না তলাপাত্রের প্রাদুর্ভাবকে নিরস্ত করা যাবে না। ইংরেজিতে প্রথার সঙ্গে যেমন-তেমন করে জোড় মেলানোর ঝোঁক সামলানো দুঃসাধ্য।

শ্রাবণ ১৩৩৮

হরপ্রসাদ সংবর্ধন

...সংস্কৃত ভাষার সঙ্গে বাংলার যত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ থাক্ তবু বাংলার স্বাতন্ত্র্য যে সংস্কৃত ব্যাকরণের তলায় চাপা পড়বার নয়, আমি জানি এ মতটি শাস্ত্রীমহাশয়ের। এ কথা শুনতে যত সহজ আসলে তা নয়। ভাষায় বাইরের দিক থেকে চোখে পড়ে শব্দের উপাদান। বলা বাহুল্য বাংলা ভাষার বেশির ভাগ শব্দই সংস্কৃত থেকে পাওয়া। এই শব্দের কোনোটাকে বলি তৎসম, কোনোটাকে তদ্ভব।

ছাপার অক্ষরে বাংলা পড়ে পড়ে একটা কথা ভুলেচি যে সংস্কৃতের তৎসম শব্দ বাংলায় প্রায় নেই বললেই হয়। "অক্ষর" শব্দটাকে তৎসম বলে গণ্য করি ছাপার বইয়ে ; অন্য ব্যবহারে নয়। রোমান অক্ষরে "অক্ষর" শব্দের সংস্কৃত চেহারা akshara বাংলায় okkhar। মরাঠী ভাষায় সংস্কৃত শব্দ প্রায় সংস্কৃতেরই মতো, বাংলায় তা নয়। বাংলার নিজের উচ্চারণের ছাঁদ আছে, তার সমস্ত আমদানি শব্দ সেই ছাঁদে সে আপন করে নিয়েছে।

তেমনি তার কাঠামোটাও তার নিজের। এই কাঠামোতেই ভাষার জাত চেনা যায়। এমন উর্দু আছে যার মুখোশটা পারসিক কিন্তু ওর কাঠামোটা বিচার করে দেখলেই বোঝা যায় উর্দু ভারতীয় ভাষা। তেমনি বাংলার স্বকীয় কাঠামোটাকে কী বলব? তাকে গৌড়ীয় বলা যাক্।

কিন্তু ভাষার বিচারের মধ্যে এসে পড়ে আভিজাত্যের অভিমান, সেটা স্বাজাত্যের দরদকে ছাড়িয়ে যেতে চায়। অব্রাহ্মণ যদি পৈতে নেবার দিকে অত্যন্ত জেদ করতে থাকে তবে বোঝা যায় যে, নিজের জাতের পরে তার নিজের মনেই সম্মানের অভাব আছে। বাংলা ভাষাকে প্রায় সংস্কৃত বলে চালালে তার গলায় পৈতে চড়ানো হয়। দেশজ বলে কারো কারো মনে বাংলার পরে যে অবমাননা আছে সেটাকে সংস্কৃত ব্যাকরণের নামাবলী দিয়ে ঢেকে দেবার চেষ্টা অনেকদিন আমাদের মনে আছে। বালক বয়সে যে ব্যাকরণ পড়েছিলুম তাতে সংস্কৃত-ব্যাকরণের পরিভাষা

দিয়ে বাংলা ভাষাকে শোধন করবার প্রবল ইচ্ছা দেখা গেছে ; অর্থাৎ এই কথা রটিয়ে দেবার চেষ্টা, যে, ভাষাটা পতিত যদিবা হয় তবু পতিত ব্রাহ্মণ, অতএব পতিতের লক্ষণগুলো যতটা পারা যায় চোখের আড়ালে রাখা কর্তব্য। অন্তত পুঁথিপত্রের চালচলনে বাংলা দেশে "মস্ত ভিড়"কে কোথাও যেন কবুল করা না হয় স্বাগত বলে যেন এগিয়ে নিয়ে আসা হয় "মহতী জনতা"কে।

এমনি করে সংস্কৃত ভাষা অনেক কাল ধরে অপ্রতিহত প্রভাবে বাংলা ভাষাকে অপত্য নির্বিশেষে শাসন করবার কাজে লেগেছিলেন। সেই যুগে নর্মাল স্কুলে কোনোমতে ছাত্রবৃত্তি ক্লাসের এক ক্লাস নীচে পর্যন্ত আমার উন্নতি হয়েছিল। বংশে ধনমর্যাদা না থাকলে তাও বোধ হয় ঘটত না। তখন যে-ভাষাকে সাধুভাষা বলা হত অর্থাৎ যে-ভাষা ভুল করে আমাদের মাতৃভাষার পাড়ায় পা দিলে গঙ্গাস্নান না করে ঘরে ঢুকতেন না তাঁর সাধনার জন্যে লোহারাম শিরোরত্নের ব্যাকরণ এবং আদ্যানাথ পণ্ডিতমশায়ের সমাসদর্পণ আমাদের অবলম্বন ছিল। আজকের দিনে শুনে সকলের আশ্চর্য লাগবে যে, দ্বিগু সমাস কাকে বলে সুকুমারমতি বালকের তাও জানা ছিল। তখনকার কালের পাঠ্যগ্রন্থের ভূমিকা দেখলেই জানা যাবে সেকালে বালকমাত্রই সুকুমারমতি ছিল।

ভাষা সম্বন্ধে আর্য পদবীর প্রতি লুব্ধ মানুষ আজও অনেকে আছেন, শুদ্ধির দিকে তাঁদের প্রখর দৃষ্টি— তাই কান সোনা পান চুনের উপরে তাঁরা বহু যত্নে মূর্ধন্য ণ-য়ের ছিটে দিচ্ছেন তার অপভ্রংশতার পাপ যথাসাধ্য ক্ষালন করবার জন্যে। এমন-কি, ফার্সি দরুন শব্দের প্রতিও পতিতপাবনের করুণা দেখি। "গবর্নমেন্টে"র উপর ণত্ব বিধানের জোরে তাঁরা ভগবান পাণিনির আশীর্বাদ টেনে এনেছেন। এঁদের "পরণে" "নরুণ-পেড়ে" ধুতি। ভাইপো "হরেনে"র নামটাকে কোন্ ন-এর উপর শূল চড়াবেন তা নিয়ে দো-মনা আছেন। কানে কুণ্ডলের সোনার বেলায় তাঁরা আর্য কিন্তু কানে মন্ত্র শোনার সময় তাঁরা অন্যমনস্ক। কানপুরে মূর্ধন্য ণ চড়েছে তাও চোখে পড়ল,— অথচ কানাই পাহারা এড়িয়ে গেছে। মহামারী যেমন অনেকগুলোকে মারে অথচ তারি মধ্যে দুটো একটা রক্ষা পায়, তেমনি হঠাৎ অল্পদিনের মধ্যে বাংলায় মূর্ধন্য ণ অনেকখানি সংক্রামক হয়ে উঠেছে। যাঁরা সংস্কৃত ভাষায় নতুন গ্র্যাজুয়েট এটার উদ্ভব তাঁদেরি থেকে, কিন্তু এর ছোঁয়াচ লাগল ছাপাখানার কম্পোজিটরকেও। দেশে শিশুদের পরে দয়া নেই তাই বানানে অনাবশ্যক জটিলতা বেড়ে চলেছে অথচ তাতে সংস্কৃত ভাষার নিয়মও পীড়িত বাংলার তো কথাই নেই।

প্রাচীন ভারতে প্রাকৃত ভাষার ব্যাকরণ লেখা হয়েছিল। যাঁরা লিখেছিলেন তাঁরা আমাদের চেয়ে সংস্কৃত ভাষা কম জানতেন না। তবু তাঁরা প্রাকৃতকে নিঃসংকোচে প্রাকৃত বলেই মেনে নিয়েছিলেন, লজ্জিত হয়ে থেকে থেকে তার উপরে সংস্কৃত ভাষার পলস্তারা লাগান নি। যে দেশ পাণিনির সেই দেশেই তাঁদের জন্ম, ভাষা সম্বন্ধে তাঁদের মোহমুক্ত স্পষ্টদৃষ্টি ছিল। তাঁরা প্রমাণ করতে চান নি যে ইরাবতী চন্দ্রভাগা শতদ্রু গঙ্গা যমুনা ব্রহ্মপুত্র সমস্তই হিমালয়ের মাথার উপরে জমাট করা বিশুদ্ধ বরফেরই পিণ্ড। যাঁরা যথার্থ পণ্ডিত তাঁরা অনেক সংবাদ রাখেন বলেই যে মান পাবার যোগ্য তা নয় তাঁদের স্পষ্ট দৃষ্টি।...[১]

---

[১] শান্তিনিকেতন রবীন্দ্রভবন সংগ্রহে 'হরপ্রসাদ শাস্ত্রী' সম্পর্কে লিখিত দুইটি পাণ্ডুলিপি পাওয়া যায়, তন্মধ্যে একটি পূর্বে 'হরপ্রসাদ সংবর্দ্ধন লেখমালা' দ্বিতীয় খণ্ডের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। 'হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর স্মৃতিপুস্তকের জন্য' চিহ্নিত অপর পাণ্ডুলিপি হইতে শব্দতত্ত্বসম্পর্কিত প্রাসঙ্গিক অংশ বর্তমান গ্রন্থে সংযোজিত হইল। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী গবেষণা কেন্দ্র নৈহাটি-কর্তৃক সংকলিত 'হরপ্রসাদ শাস্ত্রী স্মারক গ্রন্থে' (১৯৭৮) পাণ্ডুলিপি হইতে সম্পূর্ণ রচনা মুদ্রিত। শ্রীসত্যজিৎ চৌধুরী এই রচনাটির প্রতি সংকলয়িতাগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

'প্রাচীন-কাব্য সংগ্রহ'

বিদ্যাপতি

বিদ্যাপতির ন্যায় অমন একজন লোকপ্রিয় কবির পদসমূহ একত্রে পুস্তকাকারে সংগৃহীত হইল,[১] তাহার টীকা, অর্থ, পাঠ-বিভেদ ও (স্থানে স্থানে) ব্যাকরণের সূত্র বাহির হইল, তথাপি তাহা লইয়া একটা আন্দোলন উপস্থিত হইল না, ইহা কেবল বাংলা দেশের জলবাতাসের গুণে। সম্পাদক শ্রীঅক্ষয়চন্দ্র সরকার তাঁহার যথাসাধ্য যে কথার যেরূপ অর্থ করিয়াছেন, যে শ্লোকের যেরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, পাঠকেরা কি একবার মনোযোগ করিয়া দেখিবেন না, যে, তাহা ব্যাকরণ-শুদ্ধি হইল কি না, সুকল্পনা-সংগত হইল কি না? সে বিষয়ে কি একেবারে মতভেদ হইতেই পারে না? পাঠকেরা কি সম্পাদকবর্গকে একেবারে অভ্রান্ত দেবতা বলিয়া জ্ঞান করেন, অথবা তাঁহাদের স্বদেশের প্রাচীন— আদি কবিদের প্রতি তাঁহাদের এতই অনুরাগের অভাব, এতই অনাদর যে, তাঁহাদের প্রতি কৃতজ্ঞতার দেয় স্বরূপে যৎসামান্য শ্রম স্বীকার করিতেও পারেন না? বঙ্গভাষা যাঁহাদের নিকট নিজের অস্তিত্বের জন্য ঋণী, এমন-সকল পূজনীয় প্রাচীন কবিদিগের কবিতা-সকলের প্রতি যে-সে যেরূপ ব্যবহারই করুক-না, আমরা কি নিশ্চেষ্ট হইয়া চাহিয়া থাকিব? তাহারা কি আমাদের আদরের সামগ্রী নহে? যিনি এই-সকল কবিতার সম্পাদকতা করিতে চান তিনি নিজের স্কন্ধে একটি গুরুতর দায়িত্ব গ্রহণ করেন। প্রতি পদে সাধারণের নিকটে হিসাব দিবার জন্য তিনি যেন প্রস্তুত থাকেন। কিন্তু আমাদের দেশে পাঠক-সাধারণ নিশ্চেষ্ট, নিরীহ-প্রকৃতি, এবং সম্পাদকবর্গও নিজের দম্ভ পাকাইয়া পাকাইয়া একটা অপরিমিত উচ্চ আসন প্রস্তুত করিয়া তুলেন; সেখান হইতে পাঠক বলিয়া যে অতি ক্ষুদ্র-কায়া একদল প্রাণী কখনো কখনো তাঁহাদের নজরে পড়ে, তাহাদের জন্য অধিক ভাবনা করা তাঁহারা আবশ্যক মনে করেন না। কবিদিগের কাব্য যিনি সংগ্রহ করেন, তাঁহার সংগ্রহের মধ্যে যদি অসাবধানতা, অবহেলা, অমনোযোগ লক্ষিত হয়, তবে তাঁহার বিরুদ্ধে আমরা অত্যন্ত গুরুতর তিনটি নালিশ আনিতে পারি— প্রথমত, কবিদের প্রতি তিনি অন্যায় ব্যবহার করিয়াছেন; দ্বিতীয়ত, সাহিত্যের সহিত তিনি যে চুক্তি করিয়াছিলেন, সে চুক্তি রীতিমতো পালন করেন নাই; তৃতীয়ত, পাঠক-সাধারণকে তিনি অপমান করিয়াছেন। তিনি তাহাদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়াছেন, অথচ যথাযোগ্য আয়োজন করেন নাই; যথারীতি সম্ভাষণ করেন নাই; এতই কি তাহারা উপেক্ষার পাত্র? "অক্ষরের ভুল হইল হইলই, তাহাতে এমনি কী আসে যায়? অর্থবোধ হইতেছে না? একটা আন্দাজ করিয়া দেও না, কে অনুসন্ধান করিয়া দেখে?" পাঠকদের প্রতি এরূপ ব্যবহার কি সাহিত্য-আচারের বিরুদ্ধ নহে?

শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার বিদ্যাপতি-রচিত পদাবলী পুস্তকাকারে সংগ্রহ করিয়াছেন, অপ্রচলিত শব্দের ও দুরূহ শ্লোকের অর্থ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। আমাদের সাহিত্যে এরূপ উদ্যোগ সম্প্রতি আরম্ভ হইয়াছে; অতএব এই উদ্যোগীদের আমরা নিরুৎসাহ করিতে চাহি না; ইঁহাদের চেষ্টা সর্বতোভাবে প্রশংসনীয়। কেবল আমরা যথাসময়ে ইঁহাদের সাবধান করিয়া দিতে চাই। আধুনিক বঙ্গীয় পাঠকগণকে নিশ্চেষ্ট জানিয়া ইঁহারা যেন নিজ কাজে শৈথিল্য না করেন। ইঁহাদের পরিশ্রম ও উদ্যমের পুরস্কার হাতে হাতে যদি-বা না পান বঙ্গ-সাহিত্যকে ইঁহারা ঋণী করিয়া রাখিবেন, ও একদিন-না-একদিন সে ঋণ পরিশোধ হইবেই।

---

[১] 'প্রাচীন কাব্য সংগ্রহ', অগ্রহায়ণ ১২৮১-৮৩ [ইং ১৮৭৪-৭৬] খণ্ডশঃ প্রকাশ : ১। বিদ্যাপতি ২। চণ্ডীদাস ৩। গোবিন্দদাস ৪। রামেশ্বরের সত্যনারায়ণ ৫। মুকুন্দরাম কবিকঙ্কণের চণ্ডীমঙ্গল।

“যত্নে কৃতে যদি না সিধ্যতি, কোঽত্র দোষ” সে কথা সত্য বটে; কিন্তু আমাদের আলোচ্য পুস্তকের সম্পাদক নিরলস হইয়া যথাসাধ্য যত্ন করিয়াছেন কি না আমাদের সন্দেহ। রসেটি শেলীর কবিতাসমূহের যে সংস্করণ মুদ্রিত করিয়াছেন, তাহাতে তিনি প্রতি কমা ও সেমিকোলনের উপর মাথা ঘুরাইয়াছেন; ইহাতে কবির প্রতি তাঁহার অসাধারণ অনুরাগ ও সাধারণের সমীপে তাঁহার কর্তব্য পালনে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা প্রকাশ পাইতেছে। কিন্তু এরূপ তুলনা বৃথা। কোনো বিষয়েই যাহাদের সহিত মিলে না, একটা বিশেষ বিষয়ে তাহাদের সহিত তুলনা দিতে যাওয়ার অর্থ নাই। বঙ্গদেশ ইংলন্ড নহে, এবং সকল লোকই রসেটি নহে।

শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার প্রাচীন কবিতা সংগ্রহে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, এজন্য তাঁহাকে উৎসাহ দিয়া তাঁহার কৃত অর্থ ও ব্যাখ্যা সমূহ লইয়া আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইলাম, এরূপ না করিলে কবিতা-সকলের যথার্থ মর্ম বাহির হইবার সম্ভাবনা থাকিবে না। এ বিষয়ে তর্ক বিতর্ক ও আলোচনা উত্থাপন করা আবশ্যক।

প্রাচীন কবিতাবলীর টীকা প্রকাশের নানাবিধ দোষ থাকিতে পারে। ১. ব্যাকরণবিরুদ্ধ অর্থ ব্যাখ্যা; ২. সুভাব-বিরুদ্ধ ব্যাখ্যা; ৩. সহজ শ্লোকের প্যাঁচালো অর্থ ব্যাখ্যা; ৪. দুরূহ শ্লোক দেখিয়া মৌন থাকা; ৫. সংশয়ের স্থলে নিঃসংশয় ভাব দেখানো; ইত্যাদি। এই-সকল দোষ যদি বর্তমান পুস্তকে থাকে, তবে তাহা সংশোধন করিয়া দেওয়া আমাদের কর্তব্য কার্য। বিদ্যাপতির মধ্যে, ঈষৎ হউক, বা অধিক হউক, দুরূহ শ্লোক দেখিলে পাঠকদের সুবিধার জন্য আমরা তাহার অর্থ করিতে চেষ্টা করিব।

পুস্তকে নিবিষ্ট প্রথম গীতিতে কবি রাধিকার শৈশব ও যৌবনের মধ্যবর্তী অবস্থার কথা বর্ণনা করিয়াছেন।

নিরজন উরজ হেরই কত বেরি।
হাসত আপন পয়োধর হেরি॥
পহিল বদরি সম পুন নবরঙ্গ।
দিনে দিনে অনঙ্গ উঘারয়ে অঙ্গ॥ পৃ. ২

সম্পাদক ইহার শেষ দুই চরণের এইরূপ টীকা করিতেছেন; “প্রথম বর্ষার মতো নূতন নূতন ভাবভঙ্গী প্রকাশ করিতে লাগিল। বদরি (হিন্দি) বর্ষা। নবরঙ্গ শব্দে নারাঙ্গালেবু অভিধানে থাকিলে এই চরণের অন্যরূপ অর্থ হয়। কিন্তু বদরি শব্দের বর্ষা অর্থও সুপ্রসিদ্ধ নহে।” “বর্ষার মতো ভাবভঙ্গী প্রকাশ করা” শুনিলেই কেমন কানে লাগে যে, অর্থটা টানাবোনা। নবরঙ্গ শব্দে নারাঙ্গালেবু অভিধানে থাকিলে কিরূপ অর্থ হয় তাহাও দেখা উচিত ছিল। “প্রথম বর্ষার মতো ভাব-ভঙ্গী প্রকাশ করিতে লাগিল” এরূপ অর্থ করিলে পুন শব্দের সার্থকতা কী থাকে? যাহা হউক, এ স্থানের অর্থ অতিশয় সহজ, কেবল উপরে উদ্‌ধৃত চারি চরণের মধ্যে শেষের দুই চরণকে প্রথম দুই চরণের সহিত পৃথক করিয়া পড়াতেই ইহার অর্থবোধে গোল পড়ে। নিম্নলিখিত অর্থটি সহজ বলিয়া বোধ হয়। “রাধা নির্জনে কতবার আপনার উরজ দেখেন, আপনার পয়োধর দেখিয়া হাসেন। সে পয়োধর কিরূপ? না, প্রথমে বদরির (কুল) ন্যায় ও পরে নারাঙ্গার ন্যায়।” নবরঙ্গ শব্দের অর্থ নারাঙ্গা অভিধানে নাই। ‘নাগরঙ্গ’ ও ‘নার্য্যঙ্গ’ শব্দ নারাঙ্গা বলিয়া উক্ত হইয়াছে। কিন্তু নবরঙ্গ শব্দের অর্থ নারাঙ্গা, সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। বিদ্যাপতির আর-একটি পদ হইতে এই একই ভাবের দুইটি চরণ উদ্‌ধৃত করিয়া দিতেছি, তাহাতে আমাদের কথা আরো স্পষ্ট হইবে।

পহিল বদরী কুচ পুন নবরঙ্গ।
দিনে দিনে বাঢ়য়ে, পীড়য়ে অনঙ্গ। পৃ. ২২০

৩-সংখ্যক পদে সম্পাদক,

খেলত না খেলত লোক দেখি লাজ।
হেরত না হেরত সহচরী মাঝ॥ পৃ. ৩

এই দুই চরণের অর্থ করিতেছেন : “খেলার সময় হউক বা না হউক লোক দেখিলে লজ্জিত হয় ও সহচরীগণের মধ্যে থাকিয়া একবার দৃষ্টি করে ও তখনি অপর দিকে দৃষ্টিক্ষেপ করে।” “খেলত না খেলত” এবং “হেরত না হেরত” উভয়ের একই রূপ অর্থ হওয়াই সংগত বোধ হয় ; উভয়ের বিভিন্ন অর্থ মনে লয় না। “খেলত না খেলত” অর্থে সম্পাদক কহিতেছেন “খেলার সময় হউক বা না হউক” অর্থাৎ খেলে বা না খেলে, তাহা যদি হয় তবে “হেরত না হেরত” শব্দের অর্থ “দেখে বা না দেখে” হওয়াই উচিত; কিন্তু তাহা হইলে কোনো অর্থই হয় না। ইহার অর্থ নিম্নলিখিত রূপ হওয়াই উচিত ; “খেলে, খেলে না ; লোক দেখিয়া লজ্জা হয়। সহচরীদের মধ্যে থাকিয়া দেখে, দেখে না।” অর্থাৎ খেলিতে খেলিতে খেলে না ; দেখিতে দেখিতে দেখে না ; ইহাই ব্যাকরণ-সম্মত ও অর্থ-সংগত।

নয়ন নলিনী দউ অঞ্জনে রঞ্জিত
ভাঙবি ভঙ্গি-বিলাস॥ সং ৭, পৃ. ৮

সম্পাদক “ভাঙবি' শব্দের অর্থ প্রকাশ করিতেছে” লিখিয়াছেন। তিনি কহেন “ভাঙ[১] বিভঙ্গি-বিলাস এই পাঠ সংগত বোধ হয় না।” ব্যাকরণ ধরিতে গেলে ‘ভাঙবি’ শব্দের অর্থ ‘প্রকাশ করিতেছে’ কোনোমতেই হয় না। ‘বি’ অন্ত ধাতু কোনোমতেই বর্তমান কাল-বাচক হইতে পারে না। বিদ্যাপতির সমস্ত পদাবলীর মধ্যে কোথাও এমনতর দেখা যায় না। ‘ভাঙবি’ অর্থে ‘তুই প্রকাশ করিবি’ হয়, অথবা স্ত্রীলিঙ্গ কর্তা থাকিলে ‘সে প্রকাশ করিবে’ও হয়, কিন্তু বর্তমান কাল-বাচক ক্রিয়ায় ‘বি’ যোগ বিদ্যাপতির কোনো পদেই দৃষ্ট হয় না। এমন স্থলে ‘ভাঙ বিভঙ্গি বিলাস’ পাঠ কী কারণে অসংগত বুঝিতে পারা যায় না। রাধিকার নয়ন-নলিনীদ্বয় অঞ্জনে রঞ্জিত, এবং তাহার ভ্রূ বিভঙ্গি-বিলাস। অর্থাৎ বিভঙ্গিতেই তাহার ভ্রূর বিলাস। এ অর্থ আমাদের নিকট বেশ সুসংগত বোধ হইতেছে।

অলখিতে মোহে হেরি বিহসিতে থোরি।
জনু বয়ান বিরাজে চান্দ উজোরি॥
কুটিল কটাক্ষ ছটা পড়ি গেল।
মধুকর ডম্বর অম্বর ভেল॥ সং ৯, পৃ. ১০

সম্পাদক শেষ দুই চরণের অর্থ এইরূপ করিয়াছেন : ‘কুটিল কটাক্ষের শোভায় চারি দিক এমন শোভিত হইল যেন মধুকর ডামরে (মৌমাছির ঝাঁকে) আকাশ (অম্বর) আচ্ছন্ন হইল।’ ‘যেন’ শব্দ কোথা হইতে পাইলেন, এবং ‘আচ্ছন্ন’ শব্দই বা কোথা হইতে জুটিল? আমরা ইহার এইরূপ অর্থ করি— ‘অলখিত ভাবে আমাকে দেখিয়া ঈষৎ হাস্য করাতে তাহার মুখ উজ্জ্বল চাঁদের ন্যায় বিরাজ করিতে লাগিল। মুখ যদি চাঁদ হইল, কটাক্ষ সে চাঁদের ছটা স্বরূপ হইয়া পতিত হইতে লাগিল এবং মধুকরের ঝাঁক সে চাঁদের অম্বর অর্থাৎ আকাশ হইল। রাধার মুখের

---

[১] ভাঙ শব্দের অর্থ ভ্রূ।

গন্ধে এত মধুকর আকৃষ্ট হইয়াছিল।' এই গীতেরই মধ্যে মধুপের কথা পুনশ্চ উল্লেখ করা হইয়াছে ; যথা—

লীলাকমলে ভ্রমরা কিয়ে বারি।
চমকি চললু ধনি চকিত নেহারি॥ পৃ. ১১

অর্থাৎ 'লীলাকমলের দ্বারা ভ্রমরকে কিবা নিবারণ করিয়া, চকিতে চাহিয়া চমকিয়া ধনী চলিল।' ইহাতে কুমারসম্ভবের তৃতীয় সর্গে গৌরীর বর্ণনা মনে পড়ে—

ভ্রমর তৃষিত হয়ে নিশ্বাস সৌরভে
বিম্ব অধরের কাছে বেড়ায় ঘুরিয়া,
চঞ্চল নয়ন পাতে উষা প্রতিক্ষণ
লীলা-শতদল নাড়ি দিতেছেন বাধা।

আমরা 'লীলা-কমলে ভ্রমরা কিয়ে বারি' ইত্যাদি দুই চরণের যে অর্থ করিলাম সম্পাদকের টীকার সহিত তাহার ঐক্য হয় না। তাহাতে আছে— 'লীলা-কমলে স্থিত ভ্রমর বা বারিবিন্দুর ন্যায় চঞ্চল নয়নে দৃষ্টিপাত করিয়া চমকিয়া চলিল।' এ অর্থ যে অসংগত, তাহা মনোযোগ করিয়া দেখিলেই প্রতীতি হইবে—

লীলা-কমলে ভ্রমরা কিয়ে বারি।
চমকি চললু ধনি চকিতে নেহারি॥

'লীলা-কমল' ও 'চকিতে নেহারি' এতদূর ; এবং মাঝে 'চমকি চললু ধনি' এমন একটা ব্যবধান স্বরূপে পড়িয়াছে যে উহাকে একত্র করিতে গেলে অনেক টানাটানি করিতে হয় ও 'ন্যায়' নামক একটা যোজক পদার্থ ঘর হইতে তৈরি করিয়া আনিতে হয়। আমরা যে অর্থ দিয়াছি তাহা ইহা অপেক্ষা সহজ। 'বারি' শব্দের অর্থ নিবারণ করা অপ্রচলিত নহে। যথা—

'পুর-রমণীগণ রাখল বারি।' সং ১২৩, পৃ. ১০৩

অর্থাৎ পুর-রমণীগণ নিবারণ করিয়া রাখিল।

১১-সংখ্যক গীতে সম্পাদক,

'একে তনু গোরা, কনক-কটোরা
অতনু, কাঁচলা-উপাম।' পৃ. ১৩

এই দুই চরণের অর্থ করিতে পারেন নাই। তিনি কহিয়াছেন, 'এই চরণের অর্থগ্রহ হইল না।' আমরা ইহার এইরূপ অর্থ করি— 'তনু গৌরবর্ণ ; কনক কটোরা[1] (অর্থাৎ স্তন) অতনু অর্থাৎ বৃহৎ, এবং কাঁচলা-উপাম, অর্থাৎ ঠিক কাঁচলির মাপে।'[2]

যব গোধূলি সময় বেলি,
ধনি মন্দির বাহির ভেলি,
নব জলধরে বিজুরি-রেখা দ্বন্দ্ব পসারিয়া গেলি॥
সং ১৬, পৃ. ১৭

---

[1] কনক কটোরা অর্থে সোনার বাটি বুঝায়। বিদ্যাপতির অনেক স্থলে কনক-কটোরার সহিত স্তনের তুলনা দেওয়া হইয়াছে।

[2] উপমা-উপ তুল্য, মা পরিমাণ করা। প্রকৃতিবাদ।

সম্পাদক টীকা করিতেছেন : 'বিদ্যুৎ রেখার সহিত দ্বন্দ্ব (বিবাদ) বিস্তার করিয়া গেল। অর্থাৎ তাহার সমান বা অধিক লাবণ্যময়ী হইল।' 'সহিত' শব্দটি সম্পাদক কোথা হইতে সংগ্রহ করিলেন? ইহার সহজ অর্থ এই— 'রাধা গোধূলির ঈষৎ অন্ধকারে মন্দিরের বাহির হইলেন; যেন নব জলধরে বিদ্যুৎ রেখা দ্বন্দ্ব বিস্তার করিয়া গেল।' ইহাই ব্যাকরণশুদ্ধ ও সুভাব-সংগত অর্থ।

সম্পাদক ২০-সংখ্যক গীতের কোনো অর্থ দেন নাই। আমাদের মতে তাহার ব্যাখ্যা আবশ্যক। সে গীতটি এই—

এ সখি কি পেখনু এক অপরূপ।
শুনইতে মানবি স্বপন স্বরূপ॥
কমল যুগলপর চাঁদকি মাল।
তাপর উপজল তরুণ তমাল॥
তাপর বেড়ল বিজুরী লতা।
কালিন্দী তীর ধীর চলি যাতা॥
শাখাশিখর সুধাকর পাঁতি।
তাহে নব পল্লব অরুণক ভাতি॥
বিমল বিম্বফল যুগল বিকাশ।
তাপর কির থির করু বাস॥
তাপর চঞ্চল খঞ্জন যোড়।
তাপর সাপিনী ঝাঁপল মোড়॥ পৃ. ২১

ইহাতে কৃষ্ণের শরীরের বর্ণনা হইতেছে। 'নখ চন্দ্রমালা শোভিত-পদকমলদ্বয়ের উপরে তরুণ তমালবৎ কৃষ্ণের শরীর উঠিয়াছে। পীতাম্বর বিদ্যুতে তাঁহাকে বেড়িয়াছে।[1] সে তমাল তরুর শাখাশিখর, অর্থাৎ মুখ, সুধাকর। লাবণ্যই বোধ করি অরুণ ভাতির পল্লব। ওষ্ঠাধর বিম্বফলদ্বয়। তাহার উপর কিরণ অর্থাৎ হাস্য স্থির বাস করে। নেত্র খঞ্জন। কুন্তল, সাপিনী।'

অন্ধকার রাত্রে রাধিকা অভিসার উদ্দেশে বাহির হইয়াছেন, কৃষ্ণ বিঘ্ন আশঙ্কা করিতেছেন।

গগন সঘন, মহী পঙ্কা;
বিঘিনি বিথারিত উপজয়ে শঙ্কা
দশদিশ ঘন আন্ধিয়ারা;
চলইতে খলই, লখই নাহি পারা।
সব যোনি পালটি ভুললি
আওত মানবি ভানত লোলি। সং ৩৪, পৃ. ৩৪

সম্পাদক শেষ দুই চরণের অর্থ নিম্নলিখিতরূপে করিতেছেন। 'শ্রীকৃষ্ণ রাধিকার অনুপস্থিতিতেও তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন 'লোলে, (লোলি) তুমি যদি (নিরাপদে) উপস্থিত হও

---

[1] অভিনব জলধর সুন্দর দেহ।
পীতবসন পরা সৌদামিনী সেহ। সং ১৮, পৃ. ২০

(আওত) তাহা হইলে আমি মনে মনে করিব (মানবি) যে, সকল জীবকে (যোনি) দৃষ্টিপাত দ্বারা (পালটি) তোমার প্রভায় নত করিয়া (ভানত) ভুলাইয়াছে (ভুললি)।' এইরূপ অর্থ কষ্টসাধ্য সন্দেহ নাই, কিন্তু আমরা অন্য কোনো সুলভ অর্থ বা পাঠ সংগ্রহ করিতে পারিলাম না।' সম্পাদক স্বীকার করিয়াছেন উপরি-উদ্‌ধৃত অর্থটি কষ্টসাধ্য। আমরা কহিতেছি, উহা ব্যাকরণ-সংগতও নহে। 'ভুললি' অর্থে 'ভুলাইয়াছ' হয় না, উহার অর্থ ভুলিলি, অথবা স্ত্রীলিঙ্গ কর্তার সহিত যুক্ত হইলে, ভুলিল। 'মানবি' শব্দের অর্থ 'মনে করিব' নহে, 'মনে করিবি' হইতে পারে ; বিশেষত উহার কর্তা স্ত্রীলিঙ্গ নহে। আমরা উপরি-উক্ত দুই চরণের এইরূপ অর্থ করি : 'আওত মানবী, ভানত লোলি। ভানত[1] অর্থাৎ ভাবের দ্বারা লোলা, চঞ্চলা মানবী আসিতেছেন। সব যোনি পালটি ভুললি। সকল প্রাণীকে দেখিতে ভুলিলেন। এত অধীরা যে, কাহারো প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে পারিতেছেন না।'

রাধিকা শ্যামকে ভর্ৎসনা করিয়া দূতী পাঠাইতেছেন। দূতীকে কহিতেছেন :

যো পুন সহচরি, হোয় মতিমান্।
করয়ে পিশুন-বচন অবধান॥
সং ৭০, পৃ. ৬২

সম্পাদক টীকা করিতেছেন 'কাকের কথাতেই মনঃসংযোগ করেন!' এ টীকার টীকা কে করিবে? অনেক অনেক মতিমান্ দেখিয়াছি, তাঁহারা কাকের কথায় কিছুমাত্র মনোযোগ দেন না ; টীকাকার মহাশয় নিজে কী করেন? যাহা হউক, এমন মতিমান্ যদি কেহ থাকেন যিনি কেবলমাত্র কাকের কথাতেই মনঃসংযোগ না করেন, এক-আধবার আমাদের কথাও তাঁহার কানে পৌঁছায়, তবে তিনি অনুগ্রহ করিয়া এ রহস্য কি আমাদের বুঝাইয়া দিবেন? বলা বাহুল্য, ইহার অর্থ— 'যাঁহারা মতিমান্ তাঁহারা পিশুন-বচন অর্থাৎ নিন্দাবাক্যও অবধান করেন।'

রাধিকা অভিমানভরে কহিতেছেন ;

'কুজনক পীরিতি মরণ-অধীন।' সং ৮৫, পৃ. ৭৪

এই অতি সহজ চরণটির টীকায় সম্পাদক কহেন— 'কুজনের সহিত প্রীতি করিয়া এক্ষণে মরণের বশতাপন্ন হইলাম অথবা কুজনের প্রেম মরণাপেক্ষাও মন্দ।' এত কথা সম্পাদক কোথায় পাইলেন? ইহার অতি সহজ অর্থ :

'কুজনের প্রীতি মরণের অধীন, অর্থাৎ অধিক দিন বাঁচে না।'

পুস্তকের এক এক স্থান এমন দুর্বোধ যে, আমাদের সন্দেহ হয়, যে, হয় মূলের হস্তলিপিতে নয় ছাপিতে ছাপার ভুল হইয়া থাকিবে। একটা দৃষ্টান্ত দিই,

হরিণী জানয়ে ভাল কুটুম্ব বিবাদ
তবহুঁ ব্যাধক গীত শুনিতে করু সাধ॥ সং ৮৬, পৃ. ৭৫

সম্পাদক ইহার টীকা দেওয়া আবশ্যক বিবেচনা করেন নাই। কিন্তু আমরা ইহার অর্থ খুঁজিয়া পাই না। ইহার ঠিক অর্থ এই— 'হরিণী কুটুম্ব-বিবাদ উত্তম রূপ জানে তথাপি ব্যাধের গান শুনিতে তাহার সাধ।' এখানে 'কুটুম্ব-বিবাদ' কথাটার কেন ব্যবহার হইল, তাহা কি পাঠকেরা কিছু বুঝিতে পারিতেছেন? আমাদের বোধ হয় যে, উহা 'কুটিল নিষাদ' হইবে। অথবা কূট (অর্থাৎ

---

[1] চরণ চঞ্চল, চিত চঞ্চল ভাণ। পৃ. ৩
অর্থাৎ চরণ চঞ্চল এবং চিত্তেরও চঞ্চল ভাব। 'ভাণ' অর্থে ভাব।

ফাঁদ) শব্দজ একটা কিছু শব্দ ছিল, তাহাই ভ্রমক্রমে 'কুটুম্ব' শব্দে পরিণত হইয়াছে, এবং 'বিবাদ' শব্দ বোধ করি, 'নিষাদ' হইবে। আর-একটি অক্ষর-ভুলের উদাহরণ তুলিয়া দিই—

হরি যদি ফেরি পুছসি ধনি তোয়।
ইঙ্গিতে নিবেদন জানাওবি সোয়॥
যব চিতে দেখবি বড় অনুরাগ।
তৈখনে জানয়বি হৃদয়ে জনু লাগ॥

সং ৯১, পৃ. ৭৮

বিরহিণী রাধিকা কৃষ্ণের নিকট দূতী পাঠাইতেছেন। পাছে অপমান হইতে হয় এইজন্য প্রথমে ইঙ্গিতে কৃষ্ণের মনের ভাব বুঝিতে দূতীকে অনুরোধ করিতেছেন। রাধিকার ইচ্ছা, তাঁহার প্রতি কৃষ্ণের অনুরাগ লক্ষিত হইলে তবেই যেন মুখ ফুটিয়া সমস্ত নিবেদন করা হয়। সমস্ত গীতটির এই ভাব। উপরি-উদ্‌ধৃত শ্লোকের চতুর্থ চরণটি বুঝা যায় না। কিন্তু 'জানয়বি' শব্দ যদি 'জানাওবি' হয় তবে এইরূপ অর্থ হয়— যখনি চিত্তে বড়ো অনুরাগ দেখিবি, তখনি জানাবি ; হৃদয়ে যাহাতে লাগে। অর্থাৎ সেই সময় জানাইলেই হৃদয়ে লাগিবে।

রাধিকা ছল করিয়া সখীদের কহিতেছেন— কাল ঘুমাইয়াছিলাম, এমন সময় এক পুরুষ আসিলেন, তাঁহার অরুণ আঁখি ও লোহিত অধর দেখিয়া ভয়ে আমার কেশপাশ বিশৃঙ্খল হইয়া গেল, কপালে কাজল ও মুখে সিন্দূর লাগিল।

এক পুরুখ পুন আওল আগে।
কোপে অরুণ আঁখি অধরক রাগে॥
সে ভয়ে চিকুর চির (চীর?) আনহি গেল।
কপালে কাজর মুখে সিন্দূর ভেল।

সং ১০৯, পৃ. ৯৩

সম্পাদক টীকা করিতেছেন 'সেই ভয়ে চিকুর (বিদ্যুৎ) চির (দীর্ঘকালের জন্য) অন্যত্র গমন করিল।' এ টীকার কি কোনো অর্থ আছে? কোনো কথা নাই, বার্তা নাই, এমন সময় সহসা বিনামেঘে একটা বিদ্যুৎ খেলাইয়া যাইবে কেন, আমরা ভাবিয়া পাই না। চিকুর অর্থে কেশ। রাধিকা বলিতেছেন, সেই পুরুষের ভয়ে তাঁহার চিকুর ও চীর অন্যত্র গেল ; এবং বেশভূষার বিপর্যয় হইল।[১]

হিম হিমকর-কর তাপে তাপায়লু
ভৈগেল কাল বসন্ত।
কান্ত কাক মুখে নাহি সম্বাদই
কিয়ে করু মদন দুরন্ত।

সং ১২৮, পৃ. ২০৬

শীতল চন্দ্রের কিরণও আমাকে তাপিত করিল, বসন্ত আমার কাল হইল। কান্ত কাহারো মুখে সংবাদ লইলেন না; দুরন্ত মদন কী যে করিতেছে। সম্পাদক টীকা করিয়াছেন 'কান্ত কাকমুখেও সংবাদ পাঠাইলেন না, আমি এই দুরন্ত মদনে কি করিব?' কাকের সহিত সম্পাদকের বিশেষ সখ্য দেখা যাইতেছে। তিনি কাককে প্রেমের দূত এবং মতিমান্ লোকদের মন্ত্রী বলিয়া স্থির করিয়াছেন।

---

[১] মলিনচিকুর তনুচীরে। সং ১৩৯, পৃ. ১৬

কাকের বরঞ্চ বুদ্ধিমান বলিয়া একটা খ্যাতি আছে, কিন্তু প্রেমিক বলিয়া তাহার যশ আজ পর্যন্ত শুনা যায় নাই। হিন্দুস্থানীতে 'ক' বিভক্তি ষষ্ঠীতে ব্যবহার হয়, অতএব 'কাক' শব্দের অর্থ কাহার।

মাধব অবলা পেখনু মতিহীনা।
সারঙ্গ শবদে মদন স কোপিত
তেঞ দিনে দিনে অতি ক্ষীণা॥

সং ১৪৯, পৃ. ১২৪

টীকা উদ্‌ধৃত করি। 'সারঙ্গ শবদে— হরিণের শব্দ শুনিলে' হরিণের শব্দ শুনিলেও মদন প্রকুপিত হন মদনের এমন স্বভাব কোনো শাস্ত্রে লেখে না। সারঙ্গ শব্দের অর্থ যখন ভ্রমর হয়, কোকিল হয়, মেঘ হয়, ময়ূর হয় তখন মদনকে রাগাইবার জন্য হরিণকে ডাকিবার আবশ্যক?

দক্ষি পবন বহে কৈছে যুবতী সহে,
তাহে দুখ দেই অনঙ্গ।
গেলনুঁ পারাণ আশা দেই রাখই
দশ নখে লিখই ভুজঙ্গ॥

সম্পাদক কহিতেছেন— 'ইহার সম্যক অর্থগ্রহ হয় না।' চতুর্থ চরণটি অত্যন্ত দুর্বোধ্য সন্দেহ নাই। ইহার অর্থ এমন হইতে পারে যে, 'শিবের ভূষণ ভুজঙ্গকে মদন বিশেষরূপে ডরান, এই নিমিত্ত বিরহিণী নখে ভুজঙ্গ আঁকিয়া তাহাকে ভয় দেখাইয়া প্রাণকে আশা দিয়া রাখিতেছেন।' রাধিকার পক্ষে ইহা নিতান্ত অসম্ভব নহে, কারণ ইতিপূর্বে তিনি রাহু আঁকিয়া বিরহিণীর ভীতিস্বরূপ চাঁদকে ভয় দেখাইতে চেষ্টা পাইয়াছিলেন।

কৃষ্ণ বৃন্দাবন ত্যাগ করিয়া গেলে পর দূতী তাঁহার নিকটে গিয়া ব্রজ-বিরহিণীদের দুরবস্থা নিবেদন করিতেছেন।

তোহারি মুরলী সো দিগে ছোড়লি
ঝামরু ঝামরু দেহা।
জনু সে সোনারে কোষিক পাথরে
ভেজল কনক রেহা।

সং ১৬১, পৃ. ১৩৩

সম্পাদক প্রথম দুই চরণের অর্থ স্থির করিতে পারেন নাই। ইহার অর্থ— 'তোমার মুরলী তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিল (ছোড়লি; স্ত্রীলিঙ্গেই) ও তাহাদের দেহ শীর্ণ মলিন হইয়া আইল।' ঝামরু শব্দের অর্থ সম্বন্ধে আমাদের কিছু বক্তব্য আছে পরে কহিব।

বড় অপরূপ দেখিনু সজনি
নয়লি কুঞ্জের মাঝে।
ইন্দ্রনীল মণি কেতকে জড়িত
হিয়ার উপরে সাজে।

সম্পাদক 'কেতক' শব্দের অর্থ নির্মলী বৃক্ষ স্থির করিয়া বলিয়াছেন, 'কিরূপ উপমা হইল বুঝিতে পারিলাম না।' কেতক শব্দে কেয়া ফুল বুঝিতে বাধা কি? রাধা শ্যাম একত্র রহিয়াছেন যেন কেয়াফুলে ইন্দ্রনীল মণি জড়িত রহিয়াছে।

পুস্তকের মধ্যে ছোটো ছোটো অনেকগুলি অসাবধানতা লক্ষিত হয়। তাহার কতকগুলি দৃষ্টান্তস্বরূপে উল্লেখ করা আবশ্যক। আমাদের মতে এরূপ প্রাচীন কবিতাসমূহ সংগ্রহ করিতে

গেলে নিতান্ত সাবধানতার সহিত যথাসম্ভব নিখুঁত করিয়া তোলা উচিত, তিল পরিমাণ দোষ না থাকে যেন।

'কিয়ে' শব্দের অর্থ 'কি'। কি শব্দ বাংলায় অনেক অর্থে ব্যবহার হয়। জিজ্ঞাসার স্থলে, আশ্চর্যের স্থলে, যেমন— কি সুন্দর! এবং কিংবা অর্থেও প্রয়োগ হইয়া থাকে। প্রাচীন কবিতাতেও 'কিয়ে' শব্দের ঐ কয়টি অর্থ। সম্পাদক মহাশয় স্থানে স্থানে উলটাপালটা করিয়া একটার জায়গায় আর-একটা বসাইয়াছেন। দেখিলাম তিনি জিজ্ঞাসাসূচক 'কি' শব্দের উপর নিতান্ত নারাজ।

লোচন জনু থির ভৃঙ্গ আকার,
মধুমাতল কিয়ে উড়ই না পার? সং ৩, পৃ. ৪

অর্থাৎ, তাঁহার লোচন স্থিরভৃঙ্গের ন্যায় : মধুমত্ত হইয়া সে কি উড়িতে পারিতেছে না? সম্পাদক কহেন 'যেন মধুমত্ত হইয়া উড়িতে অক্ষম।'

দারুণ বঙ্ক বিলোকন থোর
কাল হোই কিয়ে উপজল মোর?

নিদারুণ ঈষৎ বঙ্কিম দৃষ্টি কি আমার কাল হইয়াই উৎপন্ন হইল? সম্পাদক কহেন 'কি বা আমার কালস্বরূপ হইয়া উপস্থিত হইল!' ইহা অত্যন্ত হাস্যজনক।

চিকুরে গলয়ে জলধারা
মুখশশি ভয়ে কিয়ে রোয়ে আন্ধিয়ারা?

এখানে 'মুখশশির ভয়ে আঁধার কি বা রোদন করিতেছে!' অর্থ করা অপেক্ষা 'মুখশশির ভয়ে কি আঁধার রোদন করিতেছে?' বলিলেই কানে ভালো শুনায়।

সম্পাদক 'কহসি' শব্দের এইরূপ টীকা করিয়াছেন— 'কহে (সি সংস্কৃত বিভক্তি)।' এ কেমন কথা বুঝিতে পারিলাম না। 'কহে' তৃতীয় পুরুষ, কিন্তু সংস্কৃতে দ্বিতীয় পুরুষ নহিলে 'সি' বিভক্তি হয় না। সম্পাদক এত স্থলে সি-অন্ত ধাতুর ভ্রমাত্মক অর্থ দিয়াছেন যে, উদ্‌ধৃত করিতে প্রবন্ধের কলেবর বাড়িয়া যায় ;

চলইতে চাহি চরণ নাহি যাব॥ সং ৮, পৃ. ১০

সম্পাদক 'যাব' শব্দের অর্থ বিশেষ করিয়া 'যায়' বলিয়া লিখিয়াছেন। ইহা ভবিষ্যৎকাল-বাচক-ক্রিয়া, ইহার অর্থ 'যায়' হইতে পারে না। ইহার অর্থ 'চলিতে চাহিতেছে তথাপি পা চলিবে না।'

'ঝামর' শব্দে সম্পাদক মেঘ কহিয়াছেন। কিন্তু সমস্ত পুস্তকের মধ্যে কোথাও ঝামর শব্দ মেঘ অর্থে ব্যবহৃত হয় নাই ; অথচ পদাবলীর মধ্যে পঞ্চাশ জায়গায় মেঘের উল্লেখ আছে।

কহ সখি সাঙরি ঝামরি দেহা॥ সং ৫৪, পৃ. ৫০

এবে ভেল বিপরীত, ঝামর দেহা॥ সং ১৪৭, পৃ. ১২৩

পুনমিক চাঁদ টুটি পড়ল জনু
ঝামর চম্পক দামে॥ সং ১৪৯, পৃ. ১২৪

তোহারি মুরলী সোদিগে ছোড়লি
ঝামরু ঝামরু দেহা॥ সং ১৬১, পৃ. ১৩৩

কুবলয়-নীল বরণ তনু সাঙরি
ঝামরি, পিউ পিউ ভাষ॥ সং ২১৪, পৃ. ১৭৭

সর্বত্রই ঝামর অর্থ শুষ্ক মলিন শব্দে উক্ত হইয়াছে। এক স্থলে শ্যামের কেশ বর্ণনায় ঝামর শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, সে স্থলে তাহার অর্থ কৃষ্ণবর্ণ হইতে পারে। সম্পাদক যদি এই পুস্তক ব্যতীত অন্য কোনো সূত্রে অনুসন্ধান করিয়া অবগত হইয়া থাকেন যে, ঝামর অর্থে মেঘ, তাহা হইলে আমাদের আর অধিক বক্তব্য থাকে না।

'আশ নিগড় করি জীউ কত রাখব
অবহ যে করত পয়াণ।'

সম্পাদক 'নিগড়' অর্থে 'গড়বন্দী করা' লিখিয়াছেন। সকলেই জানেন নিগড় অর্থ শৃঙ্খল। যাহা হউক, এরূপ ভুল তেমন মারাত্মক নহে ; যাঁহারা সংস্কৃত জানেন তাঁহাদের ইহাতে হানি হইবে না।

সমস্ত পুস্তকের মধ্যে এত অসাবধানতা, এত ভ্রম লক্ষিত হয়, যে, কিয়দ্দূর পাঠ করিয়াই সম্পাদকের প্রতি বিশ্বাস চলিয়া যায়। ইহার সমস্ত ভ্রম যে কেবল সম্পাদকের অক্ষমতা বশত ঘটিয়াছে তাহা নহে, ইহার অনেকগুলি তাঁহার অসাবধানতা বশত ঘটিয়াছে। এমন-কি, স্থানে স্থানে তিনি অভিধান খুলিয়া অর্থ দেখিবার পরিশ্রমটুকুও স্বীকার করেন নাই। এত অবহেলা এত আলস্য যেখানে, সেখানে এ কাজের ভার গ্রহণ না করিলেই ভালো হইত। আমাদের দেশে পাঠকেরা তেমন কড়াক্কড় নহেন বলিয়া তাঁহাদিগকে বিপথে চালন করিয়া লইয়া যাওয়া নিতান্ত অনুচিত। সম্পাদকের প্রশংসনীয় উদ্যোগ সত্ত্বেও আমরা তাঁহাকে যে এত কথা বলিলাম, তাহার কারণ বিদ্যাপতির কবিতা আমাদের অতি প্রিয় সামগ্রী, এবং পাঠকসাধারণকে আমরা উপেক্ষণীয় মনে করি না। আমরা এই প্রাচীন কাব্য-সংগ্রহের উদ্যোগকে উৎসাহ দিই। আমাদের ইচ্ছা, কোনো নিরলস, উৎসাহী ও কাব্যপ্রিয় সম্পাদক পুনশ্চ এই কার্যের ভার গ্রহণ করেন। শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার বিদ্যাপতির উপরেই প্রথম হস্তক্ষেপ করিয়াছেন, এই নিমিত্ত তাহাতে যে-সকল ভ্রম আছে তাহা অনেকটা মার্জনা করা যায় ; এখন আশা করি, এ বিষয়ে তাঁহার হাত অনেকটা পাকিয়া আসিয়াছে ; অতএব অধিকতর মনোযোগ সহকারে এই দেশহিতকর কার্য তিনি যেন সুচারুতর রূপে সম্পন্ন করিতে পারেন, এই আমাদের আন্তরিক ইচ্ছা।

শ্রাবণ ১২৮৮

উত্তর-প্রত্যুত্তর

উত্তর। বিগত শ্রাবণের ভারতীতে লিখিত প্রাচীন কাব্য সংগ্রহ বিষয়ক প্রস্তাব পাঠ করিলাম। পাঠান্তে মনোমধ্যে হর্ষ ও বিষাদ উভয়ই উদয় হইল। হর্ষের কারণ প্রস্তাব-লেখক মহাশয় বিশেষ পরিশ্রম করিয়া বাবু অক্ষয়চন্দ্র সরকার-কর্তৃক সম্পাদিত, বিদ্যাপতির পদাবলী পাঠ করিয়াছেন। এবং টীকাতে যে সমুদায় ভুল আছে তাহা সংশোধন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। গুরুতর পরিশ্রম করিয়া তিনি দুরূহ পদসমূহেরও ব্যাখ্যা করিয়াছেন। আমাদের বিবেচনায় তাঁহার কৃত ব্যাখ্যা অনেক স্থলে বিশদ হইয়াছে। যে জাতির যে কাব্যের যত প্রকার ব্যাখ্যা হয় সেই জাতির সেই কাব্যের তত গৌরবের কথা। এক-একখানি সংস্কৃত কাব্যের এক-একটি পদের নানা প্রকার অর্থ করা যাইতে পারে— ইহা সংস্কৃত ভাষার গৌরবের কথা সন্দেহ নাই। মিল্‌টনের প্যারেডাইস লস্টের অসংখ্য ব্যাখ্যা আছে— প্যারেডাইস লস্ট ইংরাজি ভাষার অমূল্য রত্ন। বিদ্যাপতির এক-একটি পদের নানা প্রকার অর্থ হওয়া আনন্দের কথা। কিন্তু তাঁহার কৃত পদাবলী পাঠ করিয়া ভিন্ন

ভিন্ন প্রকারের অর্থ করেন, এরূপ পাঠক বা লেখক-সংখ্যা বঙ্গদেশে অল্প— সাধারণত বঙ্গবাসী এ প্রকার কষ্টকর কার্যে হস্তক্ষেপ করিতে অগ্রসর হয়েন না। সেইজন্য ভারতীর প্রাচীন কাব্য সম্বন্ধীয় প্রস্তাব পাঠ করিয়া আমাদের এত হর্ষ হইয়াছে। আমাদিগের বিষাদের কারণ এই, যে, প্রস্তাব-লেখক মহাশয় নিরপেক্ষভাবে প্রাচীন কাব্য সংগ্রহের সমালোচনা করেন নাই। তিনি অনেক স্থানে সম্পাদকের অযথা নিন্দা করিয়াছেন। এ সম্বন্ধে আমাদের কিছু বক্তব্য আছে।

কোনো ব্যক্তি কোনো পুস্তকের টীকা করিবার পূর্বে এরূপ প্রতিজ্ঞা করিতে পারেন না, যে, তিনি যাহা লিখিবেন তাহাই নির্ভুল হইবে। আমরা যত দূর কাব্যসংগ্রহ পাঠ করিয়াছি তাহার কোনো স্থানেই সম্পাদক শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার এ প্রকার প্রতিজ্ঞা করেন নাই, সুতরাং চুক্তিভঙ্গের নালিশ তাঁহার উপর চলে না। কবিদিগের প্রতি অবিচার করার দাবিও করা যাইতে পারে না। কারণ কবিদিগের প্রতি অকৃত্রিম শ্রদ্ধা ও ভক্তি না থাকিলে সম্পাদক এ কার্যে হস্তক্ষেপ করিতেন কি না সন্দেহ। আমাদের বোধ হয় সাধারণ পাঠকবর্গ সম্পাদক যাহা-কিছু লিখিয়াছেন, তাহাই ভুল-শূন্য এ প্রত্যাশা করিয়া প্রাচীন কাব্য সংগ্রহ পাঠ করিতে আরম্ভ করেন না ; সুতরাং তাঁহারা উক্ত পুস্তকমধ্যে স্থানে স্থানে ভুল ব্যাখ্যা দেখিলে বোধ হয়, বিস্মিত হয়েন না।

শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার অকাতরে পরিশ্রম করিয়া, মহাজন পদাবলী সংগ্রহ করিয়াছেন। দুরূহ শব্দের অর্থ করিয়াছেন ; এমন-কি, লুপ্তপ্রায় পদাবলী সমূহকে মনোহর বেশভূষায় ভূষিত করিয়া, সাহিত্যজগতে আনয়নপূর্বক সাহিত্যপ্রিয় ব্যক্তিমাত্রেরই কৃতজ্ঞতার পাত্র হইয়াছেন। প্রবন্ধে লেখক-মহাশয় লিখিয়াছেন, যে, তিনি তজ্জন্য সম্পাদককে উৎসাহ দিলেন। কিন্তু কিরূপে যে তিনি উৎসাহ দিলেন, তাহা আমাদিগের বোধগম্য হইল না। বরং তিনি প্রকারান্তরে সম্পাদককে অলস অমনোযোগী প্রভৃতি বলিয়াছেন। তাঁহার লেখার ভাবে বোধ হইল, যে, সম্পাদকের নিন্দা করিবার অভিপ্রায়েই তিনি লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন।[১]

তৎকর্তৃক-সম্পাদিত পদাবলীর গুণাগুণ ব্যাখ্যা করা তাঁহার অভিপ্রায় ছিল না। নতুবা সম্পাদককে লজ্জিত করিবার জন্য এত চেষ্টা কেন? তাঁহার প্রতি এত তীব্র বিদ্রূপ নিক্ষেপ কেন? আমরা বলিয়াছি প্রবন্ধ-লেখক অনেক স্থানে সম্পাদকের অযথা নিন্দা করিয়াছেন, যাহা স্পষ্ট ভুল নহে তাহাকে ভুল প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, এক্ষণে দৃষ্টান্ত দ্বারা দেখাইব যে আমাদের কথা সত্য। তিনি লিখিয়াছেন—

> 'অলখিতে মোহে হেরি বিহসিতে থোরি।
> জনু বয়ান বিরাজে চাঁদ উজোরি।
> কুটিল কটাক্ষ ছটা পড়ি গেল।
> মধুকর ডম্বর অম্বর ভেল॥'

এই শ্লোকের শেষ ছত্রে সম্পাদক 'যেন' শব্দ কোথা হইতে পাইলেন এবং 'আচ্ছন্ন' শব্দই বা কোথা হইতে জুটিল? কোনো পদের অনুবাদ করা এক কথা, আর ব্যাখ্যা করা আর-এক কথা। অনুবাদ করিতে হইলে নিজ হইতে শব্দ দেওয়ার সকল সময়ে প্রয়োজন না হইতে পারে, কিন্তু ব্যাখ্যা করিতে হইলে অনেক সময়ে নূতন শব্দ প্রয়োগ করিতে হয় ; অন্যথা সকল স্থানে ব্যাখ্যা সরল হয় না। পাঠকেরাও উত্তম রূপ বুঝিতে পারেন না। উপরে উদ্‌ধৃত পদটিতে একটি উৎপ্রেক্ষা অলংকার আছে সুতরাং 'যেন' শব্দ প্রয়োগ করিয়া সম্পাদক কোনো দোষ করেন নাই। অনেক

---

[১] সুরুচি-সম্পন্ন পাঠকদিগের নিকট এ কথাটার উত্তর দিবার আবশ্যক বিবেচনা করিতেছি না। লেঃ—

কৃতবিদ্য সুপণ্ডিত ব্যক্তি সংস্কৃত শ্লোকের ব্যাখ্যাকালে নিজ হইতে অনেক শব্দ যোগ করিয়া দিয়াছেন। উদাহরণ—

'বশিষ্ঠ ধেনোরনুযায়িনস্তং
আবর্তমানং বনিতা বনান্তাৎ।
পপৌ নিমেষালস পক্ষ্ম পঙ্‌ক্তি
রুপোষিতাভ্যামিব লোচনাভ্যাম্।'

রঘুবংশ। দ্বিতীয়ঃ সর্গঃ, ১৯ শ্লোক

পণ্ডিত নবীনচন্দ্র ইহার এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন— 'রাজ্ঞী সুদক্ষিণা বন হইতে প্রত্যাগত বশিষ্ঠ ধেনুর অনুযায়ী রাজাকে নির্নিমেষ লোচনে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন, তাঁহার স্থির নিশ্চল দৃষ্টি দেখিয়া বোধ হইল যেন, তাঁহার লোচন যুগল বহুকাল উপোষিত থাকিয়া অতি তৃষ্ণার সহিত রাজার সৌন্দর্য পান করিতেছিল।' এক্ষণে জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে 'অতি তৃষ্ণার সহিত রাজার সৌন্দর্য পান' কোথা হইতে আসিল? আর-একজন পণ্ডিত ইহার টীকা করিয়াছেন, 'প বশিষ্ঠ ধেনুর অনুচর হইয়া বন হইতে প্রত্যাগমন করিতেছেন দেখিয়া রাজ্ঞী অনিমিষ নয়নে তাঁহাকে দেখিতে লাগিলেন। বোধ হইল যেন, তাঁহার নয়ন যুগল এতক্ষণ উপবাসী ছিল এখন তদীয় সৌন্দর্য সুধা পান করিতেছে।' 'সৌন্দর্য সুধা' কোথা হইতে আসিল? বাবু অক্ষয়চন্দ্র সরকার টীকা করিতে যাইয়া দুই-একটি নিজের শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন বলিয়া আমাদের প্রবন্ধ-লেখক তাঁহাকে বিদ্রূপ করিয়াছেন, কিন্তু এ-সকল টীকা পাঠ করিয়া তিনি কি বলিবেন বলিতে পারি না।

শ্রীযোগেন্দ্রনারায়ণ রায়

প্রত্যুত্তর— অর্থ ব্যাখ্যা করা এক, আর অর্থ তৈরি করা এক। অর্থ সহজ করিবার জন তাহাতে নূতন কথা যোগ করা কিছু মন্দ কাজ নহে, কিন্তু মূলে যে কথা নাই সেই কথা যোগ করিয়া অর্থ গড়িয়া তোলা দোষের নহে তো কী? লেখক আবার পাছে ভুল বুঝেন এই নিমিত্ত স্পষ্ট করিয়া উদাহরণ দিয়া বলিতে হইল। মনে করুন, 'সময় বসন্ত, কান্ত রহুঁ দূরদেশ' এই ছত্রটির অর্থ বুঝাইতে গিয়া আমি যদি বলি, 'বসন্তের ন্যায় এমন সুখের সময়ে, প্রাণের অপেক্ষা যাহাকে ভালোবাসি, সে কান্ত দূরদেশে রহিয়াছেন', তাহাতে দোষ পড়ে না; যদিও কথা বাড়াইলাম তথাপি কবির ভাবের অনুসরণ করিয়া চলিয়াছি। কিন্তু আমি যদি বলি 'বসন্ত অতিক্রম করিয়া গ্রীষ্ম আসিয়া পড়িল, তথাপি আমার কান্ত দূরদেশে রহিয়াছেন' তাহা হইলে অতিরিক্ত কথা ব্যবহারের জন্য আমি দোষী।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
প্রস্তাব-লেখক

উত্তর— 'লীলা-কমলে ভ্রমরা কিয়ে বারি
চমকি চললু ধনি চকিত নেহারি।'

লেখক লিখিয়াছেন 'লীলা-কমলের দ্বারা ভ্রমরকে নিবারণ' ইত্যাদি। আমাদের বিবেচনায় সম্পাদকের অর্থই বিশদ হইয়াছে। রাধিকার হস্তে লীলা-কমল কোথা হইতে আসিল? তিনি কি ভ্রমর তাড়াইবার জন্য লীলা-কমল হস্তে করিয়া বেড়াইতেন? সম্পাদক 'ন্যায়' 'সহিত' প্রভৃতি শব্দ ঘর হইতে দেওয়ায় যে মহাপাতক সঞ্চয় করেন নাই তাহা উপরে বলিয়াছি।

শ্রীযোঃ নাঃ রাঃ

প্রত্যুত্তর— 'লীলা-কমল' কোথা হইতে আসিল? তাহা ঠিক বলিতে পারি না, তবে এই পর্যন্ত বলিতে পারি যে তাহা আনাইতে কবির এক ফোঁটার অধিক কালি খরচ হইয়াছিল কি না সন্দেহ। চণ্ডীদাসের এক স্থানে আছে— 'চলে নীল শাড়ি নিঙ্গাড়ি নিঙ্গাড়ি, পরাণ সহিতে মোর।' লেখক তো জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, 'নীল শাড়ি কোথা হইতে আসিল? ঢাকা হইতে না বারাণসী হইতে?' চণ্ডীদাসের সেটা লেখা উচিত ছিল, সন্দেহ নাই, কিন্তু সে বিষয়ে চণ্ডীদাসের হইয়া একটা কথা বলা যায়। এ পর্যন্ত অনেক কবি নীল শাড়ি ও লীলাকমলের অপেক্ষাও অনেক দামী দুষ্প্রাপ্য জিনিস কাব্যে আনিয়াছেন, কিন্তু কোন্ দোকান হইতে আনাইয়াছেন, পাঠকদের উপকারার্থ তাহা লিখিয়া দেন নাই। সংস্কৃত কাব্যে সহস্র স্থানে লীলা-কমলের দ্বারা ভ্রমর তাড়াইবার উল্লেখ আছে।

শ্রীরঃ

উত্তর—

'যব গোধূলি সময় বেলি
ধনি মন্দির বাহির ভেলি,
নব জলধরে বিজুরী-রেখা
দ্বন্দ্ব পসারিয়া গেলি।'

এ পদের সম্পাদকীয় টীকাই আমাদের মতে পরিষ্কার ও ভাব-ব্যঞ্জক হইয়াছে। প্রবন্ধ-লেখক যে অর্থ করিয়াছেন তাহা পরিষ্কার হয় নাই। তিনি লিখিয়াছেন, 'রাধা গোধূলির ঈষৎ অন্ধকারে মন্দিরের বাহির হইলেন। যেন নব জলধরে বিদ্যুৎ রেখা দ্বন্দ্ব বিস্তার করিয়া গেল?' 'দ্বন্দ্ব' শব্দের এখানে অর্থ কী? কাহার সহিত দ্বন্দ্ব করিয়া গেল? সম্পাদক এই স্থানে 'পুন' শব্দ পরিত্যাগ করায় ও 'যেন' শব্দ নিজ গৃহ হইতে দেওয়ায় প্রবন্ধ-লেখক তাঁহার নিকট কৈফিয়ৎ চাহিয়াছেন। কিন্তু তিনি এক্ষণে 'যেন' ঘর হইতে দিয়াছেন এবং দ্বন্দ্ব কথাটির যথোচিত সম্মান রক্ষা করেন নাই! অন্যকে যে জন্য নিন্দা করিলাম নিজে সেই কার্যটি করিলে গভীর বুদ্ধির পরিচয় দেওয়া হয় না।

শ্রীযোঃ

প্রত্যুত্তর— সম্পাদকীয় টীকা উদ্‌ধৃত করি— 'বিদ্যুৎ-রেখার সহিত দ্বন্দ্ব বিস্তার করিয়া গেল। অর্থাৎ তাহার সমান বা অধিক লাবণ্যময়ী হইল।' এখানে 'সহিত' শব্দ যোজনা করা যে নিতান্ত জোর-জবরদস্তির কাজ হইয়াছে, তাহা কেহ অস্বীকার করিতে পারেন না। আমার অর্থ এই যে— অন্ধকারের কৃষ্ণবর্ণ ও রাধিকার গৌরবর্ণ মিলিয়া কেমন হইল, যেমন নবজলধরের সহিত বিদ্যুৎ-রেখার বিবাদ বিস্তৃত হইল। যদি বলি 'ঈশ্বরে আমি প্রীতি স্থাপন করিলাম' তাহা হইলে বুঝায়, ঈশ্বরের সহিত আমি প্রীতি করিলাম; তেমনি 'জলধরে বিদ্যুৎ বিবাদ বিস্তার করিল' অর্থে বুঝায়, জলধরের সহিত বিদ্যুৎ বিবাদ করিল।

শ্রীরঃ

উত্তর—

'এ সখি কি পেখনু এক অপরূপ।
শুনাইতে মানবি স্বপন স্বরূপ॥

...

শাখা-শিখর সুধাকর পাঁতি।
তাহে নব পল্লবে অরুণক ভাতি॥

...

তা পর চঞ্চল খঞ্জন যোড়।
তা পর সাপিনী ঝাঁপল মোড়॥'

২০-সংখ্যক গীত

প্রবন্ধ-লেখক ইহার মধ্যস্থ দুই চরণের এই অর্থ দিয়াছেন। 'সে তমাল তরুর শাখা শিখর অর্থাৎ মুখ, সুধাকর। লাবণ্যই বোধ করি অরুণ ভাতির পল্লবে।' পাঁতি শব্দটি কোথায় গেল? 'লাবণ্যই বোধ করি—' ইত্যাদি এই ছত্রের অর্থ আমরা বুঝিতে পারিলাম না।

শ্রীযোঃ

প্রত্যুত্তর— 'বোধ করি' শব্দ ব্যবহার করিবার তাৎপর্য এই যে, যেখানে অর্থ বোধে মনে কোনো প্রকার সন্দেহ থাকে সেখানে আমি অসংকুচিত ও অসন্দিগ্ধ ভাব দেখাইতে পারি না। এ অপরাধের যদি কোনো শাস্তি থাকে, তবে তাহা বহন করিতে রাজি আছি।

শ্রীরঃ

উত্তর— আর 'হাস্য স্থির বাস করে' কিরূপ বাংলা? শ্রীকৃষ্ণের কুন্তল সাপিনীর ন্যায়ই বা কি প্রকারে হইল? শ্রীকৃষ্ণের চূড়ার কথাই শুনিয়াছি। আমরা যে ব্যক্তির নিকট এই গীতটির ব্যাখ্যা শুনিয়াছি তিনি ইহার আদিরস-ঘটিত ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। সম্ভবত সেইজন্যই ইহার অর্থ করেন নাই।

শ্রীযোঃ

প্রত্যুত্তর— শ্রীকৃষ্ণের শরীর বর্ণনা করা ভিন্ন অন্য কোনো প্রকার গূঢ় আদিরস-ঘটিত অর্থ বুঝানো কবির অভিপ্রেত ছিল, তাহা আমি কোনো মতেই বিশ্বাস করিতে পারি না। 'চঞ্চল খঞ্জন' 'যুগল বিম্বফল' প্রভৃতি শব্দ প্রয়োগ দেখিয়া রূপ-বর্ণনা বলিয়াই স্পষ্ট অনুমান হইতেছে।

শ্রীরঃ

উত্তর—

'গগন সঘন, মহী পঙ্কা
বিঘিনি বিথারিত ইত্যাদি।'

এই পদে দুই-একটি ছাপার ভুল আছে। 'ভুললি' স্থানে 'ভুলালি' ও 'মানবি' স্থানে 'মানব' হইবে। তাহা হইলেই সম্পাদকের অর্থ থাকিয়া যাইবে। আশ্চর্যের বিষয়, যে, প্রবন্ধ-লেখক একটু চিন্তা করিয়া দেখেন নাই, সম্পাদক এ অর্থ দিলেন কেন। একেবারে সম্পাদকের অর্থকে ভুল বলিয়াছেন ; ইহাতে তাঁহার কতদূর বিজ্ঞতার পরিচয় প্রদান করা হইয়াছে, তাহা তিনিই বিবেচনা করুন।

শ্রীযোঃ

প্রত্যুত্তর— আশ্চর্যের বিষয় যে প্রবন্ধ-লেখক একটু চিন্তা করিয়া দেখেন নাই, যে, মূলে ও টীকায় উভয় স্থলেই অবিকল একই-রূপ ছাপার ভুল থাকা সম্ভব কি না? টীকার বন্ধনী-চিহ্নের মধ্যে যে কথাগুলি উদ্‌ধৃত আছে সেগুলির প্রতি লেখক একবার যেন দৃষ্টিপাত করেন।

শ্রীরঃ

উত্তর— পিশুন শব্দের টীকা না করিয়া প্রবন্ধ-লেখক যে টিপ্পনী করিয়াছেন, আমাদের চক্ষে তাহা ভালো লাগিল না। সম্পাদক-কৃত অর্থ ভালো না হওয়ায় প্রবন্ধ-লেখক যেন আনন্দিত

হইয়াছেন। তিনি যেন সম্পাদককে বিদ্রূপ করিবার সুযোগ খুঁজিতেছিলেন এবং সেই সুযোগ পাইয়াই দুইটা কথা শুনাইয়া দিয়াছেন। এ প্রকার লেখায় সাধারণ পাঠকবর্গের বা প্রাচীন-কাব্য সংগ্রহের— বিদ্যাপতি বা চণ্ডীদাসের কোনো লাভ হয় নাই— হইয়াছে, কেবল নিন্দা করিয়া লেখকের মনে সন্তোষ লাভ, আর যদি সম্পাদকের কেহ শত্রু থাকেন, তাহা হইলে তাঁহার মনে শান্তি লাভ।

শ্রীযোঃ

প্রত্যুত্তর— অসম্ভব ও অসংগত উক্তি শুনিলে আমাদের স্বভাবতই হাসি আসে। একজনকে একটা অদ্ভুত কার্য করিতে দেখিয়া বা অদ্ভুত কথা কহিতে শুনিয়া আমরা যদি হাসিয়া উঠি, সে কি বলিতে পারে যে, তাহার প্রতি শত্রুতা-বশত আমরা বহুদিন হইতে অবসর খুঁজিতেছিলাম, কখন সে অদ্ভুত কথা বলিবে ও আমরা হাসিয়া উঠিব? হাসি সামলাইতে পারি নাই, হাসিয়াছিলাম। মধ্যে মধ্যে এরূপ বেয়াদবি করিবার অধিকার সকল দেশের সাহিত্য-সমালোচক-দেরই আছে।

শ্রীরঃ

উত্তর— জানয়বি শব্দে 'য়' ভুল নহে। আমাদের বোধ হয় 'ন'তে আকার দিতে ছাপার ভুল হইয়া থাকিবে। হিন্দিতে যখন 'দেখায়ব' 'লিখায়ব' প্রভৃতি আছে, তখন জানায়ব বা জানায়বি না হইবে কেন? ছাপার ভুলের জন্য সম্পাদককে দায়ী করা যায় না। বিশেষত বঙ্গদেশে এমন পুস্তক খুব কম যাহাতে ছাপার ভুল নাই। আমাদের আলোচ্য প্রবন্ধেই ছাপার ভুল আছে; ছাপার ভুলের জন্য কোনো গ্রন্থকারকে কেহ দোষী করেন না। তবে নিন্দা করিবার অভিপ্রায় থাকিলে সে স্বতন্ত্র কথা।

শ্রীযোঃ

প্রত্যুত্তর— একে সহজেই দুর্বোধ্য ভাষা, তাহার উপরে ছাপার ভুল হইলে না কি বিশেষ হানি হইবার সম্ভাবনা এই নিমিত্তই আমরা বলি এ-সকল বই ছাপাইতে নিতান্তই পরিশ্রম করা আবশ্যক। সচরাচর প্রকাশিত বাংলা পুস্তকে ভুল থাকিলে তেমন হানি হয় না। প্রাচীন কবিতায়, কোন্‌টা ছাপার ভুল কোন্‌টা নহে তাহা নির্ণয় করা নিতান্তই দুঃসাধ্য। 'জানায়বি' এবং 'জানাওবি' উভয়ই হইতে পারে, অতএব 'য়' এবং 'ও' লইয়া আমার বিবাদ নহে— আমার কথা এই যে আকারটি না থাকাতে ছত্রটির অর্থ পাওয়া যায় না।

শ্রীরঃ

উত্তর—

'হিম হিমকর তাপে তাপায়লু
ভৈগেল কাল বসন্ত।
কান্ত কাক মুখে নাহিক সম্বাদই
কিয়ে করু মদন দুরন্ত।'

কান্ত কাকের মুখে সংবাদ পাঠাইলেন না পাঠ করিয়া প্রবন্ধ-লেখক অজ্ঞান হইয়াছেন। কাকের মুখে সংবাদ বড়ো আশ্চর্য কথা! লেখক নিশ্চয়ই কলিকাতাবাসী হইবেন, কাকের মুখে সংবাদ দেওয়ার কথা যে বঙ্গদেশের প্রায় সমুদয় স্থানেই (কলিকাতায় আছে কি না জানি না) প্রচলিত আছে, তাহা তিনি অবগত নহেন। কাকই যে প্রেমের দূত এরূপ নহে; কোকিলও সময়ে সময়ে প্রেমের দৌত্য কার্য করিয়া থাকে। আমরা একটি গীতে শুনিয়াছি— 'যা রে কোকিল আমার

বঁধু আছে যে দেশে' ইত্যাদি। হিন্দুস্থানী ভাষার ষষ্ঠীতে 'ক' বিভক্তি হইতে কোথাও দেখি নাই ; 'কা', 'কি', 'কে', 'কিস্‌কা' 'কিস্‌কী' 'কিস্‌কে' পড়িয়াছি। হিন্দি ব্যাকরণ ভাষা-চন্দ্রোদয়ে এই তিনটি বৈ ষষ্ঠীর বিভক্তি নাই। তবে 'তাক' হইতে তাহার 'কাক' হইতে কাহার টানিয়া বুনিয়া অর্থ করা যায়, কিন্তু তাহার সহিত ব্যাকরণের কোনো সংস্রব নাই।

শ্রীযোঃ

প্রত্যুত্তর— অমঙ্গল-সূচক কাক যে সংবাদ বহন করিতে পারে না এমন আমাদের কথা নহে। কিন্তু কোনো কবি এ পর্যন্ত কাককে প্রেমের ডাক-হরকরার কাজ দেন নাই। এ-সকল কাজ হংস, কোকিল, মেঘ, মাঝে মাঝে করিয়াছে। কাকের না চেহারা ভালো, না গলা ভালো, না স্বভাব ভালো, এই নিমিত্ত কবিরা কাককে প্রেমের কোমল কাজে নিযুক্ত করেন না। ব্যাকরণ-কারেরা যে ভাষার সৃষ্টি করে না, তাহা সকলেই জানেন। বিদ্যাপতি, গোবিন্দদাস প্রভৃতি কবিদের পদাবলীতে যদি শত শত স্থানে ষষ্ঠীতে 'ক' বিভক্তি ব্যবহার হইয়া থাকে, তবে আমার ব্যাকরণ খুলিবার কোনো আবশ্যক দেখিতেছি না। 'কি কহব, রে, সখি, কানুক রূপ।' 'সুজনক প্রেম হেম সমতুল।' 'প্রেমক রীত অব বুঝহ বিচারি।' 'যাক দরশ বিনা ঝরয়ে পরাণ, অব নাহি হেরসি তাক বয়ান।' এমন সহস্র উদাহরণ দেওয়া যায়।

শ্রীরঃ

উত্তর—

'দক্ষি পবন বহে কৈছে যুবতী সহে
তাহে দুখ দেই অনঙ্গ।
গেলহুঁ পরাণ আশা দেই রাখই
দশ নখে লিখই ভুজঙ্গ।

প্রবন্ধ-লেখক কৃত এই পদের অর্থ আমাদের বিশেষরূপে হৃদয়ঙ্গম হইল না। অনঙ্গ মহাদেবকেই ভয় করিতে পারে, বড়ো জোর না হয় নন্দীকে ভয় করিবে, কিন্তু সর্পকেও ভয় করিতে হইবে কেন বুঝা গেল না। সম্ভবত ইহার অন্য কোনো অর্থ আছে।

শ্রীযোঃ

প্রত্যুত্তর— আমি যে টীকা করিয়াছিলাম, তাহা উদ্‌ধৃত করি। 'শিবের ভূষণ ভুজঙ্গকে মদন ভয় করেন, এইজন্য বিরহিণী নখে ভুজঙ্গ আঁকিয়া তাহাকে ভয় দেখাইয়া প্রাণকে আশা দিয়া রাখিতেছেন।' এই পদটির আরম্ভেই আছে,

'হিমকর পেখি আনত করু আনন
...
নয়ন কাজর দেই লিখই বিধুন্তুদ'—
ইত্যাদি।

চন্দ্রকে ভয় দেখাইবার জন্য রাধা রাহু আঁকিয়াছেন, তবে মদনকে ভয় দেখাইবার অভিপ্রায়ে সাপ আঁকা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব নহে। এত দ্রব্য থাকিতে রাধা সাপ আঁকিতে গেলেন কেন? তাহার প্রধান কারণ, তিনি কখনো Art-School-এ পড়েন নাই, এই নিমিত্ত তাঁহার পক্ষে নন্দীর ছবি আঁকা অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার, কিন্তু মাটির উপরে অঙ্গুলি বুলাইয়া গেলেই অতি সহজে সাপ আঁকা যায়। তাহা ছাড়া, মহাদেবের সাপকে যে ভয় করিতে নাই এমন নহে।

শ্রীরঃ

পুস্তক-মধ্যে ছোটো ছোটো অসাবধানতা সম্বন্ধে যে-সকল কথা বলিয়াছেন, তাহার কতকগুলির উত্তর দেওয়ার উপযুক্ত পাত্র সম্পাদক স্বয়ং। আমরা কেবল এ সম্বন্ধে দুই-চারিটি কথা বলিব। 'কিয়ে' শব্দের অর্থ কি অপেক্ষা কিবা ভালো হয়। 'কিয়ে' শব্দের স্থানে কি হয় কিনা, আমাদের সন্দেহ আছে। 'কিয়া' শব্দেই হিন্দিতে কি। কিয়ে শব্দে উর্দুতে করিয়াছিল অর্থ হয়। এরূপ অবস্থায় কিয়ে শব্দের অর্থে কিবা ব্যবহার করিয়া সম্পাদক দুষ্কর্ম করেন নাই। আর হাস্যজনক কথা কোথাও দেখিলাম না।

শ্রীযোঃ

প্রত্যুত্তর— 'কিয়ে' শব্দের অর্থে জিজ্ঞাসাসূচক 'কি' হয় কি না, এ বিষয়ে লেখকের সন্দেহ আছে। কিন্তু কেবলমাত্র ব্যাকরণ না পড়িয়া প্রাচীন কবিতা ভালো করিয়া পড়িলে এ সন্দেহ সহজেই যাইবে। উদাহরণ দেওয়া যাক।

'হাম যদি জানিয়ে পিরীতি দুরন্ত,
তব্ কিয়ে যায়ব পাপক অন্ত?'
'হাম যদি জানিতুঁ কানুক রীত
তব কিয়ে তা সঙে বাঁধিয়ে চিত?'

শ্রীরঃ

যাহা হউক এই প্রস্তাব লইয়া বিবাদ করা আমাদিগের অভিলাষ নহে। আমরা সম্পাদকের পক্ষে বা প্রবন্ধ-লেখকের বিপক্ষে নহি। প্রবন্ধ-লেখক মহাশয় স্থানে স্থানে যে-সকল ভুল বাহির করিয়াছেন তাহার মধ্যে কতকগুলি আমাদের ভুল বলিয়া বিশ্বাস হইয়াছে। তবে প্রবন্ধ-লেখক মহাশয় সম্পাদকের উপর যে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য ভাব প্রকাশ করিয়াছেন ; তাঁহার গুরুতর পরিশ্রমের কথা বিস্মৃত হইয়া প্রকারান্তরে তাঁহাকে অলস ও এ কার্যে অক্ষম বলিয়া অন্য কোনো ব্যক্তিকে এই কার্যে হস্তক্ষেপ করিতে অনুরোধ করিয়াছেন— ইহা আমাদের ভালো লাগে নাই। আমরা পূর্বেও বলিয়াছি, এখনো বলিতেছি, যে, লেখার ভাব দেখিয়া আমাদের বোধ হইয়াছে যে, লেখক যেন, দোষ দেখাইয়া আনন্দ লাভ করিবার জন্যই কলম ধারণ করিয়াছিলেন। যেন তিনি কোনো কারণ প্রযুক্ত ইতিপূর্বে সম্পাদকের উপর চটিয়া ছিলেন, এক্ষণে সুযোগ পাইয়া এই প্রস্তাবে গাত্রের জ্বালা নিবারণ করিয়াছেন। এ প্রকার লেখার প্রশ্রয় আমরা দিতে পারি না।

আর সম্পাদকের নিকট আমাদের প্রার্থনা যে, তিনি যেন তাঁহার কাব্য-সংগ্রহের দ্বিতীয় সংস্করণে ইহার ভুলগুলি সংশোধন করিয়া দেন। তিনি গুরু পরিশ্রম করিয়া কাব্য সংগ্রহ করিয়াছেন তজ্জন্য বঙ্গবাসী তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ আছে। আর একটু পরিশ্রম করিয়া সামান্য সামান্য ভুলগুলি সংশোধন করিয়া দিলে আমরা তাঁহার নিকট অধিকতর কৃতজ্ঞ হইব।

শ্রীযোগেন্দ্রনারায়ণ রায়

প্রত্যুত্তর— যৎসামান্য শ্রম-স্বীকার পূর্বক ব্যাকরণ ও অভিধান না খুলিয়া সম্পাদক মহাশয় অসংকোচে টীকা করিয়া যাওয়াতে যে-সকল ভ্রমে পড়িয়াছেন, তাহা যদি সমস্ত উদ্‌ধৃত করিয়া দিই তাহা হইলে সহজেই প্রমাণ হইবে যে, আমি তাঁহাকে যে নিন্দা করিয়াছি তাহা অযথা হয় নাই। আমার প্রতি অন্যায় ও রুচি-বিগর্হিত দোষারোপ দূর করিবার নিমিত্ত ভবিষ্যতে সেইগুলি বিবৃত করিবার মানস রহিল। আমি সাহিত্যের সেবক। সাহিত্য লইয়াই অক্ষয়বাবুর সহিত বিবাদ করিয়াছি, তাহা আমার কর্তব্য কর্ম। সাহিত্য-বহির্ভূত ব্যক্তিগত কোনো কথার উল্লেখ করিয়া তাঁহার প্রতি আমার আক্রোশ প্রকাশ করি নাই ; এমন স্থলে যদি কেহ বলেন যে, 'লেখক কোনো

কারণ প্রযুক্ত ইতিপূর্বে সম্পাদকের উপর চটিয়া ছিলেন, এক্ষণে সুযোগ পাইয়া এই প্রস্তাবে গাত্রের জ্বালা নিবারণ করিয়াছেন' তবে তাঁহার শিক্ষার অসম্পূর্ণতা ও রুচির বিকার প্রকাশ পায়। লেখক যাহাই মনে করুন, অক্ষয়বাবুর উপর আমার এতখানি বিশ্বাস আছে, যাহাতে অসংকোচে বলিতে পারি যে, তিনি এরূপ মনে করিবেন না। তিনি যে আদৌ এমন কষ্টসাধ্য ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন, এবং এই কার্যসাধনে (আমার মনের মতো না হউক তবুও) অনেকটা পরিশ্রম করিয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতেছি, ও পূর্ব প্রবন্ধে যদি যথেষ্ট না করিয়া থাকি তবে মার্জনা চাহিতেছি।

ভাদ্র ১২৮৮

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পরিশিষ্ট

উপস্থিত-সংখ্যক ভারতীতে বিদ্যাপতি সম্বন্ধে আমার একটি মাত্র বক্তব্য আছে। প্রাচীন-কাব্য-সংগ্রহ সমালোচনায় আমি 'এ সখি, কি পেখনু এক অপরূপ' ইত্যাদি পদটির অর্থ প্রকাশ করিয়াছিলাম। কিন্তু তাহার এক স্থানে অর্থ বুঝিতে গোলযোগ ঘটায় সন্দিগ্ধভাবে একটা অনুমান-করিয়া-লওয়া ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়াছিল। আর-একবার মনোযোগপূর্বক ভাবিয়া ইহার যে অর্থ পাইয়াছি, তাহাতে আর সন্দেহ করিবার কিছু নাই। কেহ কেহ বলেন এই পদটির আদিরস-ঘটিত গূঢ় অর্থ আছে; কিন্তু তাহা কোনো মতেই বিশ্বাস করা যায় না। সহজেই ইহার যে অর্থ পাওয়া যায় তাহা অগ্রাহ্য করিয়া ইহার মধ্য হইতে একটা অশ্লীল আদিরস-ঘটিত অর্থ বাহির করা নিতান্ত কষ্টকল্পনা ও অরসিক-কল্পনার কাজ। শ্রীকৃষ্ণের শরীরের বর্ণনাই ইহার মর্ম। প্রথমে পদটি উদ্‌ধৃত করি।

এ সখি কি পেখনু এক অপরূপ।
শুনাইতে মানবি স্বপন স্বরূপ॥
কমল-যুগল পর চাঁদকি মাল।
তা'পর উপজল তরুণ তমাল॥
তা'পর বেড়ল বিজুরী লতা।
কালিন্দী তীর ধীর চলি যাতা॥
শাখাশিখর সুধাকর পাঁতি।
তাহে নব-পল্লব অরুণক ভাতি॥
বিমল বিম্ব ফল যুগল বিকাশ।
তা'পর কির থির করু বাস॥
তা'পর চঞ্চল খঞ্জন যোড়।
তা'পর সাপিনী ঝাঁপল মোড়॥

সকলেই জানেন, দেবতাদের শরীর বর্ণনায় পা হইতে প্রথমে আরম্ভ করিয়া উপরে উঠিতে হয়। এই পদ্ধতি অনুসারে কবি প্রথমে নখ-চন্দ্র-মালা শোভিত চরণ-কমল-যুগলের বর্ণনা করিয়াছেন, তাহার উপরে তরুণ তমাল স্বরূপ কৃষ্ণের পদদ্বয় উঠিয়াছে। তাহার পর বিজুরী লতা অর্থাৎ পীত বসন সে পদদ্বয় বেষ্টন করিয়াছে; (বিদ্যুতের সহিত পীত বসনের উপমা অন্যত্র

আছে, যথা— ‘অভিনব জলধর সুন্দর দেহ। পীত বসন পরা সৌদামিনী সেহ॥’)। পদদ্বয়ের বর্ণনা সমাপ্ত হইলে পর পদদ্বয়ের কার্যের উল্লেখ হইল— ‘কালিন্দী তীর ধীর চলি যাতা॥’ তাহার পরে বাহুই শাখাদ্বয় ও তাহার অগ্রভাগে নখরের সুধাকর-পঙ্‌ক্তি ও তাহাতে অরুণভাতি করপল্লব। এইবারে বর্ণনা মুখমণ্ডলে আসিয়া পৌছিল। প্রথমে বিম্বফল ওষ্ঠাধর যুগল তাহাতে কিরণ অর্থাৎ হাস্য স্থির রূপে বাস করে। তাহার ঊর্ধ্বে চঞ্চল-খঞ্জন চক্ষু। ও সকলের ঊর্ধ্বে সাপিনীর বেষ্টনের ন্যায় শ্রীকৃষ্ণের চূড়া।

এখন আমি অসংকোচে ও নিঃসন্দিগ্ধ চিত্তে বলিতে পারি যে, উপরি-উক্ত অর্থই, ঐ পদটির যথার্থ অর্থ। ইহা ব্যতীত অন্য কোনো গূঢ় অর্থ বুঝানো কবির অভিপ্রায় ছিল না।[১]

কার্তিক ১২৮৮ শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শব্দ-চয়ন : ১

বাংলা ভাষায় গদ্য লিখতে নতুন শব্দের প্রয়োজন প্রতিদিনই ঘটে। অনেক দিন ধরে অনেক রকম লেখা লিখে এসেছি সেই উপলক্ষে অনেক শব্দ আমাকে বানাতে হল। কিন্তু প্রায়ই মনের ভিতরে খটকা থেকে যায়। সুবিধা এই যে বার বার ব্যবহারের দ্বারাই শব্দবিশেষের অর্থ আপনি পাকা হয়ে উঠে, মূলে যেটা অসংগত, অভ্যাসে সেটা সংগতি লাভ করে। তৎসত্ত্বে সাহিত্যের হট্টগোলে এমন অনেক শব্দের আমদানি হয়, যা ভাষাকে যেন চিরদিনই পীড়া দিতে থাকে। যেমন ‘সহানুভূতি’। এটা sympathy শব্দের তর্জমা। ‘সিম্প্যাথি’-র গোড়াকার অর্থ ছিল ‘দরদ’। ওটা ভাবের আমলের কথা, বুদ্ধির আমলের নয়। কিন্তু ব্যবহারকালে ইংরেজিতে ‘সিম্প্যাথি’-র মূল অর্থ আপন ধাতুগত সীমা ছাড়িয়ে গেছে। তাই কোনো একটা প্রস্তাব সম্বন্ধেও সিম্প্যাথি-র কথা শোনা যায়। বাংলাতেও আমরা বলতে আরম্ভ করেছি ‘এই প্রস্তাবে আমার সহানুভূতি আছে’। বলা উচিত ‘সম্মতি আছে’ বা ‘আমি এর সমর্থন করি’। যা-ই হোক্— সহানুভূতি কথাটা যে বানানো কথা এবং ওটা এখনো মানান-সই হয় নি তা বেশ বোঝা যায় যখন ও শব্দটাকে বিশেষণ করবার চেষ্টা করি। ‘সিম্প্যাথেটিক্’-এর কী তর্জমা হতে পারে, ‘সহানুভৌতিক’, বা ‘সহানুভূতিশীল’ বা ‘সহানুভূতিমান’ ভাষায় যেন খাপ খায় না— সেইজন্যেই আজ পর্যন্ত বাঙালি লেখক এর প্রয়োজনটাকেই এড়িয়ে গেছে। দরদের বেলায় ‘দরদী’ ব্যবহার করি, কিন্তু সহানুভূতির বেলায় লজ্জায় চুপ ক’রে যাই। অথচ সংস্কৃত ভাষায় এমন একটি শব্দ আছে, যেটা একেবারেই তথার্থক। সে হচ্ছে ‘অনুকম্পা’। ধ্বনিবিজ্ঞানে ধ্বনি ও বাদ্যযন্ত্রের তারের মধ্যে সিম্প্যাথি-র কথা শোনা যায় —যে সুরে বিশেষ কোনো তার বাঁধা, সেই সুর শব্দিত হলে সেই তারটি অনুধ্বনিত হয়। এই তো ‘অনুকম্পন’। অন্যের বেদনায় যখন আমার চিত্ত ব্যথিত হয়, তখন সেই তো ঠিক ‘অনুকম্পা’। ‘অনুকম্পায়ী’ কথাটা সংস্কৃতে আছে। ‘অনুকম্পাপ্রবণ’ শব্দটাও মন্দ শোনায় না। ‘অনুকম্পালু’ বোধ করি ভালোই চলে। মুশকিল এই যে, দখলের দলিলটাই ভাষায় স্বত্বের দলিল হয়ে ওঠে। কেবলমাত্র এই কারণেই ‘কান, সোনা, চুন, পান’ শব্দগুলোতে মূর্ধন্য ণ-য়ের অনধিকার নিরোধ করা এত দুঃসাধ্য হয়েছে। ছাপাখানার অক্ষর-যোজকেরা সংশোধন মানে না। তাদের প্রশ্ন

---

[১] অপিচ দ্রষ্টব্য “জিজ্ঞাসা ও উত্তর”, ভারতী, জ্যৈষ্ঠ-শ্রাবণ, ১২৯০।

করা যেতে পারত যে, কানের এক 'সোনায়' যদি মূর্ধন্য ণ লাগল, তবে অন্য 'শোনায়' কেন দন্ত্য ন লাগে। 'শ্রবণ' শব্দের র-ফলা লোপ হবার সঙ্গে সঙ্গে তার মূর্ধন্য ণ সংস্কৃত ব্যাকরণ মতেই দন্ত্য ন হয়েছে। অথচ 'স্বর্ণ' শব্দ যখন রেফ বর্জন ক'রে 'সোনা' হল, তখন মূর্ধন্য ণ-য়ের বিধান কোন্ মতে হয়? হাল আমলের নতুন সংস্কৃত-পোড়োরা 'সোনা'কে শোধন ক'রে নিয়েছেন, তাঁদের স্বকল্পিত ব্যাকরণবিধির দ্বারা— এখন দখল প্রমাণ ছাড়া স্বত্বের অন্য প্রমাণ অগ্রাহ্য হয়ে গেল। 'শ্রবণ' শব্দের অপভ্রংশ শোনা শব্দ যখন বাংলা ভাষায় বানান-দেহ ধারণ করেছিল, তখন বিদ্যাসাগর প্রভৃতি প্রাচীন পণ্ডিতেরা বিধানকর্তা ছিলেন— সেদিনকার বানানে কান সোনা প্রভৃতিরও মূর্ধন্যত্ব প্রাপ্তি হয় নি। কৃষ্ণ শব্দজাত কানাই শব্দে আজও দন্ত্য ন চলছে, বর্ণ (বর্ণ যোজন) শব্দজাত বানান শব্দে আজও মূর্ধন্য ণ-এর প্রবেশ ঘটে নি তাতে কি পাণ্ডিত্যের খর্বতা ঘটেছে?

কিছুকাল পূর্বে যখন ভারতশাসনকর্তারা 'ইন্টারন্' শুরু করলেন, তখন খবরের কাগজে তাড়াতাড়ি একটা শব্দ সৃষ্টি হয়ে গেল— 'অন্তরীণ'। শব্দসাদৃশ্য ছাড়া এর মধ্যে আর কোনো যুক্তি নেই। বিশেষণে ওটা কী হতে পারে, তাও কেউ ভাবলেন না। Externmentকে কি বলতে হবে 'বহিরীণ'? অথচ 'অন্তরায়ণ, অন্তরায়িত, বহিরায়ণ, বহিরায়িত' ব্যবহার করলে আপত্তির কারণ থাকে না, সকল দিকে সুবিধাও ঘটে।

নূতন সংঘটিত শব্দের মধ্যে কদর্যতায় শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেছে 'বাধ্যতামূলক শিক্ষা'। প্রথমত শিক্ষার মূলের দিকে বাধ্যতা নয়, ওটা শিক্ষার পিঠের দিকে। বিদ্যাদান বা বিদ্যালাভই হচ্ছে শিক্ষার মূলে— তার প্রণালীতেই 'কম্পাল্শন্'। অথচ 'অবশ্য-শিক্ষা' শব্দটা বলবামাত্র বোঝা যায় জিনিসটা কী। 'দেশে অবশ্য-শিক্ষা প্রবর্তন করা উচিত'— কানেও শোনায় ভালো, মনেও প্রবেশ করে সহজে। কম্পালসারি এডুকেশনের বাংলা যদি হয় 'বাধ্যতামূলক শিক্ষা', 'কম্পালসারি সাবজেক্ট' কি হবে 'বাধ্যতামূলক পাঠ্য বিষয়'? তার চেয়ে 'অবশ্য-পাঠ্য বিষয়', কি সংগত ও সহজ শোনায় না? 'ঐচ্ছিক' (optional) শব্দটা সংস্কৃতে পেয়েছি, তারই বিপরীতে 'আবশ্যিক' শব্দ ব্যবহার চলে কি না, পণ্ডিতদের জিজ্ঞাসা করি। ইংরেজিতে যে-সব শব্দ অত্যন্ত সহজ ও নিত্য প্রচলিত, দরকারের সময় বাংলায় তার প্রতিশব্দ সহসা খুঁজে পাওয়া যায় না, তখন তাড়াতাড়ি যা হয় একটা বানিয়ে দিতে হয়। সেটা অনেক সময় বেখাপ হয়ে দাঁড়ায়, অনেক সময় মূল ভাবটা ব্যবহার করাই স্থগিত থাকে। অথচ সংস্কৃত ভাষায় হয়তো তার অবিকল বা অনুরূপ ভাবের শব্দ দুর্লভ নয়। একদিন 'রিপোর্ট' কথাটার বাংলা করবার প্রয়োজন হয়েছিল। সেটাকে বানাবার চেষ্টা করা গেল, কোনোটাই মনে লাগল না। হঠাৎ মনে পড়ল কাদম্বরীতে আছে 'প্রতিবেদন'— আর ভাবনা রইল না। 'প্রতিবেদন, প্রতিবেদিত, প্রতিবেদক'— যেমন ক'রেই ব্যবহার করো, কানে বা মনে কোথাও বাধে না। জনসংখ্যার অতিবৃদ্ধি 'ওভারপপ্যুলেশন'— বিষয়টা আজকাল খবরের কাগজের একটা নিত্য আলোচ্য ; কোমর বেঁধে ওর একটা বাংলা শব্দ বানাতে গেলে হাঁপিয়ে উঠতে হয়— সংস্কৃত শব্দকোষে তৈরি পাওয়া যায়, 'অতিপ্রজন'। বিদ্যালয়ের ছাত্র সম্বন্ধে 'রেসিডেন্ট', 'নন্‌রেসিডেন্ট' বিভাগ করা দরকার, বাংলায় নাম দেব কী? সংস্কৃত ভাষায় সন্ধান করলে পাওয়া যায় 'আবাসিক', 'অনাবাসিক'। সংস্কৃত শব্দভাণ্ডারে আমি কিছুদিন সন্ধানের কাজ করেছিলেম। যা সংগ্রহ করতে পেরেছি, তা শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমারের প্ররোচনায় প্রকাশ করবার জন্য তাঁর হাতে অর্পণ করলুম। অন্তত এর অনেকগুলি শব্দ বাংলা লেখকদের কাজে লাগবে ব'লে আমার বিশ্বাস।

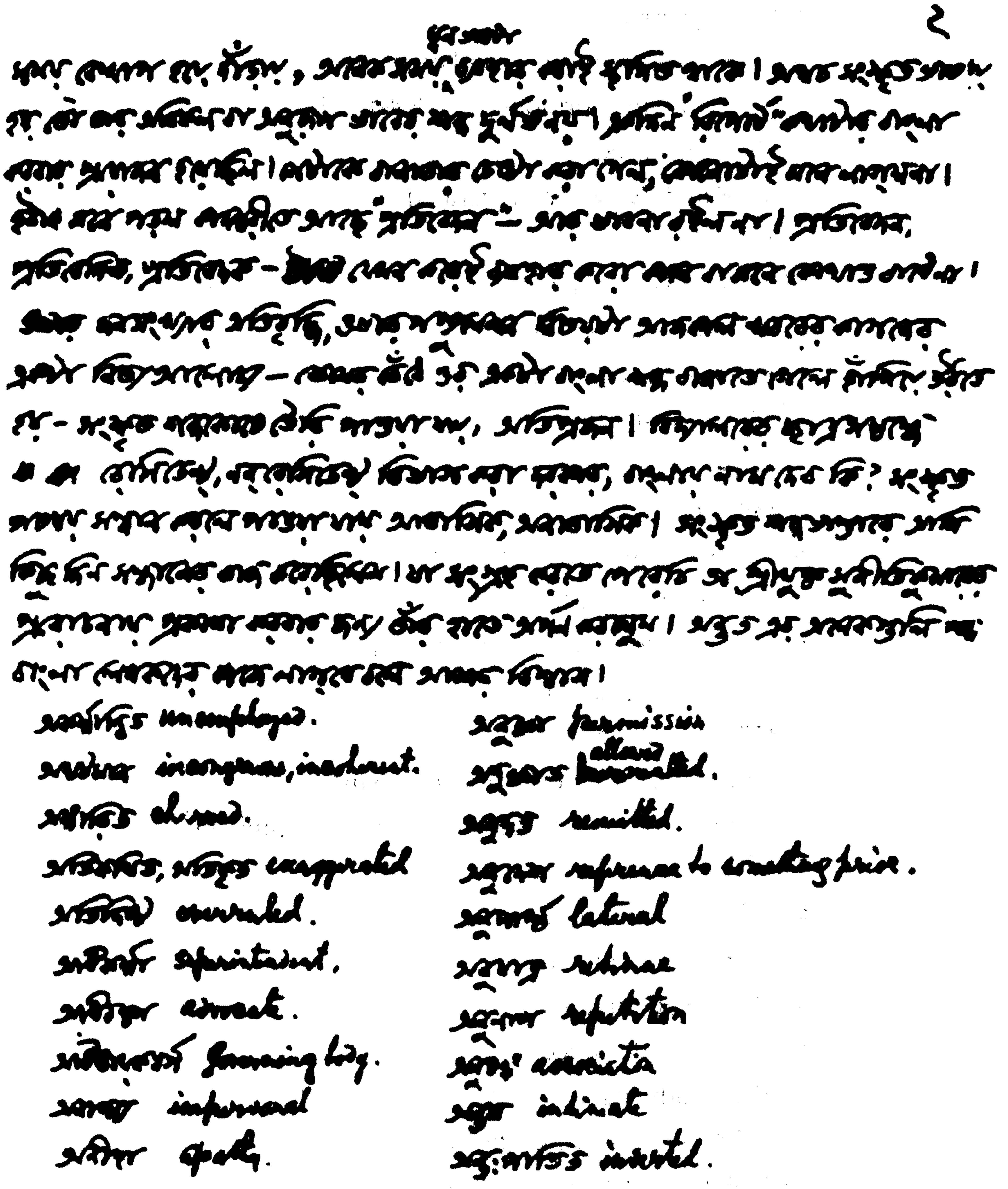

অনধিযুক্ত	unemployed.
[illegible]	incongruous, inadequate.
অপিহিত	closed.
অনধিকৃত, অগৃহীত	unappropriated
[illegible]	unrivaled.
[illegible]	superintendent.
[illegible]	aircraft.
[illegible]	governing body.
[illegible]	informal
অনীহা	apathy.
অনুজ্ঞা	permission
অনুজ্ঞাত	allowed.
[illegible]	remitted.
[illegible]	reference to working price.
অনুপার্শ্ব	lateral
অনুযাত্র	retinue
[illegible]	repetition
অনুষঙ্গ	association
[illegible]	intimate
অন্তঃপাতিত	inserted.

"শব্দচয়ন" প্রবন্ধের পাণ্ডুলিপি

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-সংগ্রহভুক্ত

অকর্মান্বিত—unemployed
অক্ষিভিষক্—oculist
অঘটমান—incongruous, incoherent
অঙ্কূয়ৎ—moving tortuously : অঙ্কূয়তী নদী
অঙ্গারিত—charred
অতিকথিত, অতিকৃত—exaggerated
অতিজীবন—survival
অতিদিষ্ট—overruled
অতিপরোক্ষ—far out of sight
অতিপ্রজন—over-population
অতিভৃত—well-filled
অতিমেমিষ চক্ষু—staring eyes
অতিষ্ঠা—precedence
অতিষ্ঠাবান—superior in standing
অতিসর্গ—act of parting with
অতিসর্গ দান করা—to bid anyone farewell
অতিসর্পণ—to glide or creep over
অতিসারিত—made to pass through
অতিস্রুত—that which has been flowing over
অত্যন্তগত—completely pertinent, always applicable
অত্যন্তীন—going far
অত্যূর্মি—bubbling over
অধঃখাত—undermined
অধিকর্মা—superintendent
অধিজানু—on the knees
অধিবক্তা—advocate
অধিষ্ঠায়কবর্গ—governing body
অনপক্ষেপ্য—not to be rejected
অনপেক্ষিত—unexpected
অনাত্ম্য—impersonal
অনাপ্ত—unattained
অনাপ্য—unattainable
অনাবাসিক—non-resident
অনাবেদিত—not notified
অনায়ক—having no leader

অনায়তন—groundless
অনায়ুষ্য—fatal to long life
অনারত—without interruption
অনার্তব—unseasonable
অনালম্ব—unsupported
অনাস্থান—having no basis or fulcrum
অনিকামতঃ—involuntarily
অনিজক—not one's own
অনিন—feeble, inane
অনিভৃত—not private, public
অনির্বিদ—undesponding
অনিষ্ঠা—unsteadiness
অনীহা—apathy
অনুকম্পায়ী—condoling
অনুকল্প—alternative
অনুকাঙ্ক্ষা—longing
অনুকাল—opportune
অনুকীর্ণ—crammed
অনুকীর্তন—proclaiming, publishing
অনুক্রকচ—serrated
অনুগামুক—habitually following
অনুজ্ঞা—permission
অনুজ্ঞাত—allowed
অনুত্ম—muffled (sound)
অনুদত্ত—remitted
অনুদেশ—reference to something prior
অনুপর্বত—promontory
অনুপার্শ্ব—lateral
অনুযাত্র—retinue
অনুরথ্যা—side-road
অনুলাপ—repetition
অনুষঙ্গ—association
অন্তঃপাতিত—inserted
অন্তম—intimate
অন্তয্য [অন্তর্য]—interior

অন্তরায়ণ—internment
অন্তরীয়—under-garment
অন্তর্জাত—inborn
অন্তর্ভৌম—subterranean
অন্তশ্ছেদ—intercept
অপক্ষেপ—reject
অপচেতা—spendthrift
অপণ্য—not for sale, unsalable
অপপাঠ—wrong reading
অপম—the most distant
অপলিখন—to scrape off
অপশব্দ—vulgar speech
অপহাস—a mocking laugh
অপাটব—awkwardness
অপ্রতিষ্ঠ—unstable
অপ্রভ—obscure
অপ্সুদীক্ষা—baptism
অবঘোষণা—announcement
অবধূলন—scattering over
অবমতি—contempt
অবমন্তব্য—contemptible
অবরপুরুষ—descendant
অবরার্ধ—the least part
অবর্জনীয়—inevitable
অবশ্চুত—trickled down
অবস্থাপন—exposing goods for sale
অবিতর্কিত—unforeseen
অবুদ্ধিপূর্ব—not preceded by intelligence
অবেক্ষা—observation
অভয়দক্ষিণা—promise of protection from danger
অভয়পত্র—a safe conduct
অভিজ্ঞানপত্র—certificate
অভিসমবায়—association
অভ্যাঘাত—interruption
অরত—apathetic

অর্থপদবী—path of advantage
অর্ম—ruins, rubbish
অল্পোন—slightly deficient
অশ্রি—angle, sharp side of anything
অসংপ্রতি—not according to the moment
অস্তব্যস্ত—scattered, confused
আকরিক, আখনিক—miner
আকল্প—design
আকৃত—shaped
আগামিক—incoming
আঙ্গিক—technique : আঙ্গিকভাব
আচয়—collection
আচিত—collected
আত্মকীয়, আত্মনীয়, আত্মনীন—one's own, original
আত্মতা—essence
আত্মবিবৃদ্ধি—self-aggrandisement
আত্যয়িক—urgent
আনৈপুণ্য—clumsiness
আপতিক—accidental
আপাতমাত্র—being only momentary
আবাসিক—resident
উক্তপ্রত্যুক্ত—discourse
উচ্চয় অপচয়—rise and fall
উচ্চণ্ড—very passionate
উচ্ছিষ্ট কল্পনা—stale invention
উচ্ছ্রায়, উচ্ছ্রিতি—elevation
উৎপারণ—to transport over
উত্তত—stretching oneself upwards
উত্তম্ভিত—upheld, uplifted
উদ্গর্জিত—bursting out roaring
উদ্ঘোষ—loud-sounding
উদ্ধর্ষ—courage to undertake anything
উদ্বাসিত—deported
উদ্যোগসমর্থ—capable of exertion
উন্মিতি—measure of altitude

উন্মুখর—loud-sounding
উন্মুদ্র—unsealed
উন্মৃষ্ট—rubbed off
উপজ্ঞা—untaught or primitive knowledge
উপধূপন—fumigation
উপনদ্ধ—inlaid
উপনিপাত—national calamities
উপপাত—accident
উপপুর—suburb
উপস্কর—apparatus
উল্বণ নাদ—shrill sound
ঊনতা—deficiency
ঊর্মিমান, ঊর্মিল—undulating
একতৎপর—solely intent on
একায়ন—footpath
ঐকাঙ্গ—bodyguard
ঐকাত্ম্য—identity
ঐচ্ছিক—optional
ঐতিহ্য—tradition, traditional
কণাকার—granular
কম্বুরেখা—spiral
কম্র—loving, beautiful
করণতা—instrumentality
কাব্যগোষ্ঠী—a conversation on poetry
কাম্যব্রত—voluntary vow (with special aim)
কারু, কারুক—artisan
কালকরণ—appointing time
কালসম্পন্ন—bearing a date
কালাতিক্রমণ—lapse of time
কালান্তর—intermediate time
কির্বির, কির্মীর—variegated colour, কির্মীরিত
কুটিল রেখা—curved line
কুলব্রত—family tradition
কুশলতা—cleverness
কূণিত—contracted

কৃতাভ্যাস—trained
কৃশিত—emaciated
কেবলকর্মী—performing mere works without intelligence
কেলিসচিব—minister of the sports
ক্রমভঙ্গ—interruption of order
ক্রয়লেখ্য—deed of sale
ক্ষয়িষ্ণু—perishable
ক্ষিপ্রনিশ্চয়—one who decides quickly
গণক-মহামাত্র [১]—finance minister
গর্গরি—whirlpool, eddy
গীতক্রম—arrangement of a song
গুম্ফন—grouping
গৃহব্রত—devoted to home
গেহেশূর—carpet-knight
গোত্রপট—genealogical table
গোপ্রতার—ox-ford (যেখানে গোরু পার করে)
গ্রন্থকুটী—library
গ্রামকূট—congregation of villages
গ্লান—tried, emaciated
চক্রচর—world-trotter
চটুলালস—desirous of flattery
চতুর্ভূমিক—four-storied
চরিষ্ণু—movable
জড়াত্মক—inanimate, unintelligent
জড়াত্মা—stupid
জনপ্রিয়—popular
জনসংসদ—assembly of men
জনাচার—popular usage
জরিষ্ণু—decaying
জ্ঞানসন্ততি—continuity of knowledge
তনিকা—string, বীণার তার
তনুবাদ—rarified atmosphere
তন্ত্রী—string, বীণার তার
তরঙ্গরেখা—curved line

---

[১] মনিয়ের উইলিয়ম্‌স্‌-এ 'গণন-মহাপাত্র'

তরস্থান—landing place
তরস্বতী, তরস্বিনী, তরস্বী—quick moving
তরুণিমা—juvenility
তাৎকালিক—simultaneous
তাৎকাল্য—simultaneousness
তীর্ণপ্রতিজ্ঞ—one who has fulfilled his promise
দিবাতন—diurnal
দুরভিসম্ভব—difficult to be performed
দুর্গতকর্ম—relief work, employment offered to the famine-stricken
দুর্মর—dying hard (diehard)
দৃপ্র—arrogant
দ্বয়বাদী—double tongued
দ্বারকপাট—leaf of a door
দ্রপ্স—a drop
দ্রপ্সী—falling in drops
দ্রব্যত্ব—substance, substantiality
দ্রাংক্ষণ—discordant sound
দ্রাঘিত—lengthened
দ্রোহবুদ্ধি—maliciously minded
ধূম্রিমা—obscurity
নঙর্থক [নঞর্থক]—negative
নভস—misty, vapoury
নাব্য—navigable
নিমিশ্ল—attached to
নির্গামিক—outgoing
নির্ণিক্ত—polished
নির্বাসিক—non-resident
নিষ্কাসিত—expelled
নীরক্ত—colourless, faded
পণ্যসিদ্ধি—prosperity in trade
পতিম্বরা—a woman who chooses her husband
পরাচিত—nourished by another, parasite
পরিলিখন—outline or sketch
পরিস্রবণ—filtering
পরুত্তন—belonging to the last year

পর্ণরীণ—vein of a leaf
পর্যায়চ্যুত—superseded, supplanted
পাদাবর্ত—a wheel worked by feet for raising water
পারণীয়—capable of being completed
পিচ্চট—pressed flat, চ্যাপ্টা
পুটক—pocket
পুনর্বাদ—tautology
পুরন্ধ্রী—matron
পূর্বরঙ্গ—prelude or prologue of a drama
পৃচ্ছনা, পৃচ্ছা—spirit of enquiry
পৃথগাত্মা—individual
পৃথগাত্মিকতা—individuality
প্রচয়—collection
প্রচয়ন—collecting
প্রচয়িকা[১]—[collection]
প্রচিত—collected
প্রণোদন—driving
প্রতিক্রম—reversed or inverted order
প্রতিচারিত—circulated
প্রতিজ্ঞাপত্র—promissory note
প্রতিপণ—barter
প্রতিপতি—a counterpart
প্রতিবাচক—answer
প্রতিভা—কারয়িত্রী—genius for action
প্রতিভা—ভাবয়িত্রী—genius for ideas, or imagination
প্রতিমান—a model, pattern
প্রতিলিপি—a copy, transcript
প্রতীপগমন—retrograde movement
প্রত্যক্ষবাদী—one who admits of no other evidence than perception by the senses
প্রত্যক্ষসিদ্ধ—determined by evidence of the sense
প্রত্যভিজ্ঞা, প্রত্যভিজ্ঞান—recognition
প্রত্যভিনন্দন, প্রত্যর্চন—returning a salutation
প্রত্যরণ্য—near or in a forest

---

[১] মনিয়ের উইলিয়মস্-এ 'প্রচায়িকা'

প্রত্যুজ্জীবন—returning to life
প্রথম কল্প—a primary or principal rule
প্রপাঠ, প্রপাঠক—chapter of a book
প্রবাচন—proclamation
প্রলীন—dissolved
প্রসাধিত—ornamented
প্রাগ্রসর—foremost, progressive
প্রাণবৃত্তি—vital function
প্রাণাহ—cement used in building
প্রাতস্তন—matutinal
প্রাতিভজ্ঞান—intuitive knowledge
প্রেক্ষণিকা—exhibition
প্রেক্ষার্থ—for show
প্রোঙ্খোল—moving to and fro
প্রৌঢ়যৌবন—prime of youth
বর্তিষ্ণু—stationary
বশঙ্গম—influenced
বস্তুমাত্রা—mere outline of any subject
বাগ্‌জীবন—buffoon
বাগ্‌ডম্বর—grandiloquence
বাগ্‌ভাবক—[promoting speech, with a taste for words]
বাতপ্রাবর্তিম—irrigation by wind-power
বিচিতি—collection
বিষয়ীকৃত—realised
বৃত—elected
ভঙ্গিবিকার—distortion of features
ভবিষ্ণু—progressing
ভিন্নক্রম—out of order
ভূমিকা—বাড়ির তলা,
    যথা : চতুর্ভূমিক—four storied
ভেষজালয়—dispensary
ভ্রাতৃব্য—cousin
মণ্ডল কবি—a poet for the crowd
মনোহত—disappointed
মায়াত্মক—illusory

মুদ্রালিপি—lithograph
মুমূর্ষা—desire of death
মৃদুজাতীয়—somewhat soft, weak
মৌল—aboriginal
যথাকথিত—as already mentioned
যথাচিন্তিত—as previously considered
যথাতথ—accurate
যথানুপূর্ব—according to a regular series
যথাপ্রবেশ—according as each one entered (সভাপ্রবেশ সম্বন্ধে)
যথাবিত্ত—according to one's means
যথামাত্র—according to a particular measure
যন্ত্রকর্মকার—machinist
যন্ত্রগৃহ—manufactory
যন্ত্রপেষণী, জাঁতা—a hand mill
যমল গান—duet song
রলরোল—wailing, lamenting
রোচিষ্ণু—elegant
লঘুখট্টিকা—easy chair
লোককান্ত—popular
লোকগাথা—folk verses
লোকবিরুদ্ধ—opposed to public opinion
শক্তিকুণ্ঠন—deadening of a faculty
শঙ্কাশীল—hesitating or diffident disposition
শয়নবাস—sleeping garment
শিঞ্জা, শিঞ্জান—tinkling sound
শিথির—flexible, pliant
—loose
শিল্পজীবী—an artisan
শিল্পবিধি—rules of art
শিল্পালয়—[art institute]
শ্মীল—winking, blinking
শ্লক্ষ্ণ—slippery, polished
শ্লথোদ্যম—relaxing one's effort
সংকেতমিলিত—met by appointment
সংকেতকেতন স্থান—a place of assignation

সংক্রমণকা—a gallery
সংরাগ—passion, vehemence
সংলাপ—conversation
সৎকলা—a fine art
সদ্যস্ক, সদ্যস্তন—belonging to the present day
সময়চ্যুতি—neglect of the right time
সমাহর্তা—collector-general
সমূহকার্য—business of a community
সম্প্রতিবিদ্—knowing only the present, not what is beyond
সহজপ্রণেয়—easily led
সহধুরী—colleague
সাংকথ্য—conversation
সাত্ত্বিক ভাবক—[promoting the quality of purity]
সীতাধ্যক্ষ—the head of the agricultural department
সীমাসন্ধি—meeting of two boundaries
সুশ্লক্ষ্ণ—delicate
সৃপ্ত—slipped out or into
সৃপ্র—slippery, lithesome, supple
সৌচিক—tailor
স্ত্রীদ্বেষী—misogynist
স্ত্রীময়—effiminate, womanish
স্ফায়িত—expanding
স্ফির—tremulous
স্বগোচর—one's own sphere or range
স্বচর—self-moving
স্বপ্রভুতা—arbitrary power
স্ববহিত—self-impelled
স্ববিধি—own rule or method
স্বমনীষা—own judgement or opinion
স্বয়মুক্তি—voluntary testimony
স্বয়ম্বশ—independent
স্বয়ম্বহ—self-moving
স্বয়ম্ভৃত, স্বয়ম্ভর—self-supporting
স্বসম্বেদ্য—intelligible only to one's self
স্বসিদ্ধ—spontaneously effected

স্বাবমাননা—self contempt
স্বৈরবর্তী—following one's own inclination
স্রস্তর, স্রস্তরা—couch, sofa
স্রোতযন্ত্রপ্রাবর্তিম—[water-power irrigation]
হস্তপ্রাবর্তিম—[hand-power motion irrigation]
হৃদয়ভাবক—[promoting the feeling and sensations moved by sentiments]

শব্দচয়ন : ২

অকরণ —passive
    সকরণ—active
অকারী—[passive]
    সকারী—[active]
অক্রম—disorder
অক্রিয়—[passive]
    সক্রিয়—[active]
অঙ্গ সংহতি—bodily symmetry, compactness of body
অঙ্গাঙ্গিতা—mutual relation
অঙ্গোঞ্ছ—গামছা [a towel]
অঞ্চিত—curved ; অঞ্চিত রেখা
অণিষ্ঠ—অণুতম [most minute]
অতথা—not saying yes, giving a negative answer
অতিঘ্ন—one who is in the condition of utter oblivion
অতিজীব—lively
অতিতর—better, higher
অতিতৃণ্ণ—seriously hurt
অতিতৃপ্ত—satiated
অতিত্বরিত—অতিদ্রুত [very fast]
অতিত্রস্নু—very timid
অতিদর্শী—far-sighted
অতিধাবন—to run or rush over
অতিবর্তন—passing beyond

---

৪৯৩ পৃষ্ঠায় 'অন্তর্বা' ও ৪৯৫ পৃষ্ঠায় 'আক্ষেপণ' ছকে মনিয়ার উইলিয়ামস্-এর অভিধানে 'অন্তর্বী' এবং 'আক্ষেপণ' আছে

অতিমর্ত্য—super human
অত্বরা—freedom from haste
অত্যণু—very thin
অত্যন্তিক—too close
অত্যভিসৃত—having come too close
অত্যাসন্ন—being too close
অধঃখনন—undermining
অধিকর্ম—superintendence
অননুকৃত্য—inimitable
অনায়ত্ত—independent
অনাশস্ত—not praised
অনিগীর্ণ—not swallowed
অনিরা—languor
অনিরুপ্ত—not distributed, not shared
অনির্জিত—unconquered
অনিস্তীর্ণ—not crossed over
অনীতি—impropriety, immorality
অনুকথিত—repeated
অনুকার, অনুকারী—[imitating]
অনুগুণ—having similar qualities
অনুজন সম্মতি—popular sanction
অনুদেয়—a present
অনুপ্ত—unsown
অনুবর্তন—to follow
অনুবাক—recitation
অনৈতিহ্য—untraditional
অন্তঃশীর্ণ—withered within
অন্তঃস্মিত—inward smile
অন্তঃস্মের—smiling inwardly
অন্তর্গলগত—sticking in the throat
অন্তর্ভাব—inherent nature
অন্তিতম—very near
অন্যোন্যসাপেক্ষ—mutually relating
অপকর্ষ—decline, deterioration
অপগ্রসর—checked, restrained

অপাচী—দক্ষিণ [south] উদীচীর উল্টো
অপাচীন—situated backwards, behind
অপাত্রভৃৎ—supporting the unworthy or worthless
অপিত্র্য—not ancestral
অপ্রতিযোগী—not incompatible with
অপ্রদুগ্ধ—not milked
অবঞ্চনতা—honesty
অবটু—the back or nape of the neck
অবডীন—flight downwards
অবতিতীর্ষু—intending to descend
অবভুগ্ন—split
অবদংশ—any pungent food, stimulant
অবব্রশ্চ—splinter, chip
অবম—undermost, inferior
অবমর্দিত—crushed
অবরতর—further down
অবরবয়স্ক—younger
অবরস্পর—having the last first, inverted
অবলীন—cowering down
অবশ্যা—hoar-frost
অবশ্যায়—[hoar-frost]
অবসা—liberation
অবস্কর—privy
অবস্তীর্ণ—strewn
অবস্ফূর্জ—the rolling of thunder
অবস্যন্দন—trickle down
অবুধ্ন—bottomless
অবেক্ষণিকা—observatory
অভঙ্গুর—not fragile
অমন্তু—silly
অমম—without egotism
অমত্রি—immortal
অমিনা—impetuous : অমেয়া, অমিতি
অম্বিতমা—dearest mother
অরাল—curved

অর্বাকপঞ্চাশ—under fifty
অশ্নীতপিবতা—invitation to eat and to drink
অসাত্ম্য—unwholesome
অসৌম্য—[disagreeable] : অশোভন
আকাশপথিক—[sky-traveller, sun]
আত্মনীয়তা—originality
আত্মবর্গ—intimate friends
আত্ম্য—personal
আদিৎসা—wish to take
আদিৎসু—[wishing to take]
আদিকালীন—belonging to the primitive time
আনর্ত—dancing room
আনুজাবর—posthumous
আন্তরতম্য—closest relationship
আবশ্যিক—compulsory
আমিশ্র—having a tendency to mix
আয়ত্তি—majesty, dignity
আরাল—little curved : আরালিত
আশিষ্ঠ—quickest
আশুকোপী—easily irritated
আশুক্লান্ত—quickly faded
আশুগামী—quickly moving
আসন্দ—chair
ইঞ্চাক—shrimph : ইচা মাছ
ইতাসু—one whose animal spirits have departed
ইযিরা—fresh, vigorous
ইষ্ট ব্রত—[performing desired vows]
ঈর্ষিত—envied
ঈর্ষিতব্য—enviable
ঈর্ষ্যক—envying
ঈর্ষ্যালু—envious
উচ্ছেষ—remainder
উৎকলিকা—[longing for] উৎকণ্ঠা
উত্তমতা—excellence
উত্তরপঞ্চাশ—[over fifty]

উপধূপিত—fumigated
উপনিধি—deposit
উপস্কৃত—furnished
উর্জানী—strength personified
উলুলি—an outcry indicative of prosperity : উলুধ্বনি
উস্রি, উস্রা—morning light
একান্তর—next but one
একোত্তর—greater or more by one
এতষ—dappled—having variegated colour
এষা—running
কটুকিমা—sharpness
কঠোরিত—[strengthened]
কণীচি—a kind of creeper
কথঙ্কথিত—one who is always asking questions ; inquisitive
কনক গৌরবর্ণ—জাফরানী রঙ—[saffron]
কনীনা—youthful
কপিল—brown, tawny, reddish brown
কপিল ধূসর—brownish grey
কপিশ—reddish brown
কপোত বর্ণ—lead grey
কম্রা—beautiful
করিষ্ঠ—doing most
কাব্যনিচয়—anthology
কাব্যবিবেচনা—criticism
কাম্ল—slightly acid
কারয়িতা, ভাবয়িতা—genius for action: genius for ideas or imagination
কারী—artist ; artificer ; mechanic
কুলগরিমা—family pride
কুলচ্যুত—expelled from a family
কুলতন্তু—thread [coming down from a race]
কুলস্থিতি—custom observed in a family
কূটমান—false measure or weight
কূটযুদ্ধ—treacherous battle
কৃতকর্তব্য, কৃতকৃত্য—one who has done his duty

কৃতত্বর—hurrying
কৃশবুদ্ধি—weakminded
কৃষ্ণপিঙ্গল—dark brown
কৃষ্ণলোহিত—purple
ক্রমভ্রষ্ট—irregular order
গিরিকটক—mountain side
গিরিদ্বার—mountain pass
গিরিপ্রস্থ—plateau : side of a hill
গীথা—a song
গুপ্তস্নেহা—having a secret affection
গেহেবিজিতী—a house hero, boaster
গৌরিমা—the being white
চিচীষা—desire to gather
চীনক (মহাভারত)—Chinese
জনপ্রবাদ, জনবাদ—rumour, report
জলনির্গম—water course
জ্ঞানদুর্বল—deficient in knowledge
ঝন্‌ঝনিত—tinkling
তথার্থ—real
তনুচ্ছায়—অল্পছায়াবিশিষ্ট [shading little]
তপিষ্ঠ—extremely hot
তমোমণি—[fire-fly]
তরুমণ্ডপ—bower
তলিনা—fine, slender
তুল্যনাম—having the same name
দোষদৃষ্টি—fault finding
দোষানুবাদ—tale-bearing
দ্রাঘিমা—length
দ্রাঘিষ্ঠ—longest
দ্রোহপর, দ্রোহবৃত্তি—[full of malice, malicious]
দ্রোহভাব—hostile disposition
ধূমবুদ্ধি—obscure intellect
নদীবঙ্ক—the bend of a river
নদীমার্গ—course of a river
নদীমুখ—mouth of a river
নানাত্ব—variety, manifoldness
নানাত্যয়—manifold

নিক্বণ—musical sound
নিচয়—store
নিত্যযৌবনা—[perpetual youth]
নীরাগ—[colourless, faded]
নীলিনী—a species of convolvulus with blue flowers
নেদিষ্ঠ—nearest
পরপরীণ—traditional
পরীবেশ—a halo round the sun or moon
পর্যন্তদেশ—neighbouring district
পর্যন্তস্থিত—adjacent
পর্যাপ্তি—adequacy
পর্যায়ক্রম—order of succession
পলিতম্লান—grey and withered
পাটল—pink
পাণ্ডর—whitish yellow cream colour
পারতন্ত্র্য—স্বাতন্ত্র্যের বিপরীত [dependence on others]
পারম্পরী—regular succession
পারম্পরীয়—traditional
পিঙ্গল—reddish brown
পিশঙ্গ—tawny
পুররোধ—sieze of a city or fortress
পুরাকথা—an old legend
পুরাবিদ্—[knowing the events of former times]
প্রজ্ঞু—bandy legged
প্রতিচিকীর্ষা—wish to require
প্রতিজীবন —resuscitation
প্রতিবারণ—warding off, preventing
প্রতিবচন
প্রতিবাক্য —answer
প্রত্যুক্তি
প্রতিসংলয়ন—retirement into a lonely place
প্রতিসংলীন—retired
প্রত্যন্তিক—situated at the border, frontiermen
প্রপাত—precipice
প্রভব—origin
প্রসাধন—decoration

প্রসাধনবিধি—[mode of decoration]
প্রাক্‌পশ্চিমায়ত—running from east to west
প্রাতিভ—intuitive
প্রাতীতিক—subjective
বক্রবাক্য—ambiguous speech
বর্গ—species or genus : যেমন, স্তন্যপায়ীবর্গ
বিকস্বর প্রসারী—expanding
বিনীল—dark blue
বিবেচক—critic
ভাবক ⎡ আঙ্গিক ভাবক ⎤ [having a taste...]
        ⎣ অনুভাব ভাবক ⎦
ভাবানুষঙ্গ—[association of idea]
মাংশচত্রু—light yellow, dun coloured
মির্মির—twinkling
মুখরেখা—feature
যথাপ্রতিজ্ঞা—according to promise
যথাযথ—suitable, fit, proper
যাচিতক—a thing borrowed for use
ঋজিষ্ঠ—straightest, upright, honest
লীলোদ্যান—pleasure garden
লোকনায়ক—[leader of the worlds]
লোকবার্তা—world's news
লোষ্ট্রভেদন—a harrow
শক্তিগোচর—within one's power
শিথিলশক্তি—impaired in strength
শিরিণা (ঋগ্‌বেদ)—night
শীঘ্রকৃত্য—to be done quickly
শ্মীলিত—[winked]
শ্যাব—dark brown
শ্রমখিন্ন—distressed by fatigue
সংখ্যান—calculation
সংখ্যাবিধান—making a calculation
সংজ্ঞু—knock-kneed
সংঘাধ্যক্ষ—the chief of the brotherhood
সংভুগ্ন—hollowed out, perforated

সমঙ্গী—complete in all parts
সময়াচার—conventional or established practice
সমস্থল—level country
সমূহ—association, community
সম্যক্ প্রয়োগ—right use
সম্যগ্‌দর্শন, দৃষ্টি—right perception, insight
সম্যগ্‌বোধ—right understanding
সাংকথিক—excellent in conversation
সাহিত্যগোষ্ঠী—[a conversation on literature]
সুহিত—kind : সুহিতা
সৃষ্টি—creation
সেরাল—pale yellow
স্কন্ধপ্রাবর্তিম—[দ্র. হস্তপ্রাবর্তিম : শব্দচয়ন ১]
স্তিমিত নয়ন—having the eyes intently fixed
স্ত্রীবাক্যাঙ্কুশপ্রক্ষুণ্ণ—driven on by the goad of a woman's words
স্ফারফুল্ল—full blown
স্ফুটফেনরাজি—bright with lines of foam
স্ফুরণ—glittering, throbbing, vibration, pulsation, twinkling
স্ফুরৎ তরঙ্গজিহ্ব—having tongue like waves
স্ফুরৎ প্রভামণ্ডল—surrounded by a circle of tremulous light
স্বচ্ছন্দতঃ—spontaneously
স্বচ্ছন্দতা—independent action
স্বচ্ছন্দভাব—spontaneity
স্বদনীয়[1]—palatable
স্বয়ম্পাঠ—original text
স্বসমুত্থ—arising within self
স্বৈরাচার—[of unrestrained conduct or behaviour]
স্বৈরালাপ—[unreserved conversation]
স্বৈরাহার—[abandunt food]

রবীন্দ্রনাথ কৃত শব্দচয়ন ১ ও ২ -সংখ্যক তালিকায় যেখানে ইংরেজি অর্থ বা প্রতিশব্দের উল্লেখ নাই সে-সব ক্ষেত্রে [ ] বন্ধনী মধ্যে মনিয়ের উইলিয়মস্-এর অভিধান হইতে ইংরেজি অর্থ সংকলন করিয়া দেওয়া হইল।

---

[1] মনিয়ের উইলিয়মস্-এ 'স্বাদনীয়'।

উপসংহার : দৃষ্টান্তবাক্য[1]

অকরণ passive আমাদের সমাজে যা কিছু পরিবর্তন হচ্ছে সে অকরণভাবে,
সকরণ active সকরণ বুদ্ধিদ্বারা আমরা তাকে চালনা করি না।

অঙ্গসংহতি bodily symmetry, compactness of body—গ্রামে যে জনসভা স্থাপিত হইয়াছে এখনো তাহা শিথিলভাবেই আছে তাহার অঙ্গসংহতি ঘটে নাই।

অঙ্গারিত charred—প্রাচীন জন্তুর কয়েকখণ্ড অঙ্গারিত অস্থিমাত্র পাওয়া গিয়াছে।

অকর্মান্বিত unemployed—আমেরিকার অকর্মান্বিত লোকের সংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে।

অঙ্গাঙ্গিতা mutual relation—আমাদের দেশের উচ্চবর্ণের লোকের সঙ্গে অন্ত্যজদের অঙ্গাঙ্গিতার অভাব।

অতিকথিত, অতিকৃত exaggerated—অতিকৃত রেখার দ্বারা তাঁহার ছবিকে ব্যঙ্গাত্মক করা হইয়াছে।

ঝির্ঝির twinkling—এই জ্যোতিষ্কটি গ্রহ নহে নক্ষত্র তাহা তাহার ঝির্ঝির আলোকে সপ্রমাণ হয়।

অতিদিষ্ট overruled—একদা যে বিধি কর্তৃপক্ষের আদিষ্ট ছিল বর্তমানে তাহা অতিদিষ্ট হইয়াছে।

অধিষ্ঠায়ক বর্গ governing body—অধিষ্ঠায়কবর্গের নিকট বিদ্যালয়ের প্রতিবেদন প্রেরিত হইয়াছে।

অধিকর্মী superintendent—বিদ্যালয়ের অধিকর্মী পদে কাহাকেও নিযুক্ত করা হয় নাই।

অনাত্ম্য impersonal—অনাত্ম্যভাবের রাজ্যশাসন প্রজার পক্ষে হৃদ্য নহে। বৈজ্ঞানিক সত্য অনাত্ম্য সত্য।

অননুকৃত্য inimitable—রঙ্গমঞ্চে তাঁহার প্রয়োগনৈপুণ্য অননুকৃত্য।

অনুজ্ঞাত allowed—মন্দিরে হীনবর্ণের প্রবেশাধিকার প্রাঙ্গণ পর্যন্ত অনুজ্ঞাত।

অনুদত্ত remitted
অনুদেশ reference to something prior —যথাকালে তাঁহার বৃত্তি অনুদত্ত হইয়াছে কিনা তাঁহার পত্রে তাহার কোনো অনুদেশ পাওয়া যায় না।

অনুপার্শ্বগতি lateral movement—বালুকারাশি অনুপার্শ্বগতিতে সরিয়া আসিয়া কূপ পূর্ণ করিয়াছে।

আত্ম্য personal—সঙ্গে একটিমাত্র তাঁহার আত্ম্য অনুচর (personal attendant) ছিল।

অনুযাত্র retinue
অন্তম intimate —তাঁহার অনুযাত্রদের মধ্যে তাঁহার অন্তম বন্ধু কেহই ছিল না।

অন্তঃপাতিত inserted—কালির রঙ দেখিয়া অনুমান করা যায় পুঁথির মধ্যে এই বাক্যগুলি পরে অন্তঃপাতিত।

অন্তর্ভৌম subterranean—ভূমিকম্পের পূর্বে একটি অন্তর্ভৌম ধ্বনি শুনা গেল।

অন্তরীয় undergarment—পশমের অন্তরীয় বস্ত্র ঘর্মশোষণের পক্ষে উপযোগী।

অন্তরায়ণ internment—রাষ্ট্রিক অপরাধে অন্তরায়িতের প্রতি পীড়ন বর্বরতা।

অপণ্য unsaleable, not for sale—প্রদর্শনীর বিশেষ চিহ্নিত চিত্রগুলি অপণ্য।

---

[1] পাণ্ডুলিপির ক্রম-অনুযায়ী মুদ্রিত।

অপম the most distant—অন্তম ও অপম আত্মীয়দের লইয়া একান্নবর্তী পরিবার।

অপশব্দ vulgar speech—অপশব্দ অনেক সময় সংস্কৃত শব্দ অপেক্ষা শক্তিশালী।

অপ্রতিষ্ঠ unstable—রাষ্ট্রব্যবস্থা কিছু পরিমাণে অপ্রতিষ্ঠ থাকা প্রজাদের স্বাধীনতার পক্ষে অনুকূল।

অবর্জনীয় inevitable—কোনো দুঃখকেই অবর্জনীয় বলিয়া উদাসীন হওয়া মনুষ্যোচিত নহে।

অভিজ্ঞান পত্র certificate—তাঁহার উদার ললাটেই বিধাতার স্বহস্ত-রচিত অভিজ্ঞানপত্র।

অভ্যাঘাত interruption—উপদেশ চেষ্টা আখ্যান বিষয়ের অভ্যাঘাত।

অরত apathetic—বান্ধবদের প্রতি যাহার অরতি সর্বত্রই তাহার চিরনির্বাসন।

অরাল curved—অরাল পক্ষ্ম কৃষ্ণায়ত চক্ষু।

অর্ম ruins, rubbish—নদীগর্ভের পঞ্চাশ ফুট নিম্নে প্রাচীন অর্মস্তূপ পাওয়া গেল।

অস্তব্যস্ত scattered, confused—তাঁহার রচনায় ভাবসংহতি নাই, সবই যেন অস্তব্যস্ত।

আত্মতা essence—বীর্যের আত্মতাই ক্ষমা।

আত্মবিবৃদ্ধি self aggrandisement—আত্মবিবৃদ্ধির অসংযমেই আত্মবিনাশ।

আত্মকীয় original—তাঁহার লেখায় স্বকীয়তা [আত্মকীয়তা] নাই সমস্তই অনুকরণ।

উক্ত প্রত্যুক্ত discourse—এই গ্রন্থটি আকবরের রাজনীতি সম্বন্ধে উক্তি প্রত্যুক্তি।

উপধূপিত fumigated—রোগীর বিছানা গন্ধক বাষ্পে উপধূপিত করা হইল।

আবাসিক resident —আবাসিক ছাত্রদের বেতন কুড়ি টাকা।
অনাবাসিক non-resident —অনাবাসিকদের দেয় ছয় টাকা।

আগামিক incoming—আমাদের আগামিক সভাপতি পরমাসে কাজে যোগ দিবেন।

বিষয়ীকৃত realised—মনে যে আদর্শ আছে জীবনে তাহা বিষয়ীকৃত হয় নাই।

আঙ্গিক technique
গুম্ফন grouping —এই চিত্রের গুম্ফন যেমন সুন্দর আঙ্গিক তেমন নয়।

শব্দচয়ন : ৩

বর্তমান গ্রন্থের বিভিন্ন রচনায় যে-সব প্রতিশব্দের উল্লেখ আছে প্রবন্ধের বিন্যাসক্রমে সেগুলি সংকলিত হইল :

উপসর্গ-সমালোচনা ॥

অপহরণ—abduction
দন্তহীন—edentate
অন্তরেজাত—innate
আসন্ন—adjacent
আক্ষিপ্ত—adjective
আবদ্ধ—adjunct
অভিনয়ন—adduce

অভিদেশ অভিনির্দেশ—address
অভিবর্তন—advent

বাংলা শব্দদ্বৈত ॥
পুনর্বৃত্তি—repetition

ধ্বন্যাত্মক শব্দ ॥
নিঃশব্দ জ্যোতিষ্কলোক—silent spheres

বাংলা কৃৎ ও তদ্ধিত ॥
একমাত্রিক—monosyllabic

বাংলা ব্যাকরণ ॥
শাব্দিক—[philologist]

বাংলা ব্যাকরণে তির্যক্‌রূপ ॥
তির্যক্‌রূপ—oblique form
নাম সংজ্ঞা—proper names

প্রতিশব্দ ॥
* অধিজাতি—nation
* আধিজাতিক—national
* আধিজাত্য—nationalism
* প্রবংশ—race
প্রবংশ রক্ষা—race preservation
জাতি সম্প্রদায়—tribe
জাতি, বর্ণ—caste
মহাজাতি—genus
উপজাতি—species
প্রজাত—generation
নিজমূলক }
স্বকীয়তা } —originality
অপূর্ব = strange
আদিম = original
দরদ—sympathy
অনন্যতন্ত্র—originality
আবেগ, হৃদয়াবেগ—emotion
চিত্তোৎকর্ষ, সমুৎকর্ষ—culture
উৎকর্ষিতচিত্ত, উৎকর্ষবান—culture-minded
অপজাত—degenerate
আপজাত্য—degeneracy

প্রজনতত্ত্ব—genetics
সৌজাত্যবিদ্যা—ugenics
বংশানুগতি—heredity
বংশানুগত—inherited
বংশানুলোম্য—inheritable
অভিযোজন—adaptation
অভিযুজ্যতা—adaptability
অভিযোজ্য—adaptable
অভিযোজিত—adapted
অনুরক্তি—interest
স্বতঃসৃত—spontaneous
প্রতিক্ষিপ্ত—reflex
প্রসমীক্ষা, প্রসমীক্ষণ, পূর্ব-বিচারণা—fore thought
সূচনা, অভিসংকেত—suggestion
সূচনাশক্তি—suggestiveness
স্বাভিসংকেত—auto-suggestion
বিসংগত সত্য, বিসংগত বাক্য—paradox
ব্যঙ্গানুকরণ—parody
শখ—amateur
পাটল—violet
পল্লবগ্রাহী—dilettante
দ্বৈমানসিকতা, দ্বৈতমানস—two mindedness
দ্বৈতমনা—two minded
মহান—sublime
মহিমা—sublimity
স্বরসংগম, স্বরসংগতি—harmony
স্বরৈক্য—concord
বিস্বর—discord
ধ্বনিমিলন—symphony
সংধ্বনিক—symphonic
রোমাঞ্চিত, তৃণাঞ্চিত—curved
বাণী, মহাবাণী—the voice
* জাত—caste
জাতি—race
* রাষ্ট্রজাতি—nation

জনসমূহ—people
* প্রজন—population
আকাশবাণী, বাক্‌প্রসার—broadcast
বুদ্ধিগত মৈত্রী, বুদ্ধিমূলক মৈত্রী, বুদ্ধিপ্রধান মৈত্রী, মৈত্রীবোধ—intellectual friendship
ভাবপ্রধান, হৃদয়প্রধান—emotional
মনঃপ্রকর্ষ, চিত্তপ্রকর্ষ—culture
প্রকৃষ্টচিত্ত, প্রকৃষ্টমনা—cultured
উৎকৃষ্টি—culture
বুদ্ধিগত সংরাগ—intellectual passion
সংরাগ—passion
বুদ্ধিগত ব্যক্তিত্ব—intellectual self
দেহপ্রকর্ষ চর্চা—physical culture
* শিলক—fossil
* শিলীকৃত—fossilized
* অবমানব—sub-man
* প্রাক্‌প্রস্তর—eolith
* প্রাক্‌মানব—eoanthropus
* প্রাগাধুনিক—eocene
* পুরাজৈবিক—proterozoic
পটভূমিকা, পশ্চাদ্‌ভূমিকা, পৃষ্ঠাশ্রয়, অনুভূমিকা, আশ্রয়, আশ্রয়বস্তু—background
সংকেত, লক্ষ্য, উদ্দেশ, উদাহরণ, অভিনির্দেশ, অভিসংকেত—allusion
পরিচয়—reference
গত মাসিক—proximo
আগামী মাসিক—ultimo
প্রতিমা—image
প্রদোষ—twilight
সাংস্কৃতিক ইতিহাস—cultural history
সংস্কৃত চিত্ত—cultured mind
সংস্কৃত বুদ্ধি—cultured intelligence
সংস্কৃতিমান—cultured
প্রৈতি—impulse
নৈসর্গিক নির্বাচন—natural selection
শিলাবিকার—fossil
শিলবিকৃত, শিলীভূত—fossilized
চারিত্র, চারিত্রশিক্ষা, চারিত্রবোধ, চারিত্রোন্নতি—ethics

তত্ত্ববিদ্যা—metaphysics
কেন্দ্রানুগ—সেন্‌ট্রিপীটাল—[centrepetal]
কেন্দ্রাতিগ—সেন্‌ট্রিফ্যুগাল—[centrifugal]
শিলাবিকার—metamorphosed rock
জীবশিলা—ফসিল—[fossil]
নভোবিদ্যা—মিটিয়রলজি—[meteorology]
প্রতিষ্ঠান—institution
অনুষ্ঠান—ceremony
অনুবাদ-চর্চা ॥
নিত্যনির্বন্ধ = persistent
বাদানুবাদ ॥
কুলসঞ্চারিতা = heredity
কুলসঞ্চারী = inherited
বানান-বিধি ॥
বৈয়াকরণিক—grammarian
চিহ্নবিভ্রাট ॥
প্রবন্ধ—essay
বাংলাভাষা ও বাঙালি চরিত্র ॥
রোথো—commonplace

অন্যান্য রচনা ও চিঠিপত্র হইতে সংকলিত

অকুশল—awkward ॥ পাণ্ডুলিপি সংখ্যা ২৭১, রবীন্দ্রভবন-সংগ্রহ
অগ্রসরতা—progress ॥ যাত্রী
অতিকৃতি—exaggeration ॥ রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়কে লিখিত : ৬ এপ্রিল ১৯৪১। চিঠিপত্র ১২
অদ্বয়বিবাহ = monogamy ॥ ছন্দ
অতিশয়পন্থা—extremism ॥ কালান্তর
অন্যোন্যস্তুতি = mutual admiration ॥ সে
অবচয়ন—selection ॥ প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশকে লিখিত : ১ আষাঢ় ১৩৩২
অবচ্ছিন্ন = abstract ॥ শান্তিনিকেতন
অবন্ধ্য = productive ॥ ইতিহাস
অবয়বহীন—amorphous ॥ সাহানাদেবীকে লিখিত : ১৬ বৈশাখ ১৩৩৫ ; সংগীতচিন্তা
অভিশোচন—condolence ॥ প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশকে লিখিত : ৪ আষাঢ় ১৩৩২
অযথা—inaccurate ॥ নির্মলকুমারী মহলানবিশকে লিখিত : ২৭ কার্তিক ১৩৩৫
আরামবাগ = park ॥ রাশিয়ার চিঠি

আরোগ্যালয়—sanatorium ॥ রাশিয়ার চিঠি

ইঙ্গিত, সংকেত—suggestion ॥ রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়কে লিখিত : ১৯ মার্চ ১৯৩৭। চিঠিপত্র ১২

উঁচ্-কপালেগিরি—High browism ॥ সুধীন্দ্রনাথ দত্তকে লিখিত : "পত্রিকা", পরিচয়, কার্তিক ১৩৩৮

* একক সংগীত—solo

কালবিরোধদোষ = anachronism ॥ সাহিত্য

কিরীটিকা = Corona ॥ বিশ্বপরিচয়

কৌতুকনাট্য = burlesque ॥ জীবনস্মৃতি

ক্ষুব্ধস্তর—troposphere ॥ বিশ্বপরিচয়

গণজাতি—Race ॥ সুর ও সঙ্গতি

গার্হস্থ্যবিভাগ—household commission ॥ রাশিয়ার চিঠি

গৃহদীপ সহায়িকা—girlguide ॥ শান্তিদেব ঘোষ, রবীন্দ্রসংগীত

গোত্রবন্ধন, জাতিবন্ধন—clan system ॥ সমাজ

গোধিকা = Lacerta ॥ বিশ্বপরিচয়

গ্রহিকা = asteroids ॥ বিশ্বপরিচয়

ঘুমন্ত শরিক = sleeping partner ॥ চিঠিপত্র ৯

চিরজীবনরস—Elixir of Life ॥ স্বদেশ

ছদ্মবেশী নাচ—fancy ball ॥ য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র

ছাঁদ, রীতি = style ॥ আধুনিক সাহিত্য

জগতত্ত্ব—cosmology ॥ সাধনা, ভাদ্র ১৩০১

* জাত = caste

দূরধ্বনিবহ—Telephone ॥ মৈত্রেয়ী দেবীকে লিখিত : বিজয়া দশমী ১৩৩৮

দৈশিকতা = Patriotism ॥ বিশ্বভারতী পত্রিকা, শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৬২ : অরবিন্দমোহন বসুকে লিখিত : অগ্রহায়ণ ১৩১৫

দ্বয়ীশিক্ষা = co-education ॥ দ্র. জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস, বাঙ্গালা ভাষার অভিধান

দ্বৈবব্য = bigamy ॥ স্বদেশ

দ্বৈরাজ্য = diarchy ॥ গল্পগুচ্ছ

ধ্রুবপদ্ধতি = classical

নাট্যখেলা = charade ॥ হাস্যকৌতুক

নিরনেক বিবাহ = monogamy ॥ বিশ্বভারতী পত্রিকা, শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৭০

নির্বস্তুক = abstract ॥ বাংলাভাষা পরিচয়

নির্মিতি = construction ॥ বিশ্বভারতী পত্রিকা, শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৭০

নেহাত সত্য—truism ॥ সুর ও সঙ্গতি

নৈরাশ্যগ্রস্ত—pessimist ॥ বিদ্যাসাগর চরিত

নৌবাহ্য—navigable ॥ রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়কে লিখিত : ২০ জানুয়ারি ১৯৩৭। চিঠিপত্র ১২
পরকালতত্ত্ব = eschatology ॥ সাধনা, ভাদ্র ১৩০১
* পরশ্রমজীবী বা পরশ্রমভোগী—Bourgeois ॥ রাশিয়ার চিঠি
* পরার্থশ্রমী—proletariat ॥ রাশিয়ার চিঠি
পরাশিত = parasite ॥ সমবায়নীতি
পাঠগৃহ—reading room ॥ রাশিয়ার চিঠি
পাত্রশিল্প—Pottery ॥ চিঠিপত্র ৯
পারলৌকিক বৈষয়িকতা = other worldliness ॥ আধুনিক সাহিত্য
পীত সংকট = yellow peril ॥ কালান্তর
পুরাগত বনেদ—tradition ॥ সে
পুরোযায়ী—pioneer ॥ রাশিয়ার চিঠি
প্রতিবৃত্তিক্রিয়া—reflex action ॥ সমূহ
প্রতিরূপক—symbol ॥ সমাজ
প্রবহমানতা—enjambenment ॥ ছন্দ
প্রিয়চারী—amiable ॥ সমূহ
প্রৈতি—energy ॥ শান্তিনিকেতন
বন্ধ্যা—unproductive ॥ ইতিহাস
বর্ণকল্পনা—colour scheme ॥ রাশিয়ার চিঠি
বহুগ্রন্থিল কলেবর—Complex Structure ॥ সংগীতচিন্তা
বিকলন—Analysis ॥ বিশ্বভারতী পত্রিকা, কার্তিক-পৌষ ১৩৬২ : রাধারানী দেবীকে লিখিত : ১৪ ভাদ্র ১৩৩৫
বিদ্যাভবন—Home of education ॥ রাশিয়ার চিঠি
বিধি এবং ব্যবস্থা = law and order ॥ সভ্যতার সংকট
বিশ্রান্তিনিকেতন—The Home of Rest ॥ রাশিয়ার চিঠি
বিশ্বমানবিকতা—cultural fellowship with foreign countries ॥ দ্বিজেন্দ্রনাথ মৈত্রকে লিখিত : ১১ জানুয়ারি ১৯৩৫, চিঠিপত্র ১৭, পত্র ৫৯
বিশ্বমুসলমানী—Pan Islamism ॥ রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়কে লিখিত : ৪ মার্চ ১৯৩৬, চিঠিপত্র ১২
বিশ্ববহ—Omnibus ॥ পথের সঞ্চয়
বিশ্বসাহিত্য—Comparative Literature ॥ সাহিত্য
বীরধর্ম—Chivalry ॥ রাশিয়ার চিঠি
বেগ্নি পারের আলো, বেগনি পারের রশ্মি, বেগ্নি পেরোনো আলো—ultra violet ray ॥ বিশ্বপরিচয়
বৈদ্যুত = Electricity ॥ বিশ্বপরিচয়
বৈভীষিক রাষ্ট্রউদ্যম্—terroristic political movement ॥ অমিয় চক্রবর্তীকে লিখিত, চিঠিপত্র ১১

বৈয়ক্তিক চৌম্বকশক্তি—Personal magnetism ॥ চিঠিপত্র ৬
ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য = individualism ॥ ধর্ম
ব্যঙ্গীকরণ = caricature ॥ বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়, 'রবীন্দ্রস্মৃতি', পৃ ৩৮
ব্যঞ্জনা = gesture ॥ চার অধ্যায়
ব্যূহবদ্ধতা—Organisation ॥ সমূহ
ভাববাতিকতা = sentimentalism ॥ রাজাপ্রজা
ভাবানুষঙ্গ = association ॥ সাহিত্যের পথে
ভারাবর্তন, মহাকর্ষ = Gravitation ॥ বিশ্বপরিচয়
মঠাশ্রয়ী ব্যবস্থা = monasticism ॥ সঞ্চয়
মহাজাগতিক রশ্মি = cosmic ray ॥ বিশ্বপরিচয়
মূর্ধন্য হাসি—wit ॥ সে
* যুগ্মক সংগীত—Duet
রাষ্ট্রিকতা—Politics ॥ সংহতি, জ্যৈষ্ঠ ১৩৩০ ; প্রবাসী, শ্রাবণ ১৩৩০, পৃ ৫০৮
* রীতি ও পদ্ধতি—cult and dogma
রূপকল্প—Pattern ॥ ছন্দ
রূপদক্ষ—artist ॥ সাহিত্যের পথে
লাল-উজানি আলো—Infra red light ॥ বিশ্বপরিচয়
লোকবাক্য—popular belief ॥ রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়কে লিখিত : চিঠিপত্র ১২
[শব্দগত] স্পর্শদোষ—contamination of words ॥ দ্র. বিজনবিহারী ভট্টাচার্য, "শব্দগত স্পর্শদোষ", প্রবাসী, শ্রাবণ ১৩৪২, পৃ ৫১০
শারীরশ্রমের সম্মান—dignity of labour ॥ পথে ও পথের প্রান্তে
শাস্ত্রমত—dogma ॥ কালান্তর
শিশুরক্ষণী—Creche ॥ রাশিয়ার চিঠি
সূচিপত্র—Correction slip ॥ মোহিতচন্দ্র সেনকে লিখিত : ২৯ শ্রাবণ ১৩১০
সংকলন, সংগ্রথন—Collection ॥ প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশকে লিখিত : ১ আষাঢ় ১৩৩২
সংস্কৃতায়িত = Sanskritized ॥ বঙ্গদর্শন, চৈত্র ১৩১১
সংস্থান পত্র—Prospectus ॥ কালিদাস নাগকে লিখিত : ১৪ নভেম্বর ১৯২২, চিঠিপত্র ১২
সখ্যবিবাহ—Compassionate marriage ॥ মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায়কে লিখিত। দ্র. হিরণকুমার সান্যাল, "মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায়", সংবদধ্বম্ Vol. ৪, No 1, পৃ ২৪৪
সংকল—Simple ॥ সংগীতচিন্তা
সঞ্চয়িকা—Anthology ॥ অমিয় চক্রবর্তীকে লিখিত : ১ জানুয়ারি ১৯৩৫, চিঠিপত্র ১১, পৃ ১৩০
সপ্তাহপ্রান্ত—Week-end ॥ দিলীপকুমার রায়কে লিখিত : ২২ শ্রাবণ ১৩৪৪
সভাপতা—Presidentship ॥ কালিদাস নাগকে লিখিত : পত্র ৮, প্রবাসী, চৈত্র ১৩৩৯, পৃ ৪৮৫

সম্মিতি, সংসাম্য = symmetry ॥ ছন্দ
* সম্মেলক সংগীত—Chorus
সহজ প্রবৃত্তি = instinct ॥ পঞ্চভূত, সমাজ
সহায়িকা—girl guide ॥ শান্তিনিকেতন পত্র, আশ্বিন ১৩৩০
সেবক = Steward ॥ য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র
স্তব্ধস্তর—Stratosphere ॥ বিশ্বপরিচয়
স্থানিক তথ্যসন্ধান—region studies ॥ রাশিয়ার চিঠি
স্নিগ্ধ—Affectionate ॥ মৈত্রেয়ী দেবীকে লিখিত : ৪ অক্টোবর ১৯৩৩
স্বতন্ত্রশাসিত—Autonomous ॥ রাশিয়ার চিঠি
হাঁ-ধর্মী—positive ॥ বিশ্বপরিচয়

তালিকা-ধৃত * চিহ্নিত শব্দগুলি বাংলা শব্দতত্ত্ব দ্বিতীয় সংস্করণের অন্তর্ভুক্ত ছিল। রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং যে স্থলে ইংরেজি ও বাংলা শব্দ একই সঙ্গে ব্যবহার করিয়াছেন সে স্থলে ইংরেজি শব্দের পূর্বে = চিহ্ন দেওয়া হইল।

শব্দচয়ন : ৪

অক্ষর-যোজক	compositor
অগত্যা-প্রেরিত খাটুনি	forced labour
অনামা চিঠি	unanimous letter
অন্তর্মনস্ক	introvert
অসিতচর্ম	coloured
আজ্ঞেয়িক	agnostic
আঁকনপট	canvas
আপিসি শাসন	burocracy
উপরাজ্য	satellite state
কদুৎসাহী	Zealot
কৃতকপুত্র	foster son
গঠন পত্রিকা	constitution, prospectus
গর্তগড়	dug-out
গোষ্ঠবিদ্যা	animal husbandry
চতুষ্পথ	crossing
চন্দ্রালোক গীতিকা	moonlight sonata
চরম তিরস্করণী	drop scene
চর্মপত্র	parchment

চিত্রবয়ন	embroidery
জনাদর	popularity
তড়িৎমাপক সূচী	galvanometer
তাপজনক খাদ্য	caloric food
দরখাস্ত পত্রিকা	application
ধর্মমূঢ়বুদ্ধি	bigotry
নরভুক্	cannibal
নৈহারিকতা	nebulocity
পরিণামদারুণ	tragic
পরিণামবাদ	theory of evolution
পরিপ্রেক্ষণিকা পরিপ্রেক্ষণী পরিপ্রেক্ষিত	perspective
প্রত্যক্ষরীকরণ	transliteration
ভীতধ্বনি	alarm
মনোবিকলনমূলক	psycho-analytical
মাশুলখানা	Custom House
মিতশ্রমিক যন্ত্র	labour-saving machine
রূঢ়িক	elementary
শেষমোকাম	terminus
সাদর পত্র	testimonial
স্বজাতিপূজা	Cult of Nationalism
স্বতশ্চালিত	automobile
স্বাঙ্গীকরণ	assimilation
স্বৈচ্ছিক	optional
স্বৈরশাসক	despot
হনুকরণ	aping

শব্দচয়ন : ৫

A Bird in hand is worth two in the bush.

দুটো পাখি ঝোপে থাকার চেয়ে একটা পাখি হাতে থাকা ভালো! —চিঠিপত্র ৮

ঝোপের মধ্যে গণ্ডাখানেক পাখি থাকার চেয়ে মুঠোর মধ্যে একটা পাখি ঢের ভালো।

—ছিন্নপ

Ask me not and you will be told no lie.
প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়ো না তাহা হইলে মিথ্যা জবাব শুনিতে হইবে না।
—গল্পগুচ্ছ ১, "অসম্ভব কথা"

Building castles in the air.
আসমানের উপর কত ঘরবাড়ি না বাঁধিয়াছিল। —বউঠাকুরানীর হাট

Do not look a gift horse in the mouth.
দানের ঘোড়ার দাঁত পরীক্ষা করিয়া লওয়াটা শোভা পায় না।
—শিক্ষা

Enough is as good as a feast.
যা যথেষ্ট সেটাই ভূরিভোজের সমান-দরের।
—মানুষের ধর্ম

Example is better than precept.
উপদেশের অপেক্ষা দৃষ্টান্ত অধিক ফলপ্রদ।
—ব্যঙ্গকৌতুক

From frying pan to fire.
তপ্ত কড়া থেকে পালাতে গিয়ে জ্বলন্ত আগুনে পড়া।
—বিশ্বভারতী পত্রিকা, মাঘ-চৈত্র ১৩৭৬
তপ্ত কটাহ হতে জ্বলন্ত চুল্লিতে পড়া।
—মোহিতচন্দ্র সেনকে লিখিত পত্র, ১৮ কার্তিক ১৩১০

Greatest good of the greatest number.
প্রচুরতম লোকের প্রভূততম সুখসাধন —চতুরঙ্গ

Irony of fate.
ভাগ্যের বিদ্রূপ। —ভানুসিংহের পত্রাবলী

Mahomet must come to the mountain.
মহম্মদকে পর্বতের কাছে আসতে হবে। —বি. ভা. প. বর্ষ ১৪, পৃ ১৭১

Not the game but the goose.
শিকার পাওয়া নহে, শিকারের পশ্চাতে অনুধাবন করা। —ধর্ম

Penny wise pound foolish.
কড়ায় কড়া কাহনে কানা। —সমাজ
পয়সার বেলায় পাকা টাকার বেলায় বোকা। —পথের সঞ্চয়

Rolling stone gathers no moss.
গড়ানে পাথরের কপালে শ্যাওলা জোটে না। —শেষের কবিতা
গড়িয়ে যাওয়া পাথর শ্যাওলা জমাতে পারে না।
—শান্তা দেবীকে লিখিত পত্র, ১৭ অগস্ট ১৯২৭,
চিঠিপত্র ১২, পৃ ২৫৬

Similia Similibus Curantur.

শঠে শাঠ্যং সমাচরেৎ।

—"হাতে কলমে", 'ভারতী', ভাদ্র-আশ্বিন ১২৯১

'সাবিত্রী', আশ্বিন ১২৯৩, রচনাবলী ত্রিংশ (সুলভ ১৭) খণ্ড

Spare the rod and spoil the child.

বেত বাঁচাইলে ছেলে মাটি করা হয়। —সাহিত্যের পথে

Success brings success.

সিদ্ধিই সিদ্ধিকে টানে। —কালান্তর

The best is the enemy of good.

বেশির জন্যে আকাঙ্ক্ষাটা সম্ভবপরের শত্রু।

—মৈত্রেয়ী দেবীকে লিখিত পত্র, বি. ভা. প. বর্ষ ১২, পৃ ২৫১

Survival of the fittest.

যোগ্যতমের উদ্‌বর্তন। —সাহিত্যের পথে

There is many a slip between the cup and the lip.

ওষ্ঠ ও পাত্রের মধ্যে অনেকগুলি ব্যাঘাত। —চিঠিপত্র ৮

To err is human, to forgive divine.

দোষ করা মানবের ধর্ম, ক্ষমা করা দেবতার। —প্রজাপতির নির্বন্ধ

ভুল করা মানবধর্ম, মার্জনা করা দেবধর্ম।

—সমাজ ; বাংলা শব্দতত্ত্ব/বীম্‌সের বাংলা ব্যাকরণ

Two is company, three is crowd.

দুয়ের যোগে সঙ্গ, তিনের যোগে গোলযোগ।

—"সংগীতের মুক্তি", 'সংগীতচিন্তা', পৃ ৪৫

Wild goose chase.

বুনোহাঁস শিকার। —শেষের কবিতা

শব্দচয়ন : ৬

কানাকানি-বিভাগ intelligence department—চার অধ্যায়, পৃ ৭৫

ঘণ্টাকর্ণ Slave of the bell—সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, 'রবীন্দ্রসংগমে দ্বীপময় ভারত ও শ্যামদেশ', পৃ ২৪

চৌকিদারি Chairmanship—রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়কে লিখিত পত্র, ২২ কার্তিক ১৩২৪। চিঠিপত্র ১২

জন বৃষ John Bull—ছিন্নপত্র

তদীয় উত্তুঙ্গতা His Exalted Highness—চিঠিপত্র ১২, পত্র ১৩৩

নাট্যিfy dramatization—খাপছাড়া, ৮৮

বলবান অস্বীকৃতি/ভিগরস্‌ প্রোটেস্ট Vigorous protest—বাঁশরি

ব্যাঘ্রপাইপ bagpipe—পূরবী

সংগীতচিন্তা

সংগীতচিন্তা

সংগীত ও ভাব

আমাদের সংস্কৃত ভাষা যেরূপ মৃত ভাষা, আমাদের সংগীতশাস্ত্র সেইরূপ মৃত শাস্ত্র। ইহাদের প্রাণ বিয়োগ হইয়াছে, কেবল দেহমাত্র অবশিষ্ট আছে। আমরা কেবল ইহাদের স্থির অচঞ্চল জীবনহীন মুখ মাত্র দেখিতে পাই, বিবিধ বিচিত্র ভাবের লীলাময়, ছায়ালোকময় পরিবর্তনশীল মুখশ্রী দেখিতে পাই না। আমরা কতকগুলি কথা শুনিতে পাই ; অথচ তাহার স্বরের উচ্চ-নীচতা শুনিতে পাই না, কেবল সমস্বরে একটি কথার পর আর-একটি কথা কানে আসে মাত্র। হয়তো ক্রমে ক্রমে তাহার অর্থবোধ মাত্র হয়, কিন্তু তাহার অর্থগুলিকে সম্যকরূপে হজম করিয়া ফেলিয়া আমাদের হৃদয়ের রক্তের সহিত মিশাইয়া লইতে পারি না। আজ সংস্কৃত ভাষায় কেহ যদি কবিতা লেখেন, তবে নস্য-সেবক চালকলা-জীবী আলংকারিক সমালোচকেরা তাহাকে কী চক্ষে দেখেন? তৎক্ষণাৎ তাঁহারা ব্যাকরণ বাহির করেন, অলংকারের পুঁথিখানা খুলিয়া বসেন, যত্ব ণত্ব, তদ্ধিত প্রত্যয়, সমাস সন্ধি, মিলাইয়া যদি নিখুঁত বিবেচনা করেন, যদি দেখেন যশকে শুভ্র বলা হইয়াছে, নলিনীর সহিত সূর্যের ও কুমুদের সহিত চন্দ্রের মৈত্র সম্পাদন করা হইয়াছে তবেই তাঁহারা পরমানন্দ উপভোগ করেন। আর, কেহ যদি আজ গান করেন, তবে তানপুরার কর্ণপীড়ক খরজ সুরের জন্মদাতাগণ তাহাকে কী চক্ষে সমালোচন করেন? তাঁহারা দেখেন একটা রাগ বা রাগিণী গাওয়া হইতেছে কি না ; সে রাগ বা রাগিণীর বাদী সুরগুলিকে যথারীতি সমাদর ও বিসম্বাদী সুরগুলিকে যথারীতি অপমান করা হইয়াছে কি না ; এ পরীক্ষাতে যদি গানটি উত্তীর্ণ হয় তবেই তাঁহাদের বাহবাসূচক ঘাড় নড়ে। অবিকল নকল দেখিলেই বুঝা যায় যে, অনুকরণকারী অনুকৃত পদার্থের ভাব আয়ত্ত করিতে পারেন নাই। মনে করুন, আমি সাহেব হইতে চাই ; অথচ আমি সাহেবদিগের ভাব কিছুমাত্র জানি না, তখন আমি কী করি? না, অ্যান্ড্রু নামক একটি বিশেষ সাহেবকে লক্ষ্য রাখিয়া, অবিকল তাহার মতো কোর্তা ও পাজামা ব্যবহার করি, তাহার কোর্তার যে দুই জায়গায় ছেঁড়া আছে, যত্নপূর্বক আমার কোর্তার ঠিক সেই দুই জায়গায় ছিঁড়ি ও তাহার নাকে যে স্থানে তিনটি তিল আছে, আমার নাকের ঠিক সেইখানে কালি দিয়া তিনটি তিল চিত্রিত করি। ঐ একই কারণ হইতে, যাহাদের স্বাভাবিক ভদ্রতা নাই, তাহারা ভদ্র হইতে ইচ্ছা করিলে আনুষ্ঠানিক ভদ্রতার কিছু বাড়াবাড়ি করিয়া থাকে। আমাদের সংগীতশাস্ত্র না কি মৃত শাস্ত্র, সে শাস্ত্রের ভাবটা আমরা না কি আয়ত্ত করিতে পারি না, এইজন্য রাগরাগিণী, বাদী ও বিসম্বাদী সুরের ব্যাকরণ লইয়াই মহা কোলাহল করিয়া থাকি। যে ভাষার ব্যাকরণ সম্পূর্ণ হইয়াছে, সে ভাষার পরলোক প্রাপ্তি হইয়াছে। ব্যাকরণে ভাষাকে বাঁচাইতে পারে না তো, প্রাচীন ইজিপ্টবাসীদের ন্যায় ভাষার একটা "মমি" তৈরি করে মাত্র। যে সাহিত্যে অলংকারশাস্ত্রের রাজত্ব, সে সাহিত্যে কবিতাকে গঙ্গাযাত্রা করা হইয়াছে। অলংকারশাস্ত্রের পিঞ্জর হইতে মুক্ত হওয়াতে সম্প্রতি

কবিতার কণ্ঠ বাংলার আকাশে উঠিয়াছে, আমার ইচ্ছা যে, কবিতার সহচর সংগীতকেও শাস্ত্রের লৌহকারা হইতে মুক্ত করিয়া উভয়ের মধ্যে বিবাহ দেওয়া হউক।

একটা অতি পুরাতন সত্য বলিবার আবশ্যক পড়িয়াছে। সকলেই জানেন, প্রথমে যেটি একটি উদ্দেশ্যের উপায় মাত্র থাকে, মানুষে ক্রমে সেই উপায়টিকে উদ্দেশ্য করিয়া তুলে। রাগরাগিণীর উদ্দেশ্য কী ছিল? ভাব প্রকাশ করা ব্যতীত আর তো কিছু নয়।

ভাব ব্যক্ত করাই যে সংগীতের মুখ্য উদ্দেশ্য এ কথা আপাতত শুনিতে অতি সহজ এবং অনেকেই মনে করিবেন এ কথা আড়ম্বর করিয়া প্রমাণ করিতে বসা অনাবশ্যক। কিন্তু অনেকেই সংগীতের উপযোগিতা বিচার করিবার সময় এ কথা বিস্মৃত হন এবং পাকেপ্রকারে এ কথা অস্বীকার করেন। এই নিমিত্ত বিশেষ মনোযোগ সহকারে এ বিষয়ে আলোচনা আবশ্যক।

স্পেন্সর সংগীতের শরীরগত কারণ সবিস্তারে আলোচনা করিয়াছেন। তিনি বলেন বাঁধা কুকুর যখন দূর হইতে তাহার মনিবকে দেখে, বন্ধনমুক্ত হইবার আশায় অল্প অল্প লেজ নাড়িতে থাকে। মনিব যতই তাহার কাছে অগ্রসর হয়, ততই সে অধিকতর লেজ নাড়িতে এবং গা দুলাইতে থাকে। মুক্ত করিয়া দিবার অভিপ্রায়ে মনিব তাহার শিকলে হাত দিলে এমন সে লাফালাফি আরম্ভ করে, যে তাহার বাঁধন খোলা বিষম দায় হইয়া উঠে। অবশেষে যখন সম্পূর্ণ ছাড়া পায় তখন খুব খানিকটা ইতস্তত ছুটাছুটি করিয়া তাহার আনন্দের বেগ সামলায়। এইরূপ আনন্দে বা বিষাদে বা অন্যান্য মনোবৃত্তির উদয়ে সকল প্রাণীরই মাংসপেশীতে ও অনুভবজনক স্নায়ুতে উত্তেজনার লক্ষণ প্রকাশিত হয়। মানুষেও সুখে হাসে, যন্ত্রণায় ছটফট করে! রাগে ফুলিতে থাকে, লজ্জায় সংকুচিত হইয়া যায়। অর্থাৎ শরীরের মাংসপেশীসমূহে মনোবৃত্তির প্রভাব তরঙ্গিত হইতে থাকে। মনোবৃত্তির অতিরিক্ত তীব্রতায় আমরা অভিভূত হইয়া পড়ি বটে, কিন্তু তাহা সত্ত্বেও সাধারণ নিয়মস্বরূপে বলা যায় যে, শরীরের গতির সহিত হৃদয়ের বৃত্তির বিশেষ যোগ আছে। তাহা যেন হইল, কিন্তু সংগীতের সহিত তাহার কী যোগ? আছে। আমাদের কণ্ঠস্বর কতকগুলি বিশেষ মাংসপেশী দ্বারা উৎপন্ন হয়; সে-সকল মাংসপেশী শরীরের অন্যান্য পেশীসমূহের সঙ্গে সঙ্গে মনোভাবের উদ্রেকে সংকুচিত হইয়া যায়। এই নিমিত্ত আমরা যখন হাসি, তখন অধরের সমীপবর্তী মাংসপেশী সংকুচিত হয়, এবং হাস্যের বেগ গুরুতর হইলে তৎসঙ্গে সঙ্গে কণ্ঠ হইতেও একটা শব্দ বাহির হইতে থাকে। রোদনেও ঠিক সেইরূপ। এক কথায়, বিশেষ বিশেষ মনোভাব উদ্রেকের সঙ্গে সঙ্গে শরীরের নানা মাংসপেশী ও কণ্ঠের শব্দ-নিঃসারক মাংসপেশীতে উত্তেজনার আবির্ভাব হয়। মনোভাবের বিশেষত্ব ও পরিমাণ অনুসারে কণ্ঠস্থিত মাংসপেশীসমূহ সংকুচিত হয়; তাহাদের বিভিন্ন প্রকারের সংকোচন অনুসারে আমাদের শব্দযন্ত্র বিভিন্ন আকার ধারণ করে; এবং সেই বিভিন্ন আকার অনুসারে শব্দের বিভিন্নতা সম্পাদিত হয়। অতএব দেখা যাইতেছে, আমাদের কণ্ঠ-নিঃসৃত বিভিন্ন স্বর বিভিন্ন মনোবৃত্তির শরীরগত বিকাশ।

আমাদের মনের ভাব বেগবান হইলে আমাদের কণ্ঠস্বর উচ্চ হয়, নহিলে অপেক্ষাকৃত মৃদু থাকে।

উত্তেজনার অবস্থায় আমাদের গলার স্বরে সুরের আমেজ আসে। সচরাচর সামান্য বিষয়ক কথোপকথনে তেমন সুর থাকে না। বেগবান মনোভাবে সুর আসিয়া পড়ে। রোষের একটা সুর আছে, খেদের একটা সুর আছে, উল্লাসের একটা সুর আছে।

সচরাচর আমরা যে স্বরে কথাবার্তা কহিয়া থাকি তাহাই মাঝামাঝি স্বর। সেই স্বরে কথা কহিতে আমাদের বিশেষ পরিশ্রম করিতে হয় না। কিন্তু তাহার অপেক্ষ উঁচু বা নীচু স্বরে কথা

কহিতে হইলে কণ্ঠস্থিত মাংসপেশীর বিশেষ পরিশ্রমের আবশ্যক করে। মনোভাবের বিশেষ উত্তেজনা হইলেই তবে আমরা আমাদের স্বাভাবিক মাঝামাঝি সুর ছাড়াইয়া উঠি অথবা নামি। অতএব দেখা যাইতেছে বেগবান মনোবৃত্তির প্রভাবে আমরা আমাদের স্বাভাবিক কথাবার্তার সুরের বাহিরে যাই।

সচরাচর যখন শান্তভাবে কথাবার্তা কহিয়া থাকি তখন আমাদের কথার স্বর অনেকটা একঘেয়ে হয়। সুরের উঁচু-নীচু খেলায় না। মনোবৃত্তির তীব্রতা যতই বাড়ে, ততই আমাদের কথায় সুরের উঁচু-নীচু খেলিতে থাকে। আমাদের গলা খুব নীচু হইতে খুব উঁচু পর্যন্ত উঠানামা করিতে থাকে। কণ্ঠের সাহায্য ব্যতীত ইহার দৃষ্টান্ত দেওয়া দুরূহ। পাঠকেরা একবার কল্পনা করিয়া দেখুন আমরা যখন কাহারো প্রতি রাগ করিয়া বলি "এ তোমার কী রকম স্বভাব?" 'এ' শব্দটা কত উঁচু সুরে ধরি ও 'স্বভাব' শব্দটায় কতটা নীচু সুরে নামিয়া আসি। ঠিক এক গ্রামের বৈলক্ষণ্য হয়।

যাহা হউক, দেখা যাইতেছে, সচরাচর কথাবার্তার সহিত মনোবৃত্তির উত্তেজিত অবস্থার কথাবার্তার ধারা স্বতন্ত্র। পাঠকেরা অবধান করিয়া দেখিবেন যে, উত্তেজিত অবস্থার কথাবার্তার যে-সকল লক্ষণ, সংগীতেরও তাহাই লক্ষণ। সুখ দুঃখ প্রভৃতির উত্তেজনায় আমাদের কণ্ঠস্বরে যে-সকল পরিবর্তন হয়, সংগীতে তাহারই চূড়ান্ত হয় মাত্র। পূর্বে উক্ত হইয়াছে যে, উত্তেজিত মনোবৃত্তির অবস্থায় আমাদের কথোপকথনে স্বর উচ্চ হয়; স্বরে সুরের আভাস থাকে ; সচরাচরের অপেক্ষা স্বরের সুর উঁচু অথবা নীচু হইয়া থাকে, এবং স্বরে সুরের উঁচু-নীচু ক্রমাগত খেলিতে থাকে। গানের স্বরও উচ্চ, গানের সমস্তই সুর; গানের সুর সচরাচর কথোপকথনের সুর হইতে অনেকটা উঁচু অথবা নীচু হইয়া থাকে, এবং গানের সুরে উঁচু-নীচু ক্রমাগত খেলাইতে থাকে। অতএব দেখা যাইতেছে যে, উত্তেজিত মনোবৃত্তির সুর সংগীতে যথাসম্ভব পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। তীব্র সুখ দুঃখ কণ্ঠে প্রকাশের যে লক্ষণ সংগীতেরও সেই লক্ষণ।

আমাদের মনোভাব গাঢ়তম তীব্রতম রূপে প্রকাশ করিবার উপায়স্বরূপে সংগীতের স্বাভাবিক উৎপত্তি। যে উপায়ে ভাব সর্বোৎকৃষ্টরূপে প্রকাশ করি, সেই উপায়েই আমরা ভাব সর্বোৎকৃষ্টরূপে অন্যের মনে নিবিষ্ট করিয়া দিতে পারি। অতএব সংগীত নিজের উত্তেজনা প্রকাশের উপায় ও পরকে উত্তেজিত করিবার উপায়।

সংগীতের উপযোগিতা সম্বন্ধে স্পেন্সর বলিতেছেন— আপাতত মনে হয় যেন সংগীত শুনিয়া যে অব্যবহিত সুখ হয়, তাহাই সাধন করা সংগীতের কার্য। কিন্তু সচরাচর দেখা যায়, যাহাতে আমরা অব্যবহিত সুখ পাই তাহাই তাহার চরম ফল নহে। আহার করিলে ক্ষুধা নিবৃত্তির সুখ হয়, কিন্তু তাহার চরম ফল শরীর পোষণ। মাতা স্নেহের বশবর্তী হইয়া আত্মসুখ-সাধনের জন্য যাহা করেন তাহাতে সন্তানের মঙ্গল সাধন হয় ; যশের সুখ পাইবার জন্য আমরা যাহা করি তাহাতে সমাজের নানা কার্য সম্পন্ন হয় ; ইত্যাদি। সংগীতে কি কেবল আমোদ মাত্রই হয়? অলক্ষিত কোনো উদ্দেশ্য সাধিত হয় না?

সকল প্রকার কথোপকথনে দুইটি উপকরণ বিদ্যমান আছে। কথা, ও যে ধরনে সেই কথা উচ্চারিত হয়, কথা ভাবের চিহ্ন (signs of ideas), আর ধরন অনুভাবের চিহ্ন (signs of feeling)। কতকগুলি বিশেষ শব্দ আমাদের ভাবকে বাহিরে প্রকাশ করে, এবং সেই ভাবের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের হৃদয়ে যে-সুখ বা দুঃখ উদয় হয়, সুরে তাহাই প্রকাশ করে। "ধরন" বলিতে যদি সুরের বাঁকচোর উঁচু-নীচু সমস্তই বুঝায় তবে বলা যায় যে, বুদ্ধি যাহা-কিছু কথায় বলে, হৃদয় "ধরন" দিয়া তাহারই টীকা করে। কথাগুলি একটা প্রস্তাব মাত্র, আর বলিবার ধরন তাহার টীকা

ও ব্যাখ্যা। সকলেই জানেন, অধিকাংশ সময়ে কথা অপেক্ষা তাহা বলিবার ধরনের উপর অধিক নির্ভর করি। অনেক সময়ে কথায় যাহা বলি, বলিবার ধরনে তাহার উল্‌টা বুঝায়। "বড়োই বাধিত করলে!" কথাটি বিভিন্ন সুরে উচ্চারণ করিলে কিরূপ বিভিন্ন ভাব প্রকাশ করে সকলেই জানেন। অতএব দেখা যাইতেছে, আমরা একসঙ্গে দুই প্রকারের কথা কহিয়া থাকি। ভাবের ও অনুভাবের।

আমাদের কথোপকথনের এই উভয় অংশই একসঙ্গে উন্নতি লাভ করিতেছে। সভ্যতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আমাদের কথা বাড়িতেছে, ব্যাকরণ বিস্তৃত ও জটিল হইয়া উঠিতেছে, এবং সেইসঙ্গে সঙ্গে যে আমাদের বলিবার ধরন পরিবর্তিত ও উন্নত হইতেছে, তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। সভ্যতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যে কথা বাড়িতেছে, তাহার অর্থই এই যে, ভাব ও অনুভাব বাড়িতেছে। সেইসঙ্গে সঙ্গে যে ভাব ও অনুভাব প্রকাশ করিবার উপায় সর্বতোভাবে সংস্কৃত ও উন্নত হইতেছে না তাহা বলা যায় না। বলা বাহুল্য যে, অনেকগুলি উন্নত ভাব ও সূক্ষ্ম অনুভাব অসভ্যদের নাই, তাহা প্রকাশ করিবার উপকরণও তাহাদের নাই। বুদ্ধির ভাষাও যেমন উন্নত হইতে থাকে, আবেগের (emotion) ভাষাও তেমনি উন্নত হয়। এখন কথা এই, সংগীত আমাদিগকে অব্যবহিত যে সুখ দেয়, তৎসঙ্গে সঙ্গে আমাদের আবেগের ভাষার (language of the emotions) পরিস্ফুটতা সাধন করিতে থাকে। আবেগের ভাষাই সংগীতের মূল। সেই কারণ হইতে জন্মগ্রহণ করিয়া আজ ইহা এক স্বতন্ত্র বৃক্ষরূপে পরিণত হইয়াছে। কিন্তু যেমন রসায়নশাস্ত্র বস্তুনির্মাণবিদ্যা হইতে জন্ম লাভ করিয়া স্বতন্ত্র শাস্ত্ররূপে উন্নীত হইয়াছে, ও অবশেষে বস্তুনির্মাণবিদ্যার বিশেষ সহায়তা করিতেছে, যেমন শরীরতত্ত্ব চিকিৎসাবিদ্যা হইতে উৎপন্ন হইয়া স্বতন্ত্র শাস্ত্র হইয়া দাঁড়াইয়াছে ও চিকিৎসাবিদ্যার উন্নতি সাধন করিতেছে তেমনি সংগীত আবেগের ভাষা হইতে জন্মাইয়া আবেগের ভাষাকে পরিস্ফুট করিয়া তুলিতেছে। সংগীতের এই কার্য।

অনেকে হয়তো সহসা মনে করিবেন এ কার্য তো অতি সামান্য। কিন্তু তাহা নহে। মনুষ্যজাতির সুখ-বর্ধনের পক্ষে আবেগের ভাষা, বুদ্ধির ভাষার সমান উপযোগী। কারণ সুরের বিচিত্র তরঙ্গভঙ্গি আমাদের হৃদয়ের অনুভাব হইতে উৎপন্ন হয় এবং সেই অনুভাব অন্যের হৃদয়ে জাগ্রত করে। বুদ্ধি মৃত ভাষায় আপনার ভাব-সকল প্রকাশ করে আর সুরের লীলা তাহাতে জীবন সঞ্চার করে। ইহার ফল হয় এই যে সেই ভাবগুলি আমরা কেবলমাত্র যে বুঝি তাহা নহে, তাহা আমরা গ্রহণ করিতে পারি। পরস্পরের মধ্যে সমবেদনা উদ্রেক করিবার ইহাই প্রধান উপায়। সাধারণের মঙ্গল ও আমাদের নিজের সুখ এই সমবেদনার উপর এতখানি নির্ভর করে, যে যাহাতে করিয়া আমাদের মধ্যে এই সমবেদনার বিশেষ চর্চা হয় তাহা সভ্য সমাজের পক্ষে অত্যন্ত আবশ্যক ও উপকারী। এই সমবেদনার প্রভাবেই আমরা পরের প্রতি ন্যায্য ও সদয় ব্যবহার করিয়া থাকি ; এই সমবেদনার ন্যূনাধিক্যই অসভ্যদিগের নিষ্ঠুরতা ও সভ্যদিগের সার্বজনীন মমতার কারণ; বন্ধুত্ব, প্রেম, পারিবারিক সুখ, সমস্তই এই সমবেদনার উপরে গঠিত। অতএব এই সমবেদনা প্রকাশ করিবার উপায় সভ্যতার পক্ষে কতখানি উপযোগী তাহা আর বলিবার আবশ্যক করে না।

সভ্যতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আমাদের হৃদয়ের দ্বন্দ্ব-পরায়ণ ভাব-সকল অন্তর্হিত হইয়া সামাজিক ভাবের প্রাদুর্ভাব হইতেছে, কেবলমাত্র স্বার্থপর ভাব-সকল দূর হইয়া পরার্থসাধক ভাবের চর্চা হইতেছে। এইরূপ সামাজিক ভাবের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে সভ্য জাতিদের সমবেদনার ভাব বিকশিত হইতেছে ও সেইসঙ্গে তাহাদের মধ্যে সমবেদনার ভাষাও বাড়িয়া উঠিতেছে।

অনেকগুলি উন্নততর, সূক্ষ্মতর ও জটিলতর অনুভাব অল্পসংখ্যক শিক্ষিত ব্যক্তিদের মধ্যে

প্রচলিত আছে, তাহা কালক্রমে জনসাধারণে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িবে, তখন আবেগের ভাষাও বিস্তৃত হইয়া পড়িবে। এখন যেমন সভ্যদেশে ভাবপ্রকাশক ভাষা অত্যন্ত অসম্পূর্ণ অবস্থা হইতে এমন দ্রুত উন্নতি লাভ করিতেছে যে, অত্যন্ত সূক্ষ্ম ও জটিল ভাবসকলও তাহাতে অতি পরিষ্কাররূপে প্রকাশ হইতে পারিতেছে, তেমনি আবেগের ভাষা যদিও এখনো অসম্পূর্ণ রহিয়াছে, তথাপি ক্রমে এতদূর উন্নতি লাভ করিতে পারিবে যে, আমরা আমাদের হৃদয়াবেগ অতি জাজ্বল্যরূপে ও সম্পূর্ণরূপে অন্যের হৃদয়ে মুদ্রিত করিতে পারিব। সকলেই জানেন, অভদ্রদের অপেক্ষা ভদ্রলোকদের গলা অধিক মিষ্ট। একজন অভদ্র যাহা বলে, একজন ভদ্র ঠিক তাহাই বলিলে অপরের অপেক্ষা অনেক মিষ্ট শুনায়। তাহার কারণ আর কিছুই নহে, অভদ্রের অপেক্ষা একজন ভদ্রের অনুভাবের চর্চা অধিক হইয়াছে, সুতরাং অনুভাব প্রকাশের উপায়ও তাঁহাদের সহজ ও স্বাভাবিক হইয়া গিয়াছে; তাহার ঠিক সুরগুলি তাঁহারা জানেন, কণ্ঠস্বরেই বুঝা যায় যে তাঁহারা ভদ্র। বহুকাল হইতে তাঁহারা ভদ্রতার ঠিক সুরটি শুনিয়া আসিতেছেন, তাহাই ব্যবহার করিয়া আসিতেছেন। অনুভাবপূর্ণ সংগীত যাঁহারা চর্চা করিয়া থাকেন তাঁহাদের যে অনুভাবের ভাষা বিশেষ মার্জিত ও সম্পূর্ণ হইবে তাহাতে আশ্চর্য কী আছে?

সুন্দর রাগিণী শুনিলে আমাদের হৃদয়ে যে সুখের উদ্রেক হয়, তাহার কারণ বোধ করি, অতি দূর ভবিষ্যতে উন্নত সভ্যতার অবস্থায় যে এক সুখময় অনুভাবের দিন আসিবে, সুন্দর রাগিণী তাহারই ছায়া আমাদের হৃদয়ে আনয়ন করে। এই-সকল রাগিণী, যাহার উপযুক্ত অনুভাব আজকাল আমরা খুঁজিয়া পাই না, এমন সময় আসিবে যখন সচরাচর ব্যবহৃত হইতে পারিবে। আজ সুরসমষ্টি মাত্র আমাদের হৃদয়ে যে সুখ দিতেছে, উন্নত যুগে অনুভাবের সহিত মিলিয়া লোকদের তাহার দ্বিগুণ সুখ দিবে। ভালো সংগীত শুনিলে আমাদের হৃদয়ে যে একটি দূর অপরিস্ফুট আদর্শ-জগৎ মায়াময়ী মরীচিকার ন্যায় প্রতিবিম্বিত হইতে থাকে, ইহাই তাহার কারণ। এই তো গেল স্পেনসরের মত।

আমাদের দেশে সংগীত এমনি শাস্ত্রগত, ব্যাকরণগত, অনুষ্ঠানগত হইয়া পড়িয়াছে, স্বাভাবিকতা হইতে এত দূরে চলিয়া গিয়াছে যে, অনুভাবের সহিত সংগীতের বিচ্ছেদ হইয়াছে, কেবল কতকগুলা সুরসমষ্টির কর্দম এবং রাগরাগিণীর ছাঁদ ও কাঠামো অবশিষ্ট রহিয়াছে ; সংগীত একটি মৃত্তিকাময়ী প্রতিমা হইয়া পড়িয়াছে ; তাহাতে হৃদয় নাই, প্রাণ নাই। এইরূপ একই ছাঁচে ঢালা, অপরিবর্তনশীল সংগীতের জড় প্রতিমা আমাদের দেবদেবী মূর্তির ন্যায় বহুকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। সংগীতে এতখানি প্রাণ থাকা চাই, যাহাতে সে সমাজের বয়সের সহিত বাড়িতে থাকে, সমাজের পরিবর্তনের সহিত পরিবর্তিত হইতে থাকে, সমাজের উপর নিজের প্রভাব বিস্তৃত করিতে পারে ও তাহার উপরে সমাজের প্রভাব প্রযুক্ত হয়। সমাজবৃক্ষের শাখায় শুদ্ধমাত্র অলংকারস্বরূপে সংগীত নামে একটা সোনার ডাল বাঁধিয়া দেওয়া হইয়াছে, গাছের সহিত সে বাড়ে না, গাছের রসে সে পুষ্ট হয় না, বসন্তে তাহাতে মুকুল ধরে না, পাখিতে তাহার উপর বসিয়া গান গাহে না। গাছের আর-কিছু উপকার করে না কেবল শোভা বর্ধন করে। তাহাও করে কি না বিচার্য।

শোভাবর্ধনের কথা যদি উঠিল তবে তৎসম্বন্ধে দুই-একটি কথা বলা আবশ্যক। সংগীতকে যদি শুদ্ধ কেবল শিল্প, কেবল মনোহারিণী বিদ্যা বলিয়া ধরা যায়, তাহা হইলেও স্বীকার করিতে হয় যে আমাদের দেশীয় অনুভাব-শূন্য সংগীত নিকৃষ্ট শ্রেণীর। চিত্রশিল্প দুই প্রকারের আছে। এক— অনুভাবপূর্ণ মুখশ্রী ও প্রকৃতির অনুকৃতি, দ্বিতীয়— যথাযথ রেখাবিন্যাস দ্বারা একটা নেত্র-

রঞ্জক আকৃতি নির্মাণ করা। কেহই অস্বীকার করিবেন না যে, প্রথমটিই উচ্চতর শ্রেণীর চিত্রবিদ্যা। আমাদের দেশে শালের উপরে, নানাবিধ কাপড়ের পাড়ে, রেখাবিন্যাস ও বর্ণবিন্যাস দ্বারা বিবিধ নয়ন-রঞ্জক আকৃতিসকল চিত্রিত হয়, কিন্তু শুদ্ধ তাহাতেই আমরা ইটালীয়দের ন্যায় চিত্র-শিল্পী বলিয়া বিখ্যাত হইব না। আমাদের সংগীতও সেইরূপ সুরবিন্যাস মাত্র, যতক্ষণ আমরা তাহার মধ্যে অনুভাব না আনিতে পারিব, ততক্ষণে আমরা উচ্চশ্রেণীর সংগীতবিৎ বলিয়া গর্ব করিতে পারিব না।

অতএব স্বীকার করা যাক রাগরাগিণীর শ্রেষ্ঠ উদ্দেশ্য ভাব প্রকাশ করা। কিন্তু এখন তাহা কী হইয়া দাঁড়াইয়াছে? এখন রাগরাগিণীই উদ্দেশ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। যে রাগরাগিণীর হস্তে ভাবটিকে সমর্পণ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল, সে রাগরাগিণী আজ বিশ্বাসঘাতকতা পূর্বক ভাবটিকে হত্যা করিয়া স্বয়ং সিংহাসন দখল করিয়া বসিয়া আছেন। আজ গান শুনিলেই সকলে দেখিতে চান, জয়জয়ন্তী, বেহাগ বা কানেড়া বজায় আছে কি না; আরে মহাশয়, জয়জয়ন্তীর কাছে আমরা এমন কী ঋণে বদ্ধ, যে, তাহার নিকটে অমনতরো অন্ধ দাস্যবৃত্তি করিতে হইবে? যদি স্থল বিশেষে মধ্যমের স্থানে পঞ্চম দিলে ভালো শুনায় কিংবা মন্দ শুনায় না, আর তাহাতে বর্ণনীয় ভাবের সহায়তা করে, তবে জয়জয়ন্তী বাঁচুন বা মরুন, আমি পঞ্চমকেই বাহাল রাখিব না কেন— আমি জয়জয়ন্তীর কাছে এমন কী ঘুষ খাইয়াছি যে তাহার এত গোলামি করিতে হইবে? আজকাল ওস্তাদবর্গ যখন ভীষণ মুখশ্রী বিকাশ করিয়া গলদঘর্ম হইয়া গান শুরু করেন, তখন সর্ব প্রথমেই ভাবের গলাটা এমন করিয়া টিপিয়া ধরেন, ও ভাব বেচারীকে এমন করিয়া ত্রাহি ত্রাহি আর্তনাদ ছাড়ান যে, সহৃদয় শ্রোতা মাত্রেরই বড়ো কষ্ট বোধ হয়। বৈয়াকরণে ও কবিতে যে প্রভেদ, উপরি-উক্ত ওস্তাদের সহিত আর-একজন ভাবুক গায়কের সেই প্রভেদ। কোন্ কোন্ রাগরাগিণীতে কী কী সুর লাগে না-লাগে তাহা তো মান্ধাতার আমলে স্থির হইয়া গিয়াছে, তাহা লইয়া আর অধিক পরিশ্রম করিবার কোনো আবশ্যক দেখিতেছি না, এখন সংগীতবেত্তারা যদি বিশেষ মনোযোগ সহকারে আমাদের কী কী রাগিণীতে কী কী ভাব আছে তাহাই আবিষ্কার করিতে আরম্ভ করেন, তবেই সংগীতের যথার্থ উপকার করেন। আমাদের রাগরাগিণীর মধ্যে একটা ভাব আছে, তাহা যাইবে কোথা বলো? কেবল ওস্তাদবর্গেরা তাহাদের অত্যন্ত উৎপীড়ন করিয়া থাকেন, তাহাদের প্রতি কিছুমাত্র মনোযোগ দেন না, এমন-কি তাহারা তাঁহাদের চোখে পড়েই না। সংগীতবেত্তারা সেই ভাবের প্রতি সকলের মনোযোগ আকর্ষণ করুন। কেন বিশেষ বিশেষ এক-এক-রাগিণীতে বিশেষ বিশেষ এক-একটা ভাবের উৎপত্তি হয় তাহার কারণ বাহির করুন। এই মনে করুন, পূরবীতেই বা কেন সন্ধ্যাকাল মনে আসে আর ভৈঁরোতেই বা কেন প্রভাত মনে আসে? পূরবীতেও কোমল সুরের বাহুল্য, আর ভৈঁরোতেও কোমল সুরের বাহুল্য, তবে উভয়েতে বিভিন্ন ফল উৎপন্ন করে কেন? তাহা কি কেবলমাত্র প্রাচীন সংস্কার হইতে হয়?

উপস্থিতমতো এ বিষয়ে একটা মত দেওয়া আমার পক্ষে অত্যন্ত দুরূহ। এই পর্যন্ত বলিতে পারি ভৈঁরো শুনিবামাত্র আমার মনে প্রভাতের ভাব আসে এবং পূরবী, গৌরী প্রভৃতি রাগিণী শুনিবামাত্র মনের মধ্যে সন্ধ্যার মূর্তি জাজ্বল্যমান হইয়া উঠে। তাহার কতটা পূর্বসংস্কারবশত কতটা অন্য কারণবশত বলা, বিচারসাধ্য। উষা আপনার গতনিদ্র জীবনের পরিপূর্ণতা লইয়া অগাধ নিস্তব্ধ, সে জীবনের এখনো ব্যয় হয় নাই ক্ষয় হয় নাই কার্য আরম্ভ হয় নাই— আর সন্ধ্যা পরিণামগাম্ভীর্য ঔদাস্যে বৈরাগ্যে শ্রান্তিভারে আসন্ন তিমির রজনীর আগমন অপেক্ষায় নিস্তব্ধ— ভৈঁরো এবং পূরবীতে প্রভাত ও সন্ধ্যার এই ঐক্য অথচ অনৈক্য আমার মনে উদয় করিয়া দেয়।

তাহার পর যখন দেখিতেছি উক্ত দুই রাগিণী বহুকাল ধরিয়া উক্ত দুই সময়ের জন্য আমাদের দেশের সর্বসাধারণে ধার্য করিয়াছে তখন সহজেই মনে হয় উক্ত দুই রাগিণীর মধ্যে এমন কিছু আছে, যে কারণে উহারা সন্ধ্যা ও প্রভাতের ভাব আমাদের মনে উদ্রেক করিয়া দেয়। সেটি যে কী, তাহা আমি গীতানুরাগী বিচক্ষণ ভাবুক ব্যক্তিদিগকে অনুশীলন করিয়া দেখিতে অনুরোধ করি। দেখা গিয়াছে আমাদের দিবাবসানের রাগিণীতে কোমল রেখাব এবং কড়ি মধ্যমের যোগই বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয়— এবং ভৈঁরোতে কোমল রেখাব লাগে বটে কিন্তু কড়ি মধ্যম লাগে না, শুদ্ধ মধ্যম লাগে, এই সামান্য প্রভেদেই প্রথমত সুরের মূর্তি অনেক পরিবর্তন হইয়া যায় তাহার পরে অন্যান্য প্রভেদও আছে। এইরূপ সুরের সামান্য পরিবর্তনে কেন যে ভাবের মূর্তি এত পরিবর্তিত হয় তাহা বলা আমার সাধ্যায়ত্ত নহে।

কোন্ সুরগুলি দুঃখের ও কোন্ সুরগুলি সুখের হওয়া উচিত দেখা যাক। কিন্তু তাহা বিচার করিবার আগে, আমরা দুঃখ ও সুখ কিরূপে প্রকাশ করি দেখা আবশ্যক। আমরা যখন রোদন করি তখন দুইটি পাশাপাশি সুরের মধ্যে ব্যবধান অতি অল্পই থাকে, রোদনের স্বর প্রত্যেক কোমল সুরের উপর দিয়া গড়াইয়া যায়, সুর অত্যন্ত টানা হয়। আমরা যখন হাসি— হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ, কোমল সুর একটিও লাগে না, টানা স্বর একটিও নাই, পাশাপাশি সুরের মধ্যে দূর ব্যবধান, আর তালের ঝোঁকে ঝোঁকে সুর লাগে। দুঃখের রাগিণী দুঃখের রজনীর ন্যায় অতি ধীরে ধীরে চলে, তাহাকে প্রতি কোমল সুরের উপর দিয়া যাইতে হয়। আর সুখের রাগিণী সুখের দিবসের ন্যায় অতি দ্রুত পদক্ষেপে চলে, দুই-তিনটা করিয়া সুর ডিঙাইয়া যায়। আমাদের রাগরাগিণীর মধ্যে উল্লাসের সুর নাই। আমাদের সংগীতের ভাবই— ক্রমে ক্রমে উত্থান বা ক্রমে ক্রমে পতন। সহসা উত্থান বা সহসা পতন নাই। উচ্ছ্বাসময় উল্লাসের সুরই অত্যন্ত সহসা। আমরা সহসা হাসিয়া উঠি, কোথা হইতে আরম্ভ করি কোথায় শেষ করি তাহার ঠিকানা নাই, রোদনের ন্যায় তাহা ক্রমশ মিলাইয়া আসে না। এরূপ ঘোরতর উল্লাসের সুর ইংরাজি রাগিণীতে আছে, আমাদের রাগিণীতে নাই বলিলেও হয়। তবে আমাদের দেশে সংগীতে রোদনের সুরের অভাব নাই। সকল রাগিণীতেই প্রায় কাঁদা যায়। একেবারে আর্তনাদ হইতে প্রশান্ত দুঃখ, সকল প্রকার ভাবই আমাদের রাগিণীতে প্রকাশ করা যায়।

আমাদের যাহা-কিছু সুখের রাগিণী আছে, তা বিলাসময় সুখের রাগিণী, গদগদ সুখের রাগিণী। অনেক সময়ে আমরা উল্লাসের গান রচনা করিতে হইলে রাগিণী যে ভাবেরই হউক তাহাকে দ্রুত তালে বসাইয়া লই, দ্রুত তাল সুখের ভাব প্রকাশের একটা অঙ্গ বটে।

যাহা হউক, এইখানে দেখা যাইতেছে যে, তালও ভাব প্রকাশের একটা অঙ্গ। যেমন সুর তেমনি তালও আবশ্যকীয়, উভয়ে প্রায় সমান আবশ্যকীয়। অতএব ভাবের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তালও দ্রুত ও বিলম্বিত করা আবশ্যক— সর্বত্রই যে তাল সমান রাখিতেই হইবে তাহা নয়। ভাব প্রকাশকে মুখ্য উদ্দেশ্য করিয়া সুর ও তালকে গৌণ উদ্দেশ্য করিলেই ভালো হয়। ভাবকে স্বাধীনতা দিতে হইলে সুর এবং তালকেও অনেকটা স্বাধীন করিয়া দেওয়া আবশ্যক, নহিলে তাহারা ভাবকে চারি দিক হইতে বাঁধিয়া রাখে। এই-সকল ভাবিয়া আমার বোধ হয়, আমাদের সংগীতে যে নিয়ম আছে যে যেমন-তেমন করিয়া ঠিক একই স্থানে সমে আসিয়া পড়িতেই হয়, সেটা উঠাইয়া দিলে ভালো হয়। তালের সমমাত্রা থাকিলেই যথেষ্ট, তাহার উপরে আরো কড়াক্কড় করা ভালো বোধ হয় না ; তাহাতে স্বাভাবিকতার অতিরিক্ত হানি করা হয়। মাথায় জলপূর্ণ কলস লইয়া নৃত্য করা যেরূপ, হাজার অঙ্গভঙ্গি করিলেও একবিন্দু জল উথলিয়া পড়িবে

না, ইহাও সেইরূপ একপ্রকার কষ্টসাধ্য ব্যায়াম। সহজ স্বাভাবিক নৃত্যের যে একটি শ্রী আছে ইহাতে তাহার যেন ব্যাঘাত করে; ইহাতে কৌশল প্রকাশ করে মাত্র। নৃত্যের পক্ষে কী স্বাভাবিক? না যাহা নৃত্যের উদ্দেশ্য সাধন করে। নৃত্যের উদ্দেশ্য কী? না অঙ্গভঙ্গির সৌন্দর্য অঙ্গভঙ্গির কবিতা দেখাইয়া মনোহরণ করা। সে উদ্দেশ্যের বহির্ভূক্ত যাহা-কিছু, তাহা নৃত্যের বহির্ভূক্ত। তাহাকে নৃত্য বলিব না, তাহার অন্য নাম দিব। তেমনি সংগীত কৌশল প্রকাশের স্থান নহে ভাব প্রকাশের স্থান, যতখানিতে ভাব প্রকাশের সাহায্য করে ততখানিই সংগীতের অন্তর্গত, যাহা-কিছু কৌশল প্রকাশ করে তাহা সংগীত নহে তাহার অন্য নাম। একপ্রকার কবিতা আছে, তাহা সোজা দিক হইতে পড়িলেও যাহা বুঝায়, উলটা দিক হইতে পড়িলেও তাহাই বুঝায়, সেরূপ কবিতা কৌশল প্রকাশের জন্যই উপযোগী, আর-কোনো উদ্দেশ্য তাহাতে সাধন করা যায় না। সেইরূপ আমাদের সংগীতে কৃত্রিম তালের প্রথা ভাবের হস্ত পদে একটা অনর্থক শৃঙ্খল বাঁধিয়া দেয়। যাঁহারা এ প্রথা নিতান্ত রাখিতে চান, তাঁহারা রাখুন, কিন্তু তালের প্রতি ভাবের যখন অত্যন্ত নির্ভর দেখিতেছি, তখন আমার মতে আর-একটি অধিকতর স্বাভাবিক তালের পদ্ধতি থাকা শ্রেয়। আর কিছু করিতে হইবে না, যেমন তাল আছে, তেমনি থাকুক, মাত্রা বিভাগ যেমন আছে তেমনি থাকুক, কেবল একটা নির্দিষ্টস্থানে সমে ফিরিয়া আসিতেই হইবে এমন বাঁধাবাঁধি না থাকিলে সুবিধা বৈ অসুবিধা কিছুই দেখিতেছি না। এমন-কি গীতিনাট্যে, যাহা আদ্যোপান্ত সুরে অভিনয় করিতে হয় তাহাতে, স্থান-বিশেষে তাল না থাকা বিশেষ আবশ্যক। নহিলে অভিনয়ের স্ফূর্তি হওয়া অসম্ভব।

যাহা হউক, দেখা যাইতেছে যে, সংগীতের উদ্দেশ্যই ভাব প্রকাশ করা। যেমন কেবলমাত্র ছন্দ, কানে মিষ্ট শুনাক তথাপি অনাবশ্যক, ভাবের সহিত ছন্দই কবিদের ও ভাবুকদের আলোচনীয়, তেমনি কেবলমাত্র সুরসমষ্টি, ভাব না থাকিলে জীবনহীন দেহ মাত্র ; সে দেহের গঠন সুন্দর হইতে পারে কিন্তু তাহাতে জীবন নাই। কেহ কেহ বলিবেন, তবে কি রাগরাগিণী আলাপ নিষিদ্ধ? আমি বলি, তাহা কেন হইবে? রাগরাগিণী আলাপ, ভাষাহীন সংগীত। অভিনয়ে pantomime যেরূপ, ভাষাহীন, অঙ্গভঙ্গি দ্বারা ভাবপ্রকাশ-করা-সংগীতে আলাপও সেইরূপ। কিন্তু pantomime-এ যেমন কেবলমাত্র অঙ্গভঙ্গি হইলেই হয় না, যে-সকল অঙ্গভঙ্গি দ্বারা ভাব প্রকাশ হয় তাহাই আবশ্যক ; আলাপেও সেইরূপ কেবল কতকগুলি সুর কণ্ঠ হইতে বিক্ষেপ করিলেই হইবে না, যে-সকল সুরবিন্যাস দ্বারা ভাব প্রকাশ হয়, তাহাই আবশ্যক। গায়কেরা সংগীতকে যে আসন দেন, আমি সংগীতকে তদপেক্ষা উচ্চ আসন দিই; তাঁহারা সংগীতকে কতকগুলা চেতনাহীন জড় সুরের উপর স্থাপন করেন, আমি তাহাকে জীবন্ত অমর ভাবের উপর স্থাপন করি। তাঁহারা গানের কথার উপরে সুরকে দাঁড় করাইতে চান, আমি গানের কথাগুলিকে সুরের 'উপরে দাঁড় করাইতে চাই। তাঁহারা কথা বসাইয়া যান সুর বাহির করিবার জন্য, আমি সুর বসাইয়া যাই কথা বাহির করিবার জন্য। এইখানে গান রচনা সম্বন্ধে একটি কথা বলা আবশ্যক বিবেচনা করিতেছি। গানের কবিতা, সাধারণ কবিতার সঙ্গে কেহ যেন এক তুলাদণ্ডে ওজন না করেন। সাধারণ কবিতা পড়িবার জন্য ও সংগীতের কবিতা শুনিবার জন্য। উভয়ে যদি এতখানি শ্রেণীগত প্রভেদ হইল, তবে অন্যান্য নানা ক্ষুদ্র বিষয়ে অমিল হইবার কথা। অতএব গানের কবিতা পড়িয়া বিচার না করাই উচিত। খুব ভালো কবিতাও গানের পক্ষে হয়তো খারাপ হইতে পারে এবং খুব ভালো গানও হয়তো পড়িবার পক্ষে ভালো না হইতে পারে। মনে করুন, একজন হাঃ— বলিয়া একটি নিশ্বাস ফেলিল, তাহা লিখিয়া লইলে আমরা পড়িব "হ"য়ে আকার ও

বিসর্গ, হাঃ, কিন্তু সে নিশ্বাসের মর্ম কি এরূপে অবগত হওয়া যায়? তেমনি আবার যদি আমরা শুনি কেহ খুব একটা লম্বা-চৌড়া কবিত্বসূচক কথায় নিশ্বাস ফেলিতেছে, তবে হাস্যরস ব্যতীত আর কোনো রস কি মনে আসে? গানও সেইরূপ নিশ্বাসের মতো। গানের কবিতা পড়া যায় না, গানের কবিতা শুনা যায়।

উপসংহারে সংগীতবেত্তাদিগের প্রতি আমার এই নিবেদন যে, কী কী সুর কিরূপে বিন্যাস করিলে কী কী ভাব প্রকাশ করে, আর কেনই বা তাহা প্রকাশ করে, তাহার বিজ্ঞান অনুসন্ধান করুন। মুলতান, ইমন-কল্যাণ, কেদারা প্রভৃতিতে কী কী সুর বাদী আর কী কী সুর বিসম্বাদী তাহার প্রতি মনোযোগ না করিয়া, দুঃখ সুখ, রোষ বা বিস্ময়ের রাগিণীতে কী কী সুর বাদী ও কী কী সুর বিসম্বাদী, তাহাই আবিষ্কারে প্রবৃত্ত হউন। মুলতান কেদারা প্রভৃতি তো মানুষের রচিত কৃত্রিম রাগরাগিণী, কিন্তু আমাদের সুখদুঃখের রাগরাগিণী কৃত্রিম নহে। আমাদের স্বাভাবিক কথাবার্তার মধ্যে সেই-সকল রাগরাগিণী প্রচ্ছন্ন থাকে। কতকগুলা অর্থশূন্য নাম পরিত্যাগ করিয়া, বিভিন্ন ভাবের নাম অনুসারে আমাদের রাগরাগিণীর বিভিন্ন নামকরণ করা হউক। আমাদের সংগীতবিদ্যালয়ে সুর অভ্যাস ও রাগরাগিণী শিক্ষার শ্রেণী আছে, সেখানে রাগরাগিণীর ভাব-শিক্ষারও শ্রেণী স্থাপিত হউক। এখন যেমন সংগীত শুনিলেই সকলে বলেন "বাঃ ইহার সুর কী মধুর", এমন দিন কি আসিবে না যেদিন সকলে বলিবেন, "বাঃ কী সুন্দর ভাব।"

আমাদের সংগীত যখন জীবন্ত ছিল, তখন ভাবের প্রতি যেরূপ মনোযোগ দেওয়া হইত সেরূপ মনোযোগ আর-কোনো দেশের সংগীতে দেওয়া হয় কি না সন্দেহ। আমাদের দেশে যখন বিভিন্ন ঋতু ও বিভিন্ন সময়ে ভাবের সহিত মিলাইয়া বিভিন্ন রাগরাগিণী রচনা করা হইত, যখন আমাদের রাগরাগিণীর বিভিন্ন ভাবব্যঞ্জক চিত্র পর্যন্ত ছিল, তখন স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, আমাদের দেশে রাগরাগিণী ভাবের সেবাতেই নিযুক্ত ছিল। সেদিন গিয়াছে। কিন্তু আবার কি আসিবে না?

সংগীতের মুক্তি

সংগীত সম্বন্ধে কিছু বলিবার জন্য সংগীতসংঘ হইতে আমাকে অনুরোধ করা হইয়াছে। ফর্মাশ এই যে, দিশি বিলাতি কোনোটাকে যেন বাদ দেওয়া না হয়। বিষয়টা গুরুতর এবং তাহা আলোচনা করিবার একটিমাত্র যোগ্যতা আমার আছে— তাহা এই যে, দিশি এবং বিলাতি কোনো সংগীতই আমি জানি না।

তা বলিয়া জানি না বলিতে এতটা দূর বোঝায় না যে, সংগীতের সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্কই নাই। সম্পর্কটা কী রকম সেটা একটু খোলসা করিয়া বলা চাই।

পৃথিবীতে দুই রকমের জানা আছে। এক ব্যবসায়ীর জানা, আর-এক অব্যবসায়ীর জানা। ব্যবসায়ী জানে যেটা জানা সহজ নয়, অর্থাৎ নাড়ি-নক্ষত্র। আর অব্যবসায়ী জানে যেটা জানা নিতান্তই সহজ, অর্থাৎ হাবভাব, চাল-চলন।

এই নাড়ি-নক্ষত্র জানাটাই প্রকৃত জানা এমন একটা অন্ধসংস্কার সংসারে চলিত আছে। তাই সরলহৃদয় আনাড়িদের মনে সর্বদাই একটা ভয় থাকে ঐ নাড়ি-নক্ষত্র পদার্থটা না জানি কী! আর, ব্যবসায়ী লোকেরা ঐ নাড়ি-নক্ষত্রের দোহাই দিয়া অব্যবসায়ী লোকের মুখ চাপা দিয়া রাখেন।

অথচ জগতে ওস্তাদ কয়েকজন মাত্র, আর অধিকাংশই আনাড়ি। বর্তমান যুগের প্রধান সর্দার হচ্ছে ডিমক্রেসি, সাধুভাষায় যাকে বলে 'অধিকাংশ'। অতএব, এ যুগে আনাড়িরও কথা বলিবার অধিকার আছে। এমন-কি, তার অধিকারই বেশি। যে বলে 'আমি জানি' সেই কেবল কথা কহিয়া যাইবে আর যে জানে 'আমি জানি না' সেই চুপ করিয়া যাইবে, এখনকার কালের এমন ধর্ম নহে। অতএব আজ আমি গান সম্বন্ধে যা বলিব তা সেই আনাড়িদের প্রতিনিধিরূপে।

কিন্তু মনে থাকে যেন আনাড়িদের একজন মাত্র প্রতিনিধিতে কুলায় না। সব সেয়ানের এক মত, কেননা তাদের বাঁধা রাস্তা; যারা সেয়ানা নয় তাদের অনেক মত, কেননা তাদের রাস্তাই নাই। তাই বহু সেয়ানার এক প্রতিনিধি চলে, কিন্তু অসেয়ানাদের মধ্যে যতগুলিই মানুষ ততগুলিই প্রতিনিধি। অতএব হিসাব-নিকাশের সময় হয়তো দেখিবেন আমার মতের মিল এক ব্যক্তির সঙ্গেই আছে এবং সে ব্যক্তি আমার মধ্যেই বিরাজমান।

আনাড়ির মস্ত সুবিধা এই যে, সানাড়ির চেয়ে তার অভিজ্ঞতার সুযোগ বেশি। কেননা, পথ একটা বৈ নয় কিন্তু অপথের সীমা নাই; সে দিক দিয়া যে চলে সেই বেশি দেখে, বেশি ঠেকে। আমি পথ জানি না বলিয়াই হোক কিংবা আমার মনটা লক্ষ্মীছাড়া স্বভাবের বলিয়াই হোক, এতদিন গানের ঐ অপথ এবং আঘাটা দিয়াই চলিয়াছি। সুতরাং আমার অভিজ্ঞতায় যাহা মিলিয়াছে তাহা শাস্ত্রের সঙ্গে মেলে না। এটা নিশ্চয়ই অপরাধের বিষয় কিন্তু সেইজন্যই হয়তো মনোরম হইতে পারে।

কাব্যকলা বা চিত্রকলা দুইটি ব্যক্তিকে লইয়া। যে মানুষ রচনা করে আর যে মানুষ ভোগ করে। গীতিকলায় আরো একজন প্রবেশ করিয়াছে। রচয়িতা এবং শ্রোতার মাঝখানে আছে ওস্তাদ। মধ্যস্থ পদার্থটা বিন্ধ্য পর্বতের মতো বাধাও হইতে পারে, আবার সুয়েজ ক্যানালের মতো সুযোগও হইতে পারে। তবু, যাই হোক, উপসর্গ বাড়িলে বিপদও বাড়ে। রসের স্রষ্টা এবং রসের ভোক্তা এই দুয়ের উপযুক্তমতো সমাবেশ, সংসারে এইই তো যথেষ্ট দুর্লভ, তার উপরে আবার রসের বাহনটি— ত্রৈগুণ্যের এমন পরিপূর্ণ সম্মিলন বড়ো কঠিন। ইংরেজিতে একটা প্রবাদ আছে— দুয়ের যোগে সঙ্গ, তিনের যোগে গোলযোগ।

ইন্দ্রের চেয়ে ইন্দ্রের ঐরাবতের বিপুলতা নিশ্চয়ই অনেক গুণে বড়ো। গীতিকলায় তেমনি ওস্তাদ অনেকখানি জায়গা জুড়িয়াছেন। দেবতার চেয়ে পাণ্ডাকে যেমন ঢের বেশি খাতির করিতে হয়, তেমনি আসরে ওস্তাদের খাতির স্বয়ং সংগীতকেও যেন ছাড়াইয়া যায়। কৃষ্ণ বড়ো কি রাধা বড়ো এ তর্ক শুনিয়াছি, কিন্তু মথুরার রাজসভার দারোয়ানজি বড়ো কি না এই তর্কটা বাড়িল।

যে লোক মাঝারি সে তার মাঝখানের নির্দিষ্ট জায়গাটিতে সন্তুষ্ট থাকে না, সে প্রমাণ করিতে চায় যে সেই যেন উপরওয়ালা। উত্তমের বিনয় স্বাভাবিক, অধমের বিনয় দায়ে পড়িয়া, কিন্তু জগতে সব চেয়ে দুঃসহ ঐ মধ্যম। রাজা মানুষটি ভালোই, আর প্রজা তো মাটির মানুষ, কিন্তু আমলা! তার কথা চাপিয়া যাওয়াই ভালো। নিজের 'রাজকর্মচারী' নামটার প্রথম অংশটাই তার মনে থাকে, দ্বিতীয় অংশটা কিছুতেই সে মুখস্থ করিয়া উঠিতে পারে না। এই কারণেই যেখানে প্রজার হাতে কোনো ক্ষমতাই নাই, সেখানে আমলাতন্ত্র অর্থাৎ ব্যুরোক্রেসি উঁচুদরের জিনিস হইতে পারে না। আমাদের সংগীতে এই ব্যুরোক্রেসির আধিপত্য ঘটিল।

এইখানে য়ুরোপের সংগীত-পলিটিক্সের সঙ্গে আমাদের সংগীত-পলিটিক্সের তফাত। সেখানে ওস্তাদকে অনেক বেশি বাঁধাবাঁধির মধ্যে থাকিতে হয়। গানের কর্তা নিজের হাতে সীমানা পাকা

করিয়া দেন, ওস্তাদ সেটা সম্পূর্ণ বজায় রাখেন। তাঁকে যে নিতান্ত আড়ষ্ট হইয়া থাকিতে হইবে তাও নয়, আবার খুব যে দাপাদাপি করিবেন সে রাস্তাও বন্ধ।

য়ুরোপের প্রত্যেক গান একটি বিশেষ ব্যক্তি, সে আপনার মধ্যে প্রধানত আত্মমর্যাদাই প্রকাশ করে। ভারতে প্রত্যেক গান একটি বিশেষ-জাতীয়, সে আপনার মধ্যে প্রধানত জাতিমর্যাদাই প্রকাশ করে। য়ুরোপীয় ওস্তাদকে সাবধানে গানের ব্যক্তিত্ব বজায় রাখিয়া চলিতে হয়। আমাদের দেশের গানে ব্যক্তিত্ব আছে, কেবল সে কোন্ জাতি তাই সন্তোষজনকরূপে প্রমাণ করিবার জন্যে। য়ুরোপে গান সম্বন্ধে যে কর্তৃত্ব গান-রচয়িতার, আমাদের দেশে তাহাই দুইজনে বখরা করিয়া লইয়াছে— গানওয়ালা এবং গাহনেওয়ালা। যেখানে কর্তৃত্বের এমন জুড়ি হাঁকানো হয় সেখানে রাস্তাটা চওড়া চাই। গানের সেই চওড়া রাস্তার নাম রাগরাগিণী। সেটা গানকর্তার প্রাইভেট রাস্তা নয়, সেখানে ট্রেসপাসের আইন খাটে না।

এক হিসাবে এ বিধিটা ভালোই। যে মানুষ গান বাঁধিবে আর যে মানুষ গান গাহিবে দুজনেই যদি সৃষ্টিকর্তা হয় তবে তো রসের গঙ্গাযমুনাসংগম। যে গান গাওয়া হইতেছে সেটা যে কেবল আবৃত্তি নয়, তাহা যে তখন-তখনি জীবন-উৎস হইতে তাজা উঠিতেছে, এটা অনুভব করিলে শ্রোতার আনন্দ অক্লান্ত অম্লান হইয়া থাকে। কিন্তু মুশকিল এই যে, সৃষ্টি করিবার ক্ষমতা জগতে বিরল। যাদের শক্তি আছে তারা গান বাঁধে, আর যাদের শিক্ষা আছে তারা গান গায়— সাধারণত এরা দুই জাতের মানুষ। দৈবাৎ ইহাদের জোড় মেলে, কিন্তু প্রায় মেলে না। ফলে দাঁড়ায় এই যে, কলাকৌশলের কলা অংশটা থাকে গানকর্তার ভাগে, আর ওস্তাদের ভাগে পড়ে কৌশল অংশটা। কৌশল জিনিসটা খাদ হিসাবেই চলে, সোনা হিসাবে নয়। কিন্তু ওস্তাদের হাতে খাদের মিশল বাড়িতেই থাকে। কেননা, ওস্তাদ মানুষটাই মাঝারি, এবং মাঝারির প্রভুত্বই জগতে সব চেয়ে বড়ো দুর্ঘটনা। এইজন্যে ভারতের বৈঠকী সংগীত কালক্রমে সুরসভা ছাড়িয়া অসুরের কুস্তির আখড়ায় নামিয়াছে। সেখানে তান-মান-লয়ের তাণ্ডবটাই প্রবল হইয়া ওঠে, আসল গানটা ঝাপসা হইয়া থাকে।

রসবোধের নাড়ি যখন ক্ষীণ হইয়া আসে কৌশল তখন কলাকে ছাড়াইয়া যায়, সাহিত্যের ইতিহাসেও ইহা বরাবর দেখা গেছে। এ দেশে গানের যখন ভরাযৌবন ছিল তখন এমন-সব ওস্তাদ নিশ্চয়ই সর্বদাই মিলিত, গান গাওয়াই যাঁদের স্বভাব, গানের পালোয়ানি করা যাঁদের ব্যবসা নয়। বুলবুলি তখন গানেরই খ্যাতি পাইত, লড়াইয়ের নয়। তখন এমন-সকল শ্রোতাও নিশ্চয়ই ছিল যাঁরা সংগীত-ভাটপাড়ার বিধান যাচাইয়া গানের বিচার করিতেন না। কেননা, শুনিবারও প্রতিভা থাকা চাই, কেবল শুনাইবার নয়।

আমাদের কালোয়াতি গানের এই যে রাগরাগিণী, ইহার রসটা কী? রাগ শব্দের গোড়াকার মানে রঙ। এই শব্দটা যখন মনের সম্বন্ধে ব্যবহার করা হয় তখন বোঝায় ভালো লাগা। বাংলায় রাগ কথাটার মানে ক্রোধ। ইংরেজিতে passion বলিতে ভালো লাগা আর ক্রোধ দুই বোঝায়। ভালো লাগা আর ক্রোধ এই দুয়ের মধ্যে একটা ঐক্য আছে। এই দুটো ভাবেই চিত্ত উদ্দীপ্ত হইয়া উঠে। এই দুয়েরই এক রঙ, সেই রঙটা রাঙা। ওটা রক্তের রঙ, হৃদয়ের নিজের আভা।

বিশ্বের একটা হৃদয়ের আভা নিয়ত প্রকাশ পাইতেছে। ভোরবেলাকার আকাশে হাওয়ায় এমন কিছু একটা আছে যেটা কেবলমাত্র বস্তু নয়, ঘটনা নয়, যেটা কেবল রস। এই রসের ক্ষেত্রেই আমাদের অন্তরের সঙ্গে বাহিরের রাগ-অনুরাগের মিল। এই মিলের তত্ত্বটি অনির্বচনীয়। যাহা নির্বচনীয় তাহা পৃথক, তাহা আপনাতে আপনি সুনির্দিষ্ট। যেখানে পদ্মফুলের নির্বচনীয়তা

সেখানে তার আকার আয়তন ও বস্তুপরিমাণ সম্পূর্ণ সীমাবদ্ধভাবে তার আপনারই। কিন্তু যেখানে পদ্মটি অনির্বচনীয় সেখানে সে যেন আপনার সমস্তটার চেয়েও আপনি অনেক বেশি। এই বেশিটুকুই তার সংগীত।

পদ্মের যেখানে এই বেশি সেখানে তার সঙ্গে আমার বেশিরও একটা গভীর মিল। তাই তো গাইতে পারি—

আজি কমলমুকুলদল খুলিল!
দুলিল রে দুলিল
মানসসরসে রসপুলকে—
পলকে পলকে ঢেউ তুলিল।
গগন মগন হল গন্ধে ;
সমীরণ মূর্ছে আনন্দে ;
গুন্ গুন্ গুঞ্জনছন্দে
মধুকর ঘিরি ঘিরি বন্দে ;
নিখিলভুবনমন ভুলিল,
মন ভুলিল রে
মন ভুলিল।

হৃদয়ের আনন্দে আর পদ্মে অভেদ হইল— ভাষার একেবারে উলটপালট হইয়া গেল। যার রূপ নাই সে রূপ ধরিল, যার রূপ আছে সে অরূপ হইল। এমন-সব অনাসৃষ্টি কাণ্ড ঘটিতেছে কোথায়? সৃষ্টি যেখানে অনির্বচনীয়তায় আপনাকে আপনি ছাড়াইয়া যাইতেছে।

আমাদের রাগরাগিণীতে সেই অনির্বচনীয় বিশ্বরসটিকে নানা বড়ো বড়ো আধারে ধরিয়া রাখার চেষ্টা হইয়াছে। যখন কল হয় নাই তখন কলিকাতায় গঙ্গার জল যেমন করিয়া জালায় ধরা হইত। যজ্ঞকর্তা আপন ইচ্ছা ও শক্তি অনুসারে নানা গড়নের ও নানা ধাতুর পাত্রে সেই রস পরিবেশন করিতে পারেন, কিন্তু একই সাধারণ জলাশয় হইতে সেটা বহিয়া আনা।

অর্থাৎ আমাদের মতে রাগরাগিণী বিশ্বসৃষ্টির মধ্যে নিত্য আছে। সেইজন্য আমাদের কালোয়াতি গানটা ঠিক যেন মানুষের গান নয়, তাহা যেন সমস্ত জগতের। ভৈরোঁ যেন ভোরবেলার আকাশেরই প্রথম জাগরণ ; পরজ যেন অবসন্ন রাত্রিশেষের নিদ্রাবিহ্বলতা ; কানাড়া যেন ঘনান্ধকারে অভিসারিকা নিশীথিনীর পথবিস্মৃতি ; ভৈরবী যেন সঙ্গবিহীন অসীমের চিরবিরহবেদনা; মূলতান যেন রৌদ্রতপ্ত দিনান্তের ক্লান্তিনিশ্বাস; পূরবী যেন শূন্যগৃহচারিণী বিধবা সন্ধ্যার অশ্রুমোচন।

ভারতবর্ষের সংগীত মানুষের মনে বিশেষভাবে এই বিশ্বরসটিকেই রসাইয়া তুলিবার ভার লইয়াছে। মানুষের বিশেষ বেদনাগুলিকে বিশেষ করিয়া প্রকাশ করা তার অভিপ্রায় নয়। তাই, যে সাহানার সুর অচঞ্চল ও গভীর, যাহাতে আমোদ-আহ্লাদের উল্লাস নাই, তাহাই আমাদের বিবাহ-উৎসবের রাগিণী। নরনারীর মিলনের মধ্যে যে চিরকালীন বিশ্বতত্ত্ব আছে সেইটিকে সে স্মরণ করাইতে থাকে, জীবজন্মের আদিতে যে দ্বৈতের সাধনা তাহারই বিরাট বেদনাটিকে ব্যক্তিবিশেষের বিবাহঘটনার উপরে সে পরিব্যাপ্ত করিয়া দেয়।

আমাদের রামায়ণ মহাভারত সুরে গাওয়া হয়, তাহাতে বৈচিত্র্য নাই, তাহা রাগিণী নয়, তাহার সুর মাত্র। আর কিছু নয়, ওটুকুতে কেবল সংসারের সমস্ত তুচ্ছতা দীনতা এবং বিচ্ছিন্নতার উপরের দিকে একটু ইশারা করিয়া দেয় মাত্র। মহাকাব্যের ভাষাটা যেখানে একটা কাহিনী বলিয়া চলে, সুর সেখানে সঙ্গে সঙ্গে কেবল বলিতে থাকে— অহো, অহো, অহো! ক্ষিতি অপে মিশাল

করিয়া যে মূর্তি গড়া তার সঙ্গে তেজ মরুৎ ব্যোমে যে সংযোগ আছে এই খবরটা মনে করাইয়া রাখে।

আমাদের বেদমন্ত্রগানেও ঐরূপ। তার সঙ্গে একটি সরল সুর লাগিয়া থাকে, মহারণ্যের মর্মরধ্বনির মতো, মহাসমুদ্রের কলগর্জনের মতো। তাহাতে কেবল এই আভাস দিতে থাকে যে, এই কথাগুলি একদিন দুইদিনের নহে, ইহা অন্তহীন কালের, ইহা মানুষের ক্ষণিক সুখদুঃখের বাণী নহে, ইহা আত্মার নীরবতারই যেন আত্মগত নিবেদন।

মহাকাব্যের বড়ো কথাটা যেখানে স্বতই বড়ো, কাব্যের খাতিরে সুর সেখানে আপনাকে ইঙ্গিত মাত্রে ছোটো করিয়া রাখিয়াছে, কিন্তু যেখানে আবার সংগীতই মুখ্য সেখানে তার সঙ্গের কথাটি কেবলই বলিতে থাকে, 'আমি কেহই না, আমি কিছুই না, আমার মহিমা সুরে।'—এইজন্য হিন্দুস্থানী গানের কথাটা অধিকাংশ স্থলেই যা-খুশি-তাই।

এই-যে পূরবীর গান—

'লইরে শ্যাম এঁদোরিয়া,
ক্যয়সে ধরুঁ মেরে
শিরো'পর গাগরিয়া'—

এর মানে, 'শ্যাম আমার জলের কলসি রাখবার বিড়েটা চুরি করিয়াছে।' এই তুচ্ছ কথাটাকে এত বড়ো সুগভীর বেদনার সুরে বাঁধিবামাত্র মন বলে এই-যে কলসি, এই-যে বিড়ে, এ তো সামান্য কলসি সামান্য বিড়ে নয়, এ এমন একটা-কিছু চুরি যার দাম বলিবার মতো ভাষা জগতে নাই—যার হিসাবের অসীম অঙ্কটা কেবল ঐ পূরবীর তানের মধ্যেই পৌঁছে।

কোনো একটা বিশেষ উদ্দীপনা—যেমন যুদ্ধের সময় সৈনিকদের মনকে রণোৎসাহে উত্তেজিত করা—আমাদের সংগীতের ব্যবহারে দেখা যায় না। তার বেলায় তুরী ভেরী দামামা শঙ্খ প্রভৃতির সহযোগে একটা তুমুল কোলাহলের ব্যবস্থা। কেননা আমাদের সংগীত জিনিসটাই ভূমার সুর ; তার বৈরাগ্য, তার শান্তি, তার গম্ভীরতা সমস্ত সংকীর্ণ উত্তেজনাকে নষ্ট করিয়া দিবার জন্যই। এই একই কারণে হাস্যরস আমাদের সংগীতের আপন জিনিস নয়। কেননা বিকৃতিকে লইয়াই বিদ্রূপ। প্রকৃতির ত্রুটিই এই বিকৃতি, সুতরাং তাহা বৃহতের বিরুদ্ধ। শান্তহাস্য বিশ্বব্যাপীর, কিন্তু অট্টহাস্য নহে। সমগ্রের সঙ্গে অসামঞ্জস্যই পরিহাসের ভিত্তি। এইজন্যই আমাদের আধুনিক উত্তেজনার গান কিংবা হাসির গান স্বভাবতই বিলিতি ছাঁদের হইয়া পড়ে।

বিলিতির সঙ্গে এই দিশি গানের ছাঁদের তফাতটা কোন্‌খানে? প্রধান তফাত সেই অতিসূক্ষ্ম সুরগুলি লইয়া যাকে বলে শ্রুতি। এই শ্রুতি আমাদের গানের সূক্ষ্ম স্নায়ুতন্ত্র। ইহারই যোগে এক সুর কেবল যে-আর-এক সুরের পাশাপাশি থাকে তা নয়, তাদের মধ্যে নাড়ীর সম্বন্ধ ঘটে। এই নাড়ীর সম্বন্ধ ছিন্ন করিলে রাগরাগিণী যদি-বা টেঁকে, তাদের ছাঁদটা বদল হইয়া যায়। আমাদের হাল ফ্যাশানের কন্সার্টের গৎগুলি তার প্রমাণ। এই গতের সুরগুলি কাটা-কাটা হইয়া নৃত্য করিতে থাকে, কিন্তু তাদের মধ্যে সেই বেদনার সম্বন্ধ থাকে না যা লইয়া আমাদের সংগীতের গভীরতা। এই-সব কাটা সুরগুলিকে লইয়া নানা প্রকারে খেলানো যায়—উত্তেজনা বলো, উল্লাস বলো, পরিহাস বলো, মানুষের বিশেষ বিশেষ হৃদয়াবেগ বলো, নানা ভাবে তাদের ব্যবহার করা যাইতে পারে। কিন্তু যেখানে রাগরাগিণী আপনার সুসম্পূর্ণতার গাম্ভীর্যে নির্বিকারভাবে বিরাজ করিতেছে সেখানে ইহারা লজ্জিত।

স্বর্গলোকের একটা মস্ত সুবিধা কিংবা অসুবিধা আছে, সেখানে সমস্তই সম্পূর্ণ। এইজন্য

দেবতারা কেবলই অমৃত পান করিতেছেন, কিন্তু তাঁরা বেকার। মাঝে মাঝে দৈত্যরা উৎপাত না করিলে তাঁদের অমরত্ব তাঁদের পক্ষে বোঝা হইয়া উঠিত। তাঁদের স্বর্গোদ্যানে তাঁরা ফুল তুলিয়া মালা গাঁথিতে পারেন, কিন্তু সেখানে ফুলগাছের একটা চান্‌কাও তাঁরা বদল করিয়া সাজাইতে পারেন না, কেননা সমস্ত সম্পূর্ণ। মর্তলোকে যেখানে অপূর্ণতা সেইখানেই নূতনের সৃষ্টি, বিশেষের সৃষ্টি, বিচিত্রের সৃষ্টি। আমাদের রাগরাগিণী সেই স্বর্গোদ্যান। ইহা চিরসম্পূর্ণ। এইজন্যই আমাদের রাগরাগিণীর রসটি সাধারণ বিশ্বরস। মেঘমল্লার বিশ্বের বর্ষা, বসন্ত বাহার বিশ্বের বসন্ত। মর্তলোকের দুঃখসুখের অন্তহীন বৈচিত্র্যকে সে আমল দেয় না।

যে-কোনো তেলেনা লইয়া যদি পরীক্ষা করিয়া দেখি তবে দেখিতে পাইব যে, তার সুরগুলিকে কাটা-কাটা রাখিলে একই রাগিণীর দ্বারা নানাপ্রকার হৃদয়ভাবের বর্ণনা হইতে পারে। কিন্তু সুরগুলিকে যদি গড়ানে করিয়া পরস্পরের গায়ে হেলাইয়া গাওয়া যায় তা হইলে হৃদয়ভাবের বিশেষ বৈচিত্র্য লেপিয়া গিয়া রাগিণীর সাধারণ ভাবটা প্রকাশ হইয়া পড়ে।

এটা কেমনতরো? যেমন দেখা গেছে খুড়তত জাঠতত মাসতত পিসতত প্রভৃতি অসংখ্য সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম পারিবারিক শ্রুতির বাঁধনে যে ছেলেটি অত্যন্ত ঠাসা হইয়া একেবারে ঠাণ্ডা হইয়া থাকে, সেই ছেলেই বৃহৎ পরিবার হইতে বাহির হইয়া, জাহাজের খালাসিগিরি করিয়া নিঃসম্বলে আমেরিকায় গিয়া, আজ খুবই শক্ত সমর্থ সজীব সতেজ ভাবে ধড়্‌ফড়্‌ করিয়া বেড়াইতেছে। আগে সে পরিবারের ঠেলাগাড়িতে পূর্বপুরুষের রাস্তায় বাঁধিবরাদ্দমতো হাওয়া খাইত। এখন সে নিজে ঘোড়া হাঁকাইয়া চলে এবং তার রাস্তার সংখ্যা নাই। বাঁধনছাড়া সুরগুলো যে গানকে গড়িয়া তোলে তার খেয়াল নাই সে কোন্‌ শ্রেণীর, সে এই জানে যে 'স্বনামা পুরুষো ধন্যঃ'।

শুধুমাত্র রসকে ভোগ করা নয় কিন্তু আপনাকে প্রকাশ করা যখন মানুষের অভিপ্রায় হয়, তখন সে এই বিশেষত্বের বৈচিত্র্যকে ব্যক্ত করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া ওঠে। তখন সে নিজের আশা আকাঙ্ক্ষা হাসি কান্না সমস্তকে বিচিত্র রূপ দিয়া আর্টের অমৃতলোক আপন হাতে সৃষ্টি করিতে থাকে। আত্মপ্রকাশের এই সৃষ্টিই স্বাধীনতা। ঈশ্বরের রচিত এই সংসার অসম্পূর্ণ বলিয়া একদল লোক নালিশ করে। কিন্তু যদি অসম্পূর্ণ না হইত তবে আমাদের অধীনতা চিরন্তন হইত। তা হইলে যা-কিছু আছে তাহাই আমাদের উপর প্রভুত্ব করিত, আমরা তার উপর একটুও হাত চালাইতে পারিতাম না। অস্তিত্বটা গলার শিকল পায়ের বেড়ি হইত। শাসনতন্ত্র যতই উৎকৃষ্ট হোক, তার মধ্যে শাসিতের আত্মপ্রকাশের কোনো ফাঁকই যদি কোথাও না থাকে, তবে তাহা সোনার দড়িতে চিরউদ্‌বন্ধন। মহাদেব নারদ এবং ভরতমুনিতে মিলিয়া পরামর্শ করিয়া যদি আমাদের সংগীতকে এমন চূড়ান্ত উৎকর্ষ দিয়া থাকেন যে আমরা তাকে কেবলমাত্র মানিতেই পারি, সৃষ্টি করিতে না পারি, তবে এই সুসম্পূর্ণতার দ্বারাই সংগীতের প্রধান উদ্দেশ্য নষ্ট হইয়াছে বলিতে হইবে।

চৈতন্যের আবির্ভাবে বাংলাদেশে বৈষ্ণবধর্ম যে হিল্লোল তুলিয়াছিল সে একটা শাস্ত্রছাড়া ব্যাপার। তাহাতে মানুষের মুক্তি-পাওয়া চিত্ত ভক্তিরসের আবেগে আত্মপ্রকাশ করিতে ব্যাকুল হইল। সেই অবস্থায় মানুষ কেবল স্থাবরভাবে ভোগ করে না, সচলভাবে সৃষ্টি করে। এইজন্য সেদিন কাব্যে ও সংগীতে বাঙালি আত্মপ্রকাশ করিতে বসিল। তখন পয়ার ত্রিপদীর বাঁধা ছন্দে প্রচলিত বাঁধা কাহিনী পুনঃপুনঃ আবৃত্তি করা আর চলিল না। বাঁধন ভাঙিল— সেই বাঁধন [ভাঙা] বস্তুত প্রলয় নহে, তাহা সৃষ্টির উদ্যম। আকাশে নীহারিকার যে ব্যাপকতা তার একটা অপরূপ মহিমা আছে। কিন্তু সৃষ্টির অভিব্যক্তি এই ব্যাপকতায় নহে। প্রত্যেক তারা আপনাতে আপনি

স্বতন্ত্র হইয়া নক্ষত্রলোকের বিরাট ঐক্যকে যখন বিচিত্র করিয়া তোলে, তখন তাহাতেই সৃষ্টির পরিণতি। বাংলা সাহিত্যে বৈষ্ণবকাব্যেই সেই বৈচিত্র্যচেষ্টা প্রথম দেখিতে পাই। সাহিত্যে এইরূপ স্বাতন্ত্র্যের উদ্দামকেই ইংরেজিতে রোম্যান্টিক মুভ্‌মেন্ট বলে।

এই স্বাতন্ত্র্যচেষ্টা কেবল কাব্যছন্দের মধ্যে নয়, সংগীতেও দেখা দিল। সেই উদ্যমের মুখে কালোয়াতি গান আর টিকিল না। তখন সংগীত এমন-সকল সুর খুঁজিতে লাগিল যাহা হৃদয়াবেগের বিশেষত্বগুলিকে প্রকাশ করে, রাগরাগিণীর সাধারণ রূপগুলিকে নয়। তাই সেদিন বৈষ্ণবধর্ম শাস্ত্রিক পণ্ডিতের কাছে যেমন অবজ্ঞা পাইয়াছিল, ওস্তাদির কাছে কীর্তন গানের তেমনই অনাদর ঘটিয়াছে।

আজ নূতন যুগের সোনার কাঠি আমাদের অলস মনকে ছুঁইয়াছে। কেবল ভোগে আর আমাদের তৃপ্তি নাই, আমাদের আত্মপ্রকাশ চাই। সাহিত্যে তার পরিচয় পাইতেছি। আমাদের নূতন-জাগরূক চিত্রকলাও পুরাতন রীতির আবরণ কাটিয়া আত্মপ্রকাশের বৈচিত্র্যের দিকে উদ্যত। অর্থাৎ, স্পষ্টই দেখিতেছি আমরা পৌরাণিক যুগের বেড়ার বাহিরে আসিলাম। আমাদের সামনে এখন জীবনের বিচিত্র পথ উদ্‌ঘাটিত। নূতন নূতন উদ্‌ভাবনের মুখে আমরা চলিব। আমাদের সাহিত্য বিজ্ঞান দর্শন চিত্রকলা সবই আজ অচলতার বাঁধন হইতে ছাড়া পাইয়াছে। এখন আমাদের সংগীতও যদি এই বিশ্বযাত্রার তালে তাল রাখিয়া না চলে তবে ওর আর উদ্ধার নাই।

হয়তো সেও চলিতে শুরু করিয়াছে। কিছুদূর না এগোলে তার হিসাব পাওয়া যাইবে না। এক দিক হইতে দেখিলে মনে হয় যেন গানের আদর দেশ হইতে চলিয়া গেছে। ছেলেবেলায় কলিকাতায় গাহিয়ে-বাজিয়ের ভিড় দেখিয়াছি ; এখন একটি খুঁজিয়া মেলা ভার, ওস্তাদ যদি-বা জোটে শ্রোতা জোটানো আরো কঠিন। কালোয়াতি বৈঠকে শেষ পর্যন্ত সবল অবস্থায় টিঁকিতে পারে এমন ধৈর্য ও বীর্য এ কালে দুর্লভ। এটা আক্ষেপের বিষয়। কিন্তু সময়ের সঙ্গে মিল না রাখিতে পারিলে বড়ো বড়ো মজবুত জিনিসও ভাঙিয়া পড়ে। এমন-কি হালকা জিনিস শীঘ্র ভাঙে না, ভাঙিবার বেলায় বড়ো জিনিসই ভাঙে। তাই আমাদের দেশের প্রাচীন স্থাপত্যের পরিচয় ভগ্নাবশেষ। অন্তত তার ধারা আর সচল নাই। অথচ কুঁড়েঘর আগে যেমন করিয়া তৈরি হইত এখনো তেমনি করিয়া হয়। কেননা, প্রাচীন স্থাপত্য যে-সকল রাজা ও ধনীর বিশেষ প্রয়োজনকে আশ্রয় করিয়াছিল তারাও নাই, সেই অবস্থারও বদল হইয়াছে। কিন্তু দেশের যে জীবনযাত্রা কুঁড়েঘরকে অবলম্বন করে তার কোনো বদল হয় নাই।

আমাদের সংগীতও রাজসভা সম্রাট্‌সভায় পোষ্যপুত্রের মতো আদরে বাড়িতেছিল। সে-সব সভা গেছে, সেই প্রচুর অবকাশও নাই, তাই সংগীতের সেই যত্ন আদর সেই হৃষ্টপুষ্টতা গেছে। কিন্তু গ্রাম্যসংগীত, বাউলের গান, এ-সবের মার নাই। কেননা, ইহারা যে রসে লালিত সেই জীবনের ধারা চিরদিনই চলিতেছে। আসল কথা, প্রাণের সঙ্গে যোগ না থাকিলে বড়ো শিল্পও টিকিতে পারে না।

কিন্তু আমাদের দেশের বর্তমান কালের জীবন কেবল গ্রাম্য নহে। তার উপরেও আর-একটা বৃহৎ লোকস্তর জমিয়া উঠিতেছে যার সঙ্গে বিশ্বপৃথিবীর যোগ ঘটিল। চিরাগত প্রথার খোপখাপের মধ্যে সেই আধুনিক চিত্তকে আর কুলায় না। তাহা নূতন নূতন উপলব্ধির পথ দিয়া চলিতেছে। আর্টের যে-সকল আদর্শ স্থাবর, তার সঙ্গে এর গতির যোগ রহিল না, বিচ্ছেদ বাড়িতে লাগিল। এখন আমরা দুই যুগের সন্ধিস্থলে। আমাদের জীবনের গতি যে দিকে, জীবনের নীতি সম্পূর্ণ সে দিকের মতো হয় নাই। দুটোতে ঠোকাঠুকি চলিতেছে। কিন্তু যেটা সচল তারই জিৎ হইবে।

এই-যে আমাদের নূতন জীবনের চাঞ্চল্য, গানের মধ্যে ইহার কিছু-কিছু লক্ষণ দেখা দিয়াছে। তাই এক দিকে গানবাজনার 'পরে অনাদরও যেমন লক্ষ্য করা যায়, আর-এক দিকে তেমনি আদরও দেখিতেছি। আজকাল ঘরে ঘরে হারমোনিয়ম, গ্রামোফোন, পাড়ায় পাড়ায় কন্সর্ট্। ইহাতে অনেকটা রুচিবিকার দেখা যায়। কিন্তু চিনি জ্বাল দিবার গোড়ার বলকে রসে অনেকটা পরিমাণ গাদ ভাসিয়া ওঠে। সেই গাদ কাটিতে কাটিতেই রস ক্রমে গাঢ় ও নির্মল হইয়া আসে। আজ টগ্‌বগ শব্দে সংগীতের সেই গাদ ফুটিতেছে ; পাড়ায় টেঁকা দায়। কিন্তু সেটা লইয়া উদ্‌বিগ্ন হইবার দরকার নাই। সুখবরটা এই যে, চিনির জ্বাল চড়ানো হইয়াছে।

গানবাজনার সম্বন্ধে কালের যে বদল হইয়াছে তার প্রধান লক্ষণ এই যে, আগে যেখানে সংগীত ছিল রাজা, এখন সেখানে গান হইয়াছে সর্দার। অর্থাৎ বিশেষ বিশেষ গান শুনিবার জন্যই এখনকার লোকের আগ্রহ, রাগরাগিণীর জন্য নয়। সেই-সকল বিশেষ গানের জন্যই গ্রামোফোনের কাট্‌তি। যুবক মহলে গায়কের আদর সে গান জানে বলিয়া, সে ওস্তাদ বলিয়া নয়।

পূর্বে ছিল দস্তুরের-মই-দিয়া-সমতল-করা চষা জমি। এখন তাহা ফুঁড়িয়া নানাবিধ গানের অঙ্কুর দেখা দিতেছে।। ওস্তাদের ইচ্ছা ইহাদের উপর দিয়া দস্তুরের মই চালায়। কেননা যার প্রাণ আছে তার নানান খেয়াল, দস্তুর বুড়োটা নবীন প্রাণের খেয়াল সহিতে পারে না। শাসনকেই সে বড়ো বলিয়া জানে, প্রাণকে নয়।

কিন্তু সরস্বতীকে শিকল পরাইলে চলিবে না, সে শিকল তাঁরই নিজের বীণার তারে তৈরি হইলেও নয়। কেননা মনের বেগই সংসারে সব চেয়ে বড়ো বেগ। তাকে ইন্‌টারন্‌ করিয়া যদি সলিটরি সেলের দেয়ালে বেড়িয়া রাখা যায় তবে তাহাতে নিষ্ঠুরতার পরাকাষ্ঠা হইবে। সংসারে কেবলমাত্র মাঝারির রাজত্বেই এমন-সকল নিদারুণতা সম্ভবপর হয়। যারা বড়ো, যারা ভূমাকে মানে, তারা সৃষ্টি করিতেই চায়, দমন করিতে চায় না। এই সৃষ্টির ঝঞ্ঝাট বিস্তর, তার বিপদও কম নয়। বড়ো যারা তারা সেই দায় স্বীকার করিয়াও মানুষকে মুক্তি দিতে চায়, তারা জানে মানুষের পক্ষে সব চেয়ে ভয়ংকর— মাঝারির শাসন। এই শাসনে যা-কিছু সবুজ তা হলদে হইয়া যায়, যা-কিছু সজীব তা কাঠ হইয়া ওঠে।

এইবার এই বর্তমান আনাড়ি লোকটার অপথযাত্রার ভ্রমণবৃত্তান্ত দুই-একটা কথায় বলিয়া লই। কেননা, গান সম্বন্ধে আমি যেটুকু সঞ্চয় করিয়াছি তা ঐ অঞ্চল হইতেই। সাহিত্যে লক্ষ্মীছাড়ার দলে ভিড়িয়াছিলাম খুব অল্প বয়সেই। তখন ভদ্র গৃহস্থের কাছে অনেক তাড়া খাইয়াছি। সংগীতেও আমার ব্যবহারে শিষ্টতা ছিল না। তবু সে মহল হইতে পিঠের উপর বাড়ি যে কম পড়িয়াছে তার কারণ এখনকার কালে সে দিকটার দেউড়িতে লোকবল বড়ো নাই।

তবু যত দৌরাত্ম্যই করি-না কেন, রাগরাগিণীর এলাকা একেবারে পার হইতে পারি নাই। দেখিলাম তাদের খাঁচাটা এড়ানো চলে, কিন্তু বাসাটা তাদেরই বজায় থাকে। আমার বিশ্বাস এই রকমটাই চলিবে। কেননা, আর্টের পায়ের বেড়িটাই দোষের, কিন্তু তার চলার বাঁধা পথটায় তাকে বাঁধে না।

আমার বোধ হয় য়ুরোপীয় সংগীত-রচনাতেও সুরগুলি রচয়িতার মনে এক-একটা দল বাঁধিয়া দেখা দেয়। এক-একটি গাছ কতকগুলি জীবকোষের সমবায়। প্রত্যেক কোষ অনেকগুলি পরমাণুর সম্মিলন। কিন্তু পরমাণু দিয়া গাছের বিচার হয় না, কেননা তারা বিশ্বের সামগ্রী— এই কোষগুলিই গাছের।

তেমনি রসের জৈব-রসায়নে কয়েকটি সুর বিশেষভাবে মিলিত হইলে তারাই গানের জীবকোষ হইয়া ওঠে। এই-সব দানাবাঁধা সুরগুলিকে নানা আকারে সাজাইয়া রচয়িতা গান

বাঁধেন। তাই য়ুরোপীয় গান শুনিতে শুনিতে যখন অভ্যাস হইয়া আসে তখন তার স্বরসংস্থানের কোষ-গঠনের চেহারাটা দেখিতে পাওয়া সহজ হয়। এই স্বরসংস্থানটা রূঢ়ী নয়, ইহা যৌগিক। তবেই দেখা যাইতেছে সকল দেশের গানেই আপনিই কতকগুলি সুরের ঠাট তৈরি হইয়া ওঠে। সেই ঠাটগুলিকে লইয়াই গান তৈরি করিতে হয়।

এই ঠাটগুলির আয়তনের উপরই গান-রচয়িতার স্বাধীনতা নির্ভর করে। রাজমিস্ত্রি ইঁট সাজাইয়া ইমারত তৈরি করে। কিন্তু তার হাতে ইঁট না দিয়া যদি এক-একটা আস্ত তৈরি দেয়াল কিংবা মহল দেওয়া যাইত তবে ইমারত গড়ায় তার নিজের বাহাদুরি তেমন বেশি থাকিত না। সুরের ঠাটগুলি ইঁটের মতো হইলেই তাদের দিয়া ব্যক্তিগত বিশেষত্ব প্রকাশ করা যায়, দেয়াল কিংবা আস্ত মহলের মতো হইলে তাদের দিয়া জাতিগত সাধারণতাই প্রকাশ করা যায়। আমাদের দেশের গানের ঠাট এক-একটা বড়ো বড়ো ফালি, তাকেই বলি রাগিণী।

আজ সেই ফালিগুলাকে ভাঙিয়া-চুরিয়া সেই উপকরণে নিজের ইচ্ছামতো কোঠা গড়িবার চেষ্টা চলিতেছে। কিন্তু টুকরাগুলি যতই টুকরা হোক, তাদের মধ্যে সেই আস্ত জিনিসটার একটা ব্যঞ্জনা আছে। তাদের জুড়িতে গেলে সেই আদিম আদর্শ আপনিই অনেকখানি আসিয়া পড়ে। এই আদর্শকে সম্পূর্ণ কাটাইয়া স্বাধীন হইতে পারি না। কিন্তু স্বাধীনতার 'পরে যদি লক্ষ থাকে, তবে এই বাঁধন আমাদিগকে বাধা দিতে পারিবে না। সকল আর্টেই প্রকাশের উপকরণমাত্রই এক দিকে উপায় আর-এক দিকে বিঘ্ন। সেই-সব বিঘ্নকে বাঁচাইয়া চলিতে গিয়া, কখনো তার সঙ্গে লড়াই কখনো-বা আপস করিতে করিতে আর্ট বিশেষভাবে শক্তি নৈপুণ্য ও সৌন্দর্য লাভ করে। যে উপকরণ আমাদের জুটিয়াছে তার অসম্পূর্ণতাকেও খাটাইয়া লইতে হইবে, সেও কাজে লাগিবে।

আমাদের গানের ভাষারূপে এই রাগরাগিণীর টুকরাগুলিকে পাইয়াছি। সুতরাং যেভাবেই গান রচনা করি এই রাগরাগিণীর রসটি তার সঙ্গে মিলিয়া থাকিবেই। আমাদের রাগিণীর সেই সাধারণ বিশেষত্বটি কেমন? যেমন আমাদের বাংলা দেশের খোলা আকাশ। এই অবারিত আকাশ আমাদের নদীর সঙ্গে, প্রান্তরের সঙ্গে, তরুচ্ছায়ানিভৃত গ্রামগুলির সঙ্গে নিয়ত লাগিয়া থাকিয়া তাদের সকলকেই বিশেষ একটি ঔদার্য দান করিতেছে। যে দেশে পাহাড়গুলো উঁচু হইয়া আকাশের মধ্যে বাঁধ বাঁধিয়াছে, সেখানে পার্বতী প্রকৃতির ভাবখানা আমাদের প্রান্তরবাসিনীর সঙ্গে স্বতন্ত্র। তেমনি আমাদের দেশের গান যেমন করিয়াই তৈরি হোক-না কেন, রাগরাগিণী সেই সর্বব্যাপী আকাশের মতো তাহাকে একটি বিশেষ নিত্যরস দান করিতে থাকিবে।

একবার যদি আমাদের বাউলের সুরগুলি আলোচনা করিয়া দেখি তবে দেখিতে পাইব যে, তাহাতে আমাদের সংগীতের মূল আদর্শটাও বজায় আছে, অথচ সেই সুরগুলা স্বাধীন। ক্ষণে ক্ষণে এ রাগিণী, ও রাগিণীর আভাস পাই, কিন্তু ধরিতে পারা যায় না। অনেক কীর্তন ও বাউলের সুর বৈঠকী গানের একেবারে গা ঘেঁষিয়া গিয়াও তাহাকে স্পর্শ করে না। ওস্তাদের আইন অনুসারে এটা অপরাধ। কিন্তু বাউলের সুর যে একঘরে, রাগরাগিণী যতই চোখ রাঙাক সে কিসের কেয়ার করে! এই সুরগুলিকে কোনো রাগকৌলীন্যের জাতের কোঠায় ফেলা যায় না বটে, তবু এদের জাতির পরিচয় সম্বন্ধে ভুল হয় না— স্পষ্ট বোঝা যায় এ আমাদের দেশেরই সুর, বিলিতি সুর নয়।

এমনি করিয়া আমাদের আধুনিক সুরগুলি স্বতন্ত্র হইয়া উঠিবে বটে, কিন্তু তবুও তারা একটা বড়ো আদর্শ হইতে বিচ্যুত হইবে না। তাদের জাত যাইবে বটে, কিন্তু জাতি যাইবে না। তারা সচল

হইবে, তাদের সাহস বাড়িবে, নানারকম সংযোগের দ্বারা তাদের মধ্যে নানাপ্রকার শক্তি ও সৌন্দর্য ফুটিয়া উঠিবে।

একটা উপমা দিলে কথাটা স্পষ্ট হইবে। আমাদের দেশের বিপুলায়ত পরিবারগুলি আজকাল আর্থিক ও অন্যান্য কারণে ভাঙিয়া ভাঙিয়া পড়িতেছে। সেই টুক্‌রা পরিবারের মানুষগুলির মধ্যে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য স্বভাবতই বাড়িয়াছে। তবু সেই পারিবারিক ঘনিষ্ঠতার ভাবটা আমাদের মন হইতে যায় না। এমন-কি, বাহিরের লোকের সঙ্গে ব্যবহারেও এটা ফুটিয়া ওঠে। এইটেই আমাদের বিশেষত্ব। এই বিশেষত্ব লইয়া ঠিকমতো ব্যবহার করিতে পারিলে আমাদের জীবনটা টিকটিকির কাটা লেজের মতো কিংবা কন্সর্টের তারস্বর গৎগুলার মতো নীরস খাপছাড়া হইবে না, তাহা চারি দিকের সঙ্গে সুসংগত হইবে। তাহা নিজের একটি বিশেষ রসও রাখিবে, অথচ স্বাতন্ত্র্যের শক্তিও লাভ করিবে।

একটা প্রশ্ন এখনো আমাদের মনে রহিয়া গেছে, তার উত্তর দিতে হইবে। য়ুরোপীয় সংগীতে যে হার্মনি অর্থাৎ স্বরসংগতি আছে, আমাদের সংগীতে তাহা চলিবে কি না। প্রথম ধাক্কাতেই মনে হয়— 'না, ওটা আমাদের গানে চলিবে না, ওটা য়ুরোপীয়।' কিন্তু হার্মনি য়ুরোপীয় সংগীতে ব্যবহার হয় বলিয়াই যদি তাকে একান্তভাবে য়ুরোপীয় বলিতে হয় তবে এ কথাও বলিতে হয় যে, যে দেহতত্ত্ব অনুসারে য়ুরোপে অস্ত্রচিকিৎসা চলে সেটা য়ুরোপীয়, অতএব বাঙালির দেহে ওটা চালাইতে গেলে ভুল হইবে। হার্মনি যদি দেশবিশেষের সংস্কারগত কৃত্রিম সৃষ্টি হইত তবে তো কথাই ছিল না। কিন্তু যেহেতু এটা সত্যবস্তু, ইহার সম্বন্ধে দেশকালের নিষেধ নাই। ইহার অভাবে আমাদের সংগীতে যে অসম্পূর্ণতা সেটা যদি অস্বীকার করি, তবে তাহাতে কেবলমাত্র কণ্ঠের জোর বা দম্ভের জোর প্রকাশ পাইবে।

তবে কি না ইহাও নিশ্চিত যে, আমাদের গানে হার্মনি ব্যবহার করিতে হইলে তার ছাঁদ স্বতন্ত্র হইবে। অন্তত মূল সুরকে সে যদি ঠেলিয়া চলিতে চায় তবে সেটা তার পক্ষে আস্পর্ধা হইবে। আমাদের দেশে ঐ বড়ো সুরটা চিরদিন ফাঁকায় থাকিয়া চারি দিকে খুব করিয়া ডালপালা মেলিয়াছে। তার সেই স্বভাবকে ক্লিষ্ট করিলে তাকে মারা হইবে। শীতদেশের মতো অত্যন্ত ঘন ভিড় আমাদের ধাতে সয় না। অতএব আমাদের গানের পিছনে যদি স্বরানুচর নিযুক্ত থাকে, তবে দেখিতে হইবে তারা যেন পদে পদে আলো হাওয়া না আটকায়।

বসিয়া যে থাকে তার সাজসজ্জা প্রচুর ভারী হইলেও চলে, কিন্তু চলাফেরা করিতে হইলে বোঝা হাল্‌কা করা চাই। লোকসান না করিয়া হাল্‌কা করিবার ভালো উপায়— বোঝাটাকে ভাগ করিয়া দেওয়া। আমাদের গানের বিপুল তানকর্তব ঐ হার্মনিবিভাগে চালান করিয়া দিলে মূল গানটার সহজ স্বরূপ ও গাম্ভীর্য রক্ষা পায়, অথচ তার গতিপথ খোলা থাকে। এক হাতে রাজদণ্ড, অন্য হাতে রাজছত্র, কাঁধে জয়ধ্বজা এবং মাথায় সিংহাসন বহিয়া রাজাকে যদি চলিতে হয় তবে তাহাতে বাহাদুরি প্রকাশ পায় বটে, কিন্তু তার চেয়ে শোভন ও সুসংগত হয় যদি এই আসবাবগুলি নানা স্থানে ভাগ করিয়া দেওয়া হয়। তাতে সমারোহে বাড়ে বৈ কমে না। আমাদের গানের যদি অনুচর বরাদ্দ হয়, তবে সংগীতের অনেক ভারী ভারী মালপত্র ঐদিকে চালান করিয়া দিতে পারি। যাই হোক, আমাদের সংগীতের পক্ষে এই একটা বড়ো মহল ফাঁকা আছে, এটা যদি দখল করিতে পারি তবে এই দিকে অনেক পরীক্ষা ও উদ্‌ভাবনার জায়গা পাইব। যৌবনের স্বভাবসিদ্ধ সাহস যাঁদের আছে এবং লক্ষ্মীছাড়ার ক্ষ্যাপা হাওয়া যাঁদের গায়ে লাগিল, এই একটি আবিষ্কারের দুর্গমক্ষেত্র তাঁদের সামনে পড়িয়া। আজ হোক কাল হোক, এ ক্ষেত্রে নিশ্চয়ই লোক নামিবে।

সংগীতের একটা প্রধান অঙ্গ তাল। আমাদের আসরে সব চেয়ে বড়ো দাঙ্গা এই তাল লইয়া। গানবাজনার ঘোড়দৌড়ে গান জেতে কি তাল জেতে এই লইয়া বিষম মাতামাতি। দেবতা যখন সজাগ না থাকেন তখন অপদেবতার উৎপাত এমনি করিয়াই বাড়িয়া ওঠে। স্বয়ং সংগীত যখন পরবশ তখন তাল বলে 'আমাকে দেখো' সুর বলে 'আমাকে'। কেননা, দুই ওস্তাদে দুই বিভাগ দখল করিয়াছে— দুই মধ্যস্থের মধ্যে ঠেলাঠেলি— কর্তৃত্বের আসন কে পায়— মাঝে হইতে সংগীতের মধ্যে আত্মবিরোধ ঘটে।

তাল জিনিসটা সংগীতের হিসাব-বিভাগ। এর দরকার খুবই বেশি সে কথা বলাই বাহুল্য। কিন্তু দরকারের চেয়েও কড়াক্কড়িটা যখন বড়ো হয় তখন দরকারটাই মাটি হইতে থাকে। তবু আমাদের দেশে এই বাধাটাকে অত্যন্ত বড়ো করিতে হইয়াছে, কেননা মাঝারির হাতে কর্তৃত্ব। গান সম্বন্ধে ওস্তাদ অত্যন্ত বেশি ছাড়া পাইয়াছে, এইজন্য সঙ্গে সঙ্গে আর-এক ওস্তাদ যদি তাকে ঠেকাইয়া না চলে তবে তো সে নাস্তনাবুদ করিতে পারে। কর্তা যেখানে নিজের কাজের ভার নিজেই লন সেখানে হিসাব খুব বেশি কড়া হয় না। কিন্তু নায়েব যেখানে তাঁর হইয়া কাজ করে সেখানে কানাকড়িটার চুলচেরা হিসাব দাখিল করিতে হয়। সেখানে কনট্রোলার আপিস কেবলই খিটিখিটি করে এবং কাজ চালাইবার আপিস বেজার হইয়া ওঠে।

য়ুরোপীয় গানে স্বয়ং রচয়িতার ইচ্ছামতো মাঝে মাঝে তালে ঢিল পড়ে এবং প্রত্যেকবারেই সমের কাছে গানকে আপন তালের হিসাব-নিকাশ করিয়া হাঁফ ছাড়িতে হয় না। কেননা, সমস্ত সংগীতের প্রয়োজন বুঝিয়া রচয়িতা নিজে তার সীমানা বাঁধিয়া দেন, কোনো মধ্যস্থ আসিয়া রাতারাতি সেটাকে বদল করিতে পারে না। ইহাতেই সুরে তালে রেষারেষি বন্ধ হইয়া যায়। য়ুরোপীয় সংগীতে তালের বোলটা মৃদঙ্গের মধ্যে নাই, তা হার্মনি-বিভাগে গানের অন্তরঙ্গরূপেই একাসনে বিরাজ করে। লাঠিয়ালের হাতে রাজদণ্ড দিলেও সে তাহা লইয়া লাঠিয়ালি করিতে চায়, কেননা রাজত্ব করা তার প্রকৃতিগত নয়। তাই ওস্তাদের হাতে সংগীত সুরতালের কৌশল হইয়া উঠে। এই কৌশলই কলার শত্রু। কেননা কলার বিকাশ সামঞ্জস্যে, কৌশলের বিকাশ দ্বন্দ্বে।

অনেক দিন হইতেই কবিতা লিখিতেছি, এইজন্য, যতই বিনয় করি-না-কেন, এটুকু না বলিয়া পারি না যে— ছন্দের তত্ত্ব কিছু-কিছু বুঝি। সেই ছন্দের বোধ লইয়া যখন গান লিখিতে বসিলাম, তখন চাঁদ সদাগরের উপর মনসার যেরকম আক্রোশ, আমার রচনার উপর তালের দেবতা তেমনি ফোঁস করিয়া উঠিলেন। আমার জানা ছিল ছন্দের মধ্যে যে নিয়ম আছে তাহা বিধাতার গড়া নিয়ম, তা কামারের গড়া নিগড় নয়। সুতরাং তার সংযমে সংকীর্ণ করে না, তাহাতে বৈচিত্র্যকে উদ্‌ঘাটিত করিতে থাকে। সেই কথা মনে রাখিয়া বাংলা কাব্যে ছন্দকে বিচিত্র করিতে সংকোচ বোধ করি নাই।

কাব্যে ছন্দের যে কাজ, গানে তালের সেই কাজ। অতএব ছন্দ যে নিয়মে কবিতায় চলে তাল সেই নিয়মে গানে চলিবে এই ভরসা করিয়া গান বাঁধিতে চাহিলাম। তাহাতে কী উৎপাত ঘটিল একটা দৃষ্টান্ত দিই। মনে করা যাক আমার গানের কথাটি এই—

কাঁপিছে দেহলতা থরথর,
চোখের জলে আঁখি ভরভর।
দোদুল তমালেরই বনছায়া
তোমার নীলবাসে নিল কায়া—

বাদল-নিশীথেরই ঝরঝর
তোমার আঁখি-'পরে ভরভর।
যে কথা ছিল তব মনে মনে
চমকে অধরের কোণে কোণে।
নীরব হিয়া তব দিল ভরি
কী মায়া-স্বপনে যে, মরি মরি,
নিবিড় কাননের মরমর
বাদল-নিশীথের ঝরঝর।

এ ছন্দে আমার পাঠকেরা কিছু আপত্তি করিলেন না। তাই সাহস করিয়া ঐটেই ঐ ছন্দেই সুরে গাহিলাম। তখন দেখি যাঁরা কাব্যের বৈঠকে দিব্য খুশি ছিলেন তাঁরাই গানের বৈঠকে রক্তচক্ষু। তাঁরা বলেন— এ ছন্দের এক অংশে সাত আর-এক অংশে চার, ইহাতে কিছুতেই তাল মেলে না। আমার জবাব এই— তাল যদি না মেলে সেটা তালেরই দোষ, ছন্দটাতে দোষ হয় নাই। কেন, তাহা বলি। এই ছন্দ তিন এবং চার মাত্রার যোগে তৈরি। এইজন্যই 'তোমার নীলবাসে' এই সাত মাত্রার পর 'নিল কায়া' এই চার মাত্রা খাপ খাইল। তিন মাত্রা হইলেও ক্ষতি হইত না, যেমন— 'তোমার নীলবাসে মিলিল'। কিন্তু ইহার মধ্যে ছয় মাত্রা কিছুতেই সহিবে না। যেমন 'তোমারি নীলবাসে ধরিল শরীর'। অথচ প্রথম অংশে যদি ছয়ের ভাগ থাকিত তবে দিব্য চলিত, যেমন— 'তোমার সুনীল বাসে ধরিল শরীর'। এ আমি বলিতেছি কানের স্বাভাবিক রুচির কথা। এই কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিবার পথ। অতএব, এই কানের কাছে যদি ছাড় মেলে তবে ওস্তাদকে কেন ডরাইব?

আমার দৃষ্টান্তগত ছন্দটিতে প্রত্যেক লাইনেই সবসুদ্ধ ১১ মাত্রা আছে। কিন্তু এমন ছন্দ হইতে পারে যার প্রত্যেক লাইনে সমান মাত্রা-বিভাগ নাই। যেমন—

বাজিবে, সখি, বাঁশি বাজিবে।
হৃদয়রাজ হৃদে রাজিবে।
বচন রাশি রাশি   কোথা যে যাবে ভাসি,
অধরে লাজহাসি সাজিবে।
নয়নে আঁখিজল   করিবে ছলছল,
সুখবেদনা মনে বাজিবে।
মরমে মুরছিয়া   মিলাতে চাবে হিয়া
সেই চরণযুগরাজীবে।

ইহার প্রথম দুই লাইনে মাত্রাভাগ— ৩ + ৪ + ৩ = ১০। তৃতীয় লাইনে— ৩ + ৪ + ৩ + ৪ = ১৪। আমার মতে এই বৈচিত্র্যে ছন্দের মিষ্টতা বাড়ে। অতএব উৎসাহ করিয়া গান ধরিলাম। কিন্তু এক ফের ফিরিতেই তালওয়ালা পথ আটক করিয়া বসিল। সে বলিল, 'আমার সমের মাশুল চুকাইয়া দাও।' আমি তো বলি এটা বে-আইনি আবোয়াব। কান-মহারাজার উচ্চ আদালতে দরবার করিয়া খালাস পাই। কিন্তু সেই দরবারের বাহিরে খাড়া আছে মাঝারি শাসনতন্ত্রের দারোগা। সে খপ করিয়া হাত চাপিয়া ধরে, নিজের বিশেষ বিধি খাটায়, রাজার দোহাই মানে না।

কবিতায় যেটা ছন্দ, সংগীতে সেইটেই লয়। এই লয় জিনিসটি সৃষ্টি ব্যাপিয়া আছে, আকাশের তারা হইতে পতঙ্গের পাখা পর্যন্ত সমস্তই ইহাকে মানে বলিয়াই বিশ্বসংসার এমন করিয়া চলিতেছে অথচ ভাঙিয়া পড়িতেছে না। অতএব কাব্যেই কী, গানেই কী, এই লয়কে যদি মানি তবে তালের সঙ্গে বিবাদ ঘটিলেও ভয় করিবার প্রয়োজন নাই।

একটি দৃষ্টান্ত দিই—

ব্যাকুল বকুলের ফুলে
ভ্রমর মরে পথ ভুলে।
আকাশে কী গোপন বাণী
বাতাসে করে কানাকানি,
বনের অঞ্চলখানি
পুলকে উঠে দুলে দুলে।
বেদনা সুমধুর হয়ে
ভুবনে গেল আজি বয়ে।
বাঁশিতে মায়াতান পুরি
কে আজি মন করে চুরি,
নিখিল তাই মরে ঘুরি
বিরহসাগরের কূলে।

এটা যে কী তাল তা আমি আনাড়ি জানি না। এবং কোনো ওস্তাদও জানেন না। গনিয়া দেখিলে দেখি প্রত্যেক লাইনে নয় মাত্রা। যদি এমন বলা যায় যে, নাহয় নয় মাত্রায় একটা নতুন তালের সৃষ্টি করা যাক, তবে আর-একটা নয় মাত্রার গান পরীক্ষা করিয়া দেখা যাক—

যে কাঁদনে হিয়া কাঁদিছে
সে কাঁদনে সেও কাঁদিল।
যে বাঁধনে মোরে বাঁধিছে
সে বাঁধনে তারে বাঁধিল।
পথে পথে তারে খুঁজিনু,
মনে মনে তারে পূজিনু,
সে পূজার মাঝে লুকায়ে
আমারেও সে যে সাধিল।
এসেছিল মন হরিতে
মহাপারাবার পারায়ে।
ফিরিল না আর তরীতে,
আপনারে গেল হারায়ে।
তারি আপনার মাধুরী
আপনারে করে চাতুরী—
ধরিবে কি ধরা দিবে সে
কী ভাবিয়া ফাঁদ ফাঁদিল।

এও নয় মাত্রা, কিন্তু এর ছন্দ আলাদা। প্রথমটার লয় ছিল তিনে ছয়ে, দ্বিতীয়টার লয় ছয়ে তিনে। আরো একটা নয়ের তাল দেখা যাক—

আঁধার রজনী পোহালো,
জগৎ পূরিল পুলকে—
বিমল প্রভাতকিরণে
মিলিল দ্যুলোকে ভূলোকে।

নয় মাত্রা বটে, কিন্তু এ ছন্দ স্বতন্ত্র। ইহার লয় তিন তিন তিনে। ইহাকে কোন্ নাম দিবে? আরো একটা দেখা যাক—

দুয়ার মম পথপাশে,
সদাই তারে খুলে রাখি।
কখন তার রথ আসে
ব্যাকুল হয়ে জাগে আঁখি।
শ্রাবণে শুনি দূর মেঘে
লাগায় গুরু গরগর,
ফাগুনে শুনি বায়ুবেগে
জাগায় মৃদু মরমর—
আমার বুকে উঠে জেগে
চমক তারি থাকি থাকি।
কখন তার রথ আসে
ব্যাকুল হয়ে জাগে আঁখি।
সবাই দেখি যায় চ'লে
পিছন-পানে নাহি চেয়ে
উতল রোলে কল্লোলে
পথের গান গেয়ে গেয়ে।
শরৎ-মেঘ ভেসে ভেসে
উধাও হয়ে যায় দূরে
যেথায় সব পথ মেশে
গোপন কোন সুরপুরে—
স্বপনে ওড়ে কোন্ দেশে
উদাস মোর প্রাণপাখি।
কখন তার রথ আসে
ব্যাকুল হয়ে জাগে আঁখি।

এও তো আর-এক ছন্দ। ইহার লয় পাঁচে চারে মিলিয়া। আবার এইটেকে উলটাইয়া দিয়া চারে পাঁচে করিলে ন'য়ের ছন্দকে লইয়া নয়-ছয় করা যাইতে পারে। চৌতাল তো বারো মাত্রার ছন্দ। কিন্তু এই বারো মাত্রা রক্ষা করিলেও চৌতালকে রক্ষা করা যায় না এমন হয়। এই তো বারো মাত্রা—

বনের পথে পথে বাজিছে বায়ে
নূপুর রুনুরুনু কাহার পায়ে।
কাটিয়া যায় বেলা মনের ভুলে,
বাতাস উদাসিছে আকুল-চুলে—
ভ্রমরমুখরিত বকুল-ছায়ে
নূপুর রুনুরুনু কাহার পায়ে!

ইহা চৌতালও নহে, একতালও নহে, ধামারও নয়, ঝাঁপতালও নয়। লয়ের হিসাব দিলেও, তালের হিসাব মেলে না। তালওয়ালা সেই গরমিল লইয়া কবিকে দায়িক করে।

কিন্তু হাল-আমলে এ-সমস্ত উৎপাত চলিবে না। আমরা শাসন মানিব, তাই বলিয়া অত্যাচার মানিব না। কেননা, যে নিয়ম সত্য সে নিয়ম বাহিরের জিনিস নয়, তাহা বিশ্বের বলিয়াই তাহা আমার আপনার। যে নিয়ম ওস্তাদের তাহা আমার ভিতরে নাই, বাহিরে আছে, সুতরাং তাকে অভ্যাস করিয়া বা ভয় করিয়া বা দায়ে পড়িয়া মানিতে হয়। এইরূপ মানার দ্বারাই শক্তির বিকাশ বন্ধ হইয়া যায়। আমাদের সংগীতকে এই মানা হইতে মুক্তি দিলে তবেই তার স্বভাব তার স্বরূপকে নব নব উদ্‌ভাবনার ভিতর দিয়া ব্যক্ত করিতে থাকিবে।

এই তো গেল সংগীতের আভ্যন্তরিক উপদ্রব। আবার বাহিরে একদল বলবান লোক আছেন, তাঁরা সংগীতকে দ্বীপান্তরে চালান করিতে পারিলে সুস্থ থাকেন। শ্যামের বাঁশির উপর রাগ করিয়া রাধিকা যেমন বাঁশবনটাকে একেবারে ঝাড়ে-মূলে উপাড়িতে চাহিয়াছিলেন ইঁহাদের সেইরকম ভাব। মাটির উপর পড়িলে গায়ে ধুলা লাগে বলিয়া পৃথিবীটাকে বরখাস্ত করিতে ইঁহারা কখনোই সাহস করেন না, কিন্তু গানকে ইঁহারা বর্জন করিবার প্রস্তাব করেন এই সাহসে যে, তাঁরা মনে করেন গানটা বাহুল্য, ওটা না হইলেও কাজ চলে এবং পেট ভরে। এটা বোঝেন না যে, বাহুল্য লইয়াই মনুষ্যত্ব, বাহুল্যই মানবজীবনের চরম লক্ষ্য। সত্যের পরিণাম সত্যে নহে, আনন্দে। আনন্দ সত্যের সেই অসীম বাহুল্য যাহাতে আত্মা আপনাকেই আপনি প্রকাশ করে— কেবল আপনার উপকরণকে নয়। যদি কোনো সভ্যতার বিচার করিতে হয় তবে এই বাহুল্য দিয়াই তার পরিমাপ। কেজো লোকেরা সঞ্চয় করে। সঞ্চয়ে প্রকাশ নাই, কেননা প্রকাশ ত্যাগে। সেই ত্যাগের সম্পদই বাহুল্য।

সঞ্চয় করাও নহে, ভোগ করাও নহে, কিন্তু আপনাকে প্রকাশ করিবার যে প্রেরণা তাহাতেই আপনার বিকাশ। গান যদি কেবল বৈঠকখানার ভোগবিলাস হয়, তবে তাহাতে নির্জীবতা প্রমাণ করে। প্রকাশের যত রকম ভাষা আছে সমস্তই মানুষের হাতে দিতে হইবে। কেননা, যে পরিমাণে মানুষ বোবা সেই পরিমাণে সে দুর্বল, সে অসম্পূর্ণ। এইজন্য ওস্তাদের গড়খাই-করা গানকে আমাদের সকলের করা চাই। তাহা হইলে জীবনের ক্ষেত্রে গানও বড়ো হইবে, সেই গানের সম্পদে জীবনও বড়ো হইবে।

এতদিন আমাদের ভদ্রসমাজ গানকে ভয় করিয়া আসিতেছিল। তার কারণ, যা সকলের জিনিস, ভোগী তাকে বাঁধ দিয়া আপনার করাতেই তার স্রোত মরিয়াছে, সে দূষিত হইয়াছে। ঘরের বন্ধ বাতাস যদি বিকৃত হয় তবে দরজা জানালা খুলিয়া দিয়া বাহিরের বাতাসের সঙ্গে তার যোগসাধন করা চাই। ইহাতে ভয় করিবার কারণ নাই, কেননা ইহাতে বাড়িটাকে হারানো হয় না। আজকালকার দেশাভিমানীরা ঐ ভুল করেন। তাঁরা মনে করেন দরজা জানালা খুলিয়া দিয়া বাহিরকে পাওয়াটাই আপনার বাড়িকে হারানো। যেন, যে হাওয়া চৌদ্দ-পুরুষের নিশ্বাসে বিষিয়া

উঠিয়াছে তাহাই আমার নিজের হাওয়া, আর ঐ বিশ্বের হাওয়াটাই বিদেশী। এ কথা ভুলিয়া যান ঘরের হাওয়ার সঙ্গে বাহিরের হাওয়ার যোগ যেখানে নাই সেখানে ঘরই নাই, সেখানে কারাগার।

দেশের সকল শক্তিই আজ জরাসন্ধের কারাগারে বাঁধা পড়িয়াছে। তারা আছে মাত্র, তারা চলে না— দস্তুরের বেড়িতে তারা বাঁধা। সেই জরার দুর্গ ভাঙিয়া আমাদের সমস্ত বন্দী শক্তিকে বিশ্বে ছাড়া দিতে হইবে— তা, সে কী গানে, কী সাহিত্যে, কী চিন্তায়, কী কর্মে, কী রাষ্ট্রে কী সমাজে। এই ছাড়া দেওয়াকে যারা ক্ষতি হওয়া মনে করে তারাই কৃপণ, তারাই আপনার সম্পদ হইতে আপনি বঞ্চিত, তারাই অন্নপূর্ণার অন্নভাণ্ডারে বসিয়া উপবাসী। যারা শিকল দিয়া বাঁধিয়া রাখে তারাই হারায়, যারা মুক্তির ক্ষেত্রে ছাড়িয়া রাখে তারাই রাখে।

ভাদ্র ১৩২৪

আমাদের সংগীত

সংগীতসংঘ থেকে যখন আমাকে অভ্যর্থনা করবার প্রস্তাব এসেছিল, তখন আমি অসংকোচে সম্মত হয়েছিলেম ; কেননা সংগীতসংঘের প্রতিষ্ঠাত্রী, নেত্রী এবং ছাত্রী সকলেই আমার কন্যাস্থানীয়া— তাঁদের কাছ থেকে প্রণাম গ্রহণ করবার অধিকার আমার আছে। আমাকে কিছু বলতে অনুরোধ করা হয়েছিল, তাতেও আমি কুণ্ঠিত হই নি। তার পরে সহসা যখন সংবাদপত্রে দেখলেম এ সভায় সর্বসাধারণের নিমন্ত্রণ আছে এবং আমার বক্তৃতার বিষয়টি হবে ভারতীয় সংগীত— তখন আমি মনে বুঝলেম এ আমার পক্ষে একটা সংকট। বাল্যকাল থেকে আমি সকল বিদ্যালয়েরই পলাতক ছাত্র, সংগীতবিদ্যালয়েও আমার হাজিরা-বই দেখলে দেখা যাবে আমি অধিকাংশ কালই গরহাজির ছিলেম। এই ব্যাপারে আমার ব্যাকুলতা দেখে উদ্যোগকর্তারা কেউ কেউ আমাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেছিলেন, 'তোমাকে বেশি বলতে হবে না, দু-চার কথায় বক্তৃতা সেরে দিয়ো।' আমি তাঁদের এই পরামর্শে আশ্বস্ত হই নি। কেননা, যে লোক খুব বেশি জানে সেই মানুষই খুব অল্প কথায় কর্তব্য সমাধা করতে পারে, যে কম জানে তাকেই ইনিয়ে-বিনিয়ে অনেক কথা বলতে হয়। যাই হোক, এখন আমার আর ফেরবার পথ নেই, অতএব 'যাবৎ কিঞ্চিৎ ন ভাষতে' এই সদুপদেশ পালন করবার সময় চলে গেছে।

বাল্যকালে স্বভাবদোষে আমি যথারীতি গান শিখি নি বটে, কিন্তু ভাগ্যক্রমে গানের রসে আমার মন রসিয়ে উঠেছিল। তখন আমাদের বাড়িতে গানের চর্চার বিরাম ছিল না। বিষ্ণু চক্রবর্তী ছিলেন সংগীতের আচার্য, হিন্দুস্থানী সংগীতকলায় তিনি ওস্তাদ ছিলেন। অতএব ছেলেবেলায় যে-সব গান সর্বদা আমার শোনা অভ্যাস ছিল, সে শখের দলের গান নয় ; তাই আমার মনে কালোয়াতি গানের একটা ঠাট আপনা-আপনি জমে উঠেছিল। রাগরাগিণীর বিশুদ্ধতা সম্বন্ধে অত্যন্ত যাঁরা শুচিবায়ুগ্রস্ত, তাঁদের সঙ্গে আমার তুলনাই হয় না, অর্থাৎ সুরের সূক্ষ্ম খুঁটিনাটি সম্বন্ধে কিছু-কিছু ধারণা থাকা সত্ত্বেও আমার মন তার অভ্যাসে বাঁধা পড়ে নি— কিন্তু কালোয়াতি সংগীতের রূপ এবং রস সম্বন্ধে একটা সাধারণ সংস্কার ভিতরে-ভিতরে আমার মনের মধ্যে পাকা হয়ে উঠেছিল।

যাই হোক, গীতরসের যে সঞ্চয় বাল্যকালে আমার চিত্তকে পূর্ণ করেছিল, স্বভাবতই তার গতি হল কোন্ মুখে, তার প্রকাশ হল কোন্ রূপে, সেই কথাটি যখন চিন্তা করে দেখি তখন তার

থেকে বুঝতে পারি সংগীত সম্বন্ধে আমাদের দেশের প্রকৃতি কী। আজ সভায় আমি সেই কথাটির আলোচনা করব।

আমার মনে যে সুর জমে ছিল, সে সুর যখন প্রকাশিত হতে চাইলে তখন কথার সঙ্গে গলাগলি করে সে দেখা দিল। ছেলেবেলা থেকে গানের প্রতি আমার নিবিড় ভালোবাসা যখন আমাকে ব্যক্ত করতে গেল, তখন অবিমিশ্র সংগীতের রূপ সে রচনা করলে না। সংগীতকে কাব্যের সঙ্গে মিলিয়ে দিলে, কোন্‌টা বড়ো কোন্‌টা ছোটো বোঝা গেল না।

আকাশে মেঘের মধ্যে বাষ্পাকারে যে জলের সঞ্চয় হয়, বিশুদ্ধ জলধারা-বর্ষণেই তার প্রকাশ। গাছের ভিতর যে রস গোপনে সঞ্চিত হতে থাকে, তার প্রকাশ পাতার সঙ্গে ফুলের সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে। সংগীতেরও এই রকম দুই ভাবের প্রকাশ। এক হচ্ছে বিশুদ্ধ সংগীত আকারে, আর হচ্ছে কাব্যের সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে। মানুষের মধ্যে প্রকৃতিভেদ আছে, সেই ভেদ অনুসারে সংগীতের এই দুই রকমের অভিব্যক্তি হয়। তার প্রমাণ দেখা যায় হিন্দুস্থানে আর বাংলা দেশে। কোনো সন্দেহ নেই যে, বাংলা দেশে সংগীত কবিতার অনুচর না হোক, সহচর বটে। কিন্তু পশ্চিম হিন্দুস্থানে সে স্বরাজে প্রতিষ্ঠিত ; বাণী তার 'ছায়েবানুগতা'। ভজন-সংগীতের কথা যদি ছেড়ে দিই, তবে দেখতে পাই পশ্চিমে সংগীত যে বাক্য আশ্রয় করে তা অতি তুচ্ছ। সংগীত সেখানে স্বতন্ত্র, সে আপনাকেই প্রকাশ করে।

বাংলা দেশে হৃদয়ভাবের স্বাভাবিক প্রকাশ সাহিত্যে। 'গৌড়জন যাহে আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি'— সে দেখতে পাচ্ছি সাহিত্যের মধুচক্র থেকে। বাণীর প্রতিই বাঙালির অন্তরের টান ; এইজন্যেই ভারতের মধ্যে এই প্রদেশেই বাণীর সাধনা সব চেয়ে বেশি হয়েছে। কিন্তু একা বাণীর মধ্যে তো মানুষের প্রকাশের পূর্ণতা হয় না— এইজন্যে বাংলা দেশে সংগীতের স্বতন্ত্র পঙ্‌ক্তি নয়, বাণীর পাশেই তার আসন।

এর প্রমাণ দেখো আমাদের কীর্তনে। এই কীর্তনের সংগীত অপরূপ কিন্তু সংগীত যুগল ভাবে গড়া— পদের সঙ্গে মিলন হয়ে তবেই এর সার্থকতা। পদাবলীর সঙ্গেই যেন তার রাসলীলা ; স্বাতন্ত্র্য সে সইতেই পারবে না।

সংগীতের স্বাতন্ত্র্য যন্ত্রে সব চেয়ে প্রকাশ পায়। বাংলার আপন কোনো যন্ত্র নেই, এবং প্রাচীনকালেই হোক আর আধুনিক কালেই হোক, যন্ত্রে যাঁরা ওস্তাদ তাঁরা বাংলার নন। বীণ রবাব শরদ্‌ সেতার এস্‌রাজ সারেঙ্গী প্রভৃতির তুলনায় আমাদের রাখালের বাঁশি বা বৈরাগীর একতারা কিছুই নয়। তা ছাড়া, গড়ের বাদ্যের বীভৎস বাঙ্গরূপে বাংলা দেশে কন্সর্ট্‌ নামক যে যন্ত্রসংগীতের উৎপত্তি হয়েছে তাকে সহ্য করা আমাদের লজ্জা এবং তাতে 'আনন্দ' পাওয়ায় আমাদের অপরাধ।

এই-সমস্ত লক্ষণ দেখে আমার বিশ্বাস হয় বাংলা দেশে কাব্যের সহযোগে সংগীতের যে বিকাশ হচ্ছে, সে একটি অপরূপ জিনিস হয়ে উঠবে। তাতে রাগরাগিণীর প্রথাগত বিশুদ্ধতা থাকবে না, যেমন কীর্তনে তা নেই ; অর্থাৎ গানের জাত রক্ষা হবে না, নিয়মের স্খলন হতে থাকবে, কেননা তাকে বাণীর দাবি মেনে চলতে হবে। কিন্তু এমনতরো পরিণয়ে পরস্পরের মন জোগাবার জন্যে উভয় পক্ষেরই নিজের জিদ কিছু-কিছু না ছাড়লে মিলন সুন্দর হয় না। এইজন্যে গানে বাণীকেও সুরের খাতিরে কিছু আপস করতে হয়, তাকে সুরের উপযোগী হতে হয়। যাই হোক, বাংলা দেশে এই এক জাতের কাব্যকলা ক্রমশ ব্যাপক হয়ে উঠবে বলে আমি মনে করি। অন্তত আমার নিজের কবিত্বের ইতিহাসে দেখতে পাই— গান-রচনা, অর্থাৎ সংগীতের সঙ্গে বাণীর মিলন-সাধনই এখন আমার প্রধান সাধনা হয়ে উঠেছে।

সংগীত যেখানে আপন স্বাতন্ত্র্যে বিরাজ করে সেখানে তার নিয়ম সংযমের যে শুচিতা প্রকাশ পায়, বাণীর সহযোগে গানরূপে তার সেই শুচিতা তেমন করে বাঁচিয়ে চলা যায় না বটে ; কিন্তু পরম্পরাগত সংগীতরীতিকে আয়ত্ত করলে তবেই নিয়মের ব্যত্যয়সাধনে যথার্থ অধিকার জন্মে। কবিতাতেও ছন্দের রীতি আছে— সে রীতি কোনো বড়ো কবি নিখুঁতভাবে সাবধানে বাঁচিয়ে চলবার চেষ্টা করেন না— অর্থাৎ তাঁরা নিয়মের উপরেও কর্তৃত্ব করেন— কিন্তু সেই কর্তৃত্ব করতে গেলেও নিয়মকে স্বীকার করা চাই। স্বাতন্ত্র্য যেখানে উচ্ছৃঙ্খলতা সেখানে কলাবিদ্যার স্থান নেই। এইজন্যে নিজের সৃজনশক্তিকে ছাড়া দিতে গেলেই শিক্ষা ও সংযমশক্তির বেশি দরকার হয়।

সংগীতসংঘ আমাদের দেশের সংগীতকে দেশের মেয়েদের কণ্ঠে প্রতিষ্ঠিত করবার ভার নিয়েছেন। তাঁদের এই সাধনার গভীর সার্থকতা আছে। আমাদের দুই রকমের খাদ্য আছে— একটি প্রয়োজনের, আর-একটি অপ্রয়োজনের ; একটি অন্ন, আর-একটি অমৃত। অন্নের ক্ষুধায় আমরা মর্ত্যলোকের সকল জীবজন্তুর সমান, অমৃতের ক্ষুধায় আমরা সুরলোকের দেবতাদের দলে। সংগীত হচ্ছে অমৃতের নানা ধারার মধ্যে একটি। দেশকে অন্নের পরিবেশন তো মেয়েদের হাতেই হয়— আর অমৃতের পরিবেশনও কি তাঁদের হাতেই নয়?

এ কথা মনে রাখতে হবে, যা অমৃত, যা প্রয়োজনকে অতিক্রম ক'রে আপনাকে প্রকাশ করে, মনুষ্যত্বের চরম মহিমা তাতেই। যে জাতি পেটুক সে কেবলমাত্র নিজের প্রতিদিনের গরজ মিটিয়ে চলেছে, মৃত্যুতেই তার একান্ত মৃত্যু। গ্রীস যে আজও অমর হয়ে আছে সে তার ধনে, ধান্যে, রাষ্ট্রীয় প্রতাপে নয় ; আত্মার আনন্দরূপ যা-কিছু সে সৃষ্টি করেছে তাতেই সে চিরদিন বেঁচে আছে। প্রত্যেক জাতির উপরে ভার আছে সে মর্ত্যলোকে আপন অমরলোকের সৃষ্টি করবে। গ্রীস সেই নিজের অমরাবতীতে আজও বাস করছে। সংগীত মানবের সেই আনন্দরূপ— সে মানবের নিজের অভাবমোচনের অতীত ব'লেই সর্বমানবের এবং সর্বকালের— রাজ্য সাম্রাজ্যের ঐশ্বর্য ধ্বংস হয়ে যায়, কিন্তু এই আনন্দরূপ চিরন্তন।

যে-সকল ঘোরতর প্রবীণ লোক ওজন-দরে জিনিসের মূল্য বিচার করেন, সারবান বলতে যাঁরা ভারবান বোঝেন, তাঁরা সংগীত প্রভৃতি কলাবিদ্যাকে শৌখিনতা বলে অবজ্ঞা করে থাকেন। তাঁরা জানেন না যাদের বীর্য আছে সৌন্দর্য তাদেরই। যে শক্তি আপনাকে শক্তিরূপেই প্রকাশ করে সে হল পালোয়ানি, কিন্তু শক্তির সত্যরূপ হচ্ছে সৌন্দর্য। গাছের পূর্ণ শক্তি তার ফুলে ; তার মোটা গুঁড়িটার মধ্যে সে কেবল আপনিই থাকে, কিন্তু তার ফুলের মধ্যে সে যে ফল ফলায় তারই বীজের ভিতর ভাবীকালের অরণ্য, অর্থাৎ তার অমরতা। সাহিত্যে, সংগীতে, সর্বপ্রকার কলাবিদ্যায় প্রাণশক্তি আপন অমরতাকে ফলিয়ে তোলে— আপিস-আদালতে কলে-কারখানায় নয়। উপনিষদ বলেছেন— জন্মেছে বলেই সকলে অমর হয় না, যারা অসীমকে উপলব্ধি করেছে 'অমৃতাস্তে ভবন্তি'। অভাবের উপলব্ধিতে কাপড়ের কল, পাটের বস্তার কারখানা— অসীমের উপলব্ধিতেই সংগীত, অসীমের উপলব্ধিতেই আমরা সৃষ্টিকর্তা। যে সৃষ্টিকর্তা চন্দ্রসূর্যের সিংহাসনে বসে দরবার করছেন তিনি যে গুণী জাতিকে শিরোপা দিয়ে বলেন, 'সাবাস! আমার সুরের সঙ্গে তোমার সুর মিলছে'— সেই ধন্য, সেই বেঁচে যায়, তাঁর অমৃতসভার পাশে তার চিরকালের আসন পাকা হয়ে থাকে।[১]

ভাদ্র ১৩২৮

---

[১] প্রতীচ্যদেশের মনীষীসমাজে বিপুল সমাদর-লাভান্তে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন (জুলাই ১৯২১) উপলক্ষে 'সংগীত-সংঘের বার্ষিক উৎসবে উক্ত'।

বাউল-গান

মুহম্মদ মন্‌সুর উদ্দিনের হারামণি গ্রন্থের ভূমিকা

মুহম্মদ মন্‌সুর উদ্দিন বাউল-সংগীত সংগ্রহে প্রবৃত্ত হয়েছেন। এ সম্বন্ধে পূর্বেই তাঁর সঙ্গে আমার মাঝে মাঝে আলাপ হয়েছিল, আমিও তাঁকে অন্তরের সঙ্গে উৎসাহ দিয়েছি। আমার লেখা যাঁরা পড়েছেন তাঁরা জানেন বাউল পদাবলীর প্রতি আমার অনুরাগ আমি অনেক লেখায় প্রকাশ করেছি। শিলাইদহে যখন ছিলাম, বাউল দলের সঙ্গে আমার সর্বদাই দেখাসাক্ষাৎ ও আলাপ-আলোচনা হত। আমার অনেক গানেই আমি বাউলের সুর গ্রহণ করেছি এবং অনেক গানে অন্য রাগরাগিণীর সঙ্গে আমার জ্ঞাত বা অজ্ঞাত-সারে বাউল সুরের মিলন ঘটেছে। এর থেকে বোঝা যাবে বাউলের সুর ও বাণী কোন্‌-এক সময়ে আমার মনের মধ্যে সহজ হয়ে মিশে গেছে। আমার মনে আছে, তখন আমার নবীন বয়স, শিলাইদহ অঞ্চলেরই এক বাউল কলকাতায় একতারা বাজিয়ে গেয়েছিল—

কোথায় পাব তারে
আমার মনের মানুষ যে রে!
হারায়ে সেই মানুষে তার উদ্দেশে
দেশ-বিদেশে বেড়াই ঘুরে।

কথা নিতান্ত সহজ, কিন্তু সুরের যোগে এর অর্থ অপূর্ব জ্যোতিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল। এই কথাটিই উপনিষদের ভাষায় শোনা গিয়েছে : তং বেদ্যং পুরুষং বেদ মা বো মৃত্যুঃ পরিব্যথাঃ। যাঁকে জানবার সেই পুরুষকেই জানো, নইলে যে মরণবেদনা। অপণ্ডিতের মুখে এই কথাটিই শুনলুম তার গেঁয়ো সুরে সহজ ভাষায়— যাঁকে সকলের চেয়ে জানবার তাঁকেই সকলের চেয়ে না জানবার বেদনা— অন্ধকারে মাকে দেখতে পাচ্ছে না যে শিশু তারই কান্নার সুর— তার কণ্ঠে বেজে উঠেছে। 'অন্তরতর যদয়মাত্মা' উপনিষদের এই বাণী এদের মুখে যখন 'মনের মানুষ' বলে শুনলুম, আমার মনে বড়ো বিস্ময় লেগেছিল। এর অনেক কাল পরে ক্ষিতিমোহন সেন মহাশয়ের অমূল্য সঞ্চয়ের থেকে এমন বাউলের গান শুনেছি, ভাষার সরলতায়, ভাবের গভীরতায়, সুরের দরদে যার তুলনা মেলে না— তাতে যেমন জ্ঞানের তত্ত্ব তেমনি কাব্যরচনা, তেমনি ভক্তির রস মিশেছে। লোকসাহিত্যে এমন অপূর্বতা আর কোথাও পাওয়া যায় বলে বিশ্বাস করি নে।

সকল সাহিত্যে যেমন লোকসাহিত্যেও তেমনি, তার ভালোমন্দের ভেদ আছে। কবির প্রতিভা থেকে যে রসধারা বয় মন্দাকিনীর মতো, অলক্ষ্যলোক থেকে সে নেমে আসে ; তার পর একদল লোক আসে যারা খাল কেটে সেই জল চাষের ক্ষেতে আনতে লেগে যায়। তারা মজুরি করে ; তাদের হাতে এই ধারার গভীরতা, এর বিশুদ্ধতা চলে যায়— কৃত্রিমতায় নানা প্রকারে বিকৃত হতে থাকে। অধিকাংশ আধুনিক বাউলের গানের অমূল্যতা চলে গেছে, তা চলতি হাটের সস্তা দামের জিনিস হয়ে পথে পথে বিকোচ্ছে। তা অনেক স্থলে বাঁধি বোলের পুনরাবৃত্তি এবং হাস্যকর উপমা তুলনার দ্বারা আকীর্ণ— তার অনেকগুলোই মৃত্যুভয়ের শাসনে মানুষকে বৈরাগীদলে টানবার প্রচারকগিরি। এর উপায় নেই, খাঁটি জিনিসের পরিমাণ বেশি হওয়া অসম্ভব— খাঁটির জন্যে অপেক্ষা করতে ও তাকে গভীর করে চিনতে যে ধৈর্যের প্রয়োজন তা সংসারে বিরল। এইজন্যে কৃত্রিম নকলের প্রচুরতা চলতে তাকে। এইজন্যে সাধারণত যে-সব বাউলের গান যেখানে-সেখানে পাওয়া যায়, কী সাধনার কী সাহিত্যের দিক থেকে তার দাম বেশি নয়।

তবু তার ঐতিহাসিক মূল্য আছে। অর্থাৎ, এর থেকে স্বদেশের চিত্তের একটা ঐতিহাসিক পরিচয় পাওয়া যায়। অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালের ভারতবর্ষীয় চিত্তের যে-একটি বড়ো আন্দোলন জেগেছিল, সেটি মুসলমান-অভ্যাগমের আঘাতে। অস্ত্র হাতে বিদেশী এল, তাদের সঙ্গে দেশের লোকের মেলা হল কঠিন। প্রথম অসামঞ্জস্যটা বৈষয়িক, অর্থাৎ বিষয়ের অধিকার নিয়ে, স্বদেশের সম্পদের ভোগ নিয়ে। বিদেশী রাজা হলেই এই বৈষয়িক বিরুদ্ধতা অনিবার্য হয়ে ওঠে। কিন্তু মুসলমান শাসনে সেই বিরুদ্ধতার তীব্রতা ক্রমশই কমে আসছিল, কেননা তারা এই দেশকেই আপন দেশ করে নিয়েছিল— সুতরাং দেশকে ভোগ করা সম্বন্ধে আমরা পরস্পরের অংশীদার হয়ে উঠলুম। তা ছাড়া, সংখ্যা গণনা করলে দেখা যাবে এ দেশের অধিকাংশ মুসলমানই বংশগত জাতিতে হিন্দু, ধর্মগত জাতিতে মুসলমান। সুতরাং দেশকে ভোগ করবার অধিকার উভয়েরই সমান। কিন্তু তীব্রতর বিরুদ্ধতা রয়ে গেল ধর্ম নিয়ে। মুসলমান শাসনের আরম্ভকাল থেকেই ভারতের উভয় সম্প্রদায়ের মহাত্মা যাঁরা জন্মেছেন তাঁরাই আপন জীবনে ও বাক্যপ্রচারে এই বিরুদ্ধতার সমন্বয়-সাধনে প্রবৃত্ত হয়েছেন। সমস্যা যতই কঠিন ততই পরমাশ্চর্য তাঁদের প্রকাশ। বিধাতা এমনি করেই দুরূহ পরীক্ষার ভিতর দিয়েই মানুষের ভিতরকার শ্রেষ্ঠকে উদ্‌ঘাটিত করে আনেন। ভারতবর্ষে ধারাবাহিক ভাবেই সেই শ্রেষ্ঠের দেখা পেয়েছি, আশা করি আজও তার অবসান হয় নি। যে-সব উদার চিত্তে হিন্দু-মুসলমানের বিরুদ্ধ ধারা মিলিত হতে পেরেছে, সেই-সব চিত্তে সেই ধর্মসংগমে ভারতবর্ষের যথার্থ মানসতীর্থ স্থাপিত হয়েছে। সেই-সব তীর্থ দেশের সীমায় বদ্ধ নয়, তা অন্তহীন কালে প্রতিষ্ঠিত। রামানন্দ, কবীর, দাদূ, রবীদাস, নানক প্রভৃতির চরিতে এই-সব তীর্থ চিরপ্রতিষ্ঠিত হয়ে রইল। এঁদের মধ্যে সকল বিরোধ সকল বৈচিত্র্য একের জয়বার্তা মিলিত কণ্ঠে ঘোষণা করেছে।

আমাদের দেশে যাঁরা নিজেদের শিক্ষিত বলেন তাঁরা প্রয়োজনের তাড়নায় হিন্দু-মুসলমানের মিলনের নানা কৌশল খুঁজে বেড়াচ্ছেন। অন্য দেশের ঐতিহাসিক স্কুলে তাঁদের শিক্ষা। কিন্তু, আমাদের দেশের ইতিহাস আজ পর্যন্ত, প্রয়োজনের মধ্যে নয়, পরন্তু মানুষের অন্তরতর গভীর সত্যের মধ্যে মিলনের সাধনাকে বহন করে এসেছে। বাউল-সাহিত্যে বাউল সম্প্রদায়ের সেই সাধনা দেখি— এ জিনিস হিন্দু-মুসলমান উভয়েরই ; একত্র হয়েছে অথচ কেউ কাউকে আঘাত করে নি। এই মিলনে সভাসমিতির প্রতিষ্ঠা হয় নি ; এই মিলনে গান জেগেছে, সেই গানের ভাষা ও সুর অশিক্ষিত মাধুর্যে সরস। এই গানের ভাষায় ও সুরে হিন্দু-মুসলমানের কণ্ঠ মিলেছে, কোরান পুরাণে ঝগড়া বাধে নি। এই মিলনেই ভারতের সভ্যতার সত্য পরিচয়, বিবাদে বিরোধে বর্বরতা। বাংলা দেশের গ্রামের গভীর চিত্তে উচ্চ সভ্যতার প্রেরণা ইস্কুল-কলেজের অগোচরে আপনা-আপনি কিরকম কাজ করে এসেছে, হিন্দু-মুসলমানের জন্য এক আসন রচনার চেষ্টা করেছে, এই বাউল গানে তারই পরিচয় পাওয়া যায়। এইজন্য মুহম্মদ মন্‌সুর উদ্দিন মহাশয় বাউল-সংগীত সংগ্রহ করে প্রকাশ করবার যে উদ্যোগ করেছেন আমি তার অভিনন্দন করি— সাহিত্যের উৎকর্ষ বিচার ক'রে না, কিন্তু স্বদেশের উপেক্ষিত জনসাধারণের মধ্যে মানবচিত্তের যে তপস্যা সুদীর্ঘকাল ধরে আপন সত্য রক্ষা করে এসেছে তারই পরিচয় লাভ করব এই আশা ক'রে। পৌষসংক্রান্তি ১৩৩৪

চৈত্র ১৩৩৪

বিশ্ববিদ্যালয়ে সংগীতশিক্ষা

বিশ্ববিদ্যালয়ে সংগীতশিক্ষার ব্যবস্থা সম্বন্ধে যে প্রস্তাব উত্থাপিত হয়েছে তা নিয়ে বাদ-প্রতিবাদ চলছে। ইচ্ছা ছিল না এর মধ্যে প্রবেশ করি। প্রথম কারণ, আমার শরীর অপটু ; দ্বিতীয় কারণ, শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের শিক্ষা প্রভৃতি সমস্ত ভার সম্প্রতি আমি নিজের হাতে নিয়েছি। শরীর যখন দুর্বল তখন একান্ত আমার আশু কর্তব্যের বাইরে অন্য কর্তব্যের মধ্যে নিজেকে জড়িত করা শক্তির অমিতব্যয়িতা, তাতে ব্যর্থতার সৃষ্টি করে। কিন্তু অকাজকে অগ্রসর হয়ে গ্রহণ না করলেও বাইরে থেকে সে ঘাড়ে এসে পড়ে, তখন তাকে অস্বীকার করতে গেলে জটিলতা আরো বেড়ে যায়।

শিক্ষাবিভাগ থেকে কিছুদিন হল এক পত্র পেয়েছিলুম, তাতে সংগীত-শিক্ষার প্রবর্তন সম্বন্ধে আমার পরামর্শ চাওয়া হয়েছিল। বিষয়ের গুরুত্ব বিচার করে আমি চুপ করে থাকতে পারি নি। উত্তরে লিখেছিলুম— বিশ্ববিদ্যালয়ে সংগীতশিক্ষার ব্যবস্থা গড়ে তোলবার পক্ষে অধ্যাপক ভাট্‌খণ্ডেই যোগ্যতম। আশা করেছিলুম এইখানেই আমার কাজ ফুরোলো। কর্মফলের পরম্পরা এখনো শেষ হয় নি। চিঠিপত্রযোগে তর্কবিতর্কের জালের মধ্যে জড়িত হয়ে পড়েছি। বর্তমানে বাংলা দেশে শ্রীযুক্ত গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়কে শ্রেষ্ঠ গায়ক বলেছি, এই কারণে কিছু ভুল-বোঝাবুঝির সৃষ্টি হয়েছে : সেটা পরিষ্কার করা ভালো।

সাধারণত আমরা যাঁদের ওস্তাদ বলি, পুরাতন বিদ্যাধারাকে রক্ষা করা সম্বন্ধে তাঁদের বিশেষ একটা উপযোগিতা আছে। তাঁরা সংগ্রহ করেন, সঞ্চয় করেন, সংগীতব্যাকরণের বিশুদ্ধতা বাঁচিয়ে রাখেন। চিরপ্রচলিত রাগরাগিণীকে চিরপ্রচলিত প্রথার কাঠামোর মধ্যে শ্রেণীবদ্ধ ভাবে ধরে রাখবার কাজে অক্লান্ত অধ্যবসায়ে তাঁদেরকে প্রবৃত্ত হতে হয়। ছেলেবেলা থেকেই একমাত্র এই কাজেই তাঁদের দেহ মন প্রাণ নিযুক্ত। সুমিষ্ট কণ্ঠস্বর তাঁদের পক্ষে অত্যাবশ্যক নয় ; অনেকের তা নেই, অনেকে তাকে অবজ্ঞাই করেন। গান সম্বন্ধে তাঁদের প্রতিভার স্বকীয়তাও বাহুল্য, এমন-কি, তাতে হয়তো তাঁদের আপন কর্মের ব্যাঘাত ঘটাতে পারে। তাঁরা একান্ত অবিকৃত ভাবে প্রাচীন ধারাকে অনুসরণ করে চলেন এইটেই তাঁদের গর্বের বিষয়। এই রকম রক্ষকতার মূল্য আছে। সমাজ সেই মূল্য তাঁদের যদি না দেয় তবে তাঁদের প্রতিও অন্যায় করে, নিজেরও ক্ষতি ঘটায়।

হিন্দুস্থানী সংগীত এমন একটি কলাবিদ্যা যার রচনার নিয়ম বহুকাল পূর্বেই সমাপ্ত হয়ে গেছে। সেই বহুকাল পূর্বের আদর্শের সঙ্গে মিলিয়েই তার বিচার চলে। যাঁরা সেই আদর্শমতেই বহু পরিশ্রমে এই-জাতীয় সংগীতের সাধনা করেছেন, হিন্দুস্থানী সংগীত সম্বন্ধে তাঁদের সাক্ষ্যকেই প্রামাণ্য বলে গ্রহণ করতে হয়।

এই ওস্তাদ-সম্প্রদায়ের মধ্যেও গুণের তারতম্য নিশ্চয়ই আছে। কারো গানের সংগ্রহ অন্যের চেয়ে হয়তো বহুলতর ; রাগরাগিণীর রূপের পরিচয় হয়তো এক ওস্তাদের চেয়ে অন্য ওস্তাদের অধিকতর বিশুদ্ধ ; তাল তানের প্রয়োগ সম্বন্ধে কারও বা কসরত অন্যের চেয়ে বিস্ময়জনক।

ওস্তাদির চেয়ে বড়ো একটা জিনিস আছে, সেটা হচ্ছে দরদ। সেটা বাইরের জিনিস নয়, ভিতরের জিনিস। বাইরের জিনিসের পরিমাপ আছে, আদর্শে ধরে সেটা সম্বন্ধে দাঁড়িপাল্লার বিচার চলে। তার চেয়ে বড়ো যেটা সেটাকে কোনো বাইরের আদর্শে মাপা চলে না ; সেটা হল সহৃদয়হৃদয়বেদ্য। কে সহৃদয় আর কে সহৃদয় নয় বাইরে থেকে তারও তল পাওয়া যায় না, তার শেষ নিষ্পত্তি করবার ব্যর্থ চেষ্টা মাথা-ফাটাফাটিতে গিয়ে পৌঁছয়— অর্থাৎ যাকে বলে হিংস্র দুঃসহযোগ!

বালককালে যদুভট্টকে জানতাম। তিনি ওস্তাদজাতের চেয়ে ছিলেন অনেক বড়ো। তাঁকে গাইয়ে বলে বর্ণনা করলে খাটো করা হয়। তাঁর ছিল প্রতিভা, অর্থাৎ সংগীত তাঁর চিত্তের মধ্যে রূপ ধারণ করত। তাঁর রচিত গানের মধ্যে যে বিশিষ্টতা ছিল তা অন্য কোনো হিন্দুস্থানী গানে পাওয়া যায় না। সম্ভবত তাঁর চেয়ে বড়ো ওস্তাদ তখন হিন্দুস্থানে অনেক ছিল, অর্থাৎ তাঁদের গানের সংগ্রহ আরো বেশি ছিল, তাঁদের কসরতও ছিল বহুসাধনাসাধ্য, কিন্তু যদুভট্টর মতো সংগীতভাবুক আধুনিক ভারতে আর কেউ জন্মেছে কি না সন্দেহ। অবশ্য, এ কথাটা অস্বীকার করবার অধিকার সকলেরই আছে। কারণ, কলাবিদ্যায় যথার্থ গুণের প্রমাণ তর্কের দ্বারা স্থির হয় না, যষ্টির দ্বারাও নয়। যাই হোক, ওস্তাদ ছাঁচে ঢেলে তৈরি হতে পারে, যদুভট্ট বিধাতার স্বহস্তরচিত। অতএব চলতি কাজে যদুভট্টদের প্রত্যাশা করা বৃথা। কথাটা হচ্ছে এই যে, হিন্দুস্থানী সংগীতের মতো একটা স্থাবর পদার্থের আধার যখন খুঁজি তখন ওস্তাদকেই সহজে হাতের কাছে পাই। বিশুদ্ধ রাগরাগিণী শুনতে বা শিখতে যখন চাই তখন ওস্তাদকেই খুঁজি। যেমন, যে পূজাবিধি মন্ত্রে ও অনুষ্ঠানে একেবারে অচল করে বাঁধা তার জন্যে পুরুতের দরকার হয়— তখন এমন লোককে জুটিয়ে আনি, অক্ষরে অক্ষরে যার সমস্ত ক্রিয়াকলাপ অভ্যস্ত। তার মানে বুঝতে পারে এতটুকু সংস্কৃতজ্ঞান এই পুরুতের পক্ষে অনাবশ্যক। কারণ, এই-সকল ক্রিয়াকলাপের বাইরের রূপটাই হল প্রধান ; সেটা যদি বিশুদ্ধ হয় তা হলেই কাজটা নিষ্পন্ন হতে পারে। যিনি পণ্ডিত তিনি তাঁর অর্থবোধের দ্বারা এই-সকল মন্ত্রে হয়তো প্রাণ দিতে পারেন, কিন্তু একান্ত চর্চার অভাবে বাইরের দিকে তাঁর স্খলন হতে পারে— অন্তত তাঁর পক্ষে কাজটা অনর্গলভাবে সহজ নাও হতে পারে। যেখানে দৃঢ় করে বেঁধে দেওয়া বাহ্যরূপটাই প্রধান সেখানে আয়াসসাধ্য অভ্যাসটাই বেশি কাজে লাগে, সেখানে প্রতিভা লজ্জিত হবে। আপিসের অভিজ্ঞ কেরানি তার স্বস্থানে উপরের অধ্যক্ষের চেয়ে বেশি যোগ্য, কিন্তু সেই যোগ্যতা সেই সীমার মধ্যেই পর্যাপ্ত।

হিন্দুস্থানী গানকে যেহেতু আমরা অতীতকালের নির্দিষ্ট বিধির দ্বারা বিচার করি, সেইজন্যেই তার এমন বাহন চাই যার চর্চা আছে, প্রতিভা যার পক্ষে বাহুল্য— যে আবিষ্কারক নয়, যে ব্যাখ্যাকারক— সংগীতে যে জগদীশচন্দ্র বসু নয়, যে বিজ্ঞান-পাঠশালায় ডেমনেস্‌ট্রেটর। এক কথায় যে ওস্তাদ।

আমাদের যখন অল্প বয়স ছিল তখন কলকাতায় ধনীদের ঘরে এইরকম ওস্তাদের সমাগম সর্বদাই দেখেছি। তাতে করে সংগীতের অলংকারশাস্ত্রবোধ অন্তত ধনীসমাজে প্রচলিত ছিল। সেই-সব বনেদী ঘরে গানের এই অলংকারশাস্ত্রবোধটা না থাকা লজ্জার বিষয় ছিল। ঠিক কোন্‌খানে সুর বা তালের কতটুকু স্খলন হচ্ছে সেটা তাঁরা অনেকেই জানতেন, সেই দিকে কান রেখেই তাঁরা গান শুনতেন। বাঁধা আদর্শের সঙ্গে তান মান লয় সম্পূর্ণ মিলেছে দেখলেই তাঁরা পুলকিত হয়ে উঠতেন। রাগিণীর যে-সব জায়গায় দুরূহ গ্রন্থি, সেইখানটাতে যে-সব গাইয়ে অনায়াসে সংকট পার হয়ে যেত তারাই বরমাল্য পেত।

যে কারণেই হোক, শহরে অনেক দিন থেকেই গাইয়ে-সমাগম বিরল হয়ে এসেছে। তাই হিন্দুস্থানী গানের অলংকারশাস্ত্র সম্বন্ধে জ্ঞানের চর্চা অনেক দিন থেকে শিক্ষিতসম্প্রদায়ের মধ্যে নেই বললেই হয়। অথচ হিন্দুস্থানী সংগীতে অলংকারশাস্ত্রবোধটা প্রধান জিনিস। এই কারণেই যখন আমরা হিন্দুস্থানী সংগীতের বিশেষভাবে আলোচনা করতে চাই তখন ওস্তাদকে খুঁজি। সেও পাওয়া দুর্লভ হয়েছে।

আমাদের বাড়িতে একদা নানাপ্রয়োজনবশত এই রকম ওস্তাদের খোঁজ আমরা প্রায়ই করতুম। শেষ যাঁকে পাওয়া গিয়েছিল তিনি খ্যাতনামা রাধিকা গোস্বামী। অন্যান্য গায়কদের মধ্যে

যদুভট্টের কাছেও তিনি শিক্ষা পেয়েছিলেন। যাঁদের কাছে তাঁর পরিচয় ছিল তাঁরা সকলেই জানেন রাধিকা গোস্বামীর কেবল যে গানের সংগ্রহ ও রাগরাগিণীর রূপজ্ঞান ছিল তা নয়, তিনি গানের মধ্যে বিশেষ একটি রসসঞ্চার করতে পারতেন। সেটা ছিল ওস্তাদের চেয়ে কিছু বেশি। সেটা যদি নাও থাকত তবু তাঁকে আমরা ওস্তাদ বলেই গণ্য করতুম, এবং ওস্তাদের কাছ থেকে যেটা আদায় করবার তা আমরা আদায় করতুম— আমরা আদায় করেও ছিলুম। সে-সব কথা সকলের জানা নেই।

তাঁর মৃত্যুর পরেও ওস্তাদের খোঁজ করবার দরকার ঘটেছিল। শান্তিনিকেতনে হিন্দুস্থানী গান শিক্ষা দেবার প্রয়োজন বোধ করি। নিজেও চেষ্টা করেছি, বন্ধুবান্ধবদেরকেও অনুরোধ জানিয়েছি, স্বয়ং দিলীপকুমারকেও এ সম্বন্ধে আমার অভাব জ্ঞাপন করেছি। তখনি আবিষ্কার করা গেল বাংলা দেশে একমাত্র হিন্দুস্থানী গানের ওস্তাদ আছেন শ্রীযুক্ত গোপেশ্বর। আর যাঁরা আছেন তাঁরা কেউ তাঁর সমকক্ষ নন, এবং অনেকে তাঁরই আত্মীয়। আমি তাঁকেও শান্তিনিকেতনে শিক্ষকতা কাজের জন্যে পেতে ইচ্ছা করেছিলুম। কিন্তু কলকাতায় তাঁর এত কাজ যে তাঁকে কলকাতার বাইরে পাওয়া সম্ভব হয় নি। দিলীপকুমার তাঁর চেয়ে যোগ্যতর কোনো ওস্তাদের কথা আমাকে জানাতে পারেন নি। আজকের দিনে কলকাতায় যেখানেই সংগীতশিক্ষার প্রয়োজন হয়েছে সেখানেই তাঁকে ডাক পড়েছে। আর যাই হোক, আজকের দিনে সাধারণের মতে তিনিই বড়ো ওস্তাদ বলে স্বীকৃত।

যাঁরা সংগীতব্যবসায়ী নন, বাংলা দেশে তাঁদের মধ্যে গোপেশ্বরবাবুর চেয়ে বড়ো ওস্তাদ কেউ আছেন কি না সে কথা বলা কঠিন। যাঁরা সংগীতব্যবসায়ী তাঁরা শিশুকাল থেকেই একান্তভাবে গান-শিক্ষায় প্রবৃত্ত, অনেক স্থলে তাঁদের বংশের মধ্যে গান-চর্চার ধারা প্রবহমান। অতএব গানের সংগ্রহ ও সাধনা সম্বন্ধে তাঁদের উপর নির্ভর করা চলে। এক সময়ে আমি বহুল পরিমাণেই হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার চর্চা করেছিলুম। দৈবাৎ আমার চিকিৎসায় যাঁরা ফল পেয়েছিলেন তাঁরা ব্যবসায়ী চিকিৎসককে ছেড়ে আমার কাছেই আসতেন। তার থেকে আমার পক্ষপাতীর দল যদি বিচার করতেন আমি সত্যিই বড়ো ডাক্তার, তবে তাঁদের সেই বিশ্বাসের জোরে আমার ডাক্তারি বিদ্যার প্রমাণ হত না। অন্যান্য শিক্ষা বা কাজকর্মের ফাঁকে ফাঁকে যাঁরা কোনো-একটি বিদ্যার চর্চা করেন, সাধারণত তাঁদের সঙ্গে তুলনা করা চলে না এমন দলের যাঁরা একান্তভাবেই সেই বিদ্যার চর্চা করেছেন। অব্যবসায়ীদের মধ্যে প্রতিভা-সম্পন্ন লোক থাকতে পারেন, কিন্তু পূর্বেই বলেছি হিন্দুস্থানী সংগীতের মতো প্রাচীন অলংকারশাস্ত্রের দ্বারা প্রায় অচলভাবে নিয়মিত বিদ্যায় কেবল প্রতিভা-দ্বারা ওস্তাদি লাভ করা যায় না, বহুল শিক্ষা ও চর্চার দ্বারাই করা যায়।

আর-একটি বিষয় নিয়ে তর্ক হচ্ছে— গোপেশ্বরবাবুর গানের স্টাইলটা বিষ্ণুপুরী বলে কেউ কেউ তাঁর ওস্তাদিতে কলঙ্ক আরোপ করে থাকেন। সংস্কৃত অলংকারশাস্ত্রে দেখা যায় যে, প্রদেশভেদে সাহিত্যের স্বাভাবিক রীতিভেদ স্বীকার করা হয়েছে। বৈদর্ভী রীতি, গৌড়ীয় রীতি প্রভৃতি রীতির বিশিষ্টতা তিরস্কৃত হয় নি। ভারতীয় স্থাপত্যে দেখা যায় দক্ষিণভারতের স্থাপত্যের সঙ্গে উড়িষ্যার ও উত্তরভারতের অনেক পার্থক্য। মাদুরার মন্দিররচনায় স্থাপত্য পদে পদে যে তান লাগিয়েছে তার অংশে অংশে অলংকার-বৈচিত্র্যের যে অতি বাহুল্য তা কারো কারো ভালো লাগে না। তার সঙ্গে সেকেন্দ্রার স্থাপত্যের তানবিহীনতা ও অলংকারবিরলতার তুলনা করলে সেকেন্দ্রাকেই কারো কারো রুচিতে ভালো ঠেকে। তবুও ভারতীয় স্থাপত্যে দক্ষিণী রীতিকে অস্বীকার করা চলে না। তেমনিই হিন্দুস্থানী গান বাংলা দেশে যদি কোনো বিশেষ রীতি অবলম্বন

করে থাকে তবে তার স্বাতন্ত্র্য মেনে নিতে হবে। সেই রীতির মধ্যেও যে উৎকর্ষের স্থান নেই তা বলা চলে না। যদুভট্টের প্রতিভার প্রথম ভূমিকা এই বিষ্ণুপুরী রীতিতেই ; রাধিকা গোস্বামী সম্বন্ধেও সেই কথা বলা চলে। পশ্চিমদেশী শ্রোতারা যদি এই রীতির গান পছন্দ নাও করে, তবে সেটাকেই চরম বিচার বলে মেনে নেওয়া চলে না। রসবোধ সম্বন্ধে মতভেদ অভ্যাসের পার্থক্যের উপর কম নির্ভর করে না। এমনও যদি ঘটে যে, কোনো বিশেষ গায়কের মুখে বিষ্ণুপুরী রীতির গান সত্যই প্রশংসাযোগ্য না হয়ে থাকে, তাতে সাধারণভাবে বিষ্ণুপুরী রীতিকে নিন্দা করা উচিত হয় না। শত শত গায়ক আছে যারা হিন্দুস্থানী দস্তুর-মতোই গান গেয়ে শ্রোতাদেরকে পীড়িত করে, সেজন্যে হিন্দুস্থানী রীতিকে কেউ দায়ী করে না।

আমাদের দেশের কোনো খ্যাতনামা ওস্তাদকে বা বিষ্ণুপুরী রীতিকে কেন আমি বর্তমান আলোচনা-প্রসঙ্গে নিন্দা করতে চাই নে তার কারণ পূর্বেই বললেম। যে তর্ক উপস্থিত হয়েছে তার প্রধান মীমাংসার বিষয় এই যে, বিশ্ববিদ্যালয়ে সংগীতশিক্ষাবিভাগ গড়ে তোলবার কাজে কে সব চেয়ে যোগ্য ব্যক্তি। আমার মনে সন্দেহমাত্র নেই যে, ভাট্‌খণ্ডেই সেই লোক। ভারতীয় সংগীতবিদ্যা সম্বন্ধে তাঁর যে ভূরিদর্শিতা তা আর কারো নেই, তা ছাড়া তাঁর উদ্ভাবিত শিক্ষাদানপ্রণালীর অসাধারণ নৈপুণ্য সকলকেই স্বীকার করতে হবে। তিনি গায়ক নন, তিনি গানশাস্ত্রের মহামহোপাধ্যায়। অন্যত্র তিনি হিন্দুস্থানী গান-শিক্ষার যে ভিত্তি রচনা করেছেন, বাংলা দেশেও যদি তাঁকে সেই ভিত্তি রচনার সুযোগ দেওয়া যায় তবে বিশ্ববিদ্যালয় যথার্থ সফলতালাভ করবেন ; এ কাজ তিনি ছাড়া আর কারো দ্বারা সুসম্পূর্ণ হতে পারবে না।

অগ্রহায়ণ ১৩৩৫

শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে সংগীতের স্থান

বাংলা দেশে আধুনিক যুগের যখন সবে আরম্ভকাল তখন আমি জন্মেছি। পুরাতন যুগের আলো তখন ম্লান হয়ে আসছে কিন্তু একেবারে বিলীন হয় নি। পিছন দিক থেকে কিছু ইঙ্গিতে, কিছু প্রত্যক্ষ, তার কতকটা পরিচয় পেয়েছি। তার মধ্যে জীর্ণ জীবনের বিকার অনেক ছিল, এখনকার আদর্শে বিচার করতে গেলে নানা দিকে তার শৈথিল্য তার দুর্বলতা মনকে লজ্জিত করতে পারে। কিন্তু তখনকার প্রদোষের ছায়ায় এমন-কিছু দেখা গেছে যা অস্তসূর্যের আলোর মতো, সেদিনকার ইতিহাসের রোকড়ের খাতায় তাকে অন্ধকারের কোঠায় ফেলা চলবে না। তার মধ্যে একটি হচ্ছে, সেকালের জীবনযাত্রায় সংগীতের সমাদর।

দেখেছি তখনকার বিশিষ্ট পরিবারে সংগীতবিদ্যার অধিকার বৈদগ্ধ্যের প্রমাণ বলে গণ্য হত। বর্তমান সমাজে ইংরেজি রচনায় বানান বা ব্যাকরণের স্খলনকে যেমন আমরা অশিক্ষার লজ্জাকর পরিচয় বলে চমকে উঠি, তেমনি হত যদি দেখা যেত— সম্মানী পরিবারের কেউ গান শোনাবার সময় সমে মাথা নাড়ায় ভুল করেছে কিংবা ওস্তাদকে রাগরাগিণী ফর্মাশের বেলায় রীত রক্ষা করে নি। তাতে যেন বংশমর্যাদায় দাগ পড়ত। সৌভাগ্যক্রমে তখনো আমাদের সংগীতরাজ্যে বক্‌স্ হারমোনিয়মের মহামারী কলুষিত করে নি হাওয়াকে। তম্বুরার তারে নিজের হাতে সুর বেঁধে সেটাকে কাঁধে হেলিয়ে আলাপের ভূমিকা দিয়ে যখন বড়ো বড়ো গীতরচয়িতার ধ্রুপদগানে গায়ক নিস্তব্ধ সভা মুখরিত করতেন, সেই ছবির সুগম্ভীর রূপ আজও আমার মনে উজ্জ্বল আছে। দূর প্রদেশ থেকে আমন্ত্রিত গুণীদের সমাদর ক'রে উচ্চ অঙ্গের সংগীতের আসর রচনা করা সেকালে

সম্পন্ন অবস্থার লোকের আত্মসম্মানরক্ষার অঙ্গ ছিল। বস্তুত তখনকার সমাজ বিদ্যার যে-কোনো বিষয়কেই শিক্ষণীয় রক্ষণীয় বলে জানত, ধনীরা তাকে বাঁচিয়ে রাখবার দায়িত্বকে গৌরব বলে গ্রহণ করতেন। এই স্বতঃস্বীকৃত ট্যাক্সের জোরেই তখনকার শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতেরা সমাজে উচ্চশিক্ষার পীঠস্থানের সৃষ্টি ও পুষ্টি-বিধান করতে পেরেছেন। তখন ধনের অবমাননা ঘটত যদি সমাজের সমস্ত প্রদীপ জ্বালিয়ে রাখবার মহাসমবায়ে কোনো ধনীর কৃপণতা প্রকাশ পেত। সরস্বতী তখন লক্ষ্মীর দ্বারে ভিক্ষাবৃত্তি করতে এসে মাথা হেঁট করতেন না, লক্ষ্মী স্বয়ং যেতেন ভারতীর দ্বারে অর্ঘ্য নিয়ে নম্রশিরে। এমনি সহজেই আত্মগৌরবের প্রবর্তনায় ধনীরা দেশে সংগীতের গৌরব রক্ষা করেছেন ; সে ছিল তাঁদের সামাজিক কর্তব্য। এর থেকে বোঝা যাবে সংগীতকে তখনকার দিনে সম্মানজনক বিদ্যা বলেই গ্রহণ করেছে।

যে বিদ্যার সঞ্চরণ অক্ষরের ক্ষেত্রে, উপর নীচে তার দুই ভাগ ছিল। এক ছিল শ্রুতি স্মৃতি দর্শন ব্যাকরণের উচ্চ শিখর, আর ছিল জনশিক্ষার নিম্নভূমিবর্তী উপত্যকা। উভয়কেই চিরদিন পালন করে এসেছেন সমাজের গণ্য ব্যক্তিরা। নানা উপলক্ষে তাঁদেরই নিবেদিত দানের নিরন্তর সাহায্যে নিঃস্বপ্রায় অধ্যাপকেরা বিনা বেতনে দুর্গম শাস্ত্রভাণ্ডারের সকল প্রকার বিদ্যা বিতরণ করে এসেছেন। বিশেষ বিশেষ স্থানে এই-সকল বিদ্যার বিশেষ কেন্দ্র ছিল, আবার ছোটো আকারে নানা স্থানে নানা গ্রামে এক-একটি ছায়াঘন ফলবান বনস্পতির মতো এরা মাথা তুলেছে। অর্থাৎ দেশের উচ্চ শিক্ষাও দুটি-একটি দূরবর্তী বিশ্ববিদ্যালয়ে নিরুদ্ধ ছিল না, তার দানসত্র ছিল দেশের প্রায় সর্বত্রই। তেমনি আবার প্রাথমিক শিক্ষার জন্য পাঠশালা প্রত্যেক গ্রামের প্রধানদের বৃত্তিতে পালিত এবং তাঁদের দালানে প্রতিষ্ঠিত ছিল, শিক্ষার্থীদের মধ্যে ধনী দরিদ্রের ভেদ ছিল না। এর দায়িত্ব রাজার অধিকারে ছিল না, ছিল সমাজের আপন হাতে।

সংগীত সম্বন্ধেও তেমনি ছিল দুই ধারা। উচ্চ সংগীতের ব্যয়সাধ্য চর্চার ক্ষেত্র ছিল ধনশালীদের বৈঠকখানায়। সেই সংগীত সর্বদা কানে পৌঁছত চার দিকের লোকের, গানের সুরসেচনে বাতাস হত অভিষিক্ত। সংগীতে যার স্বাভাবিক অনুরাগ ও ক্ষমতা ছিল সে পেত প্রেরণা, তাতে তার শিক্ষার হত ভূমিকা। যে-সব ধনীদের ঘরে বৃত্তিভোগী গায়ক ছিল তাদের কাছে শিক্ষা পেত কেবল ঘরের লোক নয়, বাইরের লোকও। বস্তুত এই-সকল জায়গা ছিল উচ্চ সংগীত শিক্ষার ছোটো ছোটো কলেজ। বিখ্যাত বাঙালি সংগীতনায়ক যদুভট্ট যখন আমাদের জোড়াসাঁকোর বাড়িতে থাকতেন, নানাবিধ লোক আসত তাঁর কাছে শিখতে : কেউ শিখত মৃদঙ্গের বোল, কেউ শিখত রাগরাগিণীর আলাপ। এই কলরবমুখর জনসমাগমে কোথাও কোনো নিষেধ ছিল না। বিদ্যাকে রক্ষা করবার ও ছড়িয়ে দেবার এই ছিল সহজ উপায়।

এই তো গেল উচ্চ সংগীত। জনসংগীতের প্রবাহ সেও ছিল বহু শাখায়িত। নদীমাতৃক বাংলা দেশের প্রাঙ্গণে প্রাঙ্গণে যেমন ছোটো-বড়ো নদী-নালা স্রোতের জাল বিছিয়ে দিয়েছে, তেমনি বয়েছিল গানের স্রোত নানা ধারায়। বাঙালির হৃদয়ে সে রসের দৌত্য করেছে নানা রূপ ধরে। যাত্রা, পাঁচালি, কথকতা, কবির গান, কীর্তন মুখরিত করে রেখেছিল সমস্ত দেশকে। লোক-সংগীতের এত বৈচিত্র্য আর-কোনো দেশে আছে কি না জানি নে। শখের যাত্রার সৃষ্টি করার উৎসাহ ছিল ধনী-সন্তানদের। এই-সব নানা অঙ্গের গান ধনীরা পালন করতেন, কিন্তু অন্য দেশের বিলাসীদের মতো এ-সমস্ত তাঁদের ধনমর্যাদার বেড়া-দেওয়া নিভৃতে নিজেদেরই সম্ভোগের বস্তু ছিল না। বাল্যকালে আমাদের বাড়িতে নলদময়ন্তীর যাত্রা শুনেছি। উঠোন-জোড়া জাজিম ছিল পাতা— সেখানে যারা সমাগত তাদের অধিকাংশই অপরিচিত, এবং অনেকেই অকিঞ্চন তার

প্রমাণ পাওয়া যেত জুতো-চুরির প্রাবল্যে। আমার পিতার পরিচর ছিল কিশোরী চাটুজ্জে। পূর্ব-বয়সে সে ছিল কোনো পাঁচালির দলের নেতা। সে আমাকে প্রায় বলত, 'দাদাজি, তোমাকে যদি পাঁচালির দলে পাওয়া যেত তা হলে—'। বাকিটুকু আর ভাষায় প্রকাশ করতে পারত না। বালক দাদাজিরও মন চঞ্চল হয়ে উঠত পাঁচালির দলে খ্যাতি অর্জন করবার অসম্ভব দুরাশায়। পাঁচালির যে গান তার কাছে শুনতুম তার রাগিণী ছিল সনাতন হিন্দুস্থানী, কিন্তু তার সুর বাংলা কাব্যের সঙ্গে মৈত্রী করতে গিয়ে পশ্চিমী ঘাঘরার ঘূর্ণাবর্তকে বাঙালি শাড়ির বাহুল্যবিহীন সহজ বেষ্টনে পরিণত করেছে।—

'কাতরে রেখো রাঙা পায় মা—
অভয়ে দীনহীন ক্ষীণ জনে যা করো, মা, নিজগুণে—
তারিতে হবে অধীনে, আমি অতি নিরুপায়।'

এই সুর আজও মনে পড়ে। সূর্যের কিরণচ্ছটা বহু লক্ষ যোজন দূর পর্যন্ত উৎসারিত হয়ে ওঠে, এই তার তানের খেলা। আর আমার শ্যামা পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল প্রভাতের রুপোলি কল্কা আর সূর্যাস্তকালের সোনালি জরির আঁচলা নিয়ে তন্বীর গায়ে গায়ে ঘিরে ঘিরে দক্ষিণ হাওয়ায় কাঁপতে থাকে। কিন্তু এও তো ঐশ্বর্য, এও তো চাই।

'ভালোবাসিবে ব'লে ভালোবাসি নে'

—এতে তানের প্রগল্‌ভতা নেই কিন্তু বেদনা আছে তো। এও যে নিতান্তই চাই সাধারণের জন্যে। শুধু সাধারণের জন্যে কেন বলি, এক সময়ে উচ্চ ঘরের রসনাও তৃপ্তির সঙ্গে এর স্বাদ গ্রহণ করেছে। মেয়েদের অশিক্ষিতপটুত্বের কথা কালিদাস বলেছেন, সরল প্রকৃতির লোকের অশিক্ষিত স্বাদসম্ভোগের কথাটাও সত্য। যে ঘরের পাকশালার দূর পাড়া পর্যন্ত মোগলাই ভোজের লোভন গন্ধে আমোদিত, সেই ঘরেই বিধবা মাসিমার রাঁধা মশলাবিরল নিরামিষ ব্যঞ্জনের আদর হয়তো তার চেয়েও নিত্য হয়।—

'মনে রইল, সই, মনের বেদনা—
প্রবাসে যখন যায় গো সে
তারে বলি বলি আর বলা হল না।'

—এ যে অত্যন্ত বাঙালির গান। বাঙালির ভাবপ্রবণ হৃদয় অত্যন্ত তৃষিত হয়েই গান চেয়েছিল, তাই সে আপন সহজ গান আপনি সৃষ্টি না করে বাঁচে নি।

তাই আজও দেখতে পাই বাংলা সাহিত্যে গান যখন-তখন যেখানে-সেখানে অনাহূত অনধিকারপ্রবেশ করতে কুণ্ঠিত হয় না। এতে অন্যদেশীয় অলংকারশাস্ত্রসম্মত রীতিভঙ্গ হয়ে থাকে। কিন্তু আমাদের রীতি আমাদেরই স্বভাবসংগত। তাকে ভর্ৎসনা করি কোন্ প্রাণে? সেদিন আমাদের নটরাজ শিশির ভাদুড়ী মশায় কোনো শোকাবহ অতি গম্ভীর নাটকের জন্য আমার কাছে গান ফর্মাশ করে বসলেন। কোনো বিলাতী নাট্যেশ্বর এমন প্রস্তাব মুখে আনতেন না, মনে করতেন এটা নাট্যকলার মাঝখানে একটা অত্যুৎপাত। এখনকার ইংরেজি-পোড়োরাও হয়তো এরকম অনিয়মে তর্জনী তুলবেন। আমি তা করি নে, আমি বলি আমাদের আদর্শ আমাদের নিজের মন আপন আনন্দের তাগিদে স্বভাবতই সৃষ্টি করবে। সেই সৃষ্টিতে কলাতত্ত্বের সংযম এবং ছন্দ বাঁচিয়ে চলতে হবে, কিন্তু তার চেহারা যদি সাহেবী ছাঁচের না হয় তবে তাকে পিটিয়ে বদল করতেই হবে এ কথা বলতে পারব না। বিদেশী অলংকারশাস্ত্র পড়বার বহু পূর্ব থেকে আমাদের নাট্য, যাকে আমরা যাত্রা বলি, সে তো গানের সুরেই ঢালা। সে যেন বাংলা দেশের ভূসংস্থানেরই মতো ;

সেখানে স্থলের মধ্যে জলের অধিকারই যেন বেশি। কথকতা, যেটা অলংকারশাস্ত্র-মতে ন্যারেটিভ শ্রেণী-ভুক্ত, তার কাঠামো গদ্যের হলেও স্ত্রীস্বাধীনতা-যুগের মেয়েদের মতোই গীতকলা তার মধ্যে অনায়াসেই অসংকোচে প্রবেশ করত। মনে তো পড়ে— একদিন তাতে মুগ্ধ হয়েছিলুম। সাহিত্যরচনার প্রচলিত পাশ্চাত্য বিধির কথা স্মরণ করে উদ্‌বেল আনন্দকে লজ্জিত হয়ে সংযত করি নি তো।

যাই হোক, আমার বলবার কথা এই যে, আত্মপ্রকাশের জন্যে বাঙালি স্বভাবতই গানকে অত্যন্ত করে চেয়েছে। সেই কারণে সর্বসাধারণে হিন্দুস্থানী সংগীতরীতির একান্ত অনুগত হতে পারে নি। সেইজন্যেই কানাড়া আড়ানা মালকোষ দরবারী তোড়ির বহুমূল্য গীতোপকরণ থাকা সত্ত্বেও বাঙালিকে কীর্তন সৃষ্টি করতে হয়েছে। গানকে ভালোবেসেছে ব'লেই সে গানকে আদর করে আপন হাতে আপন মনের সঙ্গে মিলিয়ে তৈরি করতে চেয়েছে। তাই, আজ হোক কাল হোক, বাংলায় গান যে উৎকর্ষ লাভ করবে সে তার আপন রাস্তাতেই করবে, আর-কারো পাথর-জমানো বাঁধা রাস্তায় করবে না।

যে সূত্রে এই প্রবন্ধ রচনা শুরু করেছিলেম সেই সূত্রটি এইখানে আর-একবার ধরা যাক। দেশের সংস্কৃতিতে সংগীতের প্রাধান্য ছিল, আমাদের বিদায়োন্মুখ পূর্বযুগের দিকে তাকিয়ে সেই কথাটি জানিয়েছি। তার পরে বয়স যতই বাড়তে লাগল ততই অন্য-এক যুগের মধ্যে প্রবেশ করতে লাগলুম, যে যুগে ছেলেরা প্রথম বয়স থেকে কলেজের উচ্চ ডিগ্রির দিকে মাথা উঁচু করে নোট মুখস্থ করতে লেগেছে। তখন গানটাকে সম্মাননীয় বিদ্যা বলে গণ্য করবার ধারণা লুপ্ত হয়ে এল। যে-সব বড়ো ঘরে গাইয়েরা আদর ও আশ্রয় পেয়ে এসেছে সেখানে সংগীতের ভাঙাবাসায় পড়া-মুখস্থ'র গুঞ্জনধ্বনি মুখরিত হয়ে উঠল ; তখনকার যুবকদের এমন একটি শুচিবায়ুতে পেয়ে বসল, যাতে দুর্গতিগ্রস্ত গানব্যবসায়ীর চরিত্রের সঙ্গে জড়িত করে গান বিদ্যাটিরই পবিত্র রূপকে বীভৎস বলে কল্পনা করতে লাগল। বাংলা দেশের শিক্ষাবিভাগে সংগীতকে স্বীকার করতে পারে নি। তাই, সংগীতে রুচি অধিকার ও অভিজ্ঞতা না থাকাটাকে অশিক্ষার পরিচয় বলে কোনো লজ্জা বোধ করার কারণ তখনকার শিক্ষিতমণ্ডলীর মনে রইল না। বরঞ্চ সেদিন যে-সব ছেলে, হিতৈষীদের ভয়ে, চাপা গলায় গান গেয়েছে তাদের চরিত্রে হয়েছে সন্দেহ।

অপর পক্ষে সেই সময়টাতে অনেক সৎকাজের সূচনা হয়েছে সে কথা মানতে হবে। তখন আমাদের পলিটিক্‌স্ সাবধানে দুই কূল বাঁচিয়ে এ দিকে ও দিকে তাকিয়ে মাথা তুলছে, বক্তৃতামঞ্চে ইংরেজি বাণী হাততালি পাচ্ছে, খবরের কাগজের মুখ ফুটতে শুরু করেছে, সাহিত্যে দুই-একজন অগ্রণী পথে বেরিয়েছেন। কিন্তু, দেশে বড়ো বড়ো প্রাচীন সরোবর বুজে গিয়ে তার উপরে আজ যেমন চাষ চলছে, তেমনি তখন সংগীতের রসসঞ্চয় অন্তত শিক্ষিতপাড়ায় প্রায় মরে এসেছে। তার উপরে এগিয়ে চলেছে পাঠ্যপুস্তকের আবাদ।

আপন নীরসতাকে শুচিতা বলে সম্মান দিয়েছিল যে যুগ, সে যে আজও অটল হয়ে আছে তা আমি বলি নে। বাঙালির প্রকৃতি আজ আবার আপন গানের আসর খুঁজে বেড়াচ্ছে, সুরের উপাদান সংগ্রহ করতে সৃষ্টি করছে। দেশের বিদ্যায়তন এই শুভ মুহূর্তে তার আনুকূল্য করবে— একান্ত মনে এই কামনা করি।

দৈবক্রমে যে সুযোগ আমি পেয়েছিলুম সে কথা মনে পড়ছে। আমার ভাগ্যবিধাতাকে আমি নমস্কার করি। আমি যখন জন্ম নিয়েছি তখন আমাদের পরিবারের আশ্রয় জনতার বাইরে। সমাজে আমরা ব্রাত্য। আমাদের পরিবারে পরীক্ষা-পাসের সাধনা সেদিন গৌরব পায় নি। আমার দাদারা

দুই-একজন বিশ্ববিদ্যালয়ের সিংহদ্বার একটুখানি পেরিয়ে ফিরে এসেছেন ডিগ্রিবর্জিত নিভৃতে। সেটা ভালো করেছেন তা আমি বলি নে। কিন্তু তার ফল হয়েছিল এই যে, ডিগ্রিলাঞ্ছিত শিক্ষা ছাড়া শিক্ষার আর-কোনো পরিচয় গ্রাহ্য নয় এই অন্ধ সংস্কারটা আমাদের ঘরে থাকতেই পারে নি। আমার ভাইরা দিনরাত নিজের ভাষায় তত্ত্বালোচনা করেছেন, কাব্যরস-আস্বাদনে ও উদ্ভাবনে তাঁরা ছিলেন নিবিষ্ট, চিত্রকলাও ইতস্তত অঙ্কুরিত হয়ে উঠেছে, তার উপরে নাট্যাভিনয়ে কারো কোনো সংকোচমাত্র ছিল না। আর, সমস্ত ছাড়িয়ে উঠেছিল সংগীত। বাঙালির স্বাভাবিক গীতমুগ্ধতা ও গীতমুখরতা কোনো বাধা না পেয়ে আমাদের ঘরে যেন উৎসের মতো উৎসারিত হয়েছিল। বিষ্ণু ছিলেন ধ্রুপদীগানের বিখ্যাত গায়ক। প্রত্যহ শুনেছি সকালে-সন্ধ্যায় উৎসবে-আমোদে উপাসনামন্দিরে তাঁর গান, ঘরে ঘরে আমার আত্মীয়েরা তম্বুরা কাঁধে নিয়ে তাঁর কাছে গান চর্চা করেছেন, আমার দাদারা তানসেন প্রভৃতি গুণীর রচিত গানগুলিকে আমন্ত্রণ করেছেন বাংলা ভাষায়। এর মধ্যে বিস্ময়ের ব্যাপার এই— চিরাভ্যস্ত সেই-সব প্রাচীন গানের নিবিড় আবহাওয়ার মধ্যে থেকেও তাঁরা আপন-মনে যে-সব গান রচনায় প্রবৃত্ত হয়েছেন তার রূপ তার ধারা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, গীতপণ্ডিতদের কাছে তা অবজ্ঞার যোগ্য। রাগরাগিণীর বিশুদ্ধতা নষ্ট করে এখানেও তাঁরা ব্রাত্যশ্রেণীতে ভুক্ত হয়েছেন।

গান বাজনা নাট্যকলাকে অক্ষুণ্ণ সম্মান দেবার যে দীক্ষা পেয়েছিলেম তার একটা বিশেষ পরিচয় দিই। আমার ভাইঝিরা শিশুকাল থেকে উচ্চ অঙ্গের গান বিশেষ যত্নে শিখেছিলেন। সেটা তখনকার দিনে নিন্দার্হ না হলেও বিস্ময়ের বিষয় ছিল। আমাদের বাড়ির প্রাঙ্গণে প্রকাশ্য নাট্যমঞ্চে তাঁরা যেদিন গান গেয়েছিলেন সেদিন সামাজিক হাওয়া ভিতরে-ভিতরে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়েছিল। সৌভাগ্যক্রমে তখনকার দিনের খবরের কাগজের বিষদাঁত আজকের মতো এমন উগ্র হয় নি। তা হলে অপমান মারাত্মক হয়ে উঠত। তার পরে এই-জাতীয় অত্যাচার আরো ঘটেছিল। এর চেয়ে উচ্চ সপ্তকে নিন্দা পেয়েও সংকোচ বোধ করি নি। তার কারণ, কেবলমাত্র কলেজি বিদ্যাকে নয়, সকল বিদ্যাকেই শ্রদ্ধা করবার অভ্যাস আমাদের পরিবারে প্রচলিত ছিল।

আমাদের দেশের শিক্ষাবিভাগ কলাবিদ্যার সম্মানকে শিক্ষিত মনে স্বাভাবিক ক'রে দেবেন এই নিবেদন উপস্থিত করবার অভিপ্রায়ে এই ভূমিকামাত্র আজ প্রস্তুত করে এনেছি। আর যা-কিছু আমার করবার আছে সে নানা অসামর্থ্য সত্ত্বেও আমার বিদ্যালয়ে আমি প্রবর্তিত করেছি।

মানুষ কেবল বৈজ্ঞানিক সত্যকে আবিষ্কার করে নি, অনির্বচনীয়কে উপলব্ধি করেছে। আদিকাল থেকে মানুষের সেই প্রকাশের দান প্রভূত ও মহার্ঘ। পূর্ণতার আবির্ভাব মানুষ যেখানেই দেখেছে— কথায়, সুরে, রেখায়, বর্ণে, ছন্দে, মানবসম্বন্ধের মাধুর্যে, বীর্যে— সেইখানেই সে আপন আনন্দের সাক্ষ্যকে অমরবাণীতে স্বাক্ষরিত করেছে। শিক্ষার্থী যারা, তারা সেই বাণী থেকে বঞ্চিত না হোক এই আমি কামনা করি। শুধু উপভোগ করবার উদ্দেশে জগতে জন্মগ্রহণ ক'রে, সুন্দরকে দেখেছি, মহৎকে পেয়েছি, ভালোবেসেছি ভালোবাসার ধনকে— এই কথাটি মানুষকে জানিয়ে যাবার অধিকার ও শক্তি দান করতে পারে এমন শিক্ষার সুযোগ পেয়ে দেশ ধন্য হোক— দেশের সুখ দুঃখ আশা আকাঙ্ক্ষা অমৃত-অভিষিক্ত গীতলোকে অমরত্ব লাভ করুক।[১]

ফাল্গুন ১৩৪২

---

[১] নিউ এড়ুকেশন ফেলোশিপ বা নবশিক্ষাসংঘের বঙ্গীয় শাখা-কর্তৃক অনুষ্ঠিত সম্মিলনীতে ৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৩৬ তারিখে পঠিত।

কথা ও সুর

সুরের মহলে কথাকে ভদ্র আসন দিলে তাতে সংগীতের খর্বতা ঘটে কি না এই নিয়ে কথা-কাটাকাটি চলছে। বিচারকালে সম্পাদক বলছেন আসামীর বক্তব্য শোনা উচিত। সংগীতের বড়ো আদালতে আসামী শ্রেণীতে আমার নাম উঠেছে অনেক দিন থেকে। আত্মপক্ষে আমার যা বলবার সংক্ষেপে বলব। আমার শক্তি ক্ষীণ, সময় অল্প, বিদ্যাও বেশি নেই। আমি যে শাস্ত্রের দোহাই দিয়ে থাকি সে বিশেষভাবে সংগীতশাস্ত্রও নয়, কাব্যশাস্ত্রও নয়, তাকে বলে ললিতকলাশাস্ত্র— সংগীত ও কাব্য দুই তার অন্তর্গত।

কালিদাস রঘুবংশে বলেছেন বাক্য এবং অর্থ একত্রে সম্পৃক্ত। কিন্তু যে বাক্য কাব্যের উপাদান, অর্থকে সে অনর্থ করে দিয়ে তবে নিজের কাজ চালাতে পারে। তার প্রধান কারবার অনির্বচনীয়কে নিয়ে, অর্থের অতীতকে নিয়ে। কথাকে পদে পদে আড় করে দিয়ে ছন্দের মন্ত্র লাগিয়ে অনির্বচনীয়ের জাদু লাগানো হয় কাব্যে, সেই ইন্দ্রজালে বাক্য সুরের সমান ধর্ম লাভ করে। তখন সে হয় সংগীতেরই সমজাতীয়। এই সংগীতরসপ্রধান কাব্যকে ইংরেজিতে বলে লিরিক, অর্থাৎ তাকে গান গাবার যোগ্য বলে স্বীকার করে। একদা এই-জাতীয় কবিতা সুরেই সম্পূর্ণতা লাভ করত। কবিতার এই সম্মিলিত সম্পূর্ণ রূপ সেদিন গান বলেই গণ্য হত, বৈদিক কালে যেমন সাম-গান।

সুরসম্মিলিত কাব্যের যুগলরূপের সঙ্গে সঙ্গেই সুরহীন কাব্যের স্বতন্ত্ররূপ অনেক দিন থেকেই আছে। অপেক্ষাকৃত পরে যন্ত্রের সাহায্যে গানের স্বাতন্ত্র্যও ক্রমে উদ্ভাবিত হল। স্বাতন্ত্র্যের মধ্যে এদের যে বিশেষ পরিচয় উন্মুক্ত হয়েছে সেটা মূল্যবান সন্দেহ নেই, কিন্তু তাই তাদের পরস্পরের সঙ্গ ঠেকাবার জন্যে জেনেনা-রীতি চালাতেই হবে এমন গোঁড়ামি মানতে পারব না।

শুনেছি চরক-সংহিতায় বলেছে তাকেই বলে ভেষজ যাতে হয় আরোগ্য। যারা চিরকাল একমাত্র অ্যালোপ্যাথি চিকিৎসায় আসক্ত তাদের মতে তাকেই বলে ভেষজ যা অ্যালোপ্যাথিক মেটিরিয়া মেডিকার ফর্দ-ভুক্ত। বৈদ্যশাস্ত্রমতে বড়ি খেয়ে যে লোকটা বলে 'আরাম পেলুম', তাকে ওরা অশাস্ত্রীয় গ্রাম্য বলেই ধরে নেয়। তারা বলে ডাক্তারি মতেই আরাম হওয়া উচিত, অন্য মতে কদাচ নয়।

সাংগীতিক চরক-সংহিতার মতে তাকেই বলে সংগীত যার থেকে গীতরস পাওয়া যায় কিন্তু ওস্তাদের সাক্রেদ্‌রা বলে সেটাই সংগীত যেটা গাওয়া হয় হিন্দুস্থানী কায়দায়। ঐ কায়দার বাইরে যে গীতকলা পা ফেলে তাকে ওরা বলে স্বৈরিণী, সাধুসমাজের সে বা'র। সমজদারের খাতায় যারা নাম রাখতে চায়, অন্যশ্রেণীর গানে রস পাওয়াই তাদের পক্ষে ভদ্ররীতিবিরুদ্ধ। কিন্তু আমরা চরক-সংহিতার সঙ্গে মিলিয়ে বলব— গানের রস যেখানে পাই সেখানেই সংগীত, কথার সঙ্গে তার বিশেষ মৈত্রী থাক্‌ বা না থাক্‌। ভালো কারিগরের হাতে শিল্পীত প্রদীপের মুখে শিখা জ্বলে উঠে উৎসবসভা আলোকিত করল। সেই শিখার আলোককে আলোই বলব, সেইসঙ্গেই গুণীর হাতে গড়া প্রদীপটাকেও বাহবা দিলে দোষের হয় না। বস্তুত প্রদীপটা আলোককেই সম্মান দিয়েছে, আর ঐ প্রদীপেরও মুখ উজ্জ্বল করেছে আলোক। যাঁরা এ রকম সম্মানের ভাগাভাগিকে সংগীতের জাতিনাশ বলে রাগ করেন তাঁরা জ্বালুন-না মশাল— তার বাহনটা নগণ্য হোক, তবু তার আলোর গৌরব মানতে দ্বিধা করব না।

'কারি কারি কমরিয়া গুরুজি মোকো মোল দে'—

অর্থাৎ, 'কালো কালো কম্বল গুরুজি আমাকে কিনে দে'। এটা হল মোটা মশাল, এর চূড়ার উপরে জ্বলছে পরজরাগিণীর আলো ; মশালটার কথা মনেও থাকে না। কিন্তু কারুখচিত বাণী সমগ্র গানকে যদি শোভন করে তোলে তা হলে কোনো দিক থেকে মূল্যের কিছু হ্রাস হতে পারে বলে তো মনে করি নে।

এর পরে তর্ক উঠবে, বাক্যের অনুগত হলে সংগীতে তার পুরো পরিমাণ চালচলন তানকর্তবের ব্যাঘাত হবার কথা। এ সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে, স্বক্ষেত্রের বাহিরে আর-কিছুরই অনুগত হওয়া সংগীতের পক্ষে দোষের এ কথা মানি। আমরা যে গানের আদর্শ মনে রেখেছি তাতে কথা ও সুরের সাহচর্যই শ্রদ্ধেয়, কোনো পক্ষেরই আনুগত্য বৈধ নয়। সেখানে সুর যেমন বাক্যকে মানে, তেমনি বাক্যও সুরকে অতিক্রম করে না। কেননা, অতিক্রমণের দ্বারা সমগ্র সৃষ্টির সামঞ্জস্য নষ্ট করা কলারীতিবিরুদ্ধ। যে বিশেষ শ্রেণীর সংগীতে বাক্য ও সুর দুইয়ে মিলে রসসৃষ্টির ভার নিয়েছে সেখানে আপন গৌরব রক্ষা করেও উভয়ের পদক্ষেপ উভয়ের গতি বাঁচিয়ে চলতে বাধ্য। এই পন্থার অনুসারী বিশেষ কলানৈপুণ্য এই শ্রেণীর সংগীতেরই অঙ্গ।

কিন্তু, এমনতরো বাঁচিয়ে চলতে হলে তানকর্তব পল্লবিত করার ব্যাঘাত হতে পারে। এ ভাবনা নিয়ে অন্তত তানসেন অত্যন্ত উদ্‌বিগ্ন হন নি। সংগীত মাত্রই সোরি মিঞার পদানুবর্তী নয়। অধিকাংশ ধ্রুপদ গানের বাক্যের ঠাসবুনানির মধ্যে অলংকারবাহুল্য স্থান পায় না, শোভাও পায় না। এই স্বরসংযমে তার গৌরব বাড়িয়েছে। ধ্রুপদের এই বিশেষত্ব।

আধুনিক বাংলাগানও একটি স্বাভাবিক বিশেষত্ব নিয়েছে। এই সংগীতে কথাশিল্প ও সুরশিল্পের মিলনে একটি অপরূপ সৃষ্টিশক্তি রূপ নিতে চাচ্ছে। এই সৃষ্টিতে হিন্দুস্থানী কায়দা আপন পুরো সেলামি পাবে না, যেমন পায় নি বাংলার কীর্তন-গানে। তৎসত্ত্বেও বাংলাগানের নূতন ঠাট বাংলার বাহিরের শ্রোতাদের মনে বিশেষ একটি আনন্দ দিয়ে থাকে এ আমাদের পরীক্ষিত। দেয় না তাঁদেরই, সংগীত-ব্যবসায়িকতার বাঁধা বেড়ার মধ্যে যাঁদের মন সঞ্চরণে অভ্যস্ত।[১]

৪. ১১. '৩৭

অভিভাষণ

'সংগীতসংঘ'

১৭ মার্চ [১৯২২] তারিখে য়ুনিভার্সিটি ইনসটিটিউট হলে সংগীতসংঘের পুরস্কার বিতরণসভায় কথিত

যিনি এই সংগীতসংঘের প্রতিষ্ঠাত্রী সেই প্রতিভা আজ পরলোকে। বাল্যকালে প্রতিভা আর আমি একসঙ্গে মানুষ হয়েছিলুম। তখন আমাদের বাড়িতে সংগীতের উৎস নিরন্তর প্রবাহিত হত। প্রতিভার জীবনারম্ভকাল সেই সংগীতের অভিষেকে অভিষিক্ত হয়েছিল। সেই সংগীত শুধু যে তাঁর কণ্ঠে আশ্রয় নিয়েছিল তা নয়, এ তাঁর প্রাণকে পরিপূর্ণ করেছিল। এরই মাধুর্যপ্রবাহ তাঁর জীবনের সমস্ত কর্মকে প্লাবিত করেছে। তাঁর চরিত্রে যে ধৈর্য ছিল, শান্তি ছিল, নম্রতা ছিল, সংযমের যে গাম্ভীর্য ছিল, তার সুর লয় ছিল যেন সেই সংগীতের মধ্যে। সেই সংগীতের মাধুর্যই

---

[১] এই প্রসঙ্গে এই গ্রন্থের অন্যত্র মুদ্রিত দুইখানি সমসাময়িক পত্র দ্রষ্টব্য—ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে লিখিত ৮, ১০, ১৯৩৭ তারিখের পত্র, দিলীপকুমার রায়কে লিখিত ২৯, ১০, ১৯৩৭ তারিখের পত্র।

তাঁর স্বাভাবিক ভগবদ্‌ভক্তিতে নিয়ত প্রকাশ পেত এবং এই সংগীতের প্রভাব সাধ্বী স্ত্রীর সমস্ত কর্তব্যকে সুন্দর করে তুলেছিল।

আমার বিশ্বাস যে, সংগীত কেবল চিত্তবিনোদনের উপকরণ নয় ; তা আমাদের মনে সুর বেঁধে দেয়, জীবনকে একটি অভাবনীয় সৌন্দর্য দান করে। আমি তাই মনে করি যে, এই সংগীতসংঘের প্রতিষ্ঠা প্রতিভার জীবনের শ্রেষ্ঠ দান। তাঁর আমরণকালের সাধনাকে তিনি এই সংঘে প্রতিষ্ঠিত করে গেছেন। এখানে যে সংগীতের উৎস উৎসারিত হবে তা বাংলা দেশের নানা গৃহে প্রবাহিত হয়ে আমাদের দেশের প্রাণে মধু সঞ্চার করবে। এমনি করে এই গানের প্রবাহই তাঁর জীবনের স্মৃতিকে বহন করতে থাকবে। এর চেয়ে তাঁর স্মৃতিরক্ষার শ্রেষ্ঠতর উপায় হতে পারে না। তিনি দেশের হৃদয়ের মধ্যে তাঁর জীবনের এই বাণীকে স্বয়ং স্থাপিত করেছেন।

যাঁরা আজ সংগীত ও বাদ্য দিয়ে আমাদের আনন্দ দান করলেন, তাঁদের আমি আশীর্বাদ করছি। সংগীতের অধিষ্ঠাত্রী দেবী বীণাপাণির পদ্মবনে তাঁরা মধু আহরণ করতে এসেছেন— তাঁদের সাধনা সার্থক হোক, মাধুর্যের অমৃতরসের দ্বারা তাঁরা দেশের চিত্তে শক্তি সঞ্চারিত করুন। অনেকের ধারণা আছে যে, বুঝি লড়াই করে দ্বন্দ্বসংঘর্ষের মধ্য দিয়েই শক্তি প্রকাশিত হয়। তারা এ কথা স্বীকার করে না যে, সৌন্দর্য মানুষের বীর্যের প্রধান সহায়। বসন্তকালে গাছপালার যে নবকিশলয়ের উদ্‌গম হয় তা যেমন তার অনাবশ্যক বিলাসিতা নয়, বাস্তবিক পক্ষে সে যেমন তার বড়ো সৃষ্টির একটি প্রক্রিয়া, তেমনি বড়ো বড়ো জাতির জীবনে যে রসসৌন্দর্যের বিস্তার হয়েছে তা তাদের পরিপুষ্টিরই উপকরণ জুগিয়েছে। এই-সকল রসই জাতির জীবনকে নিত্য নবীন করে রাখে, তাকে জরার আক্রমণ থেকে বাঁচায়, অমরাবতীর সঙ্গে মর্ত্যলোকের যোগ স্থাপন করে, এই রসসৌন্দর্যই মানবচিত্তে আধ্যাত্মিক পূর্ণতায় বিকশিত হয়। পিপাসার জল আহরণ ও অন্ন বিতরণের ভার নারীদের উপরেই। তেমনি আমাদের মনের মধ্যে সংগীতের সে রসপিপাসা আছে তাও পরিতৃপ্ত করবার ভার যদি নারীরাই গ্রহণ করেন তা হলেই সেটা শোভন হয়। জীবের জীবনের ভার মেয়েদের উপর। কিন্তু, কেবল দেহেরই নয়, মনেরও জীবন আছে ; এই সংগীত হচ্ছে তারই তৃষ্ণার একটি পানীয়— এই পানীয়ের দ্বারা মনের প্রাণশক্তি সতেজ হয়ে ওঠে।

জীবন নীরস হলে সঙ্গে সঙ্গে তা নির্বীর্য হয়ে পড়ে। কিন্তু, শুষ্কতার কঠোরতাই যে বীর্য এমন কথা আমাদের দেশে প্রায়ই শুনতে পাওয়া যায়। অবশ্য, বাহিরে বীর্যের যে প্রকাশ সেই প্রকাশের মধ্যে একটা কঠিন দিক আছে, কিন্তু অন্তরের যে পূর্ণতা সেই কাঠিন্যকে রক্ষা করে সেই পূর্ণতার পরিপুষ্টি কোথা থেকে? এ হচ্ছে আনন্দরস থেকে। সেইটে চোখে ধরা পড়ে না বলে তাকে আমরা অগ্রাহ্য করি, অবজ্ঞা করি, তাকে বিলাসের অঙ্গ বলে কল্পনা করি।

গাছের গুড়ির কাষ্ঠ অংশটাকে দিয়েই তো গাছের শক্তি ও সম্পদের হিসাব করলে চলবে না। সেটাকে খুব স্থূলরূপে স্পষ্ট করে দেখা যায় সন্দেহ নেই ; আর গূঢ়ভাবে তার অণুতে অণুতে যে রস সঞ্চারিত হয়, যে রসের সঞ্চারণই হচ্ছে গাছের যথার্থ প্রাণশক্তি, সেটা স্থূল নয়, কঠিন নয়, বাহিরে সুস্পষ্ট প্রত্যক্ষ নয় বলেই তাকে খর্ব করা সত্যদৃষ্টির অভাব-বশতই ঘটে। গুঁড়ির সত্যটা রসের সত্যের চেয়ে বড়ো নয়, গুঁড়ির সত্য রসের সত্যের উপরেই নির্ভর করে— এই কথাটা আমাদের মনে রাখতে হবে।

যখন দেখতে পাব যে আমাদের দেশে সংগীত ও সাহিত্যের ধারা বদ্ধ হয়েছে, তখন বুঝব দেশে প্রাণশক্তির স্রোতও অবরুদ্ধ হয়ে গেছে। সেই প্রাণশক্তিকে নানা শাখা-প্রশাখায় পূর্ণভাবে বহমান করে রাখবার জন্যেই, বিশ্বের গভীর কেন্দ্র থেকে যে অমৃতরসধারা উৎসারিত হচ্ছে তাকে

আমাদের আবাহন করে আনতে হবে। ভগীরথ যেমন ভস্মীভূত সগরসন্তানদের বাঁচাবার জন্যে পুণ্যতোয়া গঙ্গাকে মর্ত্যে আমন্ত্রণ করে এনেছিলেন, তেমনি মানসলোকের ভগীরথেরা প্রাণহীনতার মধ্যে অমৃতত্ব সঞ্চারিত করবার জন্য আনন্দরসের বিচিত্র ধারাকে বহন করে আনবেন।

সমস্ত বড়ো বড়ো জাতির মধ্যেই এই কাজ চলছে। চলছে বলেই তারা বড়ো। পার্লামেন্টে, বাণিজ্যের হাটে, যুদ্ধের মাঠে, তাঁরা বুক ফুলিয়ে তাল ঠুকে বেড়ান বলেই তাঁরা বড়ো তা নয়। তাঁরা সাহিত্যে সংগীতে কলাবিদ্যায় সকল দেশের মানুষের জন্যে সকল কালের রসস্রোত নিত্যপ্রবহমান করে রাখছেন বলেই বড়ো।

জ্যৈষ্ঠ ১৩২৯

ছাত্রদের প্রতি সম্ভাষণ

বিদেশযাত্রার প্রাক্কালে প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্রগণের অভিনন্দনে কথিত বক্তৃতার একাংশ

বাংলা দেশে নতুন একটা ভাব গ্রহণ করবার সাহস ও শক্তি আছে এবং আমরা তা বুঝিও সহজে। কেননা অভ্যাসের জড়তার বাধা আমরা পাই না। এটা আমাদের গর্বের বিষয়। নতুন ভাব গ্রহণ করা সম্বন্ধে বুদ্ধির দিক থেকে বাধা থাকলে ক্ষতি নেই, কিন্তু জড় অভ্যাসের বাধা পাওয়া বড়ো দুর্ভাগ্যের বিষয়। এই জড় অভ্যাসের বাধা অন্য প্রদেশের চেয়ে বাংলা দেশে কম বলে আমি মনে করি। প্রাচীন ইতিহাসেও তাই। বাংলায় যত ধর্মবিপ্লব হয়েছে তার মধ্যেও বাংলা নিজমাহাত্ম্যের বিশিষ্ট প্রকাশ দেখিয়েছে। এখানে বৌদ্ধধর্ম বৈষ্ণবধর্ম বাংলার যা বিশেষ রূপ, গৌড়ীয় রূপ, তাই প্রকাশ করেছে। আর-একটা খুব বিস্ময়কর জিনিস এখানে দেখা যায়— হিন্দুস্থানী গান বাংলায় আমল পায় নি। এটা আমাদের দৈন্য হতে পারে। অনেক ওস্তাদ আসেন বটে গোয়ালিয়র হতে, পশ্চিমদেশ দক্ষিণদেশ হতে, যাঁরা আমাদের গান বাদ্য শেখাতে পারেন, কিন্তু আমরা সে-সব গ্রহণ করি নি। কেননা আমাদের জীবনের স্রোতের সঙ্গে তা মেলে না। আকবর শা'র সভায় তানসেন যে গান গাইতেন সাম্রাজ্যমদগর্বিত সম্রাটের কাছে তা উপভোগের জিনিস হতে পারে, কিন্তু আমাদের আপনার হতে পারে না। তার মধ্যে যে কারুনৈপুণ্য ও আশ্চর্য শক্তিমত্তা আছে তাকে আমরা ত্যাগ করতে পারি নে, কিন্তু তাকে আমাদের সঙ্গে মিশ খাইয়ে নেওয়া কঠিন। অবশ্য, নিজের দৈন্য নিয়ে বাংলা দেশ চুপ করে থাকে নি। বাংলা কি গান গায় নি? বাংলা এমন গান গাইলে যাকে আমরা বলি কীর্তন। বাংলার সংগীত সমস্ত প্রথা— সংগীতসম্বন্ধীয় চিরাগত প্রথার নিগড় ছিন্ন করেছিল। দশকুশী বিশকুশী কত তালই বেরোল, হিন্দুস্থানী তালের সঙ্গে তার কোনোই যোগ নেই। খোল একটা বেরোল, যার সঙ্গে পাখোয়াজের কোনো মিল নেই। কিন্তু, কেউ বললে না এটা গ্রাম্য বা অসাধু। একেবারে মেতে গেল সব— নেচে কুঁদে হেসে ভাসিয়ে দিলে। কত বড়ো কথা! অন্য প্রদেশে তো এমন হয় নি। সেখানে হাজার বৎসর আগেকার পাথরে-গাঁথা কীর্তিসমূহ যেমন আকাশের আলোককে অবরুদ্ধ করে রেখেছে, তেমনি সংগীত সম্বন্ধেও সজীব চেষ্টা প্রতিহত হয়েছে। বাংলা দেশের সাহস আছে, সে মানে নি চিরাগত প্রথাকে। সে বলেছে, 'আমার গান আমি গাইব।' সাহিত্যেও তাই। এখানে হয়তো অত্যুক্তি করবার একটা ইচ্ছা হতে পারে, কেননা আমি নিজে সাহিত্যিক বলে গর্বানুভব করতে পারি। ছন্দ ও ভাব সম্বন্ধে আমাদের গীতিকাব্য যে-একটা স্বাতন্ত্র্য ও সাহসিকতা দেখিয়েছে অন্য দেশে তা নেই।

হয়তো আমার অজ্ঞতাবশত আমি ভুল করেও থাকতে পারি— কোনো কোনো হিন্দিগান আমি শুনেছি যাতে আশ্চর্য গভীরতা ও কাব্যকলা আছে, কিন্তু আমার বিশ্বাস আমাদের বৈষ্ণব কবিরা ছন্দ ও ভাব সম্বন্ধে খুব দুঃসাহসিকতা দেখিয়েছেন। প্রচলিত শব্দ ভেঙে চুরে বা একেবারে অগ্রাহ্য করে— যাতে তাঁদের সংগীত ধ্বনিত হয়, ভাবের স্রোত উদ্‌বেল হয়ে ওঠে, তেমনি শব্দ তাঁরা তৈরি করেছেন। আমি তুলনা করে কিছু বলব না, কেননা আমি সকল প্রদেশের সাহিত্যের কথা জানি নে। কিন্তু গান সম্বন্ধে আমার কোনো সন্দেহ নেই যে, বাংলা দেশ আপনার গান আপনি গেয়েছে। ভারতবর্ষের অন্যত্র যা সম্পদ আছে তা আমরা নিশ্চয়ই গ্রহণ করব, কিন্তু তুলনা-দ্বারা মূল্যবানের যথার্থ মূল্য যাচাই করে নেব। সুতরাং হিন্দুস্থানী সংগীত শিক্ষা দেবার আমি পক্ষপাতী, কিন্তু এ কথা আমি বলব না যে— 'যা হয়ে গেছে তা আর হবে না'। হয়তো সেটাই উৎকৃষ্ট মনে করে কিছুদিন তার অনুবর্তিতা করতেও পারি, কিন্তু তা টিঁকবে না। তাকে নিজস্ব করে, জীবনের স্রোতের কলধ্বনির সঙ্গে সুর বেঁধে নিয়ে ব্যবহার করতে হবে— নইলে তা টিঁকবে না। আগেও হিন্দুস্থানী গানের চর্চা হয়েছে বটে, কিন্তু তেমন করে নেয় নি। আমাদের দেশের শৌখিন ধনী লোকেরা হিন্দুস্থানী গায়কদের আহ্বান করে আনতেন, কিন্তু বাংলার হৃদয়ের অন্তঃপুরে সে গান প্রবেশ করে নি— যেমন বাউল আর কীর্তন এ দেশকে প্লাবিত করে দিয়েছিল।

আশ্বিন ১৩৩১

নিখিলবঙ্গসংগীতসম্মেলন

২৭ ডিসেম্বর ১৯৩৪, ১১ পৌষ ১৩৪১ তারিখে কলিকাতা সিনেট হাউসে অল বেঙ্গল মিউজিক কনফারেন্সের উদ্‌বোধন-বক্তৃতা[১]

আজ এখানে এসে আমি শুধু এই কথাই বলব যে, এখানে আমার বলার কী যোগ্যতা আছে। বস্তুত যাকে ধ্রুবপদ্ধতি-সংগীত বলা হয় সে সম্বন্ধে স্বীকার করতেই হবে যে, আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা সংকীর্ণ— সেইজন্য আজকের দিনে এই সভায় অবতরণিকার কর্তব্যের ভার যে আমি নিয়েছি তার দায়িত্ব তাঁদের যাঁরা এই ভার দিয়েছেন।

এখানে প্রবেশ করবার প্রারম্ভে আমার কোনো তরুণ বন্ধু অনুরোধ করেছেন সংগীত সম্বন্ধে আমার যা মত তা দীর্ঘ করে এই সুযোগে যেন ব্যাখ্যা করি। তাঁর অনুরোধ পালন করা নানা কারণে আমার অসাধ্য হবে। আজ সকালেই আমি আর-একটি কর্তব্য পালন করে এসেছি— প্রবাসী-বঙ্গসাহিত্যসম্মেলনের উদ্‌বোধন করে; সেখানে তেমন কুণ্ঠা বোধ করি নি, কেননা তাতে আমি অভ্যস্ত। সেখানের যত সুখ, যত দুঃখ, যত খ্যাতি, যত অখ্যাতি, তা আজ পঞ্চাশ বৎসর ধরে বরণ করে এসেছি। সেখানে গিয়ে আমাকে পড়তে হয়েছে, তাতে দুর্বল শ্বাসযন্ত্রের প্রতি অত্যাচার হয়েছে। আর অত্যাচার করলে ধর্মঘটের আশঙ্কা আছে।

---

[১] অনুলেখন নিখুঁত মনে হয় না। সংকলনকালে কয়েক ক্ষেত্রে নিরর্থক শব্দ ত্যাগ করিতে হইয়াছে বা বন্ধনী-মধ্যে আনুমানিক এরূপ শব্দ বসাইতে হইয়াছে যাহা কবির বক্তব্য ও বাচনভঙ্গি -সম্মত। পরিশ্রমের স্থলে পারিপার্শ্বিকের যে স্থলে সে, পারিপার্শ্বিক স্থলে পারিপার্শ্বিকের, বর্ধনের স্থলে সর্জনের (সৃজনের) রূপে স্থলে রূপে এবং দৃষ্টি স্থলে সৃষ্টি— সম্ভবপর পাঠ বলিয়া মনে হওয়া আশ্চর্য নয়।

দ্বিতীয় কথা, সংগীত এমন একটি বিষয় যা নিয়ে সংসারে প্রায়ই পণ্ডিতে পণ্ডিতে এমন দ্বন্দ্ব বাধে যার সমাপ্তি হয় অপঘাতে। অনেক সময় তম্বুরা গদার কার্য করে— সুরাসুরের এমন যুদ্ধ বাধে যা প্রায় য়ুরোপের মহাযুদ্ধের সমকক্ষ। প্রাচীনকালে সংগীত বিষয়ে যে যা বলেছেন সে সম্বন্ধে জ্ঞানের গভীরতা আমার নাই, কাজেই সে সমস্যা আমি এখানে তুলব না। পরবর্তী বক্তারা সে সম্বন্ধে বলবেন। আমি সাধারণভাবে বললে সকলের কাছে তা গ্রাহ্য হবে কি না জানি না, কিন্তু প্রাচীন শাস্ত্রের প্রতি অশ্রদ্ধা না করে আমার মন্তব্য সরল ভাষায় বলব।

সংগীত একটি প্রাণধর্মী জিনিস এবং প্রাণের প্রকাশ তার মধ্যে আছে এ কথা বলা বাহুল্য। চতুর্দিকের [পারিপার্শ্বিকের] ক্রিয়াবান প্রত্যুত্তর এবং [সে] যা পেয়েছে তার চেয়ে বেশি কিছু পাবার জন্য অন্তরের দাবি, প্রেরণা— এই দুইটি লক্ষণকে মিলিয়ে সংগীতের তত্ত্বকে প্রয়োগ করতে ইচ্ছা করি। যে স্পর্শ আমাদের প্রতিনিয়ত হচ্ছে তারই প্রত্যুত্তররূপে আমাদের চিত্ত থেকে এটা প্রকাশ পায়। প্রাণের যে ধর্ম, সংগীতেরও হবে সেই ধর্ম। তা যদি হয় তা হলে আমাদের এ কথা চিন্তা করতে হবেই যে ক্রমাগত পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে প্রাণের যে গতি প্রতিনিয়ত অগ্রসর হচ্ছে তার কল্লোল, তার ধ্বনি, একটা কোনো নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে আবদ্ধ থাকতে পারে না। এক সময় মোগলের আমলে রাজৈশ্বর্য যখন উচ্ছ্বসিত— সেই সময় তানসেন প্রভৃতি সুধীগণ সংগীতের যে রূপ দিয়েছিলেন তা তৎকালীন সাম্রাজ্যের সহিত জড়িত। তখনকার কালে শ্রোতাদের কানে যে গান যথার্থ তাঁদের নিজের অন্তরের জিনিস হবে, সেই গানই তাঁরা উপহার দিয়েছিলেন। তা তৎকালীন পারিপার্শ্বি[কের] ক্রিয়াবান প্রত্যুত্তর। সেই surroundings যে আজকে নেই এ কথা নিঃসন্দেহ। বৈদিক যুগে এক রকম সংগীত ছিল— 'সামগান'। সেই সামগান নিঃসন্দেহে তখনকার যাঁরা সাধক ছিলেন তাঁদের হৃদয় থেকে উচ্ছ্বসিত হয়েছিল— বিশেষ রূপ নিয়ে তখনকার ক্রিয়াকর্ম যজ্ঞে তা রসরূপ পেয়েছে ও পূর্ণতা লাভ করেছে। পরবর্তীকালে তা এত দূরে গিয়ে পড়েছে যে তখনকার সেই সামগান কিরকম ছিল তা আমরা নিঃসংশয়ে বলতে পারি না। তার পর এল কালিদাস বিক্রমাদিত্যের যুগ। তখনকার সংগীত নৃত্য গীত বিশেষত্ব লাভ করেছিল সেই সময়কার গভীর সাম্রাজ্যগৌরব এবং আবেষ্টনীর মধ্য দিয়ে। আনন্দ যখন হয়ে উঠেছিল অভ্রভেদী, তখন তারই অনুরূপ সংগীত যে জন্মেছিল তাতে সন্দেহ নেই।

কিন্তু, বাংলা দেশের একটা বিশেষত্ব আছে ; বাঙালি ভাবপ্রবণ জাতি। এই ভাবের উচ্ছ্বাস যখন প্রবল হয়ে ওঠে তখন সে আপনাকে প্রকাশ করে। তার প্রকৃতিতে যখন উদ্‌বৃত্ত হয়, তখন সেই শক্তি যায় [সর্জনের] দিকে। পরিমিতভাবে যখন ফলে তখন আপনাকে সে প্রকাশের সম্পদ পায় না। সেই হৃদয়াবেগ যখন তীর ছাপায় তখন সে উচ্ছ্বাসকে সে গানে নৃত্যে উচ্ছ্বসিত করে। দেখুন বৈষ্ণব-সংগীতে— সমস্ত হিন্দুস্থানী সংগীতকে পিছনে ফেলে বাঙালির প্রাণ আপনার সংগীতকে উদ্‌ভাসিত করেছে, যেহেতু তার ভেতরের হৃদয়াবেগ সহজ মাত্রা ছাড়িয়ে উঠেছিল, আপনাকে প্রকাশ না করে পারে নি। যে কীর্তন বাঙালি গেয়েছিল তা তৎকালীন পারিপার্শ্বি[কের] ক্রিয়াবান প্রত্যুত্তর। সে তার প্রাণের ধর্ম প্রকাশ করেছে এবং আরো পাবার জন্য দাবি করেছে। এটা আমার কাছে গৌরবের বিষয় বলে মনে হয়। বাইরের স্পর্শে যেই কোনো উদ্দীপনা তাকে জাগিয়ে

ভুলেছে, অমনি সে সৃষ্টির জন্য উদ্‌গ্রীব হয়েছে। সাহিত্য তার প্রমাণ। আজকের দিনের বাঙালি— যে বাঙালি একদিন এই কীর্তনের মধ্যে, লোকসংগীতের মধ্যে বিশেষত্ব প্রকাশ করেছে— সে কি আজ নূতন কিছু দেবে না? সে কি কেবলই পুনরাবৃত্তি করবে?

ক্লাসিক্যাল আমাদের কাছে দাবি করে নিখুঁত পুনরাবৃত্তি। তানসেন কী গেয়েছেন জানি না, কিন্তু আজ তাঁর গানে আর-কেউ যদি পুলকিত হন, তবে বলব তিনি এখন জন্মেছেন কেন? আমরা তো তানসেনের সময়ের লোক নই, আমরা কি জড়পদার্থ? আমাদের কি কিছুমাত্র নূতনত্ব থাকবে না? কেবল পুনরাবৃত্তিই করব?

আমার দেশবাসীর কাছে আমার নিবেদন এই যে, পুনরাবৃত্তির পথ চলা আমাদের অভ্যাস নয়। নূতনের পথে ভুল করে যাওয়াও ভালো— তাতে...পরিপূর্ণতা আনে।

আমি স্বীকার করব ক্লাসিক্যাল সংগীতের সৌন্দর্যের সীমা নেই, যেমন অজন্তার মতো কারুকার্য আর কোথাও হয় কি না সন্দেহ। কিন্তু, ছোটো ছেলের মতো তার উপর দাগা বুলিয়ে বুলিয়ে পুন [রায়] চিত্রিত করা, সেই কি আমাদের ধর্ম? সেই কি আমাদের আদর্শ? যে পূর্ণতা পূর্বতন [রূপে] আপনাকে প্রকাশ করেছে সেই পূর্ণতাকে উত্তীর্ণ হয়ে আপনাকে যদি প্রকাশ করতে না পারি, তা হলে ব্যর্থ হল আমাদের শিক্ষা। বড়ো বড়ো লোক...শিক্ষা দিয়েছেন— 'তোমরা অনুপ্রেরণা লাভ করো— সেই অনুপ্রেরণাকে তোমাদের শক্তিতে প্রকাশ করো।' তানসেন অনুকরণের কথা বলেন নি এবং কোনো গুণীই তা বলেন নি, বলতে পারেন না।

আজকের দিনে য়ুরোপ অদ্ভুত দুঃসাহসের সঙ্গে নূতন নূতন পথে আপনাকে উন্মুক্ত করতে চলেছে। অন্তরের মধ্যে তাদের কী সে ব্যাকুলতা! তাদের সে প্রকাশ রূঢ় হতে পারে, কুশ্রী হতে পারে, কিন্তু তা যুগের প্রকাশ— তা প্লাবনের প্রকাশ। আমাদেরও তাই দরকার। যদি দেখি হল না, তা হলে বুঝব প্রাণ জাগে নি। আজ পর্যন্ত আমরা [স্বকীয়?] ভাষায় স্বকীয় ভাবে ভাবতে পারি নি। ধিক্‌ আমাদের। তাদের প্রদর্শিত পথে চললে আমরা মোক্ষলাভ করব? না— কখনোই না। এই-যে গতানুগতিকতা এটা সম্পূর্ণ অশ্রদ্ধেয়। সকল রকম প্রকাশের মধ্যে যুগের প্রকাশ, আত্মপ্রকাশ, হওয়া চাই। কত রকম যুগের বাণী, কত দুঃখ, কত আঘাত আমাদের উপর পড়েছে। তার কিছু কি আমরা রেখে যাব না? একশো বছর পরে আমাদের ভবিষ্যৎ বংশকে আমাদের নব জাগরণের চিত্র কী দেখাব? তাদের কি আমরা এক হাজার বছরের পুরাতন জিনিস দেখাব? ইংরাজের নিজের প্রকৃতিগত রাষ্ট্রনীতিকে দূর দেশ থেকে নিয়ে এসে রোপণ করাব, আর এই কথাই ভবিষ্যৎকে জানাব? আজ চাই নূতনের সন্ধান। তার গান, তার রূপ, তার কাব্য, তার ছন্দ আমাদের মধ্য দিয়ে উদ্‌বুদ্ধ হবে। এই যদি হয় তবে বাঙালি হবে ধন্য। নকলে চলবে না। আমাদের সংগীত, চিত্রকলা, রাষ্ট্রনীতি, আমাদের আপন হোক এই আমার বলার কথা।

আমি বলব আমি কাউকে জানি না, কাউকে মানি না—আমরা যা-কিছু [সৃষ্টি] করি-না কেন, তার মধ্যে ভারতীয় ধারা আপনি [থেকে] যাবে। আমাদের...সেই ভারতীয় প্রকৃতি তেমনি আছে যেমন পূর্বতন কালে কীর্তনগানে বাউলে ছিল। সেই রকম আজ যদি বাঙালি আপনাকে সংগীতে চিত্রকলায় প্রকাশ করতে ইচ্ছা করে তবে সেই প্রকৃতিকে লঙ্ঘন করতে পারবে না, যদি একমাত্র লক্ষ্য থাকে যা-কিছু করবে নিজেকে মুক্ত করে—নকল করে নয়।

১২ পৌষ ১৩৪১

গীতালি

৩০ জুন ১৯৪০, ১৬ আষাঢ় ১৩৪৭, তারিখে কথিত বক্তৃতার অনুলেখন[১]

আজ আমার উপর ভার পড়েছে এই অনুষ্ঠানে তোমাদের কাছে গান সম্বন্ধে কিছু বুঝিয়ে দেওয়া। গান শেখা ভালো এ কথা বলা সহজ, যেমন সহজ বলা যে, চুরি করা ভালো নয়। মেয়েদের গলার গান কানে ভালো শুনায়— এ তো সাদা কথা, ধরা কথা— তাতে আবহাওয়া বেশ একটু সুমধুর হয়।

গানের কথা আমি বলি গানেতেই, গানের কথা আমাকে ফের যদি বলতে হয় ভাষাতে, তবে আমার উপর কি জুলুম হয় না? পুরানো পুঁথিপত্র খুঁজলে দেখবে গান সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ কী বলেছে— যথেষ্ট বলেছে।

আজ বাংলাদেশে গানে একটা খেলো ভাব এসে পড়েছে। কারণ, গান নিয়ে দোকানদারি প্রবল হয়ে পড়েছে। আমি তো ভীত হয়ে পড়েছি। দোকানের মাপেতে দর অনুসারে বাঁকাচোরা করে তার রস-টস চেপেচুপে চলেছে আমারই গান।

এক সময় ছিল যখন, যাঁরা ওস্তাদ তাঁদেরই ছিল গানের ব্যবসায়। তখন গানের যা মূল্য তা তাঁরাই বুঝতেন। তখন টেক্‌নিক্যাল গান ছিল চলতি এবং তার ঠিকমতো সুর তান মান হল কি না তাঁরাই বুঝতেন।

কিন্তু যারা খেটে খায়, অফিসে যায়, তাদের পক্ষে এ-সব গান হয়ে ওঠে না ; তাদের পক্ষে ওস্তাদের মতো গলা সাধা শক্ত। সেইজন্য এখনকার গান ব্যবসাদারির বাইরে থাকাই ভালো। আমার গান আপন মনের গান— তাতে আনন্দ পাই, শুনলে আনন্দ হয়। গান হবে যাতে, যারা আশেপাশে থাকে তারা খুশি হয় ; আত্মীয়স্বজন যারা অফিস থেকে আসছে, দূর থেকে শুনতে পেলেও, এটা তাদের জন্যও ভালো। ঘরে মাঝে মাঝে ঝগড়াও তো হয়— গান ঘরের মধ্যে মাধুরী পাওয়ার জন্যে, বাইরের মধ্যে হাততালি পাবার জন্যে নয়। ওস্তাদ যাঁরা তাঁদের জন্যে ভাবনা নেই ; ভাবনা হচ্ছে যারা গানকে সাদাসিধেরূপে মনের আনন্দের জন্য পেতে চায় তাদের জন্যে। যেমন তোমাদের টি-পার্টি যাকে বলে, সেখানে যারা সাহেবী মেজাজের লোক তাদের কানে কি ভালো লাগবে? এখানে রবীন্দ্রনাথের হালকা গান, সহজ সুর, হয়তো ভালো লাগবে। তাই বলি আমার গান যদি শিখতে চাও, নিরালায়, স্বগত, নাওয়ার ঘরে কিংবা এমনি সব জায়গায়, গলা ছেড়ে গাবে। আমার আকাঙ্ক্ষার দৌড় এই পর্যন্ত— এর...বেশি ambition মনে নাই রাখলে।

বাল্যকালে আমাদের ঘরে ওস্তাদের অভাব ছিল না ; সুদূর থেকে, অযোধ্যা গোয়ালিয়র ও মোরাদাবাদ থেকে, ওস্তাদ আসত। তা ছাড়া বড়ো বড়ো ওস্তাদ ঘরেও বাঁধা ছিল। কিন্তু আমার একটা গুণ আছে— তখনো কিছু শিখি নি, মাস্টারির ভঙ্গি দেখালেই দৌড় দিয়েছি। যদুভট্ট আমাদের গানের মাস্টার আমায় ধরবার চেষ্টা করতেন। আমি তাঁর ঘরের সামনে দিয়ে দৌড় দিতাম। তিনি আমাদের কানাড়া গান শিখাতে চাইতেন। বাংলাদেশে এরকম ওস্তাদ জন্মায় নি। তাঁর প্রত্যেক গানে একটা originality ছিল, যাকে আমি বলি স্বকীয়তা। আমি অত্যন্ত 'পলাতকা' ছিলুম বলে কিছু শিখি নি, নইলে কি তোমাদের কাছে আজকে খাতির কম হত? এ ভুল যদি না করতুম, পালিয়ে না বেড়াতুম, তা হলে আজকে তোমাদের মহলে কি নাম হত না? সেটা হয়ে উঠল না, তাই আমি এক কৌশল করেছি— কবিতার-কাছঘেঁষা সুর লাগিয়ে দিয়েছি। লোকের

---

[১] 'যাঁরা বুঝত' 'তাঁরা খুশি হয়' একরূপ কতকগুলি 'পাঠ' বর্তমান সংকলনে সংশোধিত।

মনে ধাঁধা লাগে ; কেউ বলে সুর ভালো, কেউ বলে কথা ভালো, সুরের সঙ্গে কথা, কবি কি না। কবির তৈরি গান, এতে ওস্তাদি নেই। ভারতীয় সংগীত ব'লে যে-একটা প্রকাণ্ড ব্যাপার আছে, আমার জন্মের পর তার-নাকি ক্ষতি হয়েছে— অপমান নাকি হয়েছে। তার কারণ আমার অক্ষমতা। বাল্যকালে আমি গান শিখি নি— এত সহজে শেখা যায় না, শিখতে কষ্ট হয়, সেই কষ্ট আমি নেই নি। সেজদাদা শিখতেন বটে— তিনি সুর ভাঁজছেন তো ভাঁজছেনই, গলা সাধছেন তো সাধছেনই, সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত। হয়তো বর্ষাকাল— মেঘলা হয়েছে— আমার তখন একটু কবিত্ব [জাগল]। তবু যা শুনতাম হয়তো মনে থাকত।

[এইখানে রবীন্দ্রনাথ একটি গান করেন]

খুব মনে পড়ে এই গান যেদিন শিখি। বড়দাদা সেজদাদারা দরজা বন্ধ করে গান শিখতেন। ছেলেমানুষ, আমার তথায় প্রবেশ ছিল না। কারণ, তখনকার দিনে ছেলেমানুষের অনেক অপরাধ ছিল। তানপুরোর কান কখনো মুড়ি নি। তবু দরজার পাশে কান দিয়ে শুনেছি, সেটা হয়তো মনে রয়ে গেল। এমনি করে ছুঁয়ে ছুঁয়ে যা শিখেছি তাই তোমাদের কাছে আওড়ালাম। তোমাদের যা দিয়েছি, এই ছুঁয়ে ছুঁয়ে যা শিখেছি তাই দিয়েছি।

আমার গান যাতে আমার গান ব'লে মনে হয় এইটি তোমরা কোরো। আরো হাজারো গান হয়তো আছে— তাদের মাটি করে দাও-না, আমার দুঃখ নেই। কিন্তু তোমাদের কাছে আমার মিনতি— তোমাদের গান যেন আমার গানের কাছাকাছি হয়, যেন শুনে আমিও আমার গান বলে চিনতে পারি। এখন এমন হয় যে, আমার গান শুনে নিজের গান কি না বুঝতে পারি না। মনে হয় কথাটা যেন আমার, সুরটা যেন নয়। নিজে রচনা করলুম, পরের মুখে নষ্ট হচ্ছে, এ যেন অসহ্য। মেয়েকে অপাত্রে দিলে যেমন সব-কিছু সইতে হয়, এও যেন আমার পক্ষে সেই রকম।

[১]বুলাবাবু, তোমার কাছে সানুনয় অনুরোধ— এঁদের একটু দরদ দিয়ে, একটু রস দিয়ে গান শিখিয়ো— এইটেই আমার গানের বিশেষত্ব। তার উপরে তোমরা যদি স্টিম রোলার চালিয়ে দাও, আমার গান চেপ্টা হয়ে যাবে। আমার গানে যাতে একটু রস থাকে, তান থাকে, দরদ থাকে ও মীড় থাকে, তার চেষ্টা তুমি কোরো।

আলাপ-আলোচনা

রবীন্দ্রনাথ ও দিলীপকুমার রায়

২৯ মার্চ ১৯২৫

...কবিবর হেসে বললেন, 'তোমার সংগীত সম্বন্ধে লেখা আজ বিজলীতে পড়ছিলাম।'

আমি জিজ্ঞাসুনয়নে তাঁর দিকে চাইলাম। কারণ, আমি তাঁকে একটি চিঠিতে কিছুদিন আগে লিখেছিলাম যে, সম্ভবত হিন্দুস্থানী গান সম্বন্ধে তাঁর সঙ্গে আমার কোনো মতভেদ নেই যেটা বাংলা গান সম্বন্ধে আছে।

---

[১] 'বুলাবাবু' : গীতালির অন্যতম উদ্যোক্তা প্রফুল্লচন্দ্র মহলানবিশ।

কবিবর বললেন, 'তোমার লেখার সঙ্গে মূলত আমি একমত। যারা রসরূপের লাবণ্যে মজে জগতে তাদের সংখ্যা অল্প, যারা বাহাদুরিতে ভোলে তাদের সংখ্যাই বেশি। এইজন্য অধিকাংশ ওস্তাদই কসরত দেখিয়ে দিগ্‌বিজয় করে বেড়ায়। ছেলেবেলায় আমি একজন বাঙালি গুণীকে দেখেছিলাম, গান যাঁর অন্তরের সিংহাসনে রাজমর্যাদায় ছিল— কাষ্ঠের দেউড়িতে ভোজপুরী দরোয়ানের মতো তাল-ঠোকাঠুকি করত না ; তাঁর নাম তোমরা শুনেছ নিশ্চয়ই। তিনি বিখ্যাত যদুভট্ট, যাঁর কাছে রাধিকাবাবু কিছু শিখেছিলেন।'

আমি বললাম, 'কিন্তু আপনার কি তাঁর গান মনে আছে? খুব ছেলেবেলায় আমাদের সংগীত সম্বন্ধে খুব অন্তর্দৃষ্টি থাকে না ; কাজেই আমার বোধ হয় সে সময়ে উচ্চসংগীতে আমাদের হৃদয় কেমন সাড়া দেয় সেটাও ভালো স্মরণ থাকার কথা নয়।'

কবিবর বললেন, 'কিন্তু আমার স্মৃতিতে এখনো সে সংগীতের রেশ লুপ্ত হয় নি। যদুভট্টের জীবনের একটি ঘটনা বলি শোনো। ত্রিপুরার বীরচন্দ্র মানিক্য তাঁর গানের বড়ো অনুরাগী ছিলেন। একবার তাঁর সভায় অভ্যাগত একজন হিন্দুস্থানী ওস্তাদ নটনারায়ণ রাগে একটি ছোটো গান গেয়ে যদুভট্টর কাছে তারই জুড়ি একটি নটনারায়ণ গানের প্রত্যাশা করেন।

'যদুভট্টর সে রাগটি জানা ছিল না। কিন্তু তিনি পরদিনেই নটনারায়ণ শোনাবেন বলে প্রতিশ্রুত হলেন। ওস্তাদজী গাইলেন। যদুভট্টের কান এমনি তৈরি ছিল যে তিনি সেই দিনই রাতে বাড়ি গিয়ে চৌতালে নটনারায়ণ রাগে একটি গান বাঁধলেন ও পরদিন সভায় এসে সকলকে শুনিয়ে মুগ্ধ করে দিয়েছিলেন। তাঁর রচিত সেই সুরে জ্যোতিদাদা একটি বাংলা গান রচনা করেছিলেন।'

ব'লে কবিবর গুন গুন করে সে সুরটি একটু গেয়ে শোনালেন।

আমি বললাম, 'এ রকম গায়ক এক-একজন করে যাচ্ছেন তাতে দুঃখ করা এক রকম বৃথা, কারণ গায়কও সংগীতের খাতিরে কিছু অমর হতে পারেন না। তবে আক্ষেপের বিষয় হচ্ছে এই যে, আমাদের দেশে সংগীতরাজ্যে একজন গুণী গেলে তাঁর স্থান পূর্ণ করবার লোক আর মেলে না। আমাদের দেশে গায়কদের মধ্যে যথার্থ শিল্পী ক্রমেই যে কী রকম বিরল হয়ে উঠছে তা জানেন এক যথার্থ সংগীতানুরাগী। য়ুরোপে এ রকমটা হয় না। সেখানে এক গায়ক যায় বটে, কিন্তু তার স্থানে অন্য গায়ক জন্মায়।'

কবিবর বললেন, 'তা সত্য।' বলে একটু চুপ করে বললেন, 'আজ তোমার সঙ্গে একটা আলাপ করতে চাই।'

আমি সাগ্রহে বললাম, 'বলুন।'

কবিবর বললেন, 'অনেক সময়ে আমরা পরস্পরের মধ্যে যে মতভেদের কল্পনা করি, আলোচনা করতে গিয়ে দেখা যায় তার অনেকখানিই ফাঁকি। বাংলা ও হিন্দুস্থানী গান নিয়ে তোমার সঙ্গে আমার মতভেদ যদি বা থাকে তা হলে অন্তত তার সীমাটি স্পষ্ট করে নির্দিষ্ট হওয়া ভালো। নইলে সত্যের চেয়ে ছায়াটা বড়ো হয়ে অমিলটা প্রকাণ্ড দেখতে হয়। গোড়াতেই একটা কথা জোর করে ব'লে রাখি, ছেলেবেলা থেকে ভালো হিন্দুস্থানী গান শুনে আসছি বলে তার মহত্ত্ব ও মাধুর্য সমস্ত মন দিয়েই স্বীকার করি। ভালো হিন্দুস্থানী গানে আমাকে গভীরভাবে মুগ্ধ করে।'

আমি বললাম, 'এ কথাটা আমার ভারি ভালো লাগল। আর, আপনার মতন গুণগ্রাহী শিল্পীমনের কাছে আমি তো এই'ই আশা করেছিলাম। আপনার 'জীবনস্মৃতি'তে হিন্দুস্থানী সংগীত সম্বন্ধে একটা যথার্থ অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায়। তবে অনেকের আপনার সহজ হালকা সুরের গান শুনে উল্‌টো ধারণা জন্মে থাকে যে, ওস্তাদি সংগীতের আপনি বিরোধী।'

কবিবর বললেন, 'মোটেই না। হিন্দুস্থানী সংগীতের যে-একটি উদার বিশেষত্ব, যেটাকে তুমি বলেছ সুরের মধ্য দিয়ে শিল্পীর নিত্যনিয়ত নব নব সৌন্দর্যসৃষ্টির স্বাধীনতা— সেটা য়ুরোপের সংগীতের সঙ্গে তুলনা করে আরো স্পষ্ট বুঝতে পারি।'

আমি বললাম, 'এটা খুবই ঠিক। আমারও য়ুরোপে অনেকবার মনে হয়েছিল যে, আমাদের শুধু সংগীত নয়, সভ্যতায়ও, ভারতীয় বৈশিষ্ট্যটি ঠিক-ঠিক বুঝতে হলে একবার পাশ্চাত্য সভ্যতার বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে পরিচয় লাভ করা খুব দরকার। নইলে আমাদের বিশিষ্ট দানটি সম্বন্ধে আমাদের ঠিক যেন চোখ ফোটে না।'

কবিবর বললেন, 'সত্যি কথা। কিন্তু একটা বিষয় আমি তোমাকে আজ একটু বিশেষ করে বলতে চাই। তুমি এটা কেন মানবে না যে, হিন্দুস্থানী সংগীতের ধারার বিকাশ যে ভাবে হয়েছে, আমাদের বাংলা সংগীতের ধারা সে ভাবে বিকাশ লাভ করে নি? এ দুটোর মধ্যে প্রকৃতিভেদ আছে। বাংলার সংগীতের বিশেষত্বটি যে কী তার দৃষ্টান্ত আমাদের কীর্তনে পাওয়া যায়। কীর্তনে আমরা যে আনন্দ পাই সে তো অবিমিশ্র সংগীতের আনন্দ নয়। তার সঙ্গে কাব্যরসের আনন্দ একাত্ম হয়ে মিলিত।'

আমি বললাম, 'কিন্তু সুর—'

কবিবর বললেন, 'কীর্তনে সুরও অবশ্য কম নয়; তার মধ্যে কারুনিয়মের জটিলতাও যথেষ্ট আছে। কিন্তু, তা সত্ত্বেও কীর্তনের মুখ্য আবেদনটি হচ্ছে তার কাব্যগত ভাবের, সুর তারই সহায় মাত্র। এ কথাটা আরো স্পষ্ট বোঝা যায় যদি কীর্তনের প্রাণ অর্থাৎ আঁখর কী বস্তু সেটা একটু ভেবে দেখা যায়। সেটা শুধু কথার তান নয় কি? হিন্দুস্থানী সংগীতে আমরা সুরের তান শুনে মুগ্ধ হই, সংগীতের সুরবৈচিত্র্য তানালাপে কেমন মূর্ত হয়ে উঠতে পারে সেইটেই উপভোগ করি— নয় কি? কিন্তু, কীর্তনে আমরা পদাবলীর মর্মগত ভাবরসটিকেই নানা আঁখরের মধ্য দিয়ে বিশেষ করে নিবিড়ভাবে গ্রহণ করি। এই আঁখর, অর্থাৎ বাক্যের তান, অগ্নিচক্র থেকে স্ফুলিঙ্গের মতো কাব্যের নির্দিষ্ট পরিধি অতিক্রম করে বর্ষিত হতে থাকে। সেই বেগবান অগ্নিচক্রটি হচ্ছে সংগীত-সম্মিলিত কাব্য। সংগীতই তাকে সেই আবেগবেগের তীব্রতা দিয়েছে যাতে করে নূতন নূতন আঁখর তা থেকে ছিটিয়ে পড়তে পারে। গীতহীন কাব্য যেখানে স্তব্ধ থাকে সেখানে আঁখর চলে না। বিদ্যাপতি-পাঠ-কালে পাঠক তাতে নূতন বাক্য যোজনা করলে ফৌজদারি চলে। কারণ, পাঠক তো বিদ্যাপতি নয়। কিন্তু ছন্দোবদ্ধ বিশুদ্ধ কাব্য হিসাবে আঁখরে যে দৈন্য অনিবার্য, কীর্তনের সুরের ঐশ্বর্য সেটাকে পূরণ করে দেয় ব'লেই সেটাতে রসের সহায়তা করে। অতএব দেখা যাচ্ছে কীর্তনে— সুরে বাক্যে অর্ধনারীশ্বর যোগ হয়েছে। যোগের এই দুই অঙ্গের মধ্যে কে বড়ো কে ছোটো সে বিচারের চেষ্টা করা উচিত নয়। উভয়ের যোগে যে সৌন্দর্য সম্পূর্ণতা লাভ করেছে, উভয়কে বিচ্ছিন্ন করে দিলে সেই সৌন্দর্যকেই হারাতে হবে। জলের থেকে অক্সিজেন্‌কেই নিই বা হাইড্রোজেন্‌কেই নিই, তাতে জলটাই যায় মারা। বাংলা পদগান জলেরই মতো যৌগিক সৃষ্টি, তা দুইয়ে মিলে অখণ্ড। হিন্দুস্থানী গান রূঢ়িক, তা একাই বিশুদ্ধ। সৃষ্টি ব্যাপারে রূঢ়িক শ্রেষ্ঠ না যৌগিক শ্রেষ্ঠ এ তর্কের কোনো অর্থ নেই। ভালো যা তা ভালো ব'লেই ভালো— রূঢ়িক ব'লেও না, যৌগিক ব'লেও না।'...

আমি বললাম, 'বাংলার-যে কাব্যে একটা নিজস্ব দান আছে এ কথা কে না মানবে? কিন্তু, তাই ব'লে কি প্রমাণ হয় যে আমাদের সংগীতের বৈশিষ্ট্য থাকতে পারে না। আমাদের দেশে বড়ো বড়ো কবি জন্মেছেন সত্য; কিন্তু তা থেকে তো সিদ্ধান্ত করা চলে না যে, আমাদের দেশে

সংগীতকার জন্মাতেই পারে না। আমাদের দেশে ধরুন যদুভট্ট, অঘোর চক্রবর্তী, রাধিকা গোস্বামী, সুরেন্দ্র মজুমদার প্রমুখ বড়ো বড়ো গায়কও তো জন্মেছেন? তবে?'

রবীন্দ্রনাথ বললেন, 'জন্মেছেন বটে, কিন্তু তাঁরা কেবলমাত্র গাইয়ে, অর্থাৎ সুর-আবৃত্তিকার, হিন্দুস্থানীর কাছ থেকে শিখে। হিন্দুস্থানীদের মধ্যে বিশুদ্ধ সংগীতে একটা স্বাভাবিক স্ফূর্তি আছে, যেটা তাদের একটা সত্যকার সম্পদ, ধার-করা জিনিস নয়। কাজেই এ উৎসব তাদের মধ্যে সহজে শুকিয়ে যেতে পারে না। কিন্তু, আমাদের দেশে বিশুদ্ধ সংগীতে, অর্থাৎ হিন্দুস্থানী সংগীতে, বড়ো গায়ক মানে কী জান? যেন খাল কেটে জল আনা, যা একটু দৃষ্টি না রাখলেই শুকিয়ে যেতে বাধ্য। ওদের দেশে কিন্তু বিশুদ্ধ সংগীতের বিকাশ খাল কেটে টেনে আনা নয়, নদীর স্রোতের মতনই স্বচ্ছন্দগতি— চলার চালেই মাতোয়ারা।'...'

রবীন্দ্রনাথ একটু থেমে আবার বলতে আরম্ভ করলেন, 'বাংলার বৈশিষ্ট্য যে অবিমিশ্র সংগীতে নয় তার একটা প্রমাণ যন্ত্রসংগীতের ক্ষেত্রে মেলে। সংগীতের বিশুদ্ধতম রূপ কিসে? না, যন্ত্রসংগীতে। এ কথা তো অস্বীকার করা চলে না? কিন্তু, দেখো, বাংলা দেশ কখনো হিন্দুস্থানীদের মতো যন্ত্রীর জন্ম দিয়েছে কি? আরো দেখো ওরা কেমন অকিঞ্চিৎকর কথা গানের মধ্যে অম্লানবদনে চালিয়ে দেয়। অক্ষমতাবশত নয়, সুরের তুলনায় তাদের কাছে কথার খাতির কম ব'লে। বাঙালি ভাগ্যদোষে কুকাব্য লিখতে পারে, কিন্তু অকাব্য লিখতে কিছুতেই তার কলম সরবে না। 'সামলিয়ানে মোরি এঁদোরিয়া চোরিরে!' এঁদোরিয়া মানে বুঝি জলের ঘড়ার বিড়ে। শ্যামচাঁদ সেটি চুরি করেছেন, কাজেই তার অভাবে শ্রীরাধার জল আনার মহা অসুবিধা ঘটছে। এইটেই হল সংগীতের বাক্যাংশ। অপর পক্ষে বাঙালি কবি এঁদোরিয়া চুরি নিয়ে পুলিস-কেসের আলোচনা করতে পারে, কিন্তু গান লিখতে পারে না।'

...আমি বললাম, 'এ কথা আমি মানি। কিন্তু তাই ব'লে কি আপনি বলতে চান যে ওদের গান শেখা আমাদের পণ্ডশ্রম মাত্র?'

কবিবর জোরের সঙ্গে বলে উঠলেন, 'কখনোই নয়। আমরা কি ইংরেজি শিখি না? শিখি তো? কেন শিখি? ইংরেজি সাহিত্যকে আমাদের সাহিত্যে হুবহু নকল করবার জন্য নয়। তার রসপানে আমাদের ভাষা ও সাহিত্যের অন্তর্গূঢ় স্বকীয় শক্তিকেই নূতন উদ্যমে ফলবান করে তোলবার জন্যে। রেনেসাঁস-যুগে ইংরেজি সাহিত্য ধাক্কা পেয়েছিল ইটালি থেকে, কিন্তু তার জাগরণটা তার নিজেরই। শেক্‌স্‌পিয়রের অধিকাংশ নাট্যবস্তুই বিদেশের আমদানি, কিন্তু তাই ব'লেই শেক্‌স্‌পিয়রের রচনা ইংরেজি সাহিত্যে চোরাই মাল এমন কথা তো বলা চলে না। গানের ক্ষেত্রেও ঠিক তাই; হিন্দুস্থানী সংগীত ভালো করে শিখলে তা থেকে আমরা লাভ না করেই পারব না। তবে এ লাভটা হবে তখনি যখন আমরা তাদের দানটা যথার্থ আত্মসাৎ করে তাকে আপন রূপ দিতে পারব। তর্জমা করে বা ধার করে সত্যিকার রসসৃষ্টি হয় না; সাহিত্যেও না, সংগীতেও না।'

আমি বললাম, 'তা তো বটেই। তবে কোনো সভ্যতার দানই তো অনড় অচল থাকতে পারে না। তাই, বাঙালির গান কেন হিন্দুস্থানী সংগীত থেকে লাভ করবে না! এ লাভ করাই তো স্বাভাবিক; কারণ সত্য লাভে তো মৌলিকতা নষ্ট হয় না, অনুকরণেই হয়। আমরা আমাদের নিত্য-নতুন বিচিত্র অভিজ্ঞতা দিয়েই তো শিল্পজগতে নতুন সৃষ্টি করে থাকি? এবং এতেই তো

---

[১] সে সময়ে কবির সঙ্গে এ ক্ষেত্রে সায় দিতে পারি নি— আজ বুঝেছি যে, কবিই ঠিক বলেছিলেন, আমার ধারণাই ছিল কাঁচা।
—সাঙ্গীতিকী (১৯৩৮), পৃ ১৫১

সমৃদ্ধতর হার্মনি গড়ে ওঠে?'

কবিবর বললেন, 'ওঠেই তো। দেখো, য়ুরোপীয় সভ্যতার সংস্পর্শে কি আমরা একটা নতুন সমৃদ্ধি লাভ করি নি? না, যদি না করতাম তবে সেটাই বাঞ্ছনীয় হত?'

আমি বললাম, 'অবান্তর হলেও এখানে আপনাকে একটা প্রশ্ন করি। অনেকে বলেন যে, অমুক বাঙালি নাট্যকারই হচ্ছেন সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি সাহিত্যিক। যুক্তি জিজ্ঞাসা করলে তাঁরা উত্তর দেন যে, বর্তমান বাংলা সাহিত্যিকদের মধ্যে এক তাঁর মধ্যেই য়ুরোপের বিন্দুমাত্রও প্রভাব প্রতিফলিত হয় নি। আমার সত্যিই আশ্চর্য মনে হয় যখন আমি বিজ্ঞ ও বুদ্ধিমান লোকের মুখেও অম্লানবদনে এরূপ যুক্তি প্রযুক্ত হতে শুনি। এরূপ কূপমণ্ডূকতা বোধ হয় আমাদের দেশে যে রকম নির্বিচারে হাততালি পায় অন্য কোনো সভ্যদেশে সেভাবে গৃহীত হতে পারে না— নয় কি? আমার তো ব্যক্তিগতভাবে পিতৃদেবের ভাষা, refinement, সমৃদ্ধ রসিকতা, আপনার অপূর্ব লিখনভঙ্গি বা শরৎবাবুর লেখাও— সে খাঁটি বাঙালি সাহিত্যিকের লেখার চেয়ে ঢের উচ্চশ্রেণীর লেখা মনে হয়। আপনার কি মনে হয় না যে, এ রকম নিয়ত 'খাঁটি বাঙালি হও' 'খাঁটি বাঙালি হও' করে চীৎকার করা শুধু সাহিত্যিক chauvinism মাত্র?'

কবিবর বললেন, 'তা তো বটেই। দুর্গম গিরিশিখরের উৎস থেকে যে আদি নির্ঝরটি ক্ষীণ ধারায় বইছে তাকেই বিশুদ্ধ গঙ্গা ব'লে মানব আর যে ভাগীরথী উদার ধারায় সমুদ্রে এসে মিলেছে, তার সঙ্গে পথে বহু উপনদীর মিশ্রণ ঘটেছে ব'লে তাকেই অশুদ্ধ ও অপবিত্র বলব— এমন কথা নিশ্চয়ই অশ্রদ্ধেয়। প্রাণের একটা শক্তি হচ্ছে গ্রহণ করার শক্তি, আর-একটা শক্তি হচ্ছে দান করার। যে মন গ্রহণ করতে জানে না সে ফসল ফলাতেও জানে না, সে তো মরুভূমি। যদি বাঙালির বিরুদ্ধে কেউ এ অভিযোগ আনে যে, তার মনের উপর য়ুরোপীয় সভ্যতা সব আগে প্রভাব বিস্তার করেছে, তা হলে আমি তো অন্তত তাতে বিন্দুমাত্রও লজ্জা পাই না, বরং গৌরব বোধ করি। কারণ, এই'ই জীবনের লক্ষ্য।'

আমি বললাম, 'আপনার কথাগুলি আমার ভারি ভালো লাগল। আর্টজগতে চিন্তারাজ্যের একটু খবর রাখলেই তো দেখা যায় যে, এক সভ্যতা নিত্য অপর সভ্যতা থেকে নূতন সম্পদের খোরাক জুগিয়ে নিয়েছে— নয় কি? তাই যে দু-চার জন লোক থেকে থেকে তারস্বরে রোদন করে ওঠেন যে 'গেল গেল— য়ুরোপীয় সভ্যতার সংস্পর্শে এসে বাঙালির বাঙালিত্ব ঘুচে গেল', তাঁদের সে আর্তনাদে অন্তত আমার মন তো সাড়া দিতে চায় না।'

কবিবর বললেন, 'তা তো বটেই। তা ছাড়া কোন্‌টা বাঙালির আর কোন্‌টা বাঙালির নয়, তার বিচার শোনবার জন্য আমরা কি কোনো স্পেশাল ট্রিবিউনালের মুখ তাকিয়ে থাকব? বাঙালি গ্রহণ-বর্জনের দ্বারাই আপনি তার বিচার করছে। হাজার প্রমাণ দাও-না যে, বিজয়বসন্ত বাংলার বিশুদ্ধ কথাসাহিত্য, বঙ্কিমের নভেল বিশুদ্ধ বঙ্গীয় বস্তু নয়, তবু বাংলার আবালবৃদ্ধবনিতা বিজয়বসন্তকে ত্যাগ করে বিষবৃক্ষকে গ্রহণ করার দ্বারাই প্রমাণ করছে যে, ইংরাজি-সাহিত্য-বিশারদ বঙ্কিমের নভেল বাংলার নিজস্ব জিনিস। আমি তো একবার তোমার পিতার গানের সম্বন্ধে লিখেছিলাম যে, তাঁর গানের মধ্যেও য়ুরোপীয় আমেজ যদি কিছু এসে থাকে তবে তাতে দোষের কিছু থাকতে পারে না, যদি তার মধ্য দিয়ে একটা নূতন রস ফুটে উঠে বাঙালির রূপ গ্রহণ করে।[১] আর দেখো য়ুরোপীয় সভ্যতা আমাদের দুয়ারে এসেছে ও আমাদের পাশে শতবর্ষ

---

[১] দ্রষ্টব্য : 'সোনার কাঠি' প্রবন্ধ, রচনাবলী ১৮, পৃ ৫২১ (সুলভ সং ৯ খণ্ড, পৃ ৬৩৫)।

বিরাজ করেছে। আমি বলি— আমরা কি পাথর না বর্বর যে, তার উপহারের ডালি প্রত্যাখ্যান করে চলে যাওয়াই আমাদের ধর্ম হয়ে উঠবে? যদি একান্ত অবিমিশ্রতাকেই গৌরবের বিষয় বলে গণ্য করা হয়, তা হলে বনমানুষের গৌরব মানুষের গৌরবের চেয়ে বড়ো হয়ে দাঁড়ায়। কেননা, মানুষের মধ্যেই মিশল চলছে, বনমানুষের মধ্যে মিশল নেই।'[১]

আমি বললাম, 'আপনার এ কথাগুলি আমাকে ভারি স্পর্শ করেছে। আমারও মনে হত যে, এ বিষয়ে এ বাঙালি এ অ-বাঙালি ব'লে তারস্বরে চীৎকার করা মূঢ়তা, কষ্টিপাথর হচ্ছে— আনন্দের গভীরতা ও স্থায়িত্ব।'

কবিবর বললেন, 'নিশ্চয়। আমি বলি এই কথা যে, যখন কোনো কিছু হয়, ফুটে ওঠে, তখনি সেইটাই তার চরম সমর্থন। যদি একটা নূতন সুর দেশ গ্রহণ করে, তখন ওস্তাদ হয়তো আপত্তি করতে পারেন। তিনি তাঁর মামুলি ধারণা নিয়ে বলতে পারেন, 'এঃ, এখানটা যেন— যেন— কী রকম অন্যরূপ শোনালে— এখানে এ পর্দাটা লাগল যে!' আমি বলব, 'লাগলই বা।' রস-সৃষ্টিতে আসল কথা 'কেন হল' এ প্রশ্নের জবাবে নয়, আসল কথা 'হয়েছে' এই উপলব্ধিটিতে।'

আমি গানের প্রসঙ্গে ফিরে আসার জন্য বললাম, 'এপর্যন্ত আপনার সঙ্গে আমার মতভেদ তো কিছুই নেই। আমি কেবল আপনার গানের সুরে একটা অনড় রূপ বজায় রাখার বিরোধী। আমি বলি গায়ককে আপনার গানের সুরের variation করবার স্বাধীনতা দিতে হবে।'

রবীন্দ্রনাথ বললেন, 'এইখানেই তোমার সঙ্গে আমার মতভেদ। আমি যে গান তৈরি করেছি তার ধারার সঙ্গে হিন্দুস্থানী সংগীতের ধারার একটা মূলগত প্রভেদ আছে— এ কথাটা কেন তুমি স্বীকার করতে চাও না? তুমি কেন স্বীকার করবে না যে, হিন্দুস্থানী সংগীতে সুর মুক্তপুরুষভাবে আপনার মহিমা প্রকাশ করে, কথাকে শরিক বলে মানতে সে যে নারাজ— বাংলায় সুর কথাকে খোঁজে, চিরকুমারব্রত তার নয়, সে যুগলমিলনের পক্ষপাতী। বাংলার ক্ষেত্রে রসের স্বাভাবিক টানে সুর ও বাণী পরস্পর আপস করে নেয়, যেহেতু সেখানে একের যোগেই অন্যটি সার্থক। দম্পতির মধ্যে পুরুষের জোর, কর্তৃত্ব, যদিও সাধারণত প্রত্যক্ষভাবে প্রবল, তবুও উভয়ের মিলনে যে সংসারটির সৃষ্টি হয় সেখানে যথার্থ কে বড়ো কে ছোটো তার মীমাংসা হওয়া কঠিন। তাই মোটের উপর বলতে হয় যে, কাউকেই বাদ দিতে পারি নে। বাংলার সংগীতের সুর ও কথার সেইরূপ সম্বন্ধ। হয়তো সেখানে কাব্যের প্রত্যক্ষ আধিপত্য সকলে স্বীকার করতে বাধ্য নয়, কিন্তু কাব্য ও সংগীতের মিলনে যে বিশেষ অখণ্ড রসের উৎপত্তি হয় তার মধ্যে কাকে ছেড়ে কাকে দেখব তার কিনারা পাওয়া যায় না। হিন্দুস্থানী গানে যদি কাব্যকে নির্বাসন দিয়ে কেবল অর্থহীন তা-না-না ক'রে সুরটাকে চালিয়ে দেওয়া হয় তা হলে সেটা সে গানের পক্ষে মর্মান্তিক হয় না। যে রসসৃষ্টিতে সংগীতেরই একাধিপত্য সেখানে তানকর্তবের রাস্তা যতটা অবাধ, অন্যত্র, অর্থাৎ যেখানে কাব্যসংগীতের একাসনে রাজত্ব সেখানে, তেমন হতেই পারে না। বাংলা সংগীতের, বিশেষত আধুনিক বাংলা সংগীতের, বিকাশ তো হিন্দুস্থানী সংগীতের ধারায় হয় নি। আমি তো সে দাবি করছিও না। আমার আধুনিক গানকে সংগীতের একটা বিশেষ মহলে বসিয়ে তাকে একটা বিশেষ নাম দাও-না, আপত্তি কী! বটগাছের বিশেষত্ব তার ডাল-আবডালের বহুল বিস্তারে, তালগাছের বিশেষত্ব তার সরলতায় ও শাখা-পল্লবের বিরলতায়। বটগাছের আদর্শে তালগাছকে

---

[১] সাঙ্গীতিকী গ্রন্থের 'সুর ও কথার রফা' প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সহিত নিজের কথোপকথনে এখানেই ছেদ টানিয়া (পৃ. ১৫৪) লেখক মন্তব্য করেন : এর মধ্যে সার কথাটি অনুধাবনীয় যে, বাংলা গানে একরোখা সুরবিহার নামঞ্জুর। কারণ, এ গানকে বলা যেতে পারে কাব্যসংগীত...

বিচার কোরো না। বস্তুত তালগাছ হঠাৎ বটগাছের মতো ব্যবহার করতে গেলে কুশ্রী হয়ে ওঠে। তার ঋজু অনাচ্ছন্ন রূপটিতেই তার সৌন্দর্য। সে সৌন্দর্য তোমার পছন্দ না হয় তুমি বটতলার আশ্রয় করো— আমার দুই'ই ভালো লাগে, অতএব বটতলায় তালতলায় দুই জায়গাতেই আমার রাস্তা রইল। কিন্তু তাই ব'লে বটগাছের ডাল-আবডাল-গুলোকে তালের গলায় বেঁধে দিয়ে যদি আনন্দ করতে চাও তা হলে তোমার উপর তালবনবিলাসীদের অভিসম্পাত লাগবে।'

আমি বললাম, 'এখানে আপনার কথাগুলো সম্বন্ধে আমার কিছু বলবার আছে। প্রথমত আমি বলতে চাই এই কথা যে, আপনি যে উপমাটিকে এত বড়ো করে তুললেন সেটি মনোজ্ঞ হলেও কলাকারুর আপেক্ষিক বিচারে এরূপভাবে উপমাকে প্রধান করাতে মূল বিষয়টি সম্বন্ধে অনেক সময় একটু ভুল বোঝার সহায়তা করা হয় ব'লে আমার অনেক সময়ে মনে হয়। ধরুন, হিন্দুস্থানী সুর ও বাংলা গান দুটো সম্পূর্ণ আলাদা জিনিস এ কথা আপনিই বেশি জোর করে বলছেন। অথচ, উপমা দিচ্ছেন দুটো গাছের সঙ্গে, যেন হিন্দুস্থানী সংগীত ও বাংলা সংগীতের মধ্যে প্রকৃতি-ভেদটি অনেকটা বটের শাখাপত্র ও তালের ঋজু রূপের মধ্যে প্রভেদেরই মতন। কিন্তু বস্তুতই কি এ দুই সংগীতের প্রকৃতি-ভেদটি এইরূপ? অন্তত এটা স্বতঃসিদ্ধবৎ ধরে নেওয়া চলে না, এটা প্রমাণসাপেক্ষ, এটা তো মানেন? তবে এ কথা যাক। আমি শুধু আর্টের ক্ষেত্রে রিলেটিভ মূল্য-নির্ধারণ উপমার একান্ত বিশ্বাসযোগ্যতার উপর খুব নির্ভর করা সব সময়ে ঠিক নয় এই কথাটিই বলতে চাই। এখন আমি আপনার মূল যুক্তির সম্পর্কে দু-চারটি কথা বলব। আপনি যে ভাবে রচয়িতার অনুভূতিটিকেই প্রামাণ্য বলে মনে করছেন আমি স্বীকার করি কোনো শিল্প বা শিল্পীর সৃষ্টিকে সে ভাবে দেখা যেতে পারে। কিন্তু, আর-একটা view-pointও আছে, যেটা নিতান্ত অগভীর নয়, এ কথাও আপনাকে স্বীকার করতে হবে। আনাতোল ফ্রান্‌স্‌ কোথায় বেশ বলেছেন যে, 'প্রত্যেক সুকুমার' সাহিত্যের একটা মস্ত মহিমা এই যে, প্রতি পাঠক তার মধ্যে নিজেকেই দেখে। আপনার কবিতার আবেদনও যে বিভিন্ন লোকের কাছে বিভিন্ন রকমের হতে বাধ্য এ কথা তো আপনাকে মানতেই হবে। তা হলে গানের ক্ষেত্রেই বা তা না হবে কেন? আমার তো মনে হয় শিল্পীর শিল্পসৃষ্টির ভিতরকার কথাটা— শিল্পের মধ্য দিয়ে একটা বিশ্বজনীনতার তারে আঘাত দেওয়া। অর্থাৎ আমার মনে হয় আসল কথা নানা লোকে আপনার কবিতার মধ্যে দিয়ে কত রকম suggestion-এর খোরাক সংগ্রহ করে। আপনি ঠিক কী ভেবে আপনার নানান কবিতা লিখেছেন বা নানা গান রচনা করেছেন সেটা তো গ্রহীতার কাছে সব চেয়ে বড়ো কথা নয়— বিশেষত যখন একজন কখনোই অপর কারুর প্রাণটি ঠিক ধরতে পারে না। আপনি নিজেই কি লেখেন নি যে কবিকে লোকে যেমন ভাবে কবি তেমন নয়? তাই আমার মনে হয় যে, সব চেয়ে বড়ো কথা হচ্ছে আপনার কবিতা বা গানের মধ্য দিয়ে ভিন্ন ভিন্ন লোকে কী রকম ভিন্ন ভিন্ন রস সঞ্চয় করে। এ কথাটার খুব extreme সিদ্ধান্তটিও আমার কাছে ভুল মনে হয় না। অর্থাৎ, যদি একজন যথার্থ শিল্পী আপনার কোনো গানকে সম্পূর্ণ নতুন সুরে গেয়ে আনন্দ পান ও পাঁচজনকে আনন্দ দেন, এমন-কি তা হলেও আপনার তাতে দুঃখ না পেয়ে আনন্দই পাওয়া উচিত বলে আমি মনে করি। কেননা, আর্টের কষ্টিপাথর হচ্ছে আনন্দের গভীরতা। অথচ, আপনি বলতে পারেন যে, এ ক্ষেত্রে আপনার গানের মধ্যে 'আপনি' যে সুরটি ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছিলেন সেটা বজায় রইল না। মান্‌লাম। কিন্তু— কিছু মনে করবেন না— তাতে কি সত্যই খুব আসে যায়? বিশেষত যখন ভারতীয় গানের ধারায় শিল্পী চিরকাল কম-বেশি স্বাধীনতা পেয়ে এসেছেন এ কথা আপনি অস্বীকার করতে পারেন না।'

কবিবর বললেন, 'না, এ কথা আমি অস্বীকার করি না বটে। কিন্তু, তাই বলে তুমি কি বলতে চাও যে, আমার গান যার যেমন ইচ্ছা সে তেমনিভাবে গাইবে? আমি তো নিজের রচনাকে সেরকম ভাবে খণ্ডবিখণ্ড করতে অনুমতি দেই নি। আমি যে এতে আগে থেকে প্রস্তুত নই। যে রূপসৃষ্টিতে বাহিরের লোকের হাত চালাবার পথ আছে তার এক নিয়ম, আর যার পথ নেই তার অন্য নিয়ম। মুখের মধ্যে সন্দেশ দাও— খুশির কথা। কিন্তু, যদি চোখের মধ্যে দাও তবে ভীম নাগের সন্দেশ হলেও সেটা দুঃসহ। হিন্দুস্থানী সংগীতকার, তাঁদের সুরের মধ্যকার ফাঁক গায়ক ভরিয়ে দেবে এটা যে চেয়েছিলেন। তাই কোনো দরবারী কানাড়ার খেয়াল সাদামাটা ভাবে গেয়ে গেলে সেটা নেড়া-নেড়া না শুনিয়েই পারে না। কারণ, দরবারী কানাড়া তানালাপের সঙ্গে গেয়, সাদামাটা ভাবে গেয় নয়। কিন্তু আমার গানে তো আমি সেরকম ফাঁক রাখি নি যে, সেটা অপরে ভরিয়ে দেওয়াতে আমি কৃতজ্ঞ হয়ে উঠব।'

আমি বললাম, 'মাফ করবেন কবিবর! আপনার এ কথাগুলির মধ্যে অনেকখানি সত্য থাকলেও এর বিপক্ষে দু-চারটে কথা বলার আছে। প্রথম কথা এই যে, আপনার সন্দেশের উপমাটি আপনার অনুপম উপমাশক্তির একটা সুন্দর দৃষ্টান্ত হলেও, এতেও আবার সেই ভুল বোঝার প্রশ্রয় দেওয়া হতে পারে এ আশঙ্কা আমার হয়। কারণটা একটু খুলে বলি। সন্দেশ চোখে দিলে তা দুঃসহ হয় মানি, কিন্তু সেটা স্বতঃসিদ্ধ বলে নয় এ কথা খুব জোর করেই বলা যেতে পারে। অর্থাৎ সন্দেশ চোখে দিলে দুঃসহ হয় এই কারণে যে, এটা মানুষ পরীক্ষা করে দেখছে নইলে অন্তত ভোজনবিলাসীর পক্ষে নিখরচায় একটা বাড়তি ভোজনেন্দ্রিয় লাভ হলে তাতে তার বোধ হয় আপত্তি হত না। বাংলা গান সম্বন্ধেও ঐ কথা। বাংলা গান যথেষ্ট তান দিয়ে গাওয়া যদি অসমীচীন হয় তবে সেটা এক 'ফলেন পরিচীয়তে'ই হতে পারে— আগে থাকতে স্বতঃসিদ্ধ বলে গণ্য হতে পারে না। কারণ, যদি কেউ আপনাকে গেয়ে দেখিয়ে দিতে পারে যে, বাংলা গান যথেষ্ট তানালাপের সঙ্গে গাইলেও তা পরম সুশ্রাব্য হয়ে উঠতে পারে, তা হলে তো আপনার সত্যের খাতিরে স্বীকার করে নিতেই হবে যে, হিন্দুস্থানী ও বাংলা গানের মধ্যে যে-একটা অনপনেয় গণ্ডি আপনি টানতে চান সেটা সীতাহরণের গণ্ডির মতন অলঙ্ঘ্য নয়। অর্থাৎ, গায়কের মধ্যে শুধু প্রয়োগজ্ঞানের অভাবেই এ সাময়িক গণ্ডির সৃষ্টি। শ্রেষ্ঠ শিল্পী এ গণ্ডি অতিক্রম করলেও সীতার মতন বিপদে না পড়ে যথেচ্ছ বিচরণ করতে পারেন। আমি শুধু তর্কের জন্য এ নিছক 'যদি'র আশ্রয় নিচ্ছি মনে করবেন না, এটা অনেক ক্ষেত্রেই সম্ভব দেখেছি ব'লেই এ 'যদি'বাদ করলাম জানবেন। তবে সে কথা যাক। আমি আর-একটা কথা আপনাকে বলতে চাই ও সেটা এই যে, আপনার শত আশঙ্কা ও সতর্কতা সত্ত্বেও আপনার গানকে আপনি তার মৌলিক সুরের গণ্ডির মধ্যে টেনে রাখতে পারবেন বলে আমার মনে হয় না। আপনার গানেরই একজন ভক্ত আগে আমার সঙ্গে ঠিক এই কথা বলেই তর্ক করতেন যে, যদি আপনার গানে প্রত্যেক গায়ককে তার স্বাধীন সৃষ্টির অবসর দেওয়া হয় তা হলে আপনার সুরের আর কিছু থাকবে না। কিন্তু সেদিন তিনিও আমার কাছে স্বীকার করলেন যে, আপনার 'সীমার মাঝে অসীম তুমি'-রূপ সহজ সুরটিও একজন তাঁর সামনে এমন বিকৃত করে গেয়েছিলেন যে, তার গ্রাম্যতা না শুনলে কল্পনা করাও কঠিন। আমারও মনে হয় না যে, আপনি শুধু ইচ্ছা করলেই আপনার মৌলিক সুর হুবহু বজায় থেকে যাবে। আপনি কখ্‌খনো পারবেন না, এ আমি আগে থেকেই বলে রাখছি। যদি আমাদের গান harmonized হত ও ঠিক য়ুরোপীয়দের মতন সর্বদা স্বরলিপি দেখে গাওয়া হত, তা হলে হয়তো আপনি যা চাইছেন তা সাধিত হতে পারত। কিন্তু আমাদের গান যে অন্তত শীঘ্র এ ভাবে

গৃহীত হতে পারে না এটা যদি আপনি মেনে নেন তা হলে বোধ হয় আপনার স্বীকার না করেই গত্যন্তর নেই যে, আপনি যেটা চাইছেন সেটা কার্যক্ষেত্রে সংগঠিত হওয়া অসাধ্য না হোক, একান্ত দুঃসাধ্য তো বটেই। আর, তানালাপের স্বাধীনতা না দিলেই কি আপনি আপনার গানের কাঠামোটা হুবহু বজায় রাখতে পারবেন মনে করেন? সহজ সুরের ধরাকাঠের মধ্যে কি বিকৃতি কম হয়। আপনার অনেক সহজ গানও আমি এ ভাবে গাইতে শুনেছি যে, মাফ করবেন, তা সত্যিই vulgar শোনায়। তবে আশা করি এ কথাটি ব্যবহার করার জন্য আমাকে ভুল বুঝবেন না।'

কবিবর একটু ম্লান হেসে বললেন, 'না, না, আমি তোমায় ভুল বুঝি নি মোটেই। তুমি যা বলছ তা আমারও যে আগে মনে হয় নি তা নয়। আমার গানের বিকার প্রতিদিন আমি এত শুনেছি যে আমারও ভয় হয়েছে যে, আমার গানকে তার স্বকীয় রসে প্রতিষ্ঠিত রাখা হয়তো সম্ভব হবে না। গান নানা লোকের কণ্ঠের ভিতর দিয়ে প্রবাহিত হয় বলেই গায়কের নিজের দোষগুণের বিশেষত্ব গানকে নিয়তই কিছু-না-কিছু রূপান্তরিত না করেই পারে না। ছবি ও কাব্যকে এই দুর্গতি থেকে বাঁচানো সহজ। ললিতকলার সৃষ্টির স্বকীয় বিশেষত্বর উপরই তার রস নির্ভর করে। গানের বেলাতে তাকে, রসিক হোক অরসিক হোক, সকলেই আপন ইচ্ছামতো উলট-পালট করতে সহজে পারে বলেই তার উপরে বেশি দরদ থাকা চাই। সে সম্বন্ধে ধর্মবুদ্ধি একেবারে খুইয়ে বসা উচিত নয়। নিজের গানের বিকৃতি নিয়ে প্রতিদিন দুঃখ পেয়েছি বলেই সে দুঃখকে চিরস্থায়ী করতে ইচ্ছা করে না।'...

আমি বললাম, 'আপনি এতে যে কতটা ব্যথা পেয়ে থাকবেন সেটা আমি অনেকটা কল্পনা করতে পারছি। কিন্তু ট্র্যাজিডি তো জগতে আছেই, শিল্পেও আছে, সুতরাং তাকে মেনে নেওয়া ছাড়া উপায়ও নেই। এজন্য আমার মনে হয় যে, যে ট্র্যাজিডি অবশ্যম্ভাবী তাকে নিবারণ করবার প্রয়াস নিষ্ফল। যদি আপনিও বিফল প্রয়াস করতে যান তা হলে আপনার উদ্দেশ্যসিদ্ধি হবে না, হবে কেবল— তার স্থলে একটা অহিত সাধন করা। অর্থাৎ, আপনি এতে করে বাজে শিল্পীর দ্বারা আপনার গানের caricature নিবারণ করতে পারবেন না। পারবেন কেবল সত্য শিল্পীকে তার সৃষ্টিকার্যে বাধা দিতে। কথাটা একটু পরিষ্কার করে বলি। আপনি নিজেই স্বীকার করছেন যে, আপনি চেষ্টা করলেও আপনার মৌলিক সুর বজায় রাখতে পারবেন না। কিন্তু তবু আপনার গানে শিল্পীর নিজের expression দিয়ে গাওয়াটা আপনার কাছে ব্যথার বিষয় বলে অনেক সত্যকার শিল্পী হয়তো আপনার গান তাদের নিজের মতন করে গাইতে চাইবে না। আপনার অনিচ্ছা না থাকলে হয়তো তারা আপনার গানের মূল কাঠামোটা বজায় রেখে তাদের ইচ্ছামতো স্বরবৈচিত্র্যের মধ্য দিয়ে আপনার গানকে একটা নূতন সৌন্দর্যে গরীয়ান করে তুলতে পারত। কিন্তু, আপনার সুর হুবহু বজায় রাখতে হবে—আপনার এই ইচ্ছা বা আদেশের দরুন তাদের নিজেদের অনুভূতির রঙ ফলিয়ে আপনার গান গাওয়া তাদের কাছে একটা সংকোচের কারণ না হয়েই পারবে না। কথাটা একটু ভেবে দেখবেন। শিল্পীকে এ স্বাধীনতা দিলে অবশ্য আপনার গানের মূল ভাবটি (spirit) বজায় রাখা কঠিনতর হবে এ কথা আমি মানি। কিন্তু, যেহেতু সব বড়ো আদর্শেরই উলটো দিকে riskও বড়ো হতে বাধ্য, সেহেতু এ risk-এর গুরুত্বের জন্য তো আদর্শকে ছোটো করা চলে না।'

কবিবর একটু ভেবে বললেন, 'অবশ্য, যারা সত্যকার গুণী তাদের আমি অনেকটা বিশ্বাস করে এ স্বাধীনতা দিতে পারতাম। তবে একটা কথা— না দিলেই বা মানছে কে? দাবী নেই, শুধু দোহাই আছে, এমন অবস্থায় দস্যুকে ঠেকাতে কে পারে? কেবল আমি এ সম্পর্কে তোমাকে

একটা কথা জিজ্ঞাসা করি যে, বাংলা গানে হিন্দুস্থানী সংগীতের মতন অবাধ তানালাপের স্বাধীনতা দিলে তার বিশেষত্ব নষ্ট হয়ে যাবার সম্ভাবনা আছে এ কথা তুমি মান কি না?'

আমি বললাম, 'মানি— যদি বাংলা গানে হুবহু হিন্দুস্থানী গানের তানালাপের পদ্ধতি নকল করা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। আমি এ কথা ইতিপূর্বে লিখেছি যে, বাংলা গানে, বিশেষত কবিত্বময় ও ভাবময় গানে, তানের একটু সংযম করতেই হয়। সেইজন্য বাংলা গানে হিন্দুস্থানী সংগীতের অপূর্ব রস পুরোপুরি আমদানি করা চলে না। কিন্তু, তবু অনেকখানি চলে এ কথা আপনাকে মানতে হবে— বিশেষত সত্যকার শিল্পীর হাতে। কারণ, সত্যকার শিল্পী একটা সহজ সৌষ্ঠবজ্ঞান (sense of proportion) ও সংযমজ্ঞান নিয়ে জন্মান এ কথা বোধ হয় সত্য। আপনি যদি বিখ্যাত রসিক রায়বাহাদুর সুরেন্দ্রনাথ মজুমদারের মুখে আপনারই গান শুনতেন তা হলে বুঝতেন আমি কেন আপনার কাছ থেকে এ স্বাধীনতা চাইছি। অবশ্য, এক শ্রেণীর বাংলা গান আছে যা নিতান্তই সহজ সুরে রচিত ও সহজ সুরেই গেয়। সেগুলির সঙ্গে আমার বিবাদ নেই এবং সেগুলির সম্বন্ধে আমি এ স্বাধীনতা চাইছি না। আমি কেবল বলি এই কথা যে, আর-এক শ্রেণীর বাংলা গান কেন সৃষ্টি করা অসম্ভব হবেই হবে যার মধ্যে হিন্দুস্থানী সংগীতের, সম্পূর্ণ না হোক, অনেকখানি সৌন্দর্যের আমদানি করা চলবে? আমার সম্প্রতি অতুলপ্রসাদ সেনের কতকগুলি গান শুনে আরো বেশি করে মনে হয়েছে যে, এটা শুধু সম্ভব তাই নয়, এটা হবেই। আমি আরো একটু বেশি বলতে চাই যে, এ দিকে বাংলা গানের বিকাশ অনেকটা ইতিমধ্যেই হয়েছে যার হয়তো আপনি সম্পূর্ণ খবর রাখেন না। এবং আমরা হিন্দুস্থানী সংগীতকে নিয়ে একটু উদারভাবে চেষ্টা করলে এ বিকাশ পরে আরো সমৃদ্ধতর হবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস। তাই আমার মোট কথাটি এই যে, বাংলা গান বাংলা বলেই তাতে তান দেওয়া চলবে না এ কথা আমার সংগত মনে হয় না।'

উত্তরে রবীন্দ্রনাথ বললেন, 'আমি তো কখনো এ কথা বলি নি যে, কোনো বাংলা গানেই তান দেওয়া চলে না। অনেক বাংলা গান আছে যা হিন্দুস্থানী কায়দাতেই তৈরি, তানের অলংকারের জন্য তার দাবি আছে। আমি এ রকম শ্রেণীর গান অনেক রচনা করেছি। সেগুলিকে আমি নিজের মনে কত সময়ে তান দিয়ে গাই।' ব'লে কবিবর স্বরচিত একটি ভৈরবী তান দিয়ে গাইলেন।

তার পর তিনি বললেন, 'হিন্দুস্থানী গানের সুরকে তো আমরা ছাড়িয়ে যেতে পারিই না। আমাকেও তো নিজের গানের সুরের জন্য ঐ হিন্দুস্থানী সুরের কাছেই হাত পাততে হয়েছে। আর, এতে যে দোষের কিছুই নেই এ কথাও তো আমি সাহিত্যের উপমা দিয়ে বললাম। কাজে কাজেই হিন্দুস্থানী গান ভালো করে শিখলে তার প্রভাবে যে বাংলা সংগীতে আরো নূতন সৌন্দর্য আসবে এটাই তো আশা করা স্বাভাবিক। তাই তোমরা এ চেষ্টা যদি কর তবে তোমাদের উদ্যোগে আমার অনুমোদন আছে এ কথা নিশ্চয় জেনো। কেবল আমি তোমাকে বাংলার বিশেষত্ব সম্বন্ধে যে-কয়টি কথা বললাম সে কথা-ক'টি মনে রেখো। বাংলার বৈশিষ্ট্য বজায় রেখে কেমন করে নূতন সৌন্দর্য বাংলা সংগীতে ফুটানো যেতে পারে এটা একটা সমস্যা। তবে চেষ্টা করলে এ সমস্যার সমাধানও না মিলেই পারে না। এ কথা স্মরণ রেখে যদি তুমি হিন্দুস্থানী সংগীত assimilate ক'রে বাংলার বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে তার সামঞ্জস্য সাধন করতে পার, তা হলে তুমি সগরের মতনই সুরের সুরধুনী বইয়ে দিতে পারবে— নইলে সুরের জলপ্লাবনই হবে, কিন্তু তাতে তৃষিতের তৃষ্ণা মিটবে না।'

আমি বললাম, 'আপনার সঙ্গে তো দেখছি এখন আমার কোনোই মতভেদ নেই।'

কবিবর তাঁর স্বভাবসিদ্ধ স্নিগ্ধ হাসি হাসলেন।...

২

৮ এপ্রিল ১৯২৫

সকালবেলা। কবিবরকে একটু শ্রান্ত দেখাচ্ছিল, তবে দিন দশেক আগে যতটা শ্রান্ত দেখিয়েছিল ততটা নয়।

আমি বললাম, 'আমি আপনাকে আজ একটা প্রশ্ন করতে চাই। সেটা এই যে, সংগীতের ভাষা বিশ্বজনীন— the language of music is universal ব'লে যে একটা কথা আছে সেটা সত্য কি না। আমার মনে হয় সত্য নয়। এ ধারণা আমার মন থেকে কিছুতেই যাচ্ছে না। আমার এ সংশয়ের প্রধান কারণ এই যে, আমি বার বার দেখেছি যে য়ুরোপীয় সংগীত আমাদের মনে বা ভারতীয় সংগীত ওদের মনে কখনোই একটা খুব বড়ো রকম অনুরণন তুলতে পারে না। এ সম্বন্ধে আমার বিখ্যাত সংগীতরসিক রোম্যাঁ রোলাঁর সঙ্গে প্রায়ই তর্ক হত। তাঁর বার বার বলা সত্ত্বেও আমি আজ অবধি তাঁর কথা বিশ্বাস করতে পারি নি যে, সংগীতের আবেদন দেশ-কাল-পাত্রের অতিরিক্ত।'

রবীন্দ্রনাথ বললেন, 'সকল সৃষ্টির মধ্যেই একটি দ্বৈত আছে ; তার একটা দিক হচ্ছে অন্তরের সত্য, আর-একটা দিক হচ্ছে তার বাহিরের বাহন। অর্থাৎ, এক দিকে ভাব, আর-এক দিকে ভাষা। দুইয়ের মধ্যে প্রাণগত যোগ আছে, কিন্তু প্রকৃতিগত ভেদ দুইয়ের মধ্যে আছে। ভাষা সার্বজনীন নয়, অথচ এই সত্য সার্বজনীন। এই সর্বজাতীয় সম্পদকে আয়ত্ত করতে গেলে তার বিশেষজাতীয় আধারটিকে আয়ত্ত করতে হয়। কবি শেলির কাব্যের সার্বজনীন রসটি উপভোগ করতে গেলে ইংরেজ নামে একটি বিশেষ জাতির ভাষা শিখে নেওয়া চাই। সেই ভাষার সঙ্গে সেই রসের এমনি নিবিড় মিলন যে, দুইয়ের মধ্যে বিচ্ছেদ একেবারেই চলে না। গানের ভিতরকার রসটি সর্বজাতির কিন্তু ভাষা, অর্থাৎ তার বাহিরের ঠাটখানা, বিশেষ বিশেষ জাতির। সেই পাত্রটি যথার্থ রীতিতে ব্যবহারের অভ্যাস যদি না থাকে তবে ভোজ ব্যর্থ হয়ে যায়। তাই ব'লে ভোজের সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ করা অন্যায়। য়ুরোপীয়েরা আপন সংগীতের যে প্রভূত মূল্য দেয় এবং তার দ্বারা যে সুগভীরভাবে বিচলিত হয় সেটা আমরা দেখেছি— এই সাক্ষ্যকে শ্রদ্ধা না করা মূঢ়তা। কিন্তু, এ কথাও মানতে হয় যে, এই সংগীতের রসকোষের মধ্যে প্রবেশ করার ক্ষমতা আমার নেই, কেননা এর ভাষা আমি জানি নে। ভাষা যারা নিজে জানে তারা অন্যের না-জানা সম্বন্ধে অসহিষ্ণু হয়। অনেক সময়ে বুঝতে পারে না না-জানাটাই স্বাভাবিক। ভাষা যখনি বুঝি তখনি রস ও রূপ অখণ্ড এক হয়ে আমাদের কাছে প্রকাশ পায়। কাব্যের ও গানের ভাষা সম্বন্ধে বিশেষ দেশকালের যেমন বিশেষত্ব আছে, ছবির ভাষায় তেমন নেই ; কারণ, ছবির উপকরণ হচ্ছে দৃশ্য পদার্থ—অন্য ভাষার মতন সে তো একটা সংকেত নয় বা প্রতীক নয়। গাছ শব্দটা একটা সংকেত, তার প্রত্যক্ষ পরিচয় শব্দটার মধ্যেই নেই, কিন্তু গাছের রূপরেখা আপন পরিচয় আপনি বহন করে। তৎসত্ত্বেও চিত্রকলার idiom যতক্ষণ না সুপরিচিত হয় ততক্ষণ তার রসবোধে বাধা ঘটে। এই কারণেই চীন জাপান ভারতের চিত্রকলার আদর বুঝতে য়ুরোপের অনেক বিলম্ব ঘটেছে। কিন্তু যখন বুঝেছে তখন idiom থেকে রসকে ছাড়িয়ে নিয়ে বোঝে নি। উভয়কে এক করে তবেই বুঝেছে। তেমনি সংগীতকেও বোঝবার একান্ত বাধা নেই। কিন্তু তার প্রকাশের যে বাহ্যরীতি বিশেষ দেশে বিশেষভাবে গড়ে উঠেছে, তাকে জোর করে ডিঙিয়ে সংগীতকে পূর্ণভাবে পাওয়া অসম্ভব। কোনো আভাসই পাওয়া যায় না তা বলি নে, কিন্তু সে অশিক্ষিতের আভাস নির্ভরযোগ্য নয়।

'এক ভাষায় বিশেষ শব্দের যে বিশেষ নির্দিষ্ট অর্থ আছে অন্য ভাষার প্রতিশব্দে তাকে পাওয়া যায়। কিন্তু তাতে আমাদের ব্যবহারের যে ছাপ লাগে, হৃদয়াবেগের যে রঙ ধরে, সেটা তো অন্য ভাষায় মেলে না। কারণ, চরণকমলকে feet lotus বললে কি কিছু বলা হয়? অথচ এই শব্দটির মধ্যে ভাবের যে সুরটি পাই সেই সুরটি যে-কোনো উপায়ে যে-কেউ পাবে, সেই আনন্দও তার তেমনি সুগম হবে। অতএব এই বাহিরের জিনিসটাকে পাওয়ার অপেক্ষা করতেই হবে, তা হলেই ভিতরের জিনিসটিও ধরা দেবে। আমরা ইংরেজি সাহিত্যের রস অনেকটা পরিমাণেই পাই, তার কারণ— ইংরেজি শব্দের কেবলমাত্র যে অর্থ জানি তা নয়, অনেক পরিমাণে তার সুরটি তার রঙটিও জেনেছি। য়ুরোপীয় সংগীতের ভাষা সম্বন্ধে কিন্তু এ কথা বলতে পারি নে। কীট্‌সের *Ode to a Nightingale*-এ fairy land forlorn-এর perilous sea-র ঊর্ধ্বে magic casement-এর ছবি যে অপূর্বসুন্দর হয়ে প্রকাশ পেয়েছে তাকে আমাদের ভাষায় ব্যক্ত করা অসম্ভব। ওর শব্দগত সংগীত প্রতিশব্দে দুর্লভ বলেই যে এ বাধা, তা নয়। ওদের পরীর দেশের কল্পনার সঙ্গে যে-সমস্ত বিচিত্রতার অনুভাব জড়িয়ে আছে আমাদের তা নেই। কিন্তু কীট্‌সের কবিতার মাধুর্য আমাদের কাছে তো ব্যর্থ হয় নি। কারণ, দীর্ঘকালের অভ্যাস ও সাধনায় আমরা ইংরেজি সাহিত্যের বাহির দরজা পেরিয়ে গেছি। য়ুরোপীয় সংগীতে আমাদের সেই সুদীর্ঘ সাধনা নেই, দ্বারের বাইরে আছি। তাই এটুকু বুঝেছি যে, সংগীতের সৌন্দর্য বিশ্বজনের, কিন্তু তার ভাষার দ্বারী বিশ্বজনের নিমক খায় না।'

আমি বললাম, 'রসের বিশ্বজনীনতার কথা বললেন, কিন্তু রুচিভেদ—'

কবিবর বললেন, 'অবশ্য, রুচিভেদ নিয়ে মানুষ সৃষ্টির আদিমকাল থেকেই বিবাদ করে আসছে।'

আমি বললাম, 'কিন্তু, তা হলে কি বলতে হবে যে, আর্টে absolute values সম্বন্ধে মানুষের মনের মধ্যে অনৈক্যটাই কায়েম হয়ে থাকবে, মতৈক্য কখনো গড়ে উঠবে না?'

কবিবর বললেন, 'উঠবে। তবে সেটার কষ্টিপাথর হচ্ছে কাল। একমাত্র কালই এ বিষয়ে অভ্রান্ত বিচারক। সাময়িক মতামত যে প্রায়ই শিল্পের বা শিল্পীদের relative value সম্বন্ধে ভুল করে বসে এ কথা কে না জানে?'

আমি বললাম, 'ঠিক কথা। শেকস্‌পীয়রের সময়ে লোকে বলত যে, বেন্ জনসন্ তাঁর চেয়ে বড়ো। কিন্তু, আজ আমাদের এ কথা শুনলে হাসি পায়।'

কবিবর হেসে বললেন, 'শেকস্‌পীয়রের দৃষ্টান্তটি খুব সুপ্রযুক্ত। তাঁর সময়ে লোকে তাঁকে বিজ্ঞভাবে মূর্খ ব'লে বেন্ জনসন্‌কে মস্ত পণ্ডিত হিসাবে বড়ো করে ধরতে চেয়েছিল। কিন্তু, দেখছ তো কাল কেমন ধীরে ধীরে আজ বেন্ জনসনেরই উচ্চ আসনে মূর্খ শেকস্‌পীয়রকে বসিয়েছে? তাই, রুচিভেদ নিয়ে আমাদের কালের রায় গ্রহণ করা ছাড়া এ সম্বন্ধে সমস্যার কোনো চরম সমাধান হতে পারে না।'...

৩

শান্তিনিকেতন। ৩১ ডিসেম্বর ১৯২২

সকাল নটায় গানের আসর বসল। আমি আর অতুলদা[১] দুই-একটা গান গাওয়ার পরে কবি আমার দিকে চেয়ে বলতে আরম্ভ করলেন, 'যে আদর্শ ধরে আমি গান তৈরি করি সে সম্বন্ধে

---

[১] অতুলপ্রসাদ সেন।

আমার জবাবদিহি পূর্বেই দুই-একবার তোমার কাছে দাখিল করেছি। তোমার জবানি তার রিপোর্ট্ কাগজে বেরিয়েছে, পড়েও দেখেছি। তাই কথাটা আরো একবার স্পষ্ট করা অনাবশ্যক বোধ হচ্ছে না।

'হিন্দুস্থানী গানের রীতি যখন রাজা বাদশাদের উৎসাহের জোরে সমস্ত উত্তর ভারতে একচ্ছত্র হয়ে বসল তখনো বাঙালির মনকে বাঙালির কণ্ঠকে সম্পূর্ণ দখল করতে পারে নি।

'বাংলায় রাধাকৃষ্ণের লীলাগান দিলে হিন্দুস্থানী গানের প্রবল অভিযানকে ঠেকিয়ে। এই লীলারসের আশ্রয় একটি উপাখ্যান। সেই উপাখ্যানের ধারাটিকে নিয়ে কীর্তনগান হয়ে উঠল পালাগান।

'স্বভাবতই পালাগানের রূপটি নাট্যরূপ। হিন্দুস্থানী সংগীতে নাট্যরূপের জায়গা নেই। উপমা যদি দেওয়া চলে তা হলে বলতে হবে ঐ সংগীতে আছে এক-একটি রত্নের কৌটা। ওস্তাদ জহরী ঘটা ক'রে প্যাঁচ দিয়ে তার ঢাকা খোলে। আলোর ছটায় ছটায় তান লাগিয়ে দিকে দিকে তাকে ঘুরিয়ে দেখায়। সমজদার তার জাত মিলিয়ে দেখে, তার দাম যাচাই করে। ব'লে দিতে পারে এটা হীরে না নীলা, চুনি না পান্না।

'কীর্তন হচ্ছে রত্নমালা রূপসীর গলায়। যেমন রসিক, সে প্রত্যেক রত্নটিকে প্রিয়কণ্ঠে স্বতন্ত্র করে দেখতে পায় না— দেখতে চায় না। রত্নগুলিকে আত্মসাৎ করে যে সমগ্র রূপটি নানা ভাবে হিল্লোলিত, সেইটেই তার দেখবার বিষয়। কিন্তু, এটা হিন্দুস্থানী কায়দা নয়।

'মনে পড়ছে— আমার তখন অল্প বয়স, সংগীতসমাজে নাট্য-অভিনয়। ইন্দ্র চন্দ্র দেবতারা নাটকের পাত্র। উদ্যোগকর্তা অভিনেতারা ধনী ঘরের। সুতরাং দেবতাদের গায়ের গহনা না ছিল অল্প, না ছিল ঝুঁটো, না ছিল কম দামের। সেদিন প্রধান দর্শক রাজোপাধিধারী পশ্চিম প্রদেশের এক ধনী। তাঁকে নাটকের বিষয় বোঝাবার ভার আমার উপরে; আমি পাশে ব'সে। অল্পক্ষণের মধ্যেই বোঝা গেল, সেখানে বসানো উচিত ছিল হ্যামিল্টনের দোকানের বেচনদারকে। মহারাজের একাগ্র কৌতূহল গয়নাগুলির উপরে। অথচ অলংকারশাস্ত্রে সামান্য যে পরিমাণ দখল আমার সে বাক্যালংকারের, রত্নালংকারে আমি আনাড়ি।

'সেদিন অভিনয় না হয়ে যদি কীর্তন হত তা হলেও এই পশ্চিমে মহারাজা গানের চেয়ে রাগিণীকে বেশি করে লক্ষ্য করতেন, সমগ্র কলাসৃষ্টির সহজ সৌন্দর্যের চেয়ে স্বরপ্রয়োগের দুরূহ ও শাস্ত্রসম্মত কারুসম্পদের মূল্যবিচার করতেন— সে আসরেও আমাকে বোকার মতো বসে থাকতে হত।

'মোট কথা হচ্ছে— কীর্তনে জীবনের রসলীলার সঙ্গে সংগীতের রসলীলা ঘনিষ্ঠভাবে সম্মিলিত। জীবনের লীলা নদীর স্রোতের মতো নতুন নতুন বাঁকে বাঁকে বিচিত্র। ডোবা বা পুকুরের মতো একটি ঘের-দেওয়া পাড় দিয়ে বাঁধা নয়। কীর্তনে এই বিচিত্র বাঁকা ধারার পরিবর্তমান ক্রমিকতাকে কথায় ও সুরে মিলিয়ে প্রকাশ করতে চেয়েছিল।

'কীর্তনের আরো একটি বিশিষ্টতা আছে। সেটাও ঐতিহাসিক কারণেই। বাংলায় একদিন বৈষ্ণবভাবের প্রাবল্যে ধর্মসাধনায় বা ধর্মরসভোগে একটা ডিমোক্রাসির যুগ এল। সেদিন সম্মিলিত চিত্তের আবেগ সম্মিলিত কণ্ঠে প্রকাশ পেতে চেয়েছিল। সে প্রকাশ সভার আসরে নয়, রাস্তায় ঘাটে। বাংলার কীর্তনে সেই জনসাধারণের ভাবোচ্ছ্বাস গলায় মেলাবার খুব একটা প্রশস্ত জায়গা হল। এটা বাংলা দেশের ভূমিপ্রকৃতির মতোই। এই ভূমিতে পূর্ববাহিনী দক্ষিণবাহিনী বহু

নদী এক সমুদ্রের উদ্দেশে পরস্পর মিলে গিয়ে বৃহৎ বিচিত্র একটি কলধ্বনিত জলধারার জাল তৈরি করে দিয়েছে।

'হিন্দুস্থানে তুলসীদাসের রামায়ণ সুর করে পড়া হয়। তাকে সংগীতের পদবী দেওয়া যায় না। সে যেন আখ্যান-আসবাবের উপরিতলে সুরের পাতলা পালিশ। রসের রাসায়নিক মতে সেটা যৌগিক পদার্থ নয়, সেটা যোজিত পদার্থ। কীর্তনে তা বলবার জো নেই। কথা তাতে যতই থাক্, কীর্তন তবুও সংগীত। অথচ কথাকে মাথা নিচু করতে হয় নি। বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস জ্ঞানদাসের পদকে কাব্য হিসাবে তুচ্ছ বলবে কে!

'কীর্তনে, বাঙালির গানে, সংগীত ও কাব্যের যে অর্ধনারীশ্বর মূর্তি, বাঙালির অন্য সাধারণ গানেও তাই। নিধুবাবু শ্রীধরকথকের টপ্পা গানে, হরুঠাকুর রামবসুর কবির গানে, সংগীতের সেই যুগলমিলনের ধারা।'

বললাম, 'এ সম্বন্ধে আপনার সঙ্গে আমার মতভেদ নেই। জীবনে দাম্পত্যমিলনের সুখশান্তি সম্বন্ধে আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা না থাকলেও, গানের ক্ষেত্রে দাম্পত্য বলতে কী বোঝায় সেটা আমি বুঝি বলেই আমার বিশ্বাস। কেবল, আপনি যেমন সুরের পক্ষে কথাকে ছাড়িয়ে যাওয়াটা অপরাধ বলে মনে করেন, আমিও তেমনি কথার পক্ষে সুরকে দাবিয়ে রাখার দোষ দেখাতে চাই— এইমাত্র। তাই আমার মনে হয় আপনার সঙ্গে, আমার মতভেদ ঘটে প্রধানত কোথায় সীমা নির্দেশ করবেন তাই নিয়ে, মূলনীতি নিয়ে নয়। আমার মনে হয় আপনি গানের সুরের যতটা দাবি মানতে রাজি, আমি সুরকে তার চেয়ে বড়ো স্থান দিয়ে থাকি। এটা শুধু আমার তর্কের খাতিরে বলা নয়— এ নিয়ে আমি সত্যই যাকে বলে এক্সপেরিমেন্ট করতে করতে নিত্য নূতন আলো পাচ্ছি বলে মনে করি। কাজেই, আমার এই অনুভূতিকে কেমন করে অস্বীকার করি?'

কবি বললেন, 'তোমার এই তর্কে দুটো ভাগ দেখছি— একটা মূলনীতি, আর-একটা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা। মূলনীতি জিনিসটা নির্ব্যক্তিক, সেটা হল আর্টের গোড়াকার কথা। নানা উপাদানের মধ্যে সামঞ্জস্যেই কলারচনার পূর্ণতা এই অত্যন্ত সাদা কথাটা তুমিই মানো আর আমিই মানি নে এমন যদি হয়, তবে শুধু সংগীত কেন, কাব্য সম্বন্ধেও কথা কবার অধিকার আমাকে হারাতে হয়। বাক্য এবং ছন্দ, কবিতার এই দুই অঙ্গ। বাক্য যদি ছন্দের বন্ধন ছাড়িয়ে অর্থের অহংকারে কড়াগলায় হাঁকডাক করে, কাব্যে সেটাও যেমন রূঢ়তা, তেমনি ছন্দের অতিপ্রচুর ঝংকার অর্থসমেত বাক্যকে ধ্বনি চাপা দিয়ে মারলে সেটাও একটা পাপের মধ্যে। গানে সেই মূলতত্ত্বটা আমি অর্ধেক মানি অর্ধেক মানি নে এত বড়ো মূঢ়তা প্রমাণ হলে, রসিকমণ্ডলীতে আমার জাত যাবে। নিশ্চয়ই তুমি আমাকে জাতে ঠেলবার যোগ্য বলে মনে করো না।

'তা হলেই দাঁড়াচ্ছে ব্যক্তিগত বিচারের কথা। অর্থাৎ, নালিশটা এই যে, আমার রচিত অধিকাংশ গানেই আমি সুরকে খর্ব করে কথার প্রতি পক্ষপাত প্রকাশ করে থাকি, তুমি তা করো না। অর্থাৎ, সর্বজনসম্মত মূলনীতি প্রয়োগ করবার বেলায় অন্তত সংগীতে আমার ওজন-জ্ঞান থাকে না।

'এখানে মূলনীতির আইনের বই খুলে আমাকে আসামীরূপে কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছ। ফস্ করে আমি যে 'প্লীড্ গিল্টি' করব নিশ্চয়ই তুমি ততটা আশা করো না। এই জাতের তর্ক অনেক সময়েই কথা-কাটাকাটি থেকে মাথা-কাটাকাটিতে গিয়ে পৌঁছায়। সুতরাং তর্কের চেষ্টা না করাই নিরাপদ। তবু, বিনা তর্কে আমার পক্ষে যতটা কথা বলা চলে তাই আমি বলব।

'য়ুরোপীয় সাহিত্যে এক শ্রেণীর কবিতাকে 'লিরিক' নাম দেওয়া হয়েছে। তার থেকেই বোঝা যায় সেগুলি গান গাবার যোগ্য। এমন-কি, কোনো-এক সময়ে গাওয়া হত। মাঝখানে ছাপাখানা এসে শ্রাব্য কবিতাকে পাঠ্য করেছে। বর্তমানে গীতিকাব্যের গীতি অংশটা হয়েছে উহ্য। কিন্তু, উহ্য বলেই যে সে পরলোকগত তা নয়, যা শ্রোতার কানে ছিল এখন তা আছে পাঠকের মনে। তাই এখনকার গীতিকাব্যে অশ্রুত সুর আর পঠিত কথা দুইয়ে মিলে আসর জমায়। এইজন্যে স্বভাবতই গীতিকাব্যে চিন্তাযোগ্য বিষয়ের ভিড় কম, আর তাতে তত্ত্বের-ছাপ-ওয়ালা কথা যথাসম্ভব এড়িয়ে চলতে হয়। চণ্ডীদাসের গান আছে—

কেবা শুনাইল শ্যাম নাম!
কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো,
আকুল করিল মোর প্রাণ।

এর শ্রুত বা পঠিত কথাগুলি কঠিন ও উঁচু হয়ে উঠে অশ্রুত সুরকে হোঁচট খাইয়ে মারছে না। ঐ কবিতাটিকে এমন করে লেখা যেতে পারে—

শ্যামনাম রূপ নিল শব্দের ধ্বনিতে।
বাহ্যেন্দ্রিয় ভেদ করি অন্তর-ইন্দ্রিয়ে মরি
স্মৃতির বেদনা হয়ে লাগিল রণিতে।

এর তত্ত্বটা মন্দ না। শ্যাম নামটি অপরূপ। ধ্বনিতে সেটা রূপ নিল। তার পরে অন্তরে প্রবেশ করে স্মৃতিবেদনায় পুনশ্চ অরূপ হয়ে রণিত হতে লাগল। বসে বসে ভাবা যেতে পারে, মনস্তত্ত্বের ক্লাসে ব্যাখ্যা করাও চলে, কিন্তু কোনোমতেই মনে মনেও গাওয়া যেতে পারে না। যাঁরা সারবান্ সাহিত্যের পক্ষপাতী তাঁরা এটাকে যতই পছন্দ করুন-না কেন, গীতি-কাব্যের সভায় এর উপযুক্ত মজবুত আসন পাওয়া যাবে না। এখানে বাক্য এবং তত্ত্ব দুই পালোয়ানে মিলে গীতকে একেবারে হটিয়ে দিয়েছে।

'নিজের রচনা সম্বন্ধে নিজে বিচারক হওয়া বেদস্তুর কিন্তু দায়ে পড়লে তার ওকালতি করা চলে। সেই অধিকার দাবি করে আমি বলছি— আমার গানের কবিতাগুলিতে বাক্যের আসুরিকতাকে আমি প্রশ্রয় দিই নি— অর্থাৎ, সেই-সব ভাব, সেই-সব কথা ব্যবহার করেছি, সুরের সঙ্গে যারা সমান ভাবে আসন ভাগ করে বসবার জন্যেই প্রতীক্ষা করে। এর থেকে বুঝতে পারবে তোমার মূলনীতিকে আমি সুরের দিকেও মানি, কথার দিকেও মানি।

'তবু তুমি বলতে পারো নীতিতে যেটাকে সম্পূর্ণ পরিমাণে মানি, রীতিতে সেটাকে আমি যথেষ্ট পরিমাণে মানি নে। অর্থাৎ, আমার গানের কবিতাতে কথার খেলাকে যতই কম করি-না কেন, তবু তোমার মতে মূলনীতি অনুসারে তাতে আরো যতটা বেশি সুরের খেলা দেওয়া উচিত তা আমি দিই নে। কথাটা ব্যক্তিগত হয়ে উঠল। তুমি বলবে তুমি অভিজ্ঞতা থেকে অনুভব করেছ, আমিও তোমার উলটো দিকে দাঁড়িয়ে ঠিক সেই একই কথা বলব।'

আমি বললাম, 'কাব্যে গানে ব্যক্তিগত অনুভূতিকে বাদ দিয়ে চলবার জো নেই। কেননা, অনুভূতিতেই তার সমাপ্তি। বুদ্ধিকে নিয়ে তার কারবার নয়, তার কারবার বোধকে নিয়ে। তাই আমার ব্যক্তিগত বোধেরই দোহাই দিয়ে আমাকে বলতে হবে যে, মনোজ্ঞ কাব্যকে সুরের সমৃদ্ধির মধ্য দিয়ে যে রকম নিবিড় ভাবে পাওয়া যায়, সুরের একান্ত সরলতার মধ্য দিয়ে সে ভাবে পাওয়া যায় না। কারণ, ললিতকলায় একান্ত সারল্য কি অনেকটা রিক্ততারই সামিল নয়?'

কবি বললেন, 'ঐ 'একান্ত' বিশেষণ পদের বাটখারাটা যখনি বেমালুম তুমি দাঁড়িপাল্লায় কেবল এক দিকেই চাপালে তখনি তোমার এক-ঝোঁকা বিচারের চেহারাটা ধরা পড়ল। সুরের সারল্য একান্ত হলেও যত বড়ো দোষ, সুরের বাহুল্য একান্ত হলেও দোষটা তত বড়োই। 'একান্ত' বিশেষণের যোগে যে কথাটা বলছ ভাষান্তরে সেটা দাঁড়ায় এই যে, সুরের দূষণীয় সরলতা দোষের— যেন সুরের দূষণীয় বাহুল্য দোষের নয়! অর্থাৎ, বাহুল্যের দিকে দোষটা তোমার সহ্য হয়, সারল্যের দিকের দোষটা তোমার কাছে অসহ্য। তোমার মতে : অধিকন্তু দোষায়। সর্বমত্যন্তং গর্হিতং— এটাতে তোমার মন সায় দেয় না।

'কিন্তু, পরস্পরের ব্যক্তিগত মেজাজ নিয়ে তর্ক করে কী হবে? জবার মালা মাথায় জড়িয়ে শাক্ত যদি সরস্বতীর শ্বেতপদ্মের দিকে কটাক্ষ করে বলে 'তুমি নেহাত সাদা যাকে বলে রিক্ত' তা হলে সরস্বতীর চেলাও জবাকে বলবে, 'তুমি নেহাত রাঙা যাকে বলে উগ্র।' এতে কেবল কথার ঝাঁজ বেড়ে ওঠে, তার মীমাংসা হয় না। আমি তাই তর্কের দিকে না গিয়ে সারল্য সম্বন্ধে আমার মনোভাবটা বলি।

'অনেক দিন আছি শান্তিনিকেতনে। এখানকার প্রাকৃতিক দৃশ্যে অরণ্য গিরি নদীর আয়োজন নেই। যদি থাকত সেটাকে উপযুক্তভাবে ভোগ করা কঠিন হত না। কারণ সৌন্দর্যসম্পদ ছাড়াও বহুবৈচিত্র্যের একটা জোর আছে, সেটা পরিমাণগত। নানা দিক থেকে সে আমাদের চোখকে বেড়াজালে ঘেরে, কোথাও ফাঁক রাখে না।

'এখানকার দৃশ্যে আয়োজনের বিরলতায় আমাকে বিশেষ আনন্দ দেয়। সকাল বিকাল মধ্যাহ্ন এই অবারিত আকাশে আলোছায়ার তুলিতে কত রকমের সূক্ষ্ম রঙের মরীচিকা এঁকে যায়, আমার মিতভোগী অক্লান্ত চোখের ভিতর দিয়ে আমার মন তার সমস্তটার স্বাদ পুরোপুরি আদায় করে। এখানকার বাধাহীন আকাশসভায় বর্ষা বসন্ত শরৎ তাদের ঋতুবীণায় যে গভীর মীড়গুলি দিতে থাকে তার সমস্ত সূক্ষ্ম শ্রুতি কানে এসে পৌঁছয়। এখানে রিক্ততা আছে ব'লেই মনের বোধশক্তি অলস হয়ে পড়ে না, অথবা বাইরের চাপে অভিভূত হয় না।

'একটা উপমা দিই। একজন রূপরসিকের কাছে গেছে একটি সুন্দরী। তার পায়ে চিত্র-বিচিত্র-করা একজোড়া রঙিন মোজা। রূপদক্ষকে পায়ের দিকে তাকাতে দেখে মেয়েটি জিজ্ঞাসা করলে মোজার কোন্ অংশে তাঁর নজর পড়েছে। গুণী দেখিয়ে দিলেন মোজার যে অংশ ছেঁড়া। রূপসীর পা-দুটি ঐ যে মোজার ফুলকাটা কারুকাজে তানের পর তান লাগিয়েছে নিশ্চয়ই আমাদের হিন্দুস্থানী মহারাজ তার প্রতি লক্ষ করেই বলতেন 'বাহবা', বলতেন 'সাবাস'। কিন্তু গুণী বলেন বিধাতার কিংবা মানুষের রসরচনায় বাণী যথেষ্টের চেয়ে একটুমাত্র বেশি হলেই তাকে মর্মে মারা হয়। সুন্দরীর পা-দুখানিই যথেষ্ট, যার দেখবার শক্তি আছে দেখে তার তৃপ্তির শেষ হয় না। যার দেখবার শক্তি অসাড়, ফুলকাটা মোজার প্রগল্‌ভতায় মুগ্ধ হয়ে সে বাড়ি ফিরে আসে।

'অধিকাংশ সময়েই উপাদানের বিরলতা ব্যঞ্জনার গভীরতাকে অভ্যর্থনা করে আনে। সেই বিরলতাকে কেউ-বা বলে শূন্য কেউ পূর্ণ ব'লে অনুভব করে। পূর্বে তোমাকে একটা উপমা দিয়েছি, এবার একটা দৃষ্টান্ত দিই।

'বাংলা গীতাঞ্জলির কবিতা ইংরেজিতে আপন মনেই তর্জমা করেছিলুম। শরীর অসুস্থ ছিল, আর-কিছু করবার ছিল না। কোনোদিন এগুলি ছাপা হবে এমন স্পর্ধার কথা স্বপ্নেও ভাবি নি। তার কারণ, প্রকাশযোগ্য ইংরেজি লেখবার শক্তি আমার নেই— এই ধারণা আমার মনে বদ্ধমূল ছিল।

'খাতাখানা যখন কবি য়েট্‌সের হাতে পড়ল তিনি একদিন রোদেন্‌স্টাইনের বাড়িতে অনেকগুলি ইংরেজি সাহিত্যিক ও সাহিত্যরসজ্ঞকে তার থেকে কিছু আবৃত্তি করে শোনাবেন ব'লে নিমন্ত্রণ করেছিলেন। আমি মনের মধ্যে ভারি সংকুচিত হলেম। তার দুটি কারণ ছিল। নিতান্ত সাদাসিধে দশ-বারো লাইনের কবিতা শুনিয়ে, কোনোদিন আমি কোনো বাঙালি শ্রোতাকে যথেষ্ট তৃপ্তি পেতে দেখি নি। এমন-কি, অনেকেই আয়তনের খর্বতাকে কবিত্বের রিক্ততা ব'লেই স্থির করেন। একদিন আমার পাঠকেরা দুঃখ করে বলেছিলেন ইদানীং আমি কেবল গানই লিখছি। বলেছিলেন— আমার কাব্যকলায় কৃষ্ণপক্ষের আবির্ভাব, রচনা তাই ক্ষয়ে ক্ষয়ে বচনের দিকে ছোটো হয়েই আসছে।

'তার পরে আমার ইংরেজি তর্জমাও আমি সসংকোচে কোনো-কোনো ইংরেজি-জানা বাঙালি সাহিত্যিককে শুনিয়েছিলেম। তাঁরা ধীর গম্ভীর শান্ত ভাবে বলেছিলেন— মন্দ হয় নি, আর ইংরেজি যে অবিশুদ্ধ তাও নয়। সে সময়ে এন্‌ড্রুজের সঙ্গে আমার আলাপ ছিল না।

য়েট্‌স্‌ সেদিনকার সভায় পাঁচ-সাতটি মাত্র কবিতা একটির পর আর-একটি শুনিয়ে পড়া শেষ করলেন। ইংরেজ শ্রোতারা নীরবে শুনলেন, নীরবে চলে গেলেন— দস্তুর-পালনের উপযুক্ত ধন্যবাদ পর্যন্ত আমাকে দিলেন না। সে রাত্রে নিতান্ত লজ্জিত হয়েই বাসায় ফিরে গেলেম।

'পরের দিন চিঠি আসতে লাগল। দেশান্তরে যে খ্যাতি লাভ করেছি তার অভাবনীয়তার বিস্ময় সেই দিনই সম্পূর্ণভাবে আমাকে অভিভূত করেছে।

'যাই হোক, আমার বলবার কথাটা হচ্ছে এই যে, সেদিনকার আসরে যে ডালি উপস্থিত করা হল তার উপহারসামগ্রী আয়তনে যেমন অকিঞ্চিৎকর, উপাদানে তেমনি তার নিরলংকার বিরলতা। কিন্তু, সেইটুকুই রসজ্ঞদের আনন্দের পক্ষে এত অপর্যাপ্ত হয়েছিল যে, তার প্রত্যুত্তরে সাধুবাদের বিরলতা ছিল না। অলংকারবাহুল্য শ্রোতার বা স্রষ্টার নিজের মনের জন্যে কিছু জায়গা ছেড়ে দেয় না। যার মন আছে তার পক্ষে সেটা ক্লেশকর।

'কিন্তু অনেক মানুষ আছে যারা নিজের মনোহীনতার গহ্বর ভরাবার জন্যেই রসের ভোজে যায়, তারা বলে না 'যৎ স্বল্পং তদিষ্টং'। তারা থিয়েটারে টিকিট কেনে শুধু নাটক শুনবে বলে নয়, রাত্তির চারটে পর্যন্ত শুনবে বলে। তারা নিজেকে চিরকাল ফাঁকি দেয়, কেবলই সেরা জিনিসটির বদলে মোটা জিনিসটাকে বাছে। সাজাই করার চেয়ে বোঝাই করাটাতেই তাদের আনন্দ। এই কারণে তুমি যাকে সারল্য বলছ সেটা তাদের পক্ষে রিক্ততা নয় তো কী!'

কবি একটু থেমে বললেন, 'তুমি যেমন নিজের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা বলেছ, আমিও তেমনি বলব। আমি গান রচনা করতে করতে, সে গান বার বার নিজের কানে শুনতে শুনতেই বুঝেছি যে, দরকার নেই 'প্রভূত' কারু-কৌশলের। যথার্থ আনন্দ দেয় রূপের সম্পূর্ণতা— অতি সূক্ষ্ম, অতি সহজ ভঙ্গিমার দ্বারাই সেই সম্পূর্ণতা জেগে ওঠে।'

বললাম, 'কথাগুলি আমার খুবই ভালো লাগল। এর মধ্যে দুই-একটি নতুন suggestion আমি পেলাম। সেগুলি ভেবে দেখব... তবুও আমার মনে হয় যে, সব ললিতকলার বিকাশধারাই যে অতিমাত্রায় সরলতার দিকে হবে এমন কথা জোর করে বলা যায় না। কেননা, অনেক শ্রেষ্ঠ শ্রেণীর ললিতসৃষ্টি দেখা যায় যার মধ্যে একটা complex structure, একটা বৃহৎ সুষমা, একটা সমষ্টিগত মনোজ্ঞ সমাবেশ পাওয়া যায় ও তার মধ্যে একটা সত্য ও গভীর রস-উৎস বিরাজ করে। যেমন, ধরুন, বীণার তানের আনন্দঝোরার বিচিত্র লাবণ্য, য়ুরোপীয় সিম্‌ফনির বিরাট গরিমাময় গঠনকারুকলা, মধ্যযুগের য়ুরোপের অপূর্ব স্থাপত্য, তাজমহলের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ভাস্কর্যের গাথা।'

কবি বললেন, 'এ কথা কি আমিই মানি নে? আমি কেবল বলতে চাই— সরলতায় বস্তু কম ব'লে রসরচনায় তার মূল্য কম এ কথা স্বীকার করা চলবে না, বরঞ্চ উল্‌টো। ললিতকলার কোনো-একটি রচনায় প্রথম প্রশ্নটি হচ্ছে এই যে, তাতে আনন্দ দিচ্ছে কি না। যদি দিচ্ছে হয়, তা হলে তার মধ্যে উপাদানের যতই স্বল্পতা থাকবে ততই তার গৌরব। বিপুল ও প্রয়াসসাধ্য উপায়ে একজন লোক যে ফল পায়, আর-একজন সংক্ষিপ্ত ও স্বল্পায়াস উপায়েই সেই ফল পেলে আর্টের পক্ষে সেইটেই ভালো ; বস্তুত আর্টের সৃষ্টিতে উপায় জিনিসটা যতই হালকা ও প্রচ্ছন্ন হবে ততই সৃষ্টির দিক থেকে তার মর্যাদা বাড়বে। এই মূলনীতি যদি মানো তা হলে সকল প্রকার আর্টেই পদে পদে সতর্ক হয়ে বলতে হবে : অলমতি বিস্তরেণ। বলতে হবে আর্টে প্রগল্‌ভতার চেয়ে মিতভাষ, বাহুল্যের চেয়ে সারল্য শ্রেষ্ঠ। আর্টে complex structure অর্থাৎ বহুগ্রন্থিল কলেবরের দৃষ্টান্ত-স্বরূপে তাজমহলের উল্লেখ করেছ। আমি তো তাজমহলকে সহজ রূপেরই দৃষ্টান্ত বলে গণ্য করি। একবিন্দু অশ্রুজল যেমন সহজ তাজমহল তেমনি সহজ। তাজমহলের প্রধান লক্ষণ তার পরিমিতি— ওতে এক টুকরো পাথরও নেই যাতে মনে হতে পারে হঠাৎ তাজমহল কানে হাত দিয়ে তান লাগাতে শুরু করেছে। তাজমহলে তান নেই ; আছে মান, অর্থাৎ পরিমাণ। সেই পরিমাণের জোরেই সে এত সুন্দর। পরিমাণ বলতেই বোঝায় উপাদানের সংযম। আমের সঙ্গে কাঁঠালের তুলনা ক'রে দেখো-না। কাঁঠালের উপরকার আবরণ থেকে ভিতরকার উপকরণ পর্যন্ত সমস্তটার মধ্যেই আতিশয্য ; সবটা মিলে একটা বোঝা। যেন একটা বস্তা। বাহাদুরির দিক থেকে দেখলে বাহবা দিতেই হবে। কাঁঠালের শস্যঘটিত তানবাহুল্যে মিষ্টতা নেই তাও বলতে পারি নে— নেই সৌষ্ঠব, কলারচনায় যে জিনিসটি অত্যাবশ্যক। কাঁঠালকে আমের মতো সাদাসিধে বলে না ; তার কারণ এ নয় যে, কাঁঠাল প্রকাণ্ড এবং ওজনে ভারী। যার অংশগুলির মধ্যে সুগঠিত ঐক্য, সেই হচ্ছে সিম্প্‌ল্‌। যদি নতুন কথা বানাতে হয় তা হলে সেই জিনিসকে বলা যেতে পারে সংকল, অর্থাৎ তার সমস্ত কলাগুলি সুসংগত। আমাদের শাস্ত্রে ব্রহ্মকে বলে নিষ্কল, তার মধ্যে অংশ নেই, তিনিই হচ্ছেন অসীম সিম্প্‌ল্‌— অথচ তাঁর মধ্যে সমস্তই আছে, সমস্তকে নিয়ে তিনি অখণ্ড। সূর্যের যে রশ্মিকে আমরা সাদা বলি তার মধ্যে বর্ণরশ্মির বিরলতা আছে তা নয়, তার মধ্যে সকল রশ্মির ঐক্য। তাজমহলও তেমনি সাদা, তার মধ্যে সমস্ত উপকরণের সুসংঘটিত সামঞ্জস্য। এই সামঞ্জস্যের সুষমাকে যদি আমরা ছিন্ন করে দেখি তবে তার মধ্যে বৈচিত্র্যের অন্ত দেখব না। রাসায়নিক বিশ্লেষণ করে দেখলে একটি অশ্রুবিন্দুতেও আমরা বহুকে দেখতে পাই, কিন্তু যে দেখাটিকে অশ্রু বলি সে নিতান্ত সাদা, সে এক। সেখানে সৃষ্টিকর্তা তাঁর ঐশ্বর্যের আড়ম্বর করতে চান নি, সরলভাবে তাঁর রূপদক্ষতা দেখিয়েছেন। তাঁর অশ্রুজলে রিক্ততা আছে, কিন্তু বৈজ্ঞানিক যখন সেই অশ্রুজলের হিসাবের খাতা বের করে দেখান তখন ধরা পড়ে রিক্ততার পিছনে কতখানি শক্তি। তখন বুঝতে পারি অতিরিক্ততাই সৃষ্টিশক্তির অভাব প্রকাশ করে, আর যারা অতিরিক্ত না হলে দেখতে পায় না তাদের মধ্যে দৃষ্টিশক্তিই দীনতা।'

কবির এ কথাটি আমার খুবই ভালো লাগল। তবে আমার সাফাই এই যে, সারল্যের মধ্যেকার এই গরিমার সম্বন্ধে আমি নিজেকে একটু সচেতন বলেই মনে করি। আবু পাহাড়ের দিলওয়ারা মন্দিরের কারুকার্য-বাহুল্যের বিরুদ্ধ সমালোচনায় এ কথা আমি লিখেছি (অর্থাৎ ললিতকলায় সারল্যের স্থান কোথায় সে সম্বন্ধে মতামত প্রকাশের সময়)— ওস্তাদি গানের সম্পর্কে তো কথাই নেই। কেবল আমার এ অবধি মনে হয়েছে যে, শ্রেষ্ঠ শ্রেণীর complexity-র আবেদন

অন্তত আধুনিক মনের কাছে শ্রেষ্ঠ শ্রেণীর simplicity-র আবেদনের চেয়ে ঢের বেশি সাড়া পায়। সুরকে সরল করে গাওয়াকে আমি যে কারণেই হোক কখনো মনে প্রাণে ভালোবাসতে পারি নি, যেমন বেসে এসেছি তার মধ্যে স্বরবিন্যাসের কলাকারুকে, নানান অনুভূতির আলোছায়ার বিচিত্র সমাবেশকে, সুরকে লীলোচ্ছলভাবে উৎসাহিত করে তুলতে পারাকে— এক কথায় স্বরসম্পদ সৃষ্টিতে উদ্দাম প্রেরণাকে।

আমি কবিকে শুধু বললাম, 'এ কথাটাকে আমি ভালো করে ভেবে দেখব। তাই, এখন আপনার এ মতটির সম্বন্ধে কোনো আলোচনা না করে কেবল আপনাকে এইটুকুমাত্র বলে রাখতে চাই যে, আমার এই অনুভূতিটি খুবই গভীর যে সুরসম্পদ্ যথাযথ ভাবে বাড়ালে তাতে করে গানের রস নিবিড়তরই হয়ে ওঠে। এটা আমি দৃষ্টান্ত দিয়ে বোধ হয় প্রমাণ করতে পারি।'

কবি বললেন, 'কিরকম?'

আমি বললাম, 'ধরুন, যেমন পিতৃদেবের 'এ জীবনে পূরিল না সাধ' বা 'মলয় আসিয়া' গানে। আমি আমার অনেক সুকুমারহৃদয় বন্ধুর কাছে এ গানদুটি একটু সুরের নিবিড় ব্যঞ্জনার মধ্যে গেয়ে বেশি সাড়া পেয়েছি।'

কবি বললেন, 'যেটা হয়েছে সেটা হয়েছে এই সহজ কথা অস্বীকার করব কেন? যদি পূর্বপ্রচলিত কোনো বাঁধা নিয়মের সঙ্গে সেই হওয়াটা না মেলে, তা হলে বলব নিয়মটা ছিল সংকীর্ণ। কিংবা হয়তো এমনও বলতে পারি নিয়মটা ভাঙা হয়েছে বলে যে প্রতীয়মান হচ্ছে সেটাই ভুল। কিন্তু, সেইসঙ্গে এ কথা ভুললেও চলবে না যে, ব্যক্তিবিশেষের আনন্দ পাওয়াকেই এ ক্ষেত্রে চূড়ান্ত নিষ্পত্তি বলে মেনে নেওয়া চলে না। রসসৃষ্টি করতেও যেমন সহজ শক্তির দরকার, রসের দরদ বোধ সম্বন্ধেও তেমনি সহজ শক্তি। রসের মূল্যনির্ধারণ মাথাগনতি ভোটের দ্বারা হয় না। রসিক ও রসের সাধকদের কাছে বিধান নিতে হয়, শিক্ষা নিতে হয়। যার সহজ রসবোধ আছে তার কোনো বালাই নেই।'

আমি বললাম, 'তাই, যাঁরা শুধু কাব্য-অনুরাগী তাঁদের আমিও বলি যে, সুরসম্পদ্‌কে বাড়ালে গানের রস নিবিড় হল না নিষ্প্রভ হল এ সম্বন্ধে তাঁদের বিচার ভালো লাগা না-লাগাই প্রামাণ্য নয়, যেহেতু তাঁরা বরাবর গানকে বেশি কাব্য-ঘেঁষা করে দেখার দরুন সুরসম্পদ্‌বৈচিত্র্যের যথার্থমূল্য নির্ধারণ করবার অন্তরদৃষ্টিটি অর্জন করেন নি। এ ক্ষেত্রে শুধু সুর বোঝেন এমন লোকের রায়ও যেমন সন্তোষজনক হতে পারে না, শুধু কাব্য বোঝেন এমন লোকের রায়ও তেমন নির্ভরযোগ্য হতে পারে না। আমাদের যেতে হবে তাঁদের কাছে যাঁরা কমবেশি দুইয়েরই রসজ্ঞ।'

কবি বললেন, 'তোমার এই তর্কের মধ্যে ব্যক্তিগত বিশেষ ঘটনার ইঙ্গিত আছে, সুতরাং এটা তর্কের ক্ষেত্রের বাইরে। অর্থাৎ, এখানে মতের বিচার ছাড়িয়ে ব্যক্তির বিচার এসে পড়ল, অথচ ব্যক্তিটি রইল অগোচরে। বোঝা যাচ্ছে গান সম্বন্ধে কোনো-কোনো মানুষের সঙ্গে তোমার মতের মিল হয় না, তুমি যাদের সরাসরি ভাবে কাব্য-ঘেঁষা বলে জরিমানা করতে চাও ; অথচ, তাদের হাতে যদি বিচারভার থাকে তা হলে তারাও তোমাকে বিশেষণ মাত্রের দ্বারা লাঞ্ছিত করতে পারে। কিন্তু, বিশেষণ তো বিচার নয়।

'আজকের আলোচনার কথাটা এই যে, আমি যে-সব গান রচনা করি তাতে সুরের যথেষ্ট প্রাচুর্য নেই ব'লে তোমার ভালো লাগে না। তুমি তার উপরে নিজের ইচ্ছামতো প্রাচুর্য আরোপ করে গাইতে চাও। তার পরে যদি সেটা কারো ভালো না লাগে তবে তার কপালে কাব্য-ঘেঁষা ছাপ মেরে গীতরসিক সভা থেকে বরখাস্ত করে দেবার বিধান তোমার।

'কিন্তু তুমি যেমন বিচারের অধিকারী, অন্য ব্যক্তিও তেমনি। এমন অবস্থায় সহজ মীমাংসা এই যে, যে ব্যক্তি গান রচনা করেছে তার সুরটিকে বহাল রাখা। কবির কাব্য সম্বন্ধেও এই রীতি প্রচলিত, চিত্রকরের চিত্র সম্বন্ধেও। রচনা যে করে, রচিত পদার্থের দায়িত্ব একমাত্র তারই ; তার সংশোধন বা উৎকর্ষসাধনের দায়িত্ব যদি আর-কেউ নেয় তা হলে কলাজগতে অরাজকতা ঘটে। এ কথা নিশ্চিত যে, ওস্তাদ-পরম্পরার দুর্গম কণ্ঠ-তাড়নায় তানসেনের কোনো গানেই আজ তানসেনের কিছুই বাকি নেই। প্রত্যেক গায়কই কল্পনা করে এসেছেন যে, তিনি উৎকর্ষ সাধন করছেন। রামের কুটির থেকে সীতাকে চুলে ধ'রে টেনে রাবণ যখন নিজের রথের 'পরে চড়িয়েছিলেন তখন তিনিও সীতার উৎকর্ষসাধন করেছিলেন। তবুও রামের ভার্যারূপে বনবাসও সীতার পক্ষে শ্রেয়, রাবণের স্বর্ণপুরীও তাঁর পক্ষে নির্বাসন— এই দাম্পত্য মূলনীতিটুকু প্রমাণ করবার জন্যেই সাতকাণ্ড রামায়ণ। ললিতকলাতেও ধর্মনীতির অনুশাসন এই যে, যার যেটি কীর্তি তার সম্পূর্ণ ফলভোগ তার একলারই।

'সাহিত্যে সংগীতে এমন একদিন ছিল যখন রচয়িতার সৃষ্টিকে একান্তভাবে রচয়িতার অধিকার দেওয়া দুরূহ ছিল। আল ডিঙিয়ে ডিঙিয়ে নিজের নিজের রুচি অনুসারে সর্বসাধারণে তার উপরে হস্তক্ষেপ করে এসেছে। বর্তমান যুগে যারা দ্রব্যসম্পত্তিতে এইরকম অবারিত কম্যুনিজ্‌ম্ মানে আর তাই নিয়ে রক্তে যারা পৃথিবী ভাসিয়ে দিচ্ছে, তারাও কলারাজ্যে এটাকে মানে না। আদিম কালে কলাভাণ্ডারে না ছিল কুলুপ, না ছিল পাহারা। সেইজন্যেই কলারচনায় সরকারি কার্তবীর্যার্জুনের বহুহস্তক্ষেপ নিষেধ করবার উপায় ছিল না। আজকালকার দিনে ছাপাখানা ও স্বরলিপি প্রভৃতি উপায়ে নিজের রচনায় রচয়িতার দায়িত্ব পাকা করে রাখা সম্ভব, তাই রচনাবিভাগে সরকারি যথেচ্ছাচার নিবারণ করা সহজ এবং করা উচিত। নইলে দাঁড়ি টানবে কোথায়? এক কাব্যে এক রচয়িতার স্বত্ব বিচার করা সহজ, কিন্তু এক কাব্যে অসংখ্য রচয়িতার স্বত্ব বিচার করবে কে এবং কী উপায়ে। এ যে পঞ্চপাণ্ডবের পাঞ্চালীর বাড়া, এ যে পঞ্চাশ হাজার রানী।

'তুমি বলবে আমাদের দেশের গানের বৈশিষ্ট্যই তাই, গায়কের রুচি ও শক্তিকে সে দরাজ জায়গা ছেড়ে দেয়। কিন্তু, সর্বত্র এ কথা খাটে না। খাটে কোথায়? যেখানে গানের চেয়ে রাগিণী প্রধান। রাগিণী জিনিসটা জলের ধারা ; বস্তুত সেই রকম আকৃতি-পরিবর্তনের দ্বারাই তার প্রকৃতির পরিচয়। কিন্তু, আমি যাকে গান বলি সে হচ্ছে সজীব মূর্তি, যে যেমন-খুশি তার হাত পা নাক চোখের বদল করতে থাকলে জীবনের ধর্ম ও মূর্তির মূল প্রকৃতিকেই নষ্ট করা হয়। সে হয় কেমন? যেমন, চাঁপা ফুল পছন্দ নয় ব'লে তাকে নিয়ে স্থলপদ্ম গড়বার চেষ্টা। সে স্থলে উচিত চাঁপার বাগান ত্যাগ করে স্থলপদ্মের বাগানে আসন পাতা। কারণ, যে জিনিস জীবধর্মী তাকে উপেক্ষা করলেও চলে, কিন্তু উৎপীড়ন করলে অন্যায় হয়।'

৪

জোড়াসাঁকো। ২১ মার্চ ১৯৩৮

...দিলীপদা বললেন, 'সাঙ্গীতিকীর সম্পর্কে আপনি আমাকে যে চিঠিগুলি লিখেছেন তাতে একটা কথা প্রমাণ হয় নি কি, যে, আপনি আপনার পূর্ব মত বদলেছেন? জীবনস্মৃতিতে গান নিয়ে যে-সব কথা আপনি লিখেছেন আপনি তো তার বিরুদ্ধ মতই পোষণ করছেন আজকাল।'

কবি বললেন, 'সারাজীবন ভরে একটা নির্দিষ্ট মতের অনুবর্তন করে চলাটা মনের স্বধর্মের পরিচায়ক নয়। আমার মত যদি বদলেই থাকে তাতে আমি ক্ষোভ করি নে। একটা কথা আমি ভেবে দেখেছি— গানের ক্ষেত্রে, শুধু গানের ক্ষেত্রে কেন, সমস্ত চারুশিল্পের ক্ষেত্রে নতুন সৃষ্টির পথ যদি খোলা না'ই রইল তবে তা কিছুতেই শিল্পের পাঙ্‌ক্তেয় হতে পারে না। শিল্পী নিজের পথ নিজে করে নেবে, প্রাচীন সংগীতের কণ্ঠে ঝুলে থাকাটা তার সইবে কেন? পুরাতনকে বর্জন করতে বলি নে, কিন্তু নতুন সৃষ্টির পথে যদি তাতে কাঁটার বেড়া দেখা দেয় তবে তা নৈব নৈব চ। আকবর শা'র দরবারে তানসেন মস্ত বড়ো গাইয়ে ছিলেন, কেননা তাঁর শিল্পপ্রতিভা নিত্য নতুন সৃষ্টির খাতে রসের বান ডাকিয়েছিল— আকবর শা'র যুগে ছিল সে ঘটনা অভিনব। কিন্তু, এ কালের মানুষ আমরা, আমরা কেন এখনো তানসেনের গানের জাবর কেটে চলব অন্ধ অনুকরণের মোহে? এই যে সমস্ত হিন্দুস্থানী ওস্তাদ দেখতে পাও এদের হয়তো কারো কারো প্রতিভা আছে, কিন্তু এদের যেটুকু প্রতিভা সেটা নিঃশেষিত হয়ে যায় বাঁধা পথের অনুবর্তন করতে করতেই। সুতরাং নতুন সৃষ্টির কোনো জায়গা সেখানে থাকে না। কিন্তু, বাংলা গানের কথা স্বতন্ত্র, এর অপূর্ব সম্ভাবনার কথা ভাবতেই আমার রোমাঞ্চ হয়। বাংলা গানে নিত্য নতুন স্বকীয়তার পথ তোমরা সৃষ্টি করতে থাকো, তাতেই বাংলা গান খুঁজে পাবে সার্থকতা। তুমি তো অনেক দিন য়ুরোপে ছিলে তাদের সংগীতের ভালো ভালো জিনিস দিয়ে যদি বাংলা গানের সাজি ভরাতে পারো তবে সেটা একটা সত্যিকারের কাজ করা হবে। অন্ধ অনুকরণ দোষের, কিন্তু স্বীকরণ নয়।'

দিলীপদা প্রশ্ন করলেন, 'আপনি নতুন সৃষ্টির কথা এত বললেন, স্বকীয়তাকে নানা দিক থেকে সমর্থনও করলেন, অথচ এতদিন আপনি আপনার স্বরচিত গানের ব্যাপারে একটু রক্ষণশীল ছিলেন না কি? আমার তো মনে হয় আপনি কিছুদিন আগে পর্যন্তও গায়কের সুরবিহারের (improvisation) স্বাধীনতাকে সমর্থন করেন নি।'

কবি বললেন, 'এখনো আমি সমান রক্ষণশীল আছি। তবে একটা কথা আছে। তোমাদের মতো প্রতিভাবান শিল্পীদের দিয়ে আমার ভয় নেই, কিন্তু এ পথ সবারই জন্যে নয় জেনো। যাকে-তাকে যদৃচ্ছা পক্ষবিস্তার করার স্বাধীনতা দিলে তাতে সুফলের পরিবর্তে অপফলটাই ফলবে বেশি করে। সেটা বাঞ্ছনীয় নয়। খুব মুষ্টিমেয় সংখ্যক শিল্পীগায়কের 'পরে থাকবে এর দায়িত্ব।'

কথায় কথায় নানা ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ এসে পড়ল। 'চণ্ডালিকা'র কথাও উঠল। আমাদের মধ্যে একজন বললেন, 'চণ্ডালিকা খুব চমৎকার হয়েছে।' তাতে কবি বললেন, 'তোমরা হয়তো জানো না এর জন্যে আমাকে কী অমানুষিক পরিশ্রম করতে হয়েছে। দিন নেই, রাত নেই, এদেরকে অসীম ধৈর্যের সঙ্গে গড়ে পিটে নিতে হয়েছে— সে যে কী কষ্ট তোমরা বুঝবে না।'

তার পর একটু থেমে বললেন, 'অথচ গানের ভিতর দিয়ে আমি যে জিনিসটি ফুটিয়ে তুলতে চাই সেটা আমি কারো গলায় মূর্ত হয়ে ফুটে উঠতে দেখলুম না। আমার যদি গলা থাকত তা হলে হয়তো বা বোঝাতে পারতুম কী জিনিস আমার মনে আছে। আমার গান অনেকেই গায়, কিন্তু নিরাশ হই শুনে। একটিমাত্র মেয়েকে জানতুম যে আমার গানের মূল সুরটিকে ধরতে পেরেছিল— সে হচ্ছে রুনু, সাহানা। আমি গানের প্রেরণা পেয়েছি আমার ভিতর থেকে, তাই আপন লীলায় আপন ছন্দে ভিতর থেকে যে সুর ভেসে ওঠে তাই আমার গান হয়ে দাঁড়ায়। ওস্তাদের কাছে 'নাড়া' বেঁধে সংগীতশিক্ষার দস্তরম-মহরম করা, সে আমাকে দিয়ে কোনোকালেই হল না। ভালোই হয়েছে যে, ওস্তাদের কাছে হাতে খড়ি দিতে হয় নি। আমাদের বাড়িতে উচ্চাঙ্গ সংগীতের খুব চর্চা হত সে কথা তোমরা সবাই জানো। অথচ আশ্চর্য, এ বাড়ির ছেলে হয়েও

আমি কোনোদিনও ওস্তাদিয়ানার জালে বাঁধা পড়ি নি। আড়ালে-আবডালে থেকে যেটুকু শিখেছি সেটুকুই আমার শেখা। বারান্দা পার হতে গিয়ে কিংবা জানালার ও পাশে বসে থাকার কালে যে-সব সুর ভেসে আসত কানে সেগুলোই মনের ভিতর গুঞ্জরণ করে ফিরত প্রতিনিয়ত। তার থেকেই পেয়েছি আমি গানের প্রেরণা। বর্ষার দিনে ভিতরে ভূপালী সুরের আলাপ চলেছে, আমি বাইরে থেকে শুনছি। আর, কী আশ্চর্য দেখো, পরবর্তী জীবনে আমি যত বর্ষার গান রচনা করেছি তার প্রায় সব-কটিতেই অদ্ভুতভাবে এসে গেছে ভূপালী সুর। কাজেই বুঝেছ— সংগীতশিক্ষাটা আমার সংস্কারগত, ধরাবাঁধা রুটিনমাফিক নয়।

'ছোটোবেলায়.... আমার গলা খুব ভালো ছিল। সেকালের সেরা ওস্তাদ যদুভট্ট— অত বড়ো গাইয়ে বাংলায় আজ পর্যন্ত হয়েছে কি না সন্দেহ— আমাদের বাড়ির সভাগায়ক ছিলেন। তিনি কত চেষ্টা করেছিলেন আমাকে গান শেখাবার জন্যে, কিন্তু মেরে-কেটেও আমাকে বাগ মানাতে পারেন নি। সে ধাতের ছেলেই আমি নই। কোনো রকম শেখার ব্যাপারে আমার টিকিটিও খুঁজে পাবার জো ছিল না।...

...'স্কুল কলেজে শিক্ষা হতেও পারে না। এই-যে বিশ্ববিদ্যালয়ে সংগীতশিক্ষার ব্যবস্থা হচ্ছে এর সম্পর্কে আমি খুব আশান্বিত নই। কেননা, শিল্পের ক্ষেত্রে ব্যাপক ব্যবস্থার কোনো দাম নেই। যে প্রেরণা থেকে প্রকৃত গানের জন্ম ক্লাস্‌রুমের চতুঃসীমার ভিতর কেউ তা পেতে পারে না। স্বরলিপিপরিচয় কিংবা ধরাবাঁধা কয়েকটা গান শেখাতেই ঐ ব্যবস্থার সমস্ত কৃতিত্ব যাবে ফুরিয়ে। দল পাকিয়ে শিক্ষা হয় না, শিক্ষাকে কার্যকরী করতে হলে ছোটোখাটো শ্রেণীবিভাগের 'পরে জোর দিতে হবে।...

...'বাংলাদেশের মাটিতে আছে ফলপ্রসূ কল্পনার বীজ, তাই বাঙালির রয়েছে অনন্ত সম্ভাবনা। এই জেনারেশ্যানের হাত থেকে হয়তো খুব বেশি-কিছু পাওয়া যাবে না, কিন্তু পরবর্তী কালকে দাবিয়ে রাখবে কে? এটা আমি কিছুতেই ভেবে পাই নে নিরবচ্ছিন্ন রাজনীতির চর্চাতেই কী করে দেশ উদ্ধার পেতে পারে। শিল্প, সাহিত্য, বিজ্ঞান, নাচ, গান, এদের কি কিছু দাম নেই? আনন্দকে অপাঙ্‌ক্তেয় করে রেখে এমন কী চতুর্বর্গ ফল লাভ হবে বুঝি নে। দেশের অস্থিমজ্জায় আনন্দকে চারিয়ে তোলো, তাতে সব দিক থেকেই লাভ হবে, এমন-কি রাজনীতির দিক থেকেও।'...

৫

বরানগর। ২৬ মার্চ ১৯৩৮

...'হিন্দুস্থানী সংগীত আমি সর্বান্তঃকরণে ভালোবাসি— আজ ব'লে নয়, বাল্যকাল থেকেই। মনে করি ভালোবাসা উচিত। প্রতি সুন্দর সৃষ্টি পুরানো হলেও রসিকের মনে আনন্দের সাড়া তুলবে এই তো হওয়া উচিত। যাঁরা সত্যিকার ভালো হিন্দুস্থানী গান শুনেও বলেন 'ও কী তা-না-না-না মেও মেও, বাপু, ও ভালো লাগে না'— তাঁদেরকে আমি বলব, 'তোমাদের ভালো লাগে না এজন্যে তোমাদের সঙ্গে তর্ক করব না— কেননা, রুচি নিয়ে তর্ক নিষ্ফল— কেবল বলব তোমরা এ কথা সগৌরবে বোলো না লক্ষ্মীটি!' কারণ, ভালো জিনিস ভালো না লাগাটা লজ্জারই বিষয়, গৌরবের নয়। সুতরাং, শ্রেষ্ঠ শ্রেণীর হিন্দুস্থানী সংগীত যখন সত্যিই সংগীতের একটি মহৎ বিকাশ, তখন সেটা যদি তোমাদের কারুর ভালো না'ও লাগে তো সলজ্জেই বোলো— 'লাগল না', বোলো— 'ও রসের রসিক হবার কোনো সাধনাই করি নি বা করবার সময় পাই নি— নইলে লাগত নিশ্চয়ই'।

'আমার ভালো লাগে। উৎকৃষ্ট হিন্দুস্থানী সংগীত আমি ভালোবাসি বলেছি বহুবারই। কেবল আমি বলি যে, ভালো জিনিসকেও ভালোবাসতে হবে কিন্তু মোহমুক্ত হয়ে। সব রকমের মোহ সর্বনেশে। তাজমহল আমার ভালো লাগে ব'লেই যে তাজমহলের স্থাপত্যশিল্পের অনুকরণে প্রতি বসতবাটীতে গম্বুজ ওঠাতে হবে এ কখনোই হতে পারে না। হিন্দুস্থানী সংগীত ভালো লাগে ব'লেই যে ক্রমাগত পুনরাবৃত্তি করতে হবে এ একটা কথাই নয়। অজন্তার ছবি খুবই ভালো কে না মানবে? কিন্তু তাই ব'লে তার উপর দাগা বুলিয়ে আমাদের চিত্রলোকে মুক্তি খুঁজতে হবে বললে সেটা একটা হাসির কথা হয়। তবে প্রশ্ন ওঠে : অজন্তা থেকে, তাজমহল থেকে, হিন্দুস্থানী সংগীত থেকে আমরা কী পাব? না, প্রেরণা— ইন্‌স্‌পিরেশন। সুন্দরের একটা মস্ত কাজ এই প্রেরণা দেওয়া। কিসের? না, নবসৃষ্টির। তানসেন আকবার শা মরে ভূত হয়ে গেছেন কবে, কিন্তু আমরা আজও চলতে থাকব তাঁদের সুরের শ্রাদ্ধ ক'রে? কখনোই না। তানসেনের সুর শিখব, কিন্তু কী জন্যে? না, নিজের প্রাণে যাকে তুমি বলছ renaissance— নবজন্ম— তারই আবাহন করতে। আমিও এই কথাই বলে আসছি বরাবর যে, নবসৃষ্টির যত দোষ যত ত্রুটিই থাকুক-না কেন, মুক্তি কেবল ঐ কাঁটাপথেই— বাঁধা সড়ক গোলাপদলের পাপড়ি দিয়ে মোড়া হলেও সে পথ আমাদের পৌঁছিয়ে দেবে শেষটায় চোরা গলিতেই। আমরা প্রত্যেকেই মুক্তিপন্থী, আর মুক্তি কেবল নবসৃষ্টির পথেই— গতানুগতিকতার নিষ্কলঙ্ক সাধনার পথে নৈব নৈব চ।

'হিন্দুস্থানী সংগীতের জরার দশার কথা বলেছিলে। হয়েছে কী, ও সংগীত হয়ে পড়েছে ক্লাসিক। ক্লাসিক মানে একটা সর্বাঙ্গসুন্দরতার পারফেক্‌শনের ফর্মে অচল প্রতিষ্ঠা। এ-হেন পূর্ণতা পূর্ণ ব'লেই মরেছে। পূর্ণতায় সিদ্ধির সঙ্গে আসে স্থিতি। কিন্তু, শিল্পের মুক্তি চাইতে পারে না স্থিতির অচলায়তন। তাই ইতিহাসে দেখবে অঘটন ঘটে যখন বেশি খুঁতখুঁতেপনায় আমাদের ধরে এই ক্লাসিকিয়ানার সেকেলিয়ানার মোহে।...

'হিন্দুস্থানী সংগীতের বিরুদ্ধে আজ এই-যে বিদ্রোহের চিহ্ন দিকে দিকে মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে তাকে তাই অকল্যাণজনক মনে করা সংগত নয়। হিন্দুস্থানী বীণাপাণি আজ শবাসনা ; তাঁর এ আসনকে চাই টলানো। নইলে কমলাসনারও হবে ঐ নির্জীবন আসনেরই দশা— সে মরবে। বাংলা গানে দেখো হিন্দুস্থানী সুরই তো পনেরো আনা। কাজেই কেমন করে মানব যে বাংলা গানের সঙ্গে হিন্দুস্থানী সংগীতের দা-কুমড়ো সম্বন্ধ? বাংলা গানে হিন্দুস্থানী সুরের শাশ্বত দীপ্তিই যে নবজন্ম পেয়েছে এ কথা ভুললে তো চলবে না। আমরা যে বিদ্রোহ করেছি সে হিন্দুস্থানী সংগীতের আত্মপ্রসাদের বিরুদ্ধে, গতানুগতিকতার বিরুদ্ধে, তার আনন্দদানের বিরুদ্ধে না— কেননা, আমাদের গানেও তো আমরা হিন্দুস্থানী গানের রাগরাগিণীর প্রেরণাকেই মেনে নিয়েছি। হিন্দুস্থানী সংগীতকে আমরা চেয়েছি, কিন্তু আপনার ক'রে পেলে তবেই না পাওয়া হয়। হিন্দুস্থানী সুরবিহার প্রভৃতি শুনে আমি খুশি হই, কিন্তু বলি : বেশ, খুব ভালো, কিন্তু ওকে নিয়ে আমি করব কী? আমি চাই তাকে যে আমার সঙ্গে কথা কইবে। প্রাকৃত ও সাধু বাংলার দৃষ্টান্ত নিলে এ কথাটা পরিষ্কার হবে।...

'হিন্দুস্থানী সুরে তাই মিশেল আনতে আমাদের বাধবে কেন? আমি মানি রাগ-রাগিণীর একটা নিজস্ব মহিমা আছে। এও মানি যে রাগরাগিণীর পরিচয় বাঞ্ছনীয়। কিন্তু ঐ-যে বললাম তা থেকে প্রেরণা পেতে, তাকে নকল করতে নয়। হিন্দুস্থানী সংগীত কেমন জানো? যেন শিব। রাগরাগিণীর তপস্যা হল শৈব বিশুদ্ধির তপস্যা। কিন্তু তাইতেই সে মরল। এল উমা, সঙ্গে এল ঐ ফুলের তীরন্দাজ ঠাকুরটি যার নাম ইংরাজিতে 'প্যাশন'। আমি বলি যুগে যুগে ক্লাসিসিজ্‌ম্‌-এর শৈব

তপস্যা ভাঙতে হবে এই প্যাশনে, স্থাণুকে করতে হবে বিচলিত। নিষ্ক্রিয় নির্বিচলতার মধ্যেও এক রকমের মহিমা আছে মানি, সে মহান্। কিন্তু, সৃষ্টির গতি থাকলে তবেই এ স্থিতির নিষ্ক্রিয়তার বৃত্ত হয় পূর্ণ। প্রকৃতি বিনা পুরুষকে চাইলে পরিণাম নির্বাণ— কৈবল্য। সে পথে, অন্তত, শিল্পের মুক্তি নেই। সাগরপারের ঢেউও আমাদের প্রাণে জাগাক এই প্যাশন— সংরাগ। তাতে ভুলচুক হবে— হোক-না— নির্ভুলতম ঘুমের চেয়েও ভুলে-ভরা জাগার দাম ঢের বেশি নয় কি?

'শেষ কথা সুরবিহারের সম্বন্ধে। ইংরেজি ইম্প্রভাইজেশন কথাটির তুমি বাংলা করেছ সুরবিহার (বেশ তর্জমা হয়েছে)— এও আমি ভালোবাসি। এতে যে গুণী ছাড়া পায় তাও মানি। আমার অনেক গান আছে যাতে গুণী এ রকম ছাড়া পেতে পারেন অনেকখানি। আমার আপত্তি এখানে মূলনীতি নিয়ে নয়, তার প্রয়োগ নিয়ে।

'কতখানি ছাড়া দেব? আর, কাকে? বড়ো প্রতিভা যে বেশি স্বাধীনতা দাবি করতে পারে এ কথা কে অস্বীকার করবে? কিন্তু, এ ক্ষেত্রে ছোটো বড়োর তফাত আছেই, যে কথা সেদিন বলেছিলাম।

'আর-একটা কথা। গানের গতি অনেকখানি তরল, কাজেই তাতে গায়ককে খানিকটা স্বাধীনতা তো দিতেই হবে, না দিয়ে গতি কী? ঠেকাব কী করে? তাই, আদর্শের দিক দিয়েও আমি বলি নে যে, আমি যা ভেবে অমুক সুর দিয়েছি তোমাকে গাইবার সময়ে সেই ভাবেই ভাবিত হতে হবে। তা যে হতেই পারে না। কারণ, গলা তো তোমার এবং তোমার গলায় তুমি তো গোচর হবেই। তাই এক্‌স্‌প্রেশনের ভেদ থাকবেই যাকে তুমি বলছ ইন্টারপ্রেটেশনের স্বাধীনতা। বলছিলে বিলেতেও গায়ক-বাদকের এ স্বাধীনতা মঞ্জুর। মঞ্জুর হতে বাধ্য। সাহানার মুখে যখন আমার গান শুনতাম তখন কি আমি শুধু আপনাকেই শুনতাম? না তো। সাহানাকেও শুনতাম ; বলতে হত : আমার গান সাহানা গাইছে। তোমার ঢঙের সম্বন্ধে আমার বক্তব্য এই-যে তোমার একটা নিজস্ব ঢঙ গড়ে উঠেছে, এটা তো খুবই বাঞ্ছনীয়। তাই তোমার স্বকীয় ঢঙে তুমি 'হে ক্ষণিকের অতিথি' গাইলে যে ভাবে, আমার সুরের গঠনভঙ্গি রেখে এক্‌স্‌প্রেশনের যে স্বাধীনতা তুমি নিলে, তাতে আমি সত্যিই খুশি হয়েছি। এ গান তুমি গ্রামোফোনে দিতে চাইছ, দিয়ো— আমার আপত্তি নেই। কারণ, এতে আমার সুররূপের কাঠামোটি (structureটি) জখম হয় নি। তোমার এ কথা আমিও স্বীকার করি যে, সুরকারের সুর বজায় রেখেও এক্‌স্‌প্রেশনে কম-বেশি স্বাধীনতা চাইবার এক্তিয়ার গায়কের আছে। কেবল প্রতিভা অনুসারে কম ও বেশির মধ্যে তফাত আছে এ কথাটি ভুলো না। প্রতিভাবানকে যে স্বাধীনতা দেব অকুণ্ঠে গড়পড়তা গায়ক ততখানি স্বাধীনতা চাইলে 'না' করতেই হবে।'

কবির বলা কথাগুলি লিখলাম দ্বিপ্রহরে ও বিকেলে তাঁকে পড়ে শোনালাম। কবি খুশি হয়ে বললেন, 'কথাগুলি আমারই এ কথা স্বচ্ছন্দে বলতে পারি, লেখাও খুব ভালো হয়েছে, তুমি ছাপতে পারো।'

৬

কালিম্পঙ। ৯ জুন ১৯৩৮

...'ললিতসৃষ্টিতে যখন প্রথম দিকে মানুষ খানিকটা চলে আধোছায়া আধোআলোর রাজ্যে তখন অপরে যদি উৎসাহ দেয় তা হলে দেখা যায়— ছায়া কাটে, আলো বাড়ে। সে সময়ে তাই বড়ো

কৃতজ্ঞ বোধ হয় যখন দেখি যে আমি যা উপলব্ধি করছি অপরের মনেও তার রঙ ধরছে— তাই না তারা সায় দিল প্রশংসার ঢেউ তুলে। কিন্তু, পরে— যখন আমাদের আত্মপ্রতীতি দানা বাঁধে, গোধূলির ছায়া যখন আলোর কাছে হার মানে, তখন কী দরকার অপরের স্বীকৃতির? তখন কি মনে হয় না— আমি যা পেয়েছি তা যখন নিশ্চয়ই পেয়েছি তখন অপরের না করায় তো আর সেটা না পাওয়া হয়ে যেতে পারে না? আনন্দ হল সৃষ্টি অনুষঙ্গী, নিত্যসঙ্গী— সে যখন এসে বলে 'অয়মহং ভোঃ— আমি আছি হে' তখন তাকে নামঞ্জুর করবে সাধ্য কার? কাজেই তখনো কেন আমরা হাত পাতব অপরের কাছে— তা সে আমাদের সমসাময়িকদের কাছেই হোক বা নিত্যকালের ভাবী সভাসদ্‌দের কাছেই হোক? স্বয়ং আত্মপ্রতীতি যখন শিরোপা দিল তখন অপরের সেলামি তৃপ্তি দিতে পারে, কিন্তু অপরিহার্য সে নয়।

...

...'আমি যখন গান বাঁধি তখনি সব চেয়ে আনন্দ পাই। মন বলে— প্রবন্ধ লিখি, বক্তৃতা দিই, কর্তব্য করি, এ-সবই এর কাছে তুচ্ছ। আমি একবার লিখেছিলাম—

যবে কাজ করি,
    প্রভু দেয় মোরে মান।
যবে গান করি,
    ভালোবাসে ভগবান।

এ কথা বলি কেন?— এইজন্যে যে, গানে যে আলো মনের মধ্যে বিছিয়ে যায় তার মধ্যে আছে এই দিব্যবোধ যে, যা পাবার নয় তাকেই পেলাম আপন ক'রে নতুন ক'রে। এই বোধ যে, জীবনের হাজারো অবান্তর সংঘর্ষ হানাহানি তর্কাতর্কি এ-সব এর তুলনায় বাহ্য— এই-ই হল সারবস্তু— কেননা, এ হল আনন্দলোকের বস্তু, যে লোক জৈবলীলার আদিম উৎস। প্রকাশলীলায় গান কি না সব চেয়ে সূক্ষ্ম— ethereal— তাই তো সে অপরের স্বীকৃতির স্থূলতার অপেক্ষা রাখে না। শুধু তাই নয়, নিজের হৃদয়ের বাণীকে সে রাঙিয়ে তোলে সুরে। যেমন, ধরো, যখন ভালোবাসার গান গাই তখন পাই শুধু গানের আনন্দকেই না ; ভালোবাসার উপলব্ধিকেও মেলে এমন এক নতুন নৈশ্চিত্যের মধ্যে দিয়ে যে, মন বলে পেয়েছি তাকে যে অধরা, যে আলোকবাসী, যে 'কাছের থেকে দেয় না ধরা— দূরের থেকে ডাকে'।

'কিন্তু, তা ব'লে এ কথা মনে করে বোসো না যেন যে, নিত্যকালের সাড়াকে আমি অস্বীকার করছি। বরং নিত্যকালকে মানি ব'লেই বর্তমান কালকে অতিস্বীকারের মর্যাদা দিতে বাধে। না বেধেই পারে না। কারণ, প্রতি যুগের মধ্যেই আছে বটে কয়েকটি নিত্যকালের মন, যাদের নাম রসিক মন— কিন্তু, বাকি সব? তাদের মন তো নিত্যমন নয়, সত্য রসিক তো তারা নয়। অতীত কালের সাড়া দেবার নানান ধারা পর্যালোচনা ক'রে ও ভাবী কালের সাড়া কল্পনা করে তবে এ কথা বুঝতে পারি, চিনতে পারি তাদেরকে যাদের জন্যে গান বাঁধি, কবিতা লিখি।...

'য়ুরোপে প্রথম যৌবনে যখন আমি ওদের গান শুনতে যাই তখন আমার ভালো লাগে নি। কিন্তু, আমি দেখতাম সার বেঁধে পরপর ওরা দাঁড়িয়ে থাকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা টিকিটের জন্যে। কী যে আগ্রহ, কী যে আনন্দ ওদের ভালো কন্‌সার্ট-হলে ভালো গান শুনে— দেখেছ তো তুমিও স্বচক্ষে। প্রথম-প্রথম আমি বুঝতাম না ওদের গান। কিন্তু তা ব'লে এ কথা কখনো বলি নি যে,

ওদের কী যে সব বাজে গান! বলতাম আমিই বুঝতে পারছি না এর মর্ম, ওদের গানের ইডিয়ম জানি নে ব'লে শিখি নি ব'লে। অর্থাৎ, ওদের গানে প্রথম-প্রথম আনন্দ না পেলেও এমন অশ্রদ্ধার কথা কোনোদিন বলি নি যে, আনন্দ পাওয়াটা ওদের অন্যায়।

'এইখানেই আসে শ্রদ্ধার কথা ; তুমি যাকে বলছ সাড়ার বৃত্ত তা পূরে ওঠে এই শ্রদ্ধা থাকলে তবেই। কিন্তু, এ-সব সময়ে সাড়া না পাওয়াটা স্রষ্টার কাছে যতখানি দুর্ভাগ্য তার দশগুণ দুর্ভাগ্য তাদের— যারা সাড়া দিতে পারল না। আক্ষেপ হয় সত্যিই তাদের কথা ভেবে। কারণ, স্রষ্টা যখন সত্য সৃষ্টি করলেন তখন গ্রহীতারা সবাই মুখ ফেরালেও তাঁর আনন্দের তো মার নেই, তিনি তো পেলেন সৃষ্টির আলো আকাশ বাতাস আনন্দ। কিন্তু যে দুর্ভাগা এ আলোয় এ হাওয়ায় এ আনন্দে সাড়া দিতে পারল না, কিছুই পেল না, তার চেয়ে শোচনীয় অবস্থা আর কার বলো।...'

পুরাতন প্রসঙ্গ

একদিকে... individual... আর একদিকে universal.... কিন্তু ওয়াগনার ও বেটোভেনের মতো বিপুল মানবসমাজের বিচিত্র সুখদুঃখের ঘাতপ্রতিঘাত একটা বিরাট ছন্দে এর মধ্যে ধ্বনিত হয়ে ওঠে না। য়ুরোপের সংগীত এক্লার আনন্দের কিংবা বেদনার জিনিস নয়, বিজনের সামগ্রী একেবারেই হতে পারে না, সে individual নয়, সে human.../তার বৈচিত্র্য ও বিপুলতা একেবারে আমাদের অভিভূত করে ফেলে।... কেমন করে দুইয়ের সামঞ্জস্য বিধান করা যেতে পারে [য়ুরোপীয়ে ও ভারতীয়ে], এ এক কঠিন সমস্যা।

—বিপিনবিহারী গুপ্ত "শান্তিনিকেতনে এক রাত্রি",
'মানসী ও মর্ম্মবাণী', চৈত্র ১৩২৬ পৃ ১৮৬

ছিন্নপত্রাবলী

ইন্দিরা দেবীকে লিখিত

কলকাতা। জুন ১৮৮৯

ভৈরবী সুরের মোচড়গুলো কানে এলে জগতের প্রতি এক রকম বিচিত্র ভাবের উদয় হয়... মনে হয় একটা নিয়মের হস্ত অবিশ্রাম আর্গিন যন্ত্রের হাতা ঘোরাচ্ছে এবং সেই ঘর্ষণবেদনায় সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মর্মস্থল হতে একটা গম্ভীর কাতর করুণ রাগিণী উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠছে— সকাল বেলাকার সূর্যের সমস্ত আলো ম্লান হয়ে এসেছে, গাছপালারা নিস্তব্ধ হয়ে কী যেন শুনছে এবং আকাশ একটা বিশ্বব্যাপী অশ্রুর বাষ্পে যেন আচ্ছন্ন হয়ে রয়েছে— অর্থাৎ, দূর আকাশের দিকে চাইলে মনে হয় যেন একটা অনিমেষ নীল চোখ কেবল ছল্‌ছল্‌ করে চেয়ে আছে।

পতিসর। ১৮ জানুয়ারি ১৮৯১

ভারতবর্ষের যেমন বাধাহীন পরিষ্কার আকাশ, বহুদূরবিস্তৃত সমতলভূমি আছে, এমন য়ুরোপের কোথাও আছে কি না সন্দেহ। এইজন্যে আমাদের জাতি যেন বৃহৎ পৃথিবীর সেই অসীম ঔদাস্য আবিষ্কার করতে পেরেছে। এইজন্যে আমাদের পূরবীতে কিংবা টোড়িতে সমস্ত বিশাল জগতের

অন্তরের হাহাধ্বনি যেন ব্যক্ত করছে, কারো ঘরের কথা নয়। পৃথিবীর একটা অংশ আছে যেটা কর্মপটু, স্নেহশীল, সীমাবদ্ধ, তার ভাবটা আমাদের মনে তেমন প্রভাব বিস্তার করবার অবসর পায় নি। পৃথিবীর যে ভাবটা নির্জন, বিরল, অসীম, সেই আমাদের উদাসীন করে দিয়েছে। তাই সেতারে যখন ভৈরবীর মীড় টানে, আমাদের ভারতবর্ষীয় হৃদয়ে একটা টান পড়ে।

শিলাইদহ। ৬ অক্টোবর ১৮৯১

পর্‌শুদিন অমনি বোটের জানলার কাছে চুপ করে বসে আছি, একটা জেলেডিঙিতে একজন মাঝি গান গাইতে গাইতে চলে গেল— খুব যে সুস্বর তা নয়— হঠাৎ মনে পড়ে গেল বহুকাল হল ছেলেবেলায় বাবামশায়ের সঙ্গে বোটে করে পদ্মায় আসছিলুম— একদিন রাত্তির প্রায় দুটোর সময় ঘুম ভেঙে যেতেই বোটের জানলাটা তুলে ধরে মুখ বাড়িয়ে দেখলুম নিস্তরঙ্গ নদীর উপরে ফুট্‌ফুটে জ্যোৎস্না হয়েছে, একটি ছোট্ট ডিঙিতে একজন ছোকরা একলা দাঁড় বেয়ে চলেছে, এমনি মিষ্টি গলায় গান ধরেছে— গান তার পূর্বে তেমন মিষ্টি কখনো শুনি নি। হঠাৎ মনে হল আবার যদি জীবনটা ঠিক সেইদিন থেকে ফিরে পাই! আর একবার পরীক্ষা করে দেখা যায়— এবার তাকে আর তৃষিত শুষ্ক অপরিতৃপ্ত করে ফেলে রেখে দিই নে— কবির গান গলায় নিয়ে একটি ছিপ্‌ছিপে ডিঙিতে জোয়ারের বেলায় পৃথিবীতে ভেসে পড়ি, গান গাই এবং বশ করি এবং দেখে আসি পৃথিবীতে কোথায় কী আছে; আপনাকেও একবার জানান দিই, অন্যকেও একবার জানি; জীবনে যৌবনে উচ্ছ্বসিত হয়ে বাতাসের মতো একবার হু হু করে বেড়িয়ে আসি, তার পরে ঘরে ফিরে এসে পরিপূর্ণ প্রফুল্ল বার্ধক্য কবির মতো কাটাই।

সাজাদপুর। ৫ জুলাই ১৮৯২

আজ সকালে একটা সানাইয়েতে ভৈরবী বাজাচ্ছিল, এমনি অতিরিক্ত মিষ্টি লাগছিল যে সে আর কী বলব— আমার চোখের সামনেকার শূন্য আকাশ এবং বাতাস পর্যন্ত একটা অন্তর্নিরুদ্ধ ক্রন্দনের আবেগে যেন স্ফীত হয়ে উঠছিল— বড়ো কাতর কিন্তু বড়ো সুন্দর— সেই সুরটাই গলায় কেন যে তেমন করে আসে না বুঝতে পারি নে। মানুষের গলার চেয়ে কাঁসার নলের ভিতরে কেন এত বেশি ভাব প্রকাশ করে! এখন আবার তারা মুলতান বাজাচ্ছে— মনটা বড়োই উদাস করে দিয়েছে— পৃথিবীর এই সমস্ত সবুজ দৃশ্যের উপরে একটি অশ্রুবাষ্পের আবরণ টেনে দিয়েছে— এক-পর্দা মুলতান রাগিণীর ভিতর দিয়ে সমস্ত জগৎ দেখা যাচ্ছে। যদি সব সময়েই এই রকম এক-একটা রাগিণীর ভিতর দিয়ে জগৎ দেখা যেত, তা হলে বেশ হত। আমার আজকাল ভারি গান শিখতে ইচ্ছে করে— বেশ অনেকগুলো ভূপালী... এবং করুণ বর্ষার সুর— অনেক বেশ ভালো ভালো হিন্দুস্থানী গান— গান প্রায় কিচ্ছুই জানি নে বললেই হয়।

সাজাদপুর। ১০ জুলাই ১৮৯৩

'বড়ো বেদনার মতো' গানের সুরটা ঠিক হয়তো মজলিসি বৈঠকি নয়।... এ-সব গান যেন একটু নিরালায় গাবার মতো। সুরটা যে মন্দ হয়েছে এমন আমার বিশ্বাস নয়, এমন-কি ভালো হয়েছে বললে খুব বেশি অত্যুক্তি হয় না। ও গানটা আমি নাবার ঘরে অনেক দিন একটু একটু করে সুরের সঙ্গে সঙ্গে তৈরি করেছিলুম— নাবার ঘরে গান তৈরি করবার ভারি কতকগুলি সুবিধা

আছে। প্রথমত নিরালা, দ্বিতীয়ত অন্য কোনো কর্তব্যের কোনো দাবি থাকে না— মাথায় এক-টিন জল ঢেলে পাঁচ মিনিট গুন্ গুন্ করলে কর্তব্যজ্ঞানে বিশেষ আঘাত লাগে না— সব চেয়ে সুবিধা হচ্ছে কোনো দর্শকসম্ভাবনা-মাত্র না থাকাতে সমস্ত মন খুলে মুখভঙ্গি করা যায়। মুখভঙ্গি না করলে গান তৈরি করবার পুরো অবস্থা কিছুতেই আসে না। ওটা কিনা ঠিক যুক্তিতর্কের কাজ নয়, নিছক ক্ষিপ্তভাব। এ গানটা আমি এখনো সর্বদা গেয়ে থাকি— আজ প্রাতঃকালেও অনেকক্ষণ গুন্‌গুন্ করেছি, গাইতে গাইতে গভীর একটা ভাবোন্মাদও জন্মায়। অতএব এটা যে আমার একটা প্রিয় গান সে বিষয়ে আমার কোনো সন্দেহ নেই।

কলকাতা। ২১ জুলাই ১৮৯৪

সেদিন অ[ভি] যখন গান করছিল আমি ভাবছিলুম মানুষের সুখের উপকরণগুলি যে খুব দুর্লভ তা নয়, পৃথিবীতে মিষ্টি গলার গান নিতান্ত অসম্ভব আইডিয়ালের মধ্যে নয়, অথচ ওতে যে আনন্দ পাওয়া যায় তা অত্যন্ত গভীর। কিন্তু জিনিসটি যতই সুলভ হোক, ওর জন্যে যথোপযুক্ত অবকাশ করে নেওয়া ভারি শক্ত। যে ইচ্ছাপূর্বক গান গাবে এবং যে ইচ্ছাপূর্বক গান শুনবে পৃথিবীতে কেবল এই দুটি মাত্র লোক নেই, চতুর্দিকে অধিকাংশ লোক আছে যারা গান গাবেও না গান শুনবেও না। তাই সব-সুদ্ধ মিশিয়ে ও আর হয়েই ওঠে না।

শিলাইদহ। ১০ অগস্ট ১৮৯৪

আমার মনে হয় দিনের জগৎটা য়ুরোপীয় সংগীত, সুরে-বেসুরে খণ্ডে-অংশে মিলে একটা গতিশীল প্রকাণ্ড হার্মনির জটলা— আর, রাত্রের জগৎটা আমাদের ভারতবর্ষীয় সংগীত, একটি বিশুদ্ধ করুণ গম্ভীর অমিশ্র রাগিণী। দুটোই আমাদের বিচলিত করে, অথচ দুটোই পরস্পরবিরোধী। আমাদের নির্জন এককের গান, য়ুরোপের সজন লোকালয়ের গান। আমাদের গানে শ্রোতাকে মনুষ্যের প্রতিদিনের সুখদুঃখের সীমা থেকে বের করে নিয়ে নিখিলের মূলে যে-একটি সঙ্গীহীন বৈরাগ্যের দেশ আছে সেইখানে নিয়ে যায়, আর য়ুরোপের সংগীত মনুষ্যের সুখ-দুঃখের অনন্ত উত্থানপতনের মধ্যে বিচিত্রভাবে নৃত্য করিয়ে নিয়ে চলে।

পতিসর। ১০ সেপ্টেম্বর ১৮৯৪

রামকেলি প্রভৃতি সকাল বেলাকার যে-সমস্ত সুর কলকাতায় নিতান্ত অভ্যস্ত এবং প্রাণহীন বোধ হয়, এখানে তার একটু আভাসমাত্র দিলেই অমনি তার সমস্তটা সজীব হয়ে ওঠে। তার মধ্যে এমন একটা অপূর্ব সত্য এবং নবীন সৌন্দর্য দেখা দেয়, এমন একটা বিশ্বব্যাপী গভীর করুণা বিগলিত হয়ে চারি দিককে বাষ্পাকুল করে তোলে যে, এই রাগিণীকে সমস্ত আকাশ এবং সমস্ত পৃথিবীর গান বলে মনে হতে থাকে। এ একটা ইন্দ্রজাল, একটা মায়ামন্ত্রের মতো। আমার সুরের সঙ্গে কত টুকরো টুকরো কথা যে আমি জুড়ি তার আর সংখ্যা নেই— এমন এক লাইনের গান সমস্ত দিন কত জমছে এবং কত বিসর্জন দিচ্ছি। রীতিমতো বসে সেগুলোকে পুরো গানে বাঁধতে ইচ্ছা করছে না।... আজ সমস্ত সকাল নিতান্ত সাদাসিধা ভৈরবী রাগিণীতে যে গোটা দুই-তিন ছত্র ক্রমাগত আবৃত্তি করছিলুম সেটুকু মনে আছে এবং নমুনা-স্বরূপে নিম্নে উদ্‌ধৃত করা যেতে পারে।—

ওগো তুমি নব নব রূপে এসো প্রাণে। (আমার নিত্যনব!)
এসো গন্ধ বরন গানে!
আমি যে দিকে নিরখি তুমি এসো হে
আমার মুগ্ধ মুদিত নয়ানে!

কলকাতা। ২১ নভেম্বর ১৮৯৪

কর্মক্লিষ্ট সন্দেহপীড়িত বিয়োগশোককাতর সংসারে ভিতরকার যে চিরস্থায়ী সুগভীর দুঃখটি, ভৈরবী রাগিণীতে সেইটিকে একেবারে বিগলিত করে বের করে নিয়ে আসে। মানুষে মানুষে সম্পর্কের মধ্যে যে-একটি নিত্যশোক নিত্যভয় নিত্যমিনতির ভাব আছে, আমাদের হৃদয় উদ্‌ঘাটন করে ভৈরবী সেই কান্নাটিকে মুক্ত করে দেয়— আমাদের বেদনার সঙ্গে জগদ্‌ব্যাপী বেদনার সম্পর্ক স্থাপন করে দেয়। সত্যিই তো আমাদের কিছুই স্থায়ী নয়, কিন্তু প্রকৃতি কী এক অদ্ভুত মন্ত্রবলে সেই কথাটিই আমাদের সর্বদা ভুলিয়ে রেখেছে— সেইজন্যেই আমরা উৎসাহের সহিত সংসারের কাজ করতে পারি। ভৈরবীতে সেই চিরসত্য সেই মৃত্যুবেদনা প্রকাশ হয়ে পড়ে ; আমাদের এই কথা বলে দেয় যে, আমরা যা-কিছু জানি তার কিছুই থাকবে না এবং যা চিরকাল থাকবে তার আমরা কিছুই জানি নে।

শিলাইদহ। ২২ ফেব্রুয়ারি ১৮৯৫

আমাদের মুলতান রাগিণীটা এই চারটে-পাঁচটা বেলাকার রাগিণী, তার ঠিক ভাবখানা হচ্ছে— 'আজকের দিনটা কিচ্ছুই করা হয় নি'।... আজ আমি এই অপরাহ্নের ঝিক্‌মিকি আলোতে জলে স্থলে শূন্যে সব জায়গাতেই সেই মুলতান রাগিণীটাকে তার করুণ চড়া অন্তরা-সুদ্ধ প্রত্যক্ষ দেখতে পাচ্ছি— না সুখ, না দুঃখ, কেবল আলস্যের অবসাদ এবং তার ভিতরকার একটা মর্মগত বেদনা।

শিলাইদহ। ১ মার্চ ১৮৯৫

এক-একটা গান যেমন আছে যার আস্থায়ীটা বেশ, কিন্তু অন্তরাটা ফাঁকি— আস্থায়ীতেই সুরের সমস্ত বক্তব্যটা সম্পূর্ণরূপে শেষ হওয়াতে কেবল নিয়মের বশ হয়ে একটা অনাবশ্যক অন্তরা জুড়ে দিতে হয়। যেমন আমার সেই 'বাজিল কাহার বীণা মধুর স্বরে' গানটা— তাতে সুরের কথাটা গোড়াতেই শেষ হয়ে গেছে, অথচ কবির মনের কথাটা শেষ না হওয়াতে গান যেখানে থামতে চাচ্ছে কথাকে তার চেয়ে বেশি দূর টেনে নিয়ে যাওয়া গেছে।

কলকাতা। ২ মে ১৮৯৫

আমাদের কাছে আমাদের প্রতিদিনের সংসারটা ঠিক সামঞ্জস্যময় নয়— তার কোনো তুচ্ছ অংশ হয়তো অপরিমিতি বড়ো, ক্ষুধাতৃষ্ণা ঝগড়াঝাঁটি আরাম-ব্যারাম টুকিটাকি খুঁটিনাটি খিটিমিটি এইগুলিই প্রত্যেক বর্তমান মুহূর্তকে কণ্টকিত করে তুলছে, কিন্তু সংগীত তার নিজের ভিতরকার সুন্দর সামঞ্জস্যের দ্বারা মুহূর্তের মধ্যে যেন কী-এক মোহমন্ত্রে সমস্ত সংসারটিকে এমন একটি

পারস্‌পেক্‌টিভের মধ্যে দাঁড় করায় যেখানে ওর ক্ষুদ্র ক্ষণস্থায়ী অসামঞ্জস্যগুলো আর চোখে পড়ে না— একটা সমগ্র একটা বৃহৎ একটা নিত্য সামঞ্জস্য-দ্বারা সমস্ত পৃথিবী ছবির মতো হয়ে আসে এবং মানুষের জন্ম-মৃত্যু হাসি-কান্না ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্তমানের পর্যায় একটি কবিতার সকরুণ ছন্দের মতো কানে বাজে। সেইসঙ্গে আমাদেরও নিজ নিজ ব্যক্তিগত প্রবলতা তীব্রতার হ্রাস হয়ে আমরা অনেকটা লঘু হয়ে যাই এবং একটি সংগীতময়ী বিস্তীর্ণতার মধ্যে অতি সহজে আত্মবিসর্জন করে দিই। ক্ষুদ্র এবং কৃত্রিম সমাজ-বন্ধনগুলি সমাজের পক্ষে বিশেষ উপযোগী, অথচ সংগীত এবং উচ্চ অঙ্গের আর্ট মাত্রেই সেইগুলির অকিঞ্চিৎকরতা মুহূর্তের মধ্যে উপলব্ধি করিয়ে দেয়— সেইজন্যে আর্ট মাত্রেরই ভিতর খানিকটা সমাজনাশকতা আছে— সেইজন্যে ভালো গান কিংবা কবিতা শুনলে আমাদের মধ্যে একটা চিত্তচাঞ্চল্য জন্মে, সমাজের লৌকিকতার বন্ধন ছেদন করে নিত্য-সৌন্দর্যের স্বাধীনতার জন্যে মনের ভিতরে একটা নিষ্ফল সংগ্রামের সৃষ্টি হতে থাকে— সৌন্দর্যমাত্রেই আমাদের মনে অনিত্যের সঙ্গে নিত্যের একটা বিরোধ বাধিয়ে দিয়ে অকারণ বেদনার সৃষ্টি করে।

সাজাদপুর। ৫ জুলাই ১৮৯৫

কাল অনেক রাত পর্যন্ত নহবতে কীর্তনের সুর বাজিয়েছিল ; সে বড়ো চমৎকার লাগছিল, আর ঠিক এই পাড়াগাঁয়ের উপযুক্ত হয়েছিল— যেমন সাদাসিধে তেমনি সকরুণ... সেকালের রাজাদের বৈতালিক ছিল— তারা ভিন্ন ভিন্ন সময়ে গান গেয়ে প্রহর জানিয়ে দিত, এই নবাবিটা আমার লোভনীয় মনে হয়।

শিলাইদহ। ২০ সেপ্টেম্বর ১৮৯৫

সংগীতের মতো এমন আশ্চর্য ইন্দ্রজালবিদ্যা জগতে আর কিছুই নেই— এ এক নূতন সৃষ্টিকর্তা। আমি তো ভেবে পাই নে— সংগীত একটা নতুন মায়াজগৎ সৃষ্টি করে না এই পুরাতন জগতের অন্তরতম অপরূপ নিত্যরাজ্য উদ্‌ঘাটিত করে দেয়। গান প্রভৃতি কতকগুলি জিনিস আছে যা মানুষকে এই কথা বলে যে, 'তোমরা জগতের সকল জিনিসকে যতই পরিষ্কার বুদ্ধিগম্য করতে চেষ্টা করো-না কেন এর আসল জিনিসটাই অনির্বচনীয়' এবং তারই সঙ্গে আমাদের মর্মের মর্মান্তিক যোগ— তারই জন্যে আমাদের এত দুঃখ, এত সুখ, এত ব্যাকুলতা।

শিলাইদহ। ২৬ সেপ্টেম্বর ১৮৯৫

প্রকৃতির সঙ্গে গানের যত নিকট সম্পর্ক এমন আর কিছু না— আমি নিশ্চয় জানি এখনি যদি আমি জানলার বাইরে দৃষ্টি রেখে রামকেলি ভাঁজতে আরম্ভ করি তা হলে এই রৌদ্ররঞ্জিত সুদূরবিস্তৃত শ্যামলনীল প্রকৃতি মন্ত্রমুগ্ধ হরিণীর মতো আমার মর্মের কাছে এসে আমাকে অবলেহন করতে থাকবে। যতবার পদ্মার উপর বর্ষা হয় ততবারই মনে করি মেঘমল্লারে একটা নতুন বর্ষার গান রচনা করি... কথা তো ঐ একই— বৃষ্টি পড়ছে, মেঘ করেছে, বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। কিন্তু তার ভিতরকার নিত্যনূতন আবেগ, অনাদি অনন্ত বিরহবেদনা, সেটা কেবল গানের সুরে খানিকটা প্রকাশ পায়।

শিলাইদহ। ১৫ ডিসেম্বর ১৮৯৫

কাল সন্ধ্যাবেলায় যখন এই সান্ধ্যপ্রকৃতির মধ্যে সমস্ত অন্তঃকরণ পরিপ্লুত হয়ে জলিবোটে করে সোনালি অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে আস্তে আস্তে ফিরে আসছি এমন সময়ে হঠাৎ দূরের এক অদৃশ্য নৌকো থেকে বেহালা যন্ত্রে প্রথমে পূরবী ও পরে ইমনকল্যাণে আলাপ শোনা গেল— সমস্ত স্থির নদী এবং স্তব্ধ আকাশ মানুষের হৃদয়ে একেবারে পরিপূর্ণ হয়ে গেল। ইতিপূর্বে আমার মনে হচ্ছিল মানুষের জগতে এই সন্ধ্যাপ্রকৃতির তুলনা বুঝি কোথাও নেই— যেই পূরবীর তান বেজে উঠল অমনি অনুভব করলুম এও এক আশ্চর্য গভীর এবং অসীম সুন্দর ব্যাপার, এও এক পরম সৃষ্টি— সন্ধ্যার সমস্ত ইন্দ্রজালের সঙ্গে এই রাগিণী এমনি সহজে বিস্তীর্ণ হয়ে গেল, কোথাও কিছুই ভঙ্গ হল না— আমার সমস্ত বক্ষস্থল ভরে উঠল।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরকে লিখিত পত্র

রামগড়। ২০ জ্যৈষ্ঠ ১৩২১/৩ জুন ১৯১৪

ভাই জ্যোতিদাদা,... গান অনেক তৈরী হয়েচে। এখনো থামচে না— প্রায় রোজই একটা না একটা চলছে। আমার মুস্কিল এই যে সুর দিয়ে আমি সুর ভুলে যাই। দিনু কাছে থাকলে তাকে শিখিয়ে দিয়ে বেশ নিশ্চিন্ত মনে ভুলতে পারি। নিজে যদি স্বরলিপি করতে পারতুম কথাই ছিল না। দিনু মাঝে মাঝে করে, কিন্তু আমার বিশ্বাস সেগুলো বিশুদ্ধ হয় না। সুরেন বাঁড়ুজ্যের সঙ্গে আমার দেখাই হয় না--- কাজেই আমার খাতা এবং দিনুর পেটেই সমস্ত জমা হচ্চে। এবার বিবি সেটা কতক লিখে নিয়েছে। কলকাতায়... এ-সব গান গাইতে গিয়ে দেখি কেমন ম্লান হয়ে যায়—তাই ভাবি, এগুলো হয়তো বিশেষ কারো কাজে লাগবে না।

দ্রষ্টব্য অসিতকুমার হালদার, 'রবিতীর্থে' (১৩৬৫) পৃ ৫২

ইন্দিরাদেবীকে লিখিত

১৩ জানুয়ারি ১৯৩৫

গানের কাগজে রাগ রাগিণীর নাম-নির্দেশ না থাকাই ভালো। নামের মধ্যে তর্কের হেতু থাকে, রূপের মধ্যে না। কোন্ রাগিণী গাওয়া হচ্ছে বলবার কোনো দরকার নেই। কী গাওয়া হচ্ছে সেইটেই মুখ্য কথা কেননা তার সত্যতা তার নিজের মধ্যেই চরম। নামের সত্যতা দশের মুখে, সেই দশের মধ্যে মতের মিল না থাকতে পারে। কলিযুগে শুনেছি নামেই মুক্তি, কিন্তু গান চিরকালই সত্যযুগে।

২

? ২ জুন ১৯৩৬

আমার আধুনিক গানে রাগ-তালের উল্লেখ না থাকাতে আক্ষেপ করেছিস। সাবধানের বিনাশ নেই। ওস্তাদরা জানেন আমার গানে রূপের দোষ আছে, তার পরে যদি নামেরও ভুল হয় তা হলে দাঁড়াব কোথায়? ধূর্জটিকে দিয়ে নামকরণ করিয়ে নিস।

অষ্টমখণ্ড চিঠিপত্র

প্রিয়নাথ সেনকে লিখিত

১৯১৫?

গানের কবিত্ব সম্বন্ধে যা লিখেছ সবই মানি। কেবল একটা কথা ঠিক নয়। মাথায় কবিতা সম্বন্ধে কোনো থিওরিই নেই। গান লিখি, তাতে সুর বসিয়ে গান গাই— ঐটুকুই আমার আশু দরকার— আমার আর কবিত্বের দিন নেই। পূর্বেই বলেছি ফুল চিরদিন ফোটে না— যদি ফুটত তো ফুটতই, তাগিদের কোনো দরকার হত না। এখন যা গান লিখি তা ভালো কি মন্দ সে কথা ভাববার সময়ই নেই। যদি বল তবে ছাপাই কেন, তার কারণ হচ্ছে ওগুলি আমার একান্তই অন্তরের কথা— অতএব কারো-না-কারো অন্তরের কোনো প্রয়োজন ওতে মিটতে পারে— ও গান যার গাবার দরকার সে একদিন গেয়ে ফেলে দিলেও ক্ষতি নেই, কেননা আমার যা দরকার তা হয়েছে। যিনি গোপনে অপূর্ণ প্রয়াসের পূর্ণতা সাধন করে দেন তাঁরই পাদপীঠের তলায় এগুলি যদি বিছিয়ে দিতে পারি, এ জন্মের মতো তা হলেই আমার বকশিশ মিলে গেল ; এর বেশি এখন আমার আর শক্তি নেই। এখন মূল্য আদায় করব এমন আয়োজন করব কী দিয়ে, এখন প্রসাদ পাব সেই প্রত্যাশায় বসে আছি। তোমরা সেই আশীর্বাদই আমাকে কোরো— হাটের ব্যাপারী এখন দ্বারের ভিখারী হয়ে যেন দিন কাটাতে পারে।

পথে ও পথের প্রান্তে

নির্মলকুমারী মহলানবিশকে লিখিত পত্র

[শান্তিনিকেতন] ৮ অগস্ট ১৯২

গদ্যরচনায় আত্মশক্তির, সুতরাং আত্মপ্রকাশের, ক্ষেত্র খুবই প্রশস্ত। হয়তো ভাবীকালে সংগীতটাও বন্ধনহীন গদ্যের গূঢ়তর বন্ধনকে আশ্রয় করবে। কখনো কখনো গদ্যরচনায় সুরসংযোগ করবার ইচ্ছা হয়। লিপিকা কি গানে গাওয়া যায় না ভাবছ?

কোপেনহেগেন। ৮ অগস্ট ১৯৩

য়ুরোপের সংগীত প্রকাণ্ড এবং প্রবল এবং বিচিত্র, মানুষের বিজয়রথের উপর থেকে বেজে উঠছে। ধ্বনিটা দিগ্‌দিগন্তের বক্ষস্থল কাঁপিয়ে তুলছে। বলে উঠতেই হয়— বাহবা! কিন্তু আমাদের রাখালী বাঁশিতে যে রাগিণী বাজছে সে আমার একলার মনকে ডাক দেয় একলার দিকে সেই পথ দিয়ে যে পথে পড়েছে বাঁশবনের ছায়া, চলেছে জলভরা কলসি নিয়ে গ্রামের মেয়ে, ঘুঘু ডাকছে আমগাছের ডালে, আর দূর থেকে শোনা যাচ্ছে মাঝিদের সারিগান— মন উতলা করে দেয়, চোখটা ঝাপসা করে দেয় একটুখানি অকারণ চোখের জলে। অত্যন্ত সাদাসিধে, সেইজন্যে অত্যন্ত সহজে মনের আঙিনায় এসে আঁচল পেতে বসে।

নির্মলকুমারী মহলানবিশকে লিখিত পত্র

শান্তিনিকেতন ১১।১২।৩৮

...সম্প্রতি বউমা স্থির করেছিল মায়ার খেলা নৃত্যাভিনয় করতে হবে। তাই তার পুনঃ সংস্কারে লেগেছি, যেখানে তার অভাব ছিল পূরণ করচি, কাঁচা ছিল শোধন করচি— গানের পরে গান লেখা চলচে এক একদিনে চারটে পাঁচটা। যৌবনের তরঙ্গে মন দোদুল্যমান— জীর্ণ শরীরটাকে কোথায় কোথায় দূরে ভাসিয়ে দিয়েছে। গানের সুরে যে রকম সৃষ্টির বদল করে দেয় এমন আর কিছুতে নয়। ঘোর শীতের সময় আমার তরুণ জন্ম রাগিণীলোকে অতীতের সমুদ্রপার থেকে সঙ্গে নিয়ে এসেছে বসন্তের দুর্দান্ত হাওয়া— মনের মধ্যে কূজন চলচে, গুঞ্জন চলচে— যে-সব লোক বাইরে থেকে কাজের বা অকাজের হাওয়া নিয়ে আসে তাদের মনে হয় বিদেশী লোক— কেননা তাদের মধ্যে সুরের স্পর্শ একটুও নেই। স্বর-সাধনায় উত্তরসাধিকা— কিন্তু মন্দভাগ্য আমি— কে কোথায়।

—পত্র ৪৫১, দেশ, ৩ চৈত্র ১৩৬৮, পৃ ৫৯৩

দিলীপকুমার রায়কে লিখিত

১৮ অক্টোবর ১৯২৯

গীতাঞ্জলির কয়েকটি গানের ছন্দ সম্বন্ধে কৈফিয়ত চেয়েছ। গোড়াতেই বলে রাখা দরকার— গীতাঞ্জলিতে এমন অনেক কবিতা আছে যার ছন্দোরক্ষার বরাত দেওয়া হয়েছে গানের সুরের 'পরে। অতএব, যে পাঠকের ছন্দের কান আছে তিনি গানের খাতিরে এর মাত্রা কম-বেশি নিজেই দুরস্ত করে নিয়ে পড়তে পারেন, যাঁর নেই তাঁকে ধৈর্য অবলম্বন করতে হবে।

১। 'নব নব রূপে এসো প্রাণে'— এই গানের অন্তিম পদগুলির কেবল অন্তিম দুটি অক্ষরের দীর্ঘ হ্রস্ব স্বরের সম্মান স্বীকৃত হয়েছে। যথা 'প্রাণে' 'গানে' ইত্যাদি। একটিমাত্র পদে তার ব্যতিক্রম আছে। 'এসো দুঃখে সুখে এসো মর্মে'— এখানে 'সুখে'র একার'কে অবাঙালি রীতিতে দীর্ঘ করা হয়েছে। 'সৌখ্যে' কথাটা দিলে বলবার কিছু থাকত না, তবু সেটাতে রাজি হই নি। মানুষ চাপা দেওয়ার চেয়ে মোটর ভাঙা ভালো।

২। 'অমল ধবল পা— লে লেগেছে মন্দ-মুধর হাওয়া'— এ গানে গানই মুখ্য, কাব্য গৌণ। অতএব তালকে সেলাম ঠুকে ছন্দকে পিছিয়ে থাকতে হল। যদি বলো পাঠকেরা তো শ্রোতা নয়, তারা মাফ করবে কেন। হয়তো করবে না— কবি জোড়হাত করে বলবে, 'তাল-দ্বারা ছন্দ রাখিলাম, ত্রুটি মার্জনা করিবেন।'

৩। ৩৪ নম্বরটাও গান।[1] তবুও এর সম্বন্ধে বিশেষ বক্তব্য হচ্ছে এই যে, যে ছন্দগুলি বাংলার প্রাকৃত ছন্দ, অক্ষর গণনা করে তাদের মাত্রা নয়।...

৪। 'নিভৃত প্রাণের দেবতা'— এই গানের ছন্দ তুমি কী নিয়মে পড় আমি ঠিক বুঝতে পারছি নে। 'দেবতা' শব্দের পরে একটা দীর্ঘ যতি আছে, সেটা কি রাখ না? যদি সেই যতিকে মান্য করে থাক তা হলে দেখবে 'দেবতা' এবং 'খোলো দ্বার' মাত্রায় অসমান হয় নি। এ-সব ধ্বনিগত তর্ক

---

[1] 'আমার মিলন লাগি তুমি আসছ কবে থেকে'।

মোকাবিলায় মীমাংসা করাই সহজ। লিখিত বাক্যের দ্বারা এর শেষ সিদ্ধান্তে পৌঁছনো সম্ভব হবে কি না জানি নে। ছাপাখানা-শাসিত সাহিত্যে ছন্দোবিলাসী কবির এই এক মুশকিল— নিজের কণ্ঠ স্তব্ধ, পরের কণ্ঠের করুণার উপর নির্ভর। সেইজন্যেই আমাকে সম্প্রতি এমন কথা শুনতে হচ্ছে যে, আমি ছন্দ ভেঙে থাকি... আকাশের দিকে চেয়ে বলি— 'চতুরানন্, কোন্ কানওয়ালাদের 'পরে এর বিচারের ভার!'

৫। 'আজি গন্ধবিধুর সমীরণে'— কবিতাটি সহজ নিয়মেই পড়া উচিত। অবশ্য, এর পঠিত ছন্দে ও গীত ছন্দে প্রভেদ আছে।

৬। 'জনগণমনঅধিনায়ক' গানটায় যে মাত্রাধিক্যের কথা বলেছ সেটা অন্যায় বল নি। ঐ বাহুল্যের জন্যে 'পঞ্জাব' শব্দের প্রথম সিলেব্‌ল্‌টাকে দ্বিতীয় পদের গেটের বাইরে দাঁড় করিয়ে রাখি—

পন্ / জাব সিন্ধু গুজরাট মরাঠা ইত্যাদি।

'পঞ্জাব'কে 'পঞ্জব' করে নামটার আকার খর্ব করতে সাহস হয় নি, ওটা দীর্ঘকায়াদের দেশ। ছন্দের অতিরিক্ত অংশের জন্যে একটু তফাতে আসন পেতে দেওয়া রীতি বা গীতি বিরুদ্ধ নয়।

২

১০ নভেম্বর ১৯২৯

১। 'আবার এরা ঘিরেছে মোর মন'— এই পঙ্‌ক্তির ছন্দোমাত্রার সঙ্গে 'দাহ আবার বেড়ে ওঠে ক্রমে'র মাত্রার অসাম্য ঘটেছে এই তোমার মত। 'ক্রমে' শব্দটার 'ক্র'র উপর যদি যথোচিত ঝোঁক দাও তা হলে হিসাবের গোল থাকে না। বেড়ে ওঠেক্‌রমে'— বস্তুত সংস্কৃত ছন্দের নিয়মে 'ক্র' পরে থাকাতে 'ওঠে'র 'এ' স্বরবর্ণে মাত্রা বেড়ে ওঠা উচিত। তুমি বলতে পারো আমরা সাধারণত শব্দের প্রথমবর্ণস্থিত 'র'ফলাকে দুই মাত্রা দিতে কৃপণতা করি। 'আক্রমণ' শব্দের 'ক্র'কে তার প্রাপ্য মাত্রা দিই, কিন্তু 'ওঠে ক্রমে'র 'ক্র' হ্রস্বমাত্রায় খর্ব করে থাকি। আমি সুযোগ বুঝে বিকল্পে দুই রকম নিয়মই চালাই।

২। ভক্‌ত। সেথায়। খোলো দ্বা। ০০র। — এইরকম ভাগে কোনো দোষ নেই। কিন্তু তুমি যে ভাগ করেছিলে। র০০। এটা চলে না; যেহেতু 'র' হসন্ত বর্ণ, ওর পরে স্বরবর্ণ নেই, অতএব টানব কাকে।

৩। 'জনগণ' গান যখন লিখেছিলেম তখন 'মারাঠা' বানান করি নি। মারাঠিরাও প্রথম বর্ণে আকার দেয় না। আমার ছিল 'মরাঠা'। তার পরে যাঁরা শোধন করেছেন তাঁরাই নিরাকারকে সাকার করে তুলেছেন, আমার চোখে পড়ে নি।

৩

যেখানে আর্টের উৎকর্ষ সেখানে গুণী ও গুণজ্ঞদের ভাবের উচ্চশিখর। সেখানে সকলেই অনায়াসে পৌঁছবে এমন আশা করা যায় না— সেইখানেই নানা রঙের রসের মেঘ জমে ওঠে— সেই দুর্গম উচ্চতায় মেঘ জমে বলেই তার বর্ষণের দ্বারা নীচের মাটি উর্বরা হয়ে ওঠে। অসাধারণের সঙ্গে সাধারণের যোগ এমনি করেই হয়, উপরকে নীচে বেঁধে রেখে দিলে হয় না। যারা রসের সৃষ্টিকর্তা তাদের উপর যদি হাটের ফর্মাশ চালানো যায়, তা হলেই সর্বনাশ ঘটে।

ফর্মাশ তাদের অন্তর্যামীর কাছ থেকে। সেই ফর্মাশ-অনুসারে যদি তারা চিরকালের জিনিস তৈরি করতে পারে, তা হলেই আপনিই তার উপরে সর্বলোকের অধিকার হবে। কিন্তু, সকলের অধিকার হলেই যে হাতে হাতে সকলে অধিকার লাভ করতে পারে, ভালো জিনিস এত সস্তা নয়। বসন্তে যে ফুল ফোটে সে ফুল তো সকলেরই জন্যে, কিন্তু সকলেই তার মর্যাদা সমান বোঝে এ কথা কেমন করে বলব? বসন্তে আমের মুকুলে অনেকেরই মন সায় দিলে না ব'লেই কি তাকে দোষ দেব? বলব 'তুমি কুমড়ো হলে না কেন'? বলব কি— গরিবের দেশে বকুল ফুল ফোটানো বিড়ম্বনা— সব ফুলেরই বেগুনের ক্ষেত হয়ে ওঠা নৈতিক কর্তব্য? বকুল ফুলের দিকে যে অরসিক চেয়ে দেখে না, তার জন্যে যুগ-যুগান্তর ধরেই বকুল ফুল যেন অপেক্ষা করে থাকে; মনের খেদে এবং লোকহিতৈষীদের তাড়নায় সে যেন কচুবন হয়ে ওঠবার চেষ্টা না করে। গ্রীসে সর্বসাধারণের জন্যেই সফোক্লীস এস্কিলাসের নাটক রচিত ও অভিনীত হয়েছিল, কেবল বিশিষ্ট কতিপয়ের জন্য নয়। সেখানকার সাধারণের ভাগ্য ভালো যে, তারা কোনো গ্রীসীয় দাশুরায়ের শরণাপন্ন হয় নি। সাধারণকে শ্রদ্ধাপূর্বক ভালো জিনিস দিতে থাকলে ক্রমশই তার মন ভালো জিনিস গ্রহণ করবার উপযুক্ত হয়ে ওঠে। কবিকে আমরা যেন এই কথাই বলি— 'তোমার যা সর্বশ্রেষ্ঠ তাই যেন তুমি নির্বিচারে রচনা করতে পারো।' কবি যদি সফল হয় তবে সাধারণকে বলব— 'যে জিনিস শ্রেষ্ঠ তুমি যেন সেটি গ্রহণ করতে পারো।' যারা রূপকার, যারা রসস্রষ্টা, তারা আর্টের সৃষ্টি সম্বন্ধে সত্য ও অসত্য, ভালো ও মন্দ, এই দুটি মাত্র শ্রেণীভেদই জানে; বিশিষ্ট কতিপয়ের পথ্য ও ইতর-সাধারণের পথ্য বলে কোনো ভেদ তাদের সামনে নেই। শেক্‌স্‌পীয়র সর্বসাধারণের কবি বলে একটা জনশ্রুতি প্রচলিত আছে, কিন্তু জিজ্ঞাসা করি হ্যাম্‌লেট কি সর্বসাধারণের নাটক? কালিদাস কোন্ শ্রেণীর কবি জানি নে, কিন্তু তাঁকে আপামর সাধারণ সকলেই কবি বলে প্রশংসা করে থাকে। জিজ্ঞাসা করি— যদি মেঘদূত গ্রামের দশজনকে ডেকে শোনানো যায়, তা হলে কি সেই অত্যাচার ফৌজদারি দণ্ডবিধির আমলে আসতে পারে না? সর্বসাধারণের মোক্তার যদি কালিদাসের আমলে বিক্রমাদিত্যের সিংহাসন বেদখল করে কালিদাসকে ফর্মাশে বাধ্য করতেন, তা হলে মেঘদূতের জায়গায় যে পদ্যপাঠ তৈরি হত, মহাকাল কি সেটা সহ্য করতেন? আমাকে যদি জিজ্ঞাসা করো এ সমস্যার মীমাংসা কী, আমি বলব— মেঘদূত গ্রামের দশজনের জন্যেই, কিন্তু যাতে সেই দশজনের মেঘদূতে নিজের অধিকার উপলব্ধি করতে পারে, তারই দায়িত্ব দশোত্তরবর্গের লোকের। যে দশজন মেঘদূত বোঝে না, তাদের খাতিরে মেঘদূতের বদলে পদ্ম-ভ্রমরের পাঁচালিতে সস্তা অনুপ্রাসের চকমকি ঠোকা কবির দায়িত্ব নয়। কৃত্রিমতা সকল কবি সকল আর্টিস্টের পক্ষেই দূষণীয়, কিন্তু যা সকলেই অনায়াসে বোঝে সেটাই অকৃত্রিম আর যা বুঝতে চিত্তবৃত্তির উৎকর্ষসাধনের দরকার সেটাই কৃত্রিম এ ধরনের কথা অশ্রদ্ধেয়।

৪

২৯ জুলাই ১৯৩৭

কীর্তনগীত আমি অনেক কাল থেকেই ভালোবাসি। ওর মধ্যে ভাবপ্রকাশের যে নিবিড় ও গভীর নাট্যশক্তি আছে সে আর-কোনো সংগীতে এমন সহজভাবে আছে বলে আমি জানি নে। সাহিত্যের ভূমিতে ওর উৎপত্তি, তার মধ্যেই ওর শিকড়, কিন্তু ও শাখায় প্রশাখায় ফলে ফুলে পল্লবে সংগীতের আকাশে স্বকীয় মহিমা অধিকার করেছে। কীর্তন-সংগীতে বাঙালির এই

অনন্যতন্ত্র প্রতিভায় আমি গৌরব অনুভব করি।... কখনো কখনো কীর্তনে ভৈরোঁ প্রভৃতি ভোরাই সুরেরও আভাস লাগে, কিন্তু তার মেজাজ গেছে বদলে— রাগরাগিণীর রূপের প্রতি তার মন নেই, ভাবের রসের প্রতিই তার ঝোঁক। আমি কল্পনা করতে পারি নে হিন্দুস্থানী গাইয়ে কীর্তন গাইছে, এখানে বাঙালির কণ্ঠ ও ভাবার্দ্রতার দরকার করে। কিন্তু, তৎসত্ত্বেও কি বলা যায় না যে এতে সুরসমবায়ের পদ্ধতি হিন্দুস্থানী পদ্ধতির সীমা লঙ্ঘন করে না? অর্থাৎ, য়ুরোপীয় সংগীতের সুরপর্যায় যে রকম একান্ত বিদেশী কীর্তন তো তা নয়। ওর রাগরাগিণীগুলিকে বিশেষ নাম দিয়ে হিন্দুস্থানী সংগীতের সংখ্যা বৃদ্ধি করলে উপদ্রব করা হয় না। কিন্তু, ওর প্রাণ, ওর গতি, ওর ভঙ্গি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র।

৫

২৯ অক্টোবর ১৯৩৭

'ছন্দা'য় তোমার 'কথা বনাম সুর' প্রবন্ধে তোমার তর্কটা খুব জোরালো হয়েছে। কিন্তু, তর্কে বিজ্ঞান বা গণিত ছাড়া আর কোনো-কিছুর মীমাংসা হতে চায় না। যদি কেউ হুংকার দিয়ে বলেন বিশুদ্ধ সংস্কৃত ভাষায় আম্র বলা যেতে পারে একমাত্র ফজলিকে— যদি তার আয়তন, তার ওজন, তার আঁটির বিশালতা প্রমাণ-স্বরূপে সে ব্যবহার করে— যদি বলে গুরুত্বহীন অন্য সমস্ত আমকে সংস্কৃত নামে অভিহিত করা চলবে না, বড়ো জোর গ্রাম্য ভাষায় 'আঁব' নামেই তাদের পরিচয় দেওয়া যেতে পারে— তা হলে জামাইষষ্ঠীর দিনে ফজলি আম দিয়ে তার সম্মান রক্ষা করা শ্বশুরের পক্ষে নিরাপদ হবে, কিন্তু ইতরে জনাঃ বিচিত্র আমের বিচিত্র রস সম্ভোগ ক'রে সমজদার নাম খোয়াতে কুণ্ঠিত হবে না। ওস্তাদেরা ফজলি-সংগীতের কলমের চারা বানাতে থাকুন যুগ যুগান্তর ধরে, তৎসত্ত্বেও মানুষের হৃদয়পদ্মে সৃষ্টিকর্তা ঘুমিয়ে পড়বেন না।

সুরের সঙ্গে কথার মিলন কেউ রোধ করতে পারবে না। ওরা পরস্পরকে চায়, সেই চাওয়ার মধ্যে যে প্রবল শক্তি আছে সেই শক্তিতেই সৃষ্টির প্রবর্তনা। শ্রেণীর বেড়ার মধ্যে পায়ের বেড়ির ঝংকার দিয়ে বেড়ানোকেই যে ওস্তাদ সাধনা বলে গণ্য করে, তার সঙ্গে তর্ক কোরো না; শ্রেণীর সে উপাসক, শাস্ত্রের সে বুলি-বাহক, পৃথিবীর নানা বিপদের মধ্যে সেও এক বিশেষজাতীয়— কলাবিভাগে সে ফাসিস্ট্।

৬

৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৩৬

মত বদলিয়েছি। জীবনস্মৃতি অনেক কাল পূর্বের লেখা। তার পরে বয়সও এগিয়ে চলেছে, অভিজ্ঞতাও। বৃহৎ জগতের চিন্তাধারা ও কর্মচক্র যেখানে চলছে, সেখানকার পরিচয়ও প্রশস্ততর হয়েছে। দেখেছি চিত্ত যেখানে প্রাণবান্ সেখানে সে জ্ঞানলোকে ভাবলোকে ও কর্মলোকে নিত্যনূতন প্রবর্তনার ভিতর দিয়ে প্রমাণ করছে যে, মানুষ সৃষ্টিকর্তা, কীটপতঙ্গের মতো একই শিল্পপ্যাটার্নের পুনরাবৃত্তি করছে না। আমার মনে আজ আর সন্দেহমাত্র নেই যে, কলুর বলদের মতো চোখে ঠুলি দিয়ে বাঁধা গণ্ডির মধ্যে নিরন্তর ঘুরতে থাকা সংগীতের সাহিত্যের কিংবা কোনো ললিতকলার চরম সদ্গতি নয়। হিন্দুস্থানী কালোয়াতের কণ্ঠব্যায়ামের তারিফ করতে রাজি আছি, এমন-কি তার রসভোগ থেকেও বঞ্চিত হতে চাই নে। কিন্তু, সেই রস চিত্তকে যদি মাদকতায়

অভিভূত করে রাখে, অগ্রগামী কালের নব নব সৃষ্টিবৈচিত্র্যের পিছনে আমাদের বিহ্বলভাবে কাত করে রেখে দেয়, খাঁচার পাখির মতো যে বুলি শিখেছি তাই কেবলই আউড়িয়ে যাই এবং অবিকল আউড়িয়ে যাবার জন্যে বাহবা দাবি করি, তা হলে এই নকলনবিশি-বিধানকে সেলাম করে থাকব তার থেকে দূরে— নূতন সাধনার পথে খুঁড়িয়ে চলব সেও ভালো, কিন্তু হাজার বছর আগেকার রাস্তায় শিকল-বাঁধা শাগ্‌রেদি করতে পারব না। ভুল ভ্রান্তি অসম্পূর্ণতা সমস্তর ভিতর দিয়ে নবযুগবিধাতার ডাক শুনে চলতে থাকব নবসৃষ্টির কামনা নিয়ে। বাঁধা মতের প্রবীণদের কাছে গাল খাব— জীবনে তা অনেকবার খেয়েছি— কিন্তু আত্মপ্রকাশের ক্ষেত্রে আমি কিছুতেই মানব না যে, আমি ভূতকালের ভূতে-পাওয়া মানুষ। আজ য়ুরোপীয় গুণীমণ্ডলীর মধ্যে এমন কেউ নেই যে বলে না যে, অজন্তার ছবি শ্রেষ্ঠ আদর্শের ছবি, কিন্তু তাঁদের মধ্যে এমন বেওকুফ কেউ নেই যে ঐ অজন্তার ছবির উপর কেবল দাগা বুলিয়ে যাওয়াকেই শিল্পসাধনার চরম বলে মানে। তানসেনকে সেলাম করে বলব, ‘ওস্তাদজি, তোমার যে পথ আমারও সেই পথ।’ অর্থাৎ, নবসৃষ্টির পথ। বাংলা দেশ একদিন সংগীতে গণ্ডিভাঙা নবজীবনের পথে চলেছিল। তার পদাবলী তার গীতকলাকে জাগিয়ে তুলেছিল দাসী করে নয়, সঙ্গিনী করে, তার গৌরব রক্ষা করে। সেই বাংলা দেশে আজ নতুন যুগের যখন ডাক পড়ল তখন সে হিন্দুস্থানী অন্তঃপুরে প্রাচীরের আড়ালে কুলরক্ষা করতে পারবে না— তখন সে জটিলার শাসন উপেক্ষা করে যুগলমিলনের পথে চরম সার্থকতা লাভ করবে। এ নিয়ে নিন্দে জাগবে, কিন্তু লজ্জা করলে চলবে না।

মত বদলিয়েছি। কতবার বদলিয়েছি তার ঠিক নেই। সৃষ্টিকর্তা যদি বার বার মত না বদলাতেন তা হলে আজকের দিনের সংগীতসভা ডাইনসরের ধ্রুপদী গর্জনে মুখরিত হত এবং সেখানে চতুর্দন্ত ম্যামথের চতুষ্পদী নৃত্য এমন ভীষণ হত যে যারা আজ নৃত্যকলায় পালোয়ানির পক্ষপাতী তারাও দিত দৌড়। শেষ দিন পর্যন্ত যদি আমার মত বদলাবার শক্তি অকুণ্ঠিত থাকে তা হলে বুঝব এখনো বাঁচবার আশা আছে। নইলে গঙ্গাযাত্রার আয়োজন কর্তব্য। আমাদের দেশে সেই শান-বাঁধানো ঘাটেই লোকসংখ্যা সব চেয়ে বেশি।

ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে লিখিত

খড়দহ। দেওয়ালি ১৩৩৯। ১৯৩২

সংগীতের সঙ্গে কাব্যের একটা জায়গায় মিল নেই। সংগীতের সমস্তটাই অনির্বচনীয়। কাব্যে বচনীয়তা আছে সে কথা বলা বাহুল্য ; অনির্বচনীয়তা সেইটেকেই বেষ্টন করে হিল্লোলিত হতে থাকে, পৃথিবীর চার দিকে বায়ুমণ্ডলের মতো। এপর্যন্ত বচনের সঙ্গে অনির্বচনের, বিষয়ের সঙ্গে রসের গাঁঠ বেঁধে দিয়েছে ছন্দ। পরস্পরকে বলিয়ে নিয়েছে— ‘যদেতদ্ হৃদয়ং মম তদস্তু হৃদয়ং তব’। বাক্ এবং অবাক বাঁধা পড়েছে ছন্দের মাল্য-বন্ধনে।

২

শান্তিনিকেতন। ৮ অক্টোবর ১৯৩৭

গানে কথা ও সুরের স্থান নিয়ে কিছুদিন থেকে তর্ক চলেছে। আমি ওস্তাদ নই, আমার সহজ বুদ্ধিতে এই মনে হয় এ বিষয়টা সম্পূর্ণ তর্কের বিষয় নয় ; এ সৃষ্টির অধিকারগত, অর্থাৎ লীলার। জপতপ করে মন্ত্রতন্ত্র আউড়িয়ে হয়তো কৃচ্ছ্রসাধক যথানিয়মে ভাবসমুদ্র পার হতে পারে, কিন্তু

যে সরল ভক্তির মানুষ বলে 'ভজন পূজন জানি নে, মা, জানি তোমাকেই' সেই হয়তো জিতে যায়। সে আইনকে ডিঙিয়ে গিয়ে মানে লীলাকে, ইচ্ছাকে— সেই বলে 'ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন'। সে বলে সকলের উপরে আছেন যিনি, তিনি নিজে হতে যাকে বেছে নেন তার আর ভাবনা নেই। যে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা হচ্ছে এখানে সেই সকলের উপরওয়ালা হচ্ছে সৃষ্টির আনন্দ। এই আনন্দ যখন রূপ নেয় তখন সেই রূপেই তার সত্যতার প্রমাণ হয়, আইনকর্তার দণ্ডবিধিতে নয়। উড়ুক্কু পাখির পালকওয়ালা ডানা থাকে জানি, কিন্তু সৃষ্টির বড়ো খেয়ালীর মর্জি অনুসারে বাদুড়ের পালক নেই— শ্রেণীবিভাগওয়ালা তাকে যে শ্রেণীভুক্ত করে যে নামই দিন সে উড়বেই। প্রাণীবিজ্ঞানের কোঠায় তিমিকে মাছ নাই বলা গেল, আসল কথা হচ্ছে সে জলে ডুবসাঁতার দিয়ে বেড়াবেই। অন্যান্য লক্ষণ অনুসারে তার ডাঙায় থাকাই উচিত ছিল, কিন্তু সে থাকে নি, সে জলেই রয়ে গেল। সৃষ্টিতে এমন অনেক অভাব্য ভাবিত হয়ে থাকে, হয় না জড়ের কারখানায়। কথা ও সুরে মিলে যদি সুসম্পূর্ণ সৃষ্টি হয়ে থাকে তবে যেটা হয়েছে বলেই তার আদর, সেই হওয়ার গৌরবেই সৃষ্টির গৌরব। এই মিলিত সৃষ্টিতে যে রস পাই তর্কের দ্বারা তাকে যে যা বলে বলুক সেটা বাহ্য, কিন্তু সৃষ্টির খাতির উড়িয়ে দিয়ে তর্কের খাতিরে যারা বলে বসে 'রসই পেলুম না', এমনতরো অভ্যাসগ্রস্ত আড়ষ্টবোধসম্পন্ন মানুষের অভাব নেই কী সাহিত্যে, কী সংগীতে, কী শিল্পকলায়। অভ্যাসের মোহ থেকে, আইনের পীড়ন থেকে, তারা মুক্তিলাভ করুক এই কামনা করি— কিন্তু সেই মুক্তি হবে 'ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন'।

তেলে জলে যেমন মেলে না, কথা ও সুর তেমনতরো অমিশুক নয়— মানুষের ইতিহাসের প্রথম থেকেই তার পরিচয় চলেছে। তাদের স্বাতন্ত্র্য কেউ অস্বীকার করে না, কিন্তু পরস্পরের প্রতি তাদের সুগভীর স্বাভাবিক আসক্তি লুকোনো নেই। এই আসক্তি একটি শক্তিবিশেষ, বিশ্ববিধাতার দৃষ্টান্তে গুণীরাও এই প্রবল শক্তিকে সষ্টির কাজে লাগিয়ে দেন— এই সৃষ্টির ভিতর দিয়ে সেই শক্তি মনকে বিচলিত করে তোলে। এর থেকেই উদ্ভূত হয় বিশ্বের সব চেয়ে প্রবল রস, যাকে বলে আদিরস। এই যুগলমিলন-জাতীয় সৃষ্টি উচ্চশ্রেণীর কি না হিন্দুস্থানী কায়দার সঙ্গে মিলিয়ে তার বিচার চলবে না, তার বিচার তার নিজেরই অন্তর্গূঢ় বিশেষ আদর্শের উপর। মাদুরার মন্দিরে স্থাপত্যের ও ভাস্কর্যের প্রভূততানমানসম্পন্ন যে ঐশ্বর্যের পরিচয় পাই তারই নিরন্তর পুনরাবৃত্তিতেই স্থাপত্যসাধনার চরম উৎকর্ষে নিয়ে যাবে তা বলতে পারি নে, তার চেয়ে অনেক সহজ সরল শুচি আদর্শ আছে যার বাহুল্যবর্জিত শুভ্র সংযত রূপ হৃদয়ের মধ্যে সহজে প্রবেশ করে একখানি গীতিকাব্যেরই মতো। যেমন চিস্তির শ্বেতমর্মরের সমাধিমন্দির। মাদুরার মতো তার মধ্যে বারংবার তানের উৎক্ষেপ বিক্ষেপ নেই বলেই তাকে নীচের শ্রেণীতে ফেলতে পারব না। আনন্দ সম্ভোগ করবার সহজ মন নিয়ে কৃত্রিম কৌলীন্যের মেলবন্ধন না মেনে সৃষ্টির রসবৈচিত্র্য স্বীকার করে নিতে দোষ কী?

রসসৃষ্টির রাজ্যে যাদের মনের বিহার তাদের মুশকিল এই যে, 'রহস্য নিবেদন'টা রুচির উপর নির্ভর করে, সেই রুচি তৈরি হয়ে ওঠে ব্যক্তিগত বা শ্রেণীগত অভ্যাসের উপর। এই কারণে শ্রেণীবিচার সহজ, রসবিচার সহজ নয়।

নিয়তি নিয়মকে রক্ষা করবার খবরদারিতে বাঁধা পথে বারংবার স্টীম রোলার চালায়, ইতিমধ্যে সৃষ্টিকর্তা সৃষ্টির ঝরনাকে বইয়ে দিতে থাকেন তারই স্বকীয় গতিবেগের বিচিত্র শাখায়িত পথে— এই পথে কথার ধারা একলা যাত্রা করে, সুরের ধারাও নিজের শাখা ধরে চলে, আবার সুর ও কথার স্রোত মিলেও যায়। এই মিলে এবং অমিলে দুয়েতেই রসের প্রবাহ— এর মধ্যে যাঁরা কম্যুনাল বিচ্ছেদ প্রচার করেন সেই শ্রেণীমাহাত্ম্যের ধ্বজাধারীদেরকে সৃষ্টিবাধাজনক

শান্তিভঙ্গের উৎপাত থেকে নিরস্ত হতে অনুরোধ করি।...

এত বড়ো চিঠি লিখে ভাঙা শরীরের বিরুদ্ধে যথেষ্ট অপরাধ করেছি। কিন্তু রোগ-দৌর্বল্যের আঘাতের চেয়েও বড়ো আঘাত আছে, তাই থাকতে পারলুম না। কথাও সুরকে বেগ দেয়, সুরও কথাকে বেগ দেয়, উভয়ের মধ্যে আদান-প্রদানের স্বাভাবিক সম্বন্ধ আছে; রসসৃষ্টিতে এদের পরিণয়কে হেয় করতে হবে যেহেতু সাংগীতিক মনুসংহিতায় একে অসবর্ণ বিবাহ বলে, আমার মতো মুক্তিকামী এটা সইতে পারে না। সংগীতে চিরকুমারদের আমি সম্মান করি যেখানে সম্মানের তারা যোগ্য, কিন্তু কুমার-কুমারীদের সুন্দর রকম মিলন হলে আনন্দ করতে আমার বাধে না। বিবাহে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা নষ্ট হয়ে শক্তি হ্রাস করে এ কথা সত্য হতেও পারে, না হতেও পারে, এমন হতেও পারে এক রকম শক্তিকে সংযত করে আর-এক রকম শক্তিকে পূর্ণতা দেয়।

সাহানাদেবীকে লিখিত

সেদিন মন্টুর[1] গান অনেকগুলি ও অনেকক্ষণ ধরে শুনেছি।..."হে ক্ষণিকের অতিথি" মন্টু সেদিন গেয়েছিল— সুরের মধ্যে কোনো পরিবর্তন ঘটায় নি। তার মধ্যে ও যে ধাক্কা লাগিয়েছিল সেটাতে গানের ভাবের চাইতে ভঙ্গি প্রবল হয়ে উঠেছিল। দেখলুম শ্রোতাদের ভালো লাগল। গানের প্রকাশ সম্বন্ধে গায়কের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা অগত্যা মানতেই হবে— অর্থাৎ গানের দ্বারা গায়ক নিজের অনুমোদিত বিশেষ ভাবের ব্যাখ্যা করে— যে ব্যাখ্যা রচয়িতার অন্তরের সঙ্গে না মিলতেও পারে— গায়ক তো গ্রামোফোন নয়। তুমি যখন আমার গান করো শুনলে মনে হয় আমার গান রচনা সার্থক হয়েছে— যে গানে যতখানি আমি আছি ততখানি ঝুনুও[2] আছে— এই মিলনের দ্বারা যে পূর্ণতা ঘটে সেটার জন্যে রচয়িতার সাগ্রহ প্রতীক্ষা আছে। আমি যদি সেকালের সম্রাট হতুম তাহলে তোমাকে বন্দিনী করে আনতুম লড়াই করে কেননা তোমার কণ্ঠের জন্যে আমার গানের একান্ত প্রয়োজন আছে।... ইতি ৪।৪।৩৮

—রম্যবীণা, ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যা, ১৩৬৬, পৃ ১-২

২

কালিম্পঙ। ২৯ এপ্রিল ১৯৩৮

বিশ্বসৃষ্টিতে রসবৈচিত্র্যের সীমা নেই, কবির মন তার সকল দিকেই স্পর্শসচেতন— কেবলমাত্র একটা প্রেরণাতেই, তা সে যত বড়োই হোক, যেন তার রাগরাগিণী নিঃশেষিত না হয়।...

ইতিমধ্যে মন্টু বিখ্যাত গায়িকা কেসরবাইকে এনেছিল আমাকে গান শোনাবার জন্যে। আশ্চর্য তার সাধনা, কণ্ঠে মাধুর্য আছে, যেমন তেমন করে সুর খেলাতে এবং সুরে খেলাতে এবং সুরে

---

[1] দিলীপকুমার রায়

[2] "এক্সপ্রেশন ভেদ থাকবেই— যাকে তুমি বলছ ইন্টারপ্রেটেশনের স্বাধীনতা। বলেছিলে বিলেতেও গায়ক-বাদকের এ স্বাধীনতা মঞ্জুর। মঞ্জুর হতে বাধ্য। সাহানার মুখে যখন আমার গান শুনতাম তখন কি আমি শুধু আপনাকেই শুনতাম? না তো। সাহানাকেও শুনতাম— বলতে হ'ত— 'আমার গান সাহানা গাইছে।"— দিলীপকুমার রায়ের সঙ্গে কথোপকথন : 'তীর্থঙ্কর'।

মোচড় দিতে তার অসামান্য নৈপুণ্য।[1]

এঁকে ভালো বলতে বাধ্য, কিন্তু ভালো লাগতে নয়। সংগীত যখন রূপঘনিষ্ঠ প্রাণবান দেহ নেয় তখন তার যত খুশি টেনে বাড়ানো, ছেঁটে কমানো, তাকে আছড়ানো, মোচড়ানো, কলাতত্ত্ববিরোধী। পুরুভুজজাতীয় আদিম জীব অবয়বহীন, ইংরেজিতে যাকে বলে amorphous. তাকে দুখানা করলেও যা সাতখানা করলেও তা। পূর্ণ অভিব্যক্ত জীবে এই অত্যাচার খাটে না। তার স্বভাবসীমাকে কিছুদূর অতিক্রম করা চলে, কিন্তু বেশি দূর নয়। এইজন্যে কেসরবাইয়ের গানকে কান তারিফ করলেও মন স্বীকার করছিল না। যারা ওস্তাদি-নেশা-গ্রস্ত তাদের এই কলাতত্ত্বের সহজ কথা বুঝিয়ে দেওয়া শক্ত। কেননা, নেশার সীমা নেই, ভোজের আছে। 'ঢাল্ ঢাল্ সুরা আরো ঢাল্' এটাকে মাৎলামি বলে হাসতে পারি, কিন্তু দই ক্ষীর সন্দেশের বেলা যথাস্থানে থামার দ্বারাই তাকে সম্মান দেওয়া হয়— না থামলেই সেটা বীভৎস হয়ে ওঠে। কেসরবাই যে জাতীয় গান গায়, শারীরিক ক্লান্তি ছাড়া তার থামবার এমন কোনোই সুবিহিত প্রেরণা নেই যা তার অন্তর্নিহিত। তাতে কেসরবাইকে অপরাধী করি নে, এইজাতীয় সংগীতকেই করি। কেসরবাইয়ের গাওয়াতে কেবল যে সাধনার পরিচয় আছে তা নয়, বিধিদত্ত ক্ষমতারও পরিচয় আছে— যা অধিকাংশ ওস্তাদের নেই। কিন্তু, ততঃ কিম্! এই শক্তি ভুল বাহন নিয়ে ব্যর্থ হয়েছে, নন্দনবনে যে অপ্সরার যোগ্যস্থান ছিল সুন্দরবনে তার মান বাঁচানো সহজ হয় না।

জানকীনাথ বসুকে লিখিত

শান্তিনিকেতন। ২০ ডিসেম্বর ১৯৩৮

x x আমার গান তাঁর ইচ্ছামত ভঙ্গি দিয়ে গেয়ে থাকেন, তাতে তাদের স্বরূপ নষ্ট হয় সন্দেহ নেই। গায়কের কণ্ঠের উপর রচয়িতার জোর খাটে না, সুতরাং ধৈর্য ধরে থাকা ছাড়া অন্য পথ নেই। আজকালকার অনেক রেডিয়োগায়কও অহংকার করে বলে থাকেন তাঁরা আমার গানের উন্নতি করে থাকেন। মনে মনে বলি পরের গানের উন্নতি সাধনে প্রতিভার অপব্যয় না করে নিজের গানের রচনায় মন দিলে তাঁরা ধন্য হতে পারেন। সংসারে যদি উপদ্রব করতেই হয় তবে হিটলার প্রভৃতির ন্যায় নিজের নামের জোরে করাই ভালো।

একাদশখণ্ড চিঠিপত্র

অমিয়চন্দ্র চক্রবর্তীকে লিখিত পত্র

শান্তিনিকেতন। ১৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৩৯

সুরের-বোঝাই-ভরা তিনটে নাটিকার মাঝিগিরি শেষ করা গেল। নটনটীরা যন্ত্রতন্ত্র নিয়ে চলে গেল কলকাতায়। দীর্ঘকাল আমার মন ছিল গুঞ্জনমুখরিত। আনন্দে ছিলুম। সে আনন্দ বিশুদ্ধ, কেননা

---

[1] দিলীপকুমার রায় 'ভ্রাম্যমাণ' (৭ বৈশাখ ১৮৮৬ শক, পৃ ১৬১-৬২) গ্রন্থে লেখেন : "প্রশস্তি লিখে দিলেন এক আঁচড়ে (২৩-৪-১৯৩৮) :

'I consider myself fortunate in securing a chance for listening to Kesar Bai's singing which is an artistic phenomenon of exquisite perfection. The magic of her voice with the mystery of its varied modulations has repeatedly proved its true significance not in any pedantic display of technical subtleties mechanically accurate, but in the revelation of the miracle of music only possible for a born genius. Let me offer my thanks and my blessings to Kesar Bai for allowing me this evening a precious opportunity of experience.

Rabindranath Tagore.'"

সে নির্বস্তুক (abstract)। বাক্যের সৃষ্টির উপরে আমার সংশয় জন্মে গেছে। এত রকম চলিত খেয়ালের উপর তার দর যাচাই হয়, খুঁজে পাই নে তার মূল্যের আদর্শ।...

এই টলমলে অবস্থায় এখনকার মতো দুটো পাকা ঠিকানা পেয়েছি আমার বানপ্রস্থের— গান আর ছবি। এ পাড়ায় এদের উপরে বাজারের বস্তাবন্দীর ছাপ পড়ে নি। যদিও আমার গান নিয়ে বচসার অন্ত নেই, তবু সেটা আমার মনকে নাড়া লাগায় না। তার একটা কারণ, সুরের সমগ্রতা নিয়ে কাটাছেঁড়া করা চলে না। মনের মধ্যে ওর যে প্রেরণা সে ব্যাখ্যার অতীত। রাগরাগিণীর বিশুদ্ধতা নিয়ে যে-সব যাচনদারেরা গানের আঙ্গিক বিচার করেন, কোনোদিন সেই-সব গানের মহাজনদের ওস্তাদিকে আমি আমল দিই নি, এ সম্বন্ধে জাতখোয়ানো কলঙ্ককে আমি অঙ্গের ভূষণ বলে মেনে নিয়েছি। কলার সকল বিভাগে আমি ব্রাত্য, বিশেষভাবে গানের বিভাগে। গানে আমার পাণ্ডিত্য নেই এ কথা আমার নিতান্ত জানা— তার চেয়ে বেশি জানা গানের ভিতর দিয়ে অব্যবহিত আনন্দের সহজ বোধ। এই সহজ আনন্দের নিশ্চিত উপলব্ধির উপরে বাঁধা আইনের করক্ষেপ আমাকে একটুও নাড়াতে পারে নি। এখানে আমি উদ্ধত, আমি স্পর্ধিত আমার আন্তরিক অধিকারের জোরে। বচনের অতীত বলেই গানের অনির্বচনীয়তা আপন মহিমায় আপনি বিরাজ করতে পারে, যদি তার মধ্যে থাকে আইনের চেয়ে বড়ো আইন। গান যখন সম্পূর্ণ জাগে মনের মধ্যে তখন চিত্ত অমরাবতীতে গিয়ে পৌঁছয়। এই-যে জাগরণের কথা বলছি তার মানে এ নয় যে, সে একটা মস্ত কোনো অপূর্ব সৃষ্টি -সহযোগে। হয়তো দেখা যাবে সে একটা সামান্য-কিছু। কিন্তু, আমার কাছে তার সত্য তার তৎসাময়িক অকৃত্রিম বেদনার বেগে। কিছুদিন পরে তার তেজ কমে যেতে পারে, কিন্তু যে মানুষ সম্ভোগ করেছে তার তাতে কিছু আসে যায় না, যদি না সে অন্যের কাছে বকশিশের বাঁধা বরাদ্দ দাবি করে। নতুন রচনার আনন্দে আমি পদে পদে ভুলি, গাছ যেমন ভোলে তার ফুল ফোটানো। সেইজন্যে অন্যেরা যখন ভোলে, সে আমি টেরও পাই নে। যে ছন্দ-উৎস বেয়ে অনাদিকাল ধরে ঝরছে রূপের ঝর্না তারই যে-কোনো একটা ধারা এসে যখন চেতনায় আবর্তিত হয়ে ওঠে, এমন-কি ক্ষণকালের জন্যেও, তখন তার জাদুতে কিছু-না রূপ ধরে কিছু-একটার, সেই জাদুর স্পর্শ লাগে কল্পনায়— যেন ইন্দ্রলোকের থেকে বাহবা এসে পৌঁছয় আমার মর্ত্যসীমানায়— সেই দেবতাদের উৎসাহ পাই যে দেবতারা স্বয়ং সৃষ্টিকর্তা। হয়তো সেই মুহূর্তে তাঁরা কড়ি-মূল্য দেন, কিন্তু সে স্বর্গীয় কড়ি।

...গানেতে মনের মধ্যে এনে দেয় একটা দূরত্বের পরিপ্রেক্ষণী। বিষয়টা যত কাছেরই হোক সুরে হয় তার রথযাত্রা ; তাকে দেখতে পাই ছন্দের লোকান্তরে, সীমান্তরে ; প্রাত্যহিকের করস্পর্শে তার ক্ষয় ঘটে না, দাগ ধরে না।

আমার শ্যামা নাটকের জন্যে একটা গান তৈরি করেছি ভৈরবী রাগিণীতে—

জীবনের পরম লগন কোরো না হেলা
হে গরবিনী

এই গরবিনীকে সংসারে দেখেছি বারংবার, কিন্তু গানের সুর শুনলে বুঝবে এই 'বারংবারে'র অনেক বাইরে সে চলে গেছে। যেন কোন্ চিরকালের গরবিনীর পায়ের কাছে বসে মুগ্ধ মন অন্তরে অন্তরে সাধনা করতে থাকে। সুরময় ছন্দোময় দূরত্বই তার সকলের চেয়ে বড়ো অলংকার। এই দূরবিলাসী গাইয়েটাকে অবাস্তবের নেশাখোর বলে যদি অবজ্ঞা করো, এই গরবিনীকে যদি দোক্তা খেয়ে পানের পিক ফেলতে দেখালে তবেই তাকে সাঁচ্চা বলে মেনে নিতে পারো, তবে তা নিয়ে

তর্ক করব না— সৃষ্টিক্ষেত্রে তারও একটা জায়গা আছে, কিন্তু সেই জায়গা-দখলের দলিল দেখিয়ে আমার সুরলোকের গরবিনীকে উচ্ছেদ করতে এলে আমি পেয়াদাকে বলব, ‘ওকে তাড়িয়ে তো কোনো লাভ নেই, কেননা, আঁচলে পানের পিকের ছোপ-লাগা মেয়েটা জায়গা পেতে পারে এমন কোনো ঘোর আধুনিক ভৈরবী রাগিণী হাল আমলের কোনো তানসেনের হাতে আজও তৈরি হয় নি।’ কথার হাটে হতে পারে, কিন্তু সুরের সভায় নয়। এই সুরে যে চিরদূরত্ব সৃষ্টি করে সে অমর্ত্য লোকের দূরত্ব, তাকে অবাস্তব বলে অবজ্ঞা করলে বাস্তবীকে আমরা তাঁদের অধিকার স্বচ্ছন্দে ছেড়ে দিয়ে যাব, এবং গির্জেতে গিয়ে প্রার্থনা করব ত্রাণকর্তা এদের যেন মুক্তি দেন।

গানে আমি রচনা করেছি শ্যামা, রচনা করেছি চণ্ডালিকা। তার বিষয়টা বিশুদ্ধ স্বপ্নবস্তু নয়। তীব্র তার সুখদুঃখ, ভালোমন্দ ; তার বাস্তবতা অকৃত্রিম এবং নিবিড়। কিন্তু, এগুলোকে পুলিস কেসের রিপোর্ট্‌রূপে বানানো হয় নি— গানে তার বাধা দিয়েছে— তার চার দিকে যে দূরত্ব বিস্তার করেছে তাকে পার হয়ে পৌঁছতে পারে নি যা-কিছু অবান্তর, যা অসংলগ্ন যা অনাহূত আকস্মিক। অথচ জগতে সব-কিছুর সঙ্গেই আছে অসংলগ্ন অর্থহীন আবর্জনা। তাদেরই সাক্ষ্য নিয়ে তবেই প্রমাণ করতে হবে সাহিত্যের সত্যতা, এমন বেআইনি বিধি মানতে মনে বাধছে। অন্তত গানে এ কথা ভাবতেই পারি নে। আজকালকার য়ুরোপে হয়তো সুরের ঘাড়ে বেসুর চড়ে বসে ভূতের নৃত্য বাধিয়েছে। আমাদের আসরে এখনো এই ভূতে-পাওয়া অবস্থা পৌঁছয় নি— কেননা আমাদের পাঠশালায় য়ুরোপীয় গানের চর্চা নেই। নইলে এতদিনে বাংলায় নকল বেতালের দল কানে তালা ধরিয়ে দিতে কসুর করত না।

যাই হোক, যখন বাস্তব সাহিত্যের পাহারাওয়ালা আমাকে তাড়া করে তখন আমার পালাবার জায়গা আছে আমার গান। একেই হয়তো এখনকার সাইকলজি বলে এস্‌কেপিজ্‌ম্‌।

‘জনগণমন অধিনায়ক’

পুলিনবিহারী সেনকে লিখিত

২০ নভেম্বর ১৯৩৭

জনগণমন অধিনায়ক গানটি কোনো উপলক্ষ্য-নিরপেক্ষ ভাবে আমি লিখেছি কি না তুমি জিজ্ঞাসা করেছ। বুঝতে পারছি এই গানটি নিয়ে দেশের কোনো কোনো মহলে যে দুর্বাক্যের উদ্ভব হয়েছে তারই প্রসঙ্গে প্রশ্নটি তোমার মনে জেগে উঠল।... তোমার চিঠির জবাব দিচ্ছি কলহের উষ্মা বাড়াবার জন্যে নয়, ঐ গান রচনা সম্বন্ধে তোমার কৌতূহল মেটাবার জন্যে।

একদিন আমার পরলোকগত বন্ধু হেমচন্দ্র মল্লিক বিপিন পাল মহাশয়কে সঙ্গে করে একটি অনুরোধ নিয়ে আমার কাছে এসেছিলেন। তাঁদের কথা ছিল এই যে, বিশেষভাবে দুর্গামূর্তির সঙ্গে মাতৃভূমির দেবীরূপ মিলিয়ে দিয়ে তাঁরা শারদীয়া পূজার অনুষ্ঠানকে নূতনভাবে দেশে প্রবর্তিত করতে চান, তার উপযুক্ত ভক্তি ও উদ্দীপনা-মিশ্রিত স্তবের গান রচনা করবার জন্যে আমার প্রতি তাঁদের ছিল বিশেষ অনুরোধ। আমি অস্বীকার করে বলেছিলুম এ ভক্তি আমার আন্তরিক হতে পারে না ; সুতরাং এতে আমার অপরাধের কারণ ঘটবে। বিষয়টা যদি কেবলমাত্র সাহিত্যক্ষেত্রের

অধিকারগত হত তা হলে আমার ধর্মবিশ্বাস যাই হোক আমার পক্ষে তাতে সংকোচের কারণ থাকত না ; কিন্তু ভক্তির ক্ষেত্রে, পূজার ক্ষেত্রে, অনধিকার প্রবেশ গর্হণীয়। আমার বন্ধুরা সন্তুষ্ট হন নি। আমি রচনা করেছিলুম 'ভুবনমনোমোহিনী', এ গান পূজামণ্ডপের যোগ্য নয় সে কথা বলা বাহুল্য। অপর পক্ষে এ কথাও স্বীকার করতে হবে যে, এ গান সর্বজনীন ভারতরাষ্ট্রসভায় গাবার উপযুক্ত নয়, কেননা এ কবিতাটি একান্তভাবে হিন্দুসংস্কৃতি আশ্রয় করে রচিত। অহিন্দুর এটা সুপরিচিত ভাবে মর্মঙ্গম হবে না।

আমার ভাগ্যে অনুরূপ ঘটনা আর-একবার ঘটেছে। সে বৎসর ভারত সম্রাটের আগমনের আয়োজন চলছিল। রাজসরকারের প্রতিষ্ঠাবান আমার কোনো বন্ধু সম্রাটের জয়গান রচনার জন্যে আমাকে বিশেষ করে অনুরোধ জানিয়েছিলেন। শুনে বিস্মিত হয়েছিলুম, সেই বিস্ময়ের সঙ্গে মনে উত্তাপেরও সঞ্চার হয়েছিল। তারই প্রবল প্রতিক্রিয়ার ধাক্কায় আমি জনগণমনঅধিনায়ক গানে সেই ভারতভাগ্যবিধাতার জয়ঘোষণা করেছি, পতন-অভ্যুদয়বন্ধুর পন্থায় যুগযুগধাবিত যাত্রীদের যিনি চিরসারথি, যিনি জনগণের অন্তর্যামী পথপরিচায়ক— সেই যুগ যুগান্তরের মানবভাগ্যরথচালক যে পঞ্চম বা ষষ্ঠ বা কোনো জর্জ্ই কোনোক্রমেই হতে পারেন না সে কথা রাজভক্ত বন্ধুও অনুভব করেছিলেন। কেননা তাঁর ভক্তি যতই প্রবল থাক্‌, বুদ্ধির অভাব ছিল না। আজ মতভেদবশত আমার প্রতি ক্রুদ্ধ ভাবটা দুশ্চিন্তার বিষয় নয়, কিন্তু বুদ্ধিভ্রংশটা দুর্লক্ষণ।

এই প্রসঙ্গে আর-এক দিনের ঘটনা মনে পড়ছে, সে বহুদিন পূর্বের কথা। তখনকার দিনে আমাদের রাষ্ট্রনায়কদের অঞ্জলি তোলা ছিল রাজপ্রাসাদের দুর্গম উচ্চ শিখর থেকে প্রসাদকণাবর্ষণের প্রত্যাশায়। একদা কোনো জায়গায় তাঁদের কয়েকজনের সান্ধ্য বৈঠক বসবার কথা ছিল। তাঁদের দূত ছিলেন আমার পরিচিত এক ব্যক্তি। আমার প্রবল অসম্মতি সত্ত্বেও তিনি বারবার করে বলতে লাগলেন আমি না গেলে আসর জমবে না। শেষ পর্যন্ত ন্যায্য অসম্মতিকেও বলবৎ রাখবার শক্তি বিধাতা আমাকে দেন নি। যেতে হল। ঠিক যাবার পূর্বক্ষণেই আমি নিম্নোদ্‌ধৃত গানটি রচনা করেছিলেম— 'আমায় বোলো না গাহিতে' ইত্যাদি। এই গান গাবার পরে আর আসর জমল না। সভাস্থগণ খুশি হন নি।

সুধারানী সেনকে লিখিত

শান্তিনিকেতন। [২৯ মার্চ ১৯৩৯]

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

তুমি যে প্রশ্ন করেছ এ রকম অদ্ভুত প্রশ্ন পূর্বেও শুনেছি।

পতন অভ্যুদয় বন্ধুর পন্থা / যুগ যুগ ধাবিত যাত্রী,
হে চিরসারথি তব রথচক্রে / মুখরিত পথ দিনরাত্রি—

শাশ্বত মানব-ইতিহাসের যুগযুগধাবিত পথিকদের রথযাত্রায় চিরসারথি ব'লে আমি চতুর্থ বা পঞ্চম জর্জের স্তব করতে পারি, এরকম অপরিমিত মূঢ়তা আমার সম্বন্ধে যাঁরা সন্দেহ করতে পারেন তাঁদের প্রশ্নের উত্তর দেওয়া আত্মাবমাননা।

ইতি ২৯।৩।২৯(?)

সংযোজন

সুর ও সংগতি

রবীন্দ্রনাথ ও ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের পত্রালাপ

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়েষু

তোমার অধ্যাপকীয় চিত্তবৃত্তি আমার কাছে ক্রমশই সুস্পষ্ট হয়ে উঠছে। কুঁড়েমি জিনিসটার উপর তোমার কিছুমাত্র দয়ামায়া নেই। কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ করাবেই এই তোমার কঠিন পণ। কিন্তু, সম্প্রতি এমন মানুষের সঙ্গে তোমার বোঝাপড়া চলবে, যে চিরকাল ইস্কুল-পালানে, কুঁড়েমি যার সহজ ধর্ম। বাল্যকাল থেকে কত কর্তব্যের দাবি আমাকেই আক্রমণ করেছে, প্রতিহত হয়েছে বারবার। নইলে আজ তোমাদের মতো এম. এ. পাস ক'রে নাম করতে পারতুম, বিশ্ববিদ্যালয়ের ভুয়ো উপাধি নিয়ে লজ্জা রক্ষা করতে হত না। তুমি বলছ সংগীত সম্বন্ধে অনতিবিলম্বে আড়াইশো-পাতা-ব্যাপী আনাড়িতত্ত্ব প্রকাশ করা আমার কর্তব্য। সেটা যে ঘটবে না তার প্রথম ও প্রধান কারণ আমার সমুদ্ধত কুঁড়েমি। যারা কর্তব্যের তাড়া খেয়ে খেটে মরে তারা তো মজুর শ্রেণীর। তাদের কেউ বা বৈশ্যজাতীয়, কর্তব্যসাধনে যাদের মুনফা আছে ; কেউ বা পরের ফরমাশে কর্তব্য করে, তারা শূদ্র ; কেউ বা কর্তব্যটাকে গদাস্বরূপ ক'রে হন্যে হয়ে বেড়ায়, তারা ক্ষত্রিয়। আবার কেউ বা কর্তব্য করে না, কাজ করে— যে কাজে লোভ নেই, লাভ নেই, যে কাজে গুরুমশায়ের শাসন বা গুরুর অনুশাসন নেই ; তাদের জাতই স্বতন্ত্র। যখন তুমি বৌদ্ধিক অর্থনীতি সম্বন্ধে বই লিখবে তখন আমার এই তত্ত্বকথাটা চুরি করে চালিয়ো, নালিশ করব না। যে-সব বই লিখেছি তার চেয়ে অনেক বেশি বই লিখি নি ; সংগীত সম্বন্ধে আমার মাস্টার্‌পীস্‌টা সেই অলিখিত রচনারত্নভাণ্ডাগারে রয়ে গেল। আমার সব মত যদি নিজেই স্পষ্ট করে লিখে দিয়ে যাব তবে যারা থীসিস্‌ লিখে খ্যাতি অর্জন করবে তাদের যে বঞ্চিত করা হবে। সেই-সব অনাগতকালের থীসিস্‌রচয়িতার কল্পচ্ছবি আমার মনের সামনে ভাসছে, তারা একাগ্রচিত্তে অতীতের আবর্জনাকুণ্ড থেকে জীর্ণ বাণীর ছিন্ন অংশ ঘেঁটে বের ক'রে তার ঘণ্ট তৈরি করছে— যে অংশ পাওয়া যাচ্ছে না সেইটেতেই তাদের মহোল্লাস। আমি তাদের আশীর্বাদভাজন হতে চাই। ইতি ১০ মাঘ ১৩৪১

তোমাদের
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

ধূর্জটি, তোমাকে লেখা একটা পুরোনো চিঠির প্রতিলিপি আমি রেখে দিয়েছিলাম, হঠাৎ চোখে পড়ল। দেখতে পাচ্ছি তোমাকে নানা পত্রে গান সম্বন্ধে আমার মত জানিয়েছি। আবার নতুন করে আমাকে তাগিদের দ্বারা চিঠিয়ে তুলছ কেন? এ সম্বন্ধে আমার মত সর্বসাধারণে বিজ্ঞাপিত করলে

বাঙালির সংস্কৃতিসমুন্নতির সবিশেষ সহায়তা করবে ব'লে দুরাশা মনে রাখি নে। পত্রনিহিত মতগুলি সংগ্রহ করে বা তদ্দ্বারা কীটপালনে যদি তোমার আগ্রহ থাকে আমার অসম্মতি নেই। জীবনে অনেক কথাই বলেছি, কিন্তু অনুচ্চারিত রয়েছে ততোধিক পরিমাণে— হয়তো বা ভাবীকাল তাদের জন্যেই বেশি কৃতজ্ঞ থাকবে।

তোমাদের
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

...বাংলাদেশে সংগীতের প্রকৃতিগত বিশেষত্ব হচ্ছে গান, অর্থাৎ বাণী ও সুরের অর্ধনারীশ্বর রূপ। কিন্তু, এই রূপকে সর্বদা প্রাণবান করে রাখতে হলে হিন্দুস্থানী উৎসধারার সঙ্গে তার যোগ রাখা চাই। আমাদের দেশে কীর্তন ও বাউল গানের বিশেষ একটা স্বাতন্ত্র্য ছিল, তবুও সে স্বাতন্ত্র্য দেহের দিকে ; প্রাণের দিকে ভিতরে-ভিতরে রাগরাগিণীর সঙ্গে তার যোগ বিচ্ছিন্ন হয় নি। বর্তমানে এর অনুরূপ আদর্শ দেখা যায় আমাদের বাংলা সাহিত্যে। য়ুরোপীয় সাহিত্যের সঙ্গে এর আন্তরিক যোগ বিচ্ছিন্ন হলে এর স্রোত যাবে মরে ; অথচ খাতটা এর নিজের, এর প্রধান কারবার নিজের দুই পারের ঘাটে ঘাটে। অতি বাল্যকাল থেকে হিন্দুস্থানী সুরে আমার কান এবং প্রাণ ভর্তি হয়েছে, যেমন, হয়েছে য়ুরোপীয় সাহিত্যের ভাবে ও রসে। কিন্তু, অনুকরণ করলেই নৌকাডুবি, নিজের টিকি পর্যন্ত দেখা যাবে না। হিন্দুস্থানী সুর ভুলতে ভুলতে তবে গান রচনা করেছি। ওর আশ্রয় না ছাড়তে পারলে ঘরজামাইয়ের দশা হয়, স্ত্রীকে পেয়েও তার স্বত্বাধিকারে জোর পৌঁছয় না। তাই ব'লে স্ত্রীকে বজায় না রাখলে ঘর চলে না। কিন্তু, স্বভাবে ব্যবহারে সে স্ত্রীর ঝোঁক হওয়া চাই পৈতৃকের চেয়ে শ্বাশুরিকের দিকে, তবেই সংসার হয় সুখের। আমাদের গানেও হিন্দুস্থানী যতই বাঙালি হয়ে উঠবে ততই মঙ্গল, অর্থাৎ সৃষ্টির দিকে। স্বভবনে হিন্দুস্থানী স্বতন্ত্র, সেখানে আমরা তার আতিথ্য ভোগ করতে পারি— কিন্তু বাঙালির ঘরে সে তো আতিথ্য দিতে আসবে না— সে নিজেকে দেবে, নইলে উভয়ের মিলন হবে না। যেখানে পাওয়াটা সম্পূর্ণ নয় সেখানে সে পাওয়াটা ঋণ। আসল পাওয়ায় ঋণের দায় ঘুচে যায়— যেমন স্ত্রী, তাকে নিয়ে দেনায় পাওনায় কাটাকাটি হয়ে গেছে। হিন্দুস্থানী সংগীত সম্বন্ধে আমার মনের ভাবটা ঐ। তাকে আমরা শিখব পাওয়ার জন্যে, ওস্তাদি করবার জন্যে নয়। বাংলা গানে হিন্দুস্থানী বিধি বিশুদ্ধ ভাবে মিলছে না দেখে পণ্ডিতেরা যখন বলেন সংগীতের অপকর্ষ ঘটছে, তখন তাঁরা পণ্ডিতী স্পর্ধা করেন—সেই স্পর্ধা সব চেয়ে দারুণ। বাংলায় হিন্দুস্থানীর বিশেষ পরিণতি ঘটতে ঘটতে একটা নূতন সৃষ্টি আরম্ভ হয়েছে ; এ সৃষ্টি প্রাণবান, গতিবান, এ সৃষ্টি শৌখিন বিলাসীর নয়— কলাবিধাতার। বাংলায় সাহিত্যভাষা সম্বন্ধেও তদ্রূপ। এ ক্ষেত্রে পণ্ডিতির জয় হলে বাংলা ভাষা আজ সীতার বনবাসের চিতায় সহমরণ লাভ করত। সংস্কৃতের সঙ্গে প্রণয় রেখেও বন্ধন বিচ্ছিন্ন করেছে ব'লেই বাংলা ভাষায় সৃষ্টির কার্য নব নব অধ্যবসায়ে যাত্রা করতে প্রবৃত্ত হয়েছে। বাংলা গানেও কি তারই সূচনা হয় নি? এই গান কি একদিন সৃষ্টির গৌরবে চলৎশক্তিহীন হিন্দুস্থানী সংগীতকে অনেক দূরে ছাড়িয়ে যাবে না? ইতি ১৩ই আগস্ট ১৯৩২

তোমাদের
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়েষু

আমি বারবার দেখেছি বর-ঠকানে প্রশ্ন তুলে আমাকে আক্রমণ করতে তোমার যেন একটা সিনিস্টর্ আনন্দ আছে। এবারে কিন্তু সময় খারাপ। ভিন্‌গাঁয়ে যেতে হবে, লেকচার দেবার ডাক পড়েছে। মনের মধ্যে কথা বয়ন করবার যে তাঁতটা ছিল, এতকাল সে ফরমাশ খেটেছে বিস্তর; এখন ঘনঘন টানা-পোড়েন আর সয় না, কথায় কথায় সুতো যায় ছিঁড়ে।

তুমি যে প্রশ্ন করেছ তার উত্তর সেদিনকার বকুনির মধ্যে কোনো-একটা জায়গায় ছিল ব'লে মনে হচ্ছে। বোধ হয় যেন বলেছিলুম ঘরবাড়ি বালাখানা আপন-খেয়াল-মত বানানো চলে, কিন্তু যে ভূতলের উপর তাকে খাড়া করতে হবে সেই চিরকেলে আধারের সঙ্গে তার রফা করাই চাই। তুমি জানো সংগীতে আমি নির্মমভাবে আধুনিক, অর্থাৎ জাত বাঁচিয়ে আচার মেনে চলি নে। কিন্তু একেবারেই ঠাট বজায় না রাখি যদি তবে সেটা পাগলামি হয়ে দাঁড়ায়। শিশুকালে শিশুবোধে দেখেছি প্রেয়সীকে পত্র লেখবার বিশেষ পাঠ ও রীতি বেঁধে দেওয়া ছিল, সেটাতে তখনকার কালের প্রবীণদের সম্মতি ছিল সন্দেহ নেই। তর্কের ক্ষেত্রে ধরে নেওয়া যাক, প্রেমলিপি লেখবার সেই ছাঁদ যথার্থই অত্যন্ত মনোহর— কিন্তু, কালান্তর ঘটতেই, অর্থাৎ যৌবনকাল উপস্থিত হতেই দেখা যায় সে ভাষায় কোনো পক্ষের মেজাজ সায় দেয় না। তখন স্বতই যে ভাষা দেখা দেয় তার মধ্যে পিতৃপিতামহদের অনুমোদিত ধ্রুবনির্দিষ্ট শব্দলালিত্য ও রচনানৈপুণ্য না থাকতে পারে, ব্যাকরণের বিশেষত বানানের ভুলচুক থাকাও অসম্ভব নয়, দুটো-একটা ইংরেজি শব্দও তার মধ্যে হয়তো অগত্যা ঢুকে পড়ে, কিন্তু শুচিবায়ুগ্রস্ত মুরুব্বিরা যাই বলুন-না-কেন তার মধ্যে যে সহজ রসসঞ্চার হয় তাকে অবজ্ঞা করা চলবে না। সেই মুরুব্বিরাই যদি ষোড়শী চতুর্থপক্ষীয়ার দিকে দুর্নিবার ধাক্কায় ঝুঁকে পড়েন, তবে হঠাৎ দেখা যাবে তাঁদের ভাষাও শিকল ছিঁড়েছে। কিন্তু, তৎসত্ত্বেও মূল ভাষাটা বাংলা, সেখানে সেকাল একালের নাড়ীর যোগ। এই ভাষা বহু শতাব্দীর বহু নরনারীর বিচিত্র ভাবনা কামনা ও বেদনার নিরন্তর অভিঘাতে বিশেষভাবে প্রাণময় চিন্ময় দীপ্তিময় হয়ে উঠেছে, বিশেষভাবে বাঙালির চিন্তা ও ইচ্ছাকে রূপ দেবার জন্যেই তার সৃষ্টি। এইজন্যে, কোনো বাঙালির যতই প্রতিভার জোর থাক, বিদেশী ভাষার ভূমিতে সাহিত্যের কীর্তিস্তম্ভ সে স্থায়ীভাবে গড়ে তুলতে পারে না। আমাদের বাংলা ভাষার রূপ বদল হচ্ছে নিয়তই, বদল হতে যে পারে এই তার মহৎ গুণ— কিন্তু, সমস্ত বদল হবে তার আদি-প্রকৃতির উপর ভর দিয়ে।

গান সম্বন্ধেও এই কথাই খাটে। ভারতবর্ষের বহু-যুগের-সৃষ্টি-করা যে সংগীতের মহাদেশ, তাকে অস্বীকার করলে দাঁড়াব কোথায়? পশ্চিম মহাদেশেও বাসযোগ্য স্থান নিশ্চিত আছে, কিন্তু সেখানে ভাড়াটে বাড়ির ভাড়া জোগাব কোথা থেকে? বাংলা দেশে আমার নামে অনেক প্রবাদ প্রচলিত; তারই অন্তর্গত একটি জনশ্রুতি আছে যে, আমি হিন্দুস্থানী গান জানি নে, বুঝি নে। আমার আদিযুগের রচিত গানে হিন্দুস্থানী ধ্রুবপদ্ধতির রাগরাগিণীর সাক্ষী-দল অতি বিশুদ্ধ প্রমাণ সহ দূর ভাবীশতাব্দীর প্রত্নতাত্ত্বিকদের নিদারুণ বাদবিতণ্ডার জন্যে অপেক্ষা করে আছে। ইচ্ছা করলেও সংগীতকে আমি প্রত্যাখান করতে পারি নে; সেই সংগীত থেকেই আমি প্রেরণা লাভ করি এ কথা যারা জানে না তারাই হিন্দুস্থানী সংগীত জানে না। হিন্দুস্থানী গানকে আচারের শিকলে যাঁরা অচল করে বেঁধেছেন, সেই ডিক্‌টেটারদের আমি মানি নে। যাঁরা বলেন ভারতীয়

গানের বিরাট ভূমিকার উপরে নব নব যুগের নব নব যে সৃষ্টি স্বপ্রকাশ তার স্থান নেই— ঐখানে হাতকড়ি-পরা বন্দীদের পুনঃপুনঃ আবর্তনের অনতিক্রমণীয় চক্রপথ আছে মাত্র এমনতরো নিন্দোক্তি যাঁরা স্পর্ধা-সহকারে ঘোষণা করে থাকেন তাঁদেরই প্রতিবাদ করবার জন্যই আমার মতো বিদ্রোহীদের জন্ম— সেই প্রতিবাদ ভিন্ন প্রণালীতে কীর্তনকাররাও করে গেছেন। ইতি ৭ই জানুয়ারি ১৯৩৫

তোমাদের
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কল্যাণীয় ধূর্জটি,

কাল পর্যন্ত গেল বসন্ত-উৎসবের আয়োজনে। আগামী কাল চলেছি কলকাতায়। এরই মাঝখানে এক-টুকরো অবকাশ— সংক্ষেপে সারতে হবে তোমার ফরমাশ। তোমাদের ওখানে গানের মজলিশে ছায়ানট গাওয়া হয়েছিল। ঘড়ি দেখি নি, কিন্তু অন্তরে যে ঘড়িটা রক্তের দোলায় চলে তাতে মনে হল এক ঘণ্টা পেরোলো বা। ছায়ানটের যত রূপরূপান্তর আছে, তানকর্তব সারেগম, যত রকম লয়ে-বিলয়ে তাকে উল্‌টোনো পাল্‌টানো যেতে পারে, তার কিছুই বাদ পড়ে নি। আমার অভিমত কী জানতে চাও— সময় খারাপ, বলতে সাহস করি নে। তোমাদের মেজাজ ভালো নয়। মতবিরোধ নিয়ে তোমরা যাকে যুক্তি বলো আমরা তাকে বলি গাল— ঘাঁটাতে ভয় করি। তা হোক, গীত-আলোচনায় যদি তোমার কানের সঙ্গে আমার কানের প্রভেদ দেখতে পাও তা হলে এই ব'লে তার কারণ নির্ণয় কোরো যে তুমিই বিজ্ঞ, আমি অনভিজ্ঞ ; তারও ঊর্ধ্বে উঠে লোকবিশ্রুত উদারকর্ণসম্পন্ন জীবের উপমা ব্যবহার কোরো না— এরকম সাহিত্যরীতিতে আমরা অভ্যস্ত নই।

জানতে চেয়েছ ভালো লাগল কি না। লেগেছে বইকি, কিন্তু ভালো লাগাই শেষ কথা নয়। বেঙ্গল স্টোর্সে গিয়ে যখন অসংখ্য রকম দামী কাপড় সারা প্রহর ধরে ঘেঁটে বেড়াই, ভালো লাগে, আরো ভালো লাগে, থেকে থেকে চমক লাগে, সংগ্রহের তারিফ করতে হয়। কিন্তু, সুন্দরীর গায়ে যখন মানানসই একখানি মাত্র শাড়ি দেখি, বলি : বাস্‌! হয়েছে! বলি নে ক্রমাগত সব কটা শাড়ি ওর গায়ে চাপালে ভালোর মাত্রা বাড়তেই থাকবে। সব কাপড়গুলোই সমজদারের চোখে চমৎকার ঠেকতে পারে, যত সেগুলো উলটে-পালটে নেড়ে-চেড়ে দেখে ততই তারা বলে ওঠে : ক্যা তারিফ! সোভান আল্লা! ঠিক্‌ঠাক্‌ বলতে পারে কোন্‌টাতে কত ভরি সোনার জরি, আঁচলার কাজ কাশ্মীরের না মাদুরার। মাঝের থেকে চাপা পড়ে যায় স্বয়ং সুন্দরী। ইংরেজি ভাষায় বলতে পারি, যদি ক্ষমা করো : Art is never an exhibition but a revelation। Exhibition-এর গর্ব তার অপরিমিত বহুলত্বে, revelation-এর গৌরব তার পরিপূর্ণ ঐক্যে। সেই ঐক্যে থামা ব'লে একটা পদার্থ আছে, চলার চেয়ে তার কম মূল্য নয়। সে থামা অত্যন্ত জরুরি। ওস্তাদী গানে সেই জরুরি নেই, সে কেন যে কখনোই থামে, তার কোনো অনিবার্য কারণ দেখি নে। অথচ সকল আর্টেই সেই অনিবার্যতা আছে, এবং উপাদান-প্রয়োগে তার সংযম ও বাছাই আছে। বস্তুত ছায়ানটের ব্যাপক প্রদর্শনী আর্ট্‌ নয়— বিশেষ গানে বিশেষ সংযমে বিশেষ রূপের সীমাতেই ছায়ানট আর্ট্‌ হতে পারে। সে রূপটাকে তানে-কর্তবে তুলো ধুনে দিতে থাকলে বিশেষজ্ঞসম্প্রদায়ের সেটা যতই ভালো লাগুক-না, আমি তাকে আর্টের শ্রেণীতে গণ্যই করব না। স্যাকরার দোকানে

ঢুকলে চোখ ঝল্‌মলিয়ে যাবে ; কিন্তু, দোহাই তোমাদের, প্রেয়সীকে দিয়ে স্যাকরার দোকানের শখ মিটিয়ো না— সেই প্রেয়সীই আর্ট, সেই'ই সম্পূর্ণ, সেই'ই আত্মসমাহিত। প্রোফেশনালের চক্ষে প্রেয়সীকে দেখো না, দেখো প্রেমিকের চক্ষে। প্রোফেশনাল বড়ো বাজারে খুঁজলে মেলে, প্রেমিক বাজারের তালিকায় পাই নে, তিনি থাকেন বাজারের বাইরে— 'ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন'। এইবার গাল শুরু করো। আমি চললুম। ইতি ২১শে মার্চ [১৯৩৫]

তোমাদের
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়েষু

চিঠিখানা পেয়েছ শুনে আরাম পেলুম। সামান্য কারণে মনটা বিদ্রোহী হয়ে উঠছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে। চাঞ্চল্য দূর হল।

কিন্তু, তুমি আমাকে সংগীতের তর্কে টেনে বিপদে ফেলতে চাও কেন? তোমার কী অনিষ্ট করেছি? এর পরেও যদি টিঁকে থাকি তা হলে হয়তো ছন্দের প্রশ্ন পাড়বে।

আমার যা বলবার ছিল সংক্ষেপে বলেছি। বিস্তারিত বললে শরসন্ধানের লক্ষ্য বাড়িয়ে দেওয়া হয়। তা ছাড়া অত্যন্ত সহজ কথা কী করে বৃহদায়তন অত্যন্ত বাজে কথা করে তোলা যায় আমি জানি নে। আমি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা সাহিত্যের বক্তৃপদ ছেড়ে দিয়েছি, বাক্‌-বাহুল্যের অভ্যাস বেশিদিন টিঁকল না।

বিষয়টা truism অর্থাৎ নেহাত-সত্যের অন্তর্গত। আমি তোমাকে আর্টের সর্বজনবিদিত লক্ষণের কথা বলেছি— বলেছি আকার নিয়ে, কলেবর নিয়ে, তার ব্যবহার। তোমরা যদি বলো হিন্দুস্থানী সংগীত রাগরাগিণীর প্রটোপ্লাজ্‌ম্‌, অর্থাৎ ওর আয়তন আছে, অসম্ভব রকমের স্থিতিস্থাপক প্রাণও আছে, সে প্রাণ পরিবর্তনহীন আদিতম যুগেরও বটে, রস-রসায়নের বিশ্লেষণের দ্বারা ওর বিশেষ বিশেষ উপাদানেরও তালিকা বের করা যেতে পারে, কিন্তু ওর মধ্যে কোনো পরিমিত আকৃতির তত্ত্ব নেই, ও যথেচ্ছ ফুলে উঠতে পারে, লম্বা হতে পারে, চওড়া হতে পারে, চ্যাপ্টা হয়ে এগোতে এগোতে তিন চার পাঁচ ঘণ্টাকে আপনার তলায় সম্পূর্ণ চাপা দিতে পারে, তবে আমি তোমাদের কথাটা মেনে নিতে বাধ্য হব, কারণ আমি ওস্তাদ নই— কিন্তু, বলব তা হলে ওটা আর্টের কোঠায় পড়ে না। তোমরা বলবে নাম নিয়ে মারামারি করে লাভ নেই, আমাদের ভালো লাগে এবং ভালো লাগে ব'লেই যত বেশি পাই ততই স্ফূর্তি লাগে। যখন দেখি যথেচ্ছ পরিমাণ পাওনা-বিস্তারে তোমাদের কোনো আপত্তি নেই তখন স্পষ্ট বুঝতে পারি তোমাদের ভালো লাগার প্রকৃতি কী। তোমাদেরই মতো আমারও ভালো লাগে, সেটা লোভীর ভালো লাগা। আর্টিস্ট্‌ অলুব্ধ। সে স্বাদগ্রহণের উৎকর্ষের প্রতি লক্ষ ক'রে ভালো লাগার অমিতাচারকে অশ্রদ্ধা করে। সোনা জিনিসটা উজ্জ্বল, তার সু-বর্ণটা মনোহর, দুর্লভ খনিজ বলে তার দাম আছে। বসুন্ধরা আপন রত্ন বের করে দেওয়া সম্বন্ধে মিঞাসাহেবদের চেয়ে কম কৃপণ নন। এক তাল সোনা এনে ধরা হল, তুমি বললে 'বহুৎ আচ্ছা'। আর-এক তাল এল, তুমি বললে 'সোভান আল্লা'। সংগীতের যক্ষভাণ্ডার থেকে তালের পর তাল আসতে লাগল দূন চৌদূন বেগে, বাহবা দিতে দিতে তোমার

গলা যায় ভেঙে। মূল্যের কথা কেউ অস্বীকার করতে পারবে না ; কিন্তু সে মূল্য যক্ষরাজের খাতাঞ্চিখানার। সে মূল্যের গাণিতিক অঙ্কে 'আরো' 'আরো' 'আরো' চাপিয়ে যাওয়া চলে। সরস্বতীর কমলবনে সোনার পদ্ম আছে ; সেখানে লোভীর মতো 'encore' 'encore' করে চীৎকার চলে না। বেনের দল যতই দুঃখিত হোক, শতদলের উপর আর-একটা পাপড়ি চাপানো চলবে না। সে আপন সম্পূর্ণতার মধ্যে থেমেছে ব'লেই সে অপরিসীম। ভাণ্ডারের ধনে আরো'র ফরমাশ চলে কিন্তু আনন্দের ধনের দিকে তাকিয়ে বলে থাকি— 'নিমেষে শতেক যুগ বাসি'। রামচন্দ্র সোনার সীতা বানিয়েছিলেন। সোনার প্রাচুর্য নিয়ে যদি তার গৌরব হত তা হলে দশটা খনি উজাড় করে যে পিণ্ডটা তৈরি হত তার মতো সীতার শোকাবহ নির্বাসন আর-কিছু হতে পারত না। রামচন্দ্রকে 'থামো' বলতে হয়েছে। কিন্তু ছায়ানটের অক্লান্ত প্রগল্‌ভতার মুখে 'থামো' বলবার সাহস আমাদের জোগায় না, তাতে ভুজবলের প্রয়োজন হয়। এইবার এই তর্ক সম্বন্ধে 'থামো' বলবার সময় হয়েছে, অন্তত আমার তরফে। ইতি ১৬ই চৈত্র ১৩৪১

তোমাদের
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পরম পূজনীয়েষু

আপনি লিখেছিলেন— 'আমি বারবার দেখেছি বর-ঠকানে প্রশ্ন তুলে আমাকে আক্রমণ করতে তোমার যেন একটা সিনিস্‌টর্‌ আনন্দ আছে'। কিন্তু সে রাতের আসরের পর আমাকে আপনি যে, দুটি সাংঘাতিক প্রশ্ন করেছিলেন তাদের এবং এই চিঠি-দুটির যথাযথ উত্তর দেবার অক্ষমতা লক্ষ্য করে আপনার ভাষাই আপনার ওপর নিক্ষেপ করতে ইচ্ছে হচ্ছে। এখন আমি বুঝলাম আপনি যে ব্যারিস্টার হন নি সেটা কেবল নৃপেন্দ্র সরকারের ভাগ্য-জোরে, আপনার নিজের কৃতিত্ব তাতে বেশি নেই। আজ তিন-চার সপ্তাহ ধরে কী উত্তর দেব ভাবছি। যা জুটেছে তাই গুছিয়ে লিখছি।

মনে হয়— কোথায় আমরা একমত প্রথমে জেনে রাখলে কোথায় এবং কতটুকু আমাদের পার্থক্য সহজেই ধরা পড়বে। আর্টের প্রকৃতি revelation এবং revelation-এর গৌরব তার পরিপূর্ণ ঐক্যে এই মন্তব্যের পর আপনি লিখেছেন, 'সেই ঐক্যে থামা ব'লে একটা পদার্থ আছে, চলার চেয়ে তার কম মূল্য নয়।' এই বাক্য থেকে আপনি সংগীতে গতির আনন্দ বাদ দিতে চান না, উপভোগই করতে চান পরিষ্কার বোঝা যায়। সেদিনকার এবং আরো অন্য দিনের কথোপকথনে, উচ্চসংগীত শোনবার সময় আপনার আনন্দময় একাগ্রতায় এবং বিশেষত প্রথম চিঠির মারফত ধ্রুবপদ্ধতি সম্বন্ধে মতপ্রকাশে— উচ্চসংগীতের প্রতি আপনার প্রগাঢ় শ্রদ্ধা— তার মহিমা গাম্ভীর্য ও মাধুর্য ভোগ করবার আগ্রহ ও ক্ষমতাই প্রমাণিত হয়। অতএব আমার সিদ্ধান্তই ঠিক। যে পথ-চলাতেই আনন্দ পায় সে কখনো গতিকে উপেক্ষা করতে পারে না। যে চিরজীবন গতানুগতিকের স্থাণুতার বিপক্ষে বিদ্রোহ করে এল তার পক্ষে রাগিণীর চলিষ্ণু রূপ-উদ্‌ঘাটনে অসহিষ্ণু হওয়া অসম্ভব। থামতে আপনার ধর্মে বাধে— তাই এই সেদিনও 'পুনশ্চ' ও 'চার অধ্যায়' লিখলেন। আমিও আপনার সমধর্মী, এইখানেই আমাদের যথার্থ মিল। মিলের জোরে আমরা উভয়েই হিন্দুস্থানী সংগীতের একান্ত ভক্ত হয়েও তার চিরাচরিত পদ্ধতির মুক্তি চাই। মুক্তি, মৃত্যু নয়— কারণ, বাঁচা মানেই চলা। অনুকৃতির শিকল প'রে বন্দীরাই খুঁড়িয়ে হাঁটে। স্বাধীন দেশের উপযুক্ত

সংগীত মন্ত্র আওড়ানোর মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায় না। আমি মুক্তি চাই ব'লেই আপনার সংগীতরচনার ঐতিহাসিক সার্থকতা ও অধিকার স্বীকার করি। সে মুক্তি আমাদেরই মুক্তি জানি ব'লে আপনার রচনাকে বিদেশী সংগীতের সঙ্গে তুলনা করি না ; আমাদেরই পরিচিত অন্য সংগীতের পাশে বসাই, তারই সঙ্গে যোগসূত্র খুঁজি। যখন নূতনের সঙ্গে পুরাতনের গরমিল দেখি তখন মাত্র গরমিলের জন্যই নূতনকে অবহেলা করি না ; আমাদের সংগীত-পদ্ধতির শ্রীক্ষেত্রে তাকে ঠাঁই দিই, হরিজন বলে তার প্রবেশ নিষিদ্ধ করি না। আমার বিশ্বাস আপনার সংগীতকে সংগীতের হরিজন বললেও তার অপমান করা হয় না। ভারতীয় কৃষ্টিরক্ষার ভার যদি এতদিন কেবল পুরোহিতসম্প্রদায়ের হাতেই থাকত, তা হলে সংস্কৃতির ধারা এতদিন মরুতেই সারা হত। কিন্তু— হয় নি, হয় নি গো, হয় নি হারা। এই হরিজনেরাই পাণ্ডাপূজারীর হাতের বাইরে গিয়েই সৃষ্টির সামর্থ্য অর্জন করেছে। আমাদের সংস্কৃতির ধারা যদি এখনো নৌবাহ্য থাকে তো ঐ হরিজনেরই কৃপায়। লোকসংগীতই মার্গ ও দরবারী সংগীতের কালান্তরে নিজের রক্ত দিয়ে প্রাণসঞ্চার করে এসেছে। পরে, অকৃতজ্ঞও হয়েছে সনাতনপন্থীরা। ইতিহাসেও প্রমাণ আছে— আকবর বাদশাহের দরবারে গোয়ালিয়র অঞ্চলের চাল, অর্থাৎ নবপ্রবর্তিত ধ্রুপদ শুনে আবুল ফজল আফসোস জানিয়েছিলেন। সেকালের ধ্রুপদ নাকি হরিজন-সংগীত— অর্থাৎ দরবারের অনুপযুক্ত বিবেচিত হত! মাদ্রাজের বড়ো বড়ো পণ্ডিত ও ওস্তাদ এখনো তানসেন-প্রবর্তিত উত্তর-ভারতীয় গায়কি-পদ্ধতিকে অহিন্দু যবনদুষ্ট ও ভ্রষ্ট বলে থাকেন, আমি নিজ কানে শুনেছি। বলা বাহুল্য আমরা উত্তরভারতীয়রা ঐ মতে সায় দিই না। ডাঃ সুনীতিকুমারের মতো হিন্দুও তানসেন সম্বন্ধে প্রবাসীতে উচ্চপ্রশংসাপূর্ণ প্রবন্ধ লেখেন! আমাদের মধ্যে অনেকেই তানসেনকে সংগীতের অবতার গণ্য করেন। আপনি কয়েক শতাব্দী পরে ঐ রকম পদে অধিষ্ঠিত না'ও হতে পারেন। কিন্তু, আপনার সংগীতরচনার ও সংগীতে মুক্তিদানের যুক্তির বিপক্ষে মন্তব্য কখনো কখনো ধ্রুপদের বিপক্ষে আবুল ফজলের আপত্তির পুনরুক্তি শোনায় ব'লেই সৃষ্টির ঐতিহাসিক অধিকার ও কর্তব্য থেকে আপনাকে বঞ্চিত ও মুক্ত করতে পারি না। সংগীতের যদি প্রাণ থাকে তবে তার ইতিহাসও থাকবে, যদি তার ইতিহাস থাকে তবে সেই ঐতিহ্যকে রক্ষা করা— তার সাথে যুক্ত হবার সঙ্গে সঙ্গে তাকে রূপ দেবার দায়িত্ব— কখনো কোনো স্বাধীনতাপ্রিয় ব্যক্তির ঘুচবে না ; তাকে ভেঙে গড়ার কর্তব্য থেকে কোনো স্রষ্টাই অব্যাহতি পাবেন না। আমাদের দেশের বড়ো বড়ো রচয়িতা সস্তায় অব্যাহতি পেতে চান নি। আমাদের সংগীতের ইতিহাস অনুকরণের তমসায় আচ্ছন্ন নয়। সে যাই হোক, কোনো তুলনা না করে বলছি, আপনার সংগীতরচনায় এই দায়িত্ববোধ ও কর্তব্যজ্ঞানের পরিচয় পাই।

আপনি নিজে, ভদ্রতাবশত, আপনার সংগীতের কোনো উল্লেখ করেন নি। ভালোই করেছেন। আমি উল্লেখ করছি, কারণ, আমি বুঝেছি— মনের সঙ্গে লুকোচুরি করে লাভ নেই। আমার বিশ্বাস যে, আপনি সংগীতরচয়িতা এবং আপনার রচনার সংগীতিক মূল্যও আছে। কত বেশি কত কম, কার তুলনায়, এ-সব আলোচনা এ ক্ষেত্রে অপ্রাসঙ্গিক। তর্কের খাতিরে এবং আমার মজ্জাগত শান্তিপ্রিয়তার জন্য মেনে নিচ্ছি যে, আপনি সর্বশ্রেষ্ঠ রচয়িতা নন। তা ছাড়া, আপনি যতই নিষ্কামভাবে আলোচনা করুন-না কেন, সংগীত সম্বন্ধে আপনার মতামতে আপনার নিজের রচনাপদ্ধতির ছায়াপাত হবেই হবে। উপরন্তু সেই মতামতকে এক হিসাবে আপনার সংগীতের ব্যাখ্যা ও সমর্থনও বলা চলে। সাহিত্যে অন্তত দেখেছি যে, আপনি নিজেই নিজের একজন উৎকৃষ্ট ভাষ্যকার।

অতএব মিল হল গতিপ্রিয়তায় এবং সৃষ্টির ঐতিহাসিক অধিকার-স্বীকারে। আর-একটি মিলনের ক্ষেত্র নির্দেশ করছি। আমিও রচনার প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধা দেখাবার স্বপক্ষে, কারণ আমি উৎকৃষ্ট ঘরানার গান শুনেছি। আমাদের সংগীতে অন্তত দুটি বিভাগ আছে। প্রথমত আলাপ, যাতে কথা নেই কিংবা ব্যবহৃত কথা সম্পূর্ণ নিরর্থক এবং যার একমাত্র উদ্দেশ্য রাগিণীর বিকাশসাধন। দ্বিতীয়ত বন্দেশী, যাতে শব্দ আছে, শব্দের অর্থ আছে, যদিও রাগিণীর বিকাশ সেই অর্থের সা রি গা মা'য় অনুবাদ নয়। বন্দেশী গানে 'বন্দেশ' (composition) অর্থাৎ রচনার মেজাজটাই (temper : mood) সুরের বিকাশকে ধারণ করে, তার রূপের কাঠামো জোগান দেয়, গতির সীমা নির্ধারণ করে। ধ্রুপদে এই বন্দেশী পদ্ধতির চমৎকার পরিচয় মেলে। কোনো ধ্রুপদিয়া (অনেক ধামারিও) গাইবার সময় তান বিস্তার করেন না। এমন-কি অযথা বাঁটোয়ারার দ্বারা রচনার সৌকর্যকে বিধ্বস্ত করাও ধ্রুপদে প্রশস্ত নয়। যাঁরা পাকা ঘরানার খেয়াল গান, তাঁরাও রচনার অন্তঃপ্রকৃতি বুঝে তানের সাহায্যে রচনারই রূপ উদ্‌ঘাটিত করেন। ভীমপলশ্রীর দুটি বিখ্যাত খেয়াল আছে, 'অব তো সুনলে' ও 'অব তো বড়ি বের'। কিন্তু দুটির গঠনসৌষ্ঠব পৃথক। যে খেয়ালিয়া বন্দেশের গঠনতারতম্য না স্বীকার ক'রে স্বকীয় প্রতিভারই জোরে ভীমপলশ্রীর ঐশ্বর্য দেখাতে তৎপর সে সাধারণ শ্রোতাকে চমক লাগাতে পারে, কিন্তু ওস্তাদের কাছে তার খাতির নেই। বালাজীবোয়া বিষ্ণুদিগম্বরের মুখে একটি খানদানী (হদ্দুখাঁনি) চালের গানের ঐ প্রকার স্বাধীন বিকাশ শুনে দুঃখ প্রকাশ করেছিলেন বলে শুনেছি। এবং ব্যতিরেকের জন্য দুঃখ প্রকাশ আমাদের পক্ষে স্বাভাবিক। যে দেশে বেদের উচ্চারণ ভ্রষ্ট করলে মহাপাতকী হতে হয় সে দেশে বন্দেশী অক্ষরের সুরগত সমাবেশ ভঙ্গ করতে লোকে ব্যক্তিগত স্বাধীনতার দোহাই পাড়ে কেন বুঝি না। তার পর, ঠুংরীতেও নায়ক-নায়িকা আছে, সেগুলি হল রচনার মূলভাব— যেমন কীর্তনে বিরহ মান প্রভৃতি। শ্রেষ্ঠ ঠুংরী গায়ক-গায়িকা কত সাবধানে শব্দ উচ্চারণ করেন, কী রকম শ্রদ্ধার সহিত মূলভাবের ও রচনার মর্যাদা দেন যদি কেউ মন দিয়ে লক্ষ্য করে থাকেন তা হলে তিনি কখনো আমাদের গায়কিরীতিকে স্বাধীনতার নর্তনভূমি বলতে চাইবেন না। আমার বক্তব্য হল এই : আমাদের বন্দেশী গায়কিতে রচনাকে মর্যাদা দেওয়াই রীতি। এক আলাপিয়া ছাড়া অন্য সব ভালো ওস্তাদেই স্বীকার করেন যে, মর্যাদা কেবল শব্দেরই প্রাপ্য নয়, রাগিণীরও নয়, সুর ও কথা মিলে যে রস জন্মায় কেবল তারই প্রাপ্য। আবার বলি— যখন কোনো ওস্তাদ রাগিণীরই বৈচিত্র্য দেখাতে রচনার রূপগত ঐক্যের প্রতি শ্রদ্ধানিদর্শনে কার্পণ্য করেন তখন তিনি প্রথাসংগত গায়ক নন। জোর তাঁকে আলাপিয়া নাম দেওয়া চলে। সেইসঙ্গে অবশ্য এ কথা বলবারও অধিকার আমাদের আছে যে, তাঁর কোনো কথা ব্যবহার না করলেও বেশ চলত। অতএব, রচনার স্বকীয়তার প্রতি গায়কের কাছে আপনি যে দরদ প্রত্যাশা করেন সেটি আপনার প্রাপ্য। আপনি নতুন-কিছু চাইছেন না। কেবল জনকয়েক ওস্তাদকে তাদের গোটাকয়েক প্রথাবিরোধী বদ্‌ অভ্যাস ভাঙতে অনুরোধ করছেন, তাদেরকে আমাদেরই সংগীত-ইতিহাসের অতীত গৌরবই স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন। এখানেও আপনি ভূমিকা থেকে ভ্রষ্ট নন, বরঞ্চ আগাছা তুলে পুরাতন রাজপথকে পদগম্য করতে প্রয়াসী। এখানেও আমাদের মিল, আমি রাজপথে বেড়াতে ভালোবাসি, সুবিধা অনুভব করি।

এইবার বোধ হয় আপনার সঙ্গে আমার গরমিলের ক্ষেত্র জরিপ করা সহজ হবে। ক্ষেত্রটি সংকীর্ণ ; কিন্তু তার অস্তিত্ব উড়িয়ে দেব না, যদিও তাই নিয়ে মোকদ্দমা করতে রাজি নই। বিশ্বাস আছে আপনাকে বুঝিয়ে বললে সে জমিটুকু স্ব-ইচ্ছায় ছেড়ে দেবেন। এবং প্রতিবেশী হিসেবে আমার বদনাম নেই।

আমার নিজের বক্তব্য হল এই : আলাপে যখন রচনার মতো কোনো সৌষ্ঠবসম্পন্ন কথাবস্তুর দাবি স্বীকার করবার পূর্বোক্ত ধরনের বিশেষ ও জরুরি দায়িত্ব নেই, তখন আলাপের রীতিনীতি রচনার গায়কি-পদ্ধতি থেকে ভিন্ন হবেই হবে। রচনা হল কথা ও সুরের মিশ্রণে এক নতুন রসসামগ্রী। আলাপ কিন্তু প্রাথমিক, রাগিণীর রূপবিকাশই তার একমাত্র কাজ ; এখানে না আছে অর্থবাহী কথা, না আছে কথাবাহী অর্থ। আলাপের গন্তব্য নেই, অথচ উদ্দেশ্য আছে। উদ্দেশ্য বিকাশের মধ্যেই নিহিত। উদ্দেশ্য রাগিণীকে reveal করা— উদ্দেশ্যসাধনের উপায় বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যস্থাপনা। ঐশ্বর্য দেখানো কোনো আর্টিস্টেরই কাম্য হতে পারে না, কিন্তু বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যস্থাপন নিশ্চয়ই ন্যায়সংগত। রচনায় পূর্ব হতেই ঐক্য দেওয়া আছে, সেটি রচয়িতার দান ; আলাপে তাকে স্থাপনা করতে হবে, এটি হবে গায়কের সৃষ্টি। সেজন্য তার একটি অতিরিক্ত শক্তির প্রয়োজন। আলাপিয়ার সুবিধাও রয়েছে— রচনার, বিশেষত কথার, বাঁধন তাকে মানতে হচ্ছে না। ঐশ্বর্য দেখানোতে শক্তির অপচয় ঘটে, সেইজন্য নির্বাচন তাকে করতেই হবে। বন্দেশী গানে শক্তির ব্যবহার রচনার সৌষ্ঠবরক্ষায় ; আলাপে শক্তির ব্যবহার রাগিণীর ক্রমিক বিকাশে, তার জ্ঞানকৃত বিবর্তনে। আলাপই আমাদের pure music ; আপনি চিঠিতে আলাপকে বাদ দিয়েছেন। সংগীত বলতে আমি আলাপকেও বুঝি। আর্টের দিক থেকে বন্দেশী বড়ো কি আলাপ বড়ো এই প্রশ্নের উত্তর আর্টিস্টের কৃতিত্ব-সাপেক্ষ এবং শ্রোতার রুচি-সাপেক্ষ। অর্থাৎ, এ বিচার বিশেষের ওপর নির্ভর করে ব'লেই তাকে কোনো সামান্য বাক্যে পরিণত করা চলে না। কিন্তু আধিমৌলিক বিচারে, ontologically, আলাপকে প্রাধান্য দিতে হয়। সংগীতও একপ্রকার জ্ঞান ; প্রথমে কোনো জ্ঞানই নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারে না— অথচ স্বাধীন না হলে তার বৃদ্ধি নেই। বৃদ্ধি ও সম্প্রসারণের জন্য জ্ঞানকে আশ্রয় পরিত্যাগ করতে হয়, তবেই তার মূলতত্ত্ব আবিষ্কৃত হয়। তত্ত্বমূলের পাট করলে পরগাছা যায় মরে, গাছ তখন নিজের ফলফুলে শোভিত হয়ে স্বকীয়তার গৌরব অনুভব করে। জ্ঞান চর্চার এই হল স্বকীয়তাসাধন। পরের অধ্যায়ও অবশ্য আছে, কিন্তু সেটা গাছে অর্কিড ঝোলানোর মতনই। অতএব, আলাপের রীতিনীতি বাদ দেওয়া যায় না সংগীত-আলোচনা থেকে।

ধরুন, ছায়ানটের আলাপ হচ্ছে। ছায়ানটের আরোহী অবরোহী, তার বাদী সম্বাদী, তার বিশেষ 'পকড়' দেখিয়ে ছায়ানটের ঘটস্থাপনা হল। কিন্তু সেইখানে থামলেই কি ছায়ানটের প্রাণপ্রতিষ্ঠা হল— তার প্রকৃতি ফুটল? এ যে সেই ভক্তের কথা যিনি প্রতিমার মুণ্ডু পরাবার পূর্বেই বলেছিলেন, 'আহা! মা যেন হাসছেন!' অন্য ভাষায় বলি— আমার আমিত্ব প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য নেতিবিচারের দ্বারা পার্থক্য-অনুভূতির কি কোনো প্রয়োজনই নেই? যে-সব যোগীর পূর্ণ সমাধি হয় তাঁদের বেলা তাঁরা আছেন এই যথেষ্ট। সাহিত্যে যেমন, আপনার লেখায়, পরেশবাবু ও মাস্টার মশাই। তাঁরা সৎ, এর বেশি তাঁদের সম্বন্ধে জানবার প্রয়োজনই হয় না। এঁরা পূর্ণ, এঁরা রুদ্ধগতি, আত্মসমাহিত, আত্মস্থ, আমাদের নমস্য। এঁরা হলেন শেষের কবিতা। কিন্তু অন্যের পক্ষে 'বহুর্ভবামি' অস্তিত্বের বিকাশেচ্ছা নয় কি? আমি হব— বহু হব— এইটাই আর্টিস্টের প্রাণের কথা। আমি আছি— যেমন যোগীর। বহু হওয়াই যখন আর্টিস্টের ধর্ম, যখন সে যে-বস্তুর অন্তর উদ্‌ঘাটিত (reveal) করতে চায় তার প্রকৃতি বুঝতে কোনো substance কি গুপ্তসত্তা বোঝে না, process-ই বোঝে, তখন revelation-এর জন্যই mere statement করে নীরব থাকলে তার চলে না। অতিরিক্ত কর্তব্যের মধ্যে একটি হল— ক-বস্তু খ-বস্তুর নয় প্রমাণ করা। যেটুকু না হলে নয় তারই আভাস দিয়ে মুখবন্ধ করলে আর্টিস্টের বহু হবার প্রবৃত্তিকে বঞ্চিত

করা হয়। সাধারণের বেলাতেও তাই— সাধারণ শ্রোতাও যখন শুনছে তখন সে আর্টিস্টের সঙ্গে সঙ্গে বহু হচ্ছে। বহুলতাকে নয়, বহু হবার প্রবৃত্তিকে খাতির না করলে আর্টকে ঘৃণা করা হয়। বহুলতার মূলে আছে 'বহুর্ভবামি'র তাগিদ। বিশেষত আমাদের আলাপে। আমাদের আলাপ অবিরাম গতিশীল, তার প্রকৃতিই হল procession। অতএব, ঠিক তার revelation হয় না, হয় এবং হওয়া চাই revealing।

এখন ছায়ানটের আলাপ চলুক। প্রথমেই সা'রে, গ'ম'প' প'রে' গ'ম'রে' সা' নেওয়া হল, তার পর আরোহীতে সা'রে' রে'গা' গা'মা' মা'পা' নিয়ে ধৈবত আন্দোলিত ক'রে গলা ওপরের সুরে পৌঁছল, অবরোহীতে ঐপ্রকার শুদ্ধস্বরগুলি ব্যবহার করে পা'রে' গা'মা' পা' এই মীড়টি নিয়ে রিখাবে গলা থামল— কোনো স্বরই বিবাদী হল না। তবুও কি ছায়ানট রাগিণী গাওয়া হল? আমার মতে এখনো হল না, হল কেবল ছায়ানটের blue printটুকু, ডিজাইনটুকু। শ্রমবিভাগের ফলে স্থপতিবিদ্যায় ডিজাইনের কদর বেড়েছে জানি, কিন্তু নীল রঙের কাগজে সাদা আঁচড় দেখে বসবাসের সুখভোগ কি স্বাভাবিক? আপনি বলবেন কল্পনার উদ্রেক করানোই আর্টিস্টের কর্তব্য। কিন্তু, কল্পনাও নানা জাতের, ডিজাইনারও নানা রকমের। সেইজন্য নীচের ও ওপরের তলার, স্নানের ঘরের, মায় সিঁড়িরও cross-section চাই, এলিভেশনের লোভ দেখিয়ে ছেড়ে দিলে চলবে না। তার ওপর চাই নির্মাণ, চাই গৃহপ্রবেশ, চাই বসবাস— এ ঘরে বাসর, ও ঘরে মৃত্যু, এ জানলা দিয়ে লবঙ্গলতিকার উগ্রগন্ধ পাওয়া, ওটা দিয়ে নারকেল গাছের সোনালিফুল থেকে গাঢ় সবুজ ডাবের পরিণতি দেখা, এ দেয়ালে সিঁদুরের দাগ, ওটায় খুকীর আঁচড়, এ পর্দা মেজদির, ওটা সেজ বৌমার তৈরি— সব চাই, তবেই না গৃহ! উপমা ছেড়ে দিই— শ্রীকৃষ্ণকে ভগবদ্‌গীতা শোনাতে চাই না। ছায়ানটের প্রাণপ্রতিষ্ঠার পর (প্রতিষ্ঠা কথাটি ঠিক নয়, কারণ আলাপের প্রাণই হল গতি) বিস্তারের দ্বারা তাকে মুক্তি দিতে হবে।

আলাপবিস্তার অনেকটা ভারতসাম্রাজ্যের non-regulated area'র মতন। তার রীতিনীতি— সুনির্দিষ্ট পন্থাও আছে, তবে সেটি বন্দেশী রাগিণীর রূপ-প্রকাশের নয়। হয়তো আপনি ছাড়া আর কেউ সেই নিয়মকে ভাষায় ব্যক্ত করতে পারে না। তবে পন্থা আছে জানি, কারণ, শুনেছি। প্রথমে ধীরে, গমক ও মীড়ের সাহায্যে তান না দিয়ে তার পর মধ্যলয়ে খুব ছোটো তানের সঙ্গে মীড় মিশিয়ে, তার পর— সব রাগে নয়— গোটা কয়েক রাগে দ্রুত ও বিচিত্র কর্তব্যের দ্বারা আলাপ করা হয়। সাধারণত আলাপে খেয়াল ঠুংরী ও টপ্পার তান ব্যবহৃত হয় না। অন্য অলংকার, যেমন ছুট্‌ মূর্ছনা প্রভৃতিরও প্রয়োগ চলে। তার পর বাণী আছে। সেই বাণীর অবলম্বনেই বোল্‌-তান দেওয়া হয়। এই হল আলাপের পন্থা, যার প্রধান কথা— পরম্পরা। মীড়ের পরই জমিন তৈরি হতে-না-হতেই তানকর্তব চলে না। সবই আসতে পারে, আসবেও, তবে যথাসময়ে। এইখানেই নির্বাচনক্রিয়া। বড়ো আলাপিয়ার পদ্ধতি সুসংগত, তার নির্বাচন যথেচ্ছাচারিতা নয়। ভালো ঘরানায় পথটি পাকা। যদি কোনো ওস্তাদ প্রতিভার জোরে আরো ভালো রাস্তা তৈরি করে তা হলে তাকে ও তার পথকে কদর করবই করব। আলাপে এইপ্রকার প্রতিভার সাক্ষাৎলাভ দুর্লভ, আলাবন্দে খাঁর ঘরানা ভিন্ন। তবে অন্য গানে আবুল করিমকে আমি খুব উচ্চস্থান দিই। আপনি বোধ হয় শুনেছেন যে, আবুল করিম ফৈয়াজের মতন ঠিক ঘরানা গাইয়ে নয়। সে অনেক সময় বন্দেশ ভুলে যায়— কিংবা দু-একটি লাইন গায়, বড়ো ওস্তাদে তাকে সেজন্য ঠাট্টাও করে, হিন্দোলে শুদ্ধ মধ্যম দেয়, ভৈরবীতে শুদ্ধ পর্দা লাগায়, গায় নিজের মেজাজে। কিন্তু সে মেজাজে কী মজা। এমদাদ হোসেন কি ঘরানা বাজিয়ে ছিলেন? কিন্তু এত রসিক সেতারী জন্মায় নি।

এম্‌দাদ খাঁ নিজেই ঘর সৃষ্টি করে গিয়েছেন— এখন সারা ভারতে এম্‌দাদী চালই চলছে। সেনীয়া সেতারীর বাজিয়ে হিসেবে খাতির কম।

আলাপে পরম্পরার রীতি ঘরানা হিসেবে ভিন্ন হলেও তার নীতি বোধ হয় এক ভিন্ন দুই নয়। প্রথম পদ দ্বিতীয়কে পথ দেখাবে, দ্বিতীয় তৃতীয়কে— এই চলবে। মূল অবশ্য ছায়ানট, অর্থাৎ অন্য রাগিণী নয়। মূলটাই ঐক্যবিধায়ক। এখানে ঐক্যজ্ঞান শেষ জ্ঞান নয়, এখানে ঐক্য সম্পূর্ণতার নামান্তর নয়। মূলগত ঐক্য বিস্তারের মধ্যেই ওতপ্রোত রয়েছে। গতিশীল ক্রমবর্ধমান শ্রেণীর ঐক্য এই ধরনের হতে বাধ্য। যদি বৃত্ত হিসেবে ধরেন, তা হলে ক-বিন্দু থেকে বেরিয়ে সেই ক-বিন্দুতে ফিরে আসাই হবে গতির নিয়তি। কিন্তু গানের, বিশেষত আলাপের, গতিকে বৃত্তাকারে যদি পরিণত করতেই হয়, তা হলে asymptoteএই করা ভালো। যে অসীম পথের যাত্রী তাকে ঘরের সীমানায় আবদ্ধ রাখলে কী ক্ষতি হয় আপনি নিজে জানেন। আপনিই না স্কুল পালাতেন? আপনিই না স্বাধীন দেশে বছরে অন্তত একবার ঘুরে আসেন? 'বনের হরিণ' গানটি আমার কানে ভেসে আসছে। গতিরাগের গানকে আপনি আলোছায়ার প্রাণ বলেছেন। আকাশে আজ হঠাৎ মেঘ করেছে, জোরে হাওয়া চলছে— মেঘ ও আলো ছক আঁকতে আঁকতে কোথায় যাচ্ছে কে জানে! এই তো আমাদের আলাপ।

লোকে অস্থায়ীকে (কথাটা স্থায়ী, উচ্চারণবিভ্রাটে অস্থায়ী হয়েছে) একটু ভুল বোঝে। গানের কোনো দুটি চরণ (phrase) এক নয়। আলাপ যখন শুরু হয় তখনকার প্রথম চরণ, আর ঘুরে এসে যেখানে স্থিতি সেই 'প্রথম' চরণ, এক বস্তু নয়। এমন-কি আরোহীর স্বর আর অবরোহীর স্বর এক নয়— মালকোষে ওঠবার সময় ধৈবত কোমলের একটু বেশি, নামবার সময় সত্যই কোমল। তেমনি জৌনপুরীর ধৈবত আরোহীতে কোমলের চেয়ে একটু চড়া, অবরোহীতে কোমলই। ধ্রুপদের অস্থায়ী ও সঞ্চারী— অন্তরা ও আভোগী কি সমধর্মী? উঁচু অক্টেভের ছক কি নিচু অক্টেভের ছকের পুনরাবৃত্তি? কানাড়ার সা রে গা-কোমল কি মা পা ধা-কোমলের হুবহু নকল? অথচ মধ্যমকে সুর করলেই তাই হয়, অবশ্য tempered scale-এ— সেইজন্যই তো হিন্দুস্থানী গান হার্মনিয়মের সঙ্গে গাওয়া চলে না। গানে কেন, সর্বত্রই, যেখানে জীবন সেইখানেই এইপ্রকার যান্ত্রিক পুনরাবৃত্তি অসম্ভব। আপনি নিজেই লিখেছেন— জীবন মানেই নব নব রূপের প্রকাশ। অবশ্য, সৃষ্টির মধ্যে unity আছে, কেবলই বিবর্তন নয়। কিন্তু, সেটি মূলের, পূর্বেই বলেছি। আমি ইতিহাসে dialectic process বাধ্য হয়ে স্বীকার করি। জোর ক'রে রামরাজত্বে ফিরে যেতে পারি কি? চরখা ঘুরুলেই কি উপনিষদ্ লেখা হয় না মানুষে আপনা হতেই তত্ত্বজ্ঞানী হয়ে ওঠে? A Yankee at King Arthur's Court হাসবার সামগ্রী।

আমার বক্তব্য হল এই— পরিশেষে ঐক্য চাইতে তিনিই পারেন যিনি সৃষ্টি স্থিতি ও লয়ের অতীত। 'ইতিমধ্যে'র অধিবাসীরা যখন শেষের ঐক্য চান তখন জীবনের organic processকে একটা মনগড়া অসীম উদ্দেশ্যের উপায় বিবেচনা করেন। আমার সন্দেহ যে, আপনি আলাপ সম্বন্ধে teleologically চিন্তা করেছেন। যে জিনিস চলছে, চলতে চলতে পথ কাটছে, চলিষ্ণু হয়েই পূর্ণতার দিকে এগুচ্ছে, তার আবার শেষ কোথায়?

আলাপের শুরু হল সীমার মাঝে। তার পর মূল বাঁচিয়ে, দু ধারের সীমার মধ্য দিয়ে তার গতি অসমের দিকে। দিক্ কথাটি লেখা উচিত হল না, কারণ, অসীমের দিক্ নেই— organic processএরও নেই। ব্যাপারটি সাদি কিন্তু অনন্ত। যাওয়াটাই তার মজা, তার adventure। এই শেষহীনতাই তার জীবন। তবে এ জীবনেরও ধর্ম আছে।

মূল বাঁচাবার পরই যাত্রা শুরু হল। ছায়ানটের এই তানে দেখুন বিলাবল, আবার অন্য তানে শুনুন কল্যাণের অঙ্গ। একবার মাত্র তীব্র মধ্যম ছোঁওয়া হল, বেশি নয়, সামান্য ; আর-একবার পঞ্চম থেকে মীড় দিয়ে রিখাবে নামল, আবার তীব্র গান্ধার— এই হল কল্যাণের আভাস। অতএব কল্যাণ ঠাটের যত রকম রাগিণী আছে তার সঙ্গে ছায়ানটের সাদৃশ্য দেখানো চাই— কারণ, ছায়ানট কী নয় তাও দেখাবার প্রয়োজন আছে। সেই রকম বিলাবল ঠাটের রাগিণী, বিশেষত আলাহিয়ার সঙ্গে, তার পার্থক্যও রয়েছে। অনেকটা endogamy ও exogamy-র সম্বন্ধের মতন, যেজন্য সুপাত্র খুঁজতে বাজার উজাড় করতে হয়। ছায়ানটকে কত হাত থেকে বাঁচাতে হয় ভাবুন— কামোদ, শ্যাম, কেদার, হাম্বীর, গৌড়-সারঙ্গ— সব গণ্ডির পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে। গায়ক এক-একবার গণ্ডি থেকে বেরিয়ে তাদের সঙ্গে মিশল। কিন্তু, আবার ঘরে এল জাত বজায় রেখে। এই মেশার ভেতর স্বকীয়তা বজায় রাখা তান-কর্তবের একটি প্রধান উদ্দেশ্য। রাগিণীর যত বন্ধু, বন্ধুদের সঙ্গে যত প্রকার মেলামেশার উপায় আছে, তত প্রকারের তান সম্ভব। (এখন দেখছি সতীনের উপমা দিলেও মন্দ হত না।)

তানকর্তবের অন্য কাজও আছে, তার উল্লেখ মাত্র করছি। গমকিতে গাম্ভীর্য, মীড় ও আশে মাধুর্য, মুড়কিতে অলংকার, জমজমায় ঐশ্বর্য সূচিত হয়। তবে বুঝে তান ছাড়তে হবে— নির্বাচনের হাত থেকে রেহাই নেই। বন্দেশী গানে রচনার মেজাজ এবং আলাপে সুকুমার পারম্পর্যই হল নির্বাচনের principle। ঘরানায় নির্বাচনের দায়িত্ব সহজ করে দিয়েছে মাত্র। কিন্তু, নির্বাচন-প্রক্রিয়াটি কঠিন ব'লে তান বর্জন করাটা স্নানের টাবের জলের সঙ্গে খোকাকে নর্দমায় ফেলে দেবারই মতন।

আপনি সুন্দরীর সঙ্গে রাগিণীর তুলনা করেছেন, সেই হিসাবে তানকে অলংকার বলেছেন। প্রেয়সীকে দিয়ে স্যাকরার শখ মেটাতে বারণ করেছেন। বেশ, মেটাব না। কিন্তু এই সংক্রান্তে আপনারই একটি মন্তব্য স্মরণ করিয়ে দিই। আপনি মুখে বলেছিলেন 'বেশ, সব অলংকারই চাই— কিন্তু একটি গানে কেন? আলাদা আলাদা গানে তার উপযোগী গহনা পরাও।' তা হলে, কী দাঁড়াল দেখছেন! হিন্দুসমাজ যে ভেঙে যাবে। আত্মহত্যার হিড়িক পড়বে। কারণ, একই সময় কোনো সুন্দরী তাঁর সিন্দুকের সব গহনা পরেন না, এবং একই সময় একটি সুন্দরীকে সব গহনা পরানোও যায় না। বাঙালি-সমাজে, সুন্দরীর দুর্ভিক্ষ হয়েছে। সত্য কথা এই, আলাপে ঐ প্রকার কোনো 'একই সময়' নেই, প্রত্যেক মুহূর্তই পিচ্ছিল।

ইতিপূর্বে পরম্পরা ও adventure কথা দুটি ব্যবহার করেছি। লিখতে লিখতে আরো অন্য কথা মনে হচ্ছে। ঐ সম্বন্ধে আরো কিছু বলতে চাই। আপনি লিখেছেন, 'ঘড়ি দেখি নি, কিন্তু অন্তরে যে ঘড়িটা রক্তের দোলায় চলে তাতে মনে হল এক ঘণ্টা পেরোল বা।' আমারও বিশ্বাস গান শোনবার সময় কলের ঘড়ি ব্যবহার করা উচিত নয়। নাগ্‌রার মতন ঘড়ি বাইরে রেখে আসা উচিত। রক্তের দোলায় যে সময় দোলে সেই organic timeএর সঙ্গেই গানের সম্বন্ধ আছে। অবশ্য, রক্তের দোলটাই গানের দোল ভাবলে ভুল করা হবে। আমি organic কথাটি biological অর্থে ব্যবহার করছি না। অনেকের পক্ষে সংগীত-উপভোগটা নিতান্তই জৈব। বড়োলোকের বাড়িতে বিবাহ-উপলক্ষে সংগীতকে appetiser হিসেবে ব্যবহার করা হয়। শরীর অসুস্থ হলে সব গানই দীর্ঘসূত্র, সুস্থ থাকলে সবই ক্ষণিকের মনে হওয়া স্বাভাবিক। থিয়েটার-সিনেমার গান ভাবুন। সে গান শুনতে পারি না, একান্তই জৈব বলে। সেখানে নায়কের প্রত্যাখ্যানের সঙ্গে সঙ্গে নায়িকা কাঁদতে থাকেন, এবং তাঁর ফোঁশ্‌ফোঁশানির সঙ্গে সঙ্গে আমাদেরও বেহাগ শুনতে হয়। কিন্তু, আমরা সকলে মিলে কী পাপ করেছিলাম?

আপনি নিশ্চয় 'রক্তের দোলা' ঐভাবে লেখেন নি। আমি যে অর্থে organic time ব্যবহার করছি সেটি mechanical time-এর বিপরীত। এই দুটোর মধ্যে স্বতঃই একটা বিরোধ রয়েছে, আপনার 'কিন্তু' কথাটিতেই সেটি পরিস্ফুট। মানুষ ঘড়ি মানতে চায় না। খেয়ালের বশেই মানুষ সাধারণত সময় মাপে। utilityর রাজ্যে, কলেজে, ঘড়ি। বৃদ্ধারা বলেন, 'দাঁড়াও বাছা, বলছি কবে— পুটু তখনো জন্মায় নি।' চাষাভুষোরা স্মরণীয় ঘটনা, ফসল বোনা, কাটা, প্লাবন ও জলকষ্ট দিয়েই সময় মাপে। ফ্যাক্টরি যে ফ্যাক্টরি, সেখানেও মজুররা যে তাই করে সকলেই জানেন এবং এই সাধারণ জ্ঞানটি পণ্ডিতে অনেক অঙ্ক ক'ষে ছক এঁকে উপলব্ধি করেছেন— প্রভুরা এখনো করেন নি। শ্রমিকের ক্লান্তি আসে আগ্রহের অভাবে। mechanical time হল ঘড়ির কাঁটা-মাপা ঘণ্টা, তার মাপ মিনিট ও সেকেণ্ডের যোগ-বিয়োগে। এবং যেখানে যোগ-বিয়োগই উপভোগের মাত্রা নির্ধারণ করে সেইখানেই 'গান থামবে কবে' প্রশ্নটি শ্রোতাকে উত্ত্যক্ত করে। ক্লান্ত শ্রমিকরাই বিকেলের দিকে ছুটির জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে ওঠে। কিন্তু, সহজ আগ্রহ ও কালের হ্রাসবৃদ্ধির মাপ নেই, ছন্দ আছে। সে ছন্দ সংখ্যামূলক নয়, অর্থাৎ তার পিছনে matter কি motion-এর যান্ত্রিক পুনরাবৃত্তি নেই ; আছে সেই-সব ঘটনা ও স্মরণীয় অভিজ্ঞতা যার দরুন বৃদ্ধির হার কমে বাড়ে, তার অবস্থান্তরপ্রাপ্তি হয়। এর তাগিদ থামবার নয়, বাড়বার। অবশ্য, এই প্রকার কালাতিপাতকে development বলাই ভালো। বাংলায় কী প্রতিশব্দ? এক কথায়, mechanical time-এর স্বভাব হল পুনরাবর্তন, organic time-এর হল ঐতিহাসিক উদ্‌ঘাটন। প্রথমটি হল succession of mathematically isolated instants ; দ্বিতীয়টি accumulation of connected experiences, অতএব তার ক্রিয়া cumulative। প্রথমটি গোড়ায় ফিরে আসতে পারে— ঘড়ির কাঁটা পিছিয়ে দিলে day-light saving হয়। কিন্তু, দ্বিতীয়টি চলছে নিজের গোঁ-ভরে, তার পরিণতি নেই। প্রথমটিতে যা হয়ে গিয়েছে সেটি গত, ভূত, সত্যকারের ভূত। দ্বিতীয়টিতে যা হয়েছিল সেটি বর্তমানে রয়েছে, আবার ভূত ও বর্তমান মিলে ভবিষ্যৎকে তৈরি করবার জন্য সদাই প্রস্তুত। এগিয়ে চলবার খাতিরে, ভবিষ্যতের জন্য, organic time সব করতে পারে— নতুন, রবাহূত, অনাহূতকে বরণ করতেও সে রাজি। হিন্দুস্থানী-সংগীতে আলাপের কাল organic—যে দেশে ঘড়ির dictatorship সে দেশের সংগীতের কাল mechanical হয়তো হতে পারে, ঠিক জানি না। ভাগ্যিস আমরা অসভ্য।

আমি বলছি— আলাপের কালকে ঘড়ির কাঁটা, এমন-কি রক্তের যান্ত্রিক হ্রাসবৃদ্ধি দিয়ে পরিমাণ করা যায় না। আলাপ যে বরফের গোলার মতন বাড়তে বাড়তে চলেছে। রাগিণীর রূপ যে কেবলই উন্মুক্ত হতে হতে চলেছে। আপনি বলছেন reveal করা চাই, খুব খাঁটি কথা, আলাপই তো রাগিণীর (রচনার কথা আলাদা) সত্যকারের unfolding— চীনেদের scroll-painting-এর মতন— আলাপই সত্যকারের ইতিহাস, তাই প্রতিমুহূর্তের ইতিহাস। অবশ্য, রাগিণীরই ইতিহাস, গায়কের গলা সাধার ইতিহাস নয়। রাগিণী ব'লে পৃথক বস্তু নেই, প্রকাশেই তার অস্তিত্বস্ফুরণ।

এই ভাব থেকে আপনার ব্যবহৃত 'অনিবার্য' কথাটির বিচার চলে, তার তত্ত্ব উপলব্ধি করা যায়। অন্য সব আর্টে অনিবার্য সমাপ্তি আছে ইঙ্গিত করেছেন। মানি। কিন্তু, প্রত্যেক আর্ট্ বস্তুর সময় যখন organic, অর্থাৎ অভিজ্ঞতাসাপেক্ষ, তখন একই নিয়মে সব আর্টের অনিবার্য সমাপ্তি স্থিরীকৃত হবে কী করে? সাহিত্যই ধরা যাক— রামায়ণ ও রঘুবংশের সমাপ্তি কি এক নিয়ম মানে? Henry IV আর Macbeth-এর চাল কি এক কদমে? Bernard Shaw ও তাঁর দেশবাসী

Sean O'Caseyর নাটক কি একই হারে একই স্থানে থামে? Brothers Karamazov একটি শ্রেষ্ঠ উপন্যাস, Fathers and Childrenও তাই। প্রথমটিতে এক দিনের ঘটনাই ৪০০।৫০০ পৃষ্ঠা জুড়ে বসে আছে, তার পর গল্প দ্রুত চলল, শেষ বেশও ঠিক নেই ; দ্বিতীয়টিতে একটি চমৎকার ছেদ রয়েছে। আজকালের নভেলিস্ট (Preistley নয়) Proust ও Joyceকে আপনার ভালো লাগে কি না জানি না— কিন্তু, তাঁদের লেখার সীমা কোথায়? দুজনের নভেলকে সংগীতের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে— যেন counterpoint-এর খেলা। উপমাটা উপযুক্ত ; দুজনেই stream of consciousness নিয়ে ব্যস্ত, দুজনেরই কারবার স্মৃতির উদ্‌ঘাটনপ্রক্রিয়া— কেউ exhibit করছেন না, revealই করছেন। আপনারই 'গোরা' ও 'চার অধ্যায়' ধরুন। শেষেরটায় লয় ধুনে, যেন hectic hurryতে, যেটি তার বিষয়বস্তুর নিতান্ত ও অত্যন্ত উপযোগী। কিন্তু 'গোরা'র চাল কি ভারী নয়? যেন গজগামিনী। আমাকে ভুল বুঝবেন না, আমি ভালো মন্দ বিচার করছি না— দেবী অশ্বেই আসুন, নৌকাতেই আর গজেই আসুন, দেবী হলে পুজো করব— তাতে কোনো ত্রুটি পাবেন না। আমি বলছি— এক সাহিত্যেই অনিবার্য সমাপ্তির সীমানা, রীতিনীতি, ভিন্ন ভিন্ন। 'চার অধ্যায়' বাঁশি বাজিয়ে শেষ করলেন, আর 'গোরা' লিখতে দু ভলুম লাগল— কেন? 'চার অধ্যায়' পাঁচ অধ্যায় হয় না যেমন, 'গোরা'ও তেমনি চার অধ্যায়ে শেষ হয় না।

ছবি ধরুন— একখানা রাসলীলার ছবি আছে, রাজপুত কলমের। মধ্যে কৃষ্ণ-রাধা, চার ধারে গোপিনীর দল। যদি গোনা যায় তা হলে এক মুখ দেখে দেখে দর্শকের চোখে ও মনে সহজেই ক্লান্তি আসতে পারে। কিন্তু ছবিটার ধর্মই ভিন্ন, কৃষ্ণরাধা যুগ্ম-সমাহিত, এই বিভোর ভাবটি সংখ্যার পারিপার্শ্বিকে ফুটে উঠেছে ভালো। ছক হল ডিমের আকারের— যার রেখা ধরে দেখলে চোখ পিছলে যায়, কারুর মুখ দেখবার জন্য দাঁড়ায় না, সোজাসুজি কেন্দ্রস্থ নায়ক-নায়িকায় অবস্থিত হয়। এখানে সংখ্যার উদ্দেশ্য ঐশ্বর্য দেখানো নয়, মধ্যকার চরিত্রকে অবকাশ দেওয়া। অবকাশ দেওয়া যায় ফাঁক রেখে, যেমন জাপানি চিত্রকর করেন ; আবার অবকাশ দেখানো চলে সংখ্যারও সাহায্যে, যেমন টিন্‌টরেটো একাধিক ছবিতে করেছেন। এখানে সংখ্যার মূল্য বহু নয়, statistical unity মাত্র। ব্যক্তিগত চরিত্রের অভাবে মধ্যস্থ রূপ বিকশিত করবার জন্য সংখ্যা তখন মুক্ত আকাশের সামিল। সংখ্যাও একপ্রকার relief। grouping-এর সাহায্যেও এ কাজ সম্পন্ন হতে পারে। বলা বাহুল্য ছবির সঙ্গে গানের তুলনা করছি না, আমি কেবল রূপের সঙ্গে সংখ্যার ও সীমানার উদ্দেশ্য-অনুযায়ী পার্থক্য প্রতিপন্ন করছি। মোদ্দা কথা— শেষ হবার অনিবার্যতা উদ্দেশ্যমূলক। আলাপের উদ্দেশ্যই যখন আলাদা (উদ্দেশ্য অর্থে ধৃতি বলছি) তখন বন্দেশী আর্টের অনিবার্যতার নিয়মাবলী কি এখানে প্রযোজ্য? তাই ব'লে নির্বাচনের দায়িত্ব নেই এ কথা বলব না। পূর্বেই লিখেছি আমি dialectic process মানি। লেনিন এরই একটা নতুন তত্ত্ব আবিষ্কার করেছেন (সংগীতে লেনিন! কেন নয়? তিনিও দার্শনিক ছিলেন ; তিনিও দর্শন বলতে making history বুঝতেন, interpreting it নয় ; তাঁরও মন গতিশীল ছিল)— তত্ত্বটি হল এই যে, quantity থেকেই qualityর পরিবর্তন হয়। বাস্তবিক পক্ষে, সংখ্যা আর গুণের মধ্যে বেশি ফারাক নেই। এই সম্পর্কে আপনার বন্ধু Otto Kahn-এর একটি গল্প মনে পড়ল।

একবার Cecil de Mille, Otto Kahnকে তাঁর আঁকা ছবি The King of Kings দেখাতে নিয়ে যান। কথোপকথনটি Beverley Nichols লিপিবদ্ধ করেছেন।

de Mille : এই দৃশ্যটিতে কত জন লোক আছে ভাবেন?

Kahn : ধারণাই নেই।

M : আড়াই হাজার ভাবছেন কি!

K : কিছুই নয়।

M : আপনি highbrow।

K : Velasquez-এর Conquest of Breda দেখেছেন? দেখলে মনে হবে পিছনে লাঠি সড়কির বন গজিয়েছে। যদি গোনেন, তবে টের পাবেন যে মোটে আঠারোটি।... Velasquez was an artist.

গল্পটি আমার বিপক্ষে যাচ্ছে না। এই ছবিটারই একটি চমৎকার বিশ্লেষণ পড়েছিলাম, বোধ হয় Harold Speed-এর লেখায়। বইটাতে ঐ ছবিটার রেখা-রচনাও দেওয়া আছে। দেখে ও পড়ে বুঝেছিলাম যে সম্মুখের তেরছা রচনার relief দেবার জন্য ঐ সরল সমান্তরাল রেখার বাহুল্য। এখানেও সংখ্যা, আবার de Mille-এর ছবিতে সংখ্যা। প্রথমটিতে সংখ্যা গুণ হয়ে উঠেছে ; দ্বিতীয়টিতে হয়েছে ভার, ক্রুশেরও অধিক। অতএব সংখ্যার নিজের কোনো দোষগুণ নেই, বেশি হলেই থামবার তাগিদ নেই। এ-সব ক্ষেত্রে অনিবার্যতা উদ্দেশ্য বিষয়বস্তু এবং রীতির ওপর নির্ভর করছে। এখানে সীমা-নির্ধারণের কোনো natural law নেই, আমি কোনো natural lawই মানি না।

একটি অনুরোধ ক'রে চিঠি শেষ করি। যে ভালো শাড়ি ও গহনা পরতে জানে তাকে একই সময় একের বেশি দুটি পরতে হয় না। কিন্তু, রোজ রোজ একই শাড়ি গহনা পরলে সেই সুন্দরীকে কি ভালো দেখায়? সুন্দরীরা কিন্তু অন্য কথা বলেন। আপনি যতই সৌন্দর্যের connoisseur হন-না কেন, নারীর সাজসজ্জা সম্বন্ধে নারীদের মতই শিরোধার্য। সে যাই হোক, আপনার অভিমতটি ছাপিয়ে দেব? অনেকেরই কৃতজ্ঞতা অর্জন করবেন, কেবল Bengal Stores-এর ছাড়া।

অনেক কিছু লিখলাম। পত্রটি সংগীতের আলাপের মতোই ধরে নেবেন। গান গাইতে জানি না, জানলে চিঠিটাও হয়তো ছোটো হত।

পত্রের উত্তর চাই। অনেক মিল আছে বলেই গরমিলটা সাহসী হয়ে প্রকাশ করলাম। আমি তর্ক করি নি, আপনাকে হারাতেও চেষ্টা করি নি। আপনার কথাবার্তায় ও চিঠিতে যে নতুন আভাস পেয়েছি তারই ফলে আমার চিন্তাধারা খুলে গিয়েছে। সে ধারা আপনার সৃষ্টি হলেও তার দিক্‌নির্ণয় ও বহতার ওপর আপনার কোনো হাত নেই। ওটুকু আমার দোষ।
২৫শে মার্চ ১৯৩৫

প্রণত
ধূর্জটি

কল্যাণীয়েষু

অর্জুন পিতামহ ভীষ্মের প্রতি মনের মধ্যে সম্পূর্ণ শ্রদ্ধা রেখে দরদ রেখে শরসন্ধান করেছিলেন। তুমিও আমার মতের বিরুদ্ধে যুক্তি প্রয়োগ করেছ সৌজন্য রেখে। তাই হার মানতে মনে আপত্তি থাকে না। কিন্তু, আমাদের মধ্যে যে বাদ-প্রতিবাদ চলছে তৎপ্রসঙ্গে হার-জিত শব্দটা ব্যবহার অসংগত হবে। বলা যাক আলোচনা। উপসংহারে তোমার মত তোমারই থাকবে,

আমারও থাকবে আমারই। তাতে কিছু আসে যায় না, কেননা সংগীতটা সৃষ্টির ক্ষেত্র। যারা সৃষ্টি করবে তারা নিজের পন্থা নিজেই বেছে নেবে— পুরানো নতুনের সমন্বয় তাদের কাজের দ্বারাই, বাঁধা মতের দ্বারা নয়।

তুমি বলছ ভারতের ধ্রুপদী সংগীত সম্বন্ধে তোমার প্রধান মন্তব্য আলাপ নিয়ে। ও সম্বন্ধে কিছু বলা কঠিন। আলাপের উপাদান-রূপে আছে বিশেষ রাগরাগিণী, সেগুলি গানের সীমার দ্বারা পূর্ব হতেই কোনো রচয়িতার হাতে নির্দিষ্ট রূপ পায় নি। আলাপে গায়ক আপন শক্তি ও রুচি অনুসারে তাদের রূপ দিতে দিতে চলেন। এ স্থলে অত্যন্ত সহজ কথাটা এই : যিনি পারলেন রূপ দিতে তাঁকে আর্টিস্ট হিসাবে বলব ধন্য ; যিনি পারলেন না, কেবল উপাদানটাকে নিয়ে তুলো ধুনতে লাগলেন, তাঁকে গীতবিদ্যাবিশারদ বলতে পারি, কিন্তু আর্টিস্ট বলতে পারি নে— অর্থাৎ তাঁকে ওস্তাদ বলতে পারি, কিন্তু কালোয়াত বলতে পারব না। কালোয়াত, অর্থাৎ কলাবৎ। কলা শব্দের মধ্যেই আছে সীমাবদ্ধতার তত্ত্ব— সেই সীমা, যেটা রূপেরই সীমা। সেই সীমা রূপের আপন আন্তরিক তাগিদেই অপরিহার্য। প্রদর্শনীতে সীমা অপরিহার্য নয়, সেটা কেবলমাত্র বাহিরের স্থানাভাব বা সময়াভাব বশতই ঘটে। আলাপ যদি রাগিণীর প্রদর্শনীর দায়িত্ব নেয় তা হলে সেই দিক থেকে বিচার করে তাকে প্রশংসা করাও চলে। যে দুর্বলাত্মা পাণ্ডিত্যের ভারে অভিভূত হয় সে প্রশংসা করেও থাকে ; সে লুব্ধমুগ্ধভাবে মনে করে অনেক পাওয়া গেল। কিন্তু 'অনেক'-নামক ওজনওয়ালা পদার্থই কলাবিভাগের উপদ্রব, যথার্থ কলাবৎ তাকে তার মোটা অঙ্কের মূল্য সত্ত্বেও তুচ্ছ করেন। অতএব, আলাপের কথা যদি বলো তবে আমি বলব আলাপের পদ্ধতি নিয়ে কেউ-বা রূপ সৃষ্টি করতেও পারেন, কিন্তু রূপের পঞ্চত্বসাধন করাই অধিকাংশ বলবানের অভ্যাসগত। কারণ, জগতে কলাবৎ 'কোটিকে গুটিক মেলে', বলবতের প্রাদুর্ভাব অপরিমিত। বহুসংখ্যক ফুল নিয়ে তোড়া বাঁধাও যায় আর তা নিয়ে দশ-পনেরোটা ঝুড়ি বোঝাই করাও চলে। তোড়া বাঁধতে গেলে তার সাজাই বাছাই আছে, বাদ দিতে হয় তার বিস্তর। তোড়ার খাতিরে ফুল বাদ দিতে গেলে যারা হাঁ-হাঁ করে ওঠে, ভগবানের কাছে তাদের পরিত্রাণ প্রার্থনা করি। অতএব, আলাপের দরাজ পথ বেয়ে কোন্ গায়ক সংগীতের প্রতি কী রকম ব্যবহার করলেন সেই ব্যক্তিগত দৃষ্টান্ত নিয়েই বিচার চলে। আলাপ সম্বন্ধে আর্টের আদর্শে বিচার করা কঠিন। তার কারণ, দৌড়তে দৌড়তে বিচার করতে হয় ; ক্ষণে ক্ষণে তাতে যে রস পাওয়া যায় সেইটে নিয়ে তারিফ করা চলে, কিন্তু সমগ্রকে সুনির্দিষ্ট করে দেখব কী উপায়ে! তানসেনের গান হোক বা গোপাল নায়কেরই হোক, তারা তো নিরন্তর-বিস্ফারিত মেঘের আড়ম্বর নয় ; রূপবান, তাদেরকে চার দিক থেকে দেখা যায়, বার বার বাজিয়ে নেওয়া যায়, নানা গায়কের কণ্ঠে তাদের অনিবার্য বৈচিত্র্য ঘটলেও তাদের যে মূল ঐক্য, যেটা কলার রূপ এবং কলার প্রাণ, মোটের উপরে সেটা থাকে মাথা তুলে। আলাপে সে সুবিধা পাই নে ব'লে তার সম্বন্ধে বিচার অত্যন্ত বেশি ব্যক্তিগত হতে বাধ্য। যদি কোনো নালিশ ওঠে তবে সাক্ষীকে পাবার জো নেই।

আয়তনের বৃহত্ত্ব যে দোষের নয় এ সম্বন্ধে তুমি কিছু কিছু দৃষ্টান্ত দিয়েছ। না দিলেও চলত, কারণ আর্টে আয়তনটা গৌণ। রূপ বড়ো আয়তনেরও হতে পারে, ছোটো আয়তনেরও হতে পারে, এবং অরূপ বা বিরূপ ছোটোর মধ্যেও থাকে বড়োর মধ্যেও। বেটোভেনের 'সোনাটা' যথেষ্ট বহরওয়ালা জিনিস ; কিন্তু বহরের কথাটাই যার সর্বোপরি মনে পড়ে, জীবে দয়ার খাতিরেই সভা থেকে তাকে যত্নসহকারে দূরে সরিয়ে রাখাই শ্রেয়। মহাভারতের উল্লেখ করতে পারতে— আমাদের দেশে ওকে ইতিহাস বলে, মহাকাব্য বলে না। ও একটি সাহিত্যিক galaxy।

সাহিত্যবিশ্বে অতুলনীয়— ওর মধ্যে বিস্তর তারা আছে, তারা পরস্পর সুগ্রথিত নয়— অতি বৃহৎ নেব্যুলার জালে জালে তারা বাঁধা, আর্টের ঐক্যে নয়! এইজন্যই রামায়ণ হল মহাকাব্য, মহাভারতকে কোনো আলংকারিক মহাকাব্য বলে না। আলাপ যদি স্বতই সংগীতের মহাকাব্য হয় তো হল, নইলে হল না।

আমার সঙ্গে যাদের মতের বা ভাবের মিল নেই তারা সেই অনৈক্যকে আমার অপরাধ বলে গণ্য করে, তাদের দণ্ডবিধি আমার সম্বন্ধে নির্মম। তাদের নিজের বুদ্ধি ও রুচিকেই তারা বুদ্ধিমত্তার যদি একমাত্র আদর্শ মনে করে তাতে ক্ষতি হয় না, কিন্তু সেটাকেই তারা যদি ন্যায় অন্যায়ের শাশ্বত আদর্শ মনে ক'রে দণ্ডবিধি বেঁধে দেয় তবে ভারতের ভাবী শাসনতন্ত্র তাদের আয়ত্তগত হলে এ দেশে আমার দানাপানি চলবে না। আমার বিচারকদের এই কঠোরতাই আমার চিরাভ্যস্ত, সেই কারণে তোমার ভাবাগত অনুকম্পায় আমি বিস্মিত। ভয় হয় পাছে এটা টেকসই না হয়— অন্তত আমি যে ক'দিন টিঁকি ততদিনের জন্যও, আশা করি, মতের অনৈক্য সত্ত্বেও আমার মান বাঁচিয়ে চলবে।   ইতি ৯ই এপ্রেল ১৯৩৫

তোমাদের
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পুঃ— তুমি যে চিঠিখানা লিখেছিলে তার মধ্যে অসংলগ্নতা কিছু দেখি নি। বস্তুত প্রথম পড়েই মনে করেছিলুম বলি 'মেনে নিলুম'। আমি অত্যন্ত কুঁড়ে, পরিশ্রম বাঁচাবার জন্যে প্রথমটা ইচ্ছে করে সম্মতি দিয়ে নীরবে আরাম-কেদারা আশ্রয় করি, পরক্ষণেই সাহিত্যিক শ্রেয়োবুদ্ধি ওঠে প্রবল হয়ে। হাঁ না করতে করতে অবশেষে হঠাৎ নিজেকে ঝাঁকানি দিয়ে বলি, 'উচিত কথা বলতে ছাড়ব না।' উচিত কথা বলবার দুষ্প্রবৃত্তি মানুষের মস্ত একটা ব্যসন, উনিই হচ্ছেন যত-সব অনুচিত কথার পিতামহী।

ওঁ

জোড়াসাঁকো

কল্যাণীয়েষু

কাল সন্ধ্যাবেলায় ঘুরে ফিরে আবার সেই কথাটাই উঠে পড়ল— 'ভালো তো লাগে'। সংগীতের কোনো-একটা বিশেষ বিকাশ সংযত সংহত সুসংলগ্ন সুপরিমিত মূর্তি নাও যদি নেয়, তার মধ্যে বারে বারে পুনরাবৃত্তি ও সুদীর্ঘকাল ধরে তানকর্তবের বাধাহীন আন্দোলন যদি দৈহিক ক্লান্তি ও অবকাশের সসীমতা ছাড়া থামবার অন্য কোনো হেতু নাও পায়, তবুও তো দেখছি ভালো লাগে। ভালো লাগবার কারণ হচ্ছে এই যে সংগীতের উপকরণের মধ্যে ইন্দ্রিয়তৃপ্তিকর গুণ আছে— তার ফলে, সুসম্পূর্ণ কলারূপ গ্রহণ না করলেও সে আদর পেতে পারে। মাটির পিণ্ড যতক্ষণ না ঘট আকারে সুপরিণত হয় ততক্ষণ সে মাটি। বিশেষভাবে কলাসাধনার গুণেই সে মহার্ঘ হয়। সোনার উজ্জ্বলতা প্রথম থেকেই চোখ জিতে নেয়। তার আপন বর্ণগুণেই সে পেয়েছে আভিজাত্য। অতএব তাল তাল সোনা যদি স্তূপাকার করা যায় তবে সে অভিভূত করবে মনকে।

তখন লুব্ধ মন বলতে চায়, না আর বেশি কাজ নেই। অথচ 'আর বেশি কাজ নেই' কথাটাই আর্টের অন্তরের কথা। আর্টের খাতিরেই যথাস্থানে বলা চাই : ব্যস্, চুপ, আর এক বর্ণও না। সংস্কৃত সাহিত্যে সংস্কৃত ভাষার একটি প্রধান সম্পদ ধ্বনিগৌরব। সেই কারণে কোনো কৌশলী লেখক যদি পাঠকের কান অভিভূত ক'রে ধ্বনিমন্দ্রিত শব্দ বিস্তার ক'রে চলে, তবে অনেক ক্ষেত্রে তার অপরিমিতি নিয়ে পাঠক নালিশ উপস্থিত করে না। তার একটা দৃষ্টান্ত কাদম্বরী। শূদ্রক রাজার অত্যুক্তিবহুল বর্ণনা চলল তিন-চার পাতা জুড়ে ; লেখকের কলমটা হাঁপিয়ে উঠে থামল, বস্তুত থামবার কোনো কলাগত কারণ ছিল না। এ কথা ব'লে কোনো ফল হয় না যে এতে সমগ্র গল্পের পরিমাণ-সামঞ্জস্য নষ্ট হচ্ছে। কেননা, পাঠক থেকে থেকে বলে উঠছে, 'বাহবা, বেশ লাগছে।' বেশ লাগছে ব'লেই বিপদ ঘটল, তাই বাণীর প্রগল্ভতায় বীণাপাণি হার মেনে চুপ করে গেলেন। তার পরে এল ব্যাধের মেয়ে, শুকপাখির খাঁচা হাতে নিয়ে। বন্যা বইল বর্ণনার, তটের রেখা লুপ্ত হয়ে গেল, পাঠক বললে 'বেশ লাগছে'। এই বেশ লাগা পরিমাণ মানে না। এমন স্থলে রচনার সমগ্রতাটা বাহন হয়ে দাসত্ব করে তার উপকরণের, সে আপন পূর্ণতার মাহাত্ম্যকে অকাতরে চাপা পড়তে দেয় আপন স্তূপাকার দ্রব্যসম্ভারের তলায়। সংস্কৃত সাহিত্যে কাদম্বরীর ছাঁদে গল্পরচনা আর দুটি-একটি মাত্র দৃষ্টান্ত লাভ করেছে ; ও আর চলল না। যেমন একদা মেগাথেরিয়ম ডাইনসর প্রভৃতি অতিকায় জন্তু আপন অসংগত অতিকৃতির বোঝা অধিক দিন বইতে পারল না, গেল লুপ্ত হয়ে, এও তেমনি। সংস্কৃত সাহিত্য-অভিমানী কোনো দুঃসাহসিক আজ কাদম্বরীর অনুসরণে বাংলায় গল্প লেখবার চেষ্টা করবেই না— তার কারণ, ওর মধ্যে শিল্পের সদাচার নেই। কিন্তু আমাদের সংগীতে আজও কাদম্বরীর পালা চলছে। আধুনিক বাংলা সাহিত্য বিশ্বসাহিত্যের সংস্রবে এসেছে ; তাই আমাদের এমন একটা অভ্যাস দাঁড়িয়ে গেছে যে, এই সাহিত্যে কলাতত্ত্বের মূলগত ব্যতিক্রম ঘটা অসম্ভব। কিন্তু, হিন্দুস্থানী গান ব্যবসায়ী গায়কদের গতানুগতিক রবার-নির্মিত ঝুলির মধ্যে রয়ে গেছে। বিশ্বজনীন আদর্শের সঙ্গে তার পার্থক্য ঘটলেও মন ও কানের অভ্যাসে বিরোধ ঘটবার সুযোগ হয় না। আজকালকার দিনে যাঁদের শিক্ষা ও রুচি বিশ্বচিত্তের মধ্যে প্রবেশাধিকার পেয়েছে তাঁরা যখন স্বাধীন মন নিয়ে বহুল সংখ্যায় গানের চর্চায় প্রবৃত্ত হবেন, তখন সংগীতে কলার সম্মান পাণ্ডিত্যের দম্ভ ছাড়িয়ে যাবে। তখন কোন্ ভালো লাগা যথার্থ আর্টের এলাকার, অন্তত সমজদারের কাছে তা স্পষ্ট হতে পারবে। ইতি ১৫ই মে ১৯৩৫

তোমাদের
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পরমপূজনীয়েষু

আপনার শেষ পত্রের উত্তরে আমি বলতে চাই যে, কোনো গায়ক, কোনো আলাপিয়াও, রূপসৃষ্টির দায়িত্ব থেকে মুক্ত নয়। এ কথা আমি সর্বান্তঃকরণে স্বীকার করি। কিন্তু দুটি সন্দেহ রয়ে গেল।

প্রথমত মানছি যে, ছোটোর মধ্যে রূপ ফুটতে পারে, বড়োর মধ্যেও। কিন্তু great music কিংবা great poetry কি ভিন্ন শ্রেণীর নয়? ঐশ্বর্য দেখানোটা বর্বরতা নিশ্চয়ই, কিন্তু চারপদী দরবারী কানাড়ার তানসেনী ধ্রুপদ ও খাম্বাজের ঠুংরির মধ্যে পার্থক্য আছেই। যদি কোনো উৎকৃষ্ট

গায়ক, অর্থাৎ আর্টিস্ট, সেই দরবারী কানাড়ার ধ্রুপদকে বাহুল্যবর্জিত করে আপনাকে শোনান, তবে সেই গায়নের অপেক্ষাকৃত বৃহৎ আয়তনের জন্যই কি ঐ গানের ইঙ্গিত-আভাস স্থূল হয়ে উঠবে? আমার বক্তব্য— great হলেই তাকে ভোঁতা হতে হবে এমন কোনো কথা নেই, যেমন ছোটো হলেই ইঙ্গিতমুখর হতে হবে এমন কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। বৃহতের মধ্যেও সূক্ষ্ম আভাস রয়েছে দেখেছি, যেমন জৌনপুরের মসজিদে। greatness-এর সংজ্ঞা দিতে পারছি না. সেটা শুদ্ধ নয়, খাদ-যুক্ত, তার সঙ্গে সংখ্যার ও আখ্যানবস্তুর আয়তনের সম্বন্ধ আছেই আছে— অন্তত পটভূমিতে তো রয়েইছে। আমাদের অলংকারশাস্ত্রে প্রাচুর্যকে প্রতিভার একটি নিদর্শন বলা হয়েছে।

একটা নতুন কথা তুলছি। এই অর্থে নতুন যে, পূর্বে আমি সেটা নিয়ে আপনার সঙ্গে আলোচনা করি নি। ধরুন, আমি যদি বলি আমার দু ঘণ্টা ধরে ছায়ানটের কি পূরিয়ার আলাপ শুনতে ভালোই লাগে। নাহয় নাই হল কলা, হলই বা আমার ওস্তাদী বুদ্ধি? আমি জানি আমার কান অশিক্ষিত নয়, আমার কানে শ্রুতির তারতম্য পর্যন্ত সুস্পষ্ট। এই কানে যেটা ভালো লাগে সেইটাই হবে আর্ট। দাম্ভিকতা দেখাচ্ছি না— সকলেই এই ভাবে, আমি কেবল খোলাখুলি লিখলাম। আমি জানি আপনারও ভালো লাগে সুরের বিকাশ। মার্জিত শ্রবণেন্দ্রিয়ের ভালো লাগা না-লাগাই হবে বিচারের কষ্টিপাথর— নয় কি? এই ব্যক্তিগত রুচিকে বাদ দিলে সংগীতের ভবিষ্যৎ-নিরূপণের অন্য কী ব্যক্তিসম্পর্কহীন পথনির্দেশক চিহ্ন থাকতে পারে? এই রূপসৃষ্টিটাই আমাদের সংগীতের একমাত্র ভবিষ্যৎ— আপনি কী হিসেবে বলতে পারেন?

ভালো লাগা না-লাগাকে বাদ দিতে পারি না— তাকে আপনি লোভই বলুন আর আমি নিজে তাকে বর্বরতাই বলি-না কেন। সংগীতের ভবিষ্যৎ কি স্থাপত্যে? একটা কথা আছে : architecture is frozen music। সংগীতের প্রাণ হল গতি, বরফ নিতান্তই স্থাণু।

প্রণত
ধূর্জটি

কল্যাণীয়েষু

ভালো লাগা এবং না-লাগা নিয়ে বিরোধ অন্য সকল রকম বিরোধের চেয়ে দুঃসহ। অর্থনীতি বা সমাজনীতি সম্বন্ধে তুমি যে রকম করে যা বোঝো আমি যদি সে রকম করে তা না বুঝি তা হলে তোমার সঙ্গে আমার দ্বন্দ্ব নিশ্চয় বাধতে পারে, কিন্তু সেইটে বাইরের দরজায় দাঁড়িয়ে। তখন পরস্পর পরস্পরকে মূর্খ ব'লে নির্বোধ ব'লে গাল দিতে পারি। সেটা শ্রুতিমধুর নয় বটে, কিন্তু মূর্খতা নির্বুদ্ধিতার একটা বাহ্য পরিমাপক পাওয়া যায়, যুক্তিশাস্ত্রের বাটখারা-যোগে তার ওজনের প্রমাণ দেওয়া চলে। কিন্তু যখন পরস্পরকে বলা যায় অরসিক, তখন তর্কে কুলোয় না। পৌঁছয় লাঠালাঠিতে। যেহেতু রস জিনিসটা অপ্রমেয়। বুদ্ধিগত বোঝাবুঝির তফাত নিয়ে ঘর করা চলে সংসারে তার প্রমাণ আছে, কিন্তু আমার ভালো লাগে অথচ তোমার লাগে না এইটে নিয়েই ঘর ভাঙবার কথা। অতএব সংগীত সম্বন্ধে উক্ত সাংঘাতিক বিপদ্‌জনক কথাটার নিষ্পত্তি করে নেওয়া যাক। তোমাতে আমাতে ভেদ পার হবার একটা সেতু আছে— সে হচ্ছে তোমার সঙ্গে আমার ভালো লাগার অমিল নেই। কিন্তু তৎসত্ত্বেও নালিশ রয়ে গেছে। সংস্কৃত সাহিত্যে কাদম্বরী আমার অত্যন্ত প্রিয় জিনিস— ওর বহুল নৈহারিকতার মধ্যে মধ্যে রসের জ্যোতিষ্ক নিবিড় হয়ে

ফুটে উঠেছে। মনে আছে বহুকাল পূর্বে একদা আমার শ্রোত্রী সখীদের পড়ে শুনিয়েছি এবং থেকে থেকে চমকে উঠেছি আনন্দে। সেইজন্যই আমার বড়ো দুঃখের নালিশ এই যে, এর মধ্যে আর্টের সংহতি রইল না কেন? মুক্তোগুলো মেজের উপর ছড়িয়ে যায়, গড়িয়ে যায়, ওদের মূল্য উপেক্ষা করতে পারি নে ব'লেই বলি—সাতনলী হারে গাঁথা হল না কেন! তা হলে বুকে দুলিয়ে, মুকুটে জড়িয়ে, সম্পূর্ণ আনন্দ পাওয়া যেত। রাগিণীর আলাপে থেকে থেকে রূপের বিকাশ দেখা যায়; মন বলে একটি অখণ্ড সৃষ্টির জগতেই এদের চরম গতি; এদের সম্মান করি ব'লেই এদের রাস্তায় দাঁড় করাতে চাই নে, উপযুক্ত সিংহাসনে বসালেই এদের মহিমা সম্পূর্ণ হত। সেই সিংহাসন চৌমাথাওয়ালা সদর রাস্তার চেয়ে সংহত, সংযত, পরিমিত, কিন্তু গৌরবে তার চেয়ে শ্রেষ্ঠ।

বড়ো আয়তনের সংগীতকে আমি নিন্দা করি এমন ভুল কোরো না। আয়তন যতই আয়ত হোক, তবু আর্টের অন্তর্নিহিত মাত্রার শাসনে তাকে সংযত হতে হবে, তবেই সে সৃষ্টির কোঠায় উঠবে। আমরা বাল্যকালে ধ্রুপদ গান শুনতে অভ্যস্ত, তার আভিজাত্য বৃহৎ সীমার মধ্যে আপন মর্যাদা রক্ষা করে। এই ধ্রুপদ গানে আমরা দুটো জিনিস পেয়েছি— এক দিকে তার বিপুলতা গভীরতা, আর-এক দিকে তার আত্মদমন, সুসংগতির মধ্যে আপন ওজন রক্ষা করা। এই ধ্রুপদের সৃষ্টি আগেকার চেয়ে আরো বিস্তীর্ণ হোক, আরো বহুকক্ষবিশিষ্ট হোক, তার ভিত্তিসীমার মধ্যে বহু চিত্রবৈচিত্র্য ঘটুক, তা হলে সংগীতে আমাদের প্রতিভা বিশ্ববিজয়ী হবে। কীর্তনে গরান্‌হাটি অঙ্গের যে সংগীত আছে আমার বিশ্বাস তার মধ্যে গানের সেই আত্মসংযত ঔদার্য প্রকাশ পেয়েছে।

এইখানে একটা কথা বলা কর্তব্য— গান-রচনায় আমি নিজে কী করেছি, কোন্‌ পথে গেছি, গানের তত্ত্ববিচারে তার দৃষ্টান্ত ব্যবহার করা অনাবশ্যক। আমার চিত্তক্ষেত্রে বসন্তের হাওয়ায় শ্রাবণের জলধারায় মেঠো ফুল ফোটে, বড়ো-বড়ো-বাগান-ওয়ালাদের কীর্তির সঙ্গে তার তুলনা কোরো না। ইতি ১৬ই মে ১৯৩৫

তোমাদের
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পরমপূজনীয়েষু

সেনেট হাউসের উৎসব-উপলক্ষে আপনি যে বক্তৃতা করেছিলেন তাতে বাংলার বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ ছিল। গায়কের কণ্ঠে সংযম এবং রচনাপদ্ধতিতে সুসংগতির একটা প্রয়োজন আছে বলতে গিয়ে আপনি ঐ বৈশিষ্ট্যের অবতারণা করেন। এতদিন ধরে আমাদের মধ্যে যে পত্রবিনিময় হল তাতে সংযমের প্রয়োজনটাই প্রমাণিত হচ্ছে। এই সংযমের সঙ্গে বাংলা দেশের সংস্কৃতির সম্পর্ক কী?

আপনার মুখেই অনেক কথা শুনেছি, তাই আপনার উত্তরের প্রতীক্ষায় বসে থাকব না। কোনো দেশ কিংবা জাতির বৈশিষ্ট্য প্রতিপন্ন করতে আমার সাহস হয় না। একদল ঐতিহাসিক (তাঁরা আবার জার্মান) বলছেন— সেজন্য চাই দিব্যানুভূতি। ও বালাই আমার নেই। অতি-আধুনিক হয়ে হয়তো সমগ্রকে দেখবার ক্ষমতা আমার লোপ পেয়েছে। আপনার সে শক্তি আছে এবং আপনার অভিজ্ঞতা আরো গভীর ও ব্যাপক। আপনার শিক্ষাদীক্ষাও ভিন্ন, তাই আপনার মন্তব্য শুনতে ব্যগ্র।

আমার নিজের প্রথম প্রশ্ন হল এই : বৈশিষ্ট্য কিছু আছে কি না? বিশেষ বলতে আমি ব্যক্তির অতিরিক্তকে বিশ্বাস করতে চাই না। এমন কোন্ বস্তু আছে যার কৃপাতেই আমরা বাঙালি, যার প্রকাশ কি উন্মেষই হল বাংলা-পরিশীলনের ইতিহাস? আমার বিশ্বাস : ঐ প্রকার বস্তুর অস্তিত্ব নেই, যেটি আছে সেটি কেবল মনঃকল্পিত সুবিধাবাচক ধরতাই বুলি, মন্ত্র মাত্র। মন্ত্রোচ্চারণে সোয়াস্তি আছে, যাঁরা করেন তাঁদের— বাকি সকলের নির্যাতন। যে-কোনো ধর্মের ইতিহাসে তার ভূরি ভূরি প্রমাণ আছে।

অর্থাৎ, আমি গণমন মানছি না। তাই ব'লে মহাজনতন্ত্রেও বিশ্বাসী হতে পারি না। স্বীকার করতে পারি না যে, বাংলার বৈশিষ্ট্য যদি থাকে তবে সেটি এক কিংবা একাধিক অ-সাধারণ ব্যক্তির কর্মে ও ব্যবহারেই নিবদ্ধ। 'and above all, he was a Bengali' হাসি পায় শুনতে ও পড়তে। যিনি যত বড়ো লোকই হোন্-না কেন, তিনি একাই আমাদের সকল সংস্কার তৈরি করেছেন কিংবা তিনিই সর্ববিধ সংস্কারের প্রতীক, প্রতিভূ, প্রতিনিধি— এ কথা বললে জাতিকে সমাজকে অপমান করা হয়। অপর পক্ষে, যে সাধারণ ব্যক্তি ভোট দিয়ে ও না দিয়েই নিজের অস্তিত্ব আবিষ্কার করে তার ব্যবহারই কি is equal to বাংলার বৈশিষ্ট্য? মহাজন ও লোকজন উভয়েরই দান আছে, কিন্তু জাতির সংস্কার উভয়ের সমষ্টি ভিন্ন আরো কিছু। এই অতিরিক্ত অশরীরী বস্তুর গুণাবলীকেই বৈশিষ্ট্য বলা হয়। তার আবার শক্তি আছে, সে শক্তি আবার মহাজন লোকজনের সব প্রয়াসকে এক ছাঁচে ঢালতে পারে— এবং ঢালাই উচিত! অথাতো ভূদেবচন্দ্রস্য সমাজতত্ত্বম্, চিত্তরঞ্জনদাশস্য সাহিত্যজিজ্ঞাসা, বিপিনচন্দ্রস্য ধর্মপরিচিতিঃ, লেনিন-হিট্‌লার-মুসোলিনীনাম্ শাসনতন্ত্রম্।

জাতিগত বৈশিষ্ট্য কিংবা মূলপ্রকৃতিকে কোনো বস্তুর, কোনো স্থাণুসত্তার, কোনো অচল সারপদার্থের প্রত্যয়ও যদি না ভাবি, তাকে যদি সামাজিক গতি ও বিবর্তনের বিবরণ হিসেবেই বুঝি, তাকে প'ড়ে পাওয়ার বদলে অর্জন করাই যদি মানুষের স্বভাবের দায়িত্ব হয়, তবে ব্যাপারটা অপেক্ষাকৃত সহজ হয় নিশ্চয়। কিন্তু অন্য দিক থেকে আবার ঘোরালো হয়ে ওঠে। ঐভাবে দেখলে কোনো পরিশীলনেরই নিজের রূপ থাকে না, থাকে নব্যসংস্কৃতিরচনার গুরুভার, আবার সে গুরুভার পড়ে গিয়ে যে ব্যক্তিপুরুষ হতে চায় তারই স্কন্ধে। সংস্কৃতির স্বাধীন নিঃসম্পৃক্ত সত্তা রইল কোথায়? কেবল কি তাই? সংস্কৃতিকে কেবল গতি কিংবা বিবর্তন ভাবলে তার বিবৃতি কিংবা ইতিহাস লেখা ছাড়া আর-কিছুই লেখা চলে না। অর্থাৎ, সে সম্বন্ধে কোনো সুধীজন-অনুমোদিত সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যায় না। আমারই ওপর যখন সংস্কৃতিকে গ্রহণ করবার ভার ও তাকে ভেঙে নতুন করে গড়বার দায়িত্ব পড়ল, তখন অন্যে সে ভার গ্রহণ করবে কেন? অন্যের ওপর চাপাতে আমি যাবই বা কেন? অতএব, তার সামাজিক শক্তি রইল না, এক কথায়, তার বৈশিষ্ট্য থাকল না, থাকল কেবল history of adaptation and adjustment, active or passive— নয় কি?

যদি কেউ ঐ বিবরণীতে কোনো রীতিনীতির আবিষ্কার করতে পারে তো বহুত আচ্ছা। সেটুকু তার কৃতিত্ব, সে তাই নিয়ে তার নিজের প্রভাব বিস্তার করুক। সে কাজে তার কেরামতি, তার বাহাদুরি। কিন্তু, আপনাকে নিশ্চয়ই মানতে হবে সে রীতি-নীতি কোনো সংস্কৃতিরই বৈশিষ্ট্য নয় ; আপনি বলতে পারেন না যে, সে রীতিনীতি সংস্কৃতির অন্তরাল থেকে গোপনে নিজের উদ্দেশ্যসাধন করে যাচ্ছে। উদ্দেশ্যটি আবার যা হচ্ছে তাই। তার বেশি জানবার কোনো উপায়

নেই। বলা বাহুল্য, সংস্কারকে অস্বীকার করবার স্পর্ধা আমার নেই। কিন্তু, সংস্কারও তো নির্বাচিত হতে হতে বর্তমানের আকার ধারণ করেছে?

এই হল আমার মূলে আপত্তি। বাংলা সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্যের অস্তিত্ব নিয়েই যদি কোনো ব্যক্তি সন্দিহান হয়, তবে সে ব্যক্তি তার দোহাই'এ মানবে না যে, ভবিষ্যতের বাংলা গান পুরাতন বাংলা গানের ধারাতেই চলবে। আপনি অবশ্য তা বলেন নি, বলেন না বলতে পারেন না ; কারণ এই— আপনার আপত্তি পুনরাবৃত্তিরই বিপক্ষে, হিন্দুস্থানী গানের পুনরাবৃত্তির বিপক্ষে নয়। কারণ, আপনার যুক্তি প্রাণধর্মের অনুযায়ী। কিন্তু, লোকে ভুল বোঝবার ও করবার সম্ভাবনা রয়েছে। তাকে গোড়া থেকেই হত্যা করা ভালো। গ্রাম্য সংগীতের পুনরুদ্ধার চলছে, ঠুংরী গজলের বিপক্ষে প্রতিক্রিয়ায় দেশে যা ছিল তাই ভালো ভাবতে লোকে শুরু করেছে— তাই আজ আপনার মন্তব্য পরিষ্কার করে গুছিয়ে বলার বড়োই দরকার। প্রদেশাত্মবোধের যুগ এসে গিয়েছে।

জাতিগত বৈশিষ্ট্য ও সংস্কৃতি তর্কের খাতিরে নাহয় মানলুম। কিন্তু, নতুন culture trait-কে নির্বাচন করে নিজের মতো রূপ দেবার জন্য তাকে অন্তত জীবন্ত হতে হবে। মারহাট্টা অঞ্চলে ষাট বৎসর পূর্বে উত্তরভারতীয় গায়কিপদ্ধতির চলন ছিল না, অথচ এখন সেই পদ্ধতির শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধিরা মারহাট্টি। মারহাট্টিরা উত্তরভারতের ঢঙ নিলে কেন— এবং মাদ্রাজিরা নিলে না কেন? কারণ এ নয়— রহমৎখাঁ বালাজীবোয়া বোম্বাই-পুনাতে থাকতেন। কারণ, মারহাট্টি-সংস্কৃতি হয় ছিল না, নাহয় গিয়েছিল শুকিয়ে, এবং মাদ্রাজের একটা-কিছু ছিল। মারহাট্টি গায়ক অবশ্য দক্ষিণী অলংকার হিন্দুস্থানী রাগিণীর গায়ে পরান, কিন্তু গায়কি উত্তরভারতীয়ই থাকে। মাদ্রাজি গায়ক অপেক্ষাকৃত বেশি রক্ষণশীল। বাঙালি গায়ককে কী বলবেন?

ধরাই যাক— বাংলা দেশে যাত্রাগানে, কবির গানে, তর্জায়, জারি-ভাটিয়াল কীর্তন আগমনীতে, বিদ্যাসুন্দর-যাত্রায় ও নিধুবাবুর টপ্পায় এবং রামপ্রসাদ প্রভৃতি ভক্তের গানে কথারই ছিল প্রাধান্য— সুরের সীমা ছিল সুনির্দিষ্ট, তানে ছিল সংযম। কিন্তু, সে ধারাও তো শুকিয়েছে? কেন তার বদলে সর্বত্র জগাখিচুড়ির পরিবেশন হচ্ছে? তাতে নেই কী? আপনার, অতুলপ্রসাদের, দ্বিজেন্দ্রলালের ভাত-ডাল-তরকারি সবই আছে— পেঁয়াজ রসুনও বাদ পড়ে নি। কেন এ কাণ্ড হল? অথচ আপনারাও যেমন বৈশিষ্ট্যের উত্তরাধিকারী, নব্যতন্ত্রের রচয়িতারাও তাই। তাঁদের নাহয় বাদ দিলাম— কিন্তু, পাঁচালির সঙ্গে যে শান্তিনিকেতনের গানের সম্বন্ধ নেই, যাত্রার জুড়ির গানের সঙ্গে যে দ্বিজেন্দ্রলালের কোরাসের কোনো আত্মীয়তা নেই, বিদ্যাসুন্দরী গানের সঙ্গে যে অতুলপ্রসাদের সংগীতের কোনো যোগসূত্র নেই— এটুকু আপনাকে মানতেই হবে। আজকালকার ট্রেড-ইউনিয়ন মধ্যযুগের গণ শ্রেণী পূগের বংশধর নয়।

তা হলে বুঝতে হবে বাংলার সংগীত-পরিশীলন ও অনুশীলনের ধারা ছিল একাধিক। অতএব, প্রশ্ন হল— বাংলার বৈশিষ্ট্য অর্থে কত দিনের কয় পুরুষের ঐতিহাসিক পলিমাটি বুঝব? ঊনবিংশ শতাব্দীর পূর্বে কী ছিল সঠিক জানি না, কিন্তু গীতগোবিন্দে পদাবলীতে বাঘা-বাঘা রাগরাগিণীর নাম বসানো আছে। ডা. প্রবোধ বাগচী বলেন— আরো আগে ছিল। হয়তো নামকরণ পরে হয়েছে। গায়নও জানা নেই। কিন্তু, বিষ্ণুপুর বেথিয়া ঢাকা অঞ্চলে মুসলমান ওস্তাদ অনেক দিন থেকেই রয়েছেন। ইংরেজ-নবাব জমিদার এবং নতুন শ্রেণীর বিত্তশালী মহাজনরাও হুঁকোর নল মুখে দিয়ে বাইজির গান শুনতেন। শ্রাদ্ধবাসরে কীর্তনীয়ার সঙ্গে বাইজিরও ডাক পড়ত। তার পর ওয়াজিদ আলি শাহের দরবারে তো সকলেই যেতেন। গোবরডাঙার গঙ্গানারায়ণ ভট্ট, হালিসহরের জামাই নবীনবাবু, পেনেটির মহেশবাবু, শ্রীরামপুরের মধুবাবু, বিষ্ণুপুরের যদুভট্ট,

কোলকাতার মুলোগোপাল প্রভৃতি ওস্তাদরা তো সকলেই হিন্দুস্থানী চালে গাইতেন। বড়ো বড়ো গ্রামের জমিদার-বাড়িতে হিন্দু-মুসলমান ওস্তাদ বরাবরই থাকত। পশ্চিমাঞ্চলের সব কালোয়াতই কোলকাতায় আসতেন। সেও আজ কত দিনের কথা। আপনিও সেই আবহাওয়ায় পুষ্ট। অতএব, হিন্দুস্থানী গায়কি-পদ্ধতির সঙ্গে আমাদের পরিচয় এক দিনের নয়, পুরাতন ও ঘনিষ্ঠ। অথচ, এই ধারার সঙ্গে বাংলা দেশের সংস্কৃতির যোগ নেই, যোগ রইল যাত্রাকীর্তন-ভাটিয়ালের সঙ্গে— এ কেমন করে হয় আমাকে বুঝিয়ে দিন। আমার মতে এই ধারাও বাংলা গানের বৈশিষ্ট্যের অন্য-একটি দিক।

সামাজিক নির্বাচনপ্রক্রিয়ার তথ্য কী, না জানলে বাংলা গানে ও বাঙালি গায়কের মুখের সংগীতে সংগতির বিধি নিয়ম আবিষ্কৃত হবে না। বাংলার বৈশিষ্ট্য কী আপনার কাছে শুনেছি, কিন্তু আজ আমাকে তার প্রক্রিয়ার বিবরণ শোনান। এ কাজ বাঙালি পারবে না, ও কাজ বাঙালি পারবে, কারণ, বাঙালির স্বভাবই তাই— যুক্তিটি বুদ্ধিস্পর্শী নয়, যদিও প্রাণস্পর্শী। আফিমে ঘুম আসে কেন? কারণ, আফিমে ঘুম আনবার শক্তি আছে... বাঙালির বাঙালিত্ব অনেকটা এই ধরনের।

আমার মত হল এই— সুরে সংগতি-রক্ষা ভদ্রমনেরই কাজ, জাতিগত বৈশিষ্ট্যের নয়, যে-কোনো দেশের ভদ্রলোকের কাছে আমি সংগীতকলা প্রত্যাশা করতে পারি। অবশ্য, ভদ্র এবং গানে শিক্ষিত। সুগায়ক হবার জন্য general culture-এরই নিতান্ত প্রয়োজন ; বাঙালি হবার, কেবলমাত্র বাংলার ঐতিহ্য বহন করবার প্রয়োজন নেই। ৪ঠা জুলাই ১৯৩৫

প্রণত
ধূর্জটি

ওঁ

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়েষু

লাঠিয়াল যখন প্রতিপক্ষের আক্রমণ সামলানো কঠিন বলে বোঝে তখন সে মাটিতে বসে পড়ে দেহ সংকোচ করে, অর্থাৎ আঘাতের লক্ষ্যক্ষেত্রকে যথাসাধ্য সংকীর্ণ করতে চায়। তোমার এবারকার প্রশ্নবর্ষণ সম্বন্ধে আমার মনের ভাবটা সেই ধরনের। সংক্ষেপে উত্তর দিলে বিপদকেও সংক্ষিপ্ত করা যায়। দেখি কৃতকার্য হতে পারি কি না। race অর্থাৎ গণজাতির অন্তর্নিহিত বৈশিষ্ট্য আছে কি না এইটি তোমার প্রথম প্রশ্ন। এ সম্বন্ধে চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত দিলে কথাটা পরিষ্কার হয়। আকৃতির সহজাত বৈশিষ্ট্য অস্বীকার করবার জো নেই। চৈনিকের চেহারার সঙ্গে নিগ্রোর চেহারার তফাত নিয়ে তর্ক চলে না। আকৃতির ভেদ প্রকৃতির ভেদের কোনো সূচনা করে না এ কথা শ্রদ্ধেয় নয়। কাঁঠালের সঙ্গে তুলনায় সব আমেই মূল রসবস্তুর ঐক্য মানতে হয়, কিন্তু ন্যাংড়া আম ও ফজলি আমের মধ্যে রস-বৈশিষ্ট্যের যে ভেদ আছে, আকৃতিতে তার ইশারা এবং প্রকৃতিতে তার প্রমাণ যথেষ্ট। আল্‌ফন্সোর কৌলীন্য বাইরের চেহারার থেকে শুরু করে ভিতরের আঁঠি পর্যন্ত গিয়ে ঠেকে। তার বহিরঙ্গ ও অন্তরঙ্গে পরিচয়ের যোগ আছে।

যাকে সংস্কৃতি বলে থাকি, অর্থাৎ কাল্‌চার্‌, সমস্ত য়ুরোপীয় জাতির মধ্যে তা অনবচ্ছিন্ন। এই সংস্কৃতির বুদ্ধিক্ষেত্রে ওদের পরস্পরের সীমাচিহ্ন প্রায় মিলিয়ে গেছে। ওদের সায়ান্সের মধ্যে জাতিভেদ নেই, সমান হাটে ওদের বুদ্ধিবৃত্তির দেনাপাওনা অবারিত। কিন্তু ওদের হৃদয়বৃত্তির

মধ্যে পঙ্‌ক্তিভেদ আছে। অনুভূতিতে ইটালীয় এবং নর্‌বেজীয় এক নয়, ইংরেজ এবং ফরাসির মধ্যেও প্রভেদ আছে। সে কেবলমাত্র ওদের রাষ্ট্রচালনায় নয়, ওদের শিল্পভাবনায় প্রকাশ পায়। বলা বাহুল্য জর্মান ও ফরাসির চরিত্র ভিন্ন। জর্মানি ও ইটালির ভৌগোলিক দূরত্ব অল্পই। কিন্তু ইটালির সীমা পেরিয়ে জর্মানিতে প্রবেশ করবামাত্রই উভয় দেশের লোকের প্রকৃতিগত প্রভেদ সুস্পষ্ট অনুভব করা যায়।

এই প্রভেদটি কুলক্রমে রক্তমাংস অস্থিমজ্জায় সঞ্চারিত হয়ে চলেছে অথবা বাইরের নানা ঐতিহাসিক কারণে এটা সংঘটিত— সে তর্ক আমাদের বর্তমান আলোচনার পক্ষে অনাবশ্যক। ভিন্ন ভিন্ন গণজাতির মধ্যে চরিত্রগত হৃদয়গত প্রভেদ অন্তত দীর্ঘকাল থেকে চলে আসছে এ কথা মানতেই হবে, চিরকাল চলবে কি না সে আলোচনা অবান্তর।

ভিন্ন ভিন্ন দেশের মানুষের বুদ্ধির ক্ষেত্র সমভূমি না হলেও, এক মাটির। সেখানে চাষ করতে করতে ক্রমে অনুরূপ ফসল ফলানো যেতে পারে। তার প্রমাণ জাপান। সেখানকার মাটিতে পারমার্থিক ও ব্যাবহারিক সায়ান্স শিকড় চালিয়ে দিয়ে পাশ্চাত্য শস্যের ফলনে ভয়াবহ হয়ে উঠেছে। য়ুরোপের বৌদ্ধিক প্রকৃতিকে সাধনাদ্বারা আমরা অঙ্গীকৃত করতে পারি তার কিছু-কিছু প্রমাণ দেওয়া গেছে। কিন্তু, তার চরিত্রকে পাচ্ছি নে, নানা শোচনীয় ব্যর্থতায় সেটা প্রত্যহ সুস্পষ্ট হল।

চরিত্র কর্মসৃষ্টিতে এবং হৃদয়বৃত্তি ও কল্পনাশক্তি রসসৃষ্টিতে আপন পরিচয় দিয়ে থাকে। তাই য়ুরোপীয় সংগীতের কাঠামো এক হলেও ইটালীয় ও জর্মান সংগীতের রূপের ভেদ আপনিই ঘটেছে। ও দিকে রুশীয় সংগীতেরও বৈশিষ্ট্য রসজ্ঞেরা স্বীকার করেন।

হিন্দুস্থানীর সঙ্গে বাঙালির প্রভেদ আছে, দেহে, মনে, হৃদয়ে, কল্পনায়। বুদ্ধির পার্থক্য হয়তো দূর করা যায় একজাতীয় শিক্ষার দ্বারা ; কিন্তু স্বভাবের যে দিকটা অন্তর্‌গূঢ় তার উপরে হাত চালানো সহজ নয়। আমাদের ধীশক্তিটা দারোয়ান ; কোন্ তথ্যটাকে রাখবে, কাকে খেদিয়ে দেবে, গোঁফে চাড়া দিয়ে সেটা ঠিক করতে থাকে— আক্রমণ ও আত্মরক্ষার কাজেও তার বাহাদুরি আছে— সে থাকে মনের দেউড়ি জুড়ে। কিন্তু অন্তঃপুরের কাজ আলাদা— সেইখানেই সাজসজ্জা, নাচগান, পূজা অর্চনা, সেবার নৈবেদ্য, মনোরঞ্জনের আয়োজন। কুচকাওয়াজ প্রভৃতি নানা উপায়ে দারোয়ানটার পালোয়ানির উৎকর্ষসাধনের একটা সাধারণ আদর্শ আমরা বৈজ্ঞানিক পাড়া থেকে আহরণ করতে পারি, কিন্তু অন্তঃপুরিকাদের এক ছাঁদে গড়তে গেলে হাই-হিল্‌ড্ জুতোর উপর দাঁড়িয়েও ভিতর থেকে তাদের ছাঁদ আলাদা হয়ে বেরিয়ে পড়ে, কেবল সেই অংশে মেলে যেটা তাদের স্বভাবের সঙ্গে স্বতই সংগত।

দ্বিতীয় কথা হচ্ছে এই যে, বাংলা সংস্কৃতির যদি অবশ্যম্ভাবী বৈশিষ্ট্য থাকেই তবে সেটা কি পুরাতনের পুনরাবৃত্তিরূপেই প্রকাশিত হতে থাকবে? কখনোই না। কারণ, অপরিবর্তনীয় পুনরাবৃত্তি তো প্রাণধর্মের বিরুদ্ধ। সেকেলে কবির গানে, পাঁচালি প্রভৃতিতে বাঙালি রুচির একটা আদর্শ নিশ্চয়ই পাওয়া যায় ; কিন্তু কালক্রমে তার কোনো পরিণতি যদি না ঘটে তবে বলতে হবে সে আদর্শ মরেছে। শিশুকে বড়ো হতে হবে—সেই পরিবৃদ্ধির মধ্যে একটা প্রচ্ছন্ন ঐক্যসূত্র বরাবর থাকে, কিন্তু অন্তরে বাইরে বদল হয় বিস্তর। তার সজীব কলেবরটা বাহিরের নানা উপাদান সংগ্রহ করতে থাকে, নতুন নতুন অবস্থার সঙ্গে মিল ঘটিয়ে চলে, নতুন পাঠশালায় নতুন নতুন শিক্ষালাভ করে। তার প্রভূত পরিণতি ও পরিবর্তন ঘটে। কিন্তু, মূল প্রাণের সূত্র যার দুর্বল, পুনরাবৃত্তি বই তার আর-কোনো গতি নেই। সেই পুনরাবৃত্তির অভাব দেখলেই প্রথার দোহাই পাড়তে থাকে যে বুদ্ধি, সে শবাসনা।

আমরা যাকে হিন্দুস্থানী সংগীত বলি তার মধ্যে দুটো জিনিস আছে, একটা হচ্ছে গানের তত্ত্ব, আর-একটা গানের সৃষ্টি। গানের তত্ত্বটি অবলম্বন করে বড়ো বড়ো হিন্দুস্থানী গুণী গান সৃষ্টি করেছেন। যে যুগে তাঁরা সৃষ্টি করেছেন সেই বাদশাহী যুগের প্রভাব আছে তার মধ্যে। দেশকালপাত্রের সঙ্গে সংগতিক্রমে তাঁদের সেই সৃষ্টি সত্য, যেমন সত্য সেকেন্দ্রাবাদ প্রাসাদের স্থাপত্য। তাকে প্রশংসা করব, কিন্তু অনুকরণ করতে গেলে নূতন দেশকালপাত্রে হুঁচট খেয়ে সেটা সত্য হারাবে।

বাঙালির মধ্যে 'বিদগ্ধমুখমণ্ডন'-রূপে যে হিন্দুস্থানী গানের অনুশীলন দেখা যায়, সেটা নিতান্তই ধনীর-আঁচল-ধরা পূর্বানুবৃত্তি। পূর্বকালীন সৃষ্টিকে ভোগ করবার উদ্দেশে এই অনুবৃত্তির প্রয়োজন থাকতে পারে ; কিন্তু সেইখানেই আরম্ভ আর সেইখানেই যদি শেষ হয়, দূরশতাব্দীর বাদশাহী আমলের বাইরে আমরা যে আজও বেঁচে আছি সংগীতে তার যদি কোনো প্রমাণ না পাওয়া যায়, তা হলে এ নিয়ে গৌরব করতে পারব না। কেননা, গান সম্বন্ধে যে দরিদ্র এই অবস্থাতেই চিরবর্তমান তাকেই বলব— 'পরান্নভোজী পরাবসথশায়ী'। তার চেয়ে নিজের শাকভাত এবং কুঁড়েঘরও শ্রেয়।

বাংলা দেশে কীর্তন গানের উৎপত্তির আদিতে আছে একটি অত্যন্ত সত্যমূলক গভীর এবং দূরব্যাপী হৃদয়াবেগ। এই সত্যকার উদ্দাম বেদনা হিন্দুস্থানী গানের পিঞ্জরের মধ্যে বন্ধন স্বীকার করতে পারলে না+সে বন্ধন হোক-না সোনার, বাদশাহী হাটে তার দাম যত উঁচুই হোক। অথচ হিন্দুস্থানী সংগীতের রাগরাগিণীর উপাদান সে বর্জন করে নি। সে-সমস্ত নিয়েই সে আপন নূতন সংগীতলোক সৃষ্টি করেছে। সৃষ্টি করতে হলে চিত্তের বেগ এমনিই প্রবলরূপে সত্য হওয়া চাই।

প্রত্যেক যুগের মধ্যেই এই কান্নাটা আছে— 'সৃষ্টি চাই'। অন্য যুগের সৃষ্টিহীন প্রসাদভোগী হয়ে থাকার লজ্জা থেকে যে তাকে রক্ষা করবে, তাকে সে আহ্বান করছে।

আধুনিক বাংলা দেশে গান-সৃষ্টির উদ্যম সংগীতকে কোনো অসামান্য উৎকর্ষের দিকে নিয়ে গেছে কি না এবং সে উৎকর্ষ ধ্রুবপদ্ধতির হিন্দুস্থানী সংগীতের উৎকৃষ্ট আদর্শ পর্যন্ত পৌঁছতে পেরেছে কি না সে কথাটা তত গুরুতর নয়, কিন্তু প্রকাশের চাঞ্চল্য মাত্রেই তার যে সজীবতার প্রমাণ পাই সেইটেই সব চেয়ে আশাজনক। নব্যবঙ্গের গানের কণ্ঠ গ্র্যামোফোনের চেয়ে অনেক কাঁচা হতে পারে, কিন্তু স্বরটি যদি তার 'মাস্‌টরস্‌ ভইস্‌' না হয়, তাতে যদি তার নিজের সুর খেলে, তা হলে সে বেঁচে আছে এই কথাটা সপ্রমাণ হবে। তবে তার বর্তমান যেমনি কচি হোক তার জোয়ান বয়সের ভবিষ্যৎ খুলবে আপন সিংহদ্বার। সে ভবিষ্যৎ নিরবধি।

বাঙালির চিত্তবৃত্তি প্রধানত সাহিত্যিক এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। ইংরেজের প্রতিভাও সাহিত্যপ্রবণ। তার মন আপন বড়ো বড়ো বাতি জ্বালিয়েছে সাহিত্যের মন্দিরে। প্রকৃতির গৃহিণীপনায় মিতব্যয়িতা দেখা যায়, শক্তির পরিবেশনে খুব হিসেব ক'রে ভাগ-বাটোয়ারা হয়ে থাকে। মাছকে প্রকৃতি শিখিয়েছেন খুব গভীর জলে ডুব-সাঁতার কাটতে, আর উচ্চ আকাশে উধাও হতে শিখিয়েছেন পাখিকে। কখনো কখনো সামান্য পরিমাণে কিছু মিশোল করেও থাকেন। পানকৌড়ি কিছুক্ষণের মতো জলে দেয় ডুব, উড়ুক্কু মাছ আকাশে ওড়ার শখ মেটায়। ইংলন্ডে সাহিত্যে জন্মেছেন শেক্‌স্‌পীয়র, জর্মানিতে সংগীতে জন্মেছেন বেটোফেন।

সত্যের খাতিরে এ কথা মানতেই হবে যে, বিশুদ্ধ সংগীতে হিন্দুস্থান বাংলাকে এগিয়ে গেছে। যন্ত্রসংগীতে তার প্রধান প্রমাণ পাওয়া যায়। যন্ত্রসংগীত সম্পূর্ণই সাহিত্য-নিরপেক্ষ। তা ছাড়া ঐ অঞ্চলে অর্থহীন তোম্‌-তা-না-না শব্দে তেলেনার বুলি ভাষাকে ব্যঙ্গ করতে দ্বিধা বোধ করে না।

বাংলা দেশে যন্ত্রসংগীত নিজের কোনো বিশেষত্ব উদ্ভাবন করে নি। সেতার এসরাজ সরদ রবাব প্রভৃতি যন্ত্র হিন্দুস্থানের বানানো, তার চর্চাও হিন্দুস্থানেই প্রসিদ্ধ। 'ওরে রে লক্ষ্মণ, একি কুলক্ষণ, বিপদ ঘটেছে বিলক্ষণ' প্রভৃতি পাঁচালি-প্রচলিত গানে অর্থ স্বল্পই, অনুপ্রাসের ফেনিলতাই বেশি, অতএব প্রায় সে তেলেনার কাছ ঘেঁষে গেছে, কিন্তু তবু তোম্-তানানানা'র মতো অমন নিঃসংকোচে নিরর্থক নয়। পরজ রাগিণীতে একটা হিন্দি গান জানতুম, তার বাংলা তর্জমা এই— কালো কালো কম্বল, গুরুজি, আমাকে কিনে দে, রাম-জপনের মালা এনে দে আর জল পান করবার তুম্বী। ঐ ফর্দে উদ্ধৃত ফরমাশী জিনিসগুলিতে যে সুগভীর বৈরাগ্যের ব্যঞ্জনা আছে পরজ রাগিণীই তা ব্যক্ত করবার ভার নিয়েছে। ভাষাকে দিয়েছে সম্পূর্ণ ছুটি। আমি বাঙালি, আমার স্কন্ধে নিতান্তই যদি বৈরাগ্য ভর করত, তবে লিখতুম।—

গুরু, আমায় মুক্তিধনের দেখাও দিশা।
কম্বল মোর সম্বল হোক দিবানিশা।
সম্পদ হোক জপের মালা
নামমণির-দীপ্তি-জ্বালা,
তুম্বীতে পান করব যে জল
মিটবে তাহে বিষয়তৃষা।

কিন্তু এ গানে পরজ তার ডানা মেলতে বাধা পেত। পরজ হত সাহিত্যের খাঁচার পাখি। হিন্দুস্থানী গাইয়ে তানপুরা নিয়ে বসলেন, বললেন— আমার এই চুনরিয়া লাল রঙ করে দে, যেমন তোর ঐ পাগড়ি তেমনি আমার এই চুনরিয়া লাল রঙ করে দে! বাস্, আর কিছু নয়, এই ক'টি কথার উপর কানাড়া অপ্রতিহত প্রভাবে রাজত্ব বিস্তার করলে। বাঙালি গাইলে—

ভালোবাসিবে ব'লে ভালোবাসি নে।
আমার যে ভালোবাসা তোমা বই আর জানি নে।
হেরিলে ও মুখশশী আনন্দসাগরে ভাসি,
তাই তোমারে দেখতে আসি— দেখা দিতে আসি নে।

যা-কিছু বলবার, আগেভাগে তা ভাষা দিয়েই বলে দিলে, ভৈরবী রাগিণীর হাতে খুব বেশি কাজ রইল না।

বাঙালির এই স্বভাব নিয়েই তাকে গান গাইতে হবে। বললে চলবে না রাতের বেলাকার চক্রবাকদম্পতির মতো ভাষা পড়ে থাকবে নদীর পূর্ব পারে আর গান থাকবে পশ্চিম পারে, 'and never the twain shall meet'। বাঙালির কীর্তনগানে সাহিত্যে সংগীতে মিলে এক অপূর্ব সৃষ্টি হয়েছিল— তাকে প্রিমিটিভ এবং ফোক্ ম্যুজিক বলে উড়িয়ে দিলে চলবে না। উচ্চ অঙ্গের কীর্তন গানের আঙ্গিক খুব জটিল ও বিচিত্র, তার তাল ব্যাপক ও দুরূহ, তার পরিসর হিন্দুস্থানী গানের চেয়ে বড়ো। তার মধ্যে যে বহুশাখায়িত নাট্যরস আছে তা হিন্দুস্থানী গানে নেই।

বাংলায় নূতন যুগের গানের সৃষ্টি হতে থাকবে ভাষায় সুরে মিলিয়ে। এই সুরকে খর্ব করলে চলবে না। তার গৌরব কথার গৌরবের চেয়ে হীন হবে না। সংসারে স্ত্রী-পুরুষের সমান অধিকারে দাম্পত্যের যে পরিপূর্ণ উৎকর্ষ ঘটে, বাংলা সংগীতে তাই হওয়া চাই। এই মিলনসাধনে ধ্রুবপদ্ধতির হিন্দুস্থানী সংগীতের সহায়তা আমাদের নিতে হবে, আর অনিন্দনীয় কাব্যমহিমা তাকে দীপ্তিশালী করবে। একদিন বাংলার সংগীতে যখন বড়ো প্রতিভার আবির্ভাব হবে তখন সে বসে বসে পঞ্চদশ শতাব্দীর তানসেনী সংগীতকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে প্রতিধ্বনিত করবে না,

আর আমাদের এখনকার কালের গ্র্যামোফোন-সঞ্চারী গীতপতঙ্গের দুর্বল গুঞ্জনকেও প্রশ্রয় দেবে না। তার সৃষ্টি অপূর্ব হবে, গম্ভীর হবে, বর্তমান কালের চিত্তশঙ্খকে সে বাজিয়ে তুলবে নিত্যকালের মহাপ্রাঙ্গণে। কিন্তু, গানসৃষ্টিতে আজ যেগুলিকে ছোটো দেখাচ্ছে, অসম্পূর্ণ দেখাচ্ছে, তারা পূর্ব দিগন্তে খণ্ড ছিন্ন মেঘের দল, আষাঢ়ের আসন্ন রাজ্যাভিষেকে তারা নিমন্ত্রণপত্র বিতরণ করতে এসেছে— দিগন্তের পরপারে রথচক্রনির্ঘোষ শোনা যায়। ইতি ৬ই জুলাই ১৯৩৫

তোমাদের
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পুঃ— বাংলা যন্ত্রসংগীতসৃষ্টি কোন্ লক্ষ্যে পৌঁছবে তা বলা কঠিন, প্রতিভার লীলা অভাবনীয়। এক কালে থিয়েটারে কন্সার্ট নামে যে কদর্য অত্যাচারের সৃষ্টি হয়েছিল সেটা মরেছে এইটেই আশাজনক।

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

...এই সূত্রে সংগীত সম্বন্ধে একটা কথা বলে রাখি। সংগীতের প্রসঙ্গে বাঙালির প্রকৃত বৈশিষ্ট্য নিয়ে কথা উঠেছিল। সেইটেকে আরো একটু ব্যাখ্যা করা দরকার।

বাঙালিস্বভাবের ভাবালুতা সকলেই স্বীকার করে। হৃদয়োচ্ছ্বাসকে ছাড়া দিতে গিয়ে কাজের ক্ষতি করতেও বাঙালি প্রস্তুত। আমি জাপানে থাকতে একজন জাপানি আমাকে বলেছিল, 'রাষ্ট্রবিপ্লবের আর্ট তোমাদের নয়। ওটাকে তোমরা হৃদয়ের উপভোগ্য করে তুলেছ ; সিদ্ধিলাভের জন্য যে তেজকে, যে সংকল্পকে গোপনে আত্মসাৎ করে রাখতে হয়, গোড়া থেকেই তাকে ভাবাবেগের তাড়নায় বাইরের দিকে উৎক্ষিপ্ত বিক্ষিপ্ত করে দাও।' এই জাপানির কথা ভাববার যোগ্য। সৃষ্টির কার্য যে-কোনো শ্রেণীর হোক, তার শক্তির উৎস নিভৃতে গভীরে ; তাকে পরিপূর্ণতা দিতে গেলে ভাবসংযমের দরকার। যে উপাদানে উচ্চ অঙ্গের মূর্তি গড়ে তোলে তার মধ্যে প্রতিরোধের কঠোরতা থাকা চাই : ভেঙে ভেঙে, কেটে কেটে তার সাধনা। জল দিয়ে গলিয়ে যে মৃৎপিণ্ডকে শিল্পরূপ দেওয়া যায় তার আয়ু কম, তার কণ্ঠ ক্ষীণ। তাতে যে পুতুল গড়া যায়, সে নিধুবাবুর টপ্পার মতোই ভঙ্গুর।

উচ্চ অঙ্গের আর্টের উদ্দেশ্য নয় দুই চক্ষু জলে ভাসিয়ে দেওয়া, ভাবাতিশয্যে বিহ্বল করা, তার কাজ হচ্ছে মনকে সেই কল্পলোকে উত্তীর্ণ করে দেওয়া যেখানে রূপের পূর্ণতা। সেখানকার সৃষ্টি প্রকৃতির সৃষ্টির মতোই ; অর্থাৎ সেখানে রূপ কুরূপ হতেও সংকোচ করে না ; কেননা তার মধ্যেও সত্যের শক্তি আছে— যেমন মরুভূমির উট, যেমন বর্ষার জঙ্গলে ব্যাঙ, যেমন রাত্রির আকাশে বাদুড়, যেমন রামায়ণের মন্থরা, মহাভারতের শকুনি, শেক্স্পীয়রে ইয়াগো।

আমাদের দেশের সাহিত্যবিচারকের হাতে সর্বদাই দেখতে পাই আদর্শবাদের নিক্তি ; সেই নিক্তিতে তারা এতটুকু কুঁচ চড়িয়ে দিয়ে দেখে তারা যাকে আদর্শ বলে তাতে কোথাও কিছুমাত্র কম পড়েছে কিনা। বঙ্কিমের যুগে প্রায় দেখতে পেতুম অত্যন্ত সূক্ষ্ম-বোধবান সমালোচকেরা নানা উদাহরণ দিয়ে তর্ক করতেন— ভ্রমরের চরিত্রে পতিপ্রেমের সম্পূর্ণ আদর্শ কোথায় একটুখানি ক্ষুণ্ণ

হয়েছে আর সূর্যমুখীর ব্যবহারে সতীর কর্তব্যে কতটুকু খুঁত দেখা দিল। ভ্রমর সূর্যমুখী সকল অপরাধ সত্ত্বেও কতখানি সত্য আর্টে সেটাই মুখ্য, তারা কতখানি সতী সেটা গৌণ, এ কথার মূল্য তাদের কাছে নেই ; তারা আদর্শের অতিনিখুঁতত্বে ভাবে বিগলিত হয়ে অশ্রুপাত করতে চায়। উপনিষৎ বলেছেন আত্মার মধ্যে পরম সত্যকে দেখবার উপায় 'শান্তোদান্ত উপরতস্তিতিক্ষুঃ সমাহিতো ভূত্বা'। আর্টের সত্যকেও সমাহিত হয়ে দেখতে হয়, সেই দেখবার সাধনায় কঠিন শিক্ষার প্রয়োজন আছে।

বাংলা দেশে সম্প্রতি সংগীতচর্চার একটা হাওয়া উঠেছে, সংগীতরচনাতেও আমার মতো অনেকেই প্রবৃত্ত। এই সময়ে প্রাচীন ক্লাসিক্যাল অর্থাৎ ধ্রুবপদ্ধতির হিন্দুস্থানী সংগীতের ঘনিষ্ঠ পরিচয় নিতান্তই আবশ্যক। তাতে দুর্বল রসমুগ্ধতা থেকে আমাদের পরিত্রাণ করবে। এ কিন্তু অনুশীলনের জন্যে, অনুকরণের জন্যে নয়। আর্টে যা শ্রেষ্ঠ তা অনুকরণজাত নয়। সেই সৃষ্টি আর্টিস্টের সংস্কৃতিবান মনের স্বকীয় প্রেরণা থেকে উদ্ভূত। যে মনোভাব থেকে তানসেন প্রভৃতি বড়ো বড়ো সৃষ্টিকর্তা দরবারীতোড়ি দরবারীকানাড়াকে তাঁদের গানে রূপ দিয়েছেন সেই মনোভাবটিই সাধনার সামগ্রী, গানগুলির আবৃত্তিমাত্র নয়। নতুন যুগে এই মনোভাব যা সৃষ্টি করবে সেই সৃষ্টি তাঁদের রচনার অনুরূপ হবে না, অনুরূপ না হতে দেওয়াই তাঁদের যথার্থ শিক্ষা— কেননা, তাঁরা ছিলেন নিজের উপমা নিজেই। বহু যুগ থেকে তাঁদের সৃষ্টির 'পরে আমরা দাগা বুলিয়ে এসেছি, সেটাই যথার্থত তাঁদের কাছ থেকে দূরে চলে যাওয়া। এখনকার রচয়িতার গীতশিল্প তাঁদের চেয়ে নিকৃষ্ট হতে পারে, কিন্তু সেটা যদি এখনকার স্বকীয় আত্মপ্রকাশ হয় তা হলে তাতে করেই সেই-সকল গুণীর প্রতি সম্মান প্রকাশ করা হবে।

সব শেষে নিজের সম্বন্ধে কিছু বলতে চাই। মাঝে মাঝে গান রচনার নেশায় যখন আমাকে পেয়েছে তখন আমি সকল কর্তব্য ভুলে তাতে তলিয়ে গেছি। আমি যদি ওস্তাদের কাছে গান শিক্ষা করে দক্ষতার সঙ্গে সেই-সকল দুরূহ গানের আলাপ করতে পারতুম তাতে নিশ্চয়ই সুখ পেতুম ; কিন্তু আপন অন্তর থেকে প্রকাশের বেদনাকে গানে মূর্তি দেবার যে আনন্দ, সে তার চেয়ে গভীর। সে গান শ্রেষ্ঠতায় পুরাযুগের গানের সঙ্গে তুলনীয় নয়, কিন্তু আপন সত্যতায় সে সমাদরের যোগ্য। নব নব যুগের মধ্যে দিয়ে এই আত্মসত্যপ্রকাশের আনন্দধারা যেন প্রবাহিত হতে থাকে এইটেই বাঞ্ছনীয়।

প্রথম বয়সে আমি হৃদয়ভাব প্রকাশ করবার চেষ্টা করেছি গানে, আশা করি সেটা কাটিয়ে উঠেছি পরে। পরিণত বয়সের গান ভাব-বাৎলাবার জন্যে নয়, রূপ দেবার জন্য। তৎসংশ্লিষ্ট কাব্যগুলিও অধিকাংশই রূপের বাহন। 'কেন বাজাও কাঁকন কনকন কত ছলভরে'— এতে যা প্রকাশ পাচ্ছে তা কল্পনার রূপলীলা। ভাবপ্রকাশে ব্যথিত হৃদয়ের প্রয়োজন আছে, রূপপ্রকাশ অহৈতুক। মালকোষের চৌতাল যখন শুনি তাতে কান্নাহাসির সম্পর্ক দেখি নে, তাতে দেখি গীতরূপের গম্ভীরতা। যে বিলাসীরা টপ্পা ঠুংরি বা মনোহরসাঞী কীর্তনের অশ্রু-আর্দ্র অতিমিষ্টতায় চিত্ত বিগলিত করতে চায়, এ গান তাদের জন্য নয়। আর্টের প্রধান আনন্দ বৈরাগ্যের আনন্দ, তা ব্যক্তিগত রাগদ্বেষ হর্ষশোক থেকে মুক্তি দেবার জন্যে। সংগীতে সেই মুক্তির রূপ দেখা গেছে ভৈরোঁতে, কল্যাণে, কানাড়ায়। আমাদের গান মুক্তির সেই উচ্চশিখরে উঠতে পারুক বা না পারুক, সেই দিকে ওঠবার চেষ্টা করে যেন। ইতি ১৩ই জুলাই ১৯৩৫

তোমাদের
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

গ্রন্থপরিচয়

গ্রন্থপরিচয়

রচনাবলীর বর্তমান খণ্ডে এযাবৎকাল প্রকাশিত প্রথম-সপ্তবিংশ খণ্ড এবং অচলিত সংগ্রহ প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডের (সুলভ সংস্করণ ১-১৫ খণ্ড) বহির্ভূত রচনার অংশবিশেষ স্থান পাইয়াছে। এই খণ্ডে মুদ্রিত বিভিন্ন গ্রন্থের উদ্‌বৃত্ত রচনা যাহা অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে সেইগুলি সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য তথ্য এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে কবির মন্তব্য যুক্ত হইয়াছে।

পূরবী

রবীন্দ্র-রচনাবলীর চতুর্দশ খণ্ডে (সুলভ সংস্করণ সপ্তম খণ্ডে) 'পূরবী' অন্তর্ভুক্ত। গ্রন্থাকারে 'পূরবী' প্রথম প্রকাশকালে (শ্রাবণ ১৩৩২) শিবাজী-উৎসব, দুর্দিন, সুপ্রভাত এই তিনটি কবিতা 'সঞ্চিতা' অংশের অন্তর্ভুক্ত ছিল। দ্বিতীয় সংস্করণকালে (ভাদ্র ১৩৩৮) 'সঞ্চিতা'র অন্যান্য কবিতার সঙ্গে এই কবিতাগুলি বর্জিত হয়। পরবর্তীকালে 'শিবাজী-উৎসব' ও 'সুপ্রভাত' কবিতা দুইটি 'সঞ্চয়িতা'য় স্থান লাভ করিলেও 'দুর্দিন' অন্য কোনো গ্রন্থভুক্ত হয় নাই।

'শিবাজী-উৎসব' কবিতার প্রকাশ, ১৩১১ বঙ্গাব্দের আশ্বিন সংখ্যা 'ভারতী' ও 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায়। রচনার অনুমিত স্থান ও কাল, গিরিধি, ১১ ভাদ্র ১৩১১। প্রাসঙ্গিক তথ্যের জন্য দ্রষ্টব্য, দীনেশচন্দ্র সেনকে ১১ ভাদ্র ১৩১১ তারিখে লিখিত রবীন্দ্রনাথের পত্র (চিঠিপত্র, দশম খণ্ড) ও ২০ জ্যৈষ্ঠ ১৩১৩ সালে মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়কে লিখিত রবীন্দ্রনাথের পত্র (চিঠিপত্র, ত্রয়োদশ খণ্ড)।

রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত পাণ্ডুলিপি অনুযায়ী 'দুর্দিন' কবিতা রচনার স্থান কাল : ঝড়ের দিনে। ১০ আষাঢ় ১৩১৪/কলিকাতা।

সুপ্রভাত প্রকাশিত হয় 'সুপ্রভাত' পত্রিকার প্রথম বর্ষ প্রথম সংখ্যায়।

বীথিকা

রবীন্দ্র-রচনাবলীর ঊনবিংশ খণ্ডে (সুলভ সংস্করণ দশম খণ্ডে) 'বীথিকা' অন্তর্ভুক্ত। বীথিকা কাব্যগ্রন্থের (প্রকাশ ভাদ্র ১৩৪২) রবীন্দ্রশতবর্ষপূর্তি সংস্করণে (মাঘ ১৩৬৭) গ্রন্থশেষে, সংযোজন অংশে সমকালীন অথবা কিছু পরবর্তীকালে রচিত দশটি নতুন কবিতা যোজিত হয়। বৈশাখ ১৩৭৭ সংস্করণে যুক্ত হয় 'পুপুদিদির জন্মদিনে', কার্তিক ১৩৮৮ সংস্করণে যোগ করা হয় 'যুগল পাখি'। 'যুগল পাখি' ছাড়া সংকলিত সব কবিতাই সাময়িক পত্রে প্রকাশিত। সংকলিত বারোটি কবিতা সম্পর্কে তথ্যাদি সংক্ষেপে এইরূপ—

বাণী   প্রকাশ, বিচিত্রা, পৌষ ১৩৩৭। প্রবাসী, মাঘ ১৩৩৭

'বিচিত্রা' পত্রিকায় রবীন্দ্র-হস্তাক্ষরে মুদ্রিত প্রতিরূপে দেখা যায়, 'অসীম' স্থলে 'অনাদি' এবং 'অগ্নি' স্থলে 'বহ্নি'। প্রবাসীতে প্রথম ও অষ্টম ছত্রে পাঠান্তরে, যথাক্রমে : 'অনাদি' স্থলে 'অসীম' ও 'বহ্নি' স্থলে 'অগ্নি'। 'বাণী' কবিতা সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞাতব্য এই, ১৯৩০ খৃস্টাব্দে The Child নামে ইংরেজি কবিতা লেখার প্রায় এক বছর পরে 'শিশুতীর্থ' কবিতায় রূপান্তরিত হয়। সেই

রকম, *The Religion of Man* গ্রন্থের প্রবেশকরূপে একটি ইংরেজি কবিতা প্রকাশের প্রায় এক বছর দুমাস পর এই বাংলা রূপান্তর ‘বাণী’।

প্রত্যুত্তর	বিচিত্রা, বৈশাখ ১৩৪০
দিনান্ত	পরিচয়, শ্রাবণ ১৩৪০
যুগল পাখি	বুলবুল, বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৪১

‘তরুণ বন্ধুর বিবাহ সাম্বৎসরিকে’। রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত পাণ্ডুলিপিতে নাম ‘বন্ধুদম্পতি’। নির্মলকুমারী ও প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশের বিবাহ-দিবসের স্মরণে এই কবিতাটি উপহার দেওয়া হইয়াছিল, সেইসঙ্গে যুগল পাখির একটি ছবিও রবীন্দ্রনাথ আঁকিয়া দেন। অনুরূপ প্রসঙ্গে লেখা ‘পরিশেষ’ কাব্যধৃত ‘মিলন’ কবিতার সঙ্গে ‘যুগল পাখি’ তুলনীয়।

একাকী	বিচিত্রা, বৈশাখ ১৩৪১
জীবনবাণী	প্রবাসী, ভাদ্র ১৩৪১
যাত্রাশেষে	বিচিত্রা, ভাদ্র ১৩৪১
আবেদন	প্রবাসী, অগ্রহায়ণ ১৩৪১
অচিন মানুষ	প্রবাসী, পৌষ ১৩৪১
জন্মদিনে	বিচিত্রা, পৌষ ১৩৪২। নির্মলকুমারী মহলানবিশের জন্মদিন উপলক্ষে রচিত, জানা যায়।
পুপুদিদির জন্মদিনে	প্রবাসী, মাঘ ১৩৪৩। পৌত্রী নন্দিনীর উদ্দেশে লেখা। ‘পূরবী’ কাব্যের ‘তৃতীয়া’ ও ‘বিরহিণী’ কবিতাও ইহারই উদ্দেশে রচিত। বর্তমান কবিতার একটি পূর্বপাঠ ইতিপূর্বে ‘বিচিত্রা’ চতুর্থ খণ্ডে সংকলিত।
রেশ	কবিতা, আশ্বিন ১৩৪৭। এই কবিতার সূচনাটুকু পাওয়া যায় রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত একটি পাণ্ডুলিপিতে, স্বাক্ষর-সংগ্রাহকের দাবি পূরণ করিতে কবিতাটির উদ্ভব হইয়া থাকিতে পারে। কবিতাটি উদ্ধৃত হইল—

বাঁশরী আনে আকাশবাণী
ধরণী আনমনে
কখনো শোনে কখনো নাহি
শোনে।
দিনের যবে অন্ত হবে
গানের হবে শেষ
তখন বুঝি পড়িবে মনে
সুরের কিছু রেশ।

৭ পৌষ ১৩৪৫

‘কবিতা’ পত্রে পূর্ণরূপায়িত কবিতাটির রচনাকাল ১৪. ৮. ১৯৪০। নির্মলকুমারী মহলানবিশ -রচিত ‘বাইশে শ্রাবণ’ (১৩৬৭) গ্রন্থে কবির হস্তাক্ষরে মুদ্রিত, রচনাকাল ১৫. ৮. ৪০ তারিখের এই পার্থক্য ছাড়া, বর্তমান রচনাবলী-ধৃত কবিতাটির পাণ্ডুলিপি-চিত্রের সঙ্গে একটি মাত্র পাঠভেদ : ‘ফিরে ঘিরিবে’ স্থলে ‘ঘিরে ফিরিবে’।

প্রহাসিনী

রবীন্দ্র-রচনাবলীর ত্রয়োবিংশ খণ্ডে (সুলভ সংস্করণ দ্বাদশ খণ্ডে) 'প্রহাসিনী' অন্তর্ভুক্ত। প্রহাসিনী কাব্যের প্রকাশ, পৌষ ১৩৪৫ বঙ্গাব্দে। পৌষ ১৩৫২ সংস্করণে তিনটি কবিতা স্থানান্তরিত হয় 'খাপছাড়া' কাব্যে, সেইসঙ্গে সংযোজন অংশে যুক্ত হয় চোদ্দটি নতুন কবিতা। রবীন্দ্র-রচনাবলী, ত্রয়োবিংশ খণ্ডে (সুলভ সংস্করণ দ্বাদশ খণ্ডে) সংকলিত 'প্রহাসিনী', ১৩৫২ সংস্করণ স্বতন্ত্র গ্রন্থের অনুরূপ। এতদ্ভিন্ন, সংযোজন অংশে আরো সাতটি নতুন কবিতা এবং গ্রন্থপরিচয়ে প্রসঙ্গসূত্রে আরো দুটি কবিতা সংকলিত। 'প্রহাসিনী' গ্রন্থের পরিবর্ধিত নূতন সংস্করণে (বৈশাখ ১৩৯১) আরো সাতটি কবিতা, সংযোজন অংশে ও গ্রন্থপরিচয়ে সংকলিত।

রচনাবলীর বর্তমান খণ্ডে পরিপূরক হিসাবে যে ছয়টি কবিতা সংগৃহীত, সেইগুলি সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত তথ্যাবলী এইরূপ—

সালগম-সংবাদ ভারতী, ভাদ্র ১৩০৯

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর 'নাতিনীর নিকট হইতে শালগম উপহার' পাইয়া ছন্দোবদ্ধ একটি চিঠি লিখিয়া তাহার প্রাপ্তিস্বীকার করেন। সত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়ের কন্যা শান্তা তখন বিপন্ন হইয়া ছোটোদাদু রবীন্দ্রনাথের শরণ নেওয়ায় তিনি 'সালগম-সংবাদ/নাতিনীর পত্র' জবাবটি লিখিয়া দিয়াছিলেন। বিস্তারিত তথ্যর জন্য দ্রষ্টব্য, বিশ্বভারতী পত্রিকা, শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৫৯ ও শ্রীপ্রশান্তকুমার পালের 'রবিজীবনী' পঞ্চম খণ্ড।

এপ্রিলের ফুল বঙ্গলক্ষ্মী, চৈত্র ১৩৪৫

'বঙ্গলক্ষ্মী' পত্রিকা-সম্পাদকের মন্তব্য থেকে জানা যায়, 'প্রায় ২৫ বছর আগে... দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছোট বোন... নলিনী দেবী রহস্যছলে পয়লা এপ্রিলে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথকে একটি কবিতা লিখে পাঠান— খামে ভ'রে কতকগুলি সুগন্ধ ঝুরো ফুল-সহ।...' বর্তমান কবিতাটি তাহারই উত্তর।

তোমার বাড়ি প্রবাসী, ফাল্গুন ১৩৪৭
হ্যারাম প্রবাসী, ফাল্গুন ১৩৪৭

এই দুটি কবিতা সম্বন্ধে বিশেষভাবে, এবং এই সময়ে লিখিত অন্যান্য ছড়া ও কবিতা সম্পর্কে সাধারণভাবে, সুধাকান্ত রায়চৌধুরী -রচিত 'রবীন্দ্র-দৈনিকী' (প্রবাসী, ফাল্গুন ১৩৪৭) নিবন্ধটি দ্রষ্টব্য। সংকলিত দুটি কবিতাই রবীন্দ্রনাথের দৌহিত্রী নন্দিতা কৃপালনীর উদ্দেশে রচিত।

বেঁটেছাতাওয়ালি দেশ, ২৭ বৈশাখ ১৩৪৮

শান্তিনিকেতন রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত পাণ্ডুলিপিতে রচনার স্থান কাল সম্পর্কে যে তথ্যাদি পাওয়া যায়, গ্রন্থমধ্যে কবিতার শেষে তা সংকলিত। দেশ পত্রিকায় মুদ্রিত রচনাকাল '১৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৪১ মধ্যাহ্ন'— এই কবিতার প্রাথমিক খসড়ার তারিখ ধরা যেতে পারে।

দিদিমণি

রবীন্দ্রহস্তাক্ষরে লিখিত পাঠ গ্রন্থে মুদ্রিত। ভিন্ন ছন্দে ভিন্নভাবে রচিত এই কবিতার অপর একটি পাঠের টাইপ-কপি রবীন্দ্রভবনে দেখা যায়। অনুমান করা চলে, দিদিমণি কবিতার এটি পূর্বপাঠ।

'প্রহাসিনী'র স্বতন্ত্র সংস্করণের (বৈশাখ ১৩৯১) গ্রন্থপরিচয়ে প্রাসঙ্গিক অন্যান্য তথ্য দ্রষ্টব্য।

রোগশয্যায়

রবীন্দ্র-রচনাবলীর পঞ্চবিংশ খণ্ডে (সুলভ সংস্করণ ত্রয়োদশ খণ্ডে) 'রোগশয্যায়' অন্তর্ভুক্ত। গ্রন্থাকারে প্রকাশ, পৌষ ১৩৪৭। পরবর্তীকালে স্বতন্ত্র গ্রন্থে সংযোজন অংশে তিনটি কবিতা সংকলিত। বর্তমান রচনাবলীতে গৃহীত প্রথম কবিতা 'যারা বিহানবেলায় গান এনেছিল' প্রসঙ্গে তুলনীয় মূল গ্রন্থের ৩-সংখ্যক কবিতা, 'একা বসে আছি হেথায়'। দ্বিতীয় কবিতা, 'পাখি, তোর সুর ভুলিস নে' প্রসঙ্গে তুলনীয় ৬-সংখ্যক 'ওগো আমার ভোরের চড়ুইপাখি' এবং 'শেষ লেখা' কাব্যভুক্ত ৩-সংখ্যক কবিতা 'ওরে পাখি...'।

স্মরণীয় যে এই লেখাদুটি 'গীতবিতান' তৃতীয় খণ্ডেরও অন্তর্গত। 'যারা বিহানবেলায়' প্রসঙ্গে সেখানে এই তথ্য পাওয়া যায় : '৩ নাভেম্বর ১৯৪০ তারিখের সকালে কলিকাতার বেতার-কেন্দ্র হইতে রবীন্দ্রসংগীতের একটি বিশেষ অনুষ্ঠান প্রচারিত হয়।— উহা শুনিয়া কলিকাতায় জোড়াসাঁকোর বাড়িতে কবি এই গানটি রচনা করিয়া শ্রীমতী অমিতা ঠাকুরকে শিখাইয়া দেন।' সেই সুরস্মৃতি অবলম্বনে শ্রীপ্রফুল্লকুমার দাস যে স্বরলিপি প্রস্তুত করেন তাহা নবপর্যায় বিশ্বভারতী পত্রিকা কার্তিক-পৌষ ১৪০১ -সংখ্যায় মুদ্রিত হইয়াছে।

'রোগশয্যায়' স্বতন্ত্র গ্রন্থে সংকলিত তৃতীয় কবিতাটি এই :

ওরা কাজ করে
নিরন্তর দেশে দেশান্তরে
অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গের সমুদ্র নদীর ঘাটে ঘাটে
পাঞ্জাবে বম্বাই গুজরাটে
গুরু গুরু গর্জন গুন গুন স্বর
দিন রাত্রে গাঁথা পড়ি দিনযাত্রা করিছে মুখর।
দুঃখ সুখ দিবস রজনী
মন্দ্রিত করিয়া তোলে জীবনের মহামন্ত্রধ্বনি।
শত শত সাম্রাজ্যের ভগ্নশেষ-'পরে
ওরা কাজ করে।

অনিঃশেষ প্রাণ
অনিঃশেষ মরণের স্রোতে ভাসমান
পদে পদে সংকটে সংকটে
নামহীন সমুদ্রের নিরুদ্দেশ তটে
পৌঁছিবারে অবিশ্রাম বাহিতেছে খেয়া
কোন সে অলক্ষ্য দেয়া[1]
মর্মে বসি দিতেছে আদেশ,
নাহি তার শেষ।
চলিতেছে লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি প্রাণী
এই শুধু জানি।

---

[1] দেয়া = দেবতা / বাঙ্গালা ভাষার অভিধান : জ্ঞানেন্দ্রমোহন

চলিতে চলিতে থামে— পণ্য তার দিয়ে যায় কাকে,
যারা বাকি থাকে শেষে তারাও তো বাকি নাহি থাকে।
মৃত্যুর কবলে নামা যারে মানে হয় মহা ফাঁকি
তবুও যে ফাঁকি নয়, ফুরাতে ফুরাতে রহে বাকি,
পদে পদে আপনারে শেষ করি দিয়া
পদে পদে তবু রহে জিয়া—
চলমান রূপহীন বিরাট যে সেই
মহাক্ষণে যে রয়েছে, ক্ষণে ক্ষণে তবুও যে নেই,
স্বরূপ যাহার থাকা আর নাই থাকা
খোলা আর ঢাকা
কী নামে ডাকিব তারে অস্তিত্বপ্রবাহে
মোর নাম দেখা দিয়ে মিলাইবে যাহে॥

[গৌরীপুর ভবন, কালিম্পঙ্
২৪-২৫ সেপ্টেম্বর, ১৯৪০]

এই কবিতাটি বস্তুত দুটি ভিন্ন কবিতার একত্রীকৃত প্রাথমিক পাঠ। পাণ্ডুলিপিতে (সংখ্যা ১৬০) প্রাপ্ত এই রচনার প্রথম দশ ছত্র কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত রূপে 'আরোগ্য' গ্রন্থের ১০-সংখ্যক ('অলসসময়ধারা বেয়ে') কবিতার শেষে বসিয়াছে। পরবর্তী ছত্রগুলি 'রোগশয্যায়' কাব্যের ২-সংখ্যক কবিতার ('অনিঃশেষ প্রাণ') প্রাক্-রূপ। ১১-৩২ ছত্র বিচ্ছিন্ন হইয়া 'রোগশয্যায়' কাব্যে ২-সংখ্যক কবিতার রূপ লইয়াছে। কিন্তু তাহার আগে কিছু পাঠ পরিবর্তন যেমন ঘটিয়াছে, উৎকলিত ছত্র ২৬ ও ২৭ -এর অবকাশে বসিয়াছে নূতন চার ছত্র : 'অস্তিত্বের মহৈশ্বর্য...শক্তি তাহে পায়।' পাণ্ডুলিপির ও পূর্বপ্রকাশিত গ্রন্থের সাক্ষ্যে অনুমান করা চলে এ-সকল পরিবর্তনের স্থান, কাল— শান্তিনিকেতন, ফেব্রুয়ারি ১৯৪১।

জন্মদিনে

রবীন্দ্র-রচনাবলীর পঞ্চবিংশ খণ্ডে (সুলভ সংস্করণ ত্রয়োদশ খণ্ডে) 'জন্মদিনে' অন্তর্ভুক্ত। ১৩৪৮ বঙ্গাব্দের পয়লা বৈশাখ শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্র-জন্মোৎসব উদ্‌যাপনের সময়, কবির আয়ুষ্কালে প্রকাশিত শেষ কাব্যগ্রন্থ 'জন্মদিনে'। বর্তমান খণ্ডে সংকলিত তিনটি কবিতা—

অবিচার	প্রবাসী, মাঘ ১৩৪৭
প্রচ্ছন্ন পশু	প্রবাসী, মাঘ ১৩৪৭
ফসল গিয়েছে পেকে	রবীন্দ্র-পাণ্ডুলিপি-ধৃত (১৮৭ ক। পৃ ৫৫)।

গল্পসল্প

রবীন্দ্র-রচনাবলীর ষড়্‌বিংশ খণ্ডে (সুলভ সংস্করণ ত্রয়োদশ খণ্ডে) 'গল্পসল্প' অন্তর্ভুক্ত। গ্রন্থাকারে বৈশাখ ১৩৪৮ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত। অগ্রহায়ণ ১৩৭২ সংস্করণ স্বতন্ত্র গ্রন্থে দুইটি রচনার সংযোজন হয়। বর্তমান রচনাবলীতে গৃহীত 'ওকালতি ব্যবসায়ে ক্রমশই তার', রচনাটির স্থান কাল : উদয়ন। ১০ মার্চ ১৯৪১, বিকাল।

স্ফুলিঙ্গ

রবীন্দ্র-রচনাবলীর সপ্তবিংশ খণ্ডে (সুলভ সংস্করণ চতুর্দশ খণ্ডে) 'স্ফুলিঙ্গ' অন্তর্ভুক্ত। স্বতন্ত্র গ্রন্থরূপে প্রথম প্রকাশ, ২৫ বৈশাখ ১৩৫২। পরবর্তী দুটি সংস্করণ : রবীন্দ্র-শতবর্ষপূর্তি, চৈত্র ১৩৬৭ ও শ্রাবণ ১৩৯৭ বঙ্গাব্দ।

প্রথম প্রকাশকালে কবিতাসংখ্যা ১৯৮। পরবর্তী দুটি সংস্করণে, যথাক্রমে, ২৬০ ও ৪১০। স্ফুলিঙ্গের শেষ সংস্করণে (১৩৯৭) পূর্ব-সংকলিত কোনো কোনো কবিতা বর্জিত। রবীন্দ্র-রচনাবলী সপ্তবিংশ খণ্ডে (সুলভ সংস্করণ চতুর্দশ খণ্ডে) স্ফুলিঙ্গের কবিতাসংখ্যা ২৬০, বর্তমান খণ্ডে আরো ১২৯টি সংযোজিত হইল।

স্ফুলিঙ্গের অধিকাংশ কবিতারই রচনাকাল নির্ণয় করা যায় নাই এবং উৎসনির্দেশও অনেক ক্ষেত্রেই সম্ভব হয় নাই। প্রচল স্বতন্ত্র 'স্ফুলিঙ্গে'র গ্রন্থপরিচয় অংশে যথাসম্ভব বিস্তারিত জ্ঞাতব্য আছে। বর্তমান খণ্ডে সংগৃহীত কবিতাগুলি সম্পর্কে প্রাপ্ত তথ্যাদি সংক্ষেপে দেওয়া গেল—

রবীন্দ্র পাণ্ডুলিপি সংখ্যা	৮	১২৯-সংখ্যক কবিতা পাওয়া গিয়াছে।
	১২৮	৩৬-সংখ্যক কবিতার বিশেষ পাঠভেদ আছে।
	১৬৪	২৮-সংখ্যক, বর্তমান রচনাবলীভুক্ত।
	১৭০	৩৯-সংখ্যক কবিতা।
	২৪৮	৪, ২৪, ৩১, ৬৩, ৯৫, ১১৩, ১১৬, ১২৭ -সংখ্যক কবিতা।

৬ সংখ্যক কবিতা : *Chitralipi 1*-এ মুদ্রিত, চিত্রসংখ্যা ৪-এর সঙ্গে মিলাইয়া লওয়া যায়।

১৪ ছন্দ (আষাঢ় ১৩৪৩) গ্রন্থে সংকলিত। এই গ্রন্থের তৃতীয় সংস্করণ, মাঘ ১৩৮২।

১৫ বিশ্বভারতী পত্রিকা, বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৮০। কবিতাটি রচনার উপলক্ষ জানা যায়, '১৫ সেপ্টেম্বর ১৯৩৭ তারিখে দীর্ঘ মোহাচ্ছন্ন অবস্থা হইতে সংজ্ঞা লাভ করিবার পর কবি রোগশয্যার পাশে রাখা টেবিলের ভেনেস্তা-টপ-এর উপর এক ছবি আঁকেন'— কবিতায় সেই অনুভবের বাণীরূপ প্রকাশিত।

১৭ কাজী নজরুল ইসলাম-সম্পাদিত 'ধূমকেতু' পত্রিকার সূচনায় প্রকাশিত, ১২ অক্টোবর ১৯২২ তারিখসহ। কবিতাটির একটি পাঠান্তরও পাওয়া যায়।

১৮, ২০, ২১ 'ছন্দ' গ্রন্থে ধৃত।

২৩ *Chitralipi 1*, চিত্র ১৭ তুলনীয়।

২৪ 'ওগো স্মৃতি কাপালিকা'র সঙ্গে তুলনীয় ১২৭-সংখ্যক 'স্মৃতি, সে যে নিশিদিন'। এ ছাড়া পূর্বে মুদ্রিত রচনাবলীতে ও স্বতন্ত্র গ্রন্থে 'স্মৃতি কাপালিনী পূজারতা' কবিতাটিকে পরিণত পাঠ রূপে গণ্য করা যাইতে পারে। *Fireflies* গ্রন্থে (১৯২৮) রবীন্দ্রনাথ-কৃত অনুবাদ আছে।

২৮, ২৯ *Chitralipi 1*, চিত্র ১১। রবীন্দ্রবীক্ষা ৪ (পৌষ ১৩৮৪-শ্রাবণ ১৩৮৫) বিশ্বভারতী পত্রিকা, বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৮০, সংখ্যা ৭।

৩০ 'ছন্দ' গ্রন্থ।

৩১ *Fireflies* গ্রন্থে অনুবাদ। 'স্ফুলিঙ্গ' প্রচল স্বতন্ত্র গ্রন্থে পাঠভেদ লক্ষণীয়।

৩২ আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের হিন্দু-মুসলমান বাঙালি-সমাজ 'ঘরের মায়া' নামে

ত্রৈমাসিক পত্রিকা প্রকাশের পরিকল্পনা করেন জানুয়ারি ১৯৩৩ খৃস্টাব্দে। তাঁদের অনুরোধে কবিতাটি রচিত।

৩৬ 'ছন্দ' গ্রন্থ। বিশেষ পাঠভেদ ১২৮-সংখ্যক পাণ্ডুলিপিতে।

৩৭ রবীন্দ্রবীক্ষা ৪ (পৌষ ১৩৮৪), অল্প পাঠান্তরসহ প্রকাশিত। রচনা, মার্চ ১৯৩৮।

৩৮ বিশ্বভারতী পত্রিকা, বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৮০, কবিতা সংখ্যা ১৩।

৩৯ তুলনীয়, 'প্রান্তিক' কাব্যের ১৩-সংখ্যক কবিতা। ১৭০-সংখ্যক রবীন্দ্র-পাণ্ডুলিপিতে 'স্ফুলিঙ্গে'র কবিতাটি পাওয়া যায়।

৪০ অনুবাদ *Fireflies* গ্রন্থে।

৪২, ৪৩ 'ছন্দ' গ্রন্থ।

৪৬ নাটোরের মহারাজকুমার যোগীন্দ্রনাথ রায় ও ইন্দুমতী দেবীর বিবাহ উপলক্ষে (বৈশাখ ১৩২১) এই কবিতাসহ একটি দূরবীক্ষণ যন্ত্র উপহার দেন।

৪৭ মুসলিম স্টুডেন্টস ফেডারেশনের ভ্রাম্যমাণ একটি দল ২১ ফাল্গুন ১৩৪৩ সালে শান্তিনিকেতনে আসিলে তাঁহাদের উদ্দেশে এই কবিতা রচনা করেন। প্রকাশ, 'বুলবুল' পত্রিকা, চৈত্র ১৩৪৩।

৪৮ রচনাকাল ১৭. ৩. ১৯৪০। প্রকাশ, প্রবাসী, বৈশাখ ১৩৮৭। মৈত্রেয়ী দেবীর কন্যা মিঠুয়ার উদ্দেশে রচিত।

৪৯ রবীন্দ্রবীক্ষা ৪-ধৃত। কবিতা সংখ্যা ৩।

৫১, ৫২ 'ছন্দ' গ্রন্থ।

৫৩ ৫ অগস্ট ১৯৩৮ তারিখে কলিকাতা বেতার-কেন্দ্র হইতে বিশেষ উপলক্ষে প্রচারিত।

৫৬ 'ছন্দ' গ্রন্থ।

৫৯ শিশুদের উদ্দেশে রচিত, 'মৌচাক' পত্রিকায় প্রকাশিত। ইহা ব্যতীত, বর্তমান রচনাবলীভুক্ত ৭২, ৯৩, ৯৮, ১০০ -সংখ্যক কবিতাগুলিও শিশুদের উদ্দেশে লেখা।

৯৮-সংখ্যক কবিতা আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত, অন্যান্য সব মৌচাকে।

৬০ *Chitralipi I,* চিত্র ৩।

৬৩ ২৪৮-সংখ্যক পাণ্ডুলিপি।

৬৬ লক্ষ্ণৌবাসিনী ইরা বড়ুয়ার উদ্দেশে রচিত। রচনাকাল ১৬. ৩. ১৯৪০।

৬৭ নিজের আঁকা ছবি প্রসঙ্গে রচিত আরো পনেরোটি কবিতাসহ লিখিত হয় ১৪ মার্চ ১৯৩৮ খৃস্টাব্দে। বিশ্বভারতী পত্রিকা, বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৮০, পৃ ২৭৫ বিবরণ দ্রষ্টব্য।

৬৮ রথীন্দ্রনাথ ও প্রতিমা দেবীর পালিতা কন্যা, রবীন্দ্রনাথের পৌত্রী নন্দিনীর উদ্দেশে রচিত। রচনাকাল ১৬. ৩. ১৯৪০।

৬৯, ৭০ 'ছন্দ' গ্রন্থ।

৭১ *Fireflies* গ্রন্থে অনুবাদ আছে, p. 146।

৭২ শিশুদের উদ্দেশে লিখিত। রচনাকাল, চৈত্র ১৩২৯ অথবা বৈশাখ ১৩৩০।

৭৩, ৭৪ 'ছন্দ' গ্রন্থ।

৭৬	*Chitralipi 1*, চিত্র ২।
৮১	রবীন্দ্রনাথের জন্মদিন উপলক্ষে সুফিয়া খাতুন কলিকাতা হইতে ২৩ বৈশাখ ১৩৪৪ তারিখে আলমোড়ায় তাঁর রচিত যে কবিতা পাঠান, তার উত্তরে এই কবিতা।
৮২	চিত্রলিপি ১, চিত্র ১৮।
৮৩	'ছন্দ' গ্রন্থ।
৮৪	*Chitralipi 1*, চিত্র ১৪।
৮৮	*Chitralipi 1*, চিত্র ৫।
৯৩	শিশুদের উদ্দেশে রচিত, 'মৌচাক' পত্রে প্রকাশিত।
৯৪	'ছন্দ' গ্রন্থ।
৯৫	পাণ্ডুলিপি, ২৪৮-সংখ্যক।
৯৮	আনন্দবাজার পত্রিকা।
৯৯	*Fireflies* গ্রন্থে অনুবাদ, p. 141।
১০৪	নিজের আঁকা ছবি প্রসঙ্গে। রচনাকাল ১৪ মার্চ ১৯৩৮। দ্রষ্টব্য, বিশ্বভারতী পত্রিকা, বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৮০, পৃ ২৭৫।
১০৬	পাণ্ডুলিপি, ৩৭৫-সংখ্যক।
১০৯	পাণ্ডুলিপি, ১৯।
১১০	প্রবাসী, অগ্রহায়ণ ১৩৪৩। প্রভাতচন্দ্র গুপ্ত -রচিত রবিচ্ছবি (১৩৬৮) দ্রষ্টব্য।
১১১	'ছন্দ' গ্রন্থ।
১১২	'নববর্ষ-মঙ্গল' শিরোনামে দেবালয় পত্রিকার বৈশাখ ১৩১৬ সংখ্যায় প্রকাশিত। পাঠান্তর, ৩৫১-সংখ্যক পাণ্ডুলিপিতে।
১১৩	পাণ্ডুলিপি, ২৪৮-সংখ্যক। *Fireflies* গ্রন্থে অনুবাদ, p. 38।
১১৬	পাণ্ডুলিপি, ২৪৮-সংখ্যক।
১১৭	পাঠান্তর, রবীন্দ্রবীক্ষা ৪ -ধৃত "চিত্রলিপি", সংখ্যা ২।
১২৩	বিশ্বভারতী পত্রিকা, বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৮০।
১২৭	তুলনীয়, ২৪৮-সংখ্যক পাণ্ডুলিপি-ধৃত পাঠ।
১২৮	বিশ্বভারতী পত্রিকা, বৈশাখ-আষাঢ় ১৮৮২ শক, কবিতা সংখ্যা ৫। তুলনীয়, *Fireflies* ও লেখন-ধৃত পাঠ।
১২৯	পাণ্ডুলিপি, ৮-সংখ্যক।

স্ফুলিঙ্গ-নামধেয় আরো ৭৩টি বিশেষত বিভিন্ন ব্যক্তিবর্গের উদ্দেশে রচিত কবিতা তথ্যাদিসহ রচনাবলী একত্রিংশ খণ্ডে (সুলভ অষ্টাদশ খণ্ডে) সংকলিত হইয়াছে।

চিত্রবিচিত্র

'চিত্রবিচিত্র' সংকলন-গ্রন্থের প্রথম প্রকাশ, শ্রাবণ ১৩৬১ সালে। ভাদ্র ১৩৬২ সালে এই গ্রন্থের যে সংস্করণ হয়, এখন পর্যন্ত তাহাই প্রচলিত। সহজ পাঠ, প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগের কবিতা লইয়া এই

সংকলনের সূচনা। এ ছাড়া, কোনো গ্রন্থে অসংকলিত কিছু কবিতাও (এরূপ রচনার সংখ্যা বারোটি) এই গ্রন্থে সমাহৃত। চিত্রবিচিত্র হইতে যে কয়টি কবিতা বর্তমান খণ্ডে সংকলিত সেগুলি সম্পর্কে তথ্যাদি নিম্নরূপ—

শীত। অঘ্রাণ হ'ল সারা। বিশ্বভারতী পত্রিকা, বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৫১
ঝোড়ো রাত। ঢেউ উঠেছে জলে। বিশ্বভারতী পত্রিকা, বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৫১
পৌষ-মেলা। শীতের দিনে নামল বাদল। বিশ্বভারতী পত্রিকা, বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৫১
উৎসব। দুন্দুভি বেজে ওঠে। পাঠপ্রচয়, দ্বিতীয় ভাগ। প্রকাশ ১৩৩৬ বঙ্গাব্দ।
ফাল্গুন। ফাল্গুনে বিকশিত কাঞ্চন ফুল। পাঠপ্রচয়, তৃতীয় ভাগ। প্রকাশ, চৈত্র ১৩৩৬ বঙ্গাব্দ।
তপস্যা। সূর্য চলেন ধীরে। পাঠপ্রচয়, চতুর্থ ভাগ। প্রকাশ, মাঘ, চৈত্র? ১৩৩৬ বঙ্গাব্দ।
উড়ো জাহাজ। ওরে যন্ত্রের পাখি। সন্দেশ, বৈশাখ ১৩৩৮
ছবি আঁকিয়ে। ছেঁড়াখোঁড়া মোর। বিশ্বভারতী পত্রিকা, কার্তিক-পৌষ ১৩৫১
চিত্রকূট। একটুখানি জায়গা ছিল। বিশ্বভারতী পত্রিকা, শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৫২
চলন্ত কলিকাতা। ইঁটের টোপর মাথায় পরা। বিশ্বভারতী পত্রিকা, শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৫১
হনুচরিত। হনু বলে, তুলব আমি গন্ধমাদন। বিশ্বভারতী পত্রিকা, কার্তিক-পৌষ ১৩৫১
পাঙ্চুয়াল। গতকাল পাঁচটায়। রংমশাল, আশ্বিন ১৩৪৫। রবীন্দ্রহস্তাক্ষরে মুদ্রিত।

রূপান্তর

সংস্কৃত, পালি, প্রাকৃত তথা ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষা হইতে অনূদিত বা রূপান্তরিত রবীন্দ্রনাথের প্রকীর্ণ কবিতাবলী মূল-সহ 'রূপান্তর' নামে সংকলিত হয়েই গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়, ২৫ বৈশাখ ১৩৭২ বঙ্গাব্দে। অষ্টাবিংশ খণ্ড রচনাবলীতে 'রূপান্তর' স্বতন্ত্র গ্রন্থের সকল অনুবাদ যে পারম্পর্যে বিন্যস্ত ও মুদ্রিত হইয়াছিল, সেই অনুক্রমেই সংকলিত হইয়াছিল। বর্তমান সুলভ সংস্করণে বিভিন্ন বিভাগের মূল এবং তাহাদের অনুবাদ ধারাবাহিক ভাবে মুদ্রিত হইয়াছে। অনুবাদ-সম্পর্কিত তথ্যাদির সংক্ষিপ্ত রূপ বর্তমান রচনাবলীতে মুদ্রিত হইল, বিস্তারিত তথ্যাদির জন্য স্বতন্ত্র গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

বেদ : সংহিতা ও উপনিষৎ

বিশ্বভারতী পত্রিকার শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৫০ -সংখ্যায় ক্ষিতিমোহন সেন রবীন্দ্রনাথ-কৃত অনুবাদ প্রথম এগারোটি প্রকাশ করিয়াছিলেন। অনুবাদের ইতিহাসটি তিনি পত্রিকার উক্ত সংখ্যাতেই 'রবীন্দ্রনাথের বেদমন্ত্রানুবাদ' প্রবন্ধে বিবৃত করেন।

১৯০৮ খৃস্টাব্দের পূর্বে রবীন্দ্রনাথ যে-সমস্ত সংস্কৃত মন্ত্রাদির বঙ্গানুবাদ করেন, ক্ষিতিমোহন জানাইয়াছেন, সেগুলির কোনো সন্ধান পাওয়া যায় নাই। ব্যতিক্রম, একটি অনুবাদ 'আত্মদা বলদা যিনি', ১৮৯৪ খৃস্টাব্দের ফাল্গুন মাসে তত্ত্ববোধিনীতে প্রকাশিত হয়।

পরবর্তীকালে দু দফায় আরো কিছু অনুবাদ করা হইলেও ক্ষিতিমোহনের পক্ষে সমস্ত অনুবাদ সংগ্রহ সম্ভব হয় নাই। যে-অনুবাদগুলিকে তিনি দ্বিতীয় কিস্তির অনুবাদ বলিয়াছেন, ১৯০৯ সালে অগ্রহায়ণ মাসের শেষার্ধে যা অনূদিত বলিয়া ধরা চলে, সেই 'দ্বিতীয় কিস্তির অনুবাদ কয়টিই

সকলের সম্মুখে উপস্থিত করিতেছি'— ক্ষিতিমোহনের সাক্ষ্য অনুযায়ী সেই অনুবাদগুলি (১১টি অনুবাদ) 'রূপান্তরে'র সূচনায় গ্রথিত হইয়াছে। এখানে উল্লেখ করা চলে যে, গীতাঞ্জলির পাণ্ডুলিপির কোনো কোনো পৃষ্ঠায় রবীন্দ্রনাথ এই অনুবাদগুলি করিয়া রাখিয়াছিলেন।

পূর্বোল্লিখিত এগারোটি অনুবাদ ও সেগুলির উৎসনির্দেশ নিম্নরূপ :

তুমি আমাদের পিতা।	শুক্লযজুর্বেদ বাজসনেয়ি সংহিতার বিভিন্ন অধ্যায় হইতে সংগৃহীত।
যিনি অগ্নিতে যিনি জলে।	শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্।
যাঁ হতে বাহিরে ছড়ায়ে পড়িছে।	শুক্লযজুর্বেদ এবং ঋগ্বেদ হইতে সংকলিত গায়ত্রী মন্ত্র।
সত্যরূপেতে আছেন সকল ঠাঁই।	তৈত্তিরীয়, মুণ্ডক উপনিষদ্।
আপনারে দেন যিনি।	ঋগ্বেদ। বিভিন্ন স্থল হইতে সংগৃহীত।
যদি ঝড়ের মেঘের মতো আমি ধাই।	ঋগ্বেদ। সপ্তম মণ্ডল।
হে বরুণদেব।	ঋগ্বেদ। সপ্তম মণ্ডল।
হে বরুণ, তুমি দূর করো হে।	ঋগ্বেদ। দ্বিতীয় মণ্ডল।
সকল ঈশ্বরের পরমেশ্বর।	শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্। চতুর্থ ও ষষ্ঠ অধ্যায়।
শুভ্র কায়াহীন নির্বিকার।	ঈশোপনিষদ্।
অন্তরীক্ষ আমাদের হউক অভয়।	অথর্ববেদ।

আত্মদা বলদা যিনি। পাঠান্তর ৫। পৃ ৯৩। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার ১৮১৫ শক (১৮৯৪ খৃ.), ফাল্গুন সংখ্যায় বিনা নামে প্রকাশিত হইলেও সূচীপত্রে রবীন্দ্রনাথের নাম আছে।

শোনো বিশ্বজন। পৃ ৯৯। নৈবেদ্য কাব্যের ৬০-সংখ্যক কবিতার অংশ।

সত্যকাম জাবাল। পৃ ৯৯। ছান্দোগ্য উপনিষদের সত্যকাম-কাহিনী অবলম্বনে লিখিত। চিত্রা কাব্যের 'ব্রাহ্মণ' কবিতার উল্লেখ আছে ক্ষিতিমোহনের প্রবন্ধে। রবীন্দ্রনাথ পরবর্তীকালে এই কাহিনীর অংশবিশেষের যে অনুবাদ করেন, তা বিশ্বভারতী পত্রিকার শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৬৯ সংখ্যায় (ছন্দ-কণিকা ১২) প্রকাশিত হয়। এখানে সেই অনুবাদটি সংকলিত হইল।

ফুল্লশাখা যেমন মধুমতী। পৃ ১০০। নৃত্যনাট্য চিত্রাঙ্গদা হইতে ১৪, ১৫, ১৬ -সংখ্যক অনুবাদ গৃহীত। মূল আছে অথর্ববেদে।

যেমন আমি সর্বসহা শক্তিমতী। পৃ ১০১। পাণ্ডুলিপি হইতে গৃহীত ; সম্ভবত 'চিত্রাঙ্গদা'র জন্য রচিত।

ধম্মপদ

সংকলিত কবিতাগুলি বিশ্বভারতী পত্রিকার শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৫৫ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। এর অংশবিশেষ, ১৩৫১ সালের শারদীয়া আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত। সেখান হইতে জানা যায়, চারুচন্দ্র বসু -সম্পাদিত 'ধম্মপদ' গ্রন্থের গদ্যানুবাদ প্রকাশিত হইলে রবীন্দ্রনাথ 'বঙ্গদর্শন' পত্রে (১৩১২) গ্রন্থটির প্রশংসা করেন। সম্ভবত এই সময়েই, ওই গ্রন্থের মার্জিনে রবীন্দ্রনাথ কিছু অনুবাদও করিয়া রাখেন। এই অনুবাদগুলির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন শ্রীনির্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় চৈত্র ১৩৪৯ প্রবাসী পত্রিকায়। এর পর সমীরচন্দ্র মজুমদারের সহযোগিতায় অনুবাদগুলির উদ্ধার করা সম্ভব হয়। শান্তিনিকেতন রবীন্দ্রভবনে মূল পাণ্ডুলিপি রক্ষিত আছে।

মহাভারত। মনুসংহিতা

মারিতে মারিতে কহিবে মিষ্ট। পৃ ১১২। 'সাহিত্য-প্রসঙ্গে', বঙ্গদর্শন, বৈশাখ ১৩০৮

সুখ বা হোক দুঃখ বা হোক। পৃ ১১২। চিঠিপত্র ১৩। মহাভারতের 'সুখং বা যদি বা দুঃখং' শ্লোকটি রবীন্দ্রনাথ চিঠিপত্রে প্রায়ই ব্যবহার করিয়াছেন দেখা যায়। দ্র চিঠিপত্র ১/১৬, ৪/৩৪, ৭/৩, ৮/১১৫ এবং ছিন্নপত্রাবলী ২১৫।

গাভী দুহিলেই দুগ্ধ পাই তো সদ্যই। পৃ ১১৩। বিধুশেখর শাস্ত্রীর অনুরোধক্রমে অনূদিত। 'ধর্মস্তম্ভ' নামে পুস্তিকায় (১৩৪৬) প্রথম প্রকাশিত। বিশ্বভারতী পত্রিকা বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৬০ সংখ্যায় 'ধর্মলিপি' নামে পুনর্মুদ্রিত।

কালিদাস

কুমারসম্ভব। মদনদহন। পৃ ১১৭-১২০। 'জীবনস্মৃতি' গ্রন্থের 'ঘরের পড়া' অধ্যায় দ্রষ্টব্য। আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশের পুত্র জ্ঞানচন্দ্র ভট্টাচার্য গৃহশিক্ষকরূপে যখন রবীন্দ্রনাথকে 'বাংলায় অর্থ করিয়া কুমারসম্ভব' পড়াইতে আরম্ভ করেন, তাহার ফলে এই কাব্যের তিনটি সর্গ আগাগোড়া রবীন্দ্রনাথের মুখস্থ হইয়া যায়। এরই পরিণতিতে রবীন্দ্রনাথ বাল্যকালে 'কুমারসম্ভব' কাব্যের আংশিক অনুবাদ করেন। এই প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য, প্রবোধচন্দ্র সেন -লিখিত 'রবীন্দ্রনাথের বাল্যরচনা', বিশ্বভারতী পত্রিকা, বৈশাখ ১৩৫০।

সংকলিত পাঠ সম্পর্কে বলা প্রয়োজন, মালতী পুঁথি হইতে ইহা সংকলিত। অন্যের-কৃত যোগ-বিয়োগ গ্রহণ করা হয় নাই, রবীন্দ্রনাথ নিজে যাহা বর্জন করিয়াছেন বলিয়া মনে হয়, সেইগুলি গৃহীত হয় নাই। জীর্ণতার কারণে অনেক জায়গায় পাঠোদ্ধার সম্ভব হয় নাই, কোনো কোনো জায়গায় [ ] বন্ধনীযোগে অনুমিত পাঠ দেওয়া হইয়াছে।

উত্তর দিগন্তব্যাপী। পৃ ১২০। 'ছন্দ' গ্রন্থের 'ছন্দের মাত্রা' প্রবন্ধ হইতে গৃহীত।

রঘুবংশ। বাক্য আর অর্থ। পৃ ১২১। প্রথম সর্গের ১-১০ শ্লোকের অনুবাদ সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর -সংকলিত 'নবরত্নমালা' (১৩১৪) গ্রন্থে বিনা স্বাক্ষরে প্রকাশিত হয়।

পৃ ১২৪, ১২৫। 'মনেও আনি নি তব অপ্রিয় কভু' হইতে 'ও মুখে অলক দোলে যে', 'শর্বরী পুন ফিরে পায় শশধরে' এবং 'সমসুখদুখ তব সঙ্গিনীজন' হইতে 'তোমা বিনা আজ রাজসম্পদ ধনে'— রবীন্দ্রনাথ-সম্পাদিত ১৩১২ পৌষ সংখ্যা বঙ্গদর্শনে রঘুবংশ অষ্টম সর্গের ৫২-৫৬, ৬৫-৬৭ ও ৬৯-সংখ্যক শ্লোকের এই অনুবাদ 'অজবিলাপ' নামে প্রকাশিত হয়। স্বাক্ষরহীন এই রচনা রবীন্দ্রনাথের হওয়াই স্বাভাবিক। শ্রীজগদীশ ভট্টাচার্যের প্রবন্ধ 'নব-রত্নমালায় রবীন্দ্রনাথের কবিতা'য় (প্রবাসী, ভাদ্র ১৩৪৫। গ্রন্থাকারে 'রবীন্দ্র-সান্নিধ্যে' ১৩৯৮) এগুলি রবীন্দ্ররচনারূপে নির্দিষ্ট করা হইয়াছে।

বহু অপরাধে তবুও আমার 'পর। শয়ন রচিত হত পল্লবে নব। এ মেখলা তব প্রথমা রহঃসখী॥ রঘুবংশ অষ্টম সর্গের ৪৮, ৫৭, ৫৮ -সংখ্যক শ্লোকের এই অনুবাদ শ্রীজগদীশ ভট্টাচার্য -সম্পাদিত 'বৈজয়ন্তী' পত্রিকার ১৩৪৬ অগ্রহায়ণ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়, পূর্বোল্লিখিত অনুবাদগুলিও ওইসঙ্গে পুনর্মুদ্রিত হয়।

৫৫-সংখ্যক শ্লোকের দ্বিতীয় রূপান্তর 'অলক তোমার কভু' পাণ্ডুলিপি হইতে গৃহীত।

মেঘদূত। পৃ ১২৬। প্রথম অনুবাদ, 'যক্ষ সে কোনো জনা', ছন্দ গ্রন্থের 'ছন্দের মাত্রা' প্রবন্ধ হইতে গৃহীত। প্রথম শ্লোকের আর যে-দুইটি অনুবাদ প্রকাশিত হইল, তার প্রথমটি, 'অভাগা যক্ষ যবে' (পৃ ১২৬), উদয়ন পত্রিকায় ১৩৪০ জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় প্রকাশিত। দ্রষ্টব্য, রবীন্দ্র-রচনাবলী, একবিংশ খণ্ড (সুলভ সংস্করণ একাদশ খণ্ড)।

পৃ ১২৭ 'কোনো এক যক্ষ সে'। বিশ্বভারতী পত্রিকা, শ্রাবণ-আশ্বিন, ১৩৬৯ -সংখ্যায় প্রকাশিত 'ছন্দ-কণিকা'য় ও ছন্দ গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণে (১৯৬২) মুদ্রিত।

অভিজ্ঞানশকুন্তল। পৃ ১২৭ থেকে ১৩১। ১-১০ সংখ্যক অনুবাদ প্রসঙ্গে জ্ঞাতব্য এই— ১, ৩, ৫, ৭, ৮, ১০-সংখ্যক 'প্রাচীন সাহিত্য' গ্রন্থের 'শকুন্তলা' প্রবন্ধ হইতে গৃহীত। ২ ও ৯ -সংখ্যক কবিতার অনুবাদ 'বৈজয়ন্তী' পত্রিকার ১৩৪৬ পৌষ সংখ্যা হইতে গৃহীত। শ্লোকগুলি 'নবরত্নমালা'তেও আছে।

২-সংখ্যক অনুবাদের আর-একটি রূপ 'কমল শেয়ালা-মাখা' নবরত্নমালায় প্রকাশিত।

৪-সংখ্যক অনুবাদ 'শরীর সে ধীরে ধীরে যাইতেছে আগে' (পৃ ১২৯), ভারতী পত্রিকায় ১২৮৪ মাঘ -সংখ্যায় 'সম্পাদকের বৈঠক' বিভাগে 'বিচ্ছেদ' নামে প্রকাশিত। সজনীকান্ত দাস এই অনুবাদটি রবীন্দ্রনাথের বলিয়া চিহ্নিত করেন। দ্রষ্টব্য, 'রবীন্দ্র-রচনাপঞ্জী', শনিবারের চিঠি, অগ্রহায়ণ ১৩৪৬। মালতী পুঁথিতে এই অনুবাদ পাওয়া গিয়াছে।

৬-সংখ্যক অনুবাদ, 'মাঝে মাঝে পদ্মবনে' পৃ ১৩০, মানসী, প্রথম বর্ষ প্রথম সংখ্যায় (ফাল্গুন ১৩১৫) প্রকাশিত হয়।

প্রসঙ্গক্রমে এখানে উল্লেখ করা যায়, অভিজ্ঞানশকুন্তলা সম্বন্ধে গ্যেটের উক্তির ভাবানুবাদ রবীন্দ্রনাথ 'শকুন্তলা' প্রবন্ধে করেন এবং এক সময় গ্যেটের উক্তির ইস্টউইক-কৃত ইংরেজি রূপের কাব্যরূপও তিনি করেছিলেন। 'নবরত্নমালা' গ্রন্থে এই অনুবাদ '(র)' স্বাক্ষরে মুদ্রিত— 'নব বৎসরের কুঁড়ি— তারি এক পাতে...' ইত্যাদি চারটি ছত্রে।

মালবিকাগ্নিমিত্র। নেপথ্যপরিগত প্রিয়া সে। পৃ ১৩১। রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত পাণ্ডুলিপি হইতে গৃহীত।

ভবভূতি

কী জানি মিলিতে পারে মম সমতুল। পৃ ১৩২। পাণ্ডুলিপি হইতে প্রাপ্ত। দ্রষ্টব্য, কানাই সামন্ত, 'রবীন্দ্রপ্রতিভা' গ্রন্থ, পৃ ৪০৮। 'ঠাকুরদা' গল্পে (গল্পগুচ্ছ, ১৯৫৮, পৃ ৩০২) এর স্বতন্ত্র একটি অনুবাদ মুদ্রিত আছে : 'কী জানি জন্মিতে পারে মম সমতুল—/অসীম সময় আছে, বসুধা বিপুল।'

অর্থ পরে বাক্য সরে। পৃ ১৩২। 'নবরত্নমালা'য় বিনা স্বাক্ষরে প্রকাশিত।

কিছুই করে না, শুধু /সখ্য দিয়ে হরে দুঃখগ্লানি। পৃ ১৩২। বৈজয়ন্তী পত্রিকায় ১৩৪৬ পৌষ -সংখ্যায় প্রকাশিত।

ভট্টনারায়ণ-বররুচি প্রমুখ কবিগণ

প্রথম শ্লোক ও শেষ দুটি শ্লোক (৩৩, ৩৪-সংখ্যক) ছাড়া সমস্তই 'শ্রীডাক্তার যোহনহেবর্-লিন কর্তৃক সমাহৃত' 'কাব্যসংগ্রহঃ' এবং পরবর্তীকালের 'সুভাষিতরত্নভাণ্ডাগারম্' এই আধারগ্রন্থে

পাওয়া যায়। কবিতার পাঠ, কবি ও কাব্যের নির্ধারণের জন্য উল্লিখিত দুটি গ্রন্থের উপর বিশেষ নির্ভর করা হইয়াছে; এজন্য 'সুভাষিতরত্নভাণ্ডাগারম্' গ্রন্থের ১৯৫২ সংস্করণের সাহায্য লওয়া হইয়াছে।

যেমন তেমন হোক মোর জাত। পৃ ১৩৩। রমা দেবীকে লিখিত চিঠির (১ সেপ্টেম্বর ১৯৩৩) অন্তর্গত। 'মোটামুটি অনুবাদ' এরূপ মন্তব্য দেখা যায়।

চতুরানন পাপের ফল। পৃ ১৩৩। বঙ্গদর্শন পত্রিকার ১৩০৯ আশ্বিন সংখ্যায় প্রকাশিত 'বাজে কথা' প্রবন্ধের (দ্র. 'বিচিত্র প্রবন্ধ') অন্তর্গত। পাঠান্তর, 'বিধি হে, যত তাপ মোর দিকে', সাহিত্যের পথে গ্রন্থের 'তথ্য ও সত্য' (প্রকাশ, বঙ্গবাণী, ভাদ্র ১৩৩১) প্রবন্ধের অন্তর্গত।

ভালোই করেছ পিক। পৃ ১৩৪। নবরত্নমালা গ্রন্থে বিনা স্বাক্ষরে প্রকাশিত। বৈজয়ন্তী, পৌষ ১৩৪৬ -সংখ্যায় পুনর্মুদ্রিত।

কাক কালো পিক কালো। পৃ ১৩৪। প্রথম অনুবাদ, ১৩৪৭ পৌষ সংখ্যা বৈজয়ন্তী পত্রিকায় প্রকাশিত। পাঠান্তরটি পাওয়া যায় রবীন্দ্রভবনের একটি পাণ্ডুলিপিতে। প্রসঙ্গত স্মরণীয় যে 'কাকঃ কাকঃ পিকঃ পিকঃ' নামে একটি কবিতাই আছে 'কণিকা' (১৯০০) কাব্যগ্রন্থে।

সোনা দিয়ে বাঁধা হোক। পৃ ১৩৫। 'য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র' গ্রন্থের পঞ্চম পত্রে প্রকাশিত।

উদ্যোগী পুরুষসিংহ, তারি 'পরে জানি। পৃ ১৩৫। 'নবরত্নমালা'য় বিনা স্বাক্ষরে প্রকাশিত। 'সফলতার সদুপায়' প্রবন্ধে ঈষৎ পরিবর্তিত অপর একটি পাঠ পাওয়া যায়।

দ্বিতীয় অনুবাদ, 'সেই তো পুরুষসিংহে', পৃ ১৩৬, শান্তিনিকেতন পত্রিকা ১৩৩২ কার্তিক সংখ্যায় প্রকাশিত।

তৃতীয় অনুবাদ, 'লক্ষ্মী সে পুরুষসিংহে', পৃ ১৩৬, পাণ্ডুলিপি হইতে সংগৃহীত।

চতুর্থ অনুবাদ, 'উদ্যোগী পুরুষ বলবান্', পৃ ১৩৬, 'বুধবার' পত্রিকা ৫ পৌষ ১৩২৯ সংখ্যায় প্রকাশিত।

গর্জিছ মেঘ, নাহি বর্ষিছ জল। উঠে যদি ভানু পশ্চিম দিকে। সত্যের বচন লীলায় কথিত। পৃ ১৩৭-১৩৮, নবরত্নমালা গ্রন্থে বিনা স্বাক্ষরে প্রকাশিত।

প্রায় কাজে নাহি লাগে। পৃ ১৩৭, পাণ্ডুলিপি হইতে গৃহীত।

নীতিবিশারদ যদি করে নিন্দা। নীতিজ্ঞ বলুন ভালো। পৃ ১৩৮, ১৩৯, পাণ্ডুলিপি হইতে গৃহীত। শেষেরটি সামান্য পাঠান্তরসহ গীতা রায়ের স্বাক্ষরপুস্তক হইতে ১৩৪৩ অগ্রহায়ণ সংখ্যা প্রবাসীতে, প্রভাতচন্দ্র গুপ্তর 'রবীন্দ্রনাথের অপ্রকাশিত লেখন' প্রবন্ধে মুদ্রিত হয়।

নীতিজ্ঞ করুক নিন্দা। পৃ ১৩৮, অনুবাদটি ১৩১২ আষাঢ় সংখ্যা ভারতীতে প্রকাশিত হয়। সামান্য পাঠান্তরসহ 'নবরত্নমালা'য় '(র)' স্বাক্ষরে সংকলিত। অপর একটি পাঠান্তর, হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রবাসী ১৩৪৮ ফাল্গুন সংখ্যায় 'সংস্কৃত শ্লোকদ্বয়ের বঙ্গানুবাদ' শিরোনামে প্রকাশ করেন। রবীন্দ্রভবন অভিলেখাগারে রক্ষিত যোহান হেবর্‌লিনের কাব্যসংগ্রহের দুটি পাতায় রবীন্দ্রনাথের হস্তাক্ষরে পাওয়া যায়।

আরম্ভে দেখায় গুরু। পৃ ১৩৯। 'নবরত্নমালা'য় বিনা স্বাক্ষরে প্রকাশিত।

যাঁর তাপে বিধি বিষ্ণু। পৃ ১৩৯। দ্রষ্টব্য, 'সংস্কৃত শ্লোকদ্বয়ের বঙ্গানুবাদ', হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রবাসী, ফাল্গুন ১৩৪৮। হেবর্‌লিনের কাব্যসংগ্রহে রবীন্দ্র-হস্তাক্ষরে পাওয়া যায়।

নারীর বচনে মধু। পৃ ১৪০। রাজা ও রানী নাটকে দেবদত্তের উক্তি।

যত চিন্তা কর শাস্ত্র। পৃ ১৪০। রাজা ও রানী নাটকে দেবদত্তের উক্তি।

যে পদ্মে লক্ষ্মীর বাস। শৃঙ্খল বাঁধিয়া রাখে। পৃ ১৪০, ১৪১। ফাল্গুনী নাট্যকাব্যের 'বৈরাগ্যসাধন' মুখবন্ধে শ্রুতিভূষণের উক্তি।

অম্বর অম্বুদে স্নিগ্ধ। মেঘলা গগন, তমাল কানন। পৃ ১৪১। দুটি অনুবাদই নরেন্দ্র দেবকে ২৯ আশ্বিন ১৩৩৬ তারিখে লিখিত একটি চিঠির অন্তর্গত।

কাঁপিলে পাতা নড়িলে পাখি। বচন যদি কহ গো দুটি। পৃ ১৪১, ১৪২। সবুজপত্র ১৩২১ শ্রাবণ-সংখ্যায় 'বাংলা ছন্দ' নামে প্রকাশিত জে. ডি. অ্যান্ডারসনকে লিখিত চিঠিতে মুদ্রিত।

কুঞ্জকুটিরের স্নিগ্ধ অলিন্দের 'পর। কুঞ্জ পথে-পথে চাঁদ উঁকি দেয় আসি। আসে তো আসুক রাতি। ধীরে ধীরে চলো তন্বী। চক্ষু'পরে মৃগাক্ষীর। আনতাঙ্গী বালিকার। বিঁধিয়া দিয়া আঁখিবাণে। হরিণগর্বমোচন লোচনে। সে গাম্ভীর্য গেল কোথা। পৃ ১৪২, ১৪৩, ১৪৪, ১৪৫। এই নয়টি অনুবাদ 'প্রজাপতির নির্বন্ধ' তথা 'চিরকুমার-সভা' হইতে সংকলিত। প্রথমটির (২১-সংখ্যক) পাঠান্তর কানাই সামন্ত 'রবীন্দ্রপ্রতিভার নেপথ্যভূমি' প্রবন্ধে প্রকাশ করিয়াছেন। 'আনতাঙ্গী বালিকার' প্রসঙ্গে 'চিরকুমার-সভা', প্রথম দৃশ্য চতুর্থ অঙ্কের অন্তর্গত পূর্ণ ও রসিকের সংলাপ কৌতূহলজনক (প্রিয়চক্ষু দেখাদেখি। যে আনন্দ, তাই সে কি/খুঁজিছে চঞ্চল?)।

ভ্রমর একদা ছিল। পৃ ১৪৬। বনবাণী গ্রন্থে 'কুরচি' কবিতার ভূমিকা হইতে গৃহীত।

অসম্ভাব্য না কহিবে। প্রিয়বাক্যসহ দান। জলেতে কমল, জল কমলে। এক হাতে তালি নাহি বাজে। পৃ ১৪৬, ১৪৭। সব কটি কবিতা 'নবরত্নমালা'য় বিনা স্বাক্ষরে প্রকাশিত। শ্রীজগদীশ ভট্টাচার্যের পূর্ব-উল্লিখিত প্রবন্ধে রবীন্দ্ররচনা হিসাবে চিহ্নিত।

পালি-প্রাকৃত কবিতা

স্বর্ণবর্ণে-সমুজ্জ্বল। পৃ ১৪৯। নৃত্যনাট্য চণ্ডালিকায় বৌদ্ধনারীদের গান।

বৃষ্টিধারা শ্রাবণে ঝরে গগনে। অবিরল ঝরছে শ্রাবণের ধারা। পৃ ১৪৯, ১৫০। 'ছন্দ' গ্রন্থের অন্তর্গত 'গদ্যছন্দ' প্রবন্ধ হইতে গৃহীত।

মরাঠী : তুকারাম

ভারতী পত্রিকায় ১২৮৫ বঙ্গাব্দে সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহারাষ্ট্রীয় সাধু ও কবি তুকারামের জীবনী পর্যালোচনা করেন, সেখানে তুকারামের অনেকগুলি অভঙ্গের অনুবাদও প্রকাশিত হয়। অনুবাদগুলি পরে 'নবরত্নমালা'য় সংকলিত। এই অনুবাদের কতকগুলি যে রবীন্দ্রনাথ-কৃত তা শ্রীজগদীশ ভট্টাচার্যের প্রবন্ধ হইতে জানা যায়। রবীন্দ্রনাথ এইরূপ সাতটি অভঙ্গের অনুবাদ (৪-১০ -সংখ্যক কবিতা) নিজের বলিয়া চিহ্নিত করিয়া দিয়াছিলেন। বর্তমান রচনাবলীতে সংকলিত ১-১২ সংখ্যার সব কবিতাই 'নবরত্নমালা'য় আছে।

মালতী পুঁথিতে উল্লিখিত সাতটি ছাড়া আরো আটটি অনুবাদ পাওয়া গিয়াছে। সমস্ত অনুবাদই এখানে সংকলিত হইল। প্রাসঙ্গিক কোনো কোনো তথ্য বর্তমান খণ্ডের ১৫৯ পৃষ্ঠায় দেওয়া হইয়াছে।

রবীন্দ্রনাথ এই অভঙ্গগুলির কোনো ইংরেজি অনুবাদ অবলম্বনে বাংলা ভাবান্তর করিয়াছিলেন, এমনও হইতে পারে।

হিন্দি : মধ্যযুগ

গুরু, আমায় মুক্তিধনের। পৃ ১৬০। আংশিক অনুবাদ। সুর ও সঙ্গতি [১৯৩৫] গ্রন্থে মুদ্রিত। ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে ৬ জুলাই ১৯৩৫ তারিখে লিখিত পত্র হইতে লওয়া হইয়াছে। অপিচ দ্রষ্টব্য বর্তমান গ্রন্থ, পৃ ৬৪২।

চুড়াটি তোমার যে রঙে রাঙালে। পৃ ১৬১। প্রবাসী ১৩৪৬ আষাঢ় সংখ্যায় মুদ্রিত 'রূপশিল্প' প্রবন্ধ হইতে, এবং দ্বিতীয় অনুবাদ বা পাঠান্তর 'সাহিত্যের স্বরূপ' গ্রন্থের 'সাহিত্যের মূল্য' প্রবন্ধ হইতে গৃহীত। দুটিই আংশিক অনুবাদ।

শিখ ভজন

এ হরি সুন্দর। পৃ ১৬১। প্রবাসী ১৩২০ চৈত্র সংখ্যায় 'হিন্দি আরতি (অমৃতসরে গুরুদরবারে গীত)' শিরোনামে প্রকাশিত।

বাজে বাজে রম্যবীণা বাজে। পৃ ১৬২। ক্ষিতিমোহন সেনের নিকট হইতে রবীন্দ্রনাথ মূল ভজনটি পান। তাহা অবলম্বনে তিনি যে গান রচনা করেন, তার প্রথম স্তবকই ভজনের অনুগামী, গ্রন্থে সেই অংশটিই সংকলিত।

পরিশিষ্ট ১

মৈথিলী : বিদ্যাপতি

এই অনুবাদগুলি হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রবাসী পত্রিকায় ১৩৪৮ সালের অগ্রহায়ণ-ফাল্গুন সংখ্যায় প্রকাশ করেন। 'বঙ্গীয় শব্দকোষ' সংকলনকালে হরিচরণ Grierson-সংগৃহীত 'মৈথিল উৎকর্ষপদাবলী-সংগ্রহ' ও পদাবলীতে ব্যবহৃত মৈথিল শব্দমালা পড়ার সময় লক্ষ করিয়াছিলেন, 'রবীন্দ্রনাথ পূর্বে এ পদাবলী পড়িয়া পদাবলীর পাশে পাশে বাঙলায় গদ্যে ও পদ্যে অনেকগুলি পদের অনুবাদ করিয়াছিলেন। এই অনুবাদ সকল স্থলে সম্পূর্ণ পদের নাই— কোন পদের সম্পূর্ণ, কোন পদের আংশিক অনুবাদ আছে।'

উল্লিখিত সমস্ত অনুবাদই এখানে সংকলিত হইল। রবীন্দ্রনাথের অনুবাদ -সংবলিত ওই বইখানি (Grierson, George A., *An Introduction to the Maithili Language of North Bihar containing a Grammar, Chrestomathy & Vocabulary*, Part II, Asiatic Society, Calcutta, 1882) রবীন্দ্রভবন অভিলেখাগারে রক্ষিত আছে। রবীন্দ্রনাথের হস্তাক্ষরে এখানে তারিখ '১লা ফাল্গুন ১৮৮৪'।

পরিশিষ্ট ২

অনুমিত কবিতাবলী

তারকাকুসুমচয়/ছড়ায়ে আকাশময়। পৃ ১৯৫। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, মাঘ ১৭৯৮ শক। সজনীকান্ত দাস রবীন্দ্রনাথকে এই অনুবাদ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করায় তিনি জানাইয়াছিলেন, 'নিশ্চিত সাক্ষ্য দিতে পারেন না, তবে ভাষাটা যে তাঁহার সেকেলে ভাষারই মত, তাহা অস্বীকার করিতে পারেন না, তিনি লেখেন, সেকালে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় ঠিক এই জাতীয় 'কবিতা লিখিয়ে' আর কেহ ছিলেন না।'

—'রবীন্দ্র-রচনাপঞ্জী', শনিবারের চিঠি, মাঘ ১৩৪৬

গগনের থালে রবি চন্দ্র দীপক জ্বলে। পৃ ১৯৬। গুরু নানকের একটি ভজনের প্রথমাংশ। সজনীকান্ত 'রবীন্দ্র-রচনাপঞ্জী'তে গানটি সম্পর্কে লিখেছেন, ...'ব্রহ্মসঙ্গীত স্বরলিপি' (দ্বিতীয় ভাগ) পুস্তকে ইহা জ্যোতিরিন্দ্রনাথের নামে বাহির হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথ মনে করেন, এটি তাঁহার রচনা।' বিস্তারিত তথ্য : দ্র. 'রূপান্তর' স্বতন্ত্র গ্রন্থ।

সেদিন হেরিবে কবে এ মোর নয়ান। পৃ ১৯৬। শনিবারের চিঠি, অগ্রহায়ণ ১৩৬২-সংখ্যায় সজনীকান্ত দাস একটি বিবরণসহ এই অভঙ্গটির অনুবাদ প্রকাশ করেন। যে গ্রন্থ হইতে রবীন্দ্রনাথের হস্তাক্ষরে তিনি এটি শনাক্ত করেন সেই গ্রন্থের উল্লেখ না থাকিলেও 'হস্তাক্ষর নিঃসংশয়ে কিশোর রবীন্দ্রনাথের' এই মন্তব্য করিয়াছেন।

অনূদিত কবিতা

প্রভাতসংগীত, কড়ি ও কোমল, শিশু এই তিনটি কাব্যের প্রথম প্রকাশকালে রবীন্দ্রনাথ-অনূদিত যে-সমস্ত বিদেশি কবিতার রূপান্তর বা অনুবাদ স্থান পাইয়াছিল, পরবর্তীকালে সেগুলির অধিকাংশই বর্জিত হয়, দু-একটি ক্ষেত্রে স্থানান্তরিতও হয়। এই অনুবাদগুলির প্রধান অংশ ভারতী পত্রিকায় প্রকাশিত। রবীন্দ্রনাথ ভিক্টর হুগোর যে কবিতাগুলি অনুবাদ করিয়াছেন সেগুলি, ১৮৫৭ খৃস্টাব্দে প্রকাশিত হুগোর LES CONTEMPLATIONS কাব্যের দুটি খণ্ডের অন্তর্ভুক্ত। রবীন্দ্রভবন অভিলেখাগারে সংরক্ষিত রবীন্দ্রনাথের পঠিত এই কাব্যের দুটি খণ্ডের বিভিন্ন সাদা পৃষ্ঠায় রবীন্দ্র-হস্তাক্ষরে মূল বঙ্গানুবাদগুলি দেখা যায়।

বর্তমান খণ্ডে সংকলিত অনুবাদগুলি সম্পর্কে প্রাপ্ত তথ্যাদি নিম্নরূপ—

কবি। ওই যেতেছেন কবি। সম্পাদকের বৈঠক, ভারতী, আষাঢ় ১২৮৮। কবিতার শিরোনাম নাই। কবি, প্রভাতসংগীত (১২৯০)।

Victor Hugo, LES CONTEMPLATIONS (1857)

প্রথম ছত্র : Le Poëte Sén va dans les champs ; il admire

বিসর্জন। যে তোরে বাসে রে ভালো। সম্পাদকের বৈঠক, ভারতী, আষাঢ় ১২৮৮। পত্রিকায় শিরোনামহীন। প্রভাতসংগীত। শিশু

Victor Hugo, শিরোনাম : 15 FEVRIER 1843

প্রথম ছত্র : Aime celni qui t'aime, et Sois heureuse lui.

তারা ও আঁখি। কাল সন্ধ্যাকালে ধীরে। সম্পাদকের বৈঠক, ভারতী, আষাঢ় ১২৮৮, শিরোনামহীন। প্রভাতসংগীত (১২৯০) সূচিপত্রে, 'আঁখি ও তারা'।

Victor Hugo, শিরোনাম : HIER AU SOIR

প্রথম ছত্র : Hier, le vent du soir, dont le souffle caresse

সূর্য ও ফুল। মহীয়সী মহিমার আগ্নেয় কুসুম। সম্পাদকের বৈঠক, ভারতী, আষাঢ় ১২৮৮, শিরোনাম : 'তারা ও আঁখি'। প্রভাতসংগীত। শিশু

পাণ্ডুলিপি (LES CONTEMPLATIONS গ্রন্থে) শিরোনাম : সাম্য।

প্রথম ছত্রটির ভারতী ও প্রভাতসংগীত-ধৃত পাঠ একই প্রকার, কিন্তু শিশু (১৯০২) কাব্যে 'মহীয়সী মহিমার' স্থলে 'পরিপূর্ণ মহিমার'। আলোচনা (১৮৮৪) গ্রন্থে 'সুদূর ঐক্য' নামে কবিতাটি সংকলিত দেখা যায়।

Victor Hugo. শিরোনাম : UNITÉ

প্রথম ছত্র : Par dessus l'horizon aux Collins brunies

সম্মিলন। সেথায় কপোত-বধূ লতার আড়ালে। প্রভাতসংগীত।

P. B. Shelley (1792-1822). 'Epipsychidion' কবিতার শেষ ভাগ,

ছত্র ৫২৯-৫৯০ : The ring-dove. in the embowering ivy. yet. …

I pant. I sink. I tremble. I expire !

বিদেশী ফুলের গুচ্ছ :

মধুর সূর্যের আলো। ভারতী, শ্রাবণ ১২৯১। কড়ি ও কোমল (১২৯৩)

P. B. Shelley. Stanzas / written in Dejection. near Naples (1818)

প্রথম ছত্র : The Sun is warm. the Sky is clear…

সারাদিন গিয়েছিনু বনে। ভারতী, শ্রাবণ ১২৯১। কড়ি ও কোমল

Mrs. Browning.

I have been in the meadows all the Sky…

আমায় রেখো না ধরে আর। ভারতী, শ্রাবণ ১২৯১। কড়ি ও কোমল

Ernest James Myers (1844-1921)

প্রভাতে একটি দীর্ঘশ্বাস। ভারতী, শ্রাবণ ১২৯১। কড়ি ও কোমল

Aubrey Thomas De Vere (1814 -1902)

শিরোনাম : Nothing More

প্রথম ছত্র : A sigh in the morning grey

গোলাপ হাসিয়া বলে। ভারতী, শ্রাবণ ১২৯১। কড়ি ও কোমল

Augusta Webster (1837-1894)

এত শীঘ্র ফুটিলি কেন রে। ভারতী, শ্রাবণ ১২৯১। কড়ি ও কোমল

Augusta Webster

হাসির সময় বড়ো নেই। ভারতী, শ্রাবণ ১২৯১। কড়ি ও কোমল

Philip Bourke Marston (1850 -1887)

শিরোনাম : After

প্রথম ছত্র : A little time for Laughter

বেঁচেছিল হেসে হেসে। ভারতী, শ্রাবণ ১২৯১। কড়ি ও কোমল। শিশু, 'শিশুর মৃত্যু' শিরোনামে।

Victor Hugo.

শিরোনাম : EPITAPHE

প্রথম ছত্র : Il vivait, il jouait, rainte créature

নিদাঘের শেষ গোলাপ কুসুম। ভারতী, শ্রাবণ ১২৮৮। কড়ি ও কোমল

Thomas Moore, *Irish Melodies* (1846)
'Tis the Last Rose of the summer
ওই আদরের নামে ডেকো সখা মোরে। ভারতী, আষাঢ় ১২৮৮। কড়ি ও কোমল
E. B. Browning, প্রথম ছত্র : Yes, call me by my pet-name !
কেমনে কী হল পারি নে বলিতে। ভারতী, কার্তিক ১২৮৮। কড়ি ও কোমল
Christina G. Rossetti,
শিরোনাম : May
প্রথম ছত্র : I cannot tell you how it was
রবির কিরণ হতে আড়াল করিয়া রেখে। ভারতী, কার্তিক ১২৮৮। কড়ি ও কোমল
A. C. Swinburne,
শিরোনাম : A Ballad of Dreamland
প্রথম ছত্র : I hid my heart in a nest of roses
দেখিনু যে এক আশার স্বপন। ভারতী, কার্তিক ১২৮৮। কড়ি ও কোমল
Christina Rossetti,
শিরোনাম : Mirage
প্রথম ছত্র : The hope I dreamed of was a dream
নহে নহে এ নহে মরণ। কড়ি ও কোমল
Thomas Hood,
শিরোনাম : Sonnet
প্রথম ছত্র : It is not death, that sometimes…
কোনো জাপানি কবিতার ইংরাজি অনুবাদ। কড়ি ও কোমল

মালঞ্চ

রবীন্দ্র-রচনাবলী দ্বাদশ খণ্ডের (সুলভ সংস্করণ ষষ্ঠ খণ্ড) অন্তর্ভুক্ত হইয়া মালঞ্চ উপন্যাস প্রকাশিত হয় ১৩৪৯ বঙ্গাব্দে। উপন্যাসটিকে রবীন্দ্রনাথ নাটকে রূপান্তরিত করেছিলেন। সম্পূর্ণ নাটকটি সুধীরচন্দ্র করের হস্তাক্ষরে এবং রবীন্দ্রনাথ-কর্তৃক বহুস্থলে সংশোধিত, পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত আকারে তিনটি খাতায় রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত ছিল। সম্পূর্ণ নাটকটি বিস্তৃত টীকা-সহ অধ্যাপক অশোকবিজয় রাহা-সম্পাদিত রবীন্দ্রজিজ্ঞাসা দ্বিতীয় খণ্ডে (অগ্রহায়ণ ১৩৭৫ : নভেম্বর ১৯৬৮) প্রথম প্রকাশিত হয়। তথ্যানুসন্ধানী পাঠক-পাঠিকা রবীন্দ্রজিজ্ঞাসা-র উক্ত খণ্ডটি (পৃ ৬১-৯৮) দেখিয়া লইতে পারেন।

স্বতন্ত্র গ্রন্থাকারে মালঞ্চ নাটক প্রকাশিত হয় ১৩৮৬ বঙ্গাব্দে।

হাস্যকৌতুক

'হাস্যকৌতুক' রবীন্দ্র-রচনাবলীর ষষ্ঠ খণ্ডের (সুলভ সংস্করণ তৃতীয় খণ্ড) অন্তর্ভুক্ত হইয়া প্রকাশিত হয় ১৩৪৭ সালে। রচনাগুলি জ্যৈষ্ঠ ১২৯২ হইতে বৈশাখ ১২৯৪ পর্যন্ত, প্রথমে

'বালক' মাসিক পত্রে, পরে (১২৯৩ হইতে) 'ভারতী ও বালক' পত্রে 'হেঁয়ালিনাট্য' এই সাধারণ শিরোনামে মুদ্রিত হইয়াছিল। হাস্যকৌতুক গ্রন্থে ১২৯৪ বৈশাখের পরবর্তী কোনো রচনা সংকলিত না হইয়া থাকিলেও, 'ভারতী ও বালক' পত্রের ১২৯৪ আষাঢ়ে (পৃ ১৬১-৬৪) যে 'হেঁয়ালিনাট্য' প্রকাশিত হয়, বার্ষিক সূচীপত্রে তাহা রবীন্দ্রনাথের রচনা রূপেই নির্দেশ করা হইয়াছে। রবীন্দ্রশতবর্ষপূর্তি-বৎসরে হাস্যকৌতুক গ্রন্থের যে পরিবর্ধিত সংস্করণ প্রকাশিত হয় (অগ্রহায়ণ ১৩৬৮), সেখানে উক্ত 'হেঁয়ালিনাট্য'টি সংযোজিত হইয়াছিল। রবীন্দ্র-রচনাবলীর বর্তমান খণ্ডে রচনাটি অন্তর্ভুক্ত হইল।

বিসর্জন

বিসর্জন 'রাজর্ষি উপন্যাসের প্রথমাংশ হইতে নাট্যাকারে রচিত' ও ১২৯৭ (১৮৯০ খৃ.) সালে গ্রন্থাকারে প্রথম প্রকাশিত হয়। পরে রবীন্দ্রনাথ বিভিন্ন সংস্করণে নাটকটিতে বহু পরিবর্তন করেন।

অতঃপর ১৯৩৬ সালে শান্তিনিকেতনের ছাত্রগণ-কর্তৃক সহজে ও স্বল্পসময়ে অভিনয়ের সুবিধার জন্য তিনি নাটকটির অনেক অংশ বাদ দিয়া এবং নারীচরিত্র বর্জন করিয়া পরিবর্জনের চিহ্ন-সংবলিত কপিটি বিশ্বভারতীর তদানীন্তন অধ্যাপক কাননবিহারী মুখোপাধ্যায়কে অর্পণ করেন। সেই গ্রন্থটি অবলম্বনে ১৩৬৮ শ্রাবণে নাটকটির নারীচরিত্রবর্জিত সংক্ষিপ্ত সংস্করণ প্রকাশিত হয়। রবীন্দ্র-রচনাবলীর বর্তমান খণ্ডে এই পাঠ মুদ্রিত হইল।

মূল নাটক রবীন্দ্র-রচনাবলী দ্বিতীয় খণ্ডের (সুলভ সংস্করণ প্রথম খণ্ড) অন্তর্ভুক্ত।

ইঁদুরের ভোজ

গল্পসল্প ১৩৪৮ সালের বৈশাখ মাসে প্রথম প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থ প্রকাশের অনেক পরে এর অন্তর্গত গল্পগুলির তুল্য আর-একটি রচনা 'ইঁদুরের ভোজ' আবিষ্কৃত ও গল্পসল্পের স্বতন্ত্র সংস্করণের (১৩৭২) অন্তর্ভুক্ত হয়। গল্পটি রচনার সমকালে পৌত্রী নন্দিনী দেবীর নামে বঙ্গলক্ষ্মী (আষাঢ় ১৩৪৬। পৃ ৪৫০-৫১) পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। গ্রন্থে ও রবীন্দ্র-রচনাবলীর বর্তমান খণ্ডে সংকলিত পাঠ রবীন্দ্রভবনের রবীন্দ্রহস্তাক্ষর-ধৃত পাণ্ডুলিপি-অনুসারী।

শিক্ষা

শিক্ষা গদ্যগ্রন্থাবলীর চতুর্দশ ভাগ রূপে ১৩১৫ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হয়। রবীন্দ্র-রচনাবলীর দ্বাদশ খণ্ডে (সুলভ সংস্করণ ষষ্ঠ খণ্ড) এই গ্রন্থ অন্তর্ভুক্ত হয়, সেখানে ১৩১৫ সালের পূর্বে লিখিত শিক্ষাবিষয়ক অন্যান্য অনেকগুলি রচনা পরিশিষ্ট অংশে সংকলিত হইয়াছিল।

১৩৪২ শ্রাবণে 'শিক্ষা'র যে পরিবর্ধিত সংস্করণ প্রকাশিত হয় তাহাতে ১৩১৬-১৩৪২ সালে রচিত বা মুদ্রিত আরো পনেরোটি প্রবন্ধ ও পত্র (মূলগ্রন্থে ও পরিশিষ্টে) সংকলিত হইয়াছিল। ১৩৫১ চৈত্রে আরো কয়েকটি প্রবন্ধ পরিবর্ধিত সংস্করণের অন্তর্ভুক্ত হয়। রচনাবলীর বর্তমান

খণ্ডে এর মধ্য হইতে বারোটি প্রবন্ধ গ্রহণ করা হইয়াছে। শিক্ষাবিষয়ক আরো তিনটি রচনা সাময়িক পত্র হইতে রচনাবলীর ঊনত্রিংশ (সুলভ সংস্করণ সপ্তদশ) খণ্ডে সংকলিত। আরো কিছু রচনা রবীন্দ্র-রচনাবলীর পরবর্তী খণ্ড বা খণ্ডগুলিতে মুদ্রিত হইবে।

বর্তমান খণ্ডে সংকলিত রচনাগুলির প্রথম প্রকাশ-কাল নিম্নে সংকলিত হইল :

	রচনা	প্রকাশ	
১	স্ত্রীশিক্ষা	সবুজ পত্র	ভাদ্র-আশ্বিন ১৩২২
২	ছাত্রশাসনতন্ত্র	সবুজ পত্র	চৈত্র ১৩২২
৩	অসন্তোষের কারণ	শান্তিনিকেতন পত্রিকা	জ্যৈষ্ঠ ১৩২৬
৪	বিদ্যার যাচাই	শান্তিনিকেতন পত্রিকা	আষাঢ় ১৩২৬
৫	বিদ্যাসমবায়	শান্তিনিকেতন পত্রিকা	আশ্বিন-কার্তিক ১৩২৬
৬	শিক্ষার মিলন	সবুজ পত্র	ভাদ্র ১৩২৮
		প্রবাসী/ভারতী	আশ্বিন ১৩২৮
৭	বিশ্ববিদ্যালয়ের রূপ	পুস্তিকা	১৯৩৩
৮	শিক্ষার বিকিরণ	পুস্তিকা	১৯৩৩
৯	শিক্ষা ও সংস্কৃতি	বিচিত্রা	শ্রাবণ ১৩৪২
১০	শিক্ষার স্বাঙ্গীকরণ	বিশ্বভারতী বুলেটিন	২০ মাঘ ১৩৪২
১১	আশ্রমের শিক্ষা	প্রবাসী	আষাঢ় ১৩৪৩
১২	ছাত্রসম্ভাষণ	পুস্তিকা	৫ ফাল্গুন ১৩৪৩

উল্লিখিত তালিকার বিভিন্ন প্রবন্ধ সম্পর্কে কতকগুলি তথ্য এখানে সংকলন করা গেল :

১. রবীন্দ্রনাথ শ্রাবণ ১৩২২ -সংখ্যা হইতে সবুজ পত্রে 'টীকা-টিপ্পনী' নামে একটি নূতন বিভাগ প্রবর্তন করেন। পরের সংখ্যাতেই লীলা মিত্রের একটি পত্র অবলম্বনে তিনি বর্তমান প্রবন্ধটি রচনা করেন।

২. প্রেসিডেন্সি কলেজের ইতিহাসের অধ্যাপক Edward Farley Oaten-এর বাঙালি ছাত্রদের প্রতি ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণের প্রতিবাদে ১৩ জানুয়ারি ১৯১৬ তারিখে কলেজের কিছু ছাত্র দ্বারা অধ্যাপক ওটেন প্রহৃত হন। ঘটনাটি সম্পর্কে অনুসন্ধানের জন্য আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে একটি কমিটি গঠিত হয়। কমিটি সুভাষচন্দ্র বসু, অনঙ্গমোহন দাম, সতীশচন্দ্র দে ও কমলভূষণ বসুকে কলেজ হইতে বহিষ্কারের আদেশ দেন। এই ঘটনাটির পরিপ্রেক্ষিতে বর্তমান প্রবন্ধটি লিখিত হয়। ইহার একটি ইংরেজি রূপান্তর 'Indian Students and Western Teachers' নামে *The Modern Review*-এর এপ্রিল ১৯১৬ (পৃ. ৪১৬-২২)-সংখ্যায় মুদ্রিত হইয়াছিল।

৩. ৪, ৫ এই প্রবন্ধগুলি রচনার কিছুকাল পূর্বে রবীন্দ্রনাথ দক্ষিণ ও উত্তর ভারতের কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয় ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করিয়া আসিয়াছিলেন। তাহারই অভিঘাত প্রবন্ধগুলির মধ্যে প্রকাশ পাইয়াছে।

৬. 'রবীন্দ্রজীবনী' (১৩৯৭)-অনুসারে প্রবন্ধটি ২৫ শ্রাবণ ১৩২৮ (১০ অগস্ট ১৯২১) অপরাহ্নে আশ্রমবাসীদের নিকট এবং পরে পঠিত হয় ১৫ অগস্ট য়ুনিভার্সিটি ইন্‌স্টিটিউট হলে জাতীয় শিক্ষাপরিষদের পক্ষ হইতে অনুষ্ঠিত কবি-সংবর্ধনা-সভায়, সভাপতিত্ব করেন আশুতোষ চৌধুরী। ১৮ অগস্ট আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের সভাপতিত্বে রবীন্দ্রনাথ আবার প্রবন্ধটি পাঠ করেন

আলফ্রেড থিয়েটারে।

বর্তমান সংকলনে প্রধানত প্রবাসী পত্রিকার পাঠই অনুসৃত হইয়াছে।

৭, ৮. কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'রামতনু লাহিড়ী অধ্যাপক' হিসাবে রবীন্দ্রনাথ এই বক্তৃতা দুটি দেন যথাক্রমে [?] ডিসেম্বর ১৯৩২ ও ২৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৩৩-এ। দুটি প্রবন্ধই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে পুস্তিকা-আকারে মুদ্রিত হয়।

৯. ধীরেন্দ্রমোহন সেনকে লিখিত রবীন্দ্রনাথের ১৫ জুলাই ১৯৩৫ তারিখের পত্রটি 'শিক্ষা ও সংস্কৃতি' নামে বিচিত্রা-য় মুদ্রিত হয়।

১০. কলিকাতায় অনুষ্ঠিত 'শিক্ষাসপ্তাহে' আন্তর্জাতিক 'নিউ এডুকেশন ফেলোশিপ'-এর ভাষণ-রূপে ৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৩৬ তারিখে পঠিত। উল্লেখ্য, কলিকাতা বেতারকেন্দ্র রবীন্দ্রনাথের ভাষণটি সম্প্রচার করে। এই প্রবন্ধে পূর্বপ্রকাশিত 'শিক্ষার বাহন' (পৌষ ১৩৩২) প্রবন্ধের কোনো কোনো অংশ গৃহীত হইয়াছে ; রবীন্দ্রনাথ সূচনাতেই বলেন : 'এ সম্বন্ধে বরাবর আমি আলোচনা করেছি, আবার তার পুনরুক্তি করতে প্রবৃত্ত হলেম ; যেখানে ব্যথা সেখানে বার বার হাত পড়ে। আমার এই প্রসঙ্গে পুনরুক্তি অনেকেই হয়তো ধরতে পারবেন না ; কেননা অনেকেরই কানে আমার সেই পুরোনো কথা পৌঁছয় নি। যাঁদের কাছে পুনরুক্তি ধরা পড়বে তাঁরা যেন ক্ষমা করেন। কেননা আজ আমি দুঃখের কথা বলতে এসেছি, নূতন কথা বলতে আসি নি।'

১৩৪৩ ভাদ্রে প্রকাশিত 'শিক্ষার ধারা' পুস্তিকায় সামান্য পরিবর্তনসহ এই প্রবন্ধ পুনর্মুদ্রিত হয়। বুলেটিনে বা পুস্তিকায় প্রবন্ধশেষে রবীন্দ্রনাথের একখানি পত্রের অংশবিশেষ 'পুনশ্চ' শিরোনামে সংকলিত, ওই পত্রে বাংলা দেশের তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রী মোঃ আজিজুল হককে লেখা হয় :

> আমার আর-একটি প্রস্তাব আমাদের শিক্ষাবিভাগের সম্মুখে আমি উপস্থিত করতে চাই। দেশের যে-সকল পুরুষ ও স্ত্রীলোকেরা নানা কারণে বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভের সুযোগ থেকে বঞ্চিত, তাদের জন্য ছোটোবড়ো প্রাদেশিক শহরগুলিতে যদি পরীক্ষাকেন্দ্র স্থাপন করা যায়, তবে অনেকেই অবসরমত ঘরে বসে নিজেকে শিক্ষিত করতে উৎসাহিত হবে। নিম্নতন থেকে উচ্চতন পর্ব পর্যন্ত তাদের পাঠ্য বিষয় নির্দিষ্ট করে তাদের পাঠ্যপুস্তক বেঁধে দিলে সুবিহিতভাবে তাদের শিক্ষা নিয়ন্ত্রিত হতে পারবে। এই পরীক্ষার যোগে যে-সকল উপাধির অধিকার পাওয়া যাবে, সমাজের দিক থেকে তার সম্মান ও জীবিকার দিক থেকে তার প্রয়োজনীয়তার মূল্য আছে. তাই আশা করা যায়, দেশব্যাপী পরীক্ষার্থীর দেয় অর্থ থেকে অনায়াসে এর ব্যয় নির্বাহ হবে। এই উপলক্ষে পাঠ্যপুস্তক-রচনার ক্ষেত্র প্রসারিত হয়ে জনসাধারণের মধ্যে বিদ্যাবিস্তারের উপাদান বেড়ে যাবে এবং এতে করে বিস্তর লেখকের জীবিকার উপায় নির্ধারিত হবে। একদা বিশ্বভারতী থেকে এই কর্তব্য গ্রহণ করবার সংকল্প মনে উদয় হয়েছিল, কিন্তু দরিদ্রের মনোরথ মনের বাহিরে অচল। তা ছাড়া রাজ-সরকারের উপাধিই জীবনযাত্রায় কর্ণধার।

রবীন্দ্রনাথের প্রস্তাব ওই সময়ে বা পরে শিক্ষাধিকার-কর্তৃক গৃহীত হয় নি। উল্লেখ্য, ১৯৩৩ ফেব্রুয়ারিতে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আহ্বানে রবীন্দ্রনাথ যে ভাষণ দেন ('শিক্ষার বিকিরণ', দ্রষ্টব্য ৩৩২ পৃষ্ঠার শেষ অনুচ্ছেদ থেকে ৩৩৪ পৃষ্ঠায় প্রবন্ধের শেষ) সেখানেও এই একই প্রস্তাব করা হইয়াছিল : 'বিশ্ববিদ্যালয় বা গবর্নমেন্ট হইতে এইরূপ পরীক্ষাকেন্দ্র-স্থাপনের ব্যবস্থা হয় নাই বলিয়া, রবীন্দ্রনাথের প্রবর্তনায় বিশ্বভারতী লোক-শিক্ষাসংসদ যথাশক্তি দেশের বিভিন্ন স্থানে এইরূপ পরীক্ষাকেন্দ্র স্থাপন করিতে থাকেন'।

১১. 'দি নিউ এডুকেশন ফেলোশিপ'-এর বঙ্গীয় শাখা (শান্তিনিকেতন)-কর্তৃক প্রচারিত 'শিক্ষার ধারা' (ভাদ্র ১৩৪৩) গ্রন্থের শেষ প্রবন্ধ। ১৩৪৮ আষাঢ়ে প্রকাশিত 'আশ্রমের রূপ ও বিকাশ' (বিশ্বভারতী বুলেটিন ২৯) পুস্তিকার প্রথমাংশে প্রবন্ধটির একটি সংস্কৃত রূপ সংকলিত হয়।

১২. ১৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৩৭ (৫ ফাল্গুন ১৩৪৩) প্রেসিডেন্সি কলেজ প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'বার্ষিক পদবী-সম্মান-বিতরণ-সভায়' পঠিত। অনুষ্ঠানস্থল হইতে শুরু করিয়া এই সমাবর্তন নানা কারণেই বিশিষ্ট, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে সংস্রবহীন হইয়াও রবীন্দ্রনাথের বাংলা ভাষায় ভাষণ পাঠ অন্যতম। কলিকাতা বেতারকেন্দ্র হইতে অনুষ্ঠানটি সম্প্রচারিত হইয়াছিল।

বাংলা শব্দতত্ত্ব

রবীন্দ্র-রচনাবলী দ্বাদশ খণ্ডে (সুলভ সংস্করণ ষষ্ঠ খণ্ড) 'বাংলা শব্দতত্ত্ব' অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল।

শব্দতত্ত্ব নামে গ্রন্থটির প্রথম প্রকাশ ১৩১৫ (১৯০৯) সালে। এই গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ 'বাংলা শব্দতত্ত্ব' নামে ১৩৪২ সালের অগ্রহায়ণ মাসে প্রকাশিত হয়। এই সংস্করণে অনেকগুলি নূতন প্রবন্ধ সংযোজিত হয়। এই সংস্করণেই "ভাষার কথা" প্রবন্ধটি 'ভূমিকা' রূপে সংযোজিত এবং গ্রন্থটি পণ্ডিত বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয়কে উৎসর্গীকৃত।

রবীন্দ্র-রচনাবলী-ভুক্ত হইয়া গ্রন্থটির প্রকাশকালে (আশ্বিন ১৩৪৯), পরিশিষ্টে, শ্রীনির্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় অনেক পরিশ্রম করিয়া শব্দতত্ত্ব গ্রন্থের প্রথম প্রকাশকালের (১৯০৯) পূর্ববর্তী অনেকগুলি প্রবন্ধ যুক্ত করেন ; তবে ইহার পরবর্তী রচনাগুলি উক্ত খণ্ডে যোগ করা হয় নাই। এটিকে বস্তুত শব্দতত্ত্বের তৃতীয় সংস্করণ বলা যাইতে পারে।

১৩৯১ বৈশাখে স্বতন্ত্র গ্রন্থরূপে শব্দতত্ত্বের তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত। ইহাতে পূর্ববর্তী তিনটি সংস্করণে সংগৃহীত যাবতীয় রচনা এবং ইতিপূর্বে গ্রন্থাকারে অপ্রকাশিত অন্যান্য কতকগুলি প্রবন্ধ ও চিঠিপত্র সংকলিত হয়। পুলিনবিহারী সেন ও শুভেন্দুশেখর মুখোপাধ্যায় এই সংস্করণের সংকলয়িতা। সহায়ক ছিলেন শ্রীসুবিমল লাহিড়ী। রবীন্দ্র-রচনাবলী দ্বাদশ খণ্ডে (সুলভ সংস্করণ ষষ্ঠ খণ্ড) প্রকাশিত রচনাগুলির অতিরিক্ত ও রচনাসমূহ বর্তমান খণ্ডে সংকলিত হল।

প্রবন্ধগুলির সাময়িক পত্রে প্রথম প্রকাশের যথাসম্ভব উল্লেখসহ সূচী দেওয়া হইল।

রচনা	প্রকাশ	
১ ভাষার কথা	সবুজ পত্র	চৈত্র ১৩২৩
২ বঙ্গভাষা	ভারতী	বৈশাখ ১৩০৫
৩ বাংলা ব্যাকরণে তির্যক্‌রূপ	প্রবাসী	আষাঢ় ১৩১৮
৪ বাংলা ব্যাকরণে বিশেষ বিশেষ্য	প্রবাসী	ভাদ্র ১৩১৮
৫ বাংলা নির্দেশক	প্রবাসী	আশ্বিন ১৩১৮
৬ বাংলা বহুবচন	প্রবাসী	কার্তিক ১৩১৮
৭ স্ত্রীলিঙ্গ	প্রবাসী	অগ্রহায়ণ ১৩১৮

রচনা	প্রকাশ	
৮ প্রতিশব্দ [১]		
১-৬	শান্তিনিকেতন পত্রিকা	আষাঢ়, ভাদ্র, ভাদ্র, আশ্বিন-কার্তিক, অগ্রহায়ণ, পৌষ ১৩২৬
৭-৮	অজিতকুমার চক্রবর্তীকে।	৯, ১৩ জ্যৈষ্ঠ ১৩১৭
৯-১০	দিলীপকুমার রায়কে।	২৪ নভেম্বর ১৯২৭, ৬ মে ১৯৩১
১১	বিচিত্রা	ফাল্গুন ১৩৩৮
১২	রেবতীমোহন বর্মনকে।	২২ জানুয়ারি ১৯৩২
১৩	উত্তরা	শ্রাবণ ১৩৩৯
১৪	সুধীরকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়কে।	৪ আষাঢ় ১৩৩৯
১৫	শারদীয়া আনন্দবাজার পত্রিকা	১৩৫৫
১৬	জ্ঞানেন্দ্রলাল ভাদুড়ীকে।	২ আষাঢ় ১৩৪১
১৭	ক্ষিতিভূষণ মুখোপাধ্যায়কে।	৮ আষাঢ় ১৩৪৩
১৮	যোগেন্দ্রকিশোর রক্ষিত রায়কে।	১০ জানুয়ারি ১৯৩৭
১৯	নিত্যানন্দ সেনগুপ্তকে।	২৮ শ্রাবণ ১৩৪৪
২০	ভবানীপ্রসাদ বাগচীকে।	জানুয়ারি ১৯৪০
৯ প্রদোষ ॥ ১-৩	বিচিত্রা	ভাদ্র, আশ্বিন ১৩৩৯
১০ কালচার ও সংস্কৃতি ॥		
১	পরিচয়	মাঘ ১৩৩৯
২ [২]	প্রবাসী	ভাদ্র ১৩৪২
৩ [২]	প্রবাসী	কার্তিক ১৩৪২
১১ প্রতিশব্দ-প্রসঙ্গ		
১	সাধনা	চতুর্থ বর্ষ প্রথম ভাগ
২-৪	বঙ্গদর্শন	বৈশাখ ১৩০৮
৫-৬	বঙ্গদর্শন	আষাঢ় ১৩০৮
৭	ভাণ্ডার	বৈশাখ ১৩১২
১২ অনুবাদ চর্চা	শান্তিনিকেতন পত্রিকা	আশ্বিন ও কার্তিক ১৩২৬
১৩ বাংলা কথ্যভাষা ১	শান্তিনিকেতন পত্রিকা	আশ্বিন ও কার্তিক ১৩২৬
২	প্রবাসী	বৈশাখ ১৩৫০
১৪ বাদানুবাদ ১-২	শান্তিনিকেতন পত্রিকা	অগ্রহায়ণ, পৌষ ১৩২৬
১৫ চলতি ভাষার রূপ	বিচিত্রা	চৈত্র ১৩৩৮

---

[১] যে-ক্ষেত্রে পত্রিকায় প্রকাশের উল্লেখ নেই সেগুলি শান্তিনিকেতন রবীন্দ্রভবনে সংরক্ষিত পত্রসংগ্রহ থেকে সংকলিত। পরবর্তী রচনাগুলি সম্পর্কেও এ কথা প্রযোজ্য।

[৭-২০] বিভিন্ন জনকে লিখিত পত্র থেকে কালানুক্রমে সংকলিত।

[২] প্রবাসী-তে 'কালচার' নামে প্রকাশিত। এর অংশবিশেষ ১৩৪২ সংস্করণে প্রবন্ধাকারে সংকলিত।

	রচনা	প্রকাশ	
১৬	বিবিধ ১		
	বিবিধ ২	সাহানা	জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৭
১৭	অভিভাষণ	বিচিত্রা	বৈশাখ ১৩৩৮
১৮	ভাষার খেয়াল	প্রবাসী	ভাদ্র ১৩৪২
১৯	শব্দতত্ত্বের একটি তর্ক	প্রবাসী	শ্রাবণ ১৩৪৩
২০	বিবিধ ১-২	বঙ্গদর্শন	বৈশাখ ১৩০৮
	৩-৪	ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়কে।	২০, ২৫ শ্রাবণ ১৩১৮
	৫	কথাসাহিত্য	কার্তিক ১৩৫৮
২১	বাংলা বানান	প্রবাসী	বৈশাখ ১৩২৩
২২	বাংলার বানান-সমস্যা	বিচিত্রা	ভাদ্র ১৩৩৯
২৩	বাংলা বানান : ২	প্রবাসী	কার্তিক ১৩৪৩
২৪	বাংলা বানান : ৩	প্রবাসী	পৌষ ১৩৪৩
২৫	বানান-বিধি	প্রবাসী	আষাঢ় ১৩৪৪
২৬	বানান-বিধি : ১-২	প্রবাসী	শ্রাবণ ১৩৪৪
২৭	চিহ্ন বিভ্রাট : ভূমিকা, ১-২	পরিচয়	মাঘ ১৩৩৯
২৮	বানান-প্রসঙ্গ ১	ভারতী	অগ্রহায়ণ ১৩০৫
	২	বঙ্গদর্শন	বৈশাখ ১৩০৮
	৩	বঙ্গদর্শন	আষাঢ় ১৩০৮
	৪	তরুণের স্বপ্ন	শারদীয়া ১৩৬৬
	৫	দিলীপকুমার রায়কে।	১ ফেব্রুয়ারি ১৯৩৬
	৬	কানাইলাল গঙ্গোপাধ্যায়কে।	৬ জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৩
	৭	শ্যামাদাস লাহিড়ীকে।	৩ মার্চ ১৯৩৭
	৮	বিশ্বভারতী পত্রিকা	শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৬৮
	৯	সোনার বাংলা	বৈশাখ ১৩৬০
	১০-১১	কিশোরীমোহন সাঁতরাকে।	৪, ১৩ জুন ১৯৩৭
		বৈজয়ন্তী	কার্তিক ১৩৪৬
২৯	মক্তব-মাদ্রাসার বাংলা ভাষা	প্রবাসী	ভাদ্র ১৩৩৯
৩০	ভাষা-শিক্ষায় সাম্প্রদায়িকতা : ১	প্রবাসী	বৈশাখ ১৩৪১
	: ২	প্রবাসী	পৌষ ১৩৪২
	: ৩	আবুল ফজলকে।	৬. ৯. ৪০

সংযোজন ॥

৩১	বাংলাভাষা ও বাঙালি চরিত্র : ১	ভারতী	বৈশাখ ১৩১২
	: ২	রবীন্দ্রবীক্ষা ১	শ্রাবণ ১৩৮৩
৩২	জাতীয় সাহিত্য	সাধনা	আষাঢ় ১৩০২
৩৩	নামের পদবী	বিচিত্রা	শ্রাবণ ১৩৩৮
৩৪	হরপ্রসাদ সংবর্ধন	হরপ্রসাদ শাস্ত্রী স্মারক গ্রন্থ।	১৯৭৮

	রচনা	প্রকাশ	
৩৫	‘প্রাচীন-কাব্যসংগ্রহ’	ভারতী	শ্রাবণ ১২৮৮
	উত্তর-প্রত্যুত্তর	ভারতী	ভাদ্র ১২৮৮
	পরিশিষ্ট	ভারতী	কার্তিক ১২৮৮
৩৬	শব্দচয়ন : ১	সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা	ফাল্গুন ১৩৩৬
	২-৬		

১ সবুজ পত্রের (চৈত্র ১৩২৩) একটি কপিতে দেখা যায় ভাষার কথা প্রবন্ধটির সূচনায় ‘ভূমিকা’ অংশটি রবীন্দ্রনাথ পেন্সিলে লিখিয়া রাখিয়াছিলেন এই সংস্করণের জন্য। প্রবন্ধটির একাদশ অনুচ্ছেদটিও ১৩৪২ সালের নূতন সংযোজন।

২ দীনেশচন্দ্র সেন -প্রণীত ‘বঙ্গভাষা ও সাহিত্য’ (১৮৯৬ খৃ.) গ্রন্থের সমালোচনারূপে ভারতী ১৩০৫ বৈশাখে প্রকাশিত। পরবর্তীকালে সম্পূর্ণ প্রবন্ধটি রবীন্দ্র-রচনাবলী অষ্টম খণ্ডে সাহিত্য গ্রন্থের পরিশিষ্টে মুদ্রিত। বর্তমান খণ্ডে শব্দতত্ত্বের প্রাসঙ্গিক অংশ সংকলন করা হইয়াছে। বাংলা শব্দতত্ত্ব স্বতন্ত্র সংস্করণে অতিরিক্ত অংশ সংযোজিত।

৩ ‘বাংলা ব্যাকরণে তির্যক্‌রূপ’ প্রবন্ধটি প্রবাসী-তে প্রকাশিত হইবার পর এই প্রসঙ্গে পরবর্তী কয়েকমাসের প্রবাসী-তে আলোচনা চলে। সতীশচন্দ্র বসু শ্রাবণ সংখ্যায় (পৃ ৩৭৬-৭৭) রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধের সমালোচনা করেন। ভাদ্র সংখ্যায় (পৃ ৪৫৮-৬১) যোগেশচন্দ্র রায়-এর ‘বাঙ্গালা ব্যাকরণে বিচার্য’ প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধের আলোচনা আছে। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার ‘বাংলা ব্যাকরণে বিশেষ বিশেষ্য’ প্রবন্ধের পাদটীকায় সতীশচন্দ্র বসুর সমালোচনার উল্লেখ করেন। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় (বৈশাখ ১৮৩৩ শক) ‘আশ্রম সংবাদ/শান্তিনিকেতন’ শিরোনামে মুদ্রিত একটি সংবাদে জানা যায় যে ‘প্রবন্ধ পাঠসভা’ নামে একটি সমিতি গত ফাল্গুন মাসে স্থাপিত হইয়াছে। এই সমিতিতে বিশেষজ্ঞদের লিখিত প্রবন্ধ পঠিত ও আলোচিত হইয়া থাকে।... এই সভার সভাপতি শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের লিখিত ‘বাংলা বিশেষ্য পদের একবচন’ নামক একটি প্রবন্ধ ৪ঠা চৈত্র তারিখে পঠিত ও আলোচিত হইয়াছিল।” প্রবন্ধটি প্রবাসী ১৩১৮ ভাদ্র সংখ্যায় মুদ্রিত ‘বাংলা ব্যাকরণে বিশেষ বিশেষ্য’ বলিয়া অনুমিত।

৪ ‘“বাংলা ব্যাকরণে বিশেষ বিশেষ্য” পাঠ করিয়া যে কয়েকটি কথা আমার মনে উদিত হইয়াছে’ সে বিষয়ে বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রবাসী ১৩১৮ আশ্বিন সংখ্যায় ‘আলোচনা’ পর্যায়ে ‘বাঙ্গালা ব্যাকরণ সম্বন্ধে কয়েকটি কথা’ নামে ‘প্রবাসীর পাঠকগণ ও সন্দর্ভকারের নিকট’ নিবেদন করেন।

৫ প্রবাসী পত্রিকায় (আশ্বিন ১৩১৮) প্রকাশিত ‘বাংলা নির্দেশক’ প্রবন্ধের নীচে যে ‘নোট’ মুদ্রিত হইয়াছিল তাহা এই স্থলে উদ্‌ধৃত হইল :

“বাংলা ব্যাকরণে তির্য্যকরূপ নামক প্রবন্ধে কর্ত্তৃকারকে একার প্রয়োগ লইয়া আলোচনা করিয়াছিলাম। শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি মহাশয় সে সম্বন্ধে তাঁহার মন্তব্য প্রকাশ করিয়া আমাকে উপকৃত করিয়াছেন। নিয়মের সূত্রটাকে বাঁধিয়া তুলিতে আমার গোল ঠেকিতেছিল সে আমি নিজেই অনুভব করিয়াছি। বস্তুত বাংলা ব্যাকরণ সম্বন্ধে যে আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছি তাহার পদে পদেই আমার মনে দ্বিধা আছে। অতএব এ বিষয়ে বিদ্যানিধি মহাশয় আমাকে আনুকূল্যপ্রার্থী জানিয়া আমার সন্দেহভঞ্জন করিবেন।

তাঁহার মতে সূত্রটি এই :—যেখানে কর্ত্তৃপদে জাতির বা সামান্যের ধর্ম্মপ্রকাশ উদ্দেশ্য হয় সেখানে কর্ত্তৃপদে একার আসে।

তাহা হইলে জিজ্ঞাস্য এই যে "ঠেলা দিলে টেবিল উল্টে পড়ে" না বলিয়া আমরা কি বলিতে পারি "টেবিলে উল্টে পড়ে?" "জল পাইলে ধান বাড়ে" না বলিয়া "ধানে বাড়ে" বলা যায় কি?

"গাছে ফুল ধরে" এই যে দৃষ্টান্ত তিনি দিয়াছেন— এখানে "গাছে"র এ-বিভক্তি কি সপ্তমী বিভক্তি নহে? অর্থাৎ ফুল ধরা ব্যাপারটা গাছে ঘটে ইহাই কি বক্তব্য নহে? এ বাক্যে "গাছে" শব্দ কি কর্ত্তৃপদ?

"বেদে লেখে" "ইতিহাসে বলে" প্রভৃতি দৃষ্টান্তে বেদ ও ইতিহাস নিঃসন্দেহে অচেতন পদার্থরূপে ব্যবহৃত হয় নাই। এখানে বেদ ও ইতিহাসকে মানুষরূপে দেখা হইতেছে।

"ইংরেজ সৈন্যদলে ভারতবর্ষে আছে" বা "কয়েদীতে জেলে আছে" এরূপ বাক্য কি বাংলাভাষায় সম্ভব?

"বালকে ঘুমায়" অচেষ্টক ক্রিয়াবিশিষ্ট এই দৃষ্টান্তটি আমার মনে আসিয়াছিল কিন্তু এরূপ প্রয়োগ চলে কি না সে সম্বন্ধে আমার দ্বিধা দূর হয় না। "ঘোড়ায় দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া ঘুমায়" বা "কুমীরে চোখ চাহিয়া ঘুমায়" বা "হাঁসপাতালের এই ঘরে রোগীতে ঘুমায়" এরূপ প্রয়োগ প্রচলিত কি না সন্দেহ হইতে লাগিল।

মুস্কিল এই যে, যে সব কথা আমরা সহজেই বলিয়া থাকি তাহাদের সম্বন্ধে মনে প্রশ্ন উদয় হইলে আর দিশা পাওয়া যায় না। একবার মনে হয় বুঝি এরূপ চলে, একবার মনে হয় চলে না।

"ঘুমায়" ক্রিয়া সম্বন্ধে যাহাই স্থির হউক না কেন, আমি যে লিখিয়াছিলাম সচেষ্টক ক্রিয়ার যোগেই কর্ত্তৃপদে একার বসে— এ নিয়মটিকে গ্রাহ্য করা যায় না। "প্লেগে স্ত্রীলোকেই অধিক মরে" এস্থলে মরা ক্রিয়া অচেষ্টক সন্দেহ নাই। "বেশি আদর পেলে ভালমানুষেও বিগড়ে যায়", "অধ্যবসায়ের দ্বারা মূর্খেও পণ্ডিত হতে পারে", "অকস্মাৎ মৃত্যুর আশঙ্কায় বীরপুরুষেও ভীত হয়" এসকল অচেষ্টক ক্রিয়ার দৃষ্টান্তে আমার নিয়ম খাটে না।

কিন্তু "আছে' ক্রিয়ার স্থলে কর্ত্তৃপদে একার বসে না, এ নিয়মের ব্যতিক্রম এখনো ভাবিয়া পাই নাই।"

রবীন্দ্রনাথের আবেদনে সাড়া দিয়া যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি মাঘ সংখ্যায় "বাঙ্গালা ব্যাকরণে বিচার্য্য" নামে লিখিয়াছিলেন :

"আশ্বিন মাসের প্রবাসীতে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় বাঙ্গালা বহুবচনের 'এ' বিভক্তি সম্বন্ধে আমার সূত্রের অসম্পূর্ণতা দেখাইয়াছেন। তাঁহার দৃষ্টান্ত এই, 'ঠেলা দিলে টেবিল উল্টে পড়ে', আমরা টেবিলে বলি না। এখানে 'ঠেলা দিলে' বলাতে টেবিলের সামান্য বা স্বাভাবিক ধর্ম্ম পতন সিদ্ধ হইল না। 'ইংরেজ সৈন্যদল ভারতবর্ষে আছে'— এখানে সৈন্যদলে হইতে পারে না। কারণ থাকা না থাকা কেবল সৈন্যদলের সামান্য ধর্ম্ম নহে। 'গাছে ফুল ধরে' এখানে ধর ধাতুর কর্ম্ম ফুল বলিতে হইবে। ধর ধাতু অকর্ম্মকও হয়। যেমন, জল ধরিয়াছে, মেঘ ধরিয়াছে, এসব স্থলে ধর ধাতুর অর্থ বিরাম। আমার বোধ হয়, সামান্য ধর্ম্ম প্রকাশ ব্যতীত কর্ত্তার কর্ত্তৃত্ব প্রকাশ উদ্দেশ্য হইলেও বহুবচনে এ লাগে। যেমন টাকায় টাকা করে, নদীতে নামিও না কুমীরে কামড়াবে। কর্ত্তা কারক ভিন্ন অন্য কারকেও সে কারক স্পষ্ট নির্দ্দেশ করিতে হইলে বিভক্তি দিতে হয়।"

১৩১৮ কার্তিক সংখ্যা প্রবাসী-তে (পৃ ৯৫-৯৬) বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় ' "বাংলা নির্দেশক" সম্বন্ধে কয়েকটি কথা' নামে আলোচনা করেন।

১০ 'ইংরেজি culture শব্দের বাংলা লইয়া' রবীন্দ্রনাথের ভাবনার পরিচয় প্রথম পাওয়া

অভিভাষণ ২।। এই বক্তৃতার উপলক্ষ রচনাশীর্ষে উল্লিখিত ; সুধেন্দুরঞ্জন রায় এই বক্তৃতার অনুলিখন করেন।

অভিভাষণ ৩।। এই বক্তৃতার উপলক্ষ রচনাশীর্ষে উল্লিখিত হইয়াছে। এই বক্তৃতা রবীন্দ্রনাথ-কর্তৃক সংশোধিত নয় বলিয়া মনে হয়। পূর্বে এটি আনন্দবাজার পত্রিকা-য় ও মিউজিক কন্‌ফারেন্সের প্রতিবেদন পুস্তকে মুদ্রিত হইয়াছিল।

অভিভাষণ ৪।। গীতালি নামে একটি রবীন্দ্রসংগীতশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের উদ্‌বোধনে কথিত এই ভাষণের প্রতিলিপি রবীন্দ্রনাথ - কর্তৃক সংশোধিত নয় বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে। "গীতালির উদ্দেশ্য হইতেছে রবীন্দ্রনাথের সংগীত যাহাতে সমাজে বিশুদ্ধরূপে গীত হয়, তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখা।" ইন্দিরাদেবী চৌধুরানী এই প্রতিষ্ঠানের সভানেত্রী ছিলেন, সম্পাদিকা নলিনী বসু। যুগ্ম-সম্পাদক প্রফুল্ল মহলানবিশ, বুলা নামে পরিচিত ও এই অভিভাষণে উল্লিখিত। "আমার গানের উপর ষ্টীমরোলার চালিয়ো না" শিরোনামে অভিভাষণটি আনন্দবাজার পত্রিকা-য় (১৭ আষাঢ় ১৩৪৭) প্রকাশিত হয়।

৯ দিলীপকুমার রায় রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে নানা বিষয়ে, বিশেষত সংগীতের বিষয়ে, বিভিন্ন সময়ে তাঁহার আলোচনার বহু বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন ; রবীন্দ্রনাথ-কর্তৃক পুনর্লিখিত হইয়া বা তাঁহার অনুমোদনক্রমে সেগুলি সাময়িক পত্রে/বা দিলীপকুমার রায়ের সাঙ্গীতিকী (১৯৩৮) ও তীর্থঙ্কর (১৩৪৬) গ্রন্থে মুদ্রিত হইয়াছে। এই আলাপ-আলোচনার প্রাসঙ্গিক ছয়টি বিবরণ এখানে সংকলিত হইল ; পঞ্চমটি (২৬ মার্চ ১৯৩৮) নারায়ণ চৌধুরী কর্তৃক লিখিত। এই আলোচনার মধ্যে কয়েকটির সাময়িক পত্রে প্রকাশ-বিবরণ পূর্বেই সংকলিত হইয়াছে।

প্রথম ও দ্বিতীয় আলোচনার সাময়িক পত্রে প্রকাশকালে দিলীপকুমার লেখেন : 'কবিবর তাঁর নিজের বক্তব্যটুকু প্রায় সমস্তই আদ্যন্ত লিখে দিয়েছেন।' তৃতীয় আলোচনা সাময়িক পত্রে প্রকাশের সূচনায় রবীন্দ্রনাথ লেখেন : 'আলোচ্য প্রসঙ্গটা প্রধানত আমারই।...আমার কথা সমস্তটা আমাকেই লিখতে হল। ...সংগীত সম্বন্ধে নিজের মত প্রকাশের ভার এই লেখাতে সম্পূর্ণ নিজের হাতেই নিয়েছি।' চতুর্থ আলোচনা অনুলেখকের এই টীকা-সহ সাময়িক পত্রে মুদ্রিত হয় : 'লেখাটি কবিকে আদ্যন্ত প'ড়ে শোনানো হয়েছে। কবি তাঁর বক্তব্যের অনুলিপি অনুমোদন করেছেন।' পঞ্চম আলোচনা রবীন্দ্রনাথ-কর্তৃক অনুমোদিত বলিয়া তীর্থঙ্কর গ্রন্থে (১৩৪৬ সংস্করণ, পৃ ২২৯) উল্লিখিত। ষষ্ঠ আলোচনা প্রসঙ্গে দিলীপকুমারকে ২৯ জুন ১৯৩৮ তারিখে লিখিত রবীন্দ্রনাথের পত্রে তীর্থঙ্কর (১৩৪৬, পৃ ২৩২) গ্রন্থে মুদ্রিত আছে : 'আমি যে কথা বলেছি ঠিক তার যন্ত্রকৃত প্রতিলিখনটা অসম্পূর্ণ— তোমার মনে যেসব চিন্তার উদ্রেক হয়েছে সেইটের যোগে সমস্তটা সজীব এবং সম্পূর্ণ।... খোলসা করে সব কথা বলে তুমি ছাপিয়ো, তাতে পাঠকদের পরিতৃপ্তি হবে।'

এই আলোচনাগুলি সংগীতচিন্তা গ্রন্থে প্রকাশকালে বর্ণনামূলক কোনো-কোনো অংশ বাদ দেওয়া হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য, বিশেষত বর্তমান সংকলনের প্রাসঙ্গিক বক্তব্য বা আলোচ্য বিষয়, অনুধাবনের সুযোগ যাহাতে ক্ষুণ্ণ না হয় সে দিকে দৃষ্টি রাখা হইয়াছে।

দিলীপকুমার রায়ের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের আলাপ-আলোচনার বিশদ বিবরণ যাঁহারা জানিতে ইচ্ছা করেন, দিলীপকুমারের গ্রন্থগুলিতে তাহা পাওয়া যাইবে।

১০ অধ্যাপক বিপিনবিহারী গুপ্ত ঊনবিংশ শতাব্দীর কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তির সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাদের জীবনকথা ও বিভিন্ন বিষয়ে তাঁহাদের বক্তব্য সংকলন করিয়া 'পুরাতন প্রসঙ্গ' শিরোনামে পত্রিকাদিতে মুদ্রিত করেন, পরে এগুলি 'পুরাতন প্রসঙ্গ' নামে গ্রন্থভুক্ত হয়।

উপরে বর্ণিত রচনাগুলি ছাড়া, সংগীত বিষয়ে বিভিন্ন ব্যক্তিকে লেখা কয়েকটি পত্রাংশ সংগীতচিন্তায় সংকলিত হইয়াছে। সে-সব পত্রের সঙ্গেই উৎস সূত্রের উল্লেখ আছে।

'সংগীতচিন্তা' গ্রন্থটিকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করিয়া তুলিবার অভিপ্রায়ে রচনাবলীর বিভিন্ন খণ্ডে প্রকাশিত কয়েকটি প্রবন্ধকে ইহার অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছিল। স্বভাবতই এই খণ্ডে সেগুলি বর্জিত হইল। সেই প্রবন্ধগুলির নাম ও উৎস নিম্নরূপ :

সংগীত ও কবিতা	সমালোচনা।	অচলিত ২
গান সম্বন্ধে প্রবন্ধ	জীবনস্মৃতি।	রচনাবলী ১৭
অন্তরবাহির	পথের সঞ্চয়।	রচনাবলী ২৬
সংগীত	পথের সঞ্চয়।	রচনাবলী ২৬
সোনার কাঠি	পরিচয়।	রচনাবলী ১৮

রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন রচনার মধ্যে সংগীত-বিষয়ক নানা মন্তব্য প্রকীর্ণ আছে, কোথাও কোথাও তাহা সংক্ষিপ্ত, কোথাও-বা অনতিসংক্ষিপ্ত। সংগীতচিন্তা গ্রন্থে সেগুলিও সংকলিত ছিল। পাঠকদের সহায়তা হইবে মনে করিয়া এখানে সেগুলি পরম্পরায় মুদ্রিত হইল :

আত্মকথা

জীবনস্মৃতি ও ছেলেবেলা

কবে যে গান গাহিতে পারিতাম না তাহা মনে পড়ে না। মনে আছে বাল্যকালে গাঁদাফুল দিয়া ঘর সাজাইয়া মাঘোৎসবের অনুকরণে আমরা খেলা করিতাম। সে খেলায় অনুকরণের আর আর সমস্ত অঙ্গ একেবারেই অর্থহীন ছিল, কিন্তু গানটা ফাঁকি ছিল না। এই খেলায় ফুল দিয়া সাজানো একটা টেবিলের উপরে বসিয়া আমি উচ্চকণ্ঠে 'দেখিলে তোমার সেই অতুল প্রেম-আননে' গান গাহিতেছি বেশ মনে পড়ে।

চিরকালই গানের সুর আমার মনে একটা অনির্বচনীয় আবেগ উপস্থিত করে। এখনো কাজকর্মের মাঝখানে হঠাৎ একটা গান শুনিলে আমার কাছে এক মুহূর্তেই সমস্ত সংসারের ভাবান্তর হইয়া যায়। এই-সমস্ত চোখে দেখার রাজ্য গানে-শোনার মধ্য দিয়ে হঠাৎ একটা কী নূতন অর্থ লাভ করে। হঠাৎ মনে হয় আমরা যে জগতে আছি বিশেষ করিয়া কেবল তাহার একটা তলার সঙ্গেই সম্পর্ক রাখিয়াছি, এই আলোকের তলা, বস্তুর তলা— কিন্তু এইটেই সমস্তটা নয়। যখন এই বিপুল রহস্যময় প্রাসাদে সুর আর-একটা মহলের একটা জালনা ক্ষণিকের জন্য খুলিয়া দেয় তখন আমরা কী দেখিতে পাই! সেখানকার কোনো অভিজ্ঞতা আমাদের নাই, সেইজন্য ভাষায় বলিতে পারি না কী পাইলাম— কিন্তু বুঝিতে পারি সে দিকেও অপরিসীম সত্যপদার্থ আছে। বিশ্বের সমস্ত স্পন্দিত জাগ্রত শক্তি আজ প্রধানত বস্তু ও আলোক -রূপেই প্রতিভাত হইতেছে বলিয়া আজ আমরা এই সূর্যের আলোকে বস্তুর অক্ষর দিয়াই বিশ্বকে অহরহ পাঠ করিতেছি, আর কোনো অবস্থা কল্পনা করিতে পারি না— কিন্তু এই অসীম স্পন্দন যদি আমাদের কাছে আর-কিছু না হইয়া কেবল গগনব্যাপী অতি বিচিত্র সংগীত রূপেই প্রকাশ পাইত, তবে অক্ষররূপে নহে, বাণীরূপেই আমরা সমস্ত পাইতাম। গানের সুরে যখন অন্তঃকরণের সমস্ত তন্ত্রী কাঁপিয়া উঠে তখন অনেক সময় আমার কাছে এই দৃশ্যমান জগৎ যেন আকার-আয়তন-হীন বাণীর ভাবে আপনাকে ব্যক্ত করিতে চেষ্টা করে— তখন যেন বুঝিতে পারি জগৎটাকে যে ভাবে জানিতেছি তাহা ছাড়া কত রকম ভাবেই যে উহাকে জানা যাইতে পারিত তাহা আমরা কিছুই জানি না।

২

বিষ্ণুর কাছে দিশি গান শুরু হয়েছে শিশুকাল থেকে। গানের এই পাঠশালায় আমাকেও ভর্তি হতে হল। বিষ্ণু যে গানে হাতেখড়ি দিলেন এখনকার কালের কোনো নামী বা বেনামী ওস্তাদ তাকে ছুঁতে ঘৃণা করবেন। সেগুলো পাড়াগেঁয়ে ছড়ার অত্যন্ত নীচের তলায়। দুই-একটা নমুনা দিই—

এক-যে ছিল বেদের মেয়ে— এল পাড়াতে
সাধের উল্কি পরাতে।
আবার উল্কি-পরা যেমন-তেমন,
লাগিয়ে দিল ভেল্কি—
ঠাকুরঝি!
উল্কি জ্বালাতে কত কেঁদেছি
ঠাকুরঝি!

আরো কিছু ছেঁড়া-ছেঁড়া লাইন মনে পড়ে, যেমন—

চন্দ্র সূর্য হার মেনেছে, জোনাক জ্বালে বাতি।
মোগল পাঠান হদ্দ হল, ফার্সি পড়ে তাঁতি।

* * *

গণেশের মা, কলাবউকে জ্বালা দিয়ো না,
তার একটি মোচা ফললে পরে
কত হবে ছানাপোনা।

অতি পুরোনো কালের ভুলে-যাওয়া খবরের আমেজ আসে এমন লাইনও পাওয়া যায়, যেমন—

এক-যে ছিল কুকুর-চাটা শেয়াল-কাঁটার বন
কেটে করলে সিংহাসন।

এখনকার নিয়ম হচ্ছে প্রথমে হারমোনিয়মে সুর লাগিয়ে সা রে গা মা সাধানো, তার পরে হালকা গোছের হিন্দিগান ধরিয়ে দেওয়া। তখন আমাদের পড়াশুনোর যিনি তদারক করতেন তিনি বুঝেছিলেন— ছেলেমানুষি ছেলেদের মনের আপন জিনিস, আর ঐ হালকা বাংলাভাষা হিন্দিবুলির চেয়ে মনের মধ্যে সহজে জায়গা করে নেয়। তা ছাড়া এ ছন্দের দিশি তাল বাঁয়া-তবলার বোলের তোয়াক্কা রাখে না, আপনা-আপনি নাড়ীতে নাচতে থাকে। শিশুদের মন-ভোলানো প্রথম সাহিত্য শেখানো মায়ের মুখের ছড়া দিয়ে, শিশুদের মন-ভোলানো গান শেখানোর শুরু সেই ছড়ায়— এইটে আমাদের উপর দিয়ে পরখ করানো হয়েছিল।

তখন হারমোনিয়ম আসে নি এ দেশের গানের জাত মারতে। কাঁধের উপর তম্বুরা তুলে গান অভ্যেস করেছি। কল-টেপা সুরের গোলামি করি নি।

আমার দোষ হচ্ছে— শেখবার পথে কিছুতেই আমাকে বেশি দিন চালাতে পারে নি। ইচ্ছেমতো কুড়িয়ে-বাড়িয়ে যা পেয়েছি, ঝুলি ভর্তি করেছি তাই দিয়েই। মন দিয়ে শেখা যদি আমার ধাতে থাকত তা হলে এখনকার দিনের ওস্তাদরা আমাকে তাচ্ছিল্য করতে পারত না। কেননা সুযোগ ছিল বিস্তর। যে কয়দিন আমাদের শিক্ষা দেবার কর্তা ছিলেন সেজদাদা, ততদিন বিষ্ণুর কাছে আনমনা ভাবে ব্রহ্মসংগীত আউড়েছি। কখনো কখনো যখন মন আপনা হতে লেগেছে তখন গান আদায় করেছি দরজার পাশে দাঁড়িয়ে। সেজদাদা বেহাগে আওড়াচ্ছেন 'অতিগজগামিনীরে', আমি লুকিয়ে মনের মধ্যে তার ছাপ তুলে নিচ্ছি। সন্ধেবেলায় মাকে সেই গান শুনিয়ে অবাক করা খুব সহজ কাজ ছিল।

আমাদের বাড়ির বন্ধু শ্রীকণ্ঠবাবু দিনরাত গানের মধ্যে তলিয়ে থাকতেন। বারান্দায় বসে বসে চামেলির তেল মেখে স্নান করতেন ; হাতে থাকত গুড়গুড়ি, অম্বুরি তামাকের গন্ধ উঠত আকাশে ; গুন্ গুন্ গান চলত, ছেলেদের টেনে রাখতেন চার দিকে। তিনি তো গান শেখাতেন না, গান তিনি দিতেন, কখন তুলে নিতুম জানতে পারতুম না। ফুর্তি যখন রাখতে পারতেন না, দাঁড়িয়ে উঠতেন ; নেচে নেচে বাজাতে থাকতেন সেতার, হাসিতে বড়ো বড়ো চোখ জ্বল্ জ্বল্ করত, গান ধরতেন—

'ময় ছোড়োঁ ব্রজকী বাসরী।'

সঙ্গে সঙ্গে আমিও না গাইলে ছাড়তেন না।...

তার পরে যখন আমার কিছু বয়স হয়েছে তখন বাড়িতে খুব বড়ো ওস্তাদ এসে বসলেন যদুভট্ট। একটা মস্ত ভুল করলেন, জেদ ধরলেন আমাকে গান শেখাবেনই— সেইজন্যে গান শেখাই হল না। কিছু-কিছু সংগ্রহ করেছিলুম লুকিয়ে-চুরিয়ে। ভালো লাগল কাফি সুরে 'রুম ঝুম বরখে আজু বাদরওয়া' ; রয়ে গেল আজ পর্যন্ত আমার বর্ষার গানের সঙ্গে দল বেঁধে।

৩

গান সম্বন্ধে আমি শ্রীকণ্ঠবাবুর প্রিয়শিষ্য ছিলাম। তাঁহার একটা গান ছিল— 'ময় ছোড়োঁ ব্রজকী বাসরী।' ঐ গানটি আমার মুখে সকলকে শোনাইবার জন্য তিনি আমাকে ঘরে ঘরে টানিয়া লইয়া বেড়াইতেন। আমি গান ধরিতাম, তিনি সেতারে ঝঙ্কার দিতেন এবং যেখানটিতে গানের প্রধান ঝোঁক 'ময় ছোড়োঁ', সেইখানটাতে মাতিয়া উঠিয়া তিনি নিজে যোগ দিতেন ও অশ্রান্তভাবে সেটা ফিরিয়া ফিরিয়া আবৃত্তি করিতেন এবং মাথা নাড়িয়া মুগ্ধদৃষ্টিতে সকলের মুখের দিকে চাহিয়া যেন সকলকে ঠেলা দিয়া ভালো লাগায় উৎসাহিত করিয়া তুলিতে চেষ্টা করিতেন।

ইনি আমার পিতার ভক্তবন্ধু ছিলেন। ইঁহারই দেওয়া হিন্দিগান হইতে ভাঙা একটি ব্রহ্মসংগীত আছে— 'অন্তরতর অন্তরতম তিনি যে, ভুল না রে তাঁয়।' এই গানটি তিনি পিতৃদেবকে শোনাইতে শোনাইতে আবেগে চৌকি ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইতেন। সেতারে ঘন ঘন ঝঙ্কার দিয়া একবার বলিতেন 'অন্তরতর অন্তরতম তিনি যে', আবার পালটাইয়া লইয়া তাঁহার মুখের সম্মুখে হাত নাড়িয়া বলিতেন 'অন্তরতর অন্তরতম তুমি যে'।

৪

সাহিত্যের শিক্ষায়, ভাবের চর্চায়, বাল্যকাল হইতে জ্যোতিদাদা আমার প্রধান সহায় ছিলেন। তিনি নিজে উৎসাহী এবং অন্যকে উৎসাহ দিতে তাঁহার আনন্দ।...

এক সময়ে পিয়ানো বাজাইয়া জ্যোতিদাদা নূতন নূতন সুর তৈরি করায় মাতিয়াছিলেন। প্রত্যহই তাঁহার অঙ্গুলিনৃত্যের সঙ্গে সঙ্গে সুরবর্ষণ হইতে থাকিত। আমি এবং অক্ষয়বাবু তাঁহার সদ্যোজাত সুরগুলিকে কথা দিয়া বাঁধিয়া রাখিবার চেষ্টায় নিযুক্ত ছিলাম। গান বাঁধিবার শিক্ষানবিসি এইরূপে আমার আরম্ভ হইয়াছিল।

আমাদের পরিবারে শিশুকাল হইতে গানচর্চার মধ্যেই আমরা বাড়িয়া উঠিয়াছি। আমার পক্ষে তাহার একটা সুবিধা এই হইয়াছিল— অতি সহজেই গান আমার সমস্ত প্রকৃতির মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল। তাহার অসুবিধাও ছিল। চেষ্টা করিয়া গান আয়ত্ত করিবার উপযুক্ত অভ্যাস না হওয়াতে শিক্ষা পাকা হয় নাই। সংগীতবিদ্যা বলিতে যাহা বোঝায় তাহার মধ্যে কোনো অধিকার লাভ করিতে পারি নাই।

৫

একদিন মধ্যাহ্নে খুব মেঘ করিয়াছে। সেই মেঘলাদিনের ছায়াঘন অবকাশের আনন্দে বাড়ির ভিতরে এক ঘরে খাটের উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া একটা স্লেট লইয়া লিখিলাম 'গহনকুসুমকুঞ্জমাঝে'। লিখিয়া ভারী খুশি হইলাম; তখনি এমন লোককে পড়িয়া শুনাইলাম, বুঝিতে পারিবার আশঙ্কামাত্র যাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। সুতরাং সে গম্ভীরভাবে মাথা নাড়িয়া কহিল, 'বেশ তো, এ তো বেশ হইয়াছে।'

৬

সকলের উপরের তলায় একটি ছোটো ঘরে আমার আশ্রয় ছিল। রাত্রেও আমি সেই নির্জন ঘরে শুইয়া থাকিতাম। শুক্লপক্ষের নিস্তব্ধ রাত্রে আমি সেই নদীর দিকের প্রকাণ্ড ছাদটাতে একলা ঘুরিয়া বেড়াইয়াছি। এইরূপ একটা রাত্রে আমি যেমন-খুশি ভাঙা ছন্দে একটা গান তৈরি করিয়াছিলাম— তাহার প্রথম চারটে লাইন উদ্‌ধৃত করিতেছি—

নীরব রজনী দেখো মগ্ন জোছনায়,
ধীরে ধীরে অতি ধীরে গাও গো!
ঘুমঘোরভরা গান বিভাবরী গায়,
রজনীর কণ্ঠসাথে সুকণ্ঠ মিলাও গো!

ইহার বাকি অংশ পরে ভদ্রছন্দে বাঁধিয়া পরিবর্তিত করিয়া তখনকার গানের বহিতে ছাপাইয়াছিলাম— কিন্তু সেই পরিবর্তনের মধ্যে, সেই সাবরমতী-নদীতীরের, সেই ক্ষিপ্ত বালকের নিদ্রাহারাগ্রীষ্ম-রজনীর কিছুই ছিল না। 'বলি ও আমার গোলাপবালা' গানটা এমনি আর-এক রাত্রে লিখিয়া বেহাগ সুরে বসাইয়া গুন্‌ গুন্‌ করিয়া গাহিয়া বেড়াইতেছিলাম। 'শুন নলিনী খোলো গো আঁখি' 'আঁধার শাখা উজল করি' প্রভৃতি আমার ছেলেবেলাকার অনেকগুলি গান এইখানেই লেখা।

৭

আমাদের বাড়িতে পাতায় পাতায় চিত্রবিচিত্র-করা কবি ম্যুরের রচিত একখানি আইরিশ মেলডীজ ছিল। অক্ষয়বাবুর কাছে সেই কবিতাগুলির মুগ্ধ আবৃত্তি অনেকবার শুনিয়াছি। ছবির সঙ্গে বিজড়িত সেই কবিতাগুলি আমার মনে আয়র্লন্ডের একটি পুরাতন মায়ালোক সৃজন করিয়াছিল। তখন এই কবিতার সুরগুলি শুনি নাই, তাহা আমার কল্পনার মধ্যেই ছিল। ছবিতে বীণা আঁকা ছিল, সেই বীণার সুর আমার মনের মধ্যে বাজিত। এই আইরিশ মেলডীজ আমি সুরে শুনিব, শিখিব এবং শিখিয়া আসিয়া অক্ষয়বাবুকে শুনাইব, ইহাই আমার বড়ো ইচ্ছা ছিল। দুর্ভাগ্যক্রমে জীবনের কোনো কোনো ইচ্ছা পূর্ণ হয় এবং হইয়াই আত্মহত্যা সাধন করে। আইরিশ মেলডীজ বিলাতে গিয়া কতকগুলি শুনিলাম ও শিখিলাম, কিন্তু আগাগোড়া সব গানগুলি সম্পূর্ণ করিবার ইচ্ছা আর রহিল না। অনেকগুলি সুর মিষ্ট এবং করুণ এবং সরল, কিন্তু তবু তাহাতে আয়র্লন্ডের প্রাচীন কবিসভার নীরব বীণা তেমন করিয়া যোগ দিল না।

দেশে ফিরিয়া আসিয়া এই-সকল এবং অন্যান্য বিলাতি গান স্বজনসমাজে গাহিয়া শুনাইলাম। সকলেই বলিলেন, 'রবির গলা এমন বদল হইল কেন! কেমন যেন বিদেশী রকমের— মজার রকমের— হইয়াছে।' এমন-কি তাঁহারা বলিতেন আমার কথা কহিবার গলায়ও একটু কেমন সুর বদল হইয়া গিয়াছে।

এই দেশী ও বিলাতি সুরের চর্চার মধ্যে বাল্মীকিপ্রতিভার জন্ম হইল। ইহার সুরগুলি অধিকাংশই দিশি, কিন্তু এই গীতিনাট্যে তাহাকে তাহার বৈঠকি মর্যাদা হইতে অন্য ক্ষেত্রে বাহির করিয়া আনা হইয়াছে ; উড়িয়া চলা যাহার ব্যবসায় তাহাকে মাটিতে দৌড় করাইবার কাজে লাগানো গিয়াছে। যাঁহারা এই গীতিনাট্যের অভিনয় দেখিয়াছেন তাঁহারা আশা করি এ কথা সকলেই স্বীকার করিবেন যে, সংগীতকে এইরূপ নাট্যকার্যে নিযুক্ত করাটা অসংগত বা নিষ্ফল হয় নাই। বাল্মীকিপ্রতিভা গীতিনাট্যের ইহাই বিশেষত্ব। সংগীতের এইরূপ বন্ধনমোচন ও তাহাকে নিঃসংকোচে সকলপ্রকার ব্যবহারে লাগাইবার আনন্দ আমার মনকে বিশেষভাবে অধিকার করিয়াছিল। বাল্মীকিপ্রতিভার অনেকগুলি গান বৈঠকিগান-ভাঙা, অনেকগুলি জ্যোতিদাদার রচিত গতের সুরে বসানো এবং গুটিতিনেক গান বিলাতি সুর হইতে লওয়া। আমাদের বৈঠকি গানের তেলেনা অঙ্গের সুরগুলিকে সহজেই এইরূপ নাটকের প্রয়োজনে ব্যবহার করা যাইতে পারে ; এই নাট্যে অনেক স্থলে তাহা করা হইয়াছে। বিলাতি সুরের মধ্যে দুইটিকে ডাকাতদের মত্ততার গানে লাগানো হইয়াছে এবং একটি আইরিশ সুর বনদেবীর বিলাপগানে বসাইয়াছি। বস্তুত, বাল্মীকিপ্রতিভা পাঠযোগ্য কাব্যগ্রন্থ নহে, উহা সংগীতের একটি নূতন পরীক্ষা— অভিনয়ের সঙ্গে কানে না শুনিলে ইহার কোনো স্বাদগ্রহণ সম্ভবপর নহে। য়ুরোপীয় ভাষায় যাহাকে অপেরা বলে, বাল্মীকিপ্রতিভা তাহা নহে, ইহা সুরে নাটিকা; অর্থাৎ সংগীতই ইহার মধ্যে প্রাধান্য লাভ করে নাই, ইহার নাট্যবিষয়টাকে সুর করিয়া অভিনয় করা হয় মাত্র, স্বতন্ত্র সংগীতের মাধুর্য ইহার অতি অল্পস্থলেই আছে।

আমার বিলাত যাইবার আগে হইতে আমাদের বাড়িতে মাঝে মাঝে বিদ্বজ্জনসমাগম নামে সাহিত্যিকদের সম্মিলন হইত। সেই সম্মিলনে গীতবাদ্য কবিতা-আবৃত্তি ও আহারের আয়োজন থাকিত। আমি বিলাত হইতে ফিরিয়া আসার পর একবার এই সম্মিলনী আহূত হইয়াছিল। ইহাই শেষবার। এই সম্মিলনী-উপলক্ষেই বাল্মীকিপ্রতিভা রচিত হয়। আমি বাল্মীকি সাজিয়াছিলাম এবং আমার ভ্রাতুষ্পুত্রী প্রতিভা সরস্বতী সাজিয়াছিল ; বাল্মীকিপ্রতিভা নামের মধ্যে সেই ইতিহাসটুকু রহিয়া গিয়াছে।

হার্বার্ট স্পেন্সরের একটা লেখার মধ্যে পড়িয়াছিলাম যে, সচরাচর কথার মধ্যে যেখানে একটু হৃদয়াবেগের সঞ্চার হয় সেখানে আপনিই কিছু-না-কিছু সুর লাগিয়া যায়। বস্তুত রাগ দুঃখ আনন্দ বিস্ময় আমরা কেবলমাত্র কথা দিয়া প্রকাশ করি না, কথার সঙ্গে সুর থাকে। এই কথাবার্তার আনুষঙ্গিক সুরটারই উৎকর্ষসাধন করিয়া মানুষ সংগীত পাইয়াছে। স্পেন্সরের এই কথাটা মনে লাগিয়াছিল। ভাবিয়াছিলাম এই মত অনুসারে আগাগোড়া সুর করিয়া নানা ভাবকে গানের ভিতর দিয়া প্রকাশ করিয়া অভিনয় করিয়া গেলে চলিবে না কেন। আমাদের দেশে কথকতায় কতকটা এই চেষ্টা আছে ; তাহাতে বাক্য মাঝে মাঝে সুরকে আশ্রয় করে, অথচ তাহা তালমানসংগত রীতিমতো সংগীত নহে। ছন্দ হিসাবে অমিত্রাক্ষর ছন্দ যেমন, গান হিসাবে এও সেইরূপ; ইহাতে তালের কড়াক্কড় বাঁধন নাই, একটা লয়ের মাত্রা আছে ; ইহার একমাত্র উদ্দেশ্য— কথার ভিতরকার ভাবাবেগকে পরিস্ফুট করিয়া তোলা, কোনো বিশেষ রাগিণী বা তালকে বিশুদ্ধ করিয়া প্রকাশ করা নহে। বাল্মীকিপ্রতিভায় গানের বাঁধন সম্পূর্ণ ছিন্ন করা হয় নাই, তবু ভাবের অনুগমন করিতে গিয়া তালটাকে খাটো করিতে হইয়াছে। অভিনয়টাই মুখ্য হওয়াতে এই তালের ব্যতিক্রম শ্রোতাদিগকে দুঃখ দেয় না।

বাল্মীকিপ্রতিভার গান সম্বন্ধে এই নূতন পন্থায় উৎসাহ বোধ করিয়া এই শ্রেণীর আরো একটা গীতিনাট্য লিখিয়াছিলাম, তাহার নাম কালমৃগয়া। দশরথ-কর্তৃক অন্ধমুনির পুত্রবধ তাহার নাট্যবিষয়। তেতালার ছাদে স্টেজ খাটাইয়া ইহার অভিনয় হইয়াছিল ; ইহার করুণ রসে শ্রোতারা

অত্যন্ত বিচলিত হইয়াছিলেন। পরে; এই গীতনাট্যের অনেকটা অংশ বাল্মীকিপ্রতিভার সঙ্গে মিশাইয়া দিয়াছিলাম।...

ইহার অনেক কাল পরে 'মায়ার খেলা' বলিয়া আর-একটা গীতনাট্য লিখিয়াছিলাম, কিন্তু সেটা ভিন্ন জাতের জিনিস। তাহাতে নাট্য মুখ্য নহে, গীতই মুখ্য। বাল্মীকিপ্রতিভা ও কালমৃগয়া যেমন গানের সূত্রে নাট্যের মালা, মায়ার খেলা তেমনি নাট্যের সূত্রে গানের মালা। ঘটনাস্রোতের 'পরে তাহার নির্ভর নহে, হৃদয়াবেগই তাহার প্রধান উপকরণ। বস্তুত, মায়ার খেলা যখন লিখিয়াছিলাম তখন গানের রসেই সমস্ত মন অভিষিক্ত হইয়া ছিল।

বাল্মীকিপ্রতিভা ও কালমৃগয়া যে উৎসাহে লিখিয়াছিলাম, সে উৎসাহে আর-কিছু রচনা করি নাই। ওই দুটি গ্রন্থে আমাদের সেই সময়কার একটা সংগীতের উত্তেজনা প্রকাশ পাইয়াছে। জ্যোতিদাদা তখন প্রত্যহই প্রায় সমস্ত দিন ওস্তাদি গানগুলাকে পিয়ানো যন্ত্রের মধ্যে ফেলিয়া তাহাদিগকে যথেচ্ছা মন্থন করিতে প্রবৃত্ত ছিলেন। তাহাতে ক্ষণে ক্ষণে রাগিণীগুলির এক-একটি অপূর্বমূর্তি ও ভাবব্যঞ্জনা প্রকাশ পাইত। যে-সকল সুর বাঁধা নিয়মের মধ্যে মন্দগতিতে দস্তুর রাখিয়া চলে তাহাদিগকে প্রথাবিরুদ্ধ বিপর্যস্তভাবে দৌড় করাইবা মাত্র সেই বিপ্লবে তাহাদের প্রকৃতিতে নূতন নূতন অভাবনীয় শক্তি দেখা দিত এবং তাহাতে আমাদের চিত্তকে সর্বদা বিচলিত করিয়া তুলিত। সুরগুলা যেন নানা প্রকার কথা কহিতেছে এইরূপ আমরা স্পষ্ট শুনিতে পাইতাম। আমি ও অক্ষয়বাবু অনেক সময়ে জ্যোতিদাদার সেই বাজনার সঙ্গে সঙ্গে সুরে কথা যোজনার চেষ্টা করিতাম। কথাগুলি যে সুপাঠ্য হইত তাহা নহে, তাহারা সেই সুরগুলির বাহনের কাজ করিত।

এইরূপ একটা দস্তুরভাঙা গীতবিপ্লবের প্রলয়ানন্দে এই দুটি নাট্য লেখা। এইজন্য উহাদের মধ্যে তাল-বেতালের নৃত্য আছে এবং ইংরেজি-বাংলার বাছবিচার নাই। আমার অনেক মত ও রচনারীতিতে আমি বাংলা দেশের পাঠকসমাজকে বারংবার উত্ত্যক্ত করিয়া তুলিয়াছি, কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, সংগীত সম্বন্ধে উক্ত দুই গীতিনাট্যে যে দুঃসাহসিকতা প্রকাশ পাইয়াছে তাহাতে কেহই কোনো ক্ষোভ প্রকাশ করেন নাই এবং সকলেই খুশি হইয়া ঘরে ফিরিয়াছেন। বাল্মীকিপ্রতিভায় অক্ষয়বাবুর কয়েকটি গান আছে এবং ইহার দুইটি গানে বিহারী চক্রবর্তী মহাশয়ের সারদামঙ্গলসংগীতের দুই-এক স্থানের ভাষা ব্যবহার করা হইয়াছে।

এই দুটি গীতিনাট্যের অভিনয়ে আমিই প্রধান পদ গ্রহণ করিয়াছিলাম। বাল্যকাল হইতেই আমার মনের মধ্যে নাট্যাভিনয়ের শখ ছিল। আর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল এ কার্যে আমার স্বাভাবিক নিপুণতা আছে। আমার এই বিশ্বাস অমূলক ছিল না তাহার প্রমাণ হইয়াছে। নাট্যমঞ্চে সাধারণের সমক্ষে প্রকাশ হইবার পূর্বে জ্যোতিদাদার 'এমন কর্ম আর করব না' প্রহসনে আমি অলীকবাবু সাজিয়াছিলাম। সেই আমার প্রথম অভিনয়। তখন আমার অল্প বয়স, গান গাহিতে আমার কণ্ঠের ক্লান্তি বা বাধামাত্র ছিল না; তখন বাড়িতে দিনের পর দিন, প্রহরের পর প্রহর সংগীতের অবিরলবিগলিত ঝরনা ঝরিয়া তাহার শীকরবর্ষণে মনের মধ্যে সুরের রামধনুকের রঙ ছড়াইয়া দিতেছে; তখন নবযৌবনে নব নব উদ্যম নূতন নূতন কৌতূহলের পথ ধরিয়া ধাবিত হইতেছে; তখন সকল জিনিসই পরীক্ষা করিয়া দেখিতে চাই, কিছু যে পারিব না এমন মনেই হয় না; তখন লিখিতেছি, গাহিতেছি, অভিনয় করিতেছি, নিজেকে সকল দিকেই প্রচুরভাবে ঢালিয়া দিতেছি— আমার সেই কুড়ি বছরের বয়সটাতে এমনি করিয়া পদক্ষেপ করিয়াছি।

৮

আমার গঙ্গাতীরের সেই সুন্দর দিনগুলি [১৮৮১] গঙ্গার-জলে-উৎসর্গ-করা পূর্ণবিকশিত পদ্মফুলের মতো একটি একটি করিয়া ভাসিয়া যাইতে লাগিল। কখনো-বা ঘনঘোর বর্ষার দিনে হারমোনিয়ম

যন্ত্র -যোগে বিদ্যাপতির ‘ভরাবাদর মাহভাদর’ পদটিতে মনের মতো সুর বসাইয়া বর্ষার রাগিণী গাহিতে গাহিতে বৃষ্টিপাতমুখরিত জলধারাচ্ছন্ন মধ্যাহ্ন খ্যাপার মতো কাটাইয়া দিতাম। কখনো-বা সূর্যাস্তের সময় আমরা নৌকা লইয়া বাহির হইয়া পড়িতাম ; জ্যোতিদাদা বেহালা বাজাইতেন, আমি গান গাহিতাম— পূরবী রাগিণী হইতে আরম্ভ করিয়া যখন বেহাগে গিয়া পৌঁছিতাম তখন পশ্চিমতটের আকাশে সোনার খেলনার কারখানা একেবারে নিঃশেষে দেউলে হইয়া গিয়া পূর্ববনান্ত হইতে চাঁদ উঠিয়া আসিত। আমরা যখন বাগানের ঘাটে ফিরিয়া আসিয়া নদীতীরের ছাদটার উপরে বিছানা করিয়া বসিতাম তখন জলে স্থলে শুভ্র শান্তি, নদীতে নৌকা প্রায় নাই, তীরের বনরেখা অন্ধকারে নিবিড়, নদীর তরঙ্গহীন প্রবাহের উপর আলো ঝিক্ ঝিক্ করিতেছে।

৯

কারোয়ার হইতে ফিরিবার সময় [১৮৮৩] জাহাজে ‘প্রকৃতির প্রতিশোধ’-এর কয়েকটি গান লিখিয়াছিলাম। বড়ো একটি আনন্দের সঙ্গে প্রথম গানটি জাহাজের ডেকে বসিয়া সুর দিয়া-দিয়া গাহিতে-গাহিতে রচনা করিয়াছিলাম—

হ্যাদে গো নন্দরানী,
আমাদের শ্যামকে ছেড়ে দাও—
আমরা রাখালবালক গোষ্ঠে যাব,
আমাদের শ্যামকে দিয়ে যাও।

সকালের সূর্য উঠিয়াছে, ফুল ফুটিয়াছে, রাখালবালকরা মাঠে যাইতেছে— সেই সূর্যোদয়, সেই ফুল ফোটা, সেই মাঠে বিহার, তাহারা শূন্য রাখিতে চায় না ; সেইখানেই তাহারা তাহাদের শ্যামের সঙ্গে মিলিত হইতে চাহিতেছে, সেইখানেই অসীমের সাজ-পরা রূপটি তাহারা দেখিতে চায় ; সেইখানেই মাঠেঘাটে বনে-পর্বতে অসীমের সঙ্গে আনন্দের খেলায় তাহারা যোগ দিবে বলিয়াই তাহারা বাহির হইয়া পড়িয়াছে ; দূরে নয়, ঐশ্বর্যের মধ্যে নয় ; তাহাদের উপকরণ অতি সামান্য, পীতধড়া ও বনফুলের মালাই তাহাদের সাজের পক্ষে যথেষ্ট— কেননা, সর্বত্রই যাহার আনন্দ তাহাকে কোনো বড়ো জায়গায় খুঁজিতে গেলে, তাহার জন্য আয়োজন আড়ম্বর করিতে গেলেই, লক্ষ্য হারাইয়া ফেলিতে হয়।

১০

আমি যে সময়কার কথা বলিতেছি সে সময়ের দিকে তাকাইলে দেখিতে পাই তখন শরৎ ঋতু সিংহাসন অধিকার করিয়া বসিয়াছে। তখনকার জীবনটা আশ্বিনের একটা বিস্তীর্ণ স্বচ্ছ অবকাশের মাঝখানে দেখা যায়— সেই শিশিরে-ঝলমল-করা সরস সবুজের উপর সোনাগলানো রৌদ্রের মধ্যে, মনে পড়িতেছে, দক্ষিণের বারান্দায় গান বাঁধিয়া তাহাতে যোগিয়া সুর লাগাইয়া গুন্ গুন্ করিয়া গাহিয়া বেড়াইতেছি— সেই শরতের সকালবেলায়।—

আজি শরততপনে প্রভাতস্বপনে
কী জানি পরান কী যে চায়।

বেলা বাড়িয়া চলিতেছে, বাড়ির ঘণ্টায় দুপুর বাজিয়া গেল, একটা মধ্যাহ্নের গানের আবেশে

যায় শান্তিনিকেতন পত্র ১৩২৬ আশ্বিন-কার্তিক সংখ্যায় প্রকাশিত 'প্রতিশব্দ' প্রবন্ধে (বর্তমান গ্রন্থে প্রতিশব্দ ৪ : পৃ ৩৮৮-৩৯০)। সুধীরকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়কে লিখিত পত্রে (৪ আষাঢ় ১৩৩৯) প্রশ্নটি আবার ওঠে 'প্রথমত culture শব্দের বাংলা একটি করতে হবে...' (বর্তমান গ্রন্থে প্রতিশব্দ ১৪ : পৃ ৩৯৫-৩৯৬ দ্রষ্টব্য)। কিন্তু ইতিমধ্যে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় 'সংস্কৃতি' শব্দটির প্রতি রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। এই প্রসঙ্গে সুনীতিকুমার পরবর্তীকালে লিখিয়াছিলেন :

"...কালচার শব্দের মূলে আছে লাতীনের cultura 'কুলতুরা' শব্দ ; এই শব্দ লাতীনের col 'কোল' ধাতু থেকে হ'য়েছে, col অর্থে 'কৃষ্, চাষ করা', আবার 'যত্ন' করা', 'পূজা করা'-ও হয়। culture-এর অনুরূপ প্রতিশব্দ 'উৎকর্ষ-সাধন' বেশ হ'তে পারে, খালি 'উৎকর্ষ' শব্দও চ'লতে পারে। 'টানা' ও পরে 'লাঙ্গল টানা' বা 'চাষ করা' অর্থে, 'কৃষ্' ধাতু থেকে জাত 'কৃষ্টি' শব্দটিকে অর্থের দিক থেকে culture-এর প্রতিরূপ শব্দ মনে ক'রে, বাঙলায় ব্যবহার করা হ'তে থাকে বোধ হয় গত তিরিশ বছরের ভিতরে। বঙ্কিমচন্দ্র culture অর্থে 'অনুশীলন' শব্দ ব্যবহার করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথও 'কৃষ্টি' শব্দটি গতানুগতিকভাবে গ্রহণ ক'রে থাকবেন— যদি তিনি স্বয়ং এই শব্দটি বাঙলায় চালিয়ে না থাকেন। 'কৃষ্টি'র অর্থগত পরিবর্তন বৈদিক আর সংস্কৃত সাহিত্যে যা দেখা যায়, তা থেকে কিন্তু বাঙলায় গৃহীত এর culture-অর্থ সমর্থিত হয় না। ...'চাষ'-অর্থে 'কৃষ্টি' শব্দ পরবর্তী সংস্কৃতে মেলে— culture-অর্থে নয়। সেইজন্য রবীন্দ্রনাথ 'কৃষ্টি' শব্দটি সম্বন্ধে একটু অস্বস্তিতে ছিলেন।

'সংস্কৃতি' শব্দ culture-এর প্রতিশব্দ হিসাবে পেয়ে রবীন্দ্রনাথ খুবই খুশী হন। এই শব্দটি বাঙলায় এখন থেকে ২৪/২৫ বছর আগে কেউ ব্যবহার ক'রেছেন কি না জানি না। 'সংস্কার' শব্দটি অবশ্য পাওয়া যায়, তা কিন্তু culture-অর্থে নয় ; কতকগুলি সামাজিক ধর্মীয় অনুষ্ঠান (যেমন, বিবাহ-সংস্কার), আর 'সংস্কৃতি' শব্দটি culture বা civilization অর্থে আমি পাই প্রথমে ১৯২২ সালে প্যারিসে, আমার এক মহারাষ্ট্রীয় বন্ধুর কাছে। culture-এর বেশ ভালো প্রতিশব্দ ব'লে শব্দটি আমার মনে লাগে। আমার বন্ধু শব্দটি পেয়ে আমার আনন্দ দেখে একটু বিস্মিত হন —তিনি ব'ললেন যে তাঁরা তো বহুকাল ধ'রে মারাঠী ভাষায় এই শব্দ ব্যবহার ক'রে আসছেন।[১]

১৯২২ সালে দেশে ফিরে এসে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে এ বিষয়ে আলাপ করি। 'সংস্কৃতি' শব্দটির প্রতি তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করি। তিনি আগে থাকতেই এই শব্দটি পেয়েছিলেন কি না, জানি না— সম্ভবতঃ শব্দটি তাঁর অবিদিত ছিল না। তবে আমার বেশ মনে আছে, culture-এর প্রতিশব্দ হিসাবে 'সংস্কৃতি' শব্দ সম্বন্ধে তিনি তাঁর সম্পূর্ণ অনুমোদন জ্ঞাপন করেন, 'কৃষ্টি' শব্দ আর ব্যবহার করা ঠিক হয় না, একথাও বলেন।"...

—সোনার বাংলা, শারদীয় সংখ্যা ১৩৫৩
অপিচ 'সংস্কৃতি শিল্প ইতিহাস', ১৯৭৬, পৃ ৭-৮

১৩॥ [১] এই প্রসঙ্গে বিজয়চন্দ্র মজুমদারকে রবীন্দ্রনাথ যে পত্র (প্রবাসী, জ্যৈষ্ঠ ১৩৫০) লেখেন, তাহা এ স্থলে সংযোজিত হইল :

আমাদের 'শান্তিনিকেতন' নামক ছোটো একটি পত্রে 'বাংলা কথ্যভাষা' প্রবন্ধে প্রসঙ্গক্রমে বাংলা শব্দ উচ্চারণ লইয়া দুই-একটা কথা বলিয়াছিলাম এবং সেইসঙ্গে ব্যাকরণ ঘটিত মন্তব্যও কিছু ছিল। আপনি তাহা লইয়া 'প্রবাসী'তে যে মন্তব্য লিখিয়া পাঠাইয়াছেন তাহার প্রতিলিপিখানি

---

[১] দ্রষ্টব্য, কালচার ও সংস্কৃতি : ২

পড়িয়া বিশেষ আনন্দলাভ করিলাম। বাংলা ভাষার সোদরা ভাষাগুলির সহিত পরিচয় না থাকাতে এ সকল বিষয়ে অনেক কথাই আন্দাজে বলিয়া থাকি। কিন্তু আন্দাজে বলারও একটা গুণ এই যে তাহাতে আলোচনার ও সংশোধনের অবকাশ দেওয়া হয়। চাণক্যের উপদেশ (যাবৎ কিঞ্চিৎ ন ভাষতে) যদি শিরোধার্য করিয়া লইতাম তবে তাহা শোভন হইত কিন্তু কল্যাণকর হইত না— আমার তরফে এইমাত্র কৈফিয়ৎ। দুই অক্ষরের বিশেষণ বাংলা ভাষার স্বরান্ত হইয়া থাকে এই নিয়ম সম্বন্ধে আমাদের কোনো পাঠকের নিকট হইতে প্রতিবাদ পাইয়াছি এবং এবারকার 'শান্তিনিকেতন' পত্রে এই নিয়মের ক্বচিৎ অন্যথা সম্ভাবনা স্বীকার করিয়া লইয়াছি। এই সম্ভাবনা আমার পূর্বেও জানা ছিল কিন্তু উক্ত নিয়মের উল্লেখ নিতান্ত প্রসঙ্গক্রমে ঘটাতে ভাষাপ্রয়োগে সতর্ক হইতে ভুলিয়াছিলাম। যাহা হউক আপনার মন্তব্য সম্বন্ধে আমার যাহা প্রশ্ন আছে তাহা পৌষের শান্তিনিকেতনে প্রকাশ করিব এবং আপনাকে পাঠাইয়া দিব। বাংলা ভাষাতত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করিতে ইচ্ছা হয়— কারণ ইহাতে আমার বিশেষ ঔৎসুক্য আছে কিন্তু আমার সম্বল বেশি নাই, তাই আন্দাজ লইয়া আমার কারবার। আমার মত ইস্কুলপলাতক ছেলের এই দুর্গতি। ...৭ অগ্রহায়ণ ১৩২৬

এই পত্রে উল্লিখিত বিজয়চন্দ্র মজুমদারের মন্তব্য সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের 'প্রশ্ন' যাহা পৌষের শান্তিনিকেতন পত্র-তে প্রকাশিত হয় তাহা বর্তমান খণ্ডে 'বাদানুবাদ ২' (পৃ ৪১৬-৪১৭) নামে সংকলিত। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে 'বাদানুবাদ ২'-এ রবীন্দ্রনাথ 'কবিরাজ মহাশয়ের নির্দেশমত' সংশোধনে রাজি হইয়াছিলেন, বর্তমান খণ্ডে 'বাংলা কথ্যভাষা [১]' প্রবন্ধটিতে তাহা গৃহীত হয় নাই। সাময়িক পত্রে প্রকাশিত রূপই মুদ্রিত হইয়াছে।

১৯ প্রবাসীতে প্রকাশিত এই প্রবন্ধের সূত্রে আশুতোষ ভট্টাচার্য ও বিজনবিহারী ভট্টাচার্য যে মন্তব্য করেন, সেগুলি প্রবাসী-র ফাল্গুন-সংখ্যায় (পৃ ৭১১-১৩) প্রকাশিত হয়।

২২ চলিত ভাষার বানান সম্বন্ধে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের যে প্রসঙ্গ এই প্রবন্ধে আছে তাহার উল্লেখ মণীন্দ্রকুমার ঘোষকে লিখিত পত্রেও দেখা যায় :

চলতি বাংলার বানান সম্বন্ধে প্রশান্ত বিধান নিয়েছিলেন সুনীতির কাছ থেকে। নিয়মগুলো মনে রাখতে পারি নে, অন্যমনস্ক হয়ে হাজারবার লঙ্ঘন করি। সেইজন্য অসঙ্গতি সর্বদাই দেখা যায়।

যে হেতু বাংলা অক্ষরে বিদেশী কথা সর্বদাই লিখতে হচ্চে সেইজন্যে অনেক নূতন ধ্বনির জন্যে নূতন অক্ষর রচনা করা আবশ্যক— আমাদের মনটা অত্যন্ত সাবেক কেলে বলে শীঘ্র এর কোনো কিনারা হবে বলে বোধ হয় না।

প্রাকৃত বাংলার প্রভাব বাংলা সাহিত্যে বেড়ে চলেচে কিন্তু ভাষার এই যুগান্তরের সময় হাওয়াটা এলোমেলে [এলোমেলো] ভাবেই বইচে। এ সময়কার কর্ণধারের কাজ সুনীতির নেওয়া উচিত— আমার বয়স হয়ে গেছে।

প্রাকৃত বানানের বিধিবিধান মনে রেখে প্রুফ সংশোধনের দায়িত্ব নেওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব বলেই অন্যদের হাতে সে ভার পড়েচে— সেই অন্যরাও নানাবিধ মানুষের মধ্যে বিভক্ত সেই কারণেই উচ্ছৃঙ্খলতার অন্ত নেই। ইতি ১৯ ভাদ্র ১৩৩৮

'কেবল প্রাকৃত বাংলার অভিধান'ই নয় 'নূতন অক্ষর রচনা' সম্বন্ধেও তিনি সুনীতিকুমারের মত 'প্রত্যাশা' করিয়াছিলেন।— ১৩৩৪ সালের ৯ অগ্রহায়ণ তারিখে তিনি সুনীতিকুমারকে লিখিয়াছিলেন :

"নূতন অক্ষর রচনা সম্বন্ধে যে আলোচনা হয়েছিল সেটাকে কাজে খাটাবার সময় এল।

বিচিত্রা সম্পাদক তোমার নির্দেশ অনুসারে অক্ষর ঢালাই করতে রাজি আছেন এবং তুমি সে বিষয়ে ব্যাখ্যা করে যদি কিছু লেখ তাঁরা সেটাকে প্রকাশ করতে চান— এ সম্বন্ধে এ দেশে তোমার মতই সব চেয়ে প্রামাণ্য এই কারণে বাংলা বর্ণমালায় নূতন অক্ষর যোজন তোমার মত ধ্বনিতত্ত্ববিশারদের কাছেই প্রত্যাশা করি।..."

২৩ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়-কর্তৃক নিযুক্ত বাংলা বানান-সংস্কার সমিতি যে 'বাংলা বানানের নিয়ম' (মে ১৯৩৬) প্রকাশ করেন তার ভূমিকায় শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় লেখেন :

"কিছুকাল পূর্বে রবীন্দ্রনাথ চলিত বাংলা বানানের রীতি নির্দিষ্ট করিয়া দিবার জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে অনুরোধ করেন। গত নভেম্বর মাসে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বানানের নিয়ম-সংকলনের জন্য একটি সমিতি গঠন করেন। সমিতিকে ভার দেওয়া হয়— যে সকল বানানের মধ্যে ঐক্য নাই সে সকল যথাসম্ভব নির্দিষ্ট করা এবং যদি বাধা না থাকে তবে কোনো কোনো স্থলে প্রচলিত বানান সংস্কার করা। প্রায় দুই শত বিশিষ্ট লেখক ও অধ্যাপকের অভিমত আলোচনা করিয়া সমিতি বানানের নিয়ম সংকলন করিয়াছেন।"

এই পুস্তিকার দ্বিতীয় সংস্করণের (অক্টোবর ১৯৩৬) সূচনায় রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সম্মতির পাণ্ডুলিপিচিত্র বিজ্ঞাপিত হইয়াছিল :

বাংলা বানান সম্বন্ধে যে নিয়ম বিশ্ববিদ্যালয় নির্দিষ্ট করিয়া দিলেন আমি তাহা পালন করিতে সম্মত আছি।

১১ সেপ্টেম্বর ১৯৩৬ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
১লা আশ্বিন ১৩৪৩

২৬ দেবপ্রসাদ ঘোষের যে পত্রের উত্তরে রবীন্দ্রনাথ এই দুটি পত্র লেখেন সেই পত্র এবং রবীন্দ্রনাথের পত্রের পূর্ণতর পাঠ দেবপ্রসাদ ঘোষ -প্রণীত 'বাংলা ভাষা ও বাণান' (১৩৪৬) গ্রন্থভুক্ত।

'রোচনা' পত্রিকায় বাংলা বানান সংস্কার বিষয়ে অসিতকুমার হালদার যে প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন, সে-প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ১১ জুলাই ১৯৩৫ তাঁহাকে লেখেন :

"বানান সংস্কার পড়লুম। তিন সয়ের মধ্যে মূর্দ্ধণ্য ষ কে রক্ষা করার অর্থ বুঝিনে। শ বাংলা উচ্চারণে ব্যবহার হয়, বাকি দুটো হয় না। জ-এর বদলে য ব্যবহার করাও ভ্রমাত্মক। বাংলায় অন্তঃস্থ য কে আমরা বর্গীয় জ-এর মতোই উচ্চারণ করি। অন্তঃস্থ য-এর উচ্চারণ বাংলায় নেই।

উপসংহারে বক্তব্য এই যে বাংলাদেশে কামাল পাশার আবির্ভাব যদি হয় তবেই বর্তমান প্রচলিত বানানের পরিবর্তন সম্ভব হতে পারে, যুক্তিতর্কের দ্বারা হবে না।"

—"চিঠিপত্রে রবীন্দ্রনাথ",
উত্তরা, কার্তিক ১৩৫৯, পৃ. ২১০

২৭ চিহ্নবিভ্রাট প্রসঙ্গে সুধীন্দ্রনাথ দত্তকে লিখিত যে পত্রটি ভূমিকাস্বরূপ ব্যবহার করা হইয়াছে তাহাতে প্রতিশব্দ প্রসঙ্গ রহিয়াছে— সেই বিচারে এই ভূমিকাটি "প্রতিশব্দ"-প্রসঙ্গেও বিবেচ্য।

৩১ দুটি প্রবন্ধই শান্তিনিকেতন রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত 'পারিবারিক-স্মৃতি-লিপি-পুস্তক' পাণ্ডুলিপিতে পাওয়া যায়। পাণ্ডুলিপি অনুযায়ী প্রথম প্রবন্ধটির রচনা-তারিখ ২২ কার্তিক ১২৮৮। প্রবন্ধটি ভারতী ১৩২৪ বৈশাখ সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছিল। দ্বিতীয় প্রবন্ধটির পাণ্ডুলিপিতে

তারিখ : ৬, ১১, ৮৮ ; প্রবন্ধটি 'বাংলা শব্দতত্ত্বে'র তৃতীয় স্বতন্ত্র সংস্করণে (১৩৯১) প্রথম মুদ্রিত হয়।

পারিবারিক খাতায় নানা সূত্রে রবীন্দ্রনাথের হস্তাক্ষরে শব্দতত্ত্ব-বিষয়ক মন্তব্য পাওয়া যায় : যথা—

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের নিম্নলিখিত মন্তব্যের—

"Citizen ও নাগর এ উভয়েরই অর্থ নগরবাসী কিন্তু উহাদের মধ্যে আকাশ-পাতাল প্রভেদ। ই জ্যো ঠা ১৬.১১.১৮৮৮"

সূত্রে R. T. অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথ লেখেন—

> "রসিক কথাটার বাঙ্গলা মানে ভাবুক অথবা বিশুদ্ধ Humorous নহে। রসিক কথাটার মধ্যে নাগর শব্দের মত একটা মলিন ভাব আছে। R. T. ১৭.১১.৮৮"

৩৫ রবীন্দ্র-রচনাবলীর দ্বিতীয় খণ্ডে (সুলভ সংস্করণ প্রথম খণ্ড) ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী'র সূচনায় রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছিলেন :

"অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয় পর্যায়ক্রমে বৈষ্ণব পদাবলী প্রকাশের কাজে যখন নিযুক্ত হয়েছিলেন, আমার বয়স তখন যথেষ্ট অল্প। সময়নির্ণয় সম্বন্ধে আমার স্বাভাবিক অন্যমনস্কতা তখনো ছিল, এখনো আছে। সেই কারণে চিঠিতে আমার তারিখকে যাঁরা ঐতিহাসিক বলে ধরে নেন তাঁরা প্রায়ই ঠকেন। বর্তমান আলোচ্য বিষয়ের কাল অনুমান করা অনেকটা সহজ। বোম্বাইয়ে মেজদাদার কাছে যখন গিয়েছিলুম তখন আমার বয়স ষোলোর কাছাকাছি, বিলাতে যখন গিয়েছি তখন আমার বয়স সতেরো। নূতন-প্রকাশিত পদাবলী নিয়ে নাড়াচাড়ি করছি, সে আরো কিছুকাল পূর্বের কথা। ধরে নেওয়া যাক, তখন আমি চোদ্দয় পা দিয়েছি। খণ্ড খণ্ড পদাবলীগুলি প্রকাশ্যে ভোগ করবার যোগ্যতা আমার তখন ছিল না।...

"পদাবলীর যে ভাষাকে ব্রজবুলি বলা হত আমার কৌতূহল প্রধানত ছিল তাকে নিয়ে। শব্দতত্ত্বে আমার ঔৎসুক্য স্বাভাবিক। টীকায় যে শব্দার্থ দেওয়া হয়েছিল তা আমি নির্বিচারে ধরে নিই নি। এক শব্দ যতবার পেয়েছি তার সমুচ্চয় তৈরী করে যাচ্ছিলুম। একটি ভালো বাঁধানো খাতা শব্দে ভরে উঠেছিল। তুলনা করে আমি অর্থ নির্ণয় করেছি।..."

জীবনস্মৃতি-তে 'ভানুসিংহের কবিতা' অধ্যায়ে লিখিয়াছেন :

"শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার ও সারদাচরণ মিত্র মহাশয়-কর্তৃক সংকলিত প্রাচীন কাব্য সংগ্রহ আমি বিশেষ আগ্রহের সহিত পড়িতাম। তাহার মৈথিলীমিশ্রিত ভাষা আমার পক্ষে দুর্বোধ ছিল। কিন্তু সেইজন্যই এত অধ্যবসায়ের সঙ্গে আমি তাহার মধ্যে প্রবেশচেষ্টা করিয়াছিলাম।"

এই 'অধ্যবসায়ে'র অন্যতম নিদর্শন ১২৮৮ সালের ভারতী-তে প্রকাশিত 'প্রাচীন-কাব্যসংগ্রহ (বিদ্যাপতি)', 'প্রাচীনকাব্যসংগ্রহ/উত্তর-প্রত্যুত্তর,' 'বিদ্যাপতির পরিশিষ্ট' প্রবন্ধ। শ্রাবণ ভাদ্র ও কার্তিক সংখ্যায় এই আলোচনাবলী প্রকাশিত হইয়াছিল ; সূচীপত্রে বা প্রথম প্রবন্ধে লেখকের নাম নাই ; দ্বিতীয় সংখ্যায় আলোচনা-প্রসঙ্গে 'শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। প্রস্তাব-লেখক' এইরূপ উল্লেখ আছে। 'বিদ্যাপতির পরিশিষ্ট' স্বাক্ষরিত প্রবন্ধ ; এই প্রবন্ধেও প্রথম প্রবন্ধটি যে তাঁহার রচনা সে কথা রবীন্দ্রনাথ উল্লেখ করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য 'জিজ্ঞাসা ও উত্তর', ভারতী জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ়, শ্রাবণ ১২৯০, বিদ্যাপতি-প্রসঙ্গ।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় যে, প্রাচীনকাব্যসংগ্রহ-সংক্রান্ত আলোচনার পাঁচ বৎসর পরে ১২৯৩ সালে 'শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক সম্পাদিত' 'বিদ্যাপতির পদাবলী' প্রকাশের বিজ্ঞাপন মুদ্রিত হয় :

বিজ্ঞাপন।
বিদ্যাপতির পদাবলী।
শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক সম্পাদিত
ও
শ্রীগোবিন্দলাল দত্ত কর্তৃক প্রকাশিত।

প্রায় দশ বৎসরকাল রবীন্দ্র বাবু বৈষ্ণব কবিগণের পদাবলী অধ্যয়ন করিয়া এই সম্পাদকীয় কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। সুতরাং বিদ্যাপতির পদাবলী যথাসম্ভব নির্দ্দোষ ও নির্ভুল হইয়া প্রকাশিত হইতেছে। ইতিপূর্বে মুদ্রিত কয়েকটী সংস্করণে পদের বা টীকার যত ভুল আছে, এই গ্রন্থে প্রায় সে সমস্ত সংশোধিত হইল। ফল কথা, সেই প্রাচীন, শ্রেষ্ঠ কবির কবিত্ব বুঝিতে হইলে— এবং যাবতীয় বৈষ্ণব কবিগণের পদাবলীর ভাষা বুঝিতে হইলে— রবীন্দ্র বাবু কর্তৃক সম্পাদিত এই সুন্দর, মনোহর পদাবলী সকলেরই ক্রয় করা উচিত।

১৫০ পৃষ্ঠায় উৎকৃষ্ট কাগজে মুদ্রিত।
মূল্য আট আনা মাত্র।
অগ্রহায়ণ মাসের ১৫ই তারিখের মধ্যে প্রকাশিত হইবে।
পিপেল্‌স্‌ লাইব্রেরীতে প্রাপ্তব্য।

—সাবিত্রী, আশ্বিন ১২৯৩

কিন্তু গ্রন্থটি প্রকাশিত হয় নাই।

রবীন্দ্রনাথের বিদ্যাপতি-চর্চার নিদর্শন প্রসঙ্গে অপিচ দ্রষ্টব্য 'রূপান্তর' গ্রন্থ (১৩৭২) এবং রচনাবলী অষ্টাবিংশ খণ্ড (সুলভ বর্তমান ষোড়শ খণ্ড)।

৩৬. শব্দচয়ন ১ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় (ফাল্গুন ১৩৩৬) প্রকাশিত হয়। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়কে যে পত্র লেখেন তাহা অংশত উদ্‌ধৃত হইল : "প্রতিশ্রুতি পালন করা গেল।... জিনিষটা যে পাঠালুম তার প্রধান উদ্দেশ্য এই যে এই প্রণালীতে আরো অনেক উৎসাহী লোক সংস্কৃত শব্দভাণ্ডার থেকে বাংলার ভাণ্ডারে শব্দ আহরণ করবেন। তোমাদের পত্রিকায় চারদিকে ডাক পৌঁছবে কিনা জানি না। যাই হোক আমার উৎসাহ আছে পাণ্ডিত্য নেই, সেইজন্যে দৃষ্টান্ত দেখাতে পারি বেশি দূর এগিয়ে দিতে পারি নে। এই কাজের জন্যে আমি ঘেঁটেছি অমরকোষ, মনিয়ার বিলিয়ম্‌স্‌, আপ্তে এবং বিল্‌সনের অভিধান। ভুলচুক থাকতেও পারে, যাঁদের বিচার করবার অধিকার তাঁরা বিচার করবেন।... এই উপলক্ষে প্রশ্ন এই যে সংকলক synthesis এবং বিকলন analysis অর্থে ব্যবহার করা চলে কিনা? কলা শব্দের অর্থ খণ্ড, কলাগুলিকে একত্র করাই সংকলন, বিযুক্ত করাই বিকলন। ব্যবকলন কথাটা গণিতে চলেচে অতএব কাজে লাগবে না।..."

এই পত্রানুযায়ী বলা যায়, এই শব্দচয়ন প্রধানত মনিয়ের উইলিয়ম্‌স্‌-এর Sanskrit-English Dictionary হইতে সংকলিত। রবীন্দ্রনাথ-ব্যবহৃত ও চিহ্নিত এই অভিধান শান্তিনিকেতন রবীন্দ্রভবন-সংগ্রহভুক্ত।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে শান্তিনিকেতন রবীন্দ্রভবন-সংগ্রহে রবীন্দ্রনাথের হস্তাক্ষরে একটি শব্দসংগ্রহের নোট-বুক আছে; যাহার সকল শব্দ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধে গৃহীত হয় নাই। যে শব্দগুলি অসংকলিত থাকিয়া গিয়াছে ওই নোটবুক হইতে 'শব্দচয়ন ২'-এ তাহা সংকলিত হইল।

উক্ত নোটবুকের একটি প্রতিলিপিতে এই শব্দ ব্যবহারের নিমিত্ত যে-সকল দৃষ্টান্ত বাক্য রবীন্দ্রনাথ রচনা করিয়াছিলেন 'শব্দচয়ন ২'-এর উপসংহারে সেগুলি সংকলিত হইল।

বিভিন্ন পত্রলেখকের প্রশ্নের উত্তরে রবীন্দ্রনাথ যে-সকল প্রতিশব্দ রচনা করিয়াছেন তাহা বাংলা শব্দতত্ত্বের দ্বিতীয় পরিবর্ধিত সংস্করণে পরিভাষা-সংগ্রহ নামে সংকলিত হইয়াছিল। বর্তমান সংস্করণে শব্দচয়ন ৩-এ পূর্ব-সংকলিত পরিভাষাগুলি চিহ্নিত করা হইল, এবং তালিকাটিকে পূর্ণতর করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে—এই তালিকাও সম্পূর্ণ বলিয়া মনে করা যায় না। বর্তমান গ্রন্থের বিভিন্ন রচনায় রবীন্দ্রনাথ-সৃষ্ট বা সংকলিত যে-সব প্রতিশব্দ আছে তাহাও বিধৃত হইল। তা ছাড়া রবীন্দ্রনাথের অন্যান্য রচনা ও চিঠিপত্র হইতে যথাসাধ্য সংকলন করা হইয়াছে। প্রতি ক্ষেত্রে যথাসম্ভব উৎস উল্লেখ করিয়া দেওয়া হইল।

যে-সব ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ স্পষ্টত কোনো উল্লেখসহ বাংলা প্রতিশব্দ প্রয়োগ করেন নাই অথচ শব্দগুলি ইংরেজির প্রতিশব্দ বলিয়া অনুমান করা যায় তাহা 'শব্দচয়ন ৪'-এ সংকলিত হইল। এই অনুমানের ক্ষেত্রে মতান্তর থাকিতেই পারে। ভবিষ্যতে বাংলা ভাষায় শব্দসৃষ্টির বিশদ কালানুক্রমিক আলোচনা করিয়া গবেষকগণ আরো নিশ্চিতভাবে সিদ্ধান্ত করিতে পারিবেন আশা করা যায়।

'শব্দচয়ন ৫' পর্যায়ে ইংরেজি idioms ও phrases-এর রবীন্দ্রনাথ-কৃত বাংলা অনুবাদ সংকলিত হইয়াছে।

সর্বশেষ পর্যায়ে পরিহাসছলে কৃত প্রতিশব্দ সংকলিত হইয়াছে শব্দচয়ন ৬-এ।

শব্দচয়ন ১ ও ২ ভিন্ন অন্যান্য তালিকা প্রণয়নে মুখ্যত বীরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস-প্রণীত 'রবীন্দ্রশব্দকোষ' গ্রন্থের সহায়তা লওয়া হইয়াছে।

সংযোজন : শব্দচয়ন ৩

নন্দনবিদ্যা—aesthetics
সৌজাত্যতত্ত্ব—Eugenics
—ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে
যথাক্রমে ২৪ জুলাই ১৯৩৩ ও ২১ ভাদ্র ১৩৩৮ তারিখে লিখিত পত্র।

সংগীতচিন্তা

বিভিন্ন সাময়িক পত্র ও পুস্তক হইতে রবীন্দ্রনাথের সংগীত-বিষয়ক প্রবন্ধ ভাষণ আলোচনা চিঠিপত্র ইত্যাদি সংকলন করিয়া 'সংগীতচিন্তা' প্রকাশ করেন বিশ্বভারতী, ১৩৭৩ সালের বৈশাখে। গ্রন্থটি প্রকাশিত হয় বিশ্বভারতী সংগীত-সমিতির পক্ষে। এই গ্রন্থের যে-রচনাগুলি রচনাবলীর অন্য কোনো খণ্ডের অন্তর্গত নয়, সেগুলি বর্তমান খণ্ডে মুদ্রিত হইল। প্রধান প্রবন্ধ ও ভাষণগুলির মধ্যে যেগুলি সাময়িক পত্রাদিতে প্রকাশিত, তাহার সূচী নিম্নরূপ :

১	সংগীত ও ভাব	ভারতী	জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ় ১২৮৮
২	সংগীতের মুক্তি	সবুজ পত্র	ভাদ্র ১৩২৪। ছন্দ প্রথম সংস্করণ
৩	আমাদের সংগীত	সবুজ পত্র	ভাদ্র ১৩২৮

৪	বাউল-গান		প্রবাসী	চৈত্র ১৩৩৪
৫	বিশ্ববিদ্যালয়ে সংগীতশিক্ষা		প্রবাসী	অগ্রহায়ণ ১৩৩৫
৬	শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে সংগীতের স্থান		প্রবাসী	ফাল্গুন ১৩৪২
৭	কথা ও সুর		বিচিত্রা	অগ্রহায়ণ ১৩৪৪
৮	অভিভাষণ	১	নব্যভারত	জ্যৈষ্ঠ ১৩২৯
		২	নব্যভারত	আশ্বিন ১৩৩১
		৩	আনন্দবাজার পত্রিকা	১২ পৌষ ১৩৪১
		৪	আনন্দবাজার পত্রিকা	১৭ আষাঢ় ১৩৪৭
৯	আলাপ-আলোচনা	১	বঙ্গবাণী	জ্যৈষ্ঠ ১৩৩২
		২	বঙ্গবাণী	জ্যৈষ্ঠ ১৩৩২
		৩	প্রবাসী	কার্তিক ১৩৩৪
		৪	বিচিত্রা	ফাল্গুন ১৩৪৪
১০	পুরাতন প্রসঙ্গ		মানসী ও মর্ম্মবাণী	চৈত্র ১৩২৬

১ ভারতী ১২৮৮ জ্যৈষ্ঠতে প্রকাশিত 'সংগীত ও ভাব' এবং ভারতী ১২৮৮ আষাঢ়ে প্রকাশিত 'সংগীতের উৎপত্তি ও উপযোগিতা' প্রবন্ধ দুটিকে পত্রিকার পৃষ্ঠায় সংযোজন পরিবর্ধন পরিবর্জন করিয়া পরিণত বয়সে রবীন্দ্রনাথ যে নূতন রূপ দেন সেই রূপটি এখানে মুদ্রিত হইল। দ্রষ্টব্য রবীন্দ্রভবন সংগ্রহভুক্ত Ms. 430। ইতিপূর্বে দেশ পত্রিকার ১৯৮০ জানুয়ারি ২৬ সংখ্যায় 'রবীন্দ্রনাথের প্রথম পাবলিক ভাষণ' শিরোনামায় চিত্তরঞ্জন দেব-লিখিত একটি প্রবন্ধের অংশ রূপে ছাপা হইয়াছিল। মূল দুটি প্রবন্ধ রবীন্দ্র-রচনাবলীর পরবর্তী ঊনত্রিংশ খণ্ডে (পৃ ৩৭৫-৩৮৭) এবং সুলভ সংস্করণ সপ্তদশ খণ্ডে মুদ্রিত হইয়াছে (পৃ ২৮৫-৩০৪)। দ্রষ্টব্য সংগীতচিন্তা (বৈশাখ ১৩৯২) পৃষ্ঠা ২৬৫-৮২।

২ "মুখ্যত এই লেখাটি সঙ্গীত-সম্বন্ধীয়। তালের আলোচনা-কালে আপনা থেকে এর শেষ দিকে ছন্দের কথা এসে পড়েছে। সে কারণেই একে 'ছন্দ' গ্রন্থে গ্রহণ করা গেল"— এই সূচনা-সহ 'সংগীতের মুক্তি' প্রবন্ধটি সম্পূর্ণই ছন্দ গ্রন্থের প্রথম সংস্করণে (১৩৪৩ আষাঢ়) মুদ্রিত হয়।

রবীন্দ্র-রচনাবলীর অন্তর্গত ছন্দ গ্রন্থে ও ছন্দের দ্বিতীয় সংস্করণে (১৩৬৯) এর প্রাসঙ্গিক অংশ 'সংগীত ও ছন্দ' নামে সংকলিত।

ছন্দ গ্রন্থের প্রথম সংস্করণে সংকলন-কালে এই প্রবন্ধের সাধুভাষাকে চলিত ভাষায় রূপান্তরিত করা হইয়াছিল। এখানে সবুজ পত্র-তে মুদ্রিত পাঠ অনুসৃত হইল।

কালিদাস নাগের ডায়ারি হইতে জানা যায়, রবীন্দ্রনাথ প্রবন্ধটি প্রথমে ১৩২৪ ভাদ্র ২০ (১৯১৭ সেপ্টেম্বর ৫) বিচিত্রা ক্লাবে ও পরে ২২ ভাদ্র (৭ সেপ্টেম্বর) প্রতিভা দেবী -প্রতিষ্ঠিত সংগীত সংঘের উদ্যোগে রামমোহন লাইব্রেরি হলে পাঠ করেন, সভাপতিত্ব করেন আশুতোষ চৌধুরী— গানের নমুনাগুলি রবীন্দ্রনাথ নিজেই গাহিয়া শোনান।

১৯১৭-র ৭ ডিসেম্বর তারিখে কলিকাতার প্রেসিডেন্সি রঙ্গমঞ্চে মতিলাল ঘোষের সভাপতিত্বে সংগীত-পরিষদের পক্ষে অনুষ্ঠিত এক সভায় কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষ বেদান্তচিন্তামণি এক প্রবন্ধ পাঠ করিয়া 'সংগীতের মুক্তি' প্রবন্ধের প্রতিপাদ্য বিষয়ের প্রতিবাদ করেন। এই প্রবন্ধ 'হিন্দু সঙ্গীতের স্বাতন্ত্র্য ও সংযম এবং পূজ্যপাদ কবি স্যার শ্রীরবীন্দ্রনাথ' নামে পৌষ, মাঘ ও ফাল্গুন ১৩২৪

-সংখ্যা নারায়ণ-এ মুদ্রিত হয়— পরে এটি 'হিন্দু-সঙ্গীত ও কবিবর স্যার শ্রীরবীন্দ্রনাথ' নামে পুস্তিকাকারেও প্রকাশিত হয় (১৩২৫)।

৪ 'Introduction to a collection by Md. Mansuruddin' টীকা-সহ প্রবন্ধটির একটি ইংরাজি অনুবাদ জুলাই ১৯২৮ -সংখ্যা বিশ্বভারতী কোয়ার্টার্লি-র অন্তর্গত বিশ্বভারতী বুলেটিনের ২৫৭-৫৯ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত হয়। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় -প্রকাশিত হারামণি (১৯৪২)-তে মূল রচনাটি 'আশীর্বাদ' শিরোনামে ব্যবহার করা হইয়াছে।

৫ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সংগীতশিক্ষা প্রবর্তন সম্পর্কে বাংলা সরকারের শিক্ষাবিভাগ রবীন্দ্রনাথের মত জানিতে চাহিলে তিনি জানাইয়াছিলেন, এই ব্যবস্থা গড়িয়া-তোলার পক্ষে পণ্ডিত বিষ্ণুনারায়ণ ভাতখণ্ডে উপযুক্ততম ব্যক্তি। রবীন্দ্রনাথের এই মত লইয়া কিছু বিতর্ক সৃষ্টি হয়। পরে তিনি বিষ্ণুপুরের গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়কে বাংলার শ্রেষ্ঠ গায়ক বলিয়া অভিহিত করিলে প্রধানত দিলীপকুমার রায় এই মতের প্রতিবাদ করেন। বর্তমান প্রবন্ধটি এই বিতর্কের পটভূমিকায় লিখিত। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য-সচিব অমিয় চক্রবর্তী মারফত রবীন্দ্রনাথ এ বিষয়ে একটি চিঠি ইহার পূর্বেই প্রবাসী-সম্পাদককে পাঠাইয়াছিলেন (প্রবাসী, কার্তিক ১৩৩৫, পৃ ১৬৭) :

> শ্রীযুক্ত গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলাদেশের গায়কদের মধ্যে সর্বোচ্চ খ্যাতি পাইবার যোগ্য সন্দেহ নাই। পুরুষানুক্রমে তিনি হিন্দুস্থানী সংগীতের চর্চা করিয়া পারদর্শিতালাভ করিয়াছেন, এ কথা অস্বীকার করিবার কোনো হেতু নাই। শ্রীযুক্ত ভাটখণ্ডে মহাশয় সংগীতশাস্ত্রজ্ঞতায় ভারতে অদ্বিতীয় বলিয়া আমি বিশ্বাস করি— ইঁহার যোগ্যতার প্রশংসাবাদ করিবার উপলক্ষে অন্য কোনো গীতিবিশারদের মান খর্ব করার আমি অনুমোদন করি না।
> ইতি ৬ই অক্টোবর ১৯২৮

৬ নিউ এডুকেশন ফেলোশিপ বা নবশিক্ষাসংঘের (১৯১৫ খৃস্টাব্দে ইংলণ্ডে প্রতিষ্ঠিত) নবপ্রতিষ্ঠিত বঙ্গীয় শাখার উদ্‌যোগে অনুষ্ঠিত সম্মিলনীর (৩১ জানুয়ারি - ৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৩৬) আলোচনাসভায় পাঠের উদ্দেশ্যে লিখিত। সম্মিলনীর বিজ্ঞপ্তি হইতে জানা যায়, ইন্দিরাদেবী চৌধুরানী প্রবন্ধটি ৮ ফেব্রুয়ারি সভায় পাঠ করেন। উক্ত ফেলোশিপ-কর্তৃক প্রকাশিত 'শিক্ষার ধারা' নামক প্রবন্ধসংগ্রহে (ভাদ্র ১৩৪৩) প্রবন্ধটি ছাপা হইয়াছিল।

চৈত্র ১৩৪২ -সংখ্যা প্রবাসী-তে (পৃ ৮২৪) প্রবন্ধটি সম্পর্কে একটি 'ভ্রম-সংশোধন' মুদ্রিত হয় : '...শেষ বাক্যটিতে ("শুধু উপভোগ করবার উদ্দেশে জগতে জন্মগ্রহণ করে...") "উদ্দেশে" শব্দটির পর "নয়" শব্দটি বাদ পড়ায় অর্থ-বৈপরীত্য ঘটিয়াছে।' বর্তমান রচনাবলীতে (পৃ .৫৬২, ছত্র ৩০) এই ভ্রম সংশোধন করিয়া পড়িতে হইবে।

৭ প্রবন্ধের সূচনাতেই যে 'কথা-কাটাকাটি'র বিষয় উল্লিখিত আছে সেটি প্রধানত চলিয়াছিল বিচিত্রা মাসিক পত্রে ; এই রচনাটি বিচিত্রা-য় প্রকাশিত 'কথা ও সুর' প্রবন্ধমালার পঞ্চম প্রবন্ধ। অন্য পত্রিকাতেও এই সময়ে এই বিষয়ে আলোচনা চলিতেছিল ; এই প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য : ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে লিখিত রবীন্দ্রনাথের ৮ অক্টোবর ১৯৩৭ তারিখের পত্র (পৃ ৬০৭) এবং দিলীপকুমার রায়কে লিখিত ২৯ অক্টোবর ১৯৩৭ তারিখের পত্র (পৃ ৬০৬)। প্রবন্ধটি ইতিপূর্বে দিলীপকুমার রায়ের সাঙ্গীতিকী (১৯৩৮) গ্রন্থে মুদ্রিত হইয়াছে।

৮ অভিভাষণ ১।। এই অভিভাষণের উপলক্ষ সংকলনের সূচনাতেই বিজ্ঞাপিত। শ্রীচিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এই পূর্বমুদ্রিত ভাষণের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

মনে রৈল, সই, মনের বেদনা।
প্রবাসে যখন যায় গো সে
তারে বলি বলি আর বলা হল না—

ইহা কাব্যকলায় অসম্পূর্ণ, অতএব সুরের প্রতি ইহার অনেকটা নির্ভর। সংস্কৃত শব্দ এবং ছন্দ ধ্বনিগৌরবে পরিপূর্ণ। সুতরাং সংস্কৃতে কাব্যরচনার সাধ গানে মিটাইতে হয় নাই, বরং গানের সাধ কাব্যে মিটিয়াছে। মেঘদূত সুরে বসানো বাহুল্য।

হিন্দিসাহিত্য সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জানি না। কিন্তু, এ কথা বলিতে পারি হিন্দিতে যে-সকল ধ্রুপদ খেয়াল প্রভৃতি পদ শুনা যায় তাহার অধিকাংশই কেবলমাত্র গান, একেবারেই কাব্য নহে। কথাকে সামান্য উপলক্ষমাত্র করিয়া সুর শুনানোই হিন্দিগানের প্রধান উদ্দেশ্য। কিন্তু বাংলায় সুরের সাহায্য লইয়া কথার ভাবে শ্রোতাদিগকে মুগ্ধ করাই কবির উদ্দেশ্য। কবির গান, কীর্তন, রামপ্রসাদী গান, বাউলের গান প্রভৃতি দেখিলেই ইহার প্রমাণ হইবে। অতএব কাব্যরচনাই বাংলাগানের মুখ্য উদ্দেশ্য, সুর-সংযোগ গৌণ। এই-সকল কারণে বাংলা সাহিত্যভাণ্ডারে রত্ন যাহা-কিছু পাওয়া যায় তাহা গান।

—বাংলা শব্দ ও ছন্দ। শ্রাবণ ১২৯৯

৩

সুর এবং তাল, ছন্দ এবং ধ্বনি, সংগীতের দুই অংশ। গ্রীকরা 'জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর সংগীত' বলিয়া একটা কথা বলিয়া গিয়াছেন, শেক্‌স্‌পিয়রেও তাহার উল্লেখ আছে। তাহার কারণ পূর্বেই বলিয়াছি, যে একটা গতির সঙ্গে আর-একটা গতির বড়ো নিকট সম্বন্ধ।

—গদ্য ও পদ্য। ফাল্গুন ১২৯৯

৪

যাহারা গানের সমঝদার এইজন্যই তাহারা অত্যন্ত উপেক্ষা প্রকাশ করিয়া বলে 'অমুক লোক মিষ্ট গান করে'। ভাবটা এই যে, মিষ্টগায়ক গানকে আমাদের ইন্দ্রিয়সভায় আনিয়া নিতান্ত সুলভ প্রশংসার দ্বারা অপমানিত করে, মার্জিত রুচি ও শিক্ষিত মনের দরবারে সে প্রবেশ করে না।...

যাহা সহজেই মিষ্ট তাহাতে অতি শীঘ্র মনের আলস্য আনে, বেশিক্ষণ মনোযোগ থাকে না। অবিলম্বেই তাহার সীমায় উত্তীর্ণ হইয়া মন বলে, 'আর কেন, ঢের হইয়াছে।'

এইজন্য যে লোক যে বিষয়ে বিশেষ শিক্ষা লাভ করিয়াছে, সে তাহার গোড়ার দিককার নিতান্ত সহজ ও ললিত অংশকে আর খাতির করে না। কারণ, সেটুকুর সীমা সে জানিয়া লইয়াছে; সেটুকুর দৌড় যে বেশিদূর নহে তাহা সে বোঝে; এইজন্যই তাহার অন্তঃকরণ তাহাতে জাগে না। অশিক্ষিত সেই সহজ অংশটুকুই বুঝিতে পারে; অথচ তখনো সে তাহার সীমা পায় না, এইজন্যই সেই অগভীর অংশেই তাহার একমাত্র আনন্দ। সমঝদারের আনন্দকে সে একটা কিম্ভূত ব্যাপার বলিয়া মনে করে; অনেক সময় তাহাকে কপটতার আড়ম্বর বলিয়াও গণ্য করিয়া থাকে।

এইজন্যই সর্বপ্রকার কলাবিদ্যা সম্বন্ধে শিক্ষিত ও অশিক্ষিতের আনন্দ ভিন্ন ভিন্ন পথে যায়। তখন একপক্ষ বলে, 'তুমি কী বুঝিবে!' আর-এক পক্ষ রাগ করিয়া বলে, 'যাহা বুঝিবার তাহা কেবল তুমিই বোঝ, জগতে আর-কেহ বুঝি বোঝে না!'

একটি সুগভীর সামঞ্জস্যের আনন্দ, সংস্থান-সমাবেশের আনন্দ, দূরবর্তীর সহিত যোগ-সংযোগের আনন্দ, পার্শ্ববর্তীর সহিত বৈচিত্র্যসাধনের আনন্দ— এইগুলি মানসিক আনন্দ। ভিতরে

প্রবেশ না করিলে, না বুঝিলে, এ আনন্দ ভোগ করিবার উপায় নাই। উপর হইতে চট্ করিয়া যে সুখ পাওয়া যায় ইহা তাহা অপেক্ষা স্থায়ী ও গভীর।

এবং এক হিসাবে তাহা অপেক্ষা ব্যাপক। যাহা অগভীর, লোকের শিক্ষা-বিস্তারের সঙ্গে, অভ্যাসের সঙ্গে, ক্রমেই তাহা ক্ষয় হইয়া তাহার রিক্ততা বাহির হইয়া পড়ে। যাহা গভীর তাহা আপাতত বহু লোকের গম্য না হইলেও বহুকাল তাহার পরমায়ু থাকে, তাহার মধ্যে যে-একটি শ্রেষ্ঠতার আদর্শ আছে তাহা সহজে জীর্ণ হয় না।

—কেকাধ্বনি। ভাদ্র ১৩০৮

৫

কলাবিদ্যা যেখানে একেশ্বরী সেখানেই তাহার পূর্ণগৌরব। সতীনের সঙ্গে ঘর করিতে গেলে তাহাকে খাটো হইতেই হইবে। বিশেষত সতীন যদি প্রবল হয়। রামায়ণকে যদি সুর করিয়া পড়িতে হয়, তবে আদিকাণ্ড হইতে উত্তরকাণ্ড পর্যন্ত সে সুরকে চিরকাল সমান একঘেয়ে হইয়া থাকিতে হয় ; রাগিণী হিসাবে সে বেচারার কোনোকালে পদোন্নতি ঘটে না। যাহা উচ্চদরের কাব্য তাহা আপনার সংগীত আপনার নিয়মেই জোগাইয়া থাকে, বাহিরের সংগীতের সাহায্য অবজ্ঞার সঙ্গে উপেক্ষা করে। যাহা উচ্চ অঙ্গের সংগীত তাহা আপনার কথা আপনার নিয়মেই বলে, তাহা কথার জন্য কালিদাস-মিল্টনের মুখাপেক্ষা করে না— তাহা নিতান্ত তুচ্ছ তোম্-তানা-নানা লইয়াই চমৎকার কাজ চালাইয়া দেয়।

—রঙ্গমঞ্চ। পৌষ ১৩০৯

৬

ছন্দে শব্দে বাক্যবিন্যাসে সাহিত্যকে সংগীতের আশ্রয় তো গ্রহণ করিতেই হয়। যাহা কোনোমতে বলিবার জো নাই এই সংগীত দিয়াই তাহা বলা চলে। অর্থ বিশ্লেষ করিয়া দেখিলে যে কথাটা যৎসামান্য, এই সংগীতের দ্বারাই তাহা অসামান্য হইয়া উঠে। কথার মধ্যে বেদনা এই সংগীতই সঞ্চার করিয়া দেয়।

অতএব চিত্র ও সংগীতই সাহিত্যের প্রধান উপকরণ। চিত্র ভাবকে আকার দেয় এবং সংগীত ভাবকে গতিদান করে। চিত্র দেহ এবং সংগীত প্রাণ।

—সাহিত্যের তাৎপর্য। অগ্রহায়ণ ১৩১০

৭

দেখিয়াছি বাংলায় অনেকগুলি গানের সুর কেমন দেখিতে দেখিতে ইতর হইয়া যায়। আমার বোধ হয় সভ্য দেশে যে যে সুর সর্বসাধারণের মধ্যে প্রচলিত, তাহার মধ্যে একটা গভীরতা আছে, তাহা তাহাদের national air, তাহাতে তাহাদের জাতীয় আবেগ পরিপূর্ণভাবে ব্যক্ত হয়। যথা Home Sweet Home, Auld lang Syne— বাংলাদেশে সেরূপ সুর কোথায়? এখানকার সাধারণ-প্রচলিত সুরের মধ্যে গাম্ভীর্য নাই, স্থায়িত্ব নাই, ব্যাপকতা নাই। সেইজন্য তাহার কোনোটাকেই national air বলা যায় না। হিন্দুস্থানীতে যে-সকল খাম্বাজ, ঝিঁঝিট কাফি প্রভৃতি রাগিণীতে শোভন ভদ্রভাব লক্ষিত হয়, বাংলায় সেই রাগিণীই কেমন কুৎসিত আকার ধারণ করিয়া 'বড় লজ্জা করে পাড়ায় যেতে' 'কেন বল সখি বিধুমুখি' 'একে অবলা সরলা' প্রভৃতি গানে পরিণত হইয়াছে।

কেবল তাহাই নহে, আমাদের এক-একবার মনে হয় হিন্দুস্থানী এবং বাংলার উচ্চারণের মধ্যে এই ভদ্র এবং বর্বর ভাবের প্রভেদ লক্ষিত হয়। হিন্দুস্থানী গান বাংলায় ভাঙিতে গেলেই তাহা ধরা পড়ে। সুর তাল অবিকল রক্ষিত হইয়াও অনেক সময় বাংলা গান কেমন 'রোখো' রকম শুনিতে হয়। হিন্দুস্থানীর polite 'আ' উচ্চারণ বাংলায় vulgar 'অ' উচ্চারণে পরিণত হইয়া এই ভাবান্তর সংগঠন করে। 'আ' উচ্চারণের মধ্যে একটি বেশ নির্লিপ্ত ভদ্র suggestive ভাব আছে, আর 'অ' উচ্চারণ নিতান্ত গা-ঘেঁষা সংকীর্ণ এবং দরিদ্র। কাশীর সংস্কৃত উচ্চারণ শুনিলে এই প্রভেদ সহজেই উপলব্ধি হয়।

—বাংলা ভাষা ও বাঙালি চরিত্র ১
ভারতী, বৈশাখ ১৩১২

৮

কলাবান গুণীরাও যেখানে বস্তুত গুণী, সেখানে তাঁহারা তপস্বী ; সেখানে যথেচ্ছাচার চলিতে পারে না, সেখানে চিত্তের সাধন ও সংযম আছেই।

...অনেক গুণী দেখা যায়, বাহিরের ক্ষুদ্র লালিত্যকে যাঁহারা আমল দিতে চান না, তাঁহাদের সৃষ্টির মধ্যে যেন একটা কঠোরতা আছে। তাঁহাদের ধ্রুপদের মধ্যে খেয়ালের তান নাই। হঠাৎ তাহার বাহিরের রিক্ততা দেখিয়া ইতর লোকে তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া যাইতে চাহে ; অথচ সেই নির্মল রিক্ততার গভীরতর ঐশ্বর্যই বিশিষ্ট লোকের চিত্তকে বৃহৎ আনন্দ দান করে।

—সৌন্দর্যবোধ। পৌষ ১৩১৩

৯

মিথিলার বিদ্যাপতির গান কেমন করিয়া বাংলা পদাবলী হইয়া উঠিয়াছে তাহা দেখিলেই বুঝা যাইবে— স্বভাবের নিয়মে এক কেমন করিয়া আর হইয়া উঠিতেছে। বাংলায় প্রচলিত বিদ্যাপতির পদাবলীকে বিদ্যাপতির বলা চলে না। মূল কবির প্রায় কিছুই তাহার অধিকাংশ পদেই নাই। ক্রমেই বাঙালি গায়ক ও বাঙালি শ্রোতার যোগে তাহার ভাষা, তাহার অর্থ, এমন-কি তাহার রসেরও পরিবর্তন হইয়া সে এক নূতন জিনিস হইয়া দাঁড়াইয়াছে। গ্রিয়র্সন মূল বিদ্যাপতির যে-সকল পদ প্রকাশ করিয়াছেন, বাংলা পদাবলীতে তাহার দুটি-চারটির ঠিকানা মেলে, বেশির ভাগই মিলাইতে পারা যায় না। অথচ নানা কাল ও নানা লোকের দ্বারা পরিবর্তন সত্ত্বেও পদগুলি এলোমেলো প্রলাপের মতো হইয়া যায় নাই। কারণ, একটা মূলসুর মাঝখানে থাকিয়া সমস্ত পরিবর্তনকে আপনার করিয়া লইবার জন্য সর্বদা সতর্ক হইয়া বসিয়া আছে। সেই সুরটুকুর জোরেই এই পদ-গুলিকে বিদ্যাপতির পদ বলিতেছি, আবার আগাগোড়া পরিবর্তনের জোরে এগুলিকে বাঙালির সাহিত্য বলিতে কুণ্ঠিত হইবার কারণ নাই।

—সাহিত্যসৃষ্টি। আষাঢ় ১৩১৪

১০

...গানের যেমন তান। তান যতদূর পর্যন্ত যাক-না, গানটিকে অস্বীকার করতে পারে না, সেই গানের সঙ্গে তার মূলে যোগ থাকে। সেই যোগটিকে সে ফিরে ফিরে দেখিয়ে দেয়। গান থেকে তানটি যখন হঠাৎ ছুটে বেরিয়ে চলে তখন মনে হয় সে বুঝি বিক্ষিপ্ত হয়ে উধাও হয়ে চলে গেল বা, কিন্তু তার সেই ছুটে যাওয়া কেবল মূল গানটিতে আবার ফিরে আসবার জন্যেই এবং সেই

ফিরে আসার রসটিকেই নিবিড় করার জন্যে।

—চিরনবীনতা। মাঘ ১৩১৬

১১

কথা জিনিসটা মানুষেরই, আর গানটা প্রকৃতির। কথা সুস্পষ্ট এবং বিশেষ প্রয়োজনের দ্বারা সীমাবদ্ধ, আর গান অস্পষ্ট এবং সীমাহীনের ব্যাকুলতায় উৎকণ্ঠিত। সেইজন্যে কথায় মানুষ মনুষ্যলোকের এবং গানে মানুষ বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে মেলে। এইজন্যে কথার সঙ্গে মানুষ যখন সুরকে জুড়ে দেয় তখন সেই কথা আপনার অর্থকে আপনি ছাড়িয়ে গিয়ে ব্যাপ্ত হয়ে যায়— সেই সুরে মানুষের সুখদুঃখকে সমস্ত আকাশের জিনিস করে তোলে, তার বেদনা প্রভাতসন্ধ্যার দিগন্তে আপনার রঙ মিলিয়ে দেয়, জগতের বিরাট অব্যক্তর সঙ্গে যুক্ত হয়ে একটি বৃহৎ অপরূপতা লাভ করে, মানুষের সংসারের প্রাত্যহিক সুপরিচিত সংকীর্ণতার সঙ্গে তার ঐকান্তিক ঐক্য আর থাকে না।

—শ্রাবণসন্ধ্যা। শ্রাবণ ১৩১৭

১২

যেমন গানের তান। এ কথা স্বীকার করিতেই হইবে তান জিনিসটা একটা নিয়মহীন উচ্ছৃঙ্খলতা নহে ; তাহার মধ্যে তাল মান লয় রহিয়াছে, তাহার মধ্যে স্বরবিন্যাসের অতি কঠিন নিয়ম আছে ; সেই নিয়মের মূলে স্বরতত্ত্বের গণিতশাস্ত্রসম্মত একটা দুরূহ বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব আছে ; শুধু তাই নয়, যে কণ্ঠ বা বাদ্যযন্ত্রকে আশ্রয় করিয়া এই তান চলিতেছে তাহারও নিয়মের শেষ নাই— সেই নিয়মগুলি কার্যকারণের বিশ্বব্যাপী শৃঙ্খলকে আশ্রয় করিয়া কোন্ অসীমের মধ্যে যে চলিয়া গিয়াছে তাহার কেহ কিনারা পায় না। অতএব, বাহিরের দিক হইতে যদি কেহ বলে এই তানগুলি অন্তহীন নিয়মশৃঙ্খলকে আশ্রয় করিয়াই বিস্তীর্ণ হইতেছে তবে সে এক রকম করিয়া বলা যায় সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহাতে আসল কথাটি বাদ পড়িয়া যায়। মূলের কথাটি এই যে, গায়কের চিত্ত হইতে গানের আনন্দই বিচিত্র তানের মধ্যে প্রসারিত হইতেছে। যেখানে সেই আনন্দ দুর্বল, শক্তিও সেখানে ক্ষীণ।

গানের এই তানগুলি গানের আনন্দ হইতে যেমন নানা ধারায় উৎসারিত হইতে থাকে, তেমনি তাহারা সেই আনন্দের মধ্যেই ফিরিয়া আসে। বস্তুত এই তানগুলি বাহিরে ছোটে, কিন্তু গানের ভিতরকারই আনন্দকে তাহারা ভরিয়া তোলে। তাহারা মূল হইতে বাহির হইতে থাকে, কিন্তু তাহাতে মূলের ক্ষয় হয় না, মূলের মূল্য বাড়িয়াই উঠে।

কিন্তু যদি এই আনন্দের সঙ্গে তানের যোগ বিচ্ছিন্ন হইয়া যায় তাহা হইলে উল্‌টাই হয়। তাহা হইলে তানের দ্বারা গান কেবল দুর্বল হইতেই থাকে। সে তানে নিয়ম যতই জটিল ও বিশুদ্ধ থাক্-না কেন, গানকে সে কিছুই রস দেয় না, তাহা হইতে সে কেবল হরণ করিয়াই চলে।

যে গায়ক আপনার মধ্যে এই গানের মূল আনন্দে গিয়া পৌঁছিয়াছে, গান সম্বন্ধে সে মুক্তিলাভ করিয়াছে। সে সমাপ্তিতে পৌঁছিয়াছে। তখন তাহার গলায় যে তান খেলে তাহার মধ্যে আর চিন্তা নাই, চেষ্টা নাই, ভয় নাই। যাহা দুঃসাধ্য তাহা আপনি ঘটিতে থাকে। তাহাকে আর নিয়মের অনুসরণ করিতে হয় না, নিয়ম আপনি তাহার অনুগত হইয়া চলে। তানসেন আপনার মধ্যে সেই গানের আনন্দলোকটিকে পাইয়াছিলেন। ইহাই ঐশ্বর্যলোক ; এখানে অভাব পূরণ হইতেছে— ভিক্ষা করিয়া নয়, হরণ করিয়া নয়, আপনারই ভিতর হইতে। তানসেন এই জায়গায়

আসিয়া গান সম্বন্ধে মুক্তিলাভ করিয়াছিলেন। মুক্তিলাভ করিয়াছিলেন বলিতে এ কথা বুঝায় না যে, তাঁহার গানে তাহার পর হইতে নিয়মের বন্ধন আর ছিল না। তাহা সম্পূর্ণই ছিল, তাহার লেশমাত্র ত্রুটি ছিল না, কিন্তু তিনি সমস্ত নিয়মের মূলে আপনার অধিকার স্থাপন করিয়াছিলেন বলিয়া নিয়মের প্রভু হইয়া বসিয়াছিলেন— তিনি এককে পাইয়াছিলেন বলিয়াই অসংখ্য বহু আপনি তাঁহার কাছে ধরা দিয়াছিল।

—ধর্মের অর্থ। আশ্বিন-কার্তিক ১৩১৮

১৩

ভারতবর্ষের প্রত্যেক ঋতুরই একটা-না-একটা উৎসব আছে। কিন্তু কোন্ ঋতু যে নিতান্ত বিনা কারণে তাহার হৃদয় অধিকার করিয়াছে তাহা যদি দেখিতে চাও তবে সংগীতের মধ্যে সন্ধান করো। কেননা, সংগীতেই হৃদয়ের ভিতরকার কথাটা ফাঁস হইয়া পড়ে।

বলিতে গেলে ঋতুর রাগরাগিণী কেবল বর্ষার আছে আর বসন্তের। সংগীতশাস্ত্রের মধ্যে সকল ঋতুরই জন্য কিছু-কিছু সুরের বরাদ্দ থাকা সম্ভব, কিন্তু সেটা কেবল শাস্ত্রগত। ব্যবহারে দেখিতে পাই, বসন্তের জন্য আছে বসন্ত আর বাহার ; আর বর্ষার জন্য মেঘ, মল্লার, দেশ এবং আরো বিস্তর। সংগীতের পাড়ায় ভোট লইলে, বর্ষারই হয় জিত।

আষাঢ়। আষাঢ় ১৩২১

১৪

পৃথিবীর সমস্ত প্রয়োজন ধূলির উপরে ; কিন্তু পৃথিবীর সমস্ত সংগীত ঐ শূন্যে, যেখানে তাহার অপরিচ্ছিন্ন অবকাশ।

মানুষের চিত্তের চারি দিকেও একটি বিশাল অবকাশের বায়ুমণ্ডল আছে। সেইখানেই তাহার নানা রঙের খেয়াল ভাসিতেছে ; সেইখানেই অনন্ত তাহার হাতে আলোকের রাখী বাঁধিতে আসে। ...সেখানকার ভাষাই সংগীত। এই সংগীতে বাস্তবলোকে বিশেষ কী কাজ হয় জানি না, কিন্তু ইহারই কম্পমান পক্ষের আঘাতবেগে অতিচৈতন্যলোকের সিংহদ্বার খুলিয়া যায়।

আষাঢ়। আষাঢ় ১৩২১

১৫

সুর পদার্থটাই একটা বেগ। সে আপনার মধ্যে আপনি স্পন্দিত হচ্ছে। কথা যেমন অর্থের মোক্তারি করবার জন্যে, সুর তেমন নয়, সে আপনাকেই আপনি প্রকাশ করে। বিশেষ সুরের সঙ্গে বিশেষ সুরের সংযোগে ধ্বনিবেগের একটা সমবায় উৎপন্ন হয়। তাল সেই সমবেত বেগটাকে গতিদান করে। ধ্বনির এই গতিবেগে আমাদের হৃদয়ের মধ্যে যে গতি সঞ্চার করে সে একটা বিশুদ্ধ আবেগ মাত্র, তার যেন কোনো অবলম্বন নেই। সাধারণত সংসারে আমরা কতকগুলি বিশেষ ঘটনা আশ্রয় করে সুখে দুঃখে বিচলিত হই। সেই ঘটনা সত্যও হতে পারে, কাল্পনিকও হতে পারে, অর্থাৎ আমাদের কাছে সত্যের মতো প্রতিভাত হতে পারে। তারই আঘাতে আমাদের চেতনা নানা রকমে নাড়া পায়, সেই নাড়ার প্রকারভেদে আমাদের আবেগের প্রকৃতিভেদ ঘটে। কিন্তু গানের সুরে আমাদের চেতনাকে যে নাড়া দেয় সে কোনো ঘটনার উপলক্ষ দিয়ে নয়, সে একেবারে অব্যবহিত ভাবে। সুতরাং তাতে যে আবেগ উৎপন্ন হয় সে অহৈতুক আবেগ। তাতে আমাদের চিত্ত নিজের স্পন্দনবেগেই নিজেকে জানে, বাইরের সঙ্গে কোনো

ব্যবহারের যোগে নয়।

...গানের স্পন্দন আমাদের চিত্তের মধ্যে যে আবেগ জন্মিয়ে দেয় সে কোনো সাংসারিক ঘটনামূলক আবেগ নয়। তাই মনে হয় সৃষ্টির গভীরতার মধ্যে যে-একটি বিশ্বব্যাপী প্রাণকম্পন চলছে, গান শুনে সেইটেরই বেদনাবেগ যেন আমরা চিত্তের মধ্যে অনুভব করি। ভৈরবী যেন সমস্ত সৃষ্টির অন্তরতম বিরহ-ব্যাকুলতা, দেশমল্লার যেন অশ্রুগঙ্গোত্রীর কোন্ আদিনির্ঝরের কলকল্লোল। এতে করে আমাদের চেতনা দেশকালের সীমা পার হয়ে নিজের চঞ্চল প্রাণধারাকে বিরাটের মধ্যে উপলব্ধি করে।

—ছন্দের অর্থ· চৈত্র ১৩২৪

১৬

...আর্টে সংগীতকে আমি কিরূপ স্থান প্রদান করি— এই প্রশ্নটি একবার আমাকে করা হইয়াছিল। বিজ্ঞানে গণিতের যে-স্থান, আর্টে সংগীতের সেই স্থান, ইহা সম্পূর্ণ বস্তুনিরপেক্ষ। অভিব্যক্তির যেটুকু সার, তাহাই সংগীত। সংগীতের যে-ঝংকার তাহা মুক্ত-অবাধ ; বস্তুবিচারের বাঁধন, চিন্তার বাঁধন সংগীতকে বাঁধিতে পারে না। সংগীত যেন আমাদিগকে সকল জিনিসের আত্মার ভিতরে লইয়া যায়। সৃষ্টির মূলে যে আনন্দ-ধারা, সেই আনন্দের স্পর্শে আমাদিগকে নাচাইয়া তোলে। কয়েক শতাব্দী আগে বাংলায় এমন একদিন আসিয়াছিল, যেদিন মানবের আত্মায় ভগবৎ-প্রেমের যে চিরন্তন লীলা-নাট্য চলিতেছে, তাহা জীবন্তভাবে অভিব্যক্ত হইয়াছিল— ভগবদুপলব্ধির আত্যন্তিক আনন্দধারা চারি দিকে বিকীর্ণ করিয়া।

সেদিন ভাবের একটা আবর্ত সমগ্র জাতির অন্তর আলোড়িত করিয়া তুলিয়াছিল। বাংলায় সেই ভাবাবর্ত হইতে সৃষ্ট হইয়াছিল আমাদের বাঙালির কীর্তন-গান। আমাদের জাতির ইতিহাসে এমন সময় অনেকবার আসিয়াছে, যখন আমাদের দৈনন্দিন জীবনের তুচ্ছতার অতীত জিনিসের অনুভূতিতে সমগ্র জাতির অন্তর আলোকিত হইয়া উঠিয়াছে।...

—আর্টের অর্থ, কষ্টিপাথর, প্রবাসী,
বৈশাখ ১৩৩৩, পৃ ৪৯
[বাঁশরি, ফাল্গুন ১৩৩২]

১৭

যে ওস্তাদ তানের অজস্রতা গণনা ক'রে গানের শ্রেষ্ঠতা বিচার করে তার বিদ্যাকে সেই উটের সঙ্গে তুলনা করব। শ্রেষ্ঠ গান এমন পর্যাপ্তিতে এসে স্তব্ধ হয় যার উপরে আর একটিমাত্র সুরও যোগ করা যায় না। বস্তুত, গানের সেই থামাকে সীমা বলা যায় না। সে এমন একটি শেষ যার শেষ নেই। অতএব, যথার্থ গায়কের আত্মা আপন সার্থকতাকে প্রকাশ করে তানের প্রভূত সংখ্যার দ্বারা নয়, সমগ্র গানের সেই চরম রূপের দ্বারা যা অপরিমেয়, অনির্বচনীয়, বাইরের দৃষ্টিতে যা স্বল্প, অন্তরে যা অসীম।

—মানুষের ধর্ম, রবীন্দ্র-রচনাবলী ১০, পৃ. ৩৮৯, (সুলভ সংস্করণ, দশম খণ্ড, পৃ. ৬৩১)

১৮

গীতকলা আজ এই বাংলা দেশেই গতানুগতিকতার প্রভুত্ব কাটিয়ে কুলত্যাগের কলঙ্ক স্বীকার ক'রে, নূতন প্রকাশের অভিসারে চলেছে— তার আশু ফলের বিচার করবার সময় হয় নি, কিন্তু

পণ্ডিতেরা যাই বলুন, নব-নবোন্মেষের পথে প্রতিভার মুক্তি কামনা এর মধ্যে যা দেখা যাচ্ছে তার থেকেই বাংলা দেশের যথার্থ প্রকৃতির নিরূপণ হতে পারে। প্রাণের স্পর্শশক্তি যেখানে প্রবল সেখানে প্রাণের সাড়া পেতে দেরি হয় না।

—মহাজাতি সদন। ২ ভাদ্র ১৩৪৬

'সুর ও সংগতি' অংশে রবীন্দ্রনাথের চিঠির সঙ্গে ধূর্জটিপ্রসাদের চিঠিও যুক্ত আছে বলিয়া 'সংযোজন' বিভাগে তাহা মুদ্রিত হইল। এই চিঠিগুলি 'সুর ও সঙ্গতি' নামে ১৯৩৫ সালে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। ধূর্জটিপ্রসাদকে লেখা রবীন্দ্রনাথের নিম্নোদ্ধৃত পত্রাংশগুলিও এই প্রসঙ্গে স্মরণযোগ্য :

১

...আমাদের শাস্ত্রে বলে "দুহিতা কৃপণঃ পরং" গান জিনিসটা তেমনি। কথায় কথায় ওর কপাল ভাঙে। কবিতা রেখে যাওয়া গেল ছাপার অক্ষরে— তার যদি গুণ থাকে, তবে আজ হোক কাল হোক সে নিজ গুণেই তরে' যেতে পারে। গান পরের কণ্ঠ নির্ভর করে। যে মানুষ রচনা করে সে তাকে জন্ম দেয় মাত্র, যে মানুষ গায় সেই তাকে হয় বাঁচায়, নয় মারে। জামাতা বাবাজির মতো আর কি। এমন দুর্ঘটনা প্রায় ঘটে যে, কাপড়ে কেরোসিন জ্বালিয়ে মরা তার পক্ষে কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায়।

এই কারণবশতই আমার স্নেহটা বেশি আমার গানের পরেই। স্বভাবের প্রবর্তনায় নিজের সব রচনার পরেই মানুষের মমতা থাকে কিন্তু গানের সম্বন্ধে আমার দরদ কিছু অতিরিক্ত হবার কারণ এই যে ও পর্দানশীন, ওর প্রকাশ অবরুদ্ধ ; কণ্ঠাগত করে তবে তার পরিচয় সাধন করতে হয়, সে পরিচয় অধিকাংশ স্থলেই বিকৃত। আর-একটা কারণ এই যে, ও তার সহোদরার পিছনে পড়ে গেছে— বাণী পেয়ে থাকেন প্রথম অর্ঘ্য— পরিশিষ্ট কিছু ও পেয়ে থাকে, সব সময়ে পায় না। এই অনাদর পূরণ করি নিজের মন থেকে।

কাব্য রচনা করি যে মন নিয়ে ভাষায় তার সঙ্গে বোঝাপড়া চলে। বুদ্ধি নামক একটা চশমাধারী প্রবীণের কাছে তার জবাবদিহি আছে, সম্পূর্ণ না হোক তবু অনেকটা পরিমাণে। কাব্যরসের দিকে যদি খদ্দেরের ঝোঁক না থাকে, তত্ত্বব্যাখ্যা বের করতে কতক্ষণ! সুর থাকেন সম্পূর্ণভাবে অনির্বচনীয়ের মহলে। তত্ত্বের দাবি করলে তাঁর মুখ বন্ধ— তিনি সাজিয়ে বসেছেন রসের পসরা। বুদ্ধি তাঁর হয়ে যে ওকালতি করবে সে ওকালৎনামা তার নেই। রসের বিচার অব্যবহিত আনন্দবোধে। খাঁটি বুদ্ধি মানবলোকে দুর্লভ, খাঁটি আনন্দবোধ বোধ করি বা তার চেয়েও দুর্লভ। এইজন্যে অনির্বচনীয়কে নিয়ে যার কারবার, নালিশের কারণ ঘটলে তার পক্ষে আপিল-আদালত নেই— অপ্রমেয়কে প্রমাণ করবে কী দিয়ে? এই কারণেই রসের ব্যাপারে বেদনাটা বড্ড বেশি। কাব্যের চেয়ে সুরের ব্যথা আরো অধিক। কেননা কাব্যের আছে অর্থ, সুরের আছে ধ্বনিমাত্র। ওর জটায় আছে কলকল্লোলিনী গঙ্গা, কিন্তু ঐ অকিঞ্চনের অর্থ নেই।

গান নিয়ে যারা বচসা করে তারা আর কিছু ধরবার পায় না, ধরে গিয়ে রাগরাগিণীর বাঁধা নিয়মকে। এই নিয়ম নিয়ে পাণ্ডিত্য। এই পাণ্ডিত্যে সম্ভোগ নেই, অহংকার আছে। অহংকার আছে বললেও অবিচার করা হয়। অভ্যাসের যথাযথ পুনরাবৃত্তিতে মানুষ একশ্রেণীর সুখ পায়। যেটা প্রত্যাশা করতে সে অভ্যস্ত ঠিক সেইটিই যদি ঠিক জায়গায় এসে জোটে, তার মন মাথা ঝাঁকানি

দিয়ে বলে ওঠে, কেয়া বাৎ! এই অভ্যস্ত কায়দার বেড়ার বাহিরেও সুরেন্দ্রের অমরসভা আছে, সেই সভায় উর্বশীর যে-নিত্যনূতন নাচ চলে তার ওপরে খাঁসাহেবের আধিপত্য চলে না। অভ্যাসের আফিমী মৌতাতে যাদের মন ঝিম হয়ে আছে, বন্ধনমুক্ত রসের লীলায় তাদের নেশা ছুটে যায় বলেই তারা রেগে ওঠে। তারা বলে রসভঙ্গ হোলো। বস্তুত নিয়মভঙ্গকেই তারা বলে রসভঙ্গ। বিজ্ঞসমাজে যেমন আচারের ত্রুটিকেই বলে ধর্মনাশ;— ভুলে যায় যে, নিত্য ধর্মের খাতিরেই আচারকে ভাঙতে হয়। অবশ্য আচারের সঙ্গে ধর্মের যেখানে সামঞ্জস্য আছে সেখানে এ কথা খাটে না। যে প্রথার সঙ্গে রসের আন্তরিক প্রণয়, রসিকেরা সেখানে বিচ্ছেদ ঘটাতে ইচ্ছা করেন না।

মোট কথা এই যে, গান জিনিসটার পরে দরদ অত্যন্ত বেশি, কেননা বাহ্যিক প্রমাণের দ্বারা ওর রসবিচার চলে না। এইজন্যে আমার গান যখন প্রবীণা প্রথার কাছে সর্বদাই মুখনাড়া সহ্য করত আমার পক্ষ থেকে কখনো তার প্রতিবাদ হয় নি— এমন-কি প্রাচীন কবিবাক্যও প্রতিপক্ষের প্রতি প্রয়োগ করতে নিরস্ত ছিলুম— “অরসিকেষু” ইত্যাদি। মিল্‌টনের মতো “fit though few”-র দাবি জানাই নি— ভবভূতির মতো “কালোহ্যয়ং নিরবধি বিপুলা চ পৃথ্বী’র উপর আশাকে প্রসারিত করে সান্ত্বনা লাভের চেষ্টা করি নি। কবিদের এই দম্ভ নৈরাশ্য থেকেই জেগে ওঠে, স্পর্ধা দ্বারাই তারা অনাদরকে আঘাত করবার চেষ্টা করে— যেহেতু তাদের আর কোনো অস্ত্র নেই। কিন্তু আমি জানি স্পর্ধার দ্বারা কিছু পরিমাণে মনের ঝাঁজ মেটে কিন্তু তাতে মামলা জিত হয় না, রায়টা অনিশ্চিত থেকেই যায়। তা হলে কথাকাটাকাটি করে লাভ কী!

এমন অবস্থায় আমার গান সম্বন্ধে তোমার লেখাটি পড়ে যেমন বিস্মিত তেমনি খুশি হয়েছি। ওস্তাদ-পাড়ায় তোমার বাড়ি অথচ এ কথা বলতে তোমার বাধল না যে, গানেতে বর্ণসংকর দোষ দোষই নয়। অর্থাৎ তোমার মতে গানে কেবল দুটি মাত্র জাত আছে, ভালো আর মন্দ। এটা প্রায় নাস্তিকের মতো কথা— আশঙ্কা হচ্ছে পাছে বিচক্ষণদের কাছে তোমার প্রতিপত্তি নষ্ট হয়। আমার গানের পক্ষ নিয়ে তোমার দুঃখলাভ বা সম্মানহানি ঘটে এ আমি ইচ্ছা করি নে। যে বীজ নিজে রোপণ করেছি তার ফলের দায়িক আমি একলা। তার জন্যে তোমাকে সুদ্ধ যদি দায়িক করি তা হলে চিত্রগুপ্তের খাতায় আমার বিরুদ্ধে ডবল্‌ মার্কা পড়বে।

অনেক কথা লিখলুম দেখে ভেবো না আমার বাজারে কথার টানাটানি নেই। লেখার অজস্রতা বন্ধ হয়ে গেছে। অনেক বয়স কেটেছে বাক্যে, তার পরে সুরে, এখন দিনান্তে সময় এসেছে মৌনের। ইতি ১ ভাদ্র ১৩৩৮

২

...আমার গান দেশে অনেকেই সুরে বেসুরে গেয়ে থাকে কিন্তু যাঁরা সমজদার বলে খ্যাত তাঁরা কেউ ওটাকে আমল দেন না। অর্থাৎ আকন্দ ফুলে শিবের পুজো চলে কিন্তু আকন্দগাছটা থাকে বাগানের বাইরে। আরামেই থাকে, ফ্যাশান-দোরস্ত বাগান-বিলাসীরা ওকে দেখে নাক সিট্‌কোয় না।

ইতিমধ্যে তুমি ওটাকে টেনে আনলে যাচাই ঘরে। তার ফল হবে এই যে, নামজাদা যাচনদাররা বিচলিত হয়ে উঠবে। তার প্রথম লক্ষণ দেখা গেল...পত্রিকায়।... লিখেছেন বহু চেষ্টা করেও রবীন্দ্রনাথের গান তিনি ভালো লাগাতে পারেন নি। তিনি আমার চেয়ে বয়সে ছোটো, আমার তরফ থেকে ঠিক ঐ রকম ব্যক্তিগত যুক্তি তাঁর গান সম্বন্ধে প্রয়োগ করা অশোভন হবে।

সমস্ত মনটা মাতিয়া আছে, কাজকর্মের কোনো দাবিতে কিছুমাত্র কান দিতেছি না— সেও শরতের দিনে।—

হেলাফেলা সারাবেলা
এ কী খেলা আপন-মনে।

১১

একবার মাঘোৎসবে [১৮৮৭] সকালে ও বিকালে আমি অনেকগুলি গান তৈরি করিয়াছিলাম। তাহার মধ্যে একটা গান— 'নয়ন তোমারে পায় না দেখিতে, রয়েছ নয়নে নয়নে।' পিতা তখন চুঁচুড়ায় ছিলেন। সেখানে আমার এবং জ্যোতিদাদার ডাক পড়িল। হারমোনিয়মে জ্যোতিদাদাকে বসাইয়া আমাকে তিনি নূতন গান সব-কটি একে একে গাহিতে বলিলেন। কোনো কোনো গান দুবারও গাহিতে হইল। গান গাওয়া যখন শেষ হইল তখন তিনি বলিলেন, 'দেশের রাজা যদি দেশের ভাষা জানিত ও সাহিত্যের আদর বুঝিত, তবে কবিকে তো তাহারা পুরস্কার দিত। রাজার দিক হইতে যখন তাহার কোনো সম্ভাবনা নাই, তখন আমাকেই সে কাজ করিতে হইবে।' এই বলিয়া তিনি একখানি পাঁচ-শো টাকার চেক আমার হাতে দিলেন।

বিদেশী সংগীত

জীবনস্মৃতি

ব্রাইটনে থাকিতে [১৮৭৮] সেখানকার সংগীতশালায় একবার একজন বিখ্যাত গায়িকার গান শুনিতে গিয়াছিলাম। তাঁহার নামটা ভুলিতেছি— মাডাম নীল্‌সন্[১] অথবা মাডাম আল্‌বানি[২] হইবেন। কণ্ঠস্বরের এমন আশ্চর্য শক্তি পূর্বে কখনো দেখি নাই। আমাদের দেশে বড়ো বড়ো ওস্তাদ গায়কেরাও গান গাহিবার প্রয়াসটাকে ঢাকিতে পারেন না— যে-সকল খাদসুর বা চড়াসুর সহজে তাঁহাদের গলায় আসে না, যেমন-তেমন করিয়া সেটাকে প্রকাশ করিতে তাঁহাদের কোনো লজ্জা নাই। কারণ, আমাদের দেশের শ্রোতাদের মধ্যে যাঁহারা রসজ্ঞ তাঁহারা নিজের মনের মধ্যে নিজের বোধশক্তির জোরেই গানটাকে খাড়া করিয়া তুলিয়া খুশি হইয়া থাকেন ; এই কারণে তাঁহারা সুকণ্ঠ গায়কের সুললিত গানের ভঙ্গিকে অবজ্ঞা করিয়া থাকেন ; বাহিরের কর্কশতা এবং কিয়ৎপরিমাণে অসম্পূর্ণতাতেই আসল জিনিসটার যথার্থ স্বরূপটা যেন বিনা আবরণে প্রকাশ পায়। এ যেন মহেশ্বরের বাহ্য দারিদ্র্যের মতো, তাহাতে তাঁহার ঐশ্বর্য নগ্ন হইয়া দেখা দেয়। য়ুরোপে এ ভাবটা একেবারেই নাই। সেখানে বাহিরের আয়োজন একেবারে নিখুঁত হওয়া চাই— সেখানে অনুষ্ঠানের ত্রুটি হইলে মানুষের কাছে মুখ দেখাইবার জো থাকে না। আমরা আসরে বসিয়া আধ ঘণ্টা ধরিয়া তানপুরার কান মলিতে ও তব্‌লাটাকে ঠকাঠক্ শব্দে হাতুড়ি-পেটা করিতে কিছুই মনে করি না। কিন্তু, য়ুরোপে এই-সকল উদ্যোগকে নেপথ্যে লুকাইয়া রাখা হয়—

---

[১] Christine Nilsson (1843-1922). Swedish prima donna

[২] Dame Albani (1852-1930). Canadian prima donna

সেখানে বাহিরে যাহা কিছু প্রকাশিত হয় তাহা একেবারেই সম্পূর্ণ। এইজন্য সেখানে গায়কের কণ্ঠস্বরে কোথাও লেশমাত্র দুর্বলতা থাকিলে চলে না। আমাদের দেশে গান সাধাটাই মুখ্য, সেই গানেই আমাদের যত-কিছু দুরূহতা ; য়ুরোপে গলা সাধাটাই মুখ্য, সেই গলার স্বরে তাহারা অসাধ্য সাধন করে। আমাদের দেশে যাহারা প্রকৃত শ্রোতা তাহারা গানটাকে শুনিলেই সন্তুষ্ট থাকে, য়ুরোপে শ্রোতারা গান গাওয়াটাকে শোনে। সেদিন ব্রাইটনে তাই দেখিলাম— সেই গায়িকাটির গান গাওয়া অদ্ভুত, আশ্চর্য। আমার মনে হইল যেন কণ্ঠস্বরে সার্কাসের ঘোড়া হাঁকাইতেছে। কণ্ঠনলীর মধ্যে সুরের লীলা কোথাও কিছুমাত্র বাধা পাইতেছে না। মনে যতই বিস্ময় অনুভব করি-না কেন, সেদিন গানটা আমার একেবারেই ভালো লাগিল না। বিশেষত, তাহার মধ্যে স্থানে স্থানে পাখির ডাকের নকল ছিল, সে আমার কাছে অত্যন্ত হাস্যজনক মনে হইয়াছিল। মোটের উপর আমার কেবলই মনে হইতে লাগিল মনুষ্যকণ্ঠের প্রকৃতিকে যেন অতিক্রম করা হইতেছে। তাহার পরে পুরুষ গায়কদের গান শুনিয়া আমার আরাম বোধ হইতে লাগিল— বিশেষত 'টেনর' গলা যাহাকে বলে সেটা নিতান্ত একটা পথহারা ঝোড়ো হাওয়ার অশরীরী বিলাপের মতো নয়— তাহার মধ্যে নরকণ্ঠের রক্তমাংসের পরিচয় পাওয়া যায়।

ইহার পরে গান শুনিতে শুনিতে ও শিখিতে শিখিতে য়ুরোপীয় সংগীতের রস পাইতে লাগিলাম। কিন্তু আজ পর্যন্ত আমার এই কথা মনে হয় যে, য়ুরোপের গান এবং আমাদের গানের মহল যেন ভিন্ন; ঠিক এক দরজা দিয়া হৃদয়ের একই মহলে যেন তাহারা প্রবেশ করে না। য়ুরোপের সংগীত যেন মানুষের বাস্তবজীবনের সঙ্গে বিচিত্রভাবে জড়িত। তাই দেখিতে পাই সকল রকমেরই ঘটনা ও বর্ণনা আশ্রয় করিয়া য়ুরোপে গানের সুর খাটানো চলে ; আমাদের দিশি সুরে যদি সেরূপ করিতে যাই তবে অদ্ভুত হইয়া পড়ে, তাহাতে রস থাকে না। আমাদের গান যেন জীবনের প্রতিদিনের বেষ্টন অতিক্রম করিয়া যায়, এইজন্য তাহার মধ্যে এত করুণা এবং বৈরাগ্য ; সে যেন বিশ্বপ্রকৃতি ও মানবহৃদয়ের একটি অন্তরতর ও অনির্বচনীয় রহস্যের রূপটিকে দেখাইয়া দিবার জন্য নিযুক্ত ; সেই রহস্যলোক বড়ো নিভৃত নির্জন গভীর— সেখানে ভোগীর আরামকুঞ্জ ও ভক্তের তপোবন রচিত আছে, কিন্তু সেখানে কর্মনিরত সংসারীর জন্য কোনোপ্রকার সুব্যবস্থা নাই।

য়ুরোপীয় সংগীতের মর্মস্থানে আমি প্রবেশ করিতে পারিয়াছি এ কথা বলা আমাকে সাজে না। কিন্তু, বাহির হইতে যতটুকু আমার অধিকার হইয়াছিল তাহাতে য়ুরোপের গান আমার হৃদয়কে এক দিক দিয়া খুবই আকর্ষণ করিত। আমার মনে হইত এ সংগীত রোমান্টিক। রোমান্টিক বলিলে যে ঠিকটি কী বুঝায় তাহা বিশ্লেষণ করিয়া বলা শক্ত। কিন্তু, মোটামুটি বলিতে গেলে, রোমান্টিকের দিকটা বিচিত্রতার দিক, প্রাচুর্যের দিক, তাহা জীবনসমুদ্রের তরঙ্গ-লীলার দিক, তাহা অবিরাম গতিচাঞ্চল্যের উপর আলোকছায়ার দ্বন্দ্বসম্পাতের দিক। আর-একটা দিক আছে যাহা বিস্তার, যাহা আকাশনীলিমার নির্নিমেষতা, যাহা সুদুর দিগন্তরেখায় অসীমতার নিস্তব্ধ আভাস। যাহাই হউক, কথাটা পরিষ্কার না হইতে পারে, কিন্তু আমি যখনি য়ুরোপীয় সংগীতের রসভোগ করিয়াছি তখনি বারংবার মনের মধ্যে বলিয়াছি ইহা রোমান্টিক— ইহা মানবজীবনের বিচিত্রতাকে গানের সুরে অনুবাদ করিয়া প্রকাশ করিতেছে। আমাদের সংগীতে কোথাও কোথাও সে চেষ্টা নাই যে তাহা নহে, কিন্তু সে চেষ্টা প্রবল ও সফল হইতে পারে নাই। আমাদের গান ভারতবর্ষের নক্ষত্রখচিত নিশীথিনীকে ও নবোন্মেষিত অরুণরাগকে ভাষা দিতেছে ; আমাদের গান ঘনবর্ষার বিশ্বব্যাপী বিরহবেদন ও নববসন্তের বনান্তপ্রসারিত গভীর উন্মাদনার বাক্যবিস্মৃত বিহ্বলতা।

য়ুরোপ-যাত্রীর ডায়ারি

জাহাজ। ১০ অক্টোবর ১৮৯০

এখন অভ্যাসক্রমে য়ুরোপীয় সংগীতের এতটুকু আস্বাদ পাওয়া গেছে যার থেকে নিদেন এইটুকু বোঝা গেছে যে, যদি চর্চা করা যায় তা হলে য়ুরোপীয় সংগীতের মধ্যে থেকে পরিপূর্ণ রস পাওয়া যেতে পারে। আমাদের দেশী সংগীত যে আমার ভালো লাগে সে কথার বিশেষ উল্লেখ করা বাহুল্য। অথচ দুইয়ের মধ্যে যে সম্পূর্ণ জাতিভেদ আছে তার আর সন্দেহ নেই।

জাহাজ। ১৬ অক্টোবর ১৮৯০

আজ অনেক রাত্রে নিরালায় একলা দাঁড়িয়ে জাহাজের কাঠরা ধরে সমুদ্রের দিকে চেয়ে অন্যমনস্কভাবে গুন্ গুন্ করে একটা দিশি রাগিণী ধরেছিলুম। তখন দেখতে পেলুম অনেক দিন ইংরাজি গান গেয়ে গেয়ে মনের ভিতরটা যেন শ্রান্ত এবং অতৃপ্ত হয়ে ছিল। হঠাৎ এই বাংলা সুরটা পিপাসার জলের মতো বোধ হল। আমি দেখলুম সেই সুরটি সমুদ্রের উপর অন্ধকারের মধ্যে যেরকম প্রসারিত হল, এমন আর কোনো সুর কোথাও পাওয়া যায় বলে আমার মনে হয় না। আমার কাছে ইংরাজি গানের সঙ্গে আমাদের গানের এই প্রধান প্রভেদ ঠেকে যে, ইংরাজি সংগীত লোকালয়ের সংগীত আর আমাদের সংগীত প্রকাণ্ড নির্জন প্রকৃতির অনির্দিষ্ট অনির্বচনীয় বিষাদের সংগীত। কানাড়া টোড়ি প্রভৃতি বড়ো বড়ো রাগিণীর মধ্যে যে গভীরতা এবং কাতরতা আছে সে যেন কোনো ব্যক্তিবিশেষের নয়— সে যেন অকূল অসীমের প্রান্তবর্তী এই সঙ্গীহীন বিশ্বজগতের।

য়ুরোপ-যাত্রীর ডায়ারি : খসড়া

[লন্ডন] ১৯ সেপ্টেম্বর ১৮৯০

এরা গান শুনাবে তাই সহস্র যন্ত্রের সহস্র তান আশ্চর্য সংগতি রক্ষা করে ধ্বনিত হচ্ছে। কোথাও তিলমাত্র অসম্পূর্ণতা নেই। অসীম যত্ন, অসীম অভ্যাস। নাট্যশালায় কী অদ্ভুত বিচিত্র ব্যাপার, কী আশ্চর্য সৌন্দর্যের মরীচিকা— কোনোখানে সামান্য ত্রুটি বা অশোভনতা নেই।

জাহাজ। ১৬ অক্টোবর ১৮৯০

আজ রাত্তিরেও আমাকে গান গাইতে হল। তার পরে নিরালায় অন্ধকারে জাহাজের কাঠরা ধরে সমুদ্রের দিকে চেয়ে যখন গুন্ গুন্ করে একটা দিশি রাগিণী ভাঁজছিলুম ভারি মিষ্টি লাগল। ইংরিজি গান গেয়ে গেয়ে শ্রান্ত হয়ে গিয়েছিলুম, হঠাৎ দিশি গানে প্রাণ আকুল হয়ে গেল।

জাহাজ। ২২ অক্টোবর ১৮৯০

Mrs. Moeller আমাকে গান গাইতে অনুরোধ করল, সে আমার সঙ্গে পিয়ানো বাজালে। Mrs. Moeller বললে : It is a treat to hear you sing। Webb এসে বললে : What would we do without you Tagore— there's nobody on board who sings so well। যা হোক, জাহাজে এসে আমার গান বেশ appreciated হচ্ছে। আসল কথা হচ্ছে এর আগে আমি যে ইংরিজি গানগুলি গাইতুম কোনোটাই tenor pitch-এ ছিল না, তাই আমার গলা খুলত না। এবারে সমস্ত উঁচু pitch-এর music কিনেছি, তাই এত প্রশংসা পাওয়া যাচ্ছে।

পুরাতন প্রসঙ্গ

একদিকে...individual... আর-এক্‌দিকে universal, ...কিন্তু ওয়াগনার ও বেটোভেনের মতো বিপুল মানবসমাজের বিচিত্র সুখদুঃখের ঘাতপ্রতিঘাত একটা বিরাট ছন্দে এর মধ্যে ধ্বনিত হয়ে ওঠে না। য়ুরোপের সংগীত এক্‌লার আনন্দের কিংবা বেদনার জিনিস নয়, বিজনের সামগ্রী একেবারেই হতে পারে না, সে individual নয়, সে human.../ তার বৈচিত্র্য ও বিপুলতা একেবারে আমাদের অভিভূত করে ফেলে।... কেমন করে দুইয়ের সামঞ্জস্য বিধান করা যেতে পারে [য়ুরোপীয়ে ও ভারতীয়ে], এ এক কঠিন সমস্যা।

—বিপিনবিহারী গুপ্ত, ‘শান্তিনিকেতনে এক রাত্রি”,
‘মানসী ও মর্মবাণী’, চৈত্র ১৩২৬, পৃ ১৮৬

জাপান-যাত্রী

জাপান। ২৯ মে - ৭ সেপ্টেম্বর ১৯১৬

একদিন জাপানি নাচ দেখে এলুম। মনে হল এ যেন দেহভঙ্গির সংগীত। এই সংগীত আমাদের দেশের বীণার আলাপ। অর্থাৎ, পদে পদে মীড়। ভঙ্গি-বৈচিত্র্যের পরস্পরের মাঝখানে কোনো ফাঁক নেই, কিংবা কোথাও জোড়ের চিহ্ন দেখা যায় না; সমস্ত দেহ পুষ্পিত লতার মতো একসঙ্গে দুলতে দুলতে সৌন্দর্যের পুষ্পবৃষ্টি করছে। খাঁটি য়ুরোপীয় নাচ অর্ধনারীশ্বরের মতো— আধখানা ব্যায়াম, আধখানা নাচ; তার মধ্যে লম্ফঝম্প, ঘুরপাক, আকাশকে লক্ষ্য করে লাথি-ছোঁড়াছুঁড়ি আছে। জাপানি নাচ একেবারে পরিপূর্ণ নাচ। তার সজ্জার মধ্যেও লেশমাত্র উলঙ্গতা নেই। অন্য দেশের নাচে দেহের সৌন্দর্যলীলার সঙ্গে দেহের লালসা মিশ্রিত। এখানে নাচের কোনো ভঙ্গির মধ্যে লালসার ইশারামাত্র দেখা গেল না। আমার কাছে তার প্রধান কারণ এই বোধ হয় যে, সৌন্দর্যপ্রিয়তা জাপানির মনে এমন সত্য যে তার মধ্যে কোনো রকমের মিশল তাদের দরকার হয় না এবং সহ্য হয় না।

কিন্তু, এদের সংগীতটা আমার মনে হল বড়ো বেশিদূর এগোয় নি। বোধ হয় চোখ আর কান এই দুইয়ের উৎকর্ষ একসঙ্গে ঘটে না। মনের শক্তিস্রোত যদি এর কোনো একটা রাস্তা দিয়ে অত্যন্ত বেশি আনাগোনা করে তা হলে অন্য রাস্তাটায় তার ধারা অগভীর হয়। ছবি জিনিসটা হচ্ছে অবনীর, গান জিনিসটা গগনের। অসীম যেখানে সীমার মধ্যে সেখানে ছবি; অসীম যেখানে সীমাহীনতায় সেখানে গান। রূপরাজ্যের কলা ছবি, অপরূপরাজ্যের কলা গান। কবিতা উভচর— ছবির মধ্যেও চলে, গানের মধ্যেও ওড়ে। কেননা, কবিতার উপকরণ হচ্ছে ভাষা। ভাষার একটা দিকে অর্থ, আর-একটা দিকে সুর; এই অর্থের যোগে ছবি গড়ে ওঠে, সুরের যোগে গান।

জাভা-যাত্রীর পত্র

বালি। ৩১ অগস্ট ১৯২৭

এখানকার প্রকৃতি বালিনী ভাষায় কথা কয় না— সেই শ্যামার দিকে চেয়ে চেয়ে দেখি আর অরসিক মোটর-গাড়িটাকে মনে মনে অভিশাপ দিই। মনে পড়ল কখনো কখনো শুষ্কচিত্ত গাইয়ের মুখে গান শুনেছি ; রাগিণীর যেটা বিশেষ দরদের জায়গা, যেখানে মন প্রত্যাশা করছে গাইয়ের কণ্ঠ অত্যুচ্চ আকাশের চিলের মতো পাখাটা ছড়িয়ে দিয়ে কিছুক্ষণ স্থির থাকবে কিংবা দুই-একটা মাত্র মীড়ের ঝাপ্‌টা দেবে, গানের সেই মর্মস্থানের উপর দিয়ে যখন সেই সংগীতের পালোয়ান তার তানগুলোকে লোটন-পায়রার মতো পালটিয়ে পালটিয়ে উড়িয়ে চলেছে, তখন কিরকম বিরক্ত হয়েছি।

[বালি] ৭ সেপ্টেম্বর ১৯২৭

এক-একটি জাতির আত্মপ্রকাশের এক-একটি বিশেষ পথ থাকে। বাংলা দেশের হৃদয় যেদিন আন্দোলিত হয়েছিল, সেদিন সহজেই কীর্তনগানে সে আপন আবেগসঞ্চারের পথ পেয়েছে; এখনো সেটা সম্পূর্ণ লুপ্ত হয় নি। এখানে এদের প্রাণ যখন কথা কইতে চায় তখন সে নাচিয়ে তোলে। মেয়ে নাচে, পুরুষ নাচে। এখানকার যাত্রা অভিনয় দেখেছি ; তার প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত চলায়-ফেরায়, যুদ্ধে-বিগ্রহে, ভালোবাসার প্রকাশে, এমন-কি ভাঁড়ামিতে, সমস্তটাই নাচ।

...বিশুদ্ধ নাচও আছে। পরশু রাত্রে সেটা গিয়ানয়ারের রাজবাড়িতে দেখা গেল। সুন্দর-সাজ-করা দুটি ছোটো মেয়ে— মাথায় মুকুটের উপর ফুলের দণ্ডগুলি একটু নড়াতেই দুলে ওঠে। গামেলান বাদ্যযন্ত্রের সঙ্গে দুজনে মিলে নাচতে লাগল। এই বাদ্যসংগীত আমাদের সঙ্গে ঠিক মেলে না। আমাদের দেশের জলতরঙ্গ বাজনা আমার কাছে সংগীতের ছেলেখেলা বলে ঠেকে। কিন্তু, সেই জিনিসটিকে গম্ভীর, প্রশস্ত, সুনিপুণ, বহুযন্ত্রমিশ্রিত বিচিত্র আকারে এদের বাদ্যসংগীতে যেন পাওয়া যায়। রাগরাগিণীতে আমাদের সঙ্গে কিছুই মেলে না; যে অংশ মেলে সে হচ্ছে এদের মৃদঙ্গের ধ্বনি, সঙ্গে করতালও আছে। ছোটো বড়ো ঘণ্টা এদের সংগীতের প্রধান অংশ। আমাদের দেশের নাট্যশালায় কন্সর্ট্ বাজনার যে নূতন রীতি হয়েছে এ সে রকম নয়; অথচ, য়ুরোপীয় সংগীতে বহু যন্ত্রের যে হার্মনি এ তাও নয়। ঘণ্টার মতো শব্দে একটা মূল স্বরসমাবেশ কানে আসছে; তার সঙ্গে নানা প্রকার যন্ত্রের নানারকম আওয়াজ যেন একটা কারুশিল্পে গাঁথা হয়ে উঠছে। সমস্তটাই যদিও আমাদের থেকে একেবারেই স্বতন্ত্র, তবু শুনতে ভারি মিষ্টি লাগে। এই সংগীত পছন্দ করতে য়ুরোপীয়দেরও বাধে না।...

গামেলান সংগীতের কথা পূর্বেই বলেছি। ইতিমধ্যে এ সম্বন্ধে আমাকে চিন্তা করতে হয়েছে। এরা-যে আপন-মনে সহজ আনন্দে গান গায় না, তার কারণ এদের কণ্ঠসংগীতের অভাব। এরা টিং টিং টুং টাং করে যে বাজনা বাজায় বস্তুত তাতে গান নেই, আছে তাল। নানা যন্ত্রে এরা তালেরই বোল দিয়ে চলে। এই বোল দেবার কোনো-কোনো যন্ত্র ঢাক-ঢোলের মতোই, তাতে স্বর অল্প, শব্দই বেশি ; কোনো-কোনো যন্ত্র ধাতুতে তৈরি, সেগুলি স্বরবান্। এই ধাতুযন্ত্রে টানা সুর থাকা সম্ভব নয়, থাকবার দরকার নেই, কেননা টানা সুর গানেরই জন্যে— বিচ্ছিন্ন সুরগুলিতে তালেরই বোল দেয়।

জাভা। ১৪ সেপ্টেম্বর ১৯২৭

বাজনা বেজে উঠল, সেইসঙ্গে এখানকার গানও শোনা গেল। সে গানে আমাদের মতো আস্থায়ী-অন্তরার বিভাগ নেই। একই ধুয়ো বার বার আবৃত্তি করা হয়, বৈচিত্র্য যা-কিছু তা যন্ত্র-বাজনায়।... এদের যন্ত্র বাজনাটা তাল দেবার উদ্দেশে। আমাদের দেশে বাঁয়া তবলা প্রভৃতি তালের যন্ত্র যে সপ্তকে গান ধরা হয় তারই সা সুরে বাঁধা; এখানকার তালের যন্ত্রে গানের সব সুরগুলিই আছে। মনে করো 'তুমি যেয়ো না এখনি— এখনো আছে রজনী' ভৈরবীর এই এক ছত্র মাত্র কেউ যদি ফিরে ফিরে গাইতে থাকে আর নানাবিধ যন্ত্রে ভৈরবীর সুরেই যদি তালের বোল দেওয়া হয়, আর সেই বোল-যোগেই যদি ভৈরবী রাগিণীর ব্যাখ্যা চলে, তা হলে যেমন হয় এও সেইরকম। পরীক্ষা করে দেখলে দেখা যাবে শুনতে ভালোই লাগে, নানা আওয়াজের ধাতুবাদ্যে সুরের নৃত্যে আসর খুব জমে ওঠে।

[জাভা] ১৭ সেপ্টেম্বর ১৯২৭

মানুষের জীবন বিপদ্‌সম্পদ্‌ সুখদুঃখের আবেগে নানাপ্রকার রূপে ধ্বনিতে স্পর্শে লীলায়িত হয়ে চলছে; তার সমস্তটা যদি কেবল ধ্বনিতে প্রকাশ করতে হয় তা হলে সে একটা বিচিত্র সংগীত হয়ে ওঠে; তেমনি আর-সমস্ত ছেড়ে দিয়ে সেটাকে কেবলমাত্র যদি গতি দিয়ে প্রকাশ করতে হয় তা হলে সেটা হয় নাচ। ছন্দোময় সুরই হোক আর নৃত্যই হোক তার একটা গতিবেগ আছে, সেই বেগ আমাদের চৈতন্যে রসচাঞ্চল্য সঞ্চার করে তাকে প্রবলভাবে জাগিয়ে রাখে। কোনো ব্যাপারকে নিবিড় করে উপলব্ধি করাতে হলে আমাদের চৈতন্যকে এইরকম বেগবান করে তুলতে হয়।

জাভা। ২০ সেপ্টেম্বর ১৯২৭

চোখের দেখার সুখটুকু রক্ষা করে এদের যে সংগীতের আলোচনা সে হচ্ছে সুরের নাচ। ছন্দের লীলা এদের কাছে গীতের ধারার চেয়ে বেশি। কিন্তু, ছন্দের লীলা আমাদের দেশের ভোজপুরিয়াদের খচমচ বাদ্যের দুঃসহ অত্যাচার নয়। এদের নাচ যেমন সুন্দর সজ্জিত অঙ্গের নাচ, এদের সংগীতে যে ছন্দের নাচ সেও খোল করতাল মৃদঙ্গের কোলাহল নয়— সুশ্রাব্য সুর দিয়ে সেই নাচ মণ্ডিত; এদের সংগীতকে বলা যেতে পারে স্বরনৃত্য, এদের অভিনয়কে বলা যায় রূপনাট্য।

পারস্য-যাত্রী

শিরাজ। ১৭ এপ্রিল ১৯৩২

এখানকার গান-বাজনার কিছু নমুনা পেলুম। একজনের হাতে কানুন, একজনের হাতে সেতার-জাতীয় বাজনা, গায়কের হাতে তাল দেবার যন্ত্র— বাঁয়া-তবলার একত্রে মিশ্রণ। সংগীতের তিনটি ভাগ। প্রথম অংশটা চটুল, মধ্য অংশ ধীর মন্দ সকরুণ, শেষ অংশটা নাচের তালে। আমাদের দিশি সুরের সঙ্গে স্থানে স্থানে অনেক মিল দেখতে পাই। বাংলা দেশের সঙ্গে একটা ঐক্য দেখছি— এখানকার সংগীত কাব্যের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন নয়।

তেহেরান। ২৯ এপ্রিল ১৯৩২

আজ সন্ধ্যার সময় একজন ভদ্রলোক এলেন, তাঁর কাছ থেকে বেহালায় পারসিক সংগীত শুনলুম। একটি সুর বাজালেন, আমাদের ভৈরোঁ রামকেলির সঙ্গে প্রায় তার কোনো তফাত নেই। এমন দরদ দিয়ে বাজালেন— তানগুলি পদে পদে এমন বিচিত্র অথচ সংযত ও সুমিত যে, আমার মনের মধ্যে মাধুর্য নিবিড় হয়ে উঠল। বোঝা গেল ইনি ওস্তাদ, কিন্তু ব্যাবসাদার নন। ব্যাবসাদারিতে নৈপুণ্য বাড়ে কিন্তু বেদনাবোধ কমে যায়, ময়রা যে কারণে সন্দেশের রুচি হারায়। আমাদের দেশের গাইয়ে-বাজিয়েরা কিছুতেই মনে রাখে না যে, আর্টের প্রধান তত্ত্ব তার পরিমিতি। কেননা, রূপকে সুব্যক্ত করাই তার কাজ। বিহিত সীমার দ্বারা রূপ সত্য হয়, সেই সীমা ছাড়িয়ে অতিকৃতিই বিকৃতি।... আমাদের সংগীতের আসরে এই অতিকায় আতিশয্য মত্ত করীর মতো নামে পদ্মবনে। তার তানগুলো অনেক স্থলে সামান্য একটু-আধটু হেরফের করা পুনঃ পুনঃ পুনরাবৃত্তি মাত্র। তাতে স্তূপ বাড়ে রূপ নষ্ট নয়। তন্বী রূপসীকে হাজার পাকে জড়িয়ে ঘাগরা এবং ওড়না পরানোর মতো। সেই ওড়না বহুমূল্য হতে পারে, তবু রূপকে অতিক্রম করবার স্পর্ধা তাকে মানায় না। এরকম অদ্ভুত রুচিবিকারের কারণ এই যে, ওস্তাদেরা স্থির করে রেখেছেন সংগীতের প্রধান উদ্দেশ্য সমগ্র গানটিকে তার আপন সুষমায় প্রকাশ করা নয়, রাগরাগিণীকেই বীরবিক্রমে আলোড়িত ফেনিল করে তোলা— সংগীতের ইমারতটিকে আপন ভিত্তিতে সুসংযমে দাঁড় করানো নয়, ইট কাঠ চুন সুরকিকে কণ্ঠ-কামানের মুখে সগর্জনে বর্ষণ করা। ভুলে যায় সুবিহিত সমাপ্তির মধ্যেই আর্টের পর্যাপ্তি। গান যে বানায় আর গান যে করে উভয়ের মধ্যে যদি বা দরদের যোগ থাকে, তবু সৃষ্টিশক্তির সাম্য থাকা সচরাচর সম্ভবপর নয়। বিধাতা তাঁর জীবসৃষ্টিতে নিজে কেবল যদি কঙ্কালের কাঠামোটুকু খাড়া করেই ছুটি নিতেন, যার তার উপর ভার থাকত সেই কঙ্কালে যত খুশি মেদমাংস চড়াবার, নিশ্চয়ই তাতে অনাসৃষ্টি ঘটত। অথচ আমাদের দেশে গায়ক কথায় কথায় রচয়িতার অধিকার নিয়ে থাকে, তখন সে সৃষ্টিকর্তার কাঁধের উপর চ'ড়ে ব্যায়াম-কর্তার বাহাদুরি প্রচার করে। উত্তরে কেউ বলতে পারেন, 'ভালো তো লাগে'। কিন্তু পেটুকের ভালো লাগা আর রসিকের ভালো লাগা এক নয়। কী ভালো লাগে তাই নিয়ে তর্ক।

তেহেরান। ৫ মে ১৯৩২

এশিয়ার প্রায় সকল দেশেই আজ পাশ্চাত্য ভাবের সঙ্গে প্রাচ্য ভাবের মিশ্রণ চলছে। এই মিশ্রণে নূতন সৃষ্টির সম্ভাবনা। এই মিলনের প্রথম অবস্থায় দুই ধারার রঙের তফাতটা থেকে যায়, অনুকরণের জোরটা মরে না। কিন্তু আন্তরিক মিলন ক্রমে ঘটে, যদি সে মিলনে প্রাণশক্তি থাকে— কলমের গাছের মতো নূতনে পুরাতনে ভেদ লুপ্ত হয়ে ফলের মধ্যে রসের বিশিষ্টতা জন্মে। আমাদের আধুনিক সাহিত্যে এটা ঘটেছে, সংগীতেও কেন ঘটবে না বুঝি নে। যে চিত্তের মধ্যে দিয়ে এই মিলন সম্ভবপর হয় আমরা সেই চিত্তের অপেক্ষা করছি। য়ুরোপীয় সাহিত্যচর্চা প্রাচ্য শিক্ষিত সমাজে যে পরিমাণে অনেক দিন ধরে অনেকের মধ্যে ব্যাপ্ত হয়েছে, য়ুরোপীয় সংগীতচর্চাও যদি তেমনি হত তা হলে নিঃসন্দেহই প্রাচ্য সংগীতে রসপ্রকাশের একটি নূতন শক্তি সঞ্চার হত। য়ুরোপের আধুনিক চিত্রকলায় প্রাচ্য চিত্রকলার প্রভাব সঞ্চারিত হয়েছে এ তো দেখা গেছে। এতে তার আত্মতা পরাভূত হয় না, বিচিত্রতর প্রবলতর হয়।

...আমাদের রাগরাগিণী স্বরসংগতিকে স্বীকার করেও আত্মরক্ষা করতে একেবারেই পারে না এ কথা জোর করে কে বলতে পারে? সৃষ্টির শক্তি কী লীলা করতে সমর্থ কোনো-একটা বাঁধা নিয়মের দ্বারা আমরা আগে হতে তার সীমা নির্ণয় করতে পারি নে। কিন্তু, সৃষ্টিতে নূতন রূপের প্রবর্তন বিশেষ শক্তিমান প্রতিভার দ্বারাই সাধ্য, আনাড়ির বা মাঝারি লোকের কর্ম নয়। য়ুরোপীয় সাহিত্যের যেমন, তেমনি তার সংগীতেরও মস্ত একটা সম্পদ আছে। সে যদি আমরা বুঝতে না পারি, তবে সে আমাদের বোধশক্তিরই দৈন্য ; যদি তাকে গ্রহণ করা একেবারেই অসম্ভব হয়, তবে তার দ্বারা আভিজাত্যের প্রমাণ হয় না।

বিবিধ প্রসঙ্গ

১

চৈতন্য যখন পথে বাহির হইলেন তখন বাংলা দেশের গানের সুর পর্যন্ত ফিরিয়া গেল। তখন এককণ্ঠবিহারী বৈঠকি সুরগুলো কোথায় ভাসিয়া গেল? তখন সহস্র হৃদয়ের তরঙ্গ-হিল্লোল সহস্র কণ্ঠ উচ্ছ্বসিত করিয়া নূতন সুরে আকাশে ব্যাপ্ত হইতে লাগিল। তখন রাগরাগিণী ঘর ছাড়িয়া পথে বাহির হইল, একজনকে ছাড়িয়া সহস্রজনকে বরণ করিল। বিশ্বকে পাগল করিবার জন্য কীর্তন বলিয়া এক নূতন কীর্তন উঠিল। যেমন ভাব তেমনি তাহার কণ্ঠস্বর— অশ্রুজলে ভাসাইয়া সমস্ত একাকার করিবার জন্য ক্রন্দনধ্বনি। বিজন কক্ষে বসিয়া বিনাইয়া বিনাইয়া একটিমাত্র বিরহিণীর বৈঠকি কান্না নয়, প্রেমে আকুল হইয়া নীলাকাশের তলে দাঁড়াইয়া সমস্ত বিশ্বজগতের ক্রন্দনধ্বনি।

—'চিঠিপত্র', পত্র ৬, রচনাবলী দ্বিতীয় খণ্ড (সুলভ সংস্করণ প্রথম খণ্ড, পৃ ৮৭৪)

২

বাংলা পড়িবার সময় অনেক পাঠক অধিকাংশ স্বরবর্ণকে দীর্ঘ করিয়া টানিয়া টানিয়া পড়েন। নচেৎ সমমাত্র হ্রস্বস্বরে হৃদয়ের সমস্ত আবেগ কুলাইয়া উঠে না।... ভালো ইংরেজ অভিনেতার অভিনয়ে দেখিতে পাওয়া যায় এক-একটি শব্দকে সবলে বেষ্টন করিয়া প্রচণ্ড হৃদয়াবেগ কিরূপ উদ্দাম গতিতে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে।...

বাংলা শব্দের মধ্যে এই ধ্বনির অভাব-বশত বাংলায় পদ্যের অপেক্ষা গীতের প্রচলনই অধিক। কারণ, গীত সুরের সাহায্যে প্রত্যেক কথাটিকে মনের মধ্যে সম্পূর্ণ নিবিষ্ট করিয়া দেয়। কথায় যে অভাব আছে সুরে তাহা পূর্ণ হয়। এবং গানে এক কথা বার বার ফিরিয়া গাহিলে ক্ষতি হয় না। যতক্ষণ চিত্ত না জাগিয়া উঠে ততক্ষণ সংগীত ছাড়ে না। এইজন্য প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে গান ছাড়া কবিতা নাই বলিলে হয়।

সংস্কৃতে ইহার বিপরীত দেখা যায়। বেদ ছাড়িয়া দিলে সংস্কৃত ভাষায় এত মহাকাব্য খণ্ডকাব্য সত্ত্বেও গান নাই। শকুন্তলা প্রভৃতি নাটকে যে দুই-একটি প্রাকৃত গীত দেখিতে পাওয়া যায় তাহা কাব্যের মধ্যে স্থান পাইতে পারে না। বাঙালি জয়দেবের গীতগোবিন্দ আধুনিক এবং তাহাকে এক হিসাবে গান না বলিলেও চলে। কারণ, তাহার ভাষা-লালিত্য ও ছন্দোবিন্যাস এমন সম্পূর্ণ যে তাহা সুরের অপেক্ষা রাখে না ; বরং আমার বিশ্বাস সুরসংযোগে তাহার স্বাভাবিক শব্দনিহিত সংগীতের লাঘব করে। কিন্তু,

অপেক্ষাকৃত অবিচলিত থাকা আমার পক্ষে এইজন্যে সহজ যেহেতু জীবনে অনেক অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে এসেছি। প্রথম যখন কবিতায় আধুনিকতা প্রকাশ করেছিলুম সে অনেক দিনের কথা, তোমাদের জন্ম হয় নি। তখন প্রবীণের দল, যাঁদের কাব্যে শাস্ত্রসম্বন্ধীয় অলংকার ছিল তৎকালীন হিন্দুস্থানী ছাঁচে ঢালা তাঁরা আমার অশাস্ত্রীয় ছন্দ প্রভৃতি সম্বন্ধে ঠিক এই রকম কথাই বলেছিলেন, অর্থাৎ তাঁদের অভ্যাসপীড়া ঘটিয়েছি বলে কোনো মতেই আমার রচনার ধারা তাঁদের একটুও ভালো লাগছিল না। এত বড়ো জোরালো কথার উপরে কারো জোর খাটে না— কিন্তু দেখলুম চুপ করে গেলেই তার জোর আপনিই মরে আসে। আমার কাব্য ভালো লাগে না এমন লোক বিপুলা পৃথিবীতে দুর্লভ হবে না— কিন্তু আমার কাব্য ও ছন্দের ধারাটা ব্যবহার করছেন না এমন কবি বাংলায় আজ নেই এ কথা বললে অহংকারের মতো শুনতে হবে তবু কথাটা মিথ্যে হবে না— যখন প্রথম সাধুনিয়ম ভাঙা চালে কাব্য লিখতে আরম্ভ করেছি সেটাকে প্রাগৈতিহাসিক যুগ বললেও চলে, তার পরে আজ বয়স হল সত্তর, ইতিমধ্যে ইতিহাসটা কোথায় এসে দাঁড়িয়েছে তা দেখবার সময় পাওয়া গেল— কিন্তু আমার গান সম্বন্ধে ইতিহাসের গতি নির্ণয় করবার সময় পাব না, তোমরা হয়তো কিছু আভাস পেতে পারবে, তখন আমার সময় চলে গেছে, কারণ ভূতকাল থেকে ভূতের কাল পর্যন্ত কোনো সেতু নেই।... ইতি ২১ ভাদ্র ১৩৩৮

৩

চিত্রা[ঙ্গদা।] সমালোচনা তোমার হাতে পড়েছে খুশি হয়েছি। কাব্যভ্রম করে ওর প্রতি বাণ সন্নিপাত করলে নিদারুণ অপঘাত ঘটত। নৃত্যকলার রাজ্যাভিষেকে সাহিত্যকে স্থান নিতে হয় সিংহাসনের পাদপীঠে। সংগীতে বাণী এবং সুর সমান গৌরবে পাশাপাশি বসতেও পারে যদিও সেখানে বাণীকে বসতে হয় বামে, স্ত্রীজনোচিত আত্মসংবরণ করে। কণ্ঠের পথে বাণীতে এবং সুরেতে হাত ধরাধরি করবার সুযোগ পায়— কিন্তু নৃত্য হোলো মূলত নির্বাকের ভাষা। বিশ্বভুবন মূক, মহেন্দ্রের সভায় তার আত্মনিবেদন নৃত্যে। নৃত্যের রঙ্গক্ষেত্র বিরাট, তৃণে তৃণে হাওয়ার হিল্লোল থেকে আরম্ভ করে তারায় তারায় ছন্দের মালা গাঁথা পর্যন্ত চলেছে ভঙ্গিলীলার নিত্য মহোৎসব। মানুষের সুখ-দুঃখে এই বিশ্বের ভাষাকে যখন আহ্বান করা হয় বাণী তখন কেবলমাত্র ছন্দের বাহনরূপেই তার সাহচর্য করে। কাব্যে গানে যে অনির্বচনীয়তার প্রকাশ ঘটে মুখ্যত সেটা বচনে নয়, সেটা ছন্দে। এ কথা আজ সবাই জানে বিদ্যুৎকণার ছন্দোবৈচিত্র্যেই বিশ্বের সৃষ্টি-বৈচিত্র্য। বিশ্বের সেই সৃষ্টি উৎস থেকেই ছন্দের ধারাকে মানুষের অঙ্গের মধ্যে সঞ্চারিত করলে সৃষ্টিলীলা অব্যবহিত ভাবে প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠে, তখন যে অরসিক বলে মানে কী হোলো, সে গোলাপের ব্যাখ্যার জন্যেও মল্লিনাথকে ডাকতে ছোটে। আমরা যে-সব প্রদেশে চিত্রাঙ্গদার নৃত্যরঙ্গ নিয়ে গেছি সে সব জায়গায় বাংলা ভাষা নিরর্থক, সেই কারণেই প্রমাণ হয়ে, গেছে, রসের প্রকাশে অর্থের সার্থকতা কম। ছাপার অক্ষরে চিত্রাঙ্গদা বইখানা সেই কারণে অত্যন্ত লজ্জিত— নৃত্যের ছন্দেই যার আব্রু, সেই বাণী এখানে নয়। সেই কারণে বিচারসভায় বাণীকে আড়ালে রেখে এই বইয়ের সম্ভ্রমরক্ষা তুমিই করতে পারবে। ইতি ২৯ এপ্রিল ১৯৩৬

বিভিন্ন আলোচনায় বক্তৃতায় বা সাক্ষাৎকারে সংগীত বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের নানা চিন্তার প্রকাশ আছে ইংরেজি ভাষায়। 'সংগীতচিন্তা' গ্রন্থে সংকলিত সেই আলোচনাগুলিও এখানে ক্রমান্বয়ে মুদ্রিত হইল :

১.

...In regard to music, I claim to be something of a musician myself. I have composed many songs which have defied the canons of orthodox propriety and good people are disgusted at the impudence of a man who is audacious only because he is untrained. But I persist, and God forgives me because I do not know what I do. Possibly that is the best way of doing things in the sphere of art. For I find that people blame, but also sing my songs, even if not always correctly.

Please do not think I am vain. I can judge myself objectively and can openly express admiration for my own work, because I am modest. I do not hesitate to say that my songs have found their place in the heart of my land, along with her flowers that are never exhausted, and that the folk of the future, in days of joy or sorrow or festival, will have to sing them. This too is the work of a revolutionist.

—*Talks in China*, Visva-Bharati, 1925.
The Religion of an Artist, Visva-Bharati, 1953, p. 15

২

'I have introduced some new element in our music, I know. I have composed five hundred new tunes, perhaps more. This is a parallel growth to my poetry. Anyhow, I love this aspect of my activity. I get lost in my songs, and then I think that these are my best work ; I get quite intoxicated. I often feel that, if all my poetry is forgotten, my songs will live with my countrymen, and have a permanent place. I have very deep delight in them. But'—
very sadly—
'it is nonsense to say that music is a universal language. I should like my music to find acceptance, but I know this cannot be, at least not till the West has had time to study and learn to appreciate our music. All the same, I know the artistic value of my songs. They have great beauty. Though they will not be known outside my province, and much of my work will be gradually lost, I leave them as a legacy. My own countrymen do not understand. But they will. They are real songs, songs for all seasons and occasions. In my hymns, my *Brahmasangit*, I have adapted and taken wholesale older tunes from Tansen, the best of our composers ; in these, I have used orthodox forms. But for my own songs I have invented very freely.

—Edward Thompson, *Rabindranath Tagore : Poet and Dramatist*, 1926, p. 69

৩

When I was given an opportunity of hearing Ratan Devi sing some Indian songs, I felt uneasy in my mind. I never could believe it possible for an English woman to give us any music that could be hailed as Indian. I was almost certain that it was going to be something that defies all definitions, and that I was expected to sit listening to some of those contemptible tunes that a foreigner, without the power to discriminate and patience to learn, usually picks up in India.

I remembered the unlucky day in my early boyhood, when I was asked by some English ladies to sing. I happened to know a tune of a non-descript kind which had the reputation, with us, of being of Italian origin, and I confidently selected that one in the hope of its being readily appreciated by my audience. I produced an outburst of merriment, quite unexpected in its irrepressible suddenness, and I was emphatically assured that it might be anything but Italian.

Since then, if asked to sing before Europeans, I boldly took my chance and dealt with Indian songs of unexceptionable character. The result used to be less disastrous, but hardly more satisfactory. So I came to the conclusion that mere tunes cannot stand by themselves, and unless given with some idea of the musical system to which they belong, lack all their lustre and meaning. In recent times the attention of Europe has been drawn to all branches of Oriental arts, and I have witnessed the sight of Europeans listening to Indian music with deep interest. But all the same, it is always difficult to know if their appreciation is not altogether fantastic, and until you hear them sing or play and thus come into the touch of their heart, you cannot realise their true feeling.

It is a well-known fact that history is prone to repeat its jokes ; and while I was dreading lest it should again be my turn to be the victim of its second perpetration of the one I was subjected to years ago, only with slight variations this time, Ratan Devi began by singing a few European folk-songs with the piano accompaniment. They were delightful, and I prayed in my mind that she should end the evening as she had begun, with the music familiar to her. But fortunately for me, my prayer was not granted.

Ratan Devi left her piano and sat on the floor, squatting down in Indian fashion, and took up the *tambura* on her lap. After the first few notes my misgivings were completely dispelled. The tunes she sang were not of the cheap kind that can easily adapt itself to the uninformed taste of any hasty foreign traveller, satisfying his shallow curiosity. They were Behag, Kandra, Malkaus,— sung with all their richness of details, depth of modulations and exquisite feeling. The times that she observed were the usual difficult ones in Indian music, the cadence which is never too obvious or the division of beats too emphatic. Neither tunes nor times were the least modified to make them simpler or to suit them to the European training of the singer.

Though the music was immaculately Indian, yet Ratan Devi's voice was her own, and it could not possibly be mistaken for that of any Indian *ustad.* In our country the execution of a song is considered to be of minor importance. India goes to the extreme of almost holding with contempt any finesse in singing, and our master singers never take the least trouble to make their voice and manner attractive. They are not ashamed if their gestures are violent, their top notes cracked and their bass notes unnatural. They take it to be their sole function to display their perfect mastery over all the intricacies of times and tunes, forms and formalities of the classic traditions. Those of the audience who have the human weakness to demand something more, who are not content with the presentation of a music with its richness of forms and play of power, but whose senses have to be satisfied as well, are held to be beneath the notice of any self-respecting artist. They think it to be the duty of the hireling musicians of dancing parties to cater for the enjoyment of fastidious dandies whose eyes and ears are apt to take offence at the least touch of roughness. Anyhow, the cultivation of the flawless perfection of the exterior has been severely neglected in India.

The ideal is otherwise in Europe. A stupendously vast amount of energy is constantly occupied in this country in perfecting outward details in everything, the least deviation from which takes away from the value of a thing much more than it deserves. Here the stage arrangement must be extravagantly perfect and the artist in the pride of the intrinsic merit of his art cannot afford to pay his respect to the public by appearing careless in the least detail of execution. As Europe is willing to pay a very high price for this, perhaps she has got her reward.

I at once realised this when I heard Ratan Devi sing. There was not a sign of effort in her beautiful voice, and not the least suggestion of the uncouthness we are accustomed to in our singers. The casket was as perfect as the gem.

Sometimes the meaning of a poem is better understood in a translation, not necessarily because it is more beautiful than the original, but as in the new setting the poem has to undergo a trial, it shines more brilliantly if it comes out triumphant. So it seemed to me that in Ratan Devi's singing our songs gained something in feeling and truth. Listening to her I felt more clearly than ever that our music is the music of cosmic emotion. It deals not primarily with the drama of the vicissitudes of human life. It does not give emphasis to the social enjoyment of men. In fact, in all our festivities the business of our music seems to me to bring to the heart of the crowded gathering the sense of the solitude and vastness that surrounds us on all sides. It is never its function to provide fuel for the flame of our gaiety, but to temper it and add to it a quality of depth and detachment. The truth of this becomes evident when one considers that *Sāhānā* is the *rāgini* specially used for the occasion of wedding festivals. It is not at all gay or frolicsome, but almost sad in its solemnity. Our *rāginīs* of springtide and rains, of midnight and daybreak, have the profound pathos of the all-pervading intimacy, yet immense aloofness of Nature.

Ratan Devi sang an *ālāp* in Kandra, and I forgot for a moment that I was in a London drawing-room. My mind got itself transported in the magnificence of an eastern night, with its darkness, transparent, yet unfathomable, like the eyes of an Indian maiden, and I seemed to be standing alone in the depth of its stillness and stars.

—Foreword to *Thirty Songs from the Punjab and Kashmir*
recorded by Ratan Devi with introduction and translations
by Ananda K. Coomaraswamy : February 1913.

৪

'I have heard that your poems are often sung, and chanted by the people of your country', said I, 'that is true, is it not ?'

'Yes', he said, 'it is true. Our people love poetry. I know villagers in my neighborhood, who after their day's work in the field, gather under the stars before some hut and sing in chorus till midnight devotional songs belonging to the best lyrical literature of their language.'

'If the people enjoy singing your poems is it because they are like folk poetry?'

'Some of my poems are like folk poetry,' said Dr. Tagore, 'but some are in the romantic style and some in the classical style.'

'The music that goes with them is your own music, is it not ?'

'Yes.'

'Can you tell me something about it ?'

'It is difficult to do that because it is not at all like your Western music. When I first went to England I was taken to hear a great singer— she had been in opera. I could not understand why people found her singing beautiful. To me it was strange—imitative—I did not like it. But I said to myself, 'If so many people think it is beautiful, and such intelligent people, I will try to understand.' And so I studied the Western music and I have found much to admire in it. But your people will not study our music. When they come to India and do not like it at once they will not try to understand...'

I could readily believe that the Americans with money enough to travel to India would not be the ones to stop and study the music or art of Bengal long and faithfully. Our intolerance, where it existed in this connection, might readily be the result of the pressure of our practical occidental lives upon us, or of our breathless haste. Just why English musicians should not be interested in Indian music I do not know.

'When you make a poem and music for it do you make the verbal and musical melodies together ? Or does the music come first, so that you fit words to it, or the words, so that you fit music to them?'

'Sometimes I make the words first and then put music with them later. Sometimes I make a melody first and then put words with it. Sometimes the music is subordinated to the words. Sometimes the words are subordinated to music.'

'How does this method affect your rhythms ?'

'They are always changed. Anything new added always changes what was before. It is like color added to the lines of a picture. When you add melody to words the rhythm is changed.'

'Yet you do not change the emotional key—a love song remains in the same mood, or a lament for a dead friend retains the spirit of sorrow even when the new element is added.'

Dr. Tagore gave assent at once.

'The new thing that is added—it is not alien,' he said.

'You believe, then, that either in a poem or in a song, rhythm always means something, is always intimately related to the emotion expressed ?'

Dr. Tagore seemed to think that rhythm would have no value otherwise.

'Where', I asked him, 'do the poets of your country find their rhythms ? Do they get them out of rhetorics ?'

He laughed gently and shook his head.

'Before me', he said, 'they went much to the rhetorics. I have set them free.'

'Where do your own rhythms come from ?'

'From the subconscious' he said, 'like a spring bubbling out of the earth.'

'Will you tell me something of the kinds of rhythm you have in your language !'

'We have many kinds of rhythm. a great rhythmical variety. Our words have no individual idiosyncrasies. no accent of their own to be respected. as English words have. In that our language is more like French. Many rhythmical bars that are rare or quite impossible in English are common with us. We have a four-syllable bar and five-syllable bar.'

'Where does the verse-accent come ?'

'On the first syllable. usually. It is like the ebbing away of the breath. a bar of one of these rhythms— the full breath at the beginning— then the renewal at the beginning of the next bar.'

Dr. Tagore then kindly recited a few lines from one of his poems written with four-syllable to the bar. The rhythmical effect was very beautiful. While he was reciting I noticed that his finger. lying on the table. beat the time of the rests at the end of the line. Evidently the poets of Bengal know that time is time in silence just as much as in sound. At this moment we were interrupted and I went away with the memory of that gently wavering rhythm. 'like the ebbing away of the breath'. but clearly marked from bar to bar and line to line. wishing that I could have heard many more of these poems in the language which I did not understand. yet found so clearly musical.

—Tagore and Marguerite Wilkinson : *The Touchstone*. vol. VII. No 5.
New York. February 1921.

৫

Villeneuve, 24 June, 1926.

ROLLAND : Have you heard anything of Gluck ? He lived in the 18th century. Among modern European composers he has the largest amount of what I may call the Greek feeling. retaining in music only what was serene and beautiful. and eliminating with austere severity everything that was superfluous. Before him European music was something like medieval Gothic architecture. It possessed great exuberance of spirit. but was apt to get lost in a mass of details. The reform accomplished by Gluck at the end of the 18th century. just before the outbreak of the French Revolution. was coming back to pure line and pure form. He was a German. or rather a Bohemian. who lived much in France where he was well appreciated.

TAGORE : I have always felt the immense power of your European music. I love Beethoven and also Bach. I must confess. it takes a good deal of time to understand and thoroughly appreciate the idiom of your music. As a youg boy

I heard European music being played on the piano: much of it I found attractive, but I could not enter fully into the spirit of the thing. Do the different countries of Europe have peculiar features of their own in their music ? For example, has Italian music any special characteristics ? Is the general spirit different from that of German music ?

ROLLAND : Very different indeed. A good deal of modern European music had originally come from Italy but became completely changed in its development. In the south the music has more beauty, but as you go to the north it becomes more and more complex. In the old Italian music of the 16th century you find delicate lines and shades, and the beauty of melody is prominent : in the north there is more emotion. among modern composers Puccini has great gifts but lacks in taste, and I think modern Italian music is rather spoiled and extravagant. In old Italy the composer and poet were both seeking for purity.

after some more discussion about music

TAGORE : I want to ask you a question. The purpose of art is not to give expression to emotion but to use it for the creation of significant form. Literature is not the direct expression of any emotion. Emotion only supplies the occasion which makes it possible to bring forth the creative act. A Grecian urn is not the representation of any particular emotion which is at all important : but it gives form to some definite urge of the artist's mind. In European music I find, however, that an attempt is sometimes made to give expression to particular emotions. Is this desirable ? Should not music also use emotion as material only, and not as an end in itself ?

ROLLAND : A great musician must always use emotion as substance out of which beautiful forms are created. But in Europe musicians have had such an abundance of good material that they tended to overemphasise the emotional aspects. A great musician must have poise, for without it his work perishes.

TAGORE : Take the opera *Il Traviata.* Is it not too definite ? Does it not try to describe everything in too definite terms ?

ROLLAND : Yes, it is a defect of our music, especially since the beginning of the 19th century, after the romantic work of Beethoven was written and particularly after Wagner.

TAGORE : In India we have the other extreme. The singer often takes too much liberty with the music. In pictures and in literature the outward form is fixed, but music requires for its interpretation the human voice ; even in instrumental music you have the human hand which is very flexible. The singer must therefore be a true artist and not merely an artisan. In India the composer has to depend a great deal on the singer to make the music complete by his rendering, but unfortunately the singer often overshadows the composer by his own variations.

ROLLAND : This was also the state of affairs in Europe at the time of Handel. In old Italian music, interpretation was left to the singers, the composers always leaving many things indefinite. In the popular comedies of Italy the music given by the composer was simply a kind of sketch. The player improvised, filled in, and often sang extempore, sometimes to the accompaniment of the composer. Every time both songs and music were different, and a good deal has naturally vanished.

TAGORE : That is a characteristic of music, much of it vanishes. A good deal depends on the singer ; its medium is a living channel.

ROLLAND : In those days singers were terrible tyrants, especially in the south. In the north we had greater precision ; the northern tradition is to have things as definite as possible.

TAGORE : Yes, that also is necessary. Your modern music is now well organised and harmony keeps the music pure, free from adulteration and counterfeits, as the currency of a country is kept pure by the mints.

ROLLAND : But don't you think it is only music which is petrified that can by kept pure in this way ? Music which is living cannot be kept completely unchanged.

after some time

TAGORE : You know, I am not merely a writer of verse : I am keenly interested in music and I myself compose songs. I have always felt puzzled why there are such great differences in musical form in different countries. Surely music should be more universal than other forms of art, for its vehicle is easy to reproduce and transmit from one country to another.

ROLLAND : In every country music passes through several stages. The differences observed at any particular time may possibly be due to a difference of the particular stage of development. Music has its childhood, growth and decay. The first song of emotion finds expression through a form which is scarcely adequate, then comes a perfect harmony between emotion and external form, and finally a certain formalisation, a stereotyping and decay. If life continues, a new overflow and a new cycle begins again.

TAGORE : It is the same in every form of art ; in literature also we find that a new urge creates its own form. After some time a form which was once new becomes old and worn through constant usage and is not longer adequate.

ROLLAND : Yes, and so with life also. We have the eternal flow from form to form.

Tagore : Master-minds create new forms. Then come men without gift who imprison art in rusty fetters, and a time comes for breaking through bonds again.

Rolland : In Europe we are in the last phase : we feel we are imprisoned in a cage.

Tagore : Yes, perhaps you have become too intellectualised ; everything which is vital and humane is getting killed.

Rolland : There is a tendency for our whole life to degenerate into a huge mechanical organisation.

Tagore : Its signs are appearing everywhere over the face of your beautiful old Europe. We find everywhere the same mask, monotonous and devoid of beauty. The Italian cities which I visited are all becoming too modern in their appearance. But Florence was beautiful ; the people there retained a certain detachment of mind which appealed to me very strongly. Without this detachment the life of art cannot exist.

Rolland : Yes, they still have a more rustic side to their life. Lately, Florentines have been looking back to their ancestors. This is probably the secret of Florence being a great artistic centre.

...

Tagore : I first heard European songs when I was 17-year old, during my first visit to London. The artist was Madame Nilsson[1], who used to have a great reputation in those days. She sang nature-songs giving imitation of birds' cries, a kind of mimicry, which appeared extremely ludicrous to me. Music should capture the delight of birds' songs, giving human form to the joy with which a bird sings. But it would not try to be a representation of such songs. Take the Indian rain songs. They do not try to imitate the sound of falling raindrops. They rekindle the joy of rain-festivals, and convey something of the feeling associated with the rainy season. Somehow the songs of springtime do not have the same depth ; I do not know why.

Rolland : When are your spring festivals held ?

Tagore : In Bengal towards the end of February and in early March when the southern spring-breeze begins to blow ; the days are hot while nights are cool and pleasant. This is also the season for the peasant to start work in the field. Is it purely association which gives beauty to the rain-songs? Or is it something which is really inherent in them ? It is true that we get accustomed to hear rain-melodies more frequently in the rainy season ; it is possible, these tunes bring back to our mind the joy and delight of the rainy season itself. But

---

1. Christine Nilsson (1843 – 1922). Swedish prima donna.

then the spring and summer melodies possess equally strong associations and yet they do not stir us so profoundly.

ROLLAND : Perhaps the melodies themselves have peculiar differences.

TAGORE : In poetry a particular work possesses a subtle atmosphere of its own literary associations. The peculiar value of such words will never be intelligible to foreigners : they cannot be appreciated as being supremely beautiful by merely listening to them, or even by merely understanding their literal meaning, for the association will be lacking.

In English take the following lines from Keats :

...magic casement opening on the foam
of perilous seas in faery lands forlorn.

If I translate it into Bengali, it would become meaningless ; it would have no significance for Bengali readers : '...magic casement, opening on the foam of perilous seas, in faery lands forlorn.' The phrases lack in living association to our people. Similarly it is possible that a certain clause, a certain grouping of notes, gradually acquires a value through growth of association. We may have musical phrases acquiring new values like words in literature through long continued usage.

ROLLAND : This kind of image formation occurs in European music, for example, in Bach whose careful phrasings have been carefully studied. Much of the beauty of his music is due to the use of certain musical forms which he borrowed from the earlier music of the 17th and 18th centuries and which he used effectively with the instinct of a genius. In pastoral music, certain groupings are used continually which are even now in vogue. If these particular groupings are used in non-pastoral music, even then they would create an atmosphere of pastoral life. It is probable that your associations of rain-songs are also brought about in the same way.

Rolland was much interested in Indian music
and asked many questions.

ROLLAND : What are your chief instruments ?

TAGORE : The *Vina* which gives extremely pure notes : it has not the flexibility of the violin, but preserves the purity of our melodies in a characteristic way.

He was still thinking about the suggestiveness of
literature and came back to Keats.

TAGORE : Although Keats cannot be translated into Bengali. I can understand the beauty of his poems. We lack the proper associations to start with, but after some familiarity with the ideals and with some knowledge of the surroundings in which these poems were written, we also can acquire the facility of appreciating them. So in spite of individual or geographical peculiarities of form, there is something which is universal in poetry. It requires education and also the growth of familiarity, but, given these things, poetry can be appreciated by every one. Similarly, what is pleasant to the European ear must have something in it which is universal. Indian music also must have an appeal to foreigners who have the necessary training.

ROLLAND : Yes, after getting away from the part which is merely superficial or fashionable. Certain peculiarities belong only to the surface which reflect the passing fancy of a particular time.

TAGORE : In pictures, or in plastic art, the material consists of the representation of things which are in a way familiar to most people and can easily be apprehended by every one. But phrases in music are not familiar ; so when we build up an architecture of music the whole thing appears fantastic to a foreigner. This is why it is much more difficult for a foreigner to understand foreign music than to appreciate foreign art.

After a little while, the poet went on to speak about the sources of inspiration in art and literature.

TAGORE : The starting point for all arts, poetry, painting or music, is the breath, the rhythm which is inherent in the human body and which is the same everywhere, and is therefore universal. I believe musicians must often be inspired by the rhythm of the circulation of blood or breath. A very interesting study would be a comparison of four tunes of different countries. With more developed music things become more complex, and the underlying similarities cannot be systematically traced.

—*Rolland and Tagore*, ed. Alex Aronson and Krishna Kripalani. Visva-Bharati, 1945, pp. 79-88

৬

August 1930

TAGORE : I was discussing with Dr. Mendel today the new mathematical discoveries which tell us that in the realm of infinitesimal atoms chance has its play : the drama of existence is not absolutely predestined in character.

Einstein : The facts that make science tend toward this view do not say good-bye to causality.

Tagore : Maybe, not ; but it appears that the idea of causality is not in the elements, that some other force builds up with them an organized universe.

Einstein : One tries to understand in the higher plane how the order is. The order is there, where the big elements combine and guide existence ; but in the minute elements this order is not perceptible.

Tagore : Thus duality is in the depths of existence—the contradiction of free impulse and the directive will which works upon it and evolves an orderly scheme of things.

Einstein : Modern physics would not say they are contradictory. Clouds look one from a distance, but, if you see them near, they show themselves in disorderly drops of water.

Tagore : I find a parallel in human psychology. Our passions and desires are unruly, but our character subdues these elements into a harmonious whole. Does something similar to this happen in the physical world ? Are the elements rebellious, dynamic with individual impulse ? And is there a principle in the physical world which dominates them and puts them into an orderly organization ?

Einstein : Even the elements are not without statistical order ; elements of radium will always maintain their specific order, now and ever onward, just as they have done all along. There is, then, a statistical order in the elements.

Tagore : Otherwise the drama of existence would be too desultory. It is the constant harmony of chance and determination which makes it eternally new and living.

Einstein : I believe that whatever we do or live for has its causality ; it is good, however, that we cannot look through it.

Tagore : There is in human affairs an element of elasticity also—some freedom within a small range, which is for the expression of our personality. It is like the musical system in India which is not so rigidly fixed as is the western music. Our composers give a certain definite outline, a system of melody and rhythmic arrangement, and within a certain limit the player can improvise upon it. He must be one with the law of that particular melody, and then he can give spontaneous expression to his musical feeling within the prescribed regulation. We praise the composer for his genius in creating a foundation along with a superstructure of melodies, but we expect from the player his own skill in the creation of variations of melodic flourish and ornamentation. In creation we follow the central law of existence, but, if we do not cut ourselves adrift from it, we can have sufficient freedom within the limits of our personality for the fullest self-expression.

EINSTEIN : That is only possible where there is a strong artistic tradition in music to guide the people's mind. In Europe music has come too far away from popular art and popular feeling and has become something like a secret art with conventions and traditions of its own.

TAGORE : So you have to be absolutely obedient to his too complicated music. In India the measure of a singer's freedom is in his own creative personality. He can sing the composer's song as his own, if he has the power creatively to assert himself in his interpretation of the general law of the melody which he is given to interpret.

EINSTEIN : It requires a very high standard of art fully to realize the great idea in the original music, so that one can make variations upon it. In our country the variations are often prescribed.

TAGORE : If in our conduct we can follow the law of goodness, we can have real liberty of self-expression. The principle of conduct is there, but the character which makes it true and individual is our own creation. In our music there is a duality of freedom and prescribed order.

EINSTEIN : Are the words of a song also free ? I mean to say, is the singer at liberty to add his own words to the song which he is singing ?

TAGORE : Yes. In Bengal we have a kind of song— *Kirtan* we call it— which gives freedom to the singer to introduce parenthetical comments, phrases not in the original song. This occasions great enthusiasm, since the audience is constantly thrilled by some beautiful, spontaneous sentiment added by the singer.

EINSTEIN : Is the metrical form quite severe ?

TAGORE : Yes, quite. You cannot exceed the limits of versification : the singer in all his variations must keep the rhythm and the time, which is fixed. In European music you have a comparative liberty about time, but not about melody. But in India we have freedom of melody with no freedom of time.

EINSTEIN : Can the Indian music be sung without words ? Can one understand a song without words ?

TAGORE : Yes, we have songs with unmeaning words, sounds which just help to act as carriers of the notes. In North India music is an independent art, not the interpretation of words and thoughts, as in Bengal. The music is very intricate and subtle and is a complete world of melody by itself.

EINSTEIN : It is not polyphonic ?

TAGORE : Instruments are used, not for harmony, but for keeping time and for adding to the volume and depth. Has melody suffered in your music by the imposition of harmony ?

EINSTEIN : Sometimes it does suffer very much. Sometimes the harmony swallows up the melody altogether.

TAGORE : Melody and harmony are like lines and colours in pictures. A simple linear picture may be completely beautiful ; the introduction of colour may make it vague and insignificant. Yet colour may, by combination with lines, create great pictures so long as it does not smother and destroy their value.

EINSTEIN : It is a beautiful comparison ; line is also much older than color. It seems that your melody is much richer in structure than ours. Japanese music seems to be so.

TAGORE : It is difficult to analyze the effect of eastern and western music on our minds. I am deeply moved by western music—I feel that it is great, that it is vast in its structure and grand in its composition. Our own music touches me more deeply by its fundamental lyrical appeal. European music is epic in character ; it has a broad background and is Gothic in its structure.

EINSTEIN : Yes, yes, that is very true. When did you first hear European music ?

TAGORE : At seventeen, when I first came to Europe I came to know it intimately, but even before that time I had heard European music in our own household. I had heard the music of Chopin and others at an early age.

EINSTEIN : There is a question we Europeans cannot properly answer, we are so used to our own music. We want to know whether our own music is a conventional or a fundamental human feeling ; whether to feel consonance and dissonance is natural or a convention which we accept.

TAGORE : Somehow the piano confounds me. The violin pleases me much more.

EINSTEIN : It would be interesting to study the effects of European music on an Indian who had never heard it when he was young.

TAGORE : Once I asked an English musician to analyze for me some classical music and explain to me what elements make for the beauty of a piece.

EINSTEIN : The difficulty is that the really good music, whether of the East or of the West, cannot be analyzed.

TAGORE : Yes, and what deeply affects the hearer is beyond himself.

EINSTEIN : The same uncertainty will always be their about everything fundamental in our experience, in our reaction to art, whether in Europe or in

Asia. Even the red flower I see before me on your table may not be the same to you and me.

TAGORE : And yet there is always going on the process of reconciliation between them, the individual taste conforming to the universal standard.

—*Asia*, 1931 March

৭

Geneva, June 1930.

...TAGORE : Music of different nations has a common psychological foundation, and yet that does not mean that national music should not exist. The same thing is, in my opinion, probably true for literature.

WELLS : Modern music is going from one country to another without loss—from Purcell to Bach, then Brahms, then Russian music, then oriental. Music is of all things in the world the most international.

TAGORE : You see the point. I have composed more than three hundred pieces of music. They are all sealed to the West because they cannot properly be given to you in your own notation. They would not perhaps be intelligible to your people, even if I could get them written down in European notation.

WELLS : The West may get used to the music.

TAGORE : Certain forms of tunes and melodies which move us profoundly seem to baffle Western listeners ; yet, as you say, perhaps closer acquaintance with them may gradually lead to their appreciation in the West.

WELLS : Artistic expression in the future will probably be quite different from what it is today ; the medium will be the same and comprehensible to all. Take Radio, which links together the world. And we cannot prevent further invention. Perhaps in the future, when the present clamour for dialects and national languages in broadcasting subsides and new discoveries in science are made, we shall be conversing with one another through a common medium of speech yet undreamt-of.

TAGORE : We have to create the new psychology needed for this age. We have to adjust ourselves to the new necessities and conditions of civilization....

—Extract from the conversation between Tagore and H. G. Wells.

Published in *Asia*, 1931 March.

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

রবীন্দ্র-রচনাবলীর অষ্টাবিংশ খণ্ডের প্রস্তুতিতে গ্রন্থনবিভাগের প্রাক্তন অধ্যক্ষ শ্রীজগদিন্দ্র ভৌমিক, প্রাক্তন উপাধ্যক্ষ (প্রকাশন) শ্রীমানবেন্দ্র পাল ও পরবর্তীকালে শ্রীশঙ্খ ঘোষ, শ্রীপ্রশান্তকুমার পাল, শ্রীঅনাথনাথ দাস এবং শ্রীসুবিমল লাহিড়ী মহাশয়গণের বিশেষ সহায়তা পাওয়া গিয়াছে।

এঁদের সকলের নিকট আমরা কৃতজ্ঞ।

১৬৪৪৬

বর্ণানুক্রমিক সূচী

অঘ্রান হ'ল সারা ... ৭১
অচিন মানুষ ... ২১
অশ্রুবিলাপ ... ১২৪
অধর কিসলয়-রাঙিমা-আঁকা ... ১২৮
অনুবাদ-চর্চা ... ৪০৫
অন্তরীক্ষ আমাদের হউক অভয় ... ৯৮
অপ্রমাদ অমৃতের, প্রমাদ মৃত্যুর পথ ... ১০৭
অপ্রমাদবর্গ ... ১০৭
অবকাশপদ্মে বাণী ... ৩৬
অবসন্ন দিন তার ... ৩৬
অবিচার ... ৩৩
অবিরল ঝরছে শ্রাবণের ধারা ... ১৫০
অবুঝ, বুঝি মরিস খুঁজি ... ৩৬
অভাগা যক্ষ যবে ... ১২৬
অভিভাষণ ... ৪১৯, ৫৬৪
অম্বর অম্বুদে স্নিগ্ধ ... ১৪১
অযতনে তব নিমেষকালের দান ... ৩৬
অর্থ পরে বাক্য সরে ... ১৩২
অলকায় অন্ত নাই ... ৩৬
অসন্তোষের কারণ ... ২৯৮
অসম্ভাব্য না কহিবে, মনে মনে রাখি দিবে ... ১৪৬
অসীম শূন্যে একা ... ৩৭
অস্তাচলের প্রান্ত থেকে ... ৩৭
আঁধার রজনী পোহালো ... ৫৪৮
আঁধার রাতি জ্বেলেছে বাতি ... ৩৯
আঁধারে ডুবিয়া ছিল যে জগৎ ... ৪০
আঁধারের লীলা আকাশে আলোক-লেখায় ... ৪০
আকাশ-ধরা রবিরে ঘেরি ... ১০১
আকাশ নিঠুর, বাতাস নীরস ... ৩৭
আকাশে বাতাসে ভাসে ... ৩৮
আকাশের বাণী বাজে ... ৩৮

আগে যেথায় ভিড় জমত ... ৩৮
আজি কমলমুকুলদল খুলিল ... ৫৩৮
আজি তোমাদের শুভপরিণয় -রাতে ... ৩৯
আজি মানুষের সব সাধনার ... ৩৯
আজু পড়িনু আমি কোন্ অপরাধে ... ১৭৮
আত্মদা বলদা যিনি ... ৯৩
আনভাঙ্গি বালিকার ... ১৪৪
আপনারে দেন যিনি ... ৯১
আবেদন ... ২০
আমাদের আঁখি হোক মধুসিক্ত ... ১০১
আমাদের সংগীত ... ৫৫০
আমায় রেখো না ধরে আর ... ২০৫
আমারই বেলায় উনি যোগী! নিজের তো বাকি নাই ... ১৫২
আমি দেখিতেছি চেয়ে সমুদ্রের জলে ... ২০৩
আয় চলে আয়, রে ধূমকেতু ... ৪০
আরম্ভে দেখায় গুরু, ক্রমে হয় ক্ষীণকায়া ... ১৩৯
আলাপ-আলোচনা ... ৫৭১
আলো এল যে দ্বারে তব ... ৪০
আলোর আশীর্বাদ জাগিল ... ৪১
আশালতা লাগাইনু ... ১৮৯
আশ্রমের শিক্ষা ... ৩৪৮
আসন দিলে অনাহূতে ... ৪১
আসুক সুখ বা দুঃখ ... ১১৩
আসে তো আসুক রাতি, আসুক বা দিবা ... ১৪৩
ইঁটের টোপর মাথায় পরা ... ৮২
ইঁদুরের ভোজ ... ২৭৯
ইঙ্গুদীর তৈল দিতে স্নেহসহকারে ... ১৩০
উঠে যদি ভানু পশ্চিম দিকে ... ১৩৭
উড়ো জাহাজ ... ৭৮
উৎসব ... ৭৪
উৎসবের রাত্রিশেষে ... ৪২
উত্তর দিগন্ত ব্যাপী দেবতাত্মা হিমাদ্রি বিরাজে ... ১২০
উত্তর-প্রত্যুত্তর ... ৪৮০
উদ্যোগী পুরুষ বলবান ... ১৩৬

উদ্যোগী পুরুষসিংহ, তারি 'পরে জানি ... ১৩৫
এ অসীম গগনের তীরে ... ৪২
একটুখানি জায়গা ছিল ... ৮০
একদিন নূতন রীতি হয়েছিল ... ১৭৪
...এক নগরেই মাধব বাস করে ... ১৭০
এক হাতে তালি নাহি বাজে ... ১৪৭
একাকী ... ১৬
একান্তরটি প্রদীপ-শিখা ... ১৪
এত শীঘ্র ফুটিলি কেন রে ... ২০৬
এপ্রিলের ফুল ... ২৭
এল সন্ধ্যা তিমির বিস্তারি ... ১৬
এসেছে প্রথম যুগে ... ৪২
এ হরি সুন্দর, এ হরি সুন্দর ... ১৬১
ও আমার বেঁটেছাতাওয়ালি ... ২৯
ওই আকাশ-'পরে আঁধার মেলে কী খেলা ... ৯
ওই আদরের নামে ডেকো সখা মোরে ... ২০৮
ওই দেখা যায় তোমার বাড়ি ... ২৮
ওই যেতেছেন কবি কাননের পথ দিয়া ... ১৯৯
ওকালতি ব্যবসায়ে ক্রমশই তার ... ৩৫
ওগো তুমি নব নব রূপে ... ৫৯৯
ওগো স্মৃতি কাপালিকা ... ৪২
ওরা কাজ করে ... ৬৫০
ওরে যন্ত্রের পাখি ... ৭৮
কখনো সাজায় ধূপ ... ২৮
কঠিন শিলা প্রতাপ তাঁর বহে ... ৪২
[ক]ণ্টকমাঝারে কুসুমপরকাশ ... ১৬৩
কণ্ঠে ভরি নাম নিল ... ৪২
কথা ও সুর ... ৫৬৩
কবি ... ১৯৯
কমল ভ্রমর জগতে অনেক আছে ... ১৭২
কমল শৈবালে ঢাকা তবু রমণীয় ... ১২৮
কাঁপিছে দেহলতা থরথর ... ৫৪৫
কাঁপিলে পাতা নড়িলে পাখি ... ১৪১
কাক কালো, পিক কালো, বর্ষায় সমান তারা ঠিক ... ১৩৪

কাক কালো, পিক কালো, মিথ্যা ভেদ খোঁজা ... ১৩৫
কালচার ও সংস্কৃতি ... ৪০০
কাল সন্ধ্যাকালে ধীরে সন্ধ্যার বাতাস ... ২০০
কিছুই করে না শুধু ... ১৩২
কিন্তু নিরাশাও শান্ত হয়েছে এমন ... ২০৪
কী কহিব, আহে সখী, নিজ অজ্ঞানে ... ১৮০
কী জানি মিলিতে পারে মন সমতুল ... ১৩২
কী সুর তুমি জাগালে উষা ... ৪৩
কুঞ্জকুটিরের স্নিগ্ধ অলিন্দের ’পর ... ১৪২
কুঞ্জ-পথে পথে চাঁদ উঁকি দেয় আসি ... ১৪৩
কুমারসম্ভব ... ১২০
কে এই পৃথিবী করি লবে জয় যমলোক ... ১১০
কে জানে কার মুখের ছবি ... ৪৩
কেমনে কী হল পারি নে বলিতে ... ২০৯
কোথা আছ অন্যমনা ছেলে ... ৪৩
...কোন্ তপে আমি তার মায়ের মতো ... ১৯১
কোন্ দূর শতাব্দের কোন্-এক অখ্যাত দিবসে ... ৫
কোন্ বনে মহেশ বসে ... ১৭৩
কোন্ বাণী মোর জাগল, যাহা ... ১৮
কোনো এক যক্ষ সে ... ১২৭
কোনো জাপানি কবিতার ইংরাজি অনুবাদ হইতে ... ২১২
খাবার কোথায় পাবি বাছা ... ১৫৪
খেয়েছ যে সালগম না করিয়া কাল-গম ... ২৬
গগন গরজে ঘন ঘোর ... ১৮৬
গগনের থালে রবিচন্দ্র দীপক জ্বলে ... ১৯৬
গতকাল পাঁচটায় ... ৮৫
গর্জিছ মেঘ, নাহি বর্ষিছ জল ... ১৩৭
গাভী দুহিলেই দুগ্ধ পাই তো সদ্যই ... ১১৩
গীতালি ... ৫৭০
গুরু, আমায় মুক্তিধনের দেখাও দিশা ... ১৬০, ৬৪২
গেছে সে আপদ গেছে, ঘরেতে থাকিবে তবু রুটি ... ১৫৫
গোঁড়ামি যখন সত্যেরে চাহে ... ৪৪
গোড়াতেই ঢাক-বাজনা ... ৪৪
গোলাপ হাসিয়া বলে, ‘আগে বৃষ্টি যাক চলে ... ২০৬

ঘরে আর আসে না সে— কোনো পরিশ্রম নাহি ... ১৫৫
ঘরে দুটা অন্ন এলে ছেলেদের দেবো কোথা খেতে ... ১৫৩
ঘরের মায়া ঘরের বাইরে করুক রূপ রচনা ... ৪৪
চক্ষু'পরে মৃগাক্ষির চিত্রখানি ভাসে ... ১৪৪
চতুরানন, পাপের ফল ... ১৩৩
চন্দন হইল বিষম শর ... ১৮৫
চরণে আপনারে ... ৪৪
চলতি ভাষার রূপ ... ৪১৭
চলন্ত কলিকাতা ... ৮২
চলার গতি শেষের প্রতি ... ৪৪
চারিদিকে বিবাদ বিদ্বেষ ... ৪৫
চিত্তবর্গ ... ১০৯
চিত্ত মম বেদনা-দোলে ... ৪৫
চিত্রকূট ... ৮০
চিহ্নবিভ্রাট ... ৪৪৫
চূড়াটি তোমার ... ১৬১
ছবি-আঁকিয়ে ... ৭৯
ছবির আসরে এল ... ৪৬
ছবির জগতে যেথা কোনো ভাষা নেই ... ৪৫
ছাত্রদের প্রতি সম্ভাষণ ... ৫৬৬
ছাত্রশাসনতন্ত্র ... ২৮৮
ছাত্রসম্ভাষণ ... ৩৫১
ছেঁড়াখোঁড়া মোর পুরোনো খাতায় ... ৭৯
জন্মদিনে ... ২২
জন্মের দিনে দিয়েছিল আজি ... ৪৬
জলেতে কমল, জল কমলে ... ১৪৭
জাতীয় সাহিত্য ... ৪৬৫
জীবনবাণী ... ১৮
জীবনযাত্রা আগে চলে যায় ছুটে ... ৪৬
জীবন সঞ্চয় করে ... ৪৭
জ্বেলেছে পথের আলোক ... ৪৭
ঝোড়ো রাত ... ৭২
ঢেউ উঠেছে জলে ... ৭২
তপস্যা ... ৭৭

তরণী বেয়ে শেষে ... ৪৭
তরুণ প্রাণের যুগল মিলনে ... ৪৭
তলোয়ার থাকে ... ৪৮
তারকাকুসুমচয় ... ১৯৫
তারা ও আঁখি ... ২০০
তৃষ্ণার পরীক্ষা শেষ হয় ... ১৫৯
তুমি অচিন মানুষ ছিলে গোপন আপন গহন-তলে ... ২১
তুমি আমাদের পিতা ... ৮৯
তোমাদের জল না করি দান ... ১২৯
তোমাদের যে মিলন হবে ... ৪৮
তোমার আমার মাঝে ঘন হল কাঁটার বেড়া এ ... ৪৮
তোমার ঐ মাথার চূড়ায় ... ১৬১
তোমার জন্মদিনে আমার ... ২২
তোমার বাড়ি ... ২৮
দাদুরে যে মনে করে লিখেছ এ চিঠি ... ৪৯
দিদিমণি ... ৩০
দিদিমণি আঁট করে দিলে মোর দিন ... ৩০
দিনান্ত ... ১৪
দিনান্তে ধরণী যথা ... ৪৯
দুই প্রাণ মিলাইয়া ... ৫০
দুন্দুভি বেজে ওঠে ডিম্-ডিম্ রবে ... ৭৪
দুয়ার মম পথপাশে ... ৫৪৮
দুর্দিন ... ৯
দূরের মানুষ কাছের হলেই ... ৫০
দেও গো বিদায় এবে যাই নিজধামে ... ১৫৬
দেখিনু যে এক আশার স্বপন ... ২১০
[ধ]ন যৌবন রসরঙ্গে ... ১৭৩
ধরণীর আঁখিনীর ... ৫০
ধরায় পাওরী আছে লোকেদের তরে ... ১৫৮
ধরার আঙিনা হতে ওই শোনো ... ৫০
ধীরে ধীরে চলো তন্বী, পরো নীলাম্বর ... ১৪৪
নদী বহে যায় নূতন নূতন বাঁকে ... ৫১
নবমধুলোভী ওগো মধুকর ... ১৩১
নয়ন-অতিথিরে ... ৫১

নয়নে নিঠুর চাহনি … ৫১
নহে নহে এ নহে মরণ … ২১১
নামদেব পাণ্ডুরঙ্গে লয়ে সঙ্গে ক'রে … ১৫১
নামের পদবী … ৪৬৬
নারীর দুখের দশা অপমানে জড়ানো … ৩৩
নারীর বচনে মধু হৃদয়েতে হলাহল … ১৪০
নিখিলবঙ্গসংগীতসম্মেলন … ৫৬৭
নিত্য ঘরে ঘরে ভ্রমে, তার কেমন বিবাহ … ১৯৩
নিদাঘের শেষ গোলাপ কুসুম … ২০৮
নিঃস্বতাসংকোচে দিন … ৫১
নীতিজ্ঞ করুক নিন্দা অথবা স্তবন … ১৩৮
নীতিজ্ঞ বলুন ভালো, গালি বা পাড়ুন … ১৩৯
নীতিবিশারদ যদি করে নিন্দা অথবা স্তবন … ১৩৮
নূতন সংসারখানি সৃষ্টি করো আপন শক্তিতে … ৫২
নেপথ্যপরিগত প্রিয়া সে … ১৩১
পক্ষে বহিয়া অসীম কালের বার্তা … ১৩
পতিত ক্ষেতের ধূসরিত ভূমে … ৫২
পথে পথে অরণ্যে পর্বতে … ৫৩
পথে যেতে যেতে হল … ৫৩
পশ্চিমের দিক্‌সীমায় দিনশেষের আলো … ২০
পাঙ্‌চুয়াল … ৮৫
পাখি, তোর সুর ভুলিস নে … ৩১
পিয়াসে মরিতেছে [আ]মাকে জল খাওয়াও … ১৯২
পুণ্য-ধারার অভিষেক বারি … ৫৩
পুপুদিদির জন্মদিনে … ২৩
পুরাতন প্রসঙ্গ … ৫৯৬
পুষ্পবর্গ … ১১০
পূর্বপ্রেমে আসিনু তোমা হেরিতে … ১৭৫
পৌষ-মেলা … ৭৪
প্রচ্ছন্ন পশু … ৩৪
প্রতিশব্দ … ৩৮৫
প্রতিশব্দ-প্রসঙ্গ … ৪০২
প্রত্যুত্তর … ১৩
প্রথম ও একাদশ দিয়া প্রভু গেল … ১৮৫

প্রদীপ থাকে সারাটা দিন ... ৫৩
প্রদোষ ... ৩৯৮
প্রদোষের দেশে ... ৫৩
প্রভাত একটি দীর্ঘশ্বাস ... ২০৬
প্রভাতের 'পরে দক্ষিণ করে ... ৫৪
প্রয়াগে যেখানে গঙ্গা যমুনা ... ৫৪
'প্রাচীন-কাব্য সংগ্রহ' : বিদ্যাপতি ... ৪৭১
প্রায় কাজে নাহি লাগে মস্ত ভাগর ... ১৩৭
প্রিয়বাক্য-সহ দান, জ্ঞান গর্বহীন ... ১৪৭
প্রিয়ার দৌত্যের পথে ... ৫৪
প্রেয়সী মোর পুপে ... ৫৫
ফসল গিয়েছে পেকে ... ৩৪
ফাল্গুন ... ৭৫
ফাল্গুনে বিকশিত কাঞ্চন ফুল ... ৭৫
ফিরে ফিরে আঁখিনীরে ... ৫৫
ফুল্ল শাখা যেমন মধুমতী ... ১০০
বঙ্গভাষা ... ৩৬৯
বচন নাহি তো মুখে ... ৫৫
বচন যদি কহ গো দুটি ... ১৪২
বড়োই সহজ ... ৫৫
বড়োর দলে নাইবা হলে গণ্য ... ৫৫
বনের পথে পথে বাজিছে বায়ে ... ৫৬, ৫৪৯
বন্ধুগণ, শুন, রামনাম করো সবে ... ১৫৮
বর্ষণশান্ত পাণ্ডুর মেঘ ... ৫৬
বসন্তের ফুল তোরই ... ২৭
বহিয়া হালকা বোঝা ... ৫৬
বহু অপরাধে তবুও আমার 'পর ... ১২৪
বাউল-গান ... ৫৫৩
বাউল বলে খাঁচার মধ্যে ... ৫৭
বাংলা কথ্যভাষা ... ৪১০
বাংলা নির্দেশক ... ৩৭৮
বাংলা বহুবচন ... ৩৮১
বাংলা বানান ... ৪২৮
বাংলা বানান : ২ ... ৪৩১

বাংলা বানান : ৩ ... ৪৩১
বাংলা ব্যাকরণে তির্যক্‌রূপ ... ৩৭১
বাংলা ব্যাকরণে বিশেষ বিশেষ্য ... ৩৭৫
বাংলা ভাষা ও বাঙালি চরিত্র : ১-২ ... ৪৬৩
বাংলার বানান সমস্যা ... ৪২৯
বাংলা শব্দতত্ত্ব ... ৩৫৯
বাক্য আর অর্থ -সম সম্মিলিত শিবপার্বতীরে ... ১২১
বাক্য তোমার সব লোকে বলে ... ৫৭
বাজিবে, সখি, বাঁশি বাজিবে ... ৫৪৬
বাজে নিশীথের নীরব ছন্দে ... ৫৭
বাজে বাজে রম্যবীণা বাজে ... ১৬২
বাণী ... ১৩
বাণী আমার পাগল হাওয়ার ... ৫৮
বাতাসে অশথপাতা পড়িছে খসিয়া ... ২১২
বাদানুবাদ ... ৪১৫
বানান-প্রসঙ্গ : ১-১১ ... ৪৪৯
বানান বিধি ... ৪৩৪
বানান-বিধি : ১-২ ... ৪৩৮, ৪৪৫
বাঁশরি আনে আকাশবাণী ... ২৪, ৬৪৮
বাহিরে ও ঘরে মোর আছ যারা যারা ... ১৫৭
বাহিরের আশীর্বাদ ... ৫৮
বিজন রাতে যদি রে তোর ... ১৮
বিদায়-বেলার রবির পানে ... ৫৮
বিদেশী ফুলের গুচ্ছ ... ২০৩
বিদ্যার যাচাই ... ২৯৯
বিদ্যাসমবায় ... ৩০১
বিঁধিয়া দিয়া আঁখিবাণে ... ১৪৫
বিধি হে, যত তাপ মোর দিকে ... ১৩৪
বিনা বিচারে ব্যভিচার বুঝ ... ১৬৯
বিপুল প্রস্তরপিণ্ড ভূস্তরের কণ্ঠ রুদ্ধ করি ... ৫৮
বিবিধ : ১-২ ... ৪১৮
বিবিধ : ১-৫ ... ৪২৪
বিরহী গগন ধরণীর কাছে ... ৫৯
বিশ্ববিদ্যালয়ের রূপ ... ৩১৬

বিশ্ববিদ্যালয়ে সংগীতশিক্ষা … ৫৫৫
বিসর্জন … ১৯৯
বিসর্জন (নাটক : নারীচরিত্র বর্জিত সংক্ষিপ্ত) … ২৫৯
বিস্মৃত যুগে গুহাবাসীদের মন … ৫৯
বুঝিনু তাহার ভালো মন্দ … ১৯০
বৃষ্টিধারা শ্রাবণে ঝরে গগনে … ১৪৯
বেঁচেছিল, হেসে হেসে … ২০৭
বেঁটেছাতাওয়ালি … ২৯
বেলকুঁড়ি-গাঁথা মালা … ১৩
বোধ হয় এ পাষণ্ড পূর্বজন্মে ছিল মোর অরি … ১৫৩
ব্যাকুল বকুলের ফুলে … ৫৪৭
ভয়ে ভয়ে এসেছিল … ৫৯
ভালোই করেছ, পিক … ১৩৪
ভাষার কথা … ৩৬১
ভাষার খেয়াল … ৪২০
ভাষা-শিক্ষায় সাম্প্রদায়িকতা : ১-৩ … ৪৫৭
ভুবন হবে নিত্য মধুর … ৫৯
ভোরের কলকাকলিতে … ৬০
ভ্রমণকারী মন … ৬০
ভ্রমর একদা ছিল পদ্মবনপ্রিয় … ১৪৬
মক্তব-মাদ্রাসার বাংলা ভাষা … ৪৫৫
মদনদহন … ১১৭
মধুর সূর্যের আলো, আকাশ বিমল … ২০৩
মন আগে ধর্ম পিছে … ১০৩
মন হইল পরবশ, পরদেশ নাথ … ১৮৪
মনে রেখো দৈনিক … ৬০
মরুতল কারে বলে? সত্য যেথা … ৬০
মহীয়সী মহিমার আগ্নেয় কুসুম … ২০০
মাঝে মাঝে পদ্মবনে … ১৩০
মাটি আঁকড়িয়া থাকিবারে চাই … ৬০
মাঠে আছে কাঁচা ধান … ৬১
মাধব আমার রটিল দূর দেশ … ১৮৩
মাধব, এ নহে উচিত বিচার … ১৭৭
মাধব, কী কহিব তাহার জেয়ানে … ১৭৯

মাধব, তুঁহু যদি যাও বিদেশে ... ১৮১
মাধব মাসে মাধবতিথিতে ... ১৮৭
মাধবী যায় যবে চলিয়া ... ৬১
মানিনী, এখন উচিত নহে মান ... ১৭৬
মারিতে মারিতে কহিবে মিষ্ট ... ১১২
মালঞ্চ (নাটক) ... ২১৭
মালতী সারাবেলা ঝরিছে রহি রহি ... ৬১
মিলন-প্রভাতে দূরের মানুষ ... ৬২
মিলন-যাত্রায় তব পরিপূর্ণ প্রেমের পাথেয় ... ৬২
মিলনের রথ চলে ... ৬২
মুখমণ্ডলে বদন মিলাইয়া ধরিল ... ১৬৫
মূর্ত তোরা বসন্তকাল মানব-লোকে ... ৬৩
মৃগের গলি পড়ে মুখের তৃণ ... ১৩০
মৃদু এ মৃগদেহে ... ১২৭
মেঘগুলি মোর ... ৬৩
মেঘদূত ... ১২৬, ১২৭
মেঘলা গগন তমাল-কানন ... ১৪১
মোরে তেজি পিয়া মোর গেল যে বিদেশ ... ১৮২
মোহন, মধুপুরে বাস ... ১৮৮
মৌমাছি সে মধু খোঁজে মাধবীর ঝোপে ... ৬৩
যক্ষ সে কোনোজনা আছিল আনমনা ... ১২৬
যতক্ষণ থাকে মেঘ ... ৬৪
যত চিন্তা কর শাস্ত্র, চিন্তা আরো বাড়ে ... ১৪০
যদিও ক্লান্ত মোর দিনান্ত ... ৬৪
যদি ঝড়ের মেঘের মতো আমি ধাই ... ৯৪
যদি মোরে স্থান দাও তব পদছায় ... ১৫১
যবে কাজ করি ... ৫৯৫
যশের বোঝা তুলিয়া লয়ে কাঁধে ... ৬৪
যাত্রা শেষে ... ১৮
যারা বিহানবেলায় গান এনেছিল ... ৩১
যাঁর তাপে বিধি বিষ্ণু শম্ভু বারো মাস ... ১৩৯
যাঁ হতে বাহিরে ছড়ায়ে পড়িছে ... ৯০
[যাঁ]হার জন্মে গেলেম ... ১৬৮
যাহা খুশী তাই করে ... ৬৪

যিনি অগ্নিতে যিনি জলে … ৯০
যুগল পাখি … ১৫
যুগল যাত্রী করিছ যাত্রা … ৬৫
যুগ্মগাথা … ১০৩
যে কাঁদনে হিয়া কাঁদিছে … ৫৪৭
যে ছিল মোর ছেলেমানুষ … ২৩
যে তোরে বাসে রে ভালো, তারে ভালোবেসে বাছা … ১৯৯
যে পদ্মে লক্ষ্মীর বাস, দিন-অবসানে … ১৪০
যেমন আমি সর্বসহা শক্তিমতী … ১০১
যে মন টলে, যে মন চলে, যাহারে ধরে বাখা দায় … ১০৯
যেমন-তেমন হোক মোর জাত … ১৩৩
রবির কিরণ হতে আড়াল করিয়া রেখে … ২১০
রঘুবংশ … ১২১
[রা]হু মেঘ হইয়া … ১৬৫
রুদ্র, তোমার দারুণ দীপ্তি … ১০
রুদ্র সমুদ্রের বক্ষ … ৬৫
রেণু কোথায় লুকিয়ে থাকে … ৬৫
রেশ … ২৪
রৌদ্রী তপস্যার তাপে জ্বলন্ত বৈশাখে … ৬৫
লক্ষ্মী সে পুরুষসিংহে করেন ভজন … ১৩৬
লিখন দিয়ে স্মৃতিরে কি … ৬৬
লেখা আসে ভিড় ক'রে … ৬৬
[লোচ]ন অরুণ, ইহার ভেদ বুঝিতেছি … ১৭১
লোভিত মধুকর কৌশল অনুসরি … ১৬৬
শকতিহীনের দাপনি … ৬৬
শক্তির সংঘাত-মাঝে বিশ্বে যিনি শান্ত যিনি স্থির … ৬৬
শব্দ-চয়ন : ১-৬ … ৪৮৯
শব্দতত্ত্বের একটি তর্ক … ৪২২
শরীর সে ধীরে ধীরে যাইতেছে আগে … ১২৯
শান্তি নিজ আবর্জনা দূর করিবারে … ৬৭
শিক্ষা ও সংস্কৃতি … ৩৩৪
শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে সংগীতের স্থান … ৫৫৮
শিক্ষার বিকিরণ … ৩২৭
শিক্ষার মিলন … ৩০৩

শিক্ষার স্বাঙ্গীকরণ ... ৩৩৭
শিবাজী-উৎসব ... ৫
শিশির আপন বিন্দুর মাঝখানে ... ৬৭
শিশির সে চিরন্তনে ... ৬৭
শীত ... ৭১
শীতের দিনে নামল বাদল ... ৭৪
শীতের দুয়ারে বসন্ত যবে ... ৬৭
শুন, দেব এ মনের বাসনানিচয় ... ১৫০
শুভ্র কায়াহীন নির্বিকার ... ৯৭
শৃঙ্খল বাঁধিয়া রাখে এই জানি সবে ... ১৪১
শৈশবে ছাদের কোণে গোপনে ছুটিত মায়ারথ ... ৬৭
শোনো বিশ্বজন ... ৯৯
সংগীত ও ভাব ... ৫২৭
সংগীতচিন্তা ... ৫২৫
সংগীতের মুক্তি ... ৫৩৫
সংগ্রামমদিরাপানে আপনা-বিস্মৃত ... ৩৪
সকল ঈশ্বরের পরমেশ্বর ... ৯৬
সকল পক্ষী মৎস্যভক্ষী ... ৬৮
সতের বচন লীলায় কথিত ... ১৩৮
সত্যকাম জাবাল মাতা জবালাকে বললেন ... ৯৯
সত্য রূপেতে আছেন সকল ঠাঁই ... ৯১
সবিতার জ্যোতির্মন্ত্র ... ৬৮
সময় লঙ্ঘন করি নায়ক তপন ... ১১৭
[স]মুদ্রের মতো নিশির ... ১৬৫
সম্মিলন ... ২০১
সাত বর্ণ মিলে যথা ... ৬৮
সারাদিন গিয়েছিনু বনে ... ২০৪
সালগম-সংবাদ ... ২৬
সীমাশূন্য মহাকাশে ... ৬৮
সুখ বা হোক দুখ বা হোক ... ১১২
সুখ হোক দুঃখ হোক ... ১১২
সুনিবিড় শ্যামলতা ... ৬৮
সুন্দরী বিরহশয়নঘরে গেল ... ১৮২
সুন্দরী রমণী তোমার অভিসার যত করিয়াছে ... ১৬৪

সুন্দরের অশ্রুজল দেখা দেয় যেই ... ৬৯
সুপ্রভাত ... ১০
সুর ও সংগতি ... ৬১৭
সূর্য ও ফুল ... ২০০
সূর্য কখন আলোর তিলক ... ৬৯
সূর্য চলেন ধীরে সন্ন্যাসীবেশে ... ৭৭
সেই তো পুরুষসিংহ উদ্যোগী যে জন ... ১৩৬
সেকালের জয়গৌরব খসি ... ৬৯
সে গাম্ভীর্য গেল কোথা ... ১৪৫
সেথায় কপোতবধূ লতার আড়ালে ... ২০১
সেদিন হেরিবে কবে এ মোর নয়ান ... ১৯৬
সেবা কোরো গুরু জনে, সপত্নীরে জেনো সখীসম ... ১৩১
সোনা দিয়ে বাঁধা হোক কাকটার ডানা ... ১৩৫
স্ত্রীলিঙ্গ ... ৩৮৩
স্ত্রীশিক্ষা ... ২৮৫
স্বপ্নগগন পথের-চিহ্ন-হীন ... ১৫
স্বর্গের চোখের জলে ... ৬৯
স্বর্ণবর্ণে-সমুজ্জ্বল নবচম্পাদলে ... ১৪৯
স্মৃতি সে যে নিশিদিন ... ৭০
হনুচরিত ... ৮৪
হনু বলে, তুলব আমি গন্ধমাদন ... ৮৪
হরপ্রসাদ সংবর্ধন ... ৪৬৯
হরিণগর্বমোচন লোচনে ... ১৪৫
হায় মোর নাই আশা, নাইকো আরাম ... ২০৩
হাসির সময় বড়ো নেই ... ২০৭
হাস্যকৌতুক ... ২৫৪
হিতৈষীদের স্বার্থবিহীন অত্যাচারে ... ৭০
হেথা কেন আসে লোকগুলা ... ১৫৬
হেথায় আকাশ সাগর ধরণী ... ৭০
হে বরুণ, তুমি দূর করো হে ... ৯৫
হে বরুণদেব ... ৯৪
হেঁয়ালি নাট্য ... ২৫৫
হ্যারাম ... ২৮

সুলভ সংস্করণ

মূল্য ১৫০·০০ টাকা
ISBN-81-7522-291-3 (V.16)
ISBN-81-7522-289-1 (Set)